গল্প সমগ্র

প্রথম খণ্ড

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নন্দিতা পাবলিশার্স

৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
রবীন্দ্র নাথ চন্দ্র
নন্দিতা পাবলিশার্স
৬এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৬৫

মুদ্রাকর :
গোবিন্দ লাল চৌধুরী
স্যাঙ্গুইন প্রিণ্টার্স
২, ছিদামমুদি লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

সূচীপত্র

গল্পসমগ্র

আগামীকাল

মেয়েটি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। ভেতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না। দু-একবার তাকাচ্ছিল ওপরের দিকে, যদি কোন ঘরের জানালায় কারুকে দেখা যায়।

অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন দুজন প্রৌঢ় লোক। একজন একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কাকে চাই?

মেয়েটি মুখ তুলে বলল, তপন আছে?

প্রৌঢ়টি একটু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, তপন? তপন কি?

তপন রায়চৌধুরী।

যাদবপুরে পড়ে?

হ্যাঁ।

ওদের ফ্ল্যাট তিনতলায়। ঐ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যান।

তাকে একটু নীচে ডেকে পাঠানো যায় না?

কে ডাকবে? আমি অন্য ফ্ল্যাটে থাকি।

মেয়েটি একটুক্ষণ চিন্তা করে বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে।

মেয়েটি গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে ধীর পায়ে সিঁড়ির দিকে এগোল।

সে চোখের আড়াল হবার পর প্রৌঢ়টি একটু হেসে অপর প্রৌঢ়কে বললেন, দিনকাল কি রকম বদলেছে দেখেছ? আমাদের সময়ে কোন ছেলেই কোন মেয়ের বাড়িতে ডাকতে যেতে সাহস করত না। এখন মেয়েরাই ছেলেদের বাড়িতে ডাকতে আসে।

অপর প্রৌঢ় বললেন, মেয়েটি তিনতলার তপনের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে বুঝি?

তাই তো মনে হয়।

আমাদের সময়ে কোন ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে মেয়েরা লোকজনের সামনে দাদা-টাদা বলে ডাকত। তপনদা কিংবা অজয়দা। এখন এরা স্রেফ নাম ধরে ডাকে।

আপনি-টাপনি বলারও ধার ধারে না। প্রথম থেকেই তুমি।

তুই তুকারিও করে শুনেছি।

প্রথম প্রৌঢ় একটা নকল দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুচকি হেসে বললেন, আমরা বড্ড অসময়ে বুড়ো হয়ে গেলুম হে! আমরা এসব কিছুই পেলাম না!

মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে গিয়ে থামল। সিঁড়ির দু'পাশে দুটি ফ্ল্যাট। কোন্ ফ্ল্যাটটা তপনদের সে কি করে বুঝবে? এরা দরজায় নাম লিখে রাখে না কেন?

মেয়েটি প্রথমে ডানদিকের দরজায় কলিং বেল টিপল। দরজা খুলল একটি বলিষ্ঠ চেহারার যুবক।

তপন আছে?

যুবকটি একটু রূঢ়ভাবে বলল, এখানে তপন নামে কেউ থাকে না। এ কথা বলেও যুবকটি দরজা বন্ধ করল না। মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

মেয়েটি বুঝতে পারল, পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাটের মধ্যে নিশ্চয়ই ভাব নেই।

ছেলেটির অন্তত বলা উচিত ছিল, উল্টো দিকের ফ্ল্যাটে দেখুন।

মেয়েটি বলল, ও, আমার ভুল হয়ে গেছে।

উল্টো দিকে ফিরে সে চলে এল অন্যদিকের ফ্ল্যাটে। সেখানে বেল টিপতে দরজা খুলল একজন চাকর শ্রেণীর লোক।

তপনবাবু আছেন?

আছেন। দাদাবাবুর জ্বর।

আমি একটু দেখা করব।

চটি ফটফট করে তপন নিজেই এগিয়ে এল দরজার কাছে। উলটো দিকের ফ্ল্যাটের যুবকটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে এদিকে চেয়ে। তাকে দেখে তপনের ভুরু কুঁচকে গেল। মেয়েটিকে বলল, তুমি? এস ভেতরে এস।

এই সময় উলটো দিকের দরজাটা দড়াম শব্দে বন্ধ হল।

তপন মেয়েটিকে নিয়ে এল বসবার ঘরে। বেশ ছিমছাম সাজানো। হালকা রঙের সোফা-সেট, এক কোণে নীচু টেবিলে পেতলের বুদ্ধ মূর্তি, তার পাশে ফুলদানি, ফুল নেই।

দূরে থেকে তপনের মা জিজ্ঞেস করলেন, কে এসেছে রে?

তপন বলল, আমার এক বন্ধু। তুমি এস একটু—

মা উত্তর দিলেন, যাচ্ছি। একটু পরে যাচ্ছি।

মেয়েটি ধপাস করে একটা সোফায় বসে পড়ে বললে, পাখাটা খুলে দাও।

তপন পাখটা চালিয়ে একটা সিগারেট ধরালে। তারপর বলল, হঠাৎ আমার বাড়ি চলে এলে যে?

এমনিই এলাম। তোমাদের উলটো দিকের ফ্ল্যাটের ছেলেটার সঙ্গে বুঝি তোমার ঝগড়া।

ও, সত্যেন, ও তো একটা লোফার।

লোফার মানে? কি করে?

পাড়ায় মস্তানি করে। আসল ব্যাপারটা কি, এ বাড়ির একতলার ফ্ল্যাটে সুস্মিতা বলে একটা মেয়ে থাকত, তাকে সত্যেনের খুব পছন্দ ছিল। কিন্তু সুস্মিতা আবার আমার প্রেমে পড়ে গেল। আমার কাছ থেকে বই-টই নিতে আসত। সেই থেকেই আমার ওপর সত্যেনের রাগ।

নিজের বাড়িতেও বুঝি প্রেম করা হয়েছে তোমার?

নিশ্চয়ই। ফ্ল্যাট বাড়িতে কিংবা পাড়ার মধ্যেই তো প্রথম প্রেমের হাতেখড়ি হয়। তারপর তো কলেজ ইউনিভার্সিটিতে।

সুস্মিতা এখন আর আসে না বই নিতে?

ওর বিয়ে হয়ে গেছে।

তোমার সব প্রেমিকাদেরই এত তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায় কেন?

তার মানে?

তোমার প্রেমিকাদের তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায় কিন্তু তোমাকে কেউ তারা বিয়ে করতে চায় না।

তপন হোহো করে হাসল। সিগারেটে টান দিল আবার।

তপনের মা এসে ঢুকলেন। বেশ জমকালো একটা শাড়ি পরা। এক্ষুনি বাইরে বেরুবেন মনে হয়।

তপন সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল, মা, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এর নাম খুকু—এই তোমার ভাল নাম কি যেন?

মেয়েটি প্রথমে হাত জোড় করে নমস্কার করে বলল, আমার নাম সুবর্ণা চ্যাটার্জি। তারপর সে উঠে গিয়ে তপনের মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

তিনি বললেন, আরে থাক থাক, পায়ে হাত দিতে হবে না।

তপন বলল, সুবর্ণা আমাদের ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ওর সাবজেক্ট ফিলসফি।

মা বললেন, হ্যাঁ, তোমার কথা শুনেছি। তুমি আগে আমাদের বাড়িতে আস নি তো!

সুবর্ণা বলল, না আসা হয় নি। তপন কখনো আসতেই বলে নি।

এবার থেকে আসবে। তুমি কি খাবে। চা না কফি?

আমি কিছু খাব না মাসীমা।

কিছু খাবে না? একটু শরবত করে দিই?

আচ্ছা দিন।

মা তপনকে বললেন, আমি রঘুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি একটু বেরুব। সাড়ে বারোটা বাজলে তুই রঘুকে মনে করে পাঠিয়ে দিস বাপ্পাকে যেন স্কুল থেকে নিয়ে আসে।

তপন জিজ্ঞেস করলে, তুমি কোথায় যাবে?

দু-একটা জিনিস কেনাকাটি আছে, তারপর তোর ঝুনুমাসীর বাড়ি থেকেও একটু ঘুরে আসতে হবে।

তিনি সুবর্ণার দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা তোমরা গল্প কর—

মা চলে যাবার পর তপন জিজ্ঞেস করলে, মাকে তো বললে আমি তোমাকে কখনো বাড়িতে আসতে বলি নি। তাহলে এলে কেন?

এমনিই ইচ্ছে হল।

হঠাৎ এরকম ইচ্ছে?

তোমাদের টেলিফোনের লাইনটা খারাপ?

দু-তিনদিন ধরে খারাপ হয়ে আছে।

তুমি চারদিন ক্লাসে যাও নি—

আমার জ্বর।

বাজে কথা।

বাজে কথা মানে? আমি কি বাড়ির চাকরকেও মিথ্যে শিখিয়ে রেখেছি নাকি?

সুবর্ণা তপনের গলার কাছটা ছুঁয়ে বললে, কই গা গরম নেই তো!

কাল রাত পর্যন্ত ছিল।

আগে তো অনেকবার এর থেকে বেশী জ্বর কিংবা শরীর খারাপ নিয়েও ইউনিভার্সিটিতে যেতে।

তা যেতাম। তুমি চারদিন আমাকে না দেখেই উতলা হয়ে পড়েছিলে নাকি? সেইজন্যই আজ দেখতে এলে?

না। সেজন্যে নয়। তোমাকে একটা খবর দিতে এলাম।

কি!

চাকর রঘু একটা ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে এল। এক গেলাসে অরেঞ্জ স্কোয়াসের শরবত আর একটি প্লেটে চারখানা শোনপাপড়ি।

তপন জিজ্ঞেস করলে, রঘু, মা বেরিয়ে গেছেন?

হ্যাঁ, এই মাত্র গেলেন।

দরজাটা বন্ধ করে রাখিস।

চাকর ট্রে-টা রেখে যাবার পর তপন নিজেই আগে প্লেট থেকে একটা শোনপাপড়ি তুলে মুখে পুরল। তারপর বলল, শোনপাপড়িগুলো লাভলি, মা নিজে বানিয়েছে, খেয়ে দেখ।

সুবর্ণাও একটা তুলে মুখে দিয়ে বলল, সত্যি খুব ভাল হয়েছে তো!

এবার তোমার খবরটা বল।

আগামী সোমবার আমি রণজয়কে বিয়ে করছি।

এ আর নতুন খবর কি?

তুমি জানতে?

আগামী সোমবারই যে বিয়ে করবে, তা জানতাম না। রণজয়ই আমাকে বলছিল তুমি বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ।

তোমার কাছ থেকে একটা পরামর্শ চাইতে এলাম।

বল।

আমার কি এক্ষুনি বিয়ে করা উচিত?

সব মেয়েরই তাড়াতাড়ি বিয়ে করা উচিত। আমার মতে—

ইয়ার্কি নয়। একটু সীরিয়াসলি চিন্তা করে বল—
এ নিয়ে এত চিন্তা-ভাবনা করার কি আছে?
বাড়িতে কারুকে এখন জানাচ্ছি না।
ও। কিন্তু তুমি হঠাৎ বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেই বা কেন?
কারণ নিশ্চয়ই একটা আছে। তুমি সবটা জানো না তপন। রণজয় একলা একটা ঘর নিয়ে থাকে রয়েড স্ট্রীটে। সেখানে আমাকে প্রায়ই যেতে হয়। মানে আমি না গেলে ও ছেলেমানুষের মতন জেদ করে, রাগারাগি করে। দু-তিনদিন আমি না গেলে ও এমন কি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়, পড়াশুনোও একেবারে করে না।
রোজ একবার করে গেলেই পারো।
তাই তো যাই। তার ফলে কি হয় বুঝতেই পারো।
পারছি। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পাড়া, ডিসটার্ব করার কেউ নেই।
আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা হয়।
দুশ্চিন্তা! তোমার ভাল লাগে না! এত চমৎকার সুযোগ। দ্যাখ, আঠারো থেকে চব্বিশ বছর সময়টা হচ্ছে সবচেয়ে চমৎকার বয়েস। এই সময়ে সেক্স জিনিসটা সবচেয়ে বেশী উপভোগ করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই এই সময়টা নষ্ট করে। সুযোগ পায় না। পড়াশুনো শেষ না করে চাকরি-বাকরি না পেলে কেউ বিয়ে করতে পারে না। কিন্তু পড়াশুনো কিংবা চাকরির সঙ্গে সেক্সের কি সম্পর্ক? বাবা মায়ের শাসনে থেকে অনেককেই এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তুমি এ রকম সুন্দরভাবে সেটা পেয়ে গেছ, অথচ বলতে চাও, সেটা তোমার ভাল লাগে না!
ভাল লাগা না লাগার কথা নয়। আমার ভয় হয়, কিছু যদি হয়ে-টয়ে যায়!
প্রি-কশান নিলেই পারো। হাতের কাছে যখন সব কিছুই পাওয়া যায়—
ভুলে যেও না, এদেশটা এখনো ইওরোপ আমেরিকা হয়ে যায় নি।
ইওরোপ আমেরিকার দেশে মেয়েদের কি চারটে করে হাত পা আছে নাকি? ওদের সঙ্গে তুলনা দেবার তো দরকার নেই। আমি বলছি, যেটা খুব সহজ এবং স্বাভাবিক ব্যাপার।
মেয়েদের সব ব্যাপার তোমরা এখনো বুঝতে পারো না।
ও, এদিকে অন্য সময় ছেলেদের সঙ্গে সমান সমান হবার ইচ্ছে আর অসুবিধাতে পড়লেই মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যাপার।
অসুবিধের কিছু নেই এর মধ্যে? আমি ভাবছিলাম, ভবিষ্যতে তো রণজয়কে আমি বিয়ে করবই—তাহলে রেজিস্ট্রেশনটা সেরে রাখলেই বা দোষ কি?
ব্যাপারটা আইনসঙ্গত করে রাখা?
হ্যাঁ।
আইনসঙ্গত করলে স্বাদটা কমে যায়। গোপন ব্যাপার থাকলেই সেক্সটা ভাল জমে। আইন-টাইনের ব্যাপারটা যতদিন দূরে সরিয়ে রাখা যায়।
তুমি বড্ড বাজে কথা বল। তুমি কি সবজান্তা নাকি?
তুমিই তো আমার কাছে পরামর্শ চাইলে।
আমি তোমার কাছ থেকে জানতে চাইছি, এখন বিয়েটা করে রাখলে কি রণজয়ের পড়াশুনোর ক্ষতি হবে?
রণজয় ফার্স্ট ক্লাস পাবেই।
তুমি জানো না, আজকাল ওর পড়াশুনোয় মন নেই।
তার মানে তুমি ওকে অতৃপ্ত করে রেখেছ। ছটফটানি থাকলে পড়াশুনোয় মন বসবে কি করে? বিয়েটাই করে ফেল তাহলে। নিশ্চিন্ত হয়ে পড়াশুনোয় মন দেবে।
তাহলে তুমি বলছ?
হ্যাঁ, বলছিই তো। রণজয় পাত্র হিসেবেও ভাল। ভারতবর্ষে যতই চাকরির সমস্যা থাকুক, ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ইঞ্জিনিয়ারদের এখনো চাকুরির অভাব হবার কথা নয়। তাছাড়া,

ওদের ফ্যামিলির অনেক রকম কানেকশান আছে।

এই কথার পর সুবর্ণা কেন যে হঠাৎ রেগে উঠল তার কোন যুক্তি নেই। সে শরবতের গেলাসটা ঠক করে নামিয়ে রেখে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল, এসব কথা বলছ কেন? আমি রণজয়কে বিয়ে করছি, তার কারণ ও আমাকে ভালবাসে। আমিও ওকে ভালবাসি।

তপন হাসতে হাসতে লঘু গলায় বলল, সে তো আমিও তোমাকে ভালবাসি। তুমিও আমাকে ভালবাস।

থাক, আর বাজে কথা বলতে হবে না। তোমার কত অসংখ্য মেয়ে বন্ধু।

তাদের সবাইকেই আমি ভালবাসি। তোমাকে একটু বেশী ভালবাসি।

এর নাম ভালবাসা?

তাছাড়া কি? যাক, আমার কথা যাক। তুমি আমাকে ভালবাস না?

মোটেই না।

তাহলে আজ আমার কাছে ছুটে এসেছ কেন?

তোমার কাছে এসেছি বন্ধু হিসেবে একটা পরামর্শ নিতে।

বন্ধুকে বুঝি ভালবাসা যায় না? ভাল না বাসলে আবার বন্ধু কি? তুমি যে অন্য কোন বন্ধুর কাছে না গিয়ে আমার কাছেই এসেছ, তাতেই প্রমাণ হয়, তুমি আমাকে একটু বেশী ভালবাস।

এসব বাজে কথা থাক। আমি এবার উঠব। অনেক বেলা হয়েছে।

ক'টা বাজল?

বারোটা কুড়ি।

ওরে বাবা, খেয়ালই করি নি। বস, আর একটু বস, আমি এক্ষুনি আসছি।

তপন উঠে গিয়ে রঘুকে ডাকল। তাকে বলল, তক্ষুনি বেরিয়ে গিয়ে ছোট ভাইকে স্কুল থেকে আনতে।

রঘু চলে যাবার পর তপন দরজা বন্ধ করে দিল। গোটা ফ্ল্যাটটাতে এখন সে আর সুবর্ণা ছাড়া আর কেউ নেই। এ রকম সময় আবহাওয়াটা হঠাৎ কি রকম বদলে যায়।

তপন ঘরে ফিরে এসে এবার বসল সুবর্ণার পাশে। তার কাঁধে হাত রেখে বলল, তুমি কি এখান থেকে ইউনিভার্সিটিতে যাবে?

সুবর্ণা বলল, না। আজ আর যাব না।

তাহলে কোথায় যাবে? রণজয়ের ফ্ল্যাটে?

ও নেই এখন। বাড়িতেই যাব।

আমার দিকে একটু তাকাও তো—

সুবর্ণা ওর দিকে মুখ ফেরাতেই তপন আলতোভাবে তার ঠোঁটে একটা চুমু খেল। তারপর বলল, তোমাকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।

সুবর্ণা বলল, আমাদের একলা রেখে তোমার মা বেরিয়ে গেলেন।

তাতে কি হয়েছে?

উনি কিছু ভাবলেন না?

কি আবার ভাববেন? ছেলের চরিত্র খারাপ হয়ে যাবে? এতে মেয়ের মায়েরা ভয় পেতে পারেন, কিন্তু একটি ছেলের মা ভয় পাবেন কেন?

ছেলে হলেই বুঝি তাদের সব রকম স্বাধীনতা দেওয়া যায়?

আমি পাই। এমন কি, ছেলেবেলা থেকেই আমি একটু মেয়ে-টেয়েদের সঙ্গে মিশতে ভালবাসি। আমার মা কখনো বাধা দেবার চেষ্টা করেন নি।

তুমি ভাগ্যবান, এ রকম মা পেয়েছ।

আমার মা-ও ভাগ্যবান, আমার মতন ছেলে পেয়েছেন। এত মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করেও তো আমি বয়ে যাই নি। হায়ার সেকেন্ডারিতে সেভেন্থ স্ট্যান্ড করেছিলাম। এবারেও ফাইনাল পরীক্ষাতে ফার্স্ট ক্লাস তো পাবই, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্টও হতে পারি।

তোমার বড্ড অহংকার!

সত্যি কথাই বলছি। লোকজনের মাঝখানে তো আর চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছি না যে অহংকার হবে।

আচ্ছা, এবার সত্যি বল তো, এই চারদিন কেন ইউনিভার্সিটিতে যাও নি?

বলছি। তার আগে আমাকে একটা চুমু খাও।

সুবর্ণা ঠোঁটটা এগিয়ে আনল। তপন বলল, উঁহু, ঐ রকমভাবে নয়। এক হাতে আমার চুল মুঠো করে ধর, এক হাত রাখ আমার কাঁধে—

সুবর্ণা সরে গেল। একটু রাগের ভাব দেখিয়ে বলল, ইস, আবদার, না? দু'দিন বাদে আমি পরের বউ হয়ে যাচ্ছি না?

বাঃ, তাতে কি হয়েছে?

কি হয়েছে মানে? আর একজনকে বিয়ে করেও বুঝি আমি তোমার সঙ্গে এই সব করব?

রণজয় তোমাকে বিয়ে করছে বলে কি পুরোপুরি কিনে নিচ্ছে নাকি? তোমার আর কোন স্বাধীনতা থাকবে না?

স্বাধীনতা মানে বুঝি এই সব? সব কিছুরই একটা যুক্তি থাকা চাই।

চমৎকার যুক্তি রয়েছে তো। এই ঘরে শুধু তুমি আর আমি আছি; ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই। এই সময়টা একটু ভালভাবে কাটানো উচিত নয়? আর চুমু খাওয়ার মতন এমন ভাল জিনিস আর কি আছে বল? রণজয়ের ফ্ল্যাটে গিয়েও কি তুমি এই সব কর না।

সেইজন্যই তো তাকে আমি বিয়ে করছি।

আঃ, মেয়েরা বড্ড বিয়ে-পাগলা হয়। বিয়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? মানুষের শরীর কখনো ক্ষয়ে যায় না, শরীর কখনো অপবিত্র হয় না। এস, এস, দেরি করে লাভ কি।

আমি যদি রাজি না হই, তুমি কি জোর করবে?

মোটেই না। এই সব ব্যাপারে আমি জোর-জার একেবারেই পছন্দ করি না।

আমি রাজি নই।

তপন সঙ্গে সঙ্গে সোফা থেকে উঠে পড়ল। বলল, ঠিক আছে।

সুবর্ণা মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইল। তপন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

সুবর্ণা একটু পরে মুখ তুলে বলল, তুমি রাগ করলে?

না. এতে রাগের কি আছে? আমি তোমাকে ভালবাসি সুবর্ণা, তোমার সব রকম ব্যবহারই আমার ভাল লাগে!

তুমি ভালবাসার কথা মুখে উচ্চারণ কর না। তুমি জানোই না কাকে ভালবাসা বলে।

কোন্ বইয়ে ভালবাসার ডেফিনেশান লেখা আছে? নামটা বলে দাও। পড়ে মুখস্থ করে নেব। তারপর সেই অনুযায়ী ভালবাসার চেষ্টা করব।

এই ঘরে এখন অন্য কোন মেয়ে থাকলে, তাকেও তুমি চুমু খেতে চাইতে?

যদি তাকে আমার পছন্দ হত. তাহলে চাইতাম।

যে-কোন মেয়ে?

বললাম তো. যদি পছন্দ হত, যদি সেও রাজি হত।

বুঝলাম। আচ্ছা, আমি এবার চলি—

ঠিক আছে। বিয়ের নেমন্তন্ন খাওয়াচ্ছ তো?

সুবর্ণা উঠে দাঁড়াল। গাঢ় চোখে তাকাল তপনের দিকে। তপন মিটিমিটি হাসছে। সুবর্ণা তপনের দিকে একটু এগিয়ে এসে বলল, একবার কিন্তু!

তপন মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে বলল, চুলের মুঠি ধর।

সুবর্ণা মুঠো করে ধরল তপনের চুল, আর একটা হাত রাখল ওর কাঁধে, তারপর ঠোঁটে ঠোঁট রাখল।

তপন সুবর্ণাকে কাছে টেনে নিয়ে প্রচণ্ডভাবে আলিঙ্গন করল। সুবর্ণার শরীরটাকে তার শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইল যেন।...

প্রায় দম বন্ধ হবার শেষ মুহূর্তে ওরা ছাড়াছাড়ি করল। সুবর্ণা একটু একটু হাঁপাচ্ছে। তার গালে লেগেছে লালচে রং।

নিজেকে একটু সামলে নেবার পর সুবর্ণা লজ্জিতভাবে বলল, অচ্ছা, সত্যি করে বল তো এটা কি পাপ নয়?

পাপ পুণ্যের কথা পরে হবে। আগে বল, তোমার ভাল লাগে নি?

যাঃ!

চিরকালই মেয়েরা এই সময় লজ্জা পাবে। কিছুতেই সত্যি কথা বলবে না। যাই হোক, লজ্জাটাও এই সময় সুন্দর দেখায়।

সুবর্ণা তপনের বুকে দুটো কিল মেরে বলল, তুমি কি কিছুতেই একটু সীরিয়াস হতে পারো না?

তপন আবার জড়িয়ে ধরল সুবর্ণাকে। আবার একটি দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন।

সুবর্ণার দিক থেকে বাধা দেবার কোন চিহ্ন নেই।

তপন বলল, এবার তোমার পাপ-পুণ্যের প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছি। দুজন মানুষ যদি কোন একটা কাজ করে আনন্দ পায় এবং তাতে অন্য কারুর কোন ক্ষতি না হয় তাহলে সেটা পাপ হতেই পারে না।

রণজয় যদি জানতে পারে, তাহলে ক্ষতি হবে না?

তুমি অত্যন্ত নির্বোধ না হলে নিশ্চয়ই রণজয়কে এই সব কথা বলতে যাবে না। আর তাছাড়া আমার মনে হয়, রণজয় জানতে পারলেও এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। তোমার কি ধারণা, রণজয় তোমাকে ছাড়া আর কোন মেয়েকে জীবনে ছুঁয়ে দেখে নি?

না, তা মোটেই ভাবি না।

তাহলে? এই সব সামান্য ব্যাপার নিয়ে বেশী মাথা ঘামানোর দরকার কি!

আচ্ছা, তুমি যদি জানতে পারো একটি মেয়ে অন্য একজনের সঙ্গে শুয়েছে, তারপরেও তুমি সেই মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারবে?

বাঃ, তাহলে একবার ডিভোর্স করার পরেও মেয়েদের আবার বিয়ে হয় কি করে? তুমি আমাকে শুচিবায়ুগ্রস্ত ভেবেছ নাকি? তোমাকে তো বলেইছি, মানুষের শরীর কখনও অপবিত্র হয় না। যত কিছু ঝঞ্ঝাট মানুষের মন নিয়ে। বলে তপন একটা সিগারেট ধরাতে গেল।

সুবর্ণা হাত বাড়িয়ে বলল, দাও, আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।

সুবর্ণার মুখে সিগারেট, তপন দেশলাই জ্বালিয়ে দিল। সুবর্ণা দুবার জোরে টান দিয়ে সিগারেটটা এগিয়ে দিল তপনের দিকে।

সুবর্ণা বলল, এবার বল, কেন তুমি চার দিন ইউনিভার্সিটিতে যাও নি?

পরীক্ষা এসে গেছে, এখন আর ক্লাসে না গেলেও হয়। তাছাড়া—

তাছাড়া?

আমার মনে হচ্ছিল, রণজয় যেন আমাকে একটু হিংসে করছে। আমি শুনেছিলাম, তোমাদের শিগগিরই বিয়ে হবে। কিন্তু ক্যামপাসের মধ্যে তুমি আমার সঙ্গে বারবার দেখা কর, বেশী কথা বল আমার সঙ্গে, এটা যেন রণজয়ের ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। ও আগে এ রকম ছিল না, এখন যেন ওর ভেতর একটা হিংসে এসে ঢুকেছে। তাই আমি ভাবলাম আমার কিছুদিন দূরে থাকাই ভাল। বিয়ের আগে অশান্তি করার কোন মানে হয় না। অর্থাৎ তোমার কথা ভেবেই।

আমার কথা ভেবে?

হ্যাঁ, তোমার ভালর জনাই—

সুবর্ণা ঠাস করে এক চড় মারল তপনের গালে। বেশ জোরে।

তপন গালে হাত বুলিয়ে নিল একবার। তারপর হেসে জিজ্ঞেস করল, এটা কিসের জন্য?

তুমি আজ সারাক্ষণ শুধু আমাকে অপমান করছ।

অপমান? তার মানে?

নিশ্চয়ই অপমান করেছ। রণজয়ের হিংসে হয়, আর তোমার বুঝি হিংসে হতে পারে না?

আমার হিংসে হবে কেন?

তুমি একবারও আমাকে বলতে পারতে না, তুমি রণজয়কে বিয়ে কর না!

তোমাদের বিয়ে তো আগেই ঠিক হয়ে গেছে।

ঠিক হয়ে গেলেই বা, তুমি যদি একবার বলতে—

বলব কেন সে কথা, রণজয়ের সঙ্গে অনেকদিন ধরেই তোমার চেনা—ও তোমাকে পাগলের মতন চায়—তুমিও ওকে ভালবাস, তোমাদের দুজনের বিয়ে হবে, এইটাই তো সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার।

তাহলে তুমি কেন বলেছিলে, তুমি আমাকে ভালবাস?

সে কথাও বলতে পারব না? তাতে দোষটা কি হয়েছে?

এরকম মিথ্যে কথা আর ক'জনকে বলেছ?

না, মিথ্যে নয়! আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি। কিন্তু ভালবাসলেই কি একেবারে নিজের দখলে রাখতে হবে? তুমি অন্য কারুর স্ত্রী হয়ে গেলেও কি তোমাকে আমি ভালবাসতে পারি না? কারুর বাড়ির সুন্দর বাগান দেখে যদি আমার খুব ভাল লাগে তাহলেই কি আমি বাগানটা দখল করে নেবার চেষ্টা করব?...কথা বলতে বলতে থেমে গেল তপন। সুবর্ণার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে।

তপন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এ কি?

সুবর্ণা কোন উত্তর দিল না।

তপন সুবর্ণার কোমর ধরে তাকে আবার সোফায় বসিয়ে দিল জোর করে। একটা আঙুল দিয়ে আলতোভাবে সুবর্ণার চোখের জল মুছে দিয়ে বলল, বিয়ের আগে সব মেয়েরাই কাঁদে, তাই না? ভয় হচ্ছে বুঝি?

তুমি আমার এ রকম ক্ষতি করলে কেন?

কি ক্ষতি করলাম?

আমার মনের মধ্যে কি হচ্ছে, তুমি একবার ভেবেও দেখ না। আমি রণজয়কে বিয়ে করতাম, ওকে বিয়ে করে সুখী হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি মাঝখান থেকে এসে সব গন্ডগোল বাধিয়ে দিলে। তুমি কেন আজ আমায় নিয়ে এ রকম করলে!

কি করেছি?

সবটাই তোমার ছেলেখেলা?

তপন হঠাৎ রেগে উঠল। ঘড়ির দিকে আঙুলে দেখিয়ে কড়া গলায় বলল, আর মাত্র পনেরো মিনিট সময় আছে, তারপরই রঘু আমার ছোট ভাইকে নিয়ে এসে পড়বে, এই পনেরো মিনিট আমরা আনন্দ করতে পারি। তুমি আমার সঙ্গে যদি বিছানায়—

ছি ছি, তুমি আমাকে এই ভাব!

আমি ঠিকই ভাবি, মেয়ে মানেই কি এক একটা সংস্কারের ডিপো? তুমি আজ বড্ড ন্যাকামি করছ।

তপন, তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি।

সুবর্ণা তুমি নিজে থেকেই আমার এখানে এসেছ, আমি তোমাকে ডাকি নি।

আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।

গেট আউট!

সুবর্ণা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে এদিক ওদিক তাকাল। তপনকে আঘাত করার জন্য সে একটা কিছু খুঁজছে। সে রকম কিছুই নেই, নীচু টেবল থেকে বুদ্ধ মূর্তিটাই তুলে নিল। অহিংসার প্রতিমূর্তিটি দিয়ে সে ঠকাস করে মারল তপনের মাথায়।

তপন সুবর্ণার দুটো হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলল, একদম খুন করে ফেলব কিন্তু। তুমি আমার রাগ চেনো না!

আমাকে ছেড়ে দাও, অসভ্য কোথাকার!

না ছাড়ব না। আমি জানি তোমার ব্যাপার, তুমি রণজয়কে বিয়ে করতে চাও, আবার আমাকেও ছাড়তে চাও না, দুজনকেই একসঙ্গে বিয়ে করে দ্রৌপদী হতে চাও?

আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আর কোনোদিন তোমায় মুখ দেখাব না।

না, কিছুতেই ছাড়ব না, তুমি আমাকে মেরেছ।

তপন তুমি বলেছিলে তুমি আমার ওপরে জোর করবে না।

তুমিই চাইছ, আমি জোর করি।

না, প্লিজ না।

তপন ছেড়ে দিল সুবর্ণার হাত। তার ফর্সা হাত দুটি তপনের দৃঢ় মুষ্টিতে লাল হয়ে গেছে। ধরা গলায় সুবর্ণা বলল, আমি চলে যাচ্ছি, আর কোনদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

তপন বলল, নিশ্চয়ই দেখা হবে। তোমার বিয়ের দিনে।

না।

হ্যাঁ হবেই। তুমি নেমন্তন্ন না করলেও রণজয় করবে।

আমি ওকে বারণ করে দেব।

ও শুনবে না। ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে কি চমৎকার ব্যবহার!

স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে তোমারই বা কি চমৎকার ব্যবহার। আমার বুদ্ধ মূর্তিটা তুমি ভেঙে ফেলেছ।

আর একটা কিনে পাঠিয়ে দেব।

তাই দিও।

আমি যাচ্ছি এখন।

যাও।

সারা জীবন মনে থাকবে, তুমি আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ।

আর একটা কথাও মনে রেখো। আমি তোমাকে ভালবাসি। এখনও ভালবাসি। পরেও ভালবাসব।

আবার ঐ কথা! খবরদার বলবে না।

বেশ করব বলব। একশোবার বলব। কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।

সুবর্ণা দু'হাতে মুখ ঢেকে করুণ গলায় বললে, কেন বারবার ঐ মিথ্যে কথাটা বলে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? আমাকে কষ্ট দিয়ে তোমার কি লাভ?

তপন ওকে নিজের বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলল, একটুও মিথ্যে নয়। মুখটা তোল। সুবর্ণা মুখটা তুলতেই তপন তাকে খুব নরমভাবে চুম্বন করল। আদর করে বলল, তুই একটা পাগলি।

সুবর্ণা বলল, আর তুই কি? একটা ডাকাত!

চোখের জলের দাগটাগ লেগে রয়েছে। এই অবস্থায় রাস্তা দিয়ে যেতিস কি করে? মুখটা ধুয়ে ফেল ভাল করে।

সুবর্ণা তপনের বুকে মাথা রেখে বলল, আমি কিন্তু রণজয়কে খুবই ভালবাসি।

কে বারণ করছে ভালবাসতে? আয় না, আমরা সবাই সবাইকে ভালবাসি।

না আমি তোকে ভালবাসতে পারব না, তাহলে যদি বারবার তোর কাছে চলে আসতে ইচ্ছে হয়।

ইচ্ছে হলে আসবি।

তা হয় না। এ রকমভাবে বিবাহিত জীবন কাটানো যায় না।

পরীক্ষা করে দেখ না কিছুদিন। যদি খুব অসুবিধে হয় আমি নিজেই তোকে বারণ করব।

সুবর্ণা আর দেরি করল না। বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তপন তাকে সিঁড়ির তলা

পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় তপন সুবর্ণার কাঁধে হাত রেখেছিল। ঠিক দুই বন্ধুর মতন।

সুবর্ণা আজ আর ইউনিভার্সিটিতে যাবে না। বাড়ি ফিরবে ভেবেছিল। কিন্তু মনটা খুব চঞ্চল হয়ে আছে। মনের মধ্যে একটু একটু অপরাধবোধ। তপন তাকে দু-একবার চুমু খেয়েছে কিংবা জড়িয়ে ধরেছে, সে জন্য নয়। তার নিজেরই তো খুব ইচ্ছে করছিল তপনের আদর পেতে—এই জন্য।

বাড়ির দিকে না গিয়ে সুবর্ণা চলে এল রণজয়ের ফ্ল্যাটের দিকে।

এই পাড়াটা পাঁচমিশেলি। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, চীনে, গরীব মুসলমান এবং সাহেবী ঢং-এর হিন্দুরা বেশ সহাবস্থান করে আছে। কোন্ বাড়িতে কে এল, কিংবা কোন্ মেয়ে গেল কোন্ পুরুষের ঘরে, এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সুবর্ণার একবার মনে হল, তার মুখটা কলঙ্কিনীর মতন দেখাচ্ছে না তো? আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিল ভাল করে।

ওপর থেকে একটি মেয়ে নেমে আসছে তরতর করে। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ। মেয়েটি সুবর্ণার পাশ দিয়ে যাবার সময় একবার সোজাসুজি তাকাল ওর দিকে। একটু যেন রাগ আর অভিমান মেশানো দৃষ্টি। সুবর্ণার একটু চেনাচেনা মনে হল মেয়েটিকে, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারল না। তবে মেয়েটি যে রণজয়ের কাছেই এসেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ বাড়িতে আর একটিও বাঙালী পরিবার থাকে না।

দরজায় ধাক্কা দিতেই ভেতর থেকে রণজয়ের গলা শোনা গেল, কে? দরজা খোলাই আছে।

একটাই লম্বা টানা ঘর রণজয়ের। এত লম্বা ঘর সচরাচর হয় না। হয়তো এককালে বারান্দা ছিল, এখন ঢাকাঢুকি দিয়ে ঘর বানানো হয়েছে।

দরজার কাছেই রণজয়ের খাট ও কয়েকটি চেয়ার পাতা। তার একটু দূরে তার পড়ার টেবিল ও বইয়ের আলমারি। তার ওপাশে রান্নার জায়গা। রণজয় অবশ্য বাইরেই খায়, তবু রান্নার ব্যবস্থা আছে।

অত্যন্ত অগোছালো রণজয়ের ঘর। সব জায়গায়, এমন কি, রান্নার জায়গাতেও বই ও পত্র-পত্রিকা ছড়ানো। নিজের বিষয় ছাড়াও রণজয় বহু রকমের জিনিস পড়ে। তার জামা, কাপড়, রুমাল তোয়ালেও এদিক ওদিক পড়ে থাকে।

সুবর্ণার প্রথম কাজই হচ্ছে, এখানে এসে সব কিছু গোছগাছ করে দেওয়া।

রণজয় সুবর্ণাকে দেখে একটুও অবাক হল না। খাটে হেলান দিয়ে শুয়ে বই পড়ছিল, তাড়াতাড়ি উঠে বলল, তুমি এসেছ? বাঃ! খুব খিদে পেয়েছে। একটা কিছু রান্না করে দাও না আমার জন্য।

সুবর্ণা হাতের ব্যাগটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে বলল, তোমার কাছে একটা মেয়ে এসেছিল?

হ্যাঁ।

কে বল তো মেয়েটি? চেনা চেনা লাগছিল!

ওর নাম তো ভাস্বতী বসু। পার্টির কাজ করে। খুব ভাল ওয়ার্কার।

তোমার কাছে এসেছিল কেন?

পার্টির চাঁদা চাইতে। আমিও একসময় কাজ করতাম।

ইউনিভার্সিটিতে ওকে দেখেছি মনে হচ্ছে। তোমার সঙ্গে অনেকদিনের চেনা?

অনেক দিনের। ওকে আমি খুব ছেলেবেলা থেকে চিনি। তুমি কি অমলেশকে দেখেছ? আমাদের থেকে সিনিয়ার। সেই অমলেশ হচ্ছে ওর পুরুষ। একসঙ্গেই থাকে বিয়ে-টিয়ে এখনো করে নি. করে নেবে এক সময়।

সুবর্ণা হঠাৎ রেগে গেল। বলল, চাঁদা চাইতে তোমার বাড়িতে আসবার দরকার কি? ক্যাম্পাসেই তো চাইতে পারে।

রণজয় একটু অবাক হয়ে বলল, বাড়িতে আসবে না কেন? আমিই তো ওকে একদিন আসতে বলেছিলাম।

কেন?

আরে তুমি রেগে যাচ্ছ নাকি ; এসেছে তো কি হয়েছে!

আমার হিংসে হচ্ছে।

রণজয় উঠে বসে সুবর্ণাকে আলিঙ্গন করে বলল, ধ্যাৎ পাগলি! এ আবার কি ছেলেমানুষী। জাম্ববতী খুব ভাল মেয়ে। দারুণ সীরিয়াস। ওদের পার্টির কাছে ও একটা জুয়েল। পলিটিক্যাল সায়েন্সটাও অনেকের থেকে ভাল বোঝে। ছেলেবেলায় কানপুরে আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম।

তখন তুমি বুঝি ওকে ভালবাসতে?

শুধু তখন কেন এখনো তো ভালবাসি।

সুবর্ণা নিজেকে রণজয়ের থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। আরক্ত মুখে জিজ্ঞেস করল, তুমি এ রকম আর কজনকে ভালবাস?

গুণে দেখি নি। অনেককে।

ছাড়ঃ আমাকে ছাড়! আমি ভালবাসার ভাগাভাগিতে বিশ্বাস করি না। তুমি যদি অনেককেই ভালবাসতে চাও—

মানুষ কি শুধু একজনকে ভালবেসে বেঁচে থাকতে পারে নাকি? মাকে-বাবাকে কিংবা ছেলে-মেয়েকে ভাইবোনকে ভালবাসবে না?

সেটা অন্য ব্যাপার।

এটাও অন্য ব্যাপার। আমি আরো অনেক মেয়েকে ভালবাসি, কিন্তু তোমাকে বিশেষ রকম ভালবাসি বলেই তোমাকে নিজের করে চাই। অন্য কোন মেয়েকে তো এইরকমভাবে চাই নি!

ঠিক আছে বুঝেছি। ছাড়ো রান্না করে দিচ্ছি, কি খাবে বল—

তুমি খিচুড়ি রাঁধতে পারো?

কে না পারে? সবাই পারে।

তাহলে খিচুড়ি আর ডিম ভাজা—

সসপ্যানে চাল ধুতে ধুতে সুবর্ণা জিজ্ঞেস করল, ঐ মেয়েটি কতক্ষণ ছিল?

রণজয় ওর ঘাড়ে একটা চুমু খেয়ে বলল, অনেকক্ষণ। আধঘণ্টা তো হবেই।

চাদার কথা বলতে কি এতক্ষণ সময় লাগে?

আমি কি সহজে চাঁদা দিই নাকি? ওকে আটকে রাখার জন্যই তো নানা কথা বলছিলাম।

সেই সময় যদি আমি এসে পড়তাম?

তাহলে আরও জমত। আফ্রিকার দেশগুলোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথা উঠেছিল। জাম্ববতীর বেশ পরিষ্কার চিন্তা আছে এ বিষয়ে।

শুধু এই সব কথাই হল!

মাথা খারাপ? তুমি কি জাম্ববতীকে নীরস মেয়ে ভেবেছ নাকি! যারা দিনরাত রাজনীতি ছাড়া অন্য কোন কথা চিন্তা করে না, তাদের গাল-টাল তুবড়ে কি রকম বিচ্ছিরি চেহারা হয়ে যায়। জাম্ববতী মোটেই সে রকম মেয়ে নয়। আমরা কিছুক্ষণ ছেলেবেলার গল্প করলাম। জাম্ববতী এক সময় আমাকে একটা প্রেমপত্র লিখেছিল, তখন ওর বয়স এগারো বারো হবে। সেই কথা বলে হাসলাম খুব।

এখনো তোমার সম্পর্কে ওর কোন দুর্বলতা নেই!

দুর্বলতা! না, ঐ জিনিসটা নেই জাম্ববতীর চরিত্রে। ও যা করে, সোজাসুজি জোর দিয়ে করে। অন্য কিছু গ্রাহ্য করে না। যেমন ধর অমলেশের সঙ্গে যে ও একসঙ্গেই প্রায় থাকে —সে ব্যাপারে ও ওর বাবা মা কিংবা অন্য কারো আপত্তি গ্রাহ্যই করে না।

একসঙ্গে থাকে যখন বিয়ে করে না কেন?

এখনো বিয়ের জন্য তৈরি হয় নি। কিংবা ওদের নিজস্ব কোন প্ল্যান থাকতে পারে। এ ব্যাপারেও ওর সঙ্গে কথা উঠেছিল। ওর ভাবনা-চিন্তা বেশ পরিষ্কার। ওর একটা শরীরের দাবি আছে, অমলেশেরও আছে। সেই দাবিটা অগ্রাহ্য করলে অন্য কাজ মন দিয়ে করা যায় না। খাওয়া দাওয়ার মতনই তো সেক্সটা একটা শারীরিক প্রয়োজন। সেটাকে বাদ দিয়ে যারা কাজ করতে চায়, তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কি রকম অস্বাভাবিক মানুষ হয়ে ওঠে। ওরা পরস্পরকে ভালবাসে, তাই একসঙ্গে থাকে। খোলাখুলি ব্যাপার।

যদি বাচ্চা-টাচ্চা হয়ে যায়!

সে কথাও আমি ভাস্বতীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওর সে জন্য চিন্তা নেই।

সুবর্ণা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, সত্যি কথা বল তো, তুমি ঐ মেয়েটির সঙ্গে এতক্ষণ শুধু গল্পই করেছ? আর কিছু—

দুষ্টু দুষ্টু হেসে রণজয় বলল, সত্যি কথা বলব, রাগ করবে না?

আগে বল।

আমার হাতে হাত রেখে বল রাগ করবে না।

এই তো হাত রেখেছি।

আমি ওকে একটা চুমু খেয়েছি।

সুবর্ণা হাতটা সরিয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। রণজয় তার থুতনিটা ধরে উঁচু করে বলল, রাগ করবে না প্রতিজ্ঞা করলে যে?

সুবর্ণা সত্যিই রাগ করে নি, মনটা শুধু উতলা লাগছে। মনটাকে সামলাবার চেষ্টা করছে সে। তারপর মুখ তুলে হাসিমুখে বলল, শুধু একটা?

তাহলে আরও সত্যি কথা বলি? একটা নয় তিনটে। ওকে একটাই বলেছিলাম। তারপর একটু বেশী লোভ হল। কিন্তু এর চেয়ে আর বেশী কিছু না, এটা কিন্তু ঠিক।

হঠাৎ উঠে গিয়ে?

না, না না। আমি নানারকম কথা বলছিলাম! এক সময় কি যেন মনে হল ডান পাশ থেকে ওর মুখখানা বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল, তাই আমি বললাম, ভাস্বতী অনেক তো কথা হল, এবার একটা চুমু খেলে কি হয়!

ও বললে, কেন? আমি বললাম, এমনিই।

তারপর ভাস্বতী বলল, ছেলেবেলার কথা ভেবে আমি একবারের জন্য রাজি হতে পারি, কিন্তু তুমি খুব দুরন্ত ছেলে! তুমি আরও বাড়াবাড়ি করবে।

আমি বললাম, না, না, মোটেই না।

রণজয় সুবর্ণার কাঁধে হাত রেখে ঠোঁটের কাছে ঠোঁটটা এনে বলল, আমি তখন এই রকমভাবে আলতো করে একটু চুমু খেলাম। কিন্তু তাতে আশা মিটল না বলেই, আর একটু জোরে পরপর আর দু'বার—তারপর ভস্বতী আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

দরজা বন্ধ করেছিলে?

এইরকম ভেজানোই ছিল।

তখন যদি আমি, ধর ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজা ঠেলে ঢুকে পড়তাম।

এ রকম তো গল্পে হয়। কিন্তু ধর তুমি সত্যিই সেই সময় এসে পড়লে, তারপর কি হত? তুমিই বল না। তুমি কি রণরঙ্গিনী মূর্তিতে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে? না আমাকে খুন করতে চাইতে?

তুমি বল আমার কি করা উচিত সেই সময়?

তুমি একটু লজ্জা পেতে হয়তো। আমরাও লজ্জা পেতাম। কিংবা তিনজনেই হেসে ফেলতাম। এর থেকে আর বেশী কি হবে? এমন তো কিছু নয়।

সুবর্ণা রণজয়ের চোখে একেবারে স্থির দৃষ্টি রেখে বলল, এবার আমার আর একটা উত্তর দাও। মনে কর, তুমি একদিন হঠাৎ এই ঘরে ঢুকলে—আমাকে অন্য কেউ হয়তো তোমার কোন বন্ধু চুমু খাচ্ছে। তখন তুমি কি করতে?

একটু চিন্তা না করে রণজয় বলল, আমি একটু রেগে যেতুম।

রেগে যেতে? বাঃ! তুমি যা খুশি করতে পারো। আর আমি কিছু করলেই তুমি রেগে যাবে কেন?

একটু তো বলেছি। বেশী তো না। ছেলেদের একটু অহংকার বেশী কিনা।

আমি মোটেই তা বিশ্বাস করি না। তোমার অহংকার থাকতে পারে, আর আমার পারে না?

পারেই তো। কিন্তু তোমাকে যদি কেউ চুমু-টুমু খায় আমি দেখে ফেললে, হেসেই ফেলব। একটু রাগের ভাব ভেতরে থাকবে অহংকারটাকে সুড়সুড়ি দেবার জন্য।

কিসের অহংকার?

এই যে আমি পুরুষ, আমি বহু নারীকে জয় করতে পারি, কিন্তু কোন নারীই আমাকে ছাড়া অন্য কারুকে চাইবে না। এইটাই তো বহুকালের ট্র্যাডিশন—সেটা কাটাতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে।

ওসব চলবে না। একজন ছেলে যদি অনেক মেয়েকে চায়, তাহলে একটি মেয়েও অনেককে চাইতে পারে।

পারেই তো! না হলে ভাস্বতী রাজি হল কেন? ও যদি প্রথমেই না বলত, আমি কি জোর করতুম?

সুবর্ণা রণজয়ের দু'হাত ধরল নিজের দু'হাতে। তারপর বলল, তুমি জানো, তোমার হাত ছুঁয়ে আমি কক্ষনো মিথ্যে কথা বলি না। আমি তোমাকে একটা কথা বলছি। তোমার এখানে আসবার আগে আমি তপনের বাড়ি গিয়েছিলাম একটা কথা জিজ্ঞেস করবার জন্য।

রণজয় সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বললে, নিশ্চয়ই ঐ রাস্কেলটা তোমাকে চুমু খেয়েছে?

সুবর্ণা চুপ করে রইল।

রণজয় আবার জিজ্ঞেস করল, ক'টা।

তিন চারটে!

আমি জানতাম।, ও কিছুতেই ছাড়বে না। তপনটা ভাবে কি জানো, আমি ওকে হিংসে করি! ইডিয়েট একটা! ওকে আমি হিংসে করব কেন? আমি তো জানিই তুমি ওকে ভালবাস!

তুমি জানো? তুমি কিছু জানো না। আমি তোমার মতন আর কারুকেই ভালবাসি না।

তাও জানি। কিন্তু তার জন্য তপন বা আর কারুকে একটু ভালবাসতে দোষ কি? এস আমরা সবাই মিলে সবাইকে ভালবাসি।

তপনও ঠিক এইরকম একটা কথা বলছিল।

বলবেই। আমরা অনেক কালের বন্ধু।

তপন যে আমাকে...তাই শুনে তোমার একটুও রাগ হয় নি?

ভাস্বতীর কথা শুনে তোমার যতখানি রাগ হয়েছিল, ঠিক ততখানিই।

তারপরই রণজয় সুবর্ণাকে টানতে টানতে বিছানার কাছে নিয়ে এসে বলল, কিন্তু তপন যদি তোমাকে তিনটে চুমু খেয়ে থাকে, তাহলে তুমি আমাকে এক্ষুনি তিনশোটা চুমু খেতে দেবে। না হলে কিন্তু আমি ভীষণ রেগে যাব! হঠাৎ কথা থামিয়ে পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। সেই দৃষ্টি চিরকালের।

দূর থেকে দেখা

বৃষ্টির পর ঘাসগুলো চকচকে সবুজ হয়ে আছে। পুরোনো উপমা হলেও কার্পেটের কথাই মনে আসে। সেই মাঠভরা কার্পেটের ওপর দৌড়চ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে, এই সাত আট বছর বয়েস। ছেলেটার পরনে একটা টকটকে লাল রঙের প্যান্ট, কোমরের অনেক নিচে নেমে গেছে, এক হাতে সেটা ধরা। হাত ছাড়লেই প্যান্ট খুলে যাবে। ছেলেটা অনেকক্ষণ

ধরে ছোটাছুটি করছে একটা ডানা-ভাঙা শালিক পাখি ধরার জন্য।

দৃশ্যটা আকর্ষণীয়। লিখতে লিখতে কলম থামিয়ে আমি সেইদিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকি। ছাদের ওপর একটা ছোট্ট ঘর আমি সম্প্রতি পেয়েছি, সেখানে এখন লিখতে বসি। ঘরটা সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয়—চারদিকে শুধু ছাদ, যেন ছাদের জগৎ, কোনো মানুষজন নেই। সকাল নটা দশটায় কে আর ছাদে উঠবে। কচিৎ দেখা যায় কাপড় মেলতে এসেছে কোনো ঝি, অথবা দূরে কোনো রান্নাঘরের জানলায় কোনো সুন্দরী রমণীর শরীরের একাংশ।

কিছু কিছু গাছপালাও চোখে পড়ে' আমার বাড়ি শহরের ধার ঘেঁষে, সামনেই ওভার ব্রীজ, তলায় রেল লাইন। ছাদের ঘরে আসার পরেই আমি টের পেয়েছি, এদিকে অনেক নারকোল গাছ আছে এখনো। পূব দিকে বেশ খানিকটা দূরে একটা নারকোল গাছের জঙ্গল। এ ছাড়া কৃষ্ণচূড়া, অশ্বত্থ ও আমগাছ বেশ দেখা যায়। এমন কি এক বাড়ির উঠোনে পেঁপে গাছ পর্যন্ত। আমি অবশ্য প্রকৃতি-ট্রকৃতি তেমন একটা পছন্দ করতাম না কখনো, কিন্তু এখন লক্ষ্য করছি, বৃষ্টির সময় গাছগুলির চুপচাপ স্নান করার দৃশ্য দেখতে বেশ ভালোই লাগে। আমার ঘরে পাখা নেই, কখনো কখনো বেশী গরম লাগলে আমি দূরের নারকোল গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি, ওদের পাতা নড়ছে কিনা।

জমির দাম আগুন হলেও এখনো কিছু কিছু জমি খালি পড়ে আছে। হয়তো মালিকানার গণ্ডগোল বা অন্য কিছু কারণ থাকে। সেই রকমই একটা জমি, বেশ বড়, ফুটবলের মাঠ হতে পারতো, চারদিকে পাঁচিল ঘেরা, অনেকদিন থেকেই বিনা রক্ষণাবেক্ষণে আছে দেখছি। পাঁচিলের একদিকে এর মধ্যেই বেশ বড় একটা গোল গর্ত হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে দৈত্যের বাগানে শিশুদের মতন রেললাইনের পাশের বস্তির ছেলেমেয়েরা খেলা করতে আসে। আমার লেখার টেবিলের সামনেই জানলা, সেই জানলার সোজাসুজি ঐ মাঠ। একটু চোখ তুললেই ঐদিকে তাকাতে হয়।

শালিক পাখিটা বাচ্চাই হবে বোধ হয়। একটু-আধটু উড়েই আবার পড়ে যাচ্ছে। ছেলেটা এক একবার ধরেও ফেলছে সেটাকে। কিন্তু এক হাতে রাখতে পারছে না। অন্য হাত ব্যবহার করতে গেলে প্যাণ্ট ছেড়ে দিতে হয়।

দুটো শালিক ব্যাকুলভাবে ছেলেটার মাথার কাছে ওড়াউড়ি করছে। দুটো কেন? শিল্পীরা যে ঘর-সংসার কিংবা সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে মাথা ঘামায় না, তার প্রমাণ কোকিল। গুণহীন বলেই বোধ হয় পাখিদের মধ্যে শালিকের সন্তান স্নেহ অত্যন্ত বেশী। কিন্তু দুটো কেন? জন্তুজানোয়ারের তো পিতৃস্নেহ বলে কিছু থাকে না শুনেছি।

শালিক দুটো ছেলেটার খুব কাছাকাছি উড়ে উড়ে ওর দৃষ্টি ফেরাবার চেষ্টা করছে। ছেলেটা অবশ্য তাতে ভুলবে না। দূরে পাঁচ সাতটা কাক এমন লঘু স্বরে ডাকছে, যেন হাসছে। কাকের বাচ্চা নিয়ে কেউ এরকম খেলা করলে ওরা এতক্ষণ তার জীবন অতিষ্ঠ করে দিত। এখন শালিকের বাচ্চার বিপদে ওরা মজা দেখছে। অবশ্য শালিকরাও চড়ুই পাখির বাসা খুঁচিয়ে বাচ্চাগুলোকে মেরে ফেলে আমি জানি।

ছেলেটা একবার ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে চেপে ধরলো শালিকের বাচ্চাটাকে। সঙ্গে সঙ্গে খুলে পড়ে গেল ওর প্যাণ্টটা। আমি একা ঘরে হোহো করে হেসে উঠলাম।

ছেলেটা জানে না ওকে কেউ দেখছে। তবু পাখিটাকে ছেড়ে প্যাণ্টটাকে টেনে তুললো আবার। একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলো কি যেন। পাখির বাচ্চাটা লাফিয়ে লাফিয়ে অনেকটা দূরে চলে গেছে, দুই অভিভাবক পিড়িং পুড়িং করে কি যেন উপদেশ দিচ্ছে তাকে। লাল প্যাণ্ট পরা ছেলেটা কিন্তু হাল ছাড়লো না। আবার দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দিল সারা মাঠ জুড়ে।

এটা একটা সুন্দর দৃশ্য। কোনো বাচ্চা ছেলে যখন একা একা খেলা করে, তখনই তাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। একা খেলার সময় কি অসম্ভব মনোযোগী হয় ওরা। দৃশ্যটা আমার বেশী ভালো লাগছে এই কারণে যে, ঐ ছেলেটা থকে রেললাইনের পাশের

বস্তিতে, যেটা ঐ পাড়ার ঝি-চাকরের ডিপো। ওখানে আছে নিরানন্দ, মারামারি; ওখানে দু'বেলা খাবার নেই, চিনি কিংবা মাছের স্বাদই জানে না। ঐ জায়গাকার একটি ছেলে, কারুর কাছ থেকে চেয়ে আনা লাল রঙের প্যান্টুল পরা, আপন মনে খেলছে। এখন এই বালকের খেলার যা আনন্দ, পৃথিবীর কোনো বালক এর চেয়ে বেশী কিছু পায় না।

সুন্দর দৃশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না অবশ্য। দৌড়োদৌড়িতে পরিশ্রান্ত ছেলেটি হঠাৎ মত বদলে ফেলে। দু' হাতের ব্যবহার ছাড়া সে পাখিটাকে কিছুতেই ধরতে পারবে না জেনে এবার সে একটা ইঁটের টুকরো কুড়িয়ে নেয়। এবার সে শালিকের বাচ্চাটাকে মারবে!

আমি আঁতকে উঠলাম। একবার ভাবলাম, চেঁচিয়ে বারণ করি। কিন্তু আমার গলার আওয়াজ অতদূর পৌঁছোবে না। তা ছাড়া, ও শুনবেই বা কেন আমার কথা।

শালিকের বাচ্চাটাকে ইঁট ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেই ফেললো ছেলেটা। বড় শালিক দুটো একবার তার মাথার কাছে এসে উড়ছে, আবার সরে যাচ্ছে একটু দূরে। মায়ের সামনেই হত্যা করা হচ্ছে তার সন্তানকে, কিন্তু প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই তার। এটা এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয় পৃথিবীতে, কিন্তু আমার চোখের সামনেই ঘটে বলে আমি একটু মুষড়ে পড়ি।

খেলা শেষ হয়ে গেছে, ছেলেটি এক দৌড়ে দেয়ালের গর্ত পেরিয়ে চলে গেল আমার দৃষ্টির আড়ালে। তখন চোখে পড়লো এক কোণে একটা বেড়াল চুপ করে বসে ছিল, এবার সে গুটিগুটি পায়ে এগোচ্ছে মরা শালিকটার দিকে। তার মা তখনো খুব কাছে বসে। বেড়ালটাকে আমি আগে লক্ষ্যই করি নি। ও ঠিক সময়টার জন্য অপেক্ষা করছিল।

আমি জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। মনটা খুব খারাপ লাগছে। আমার চোখের সামনেই শালিকের বাচ্চাটা মরলো। আমি যখন এ ঘরে থাকি না, সেই সময়ে মরলেই তো পারতো! কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। কিন্তু এরকম করলে তো চলবে না। অনেক জরুরী লেখা বাকি আছে।

মন ভালো করার জন্য আমি উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নিজেকে ভ্যাংচালাম। তাতেও কিছু হলো না বলে নাচতে শুরু করলাম আমি। খানিকক্ষণ মণিপুরী সর্পনৃত্য অভ্যেস করা গেল। একা ঘরে থাকার এই একটা সুবিধে, যাই করি, কেউ পাগল ভাববে না। কিন্তু নাচের পরেও মনটা শান্ত হয় না। ছাদে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে থাকি, যদি কোনো সুন্দরী রমণীর এক ঝিলতেও দেখতে পাওয়া যায়। বেশিক্ষণ খুঁজতে সাহস হয় না অবশ্য, কারণ আমাদের কাছাকাছি একটি বাড়িতে একটি বদ্ধ উন্মাদ স্ত্রীলোক আছে, কচিৎ তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলেই আমার বুক কাঁপে। তখন আমি দূরের দিকে তাকিয়ে যা দেখা যায় না, তাই দেখার চেষ্টা করি।

দিন তিনেক বাদে দুপুরবেলা দেখলাম আমাদের বাড়ির সিঁড়িতে সেই লালপ্যান্ট পরা ছেলেটা বসে আছে। একটু চমকে উঠলাম। এ বাড়ির সদর দরজা এবং সিঁড়ি থেকে নিয়মিত বাল্‌ব চুরি যায়। অনেক চেষ্টা করেও চোর ধরতে পারি না। অনেক সময় দিন দুপুরেও বাল্‌ব অদৃশ্য হয়। বাড়িওয়ালাও এক সময় হার স্বীকার করে জানিয়েছেন, এ পাড়ায় মশাই সিঁড়িতে আলো জ্বালিয়ে রাখার উপায় নেই!

আমি ছেলেটার দিকে কড়া চোখে তাকালাম। সে মুখ নিচু করে বসে রইলো। যে-ভাবে টিকটিকির মতন দেয়াল বেয়ে উঠে বাল্‌ব খুলে নেয়, তাতে এই রকম বাচ্চা ছেলেরই কাজ। কিন্তু চোর আমাকে দেখেও সিঁড়িতে বসে থাকবে না।

—কি চাই?

ছেলেটা মুখ তুলে তাকালো। এখন একে শালিক হত্যাকারী বলে আর চেনা যায় না, নিতান্ত গোবেচারা মুখ, অনেকটা মহাত্মা গান্ধীর বাল্যকালের ছবির মতন।

উত্তর না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম, কি চাই?

—আমার মায়ের সঙ্গে এসেছি!

ভেতরে এসে দেখলাম, একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক আমার মা ও বউদির সামনে মাটিতে বসে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কিছু বলছে। দেখলেই বোঝা যায় ঝি-ক্লাসের মেয়েছেলে।

আমার মা ও বউদি ওকে চেনেন মনে হলো।

বসবার ঘরে খবরের কাগজ খুলে আন্তর্জাতিক অস্ত্র পরীক্ষা বিষয়ে পড়তে পড়তেও আমি ওদের সব কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। স্ত্রীলোকটি তার নিজের জীবনকাহিনী বলে যাচ্ছে। দুঃখের কাহিনী শুনতে আমার ভালো লাগে না, দুঃখের কাহিনী সব সময়েই একঘেয়ে হয়। পঙ্গু স্বামী, অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, দু'সপ্তাহ রেশন তুলতে পারি নি, কি করে বাঁচবো বলুন ইত্যাদি। নতুন কিছু না। মোট কথা, স্ত্রীলোকটি আমাদের বাড়িতে কাজ চায়। এক সময় তার বড় মেয়ে এ বাড়িতে কাজ করতো, দু-একদিন সেও এসে বদলি কাজ করে দিয়ে গেছে। সেই সূত্রে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ।

আমাদের বাড়িতে একজন ইতিমধ্যেই কাজ করছে। একজনকে কাজ দেবার জন্য তো আর একজনকে ছাড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু যে দু'সপ্তাহ রেশন তুলতে পারে নি, সে এই যুক্তি বুঝবে না, তাকে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।

ওই সব ঘ্যানঘেনে কথাবার্তার মধ্যে একটি মাত্র বিষয়ই উল্লেখযোগ্য। ওই স্ত্রীলোকটির যে কিশোরী মেয়েটি এক সময় আমাদের বাড়িতে কাজ করতো, সে এখন যুবতী হয়েছে, এবং সে এখন মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে আলাদা বাসা নিয়েছে। তার রোজগার ভালো, সে গালে স্নো পাউডার মাখে, কিন্তু মা, আমি মরে গেলেও তার অন্ন খাবো না, সে সেধে দিতে এলেও তার কাছ থেকে একটা আধলাও নেবো না।

বুঝতে অসুবিধে হয় না, মেয়েটি এখন বেশ্যা হয়েছে। ওই স্নো-পাউডার মাখার কথাটা শুনলেই ধরা যায়। আশ্চর্য, গরীবদের মধ্যেই এত পাপ-পুণ্য বোধ প্রবল থাকে। এই গোঁয়ার ধারণাগুলোর জন্য না খেয়ে থাকতেও রাজী আছে। ঝি-গিরি করার চেয়ে বেশ্যা হওয়া খারাপ! চুরি ডাকাতি করার থেকেও! দু'সপ্তাহ রেশন না তুললে বস্তির লোকেরা কি খেয়ে থাকে, কে জানে!

গত সপ্তাহে আমাদের রেশন থেকে অখাদ্য চাল দিয়েছিল। শুধু কাঁকর এবং পোকা-ধরাই নয়, বিশ্রী গন্ধ। ওই স্ত্রীলোকটিকে চাকরির বদলে সেই চাল দান করে দেওয়া হলো। দুটো রুটি ওর ছেলেটির জন্য। বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, ছেলেটি সেই রুটি দুটো চিবোতে চিবোতে আর লাফাতে লাফাতে যাচ্ছে মায়ের পেছনে। ছেলেটার আনন্দ পাবার ক্ষমতা আছে।

ওর যে দিদি আমাদের বাড়িতে আগে কাজ করতো, তাকে মাঝে মাঝে পথে ঘাটে দেখি। এর পর একদিন বাস স্টপে সেই মেয়েটিকে দেখে একটু বিশেষ কৌতূহল নিয়ে তাকালাম। সত্যিই গালে স্নো-পাউডার মেখেছে। ঝালঝেলে শস্তা সিল্কের শাড়ি। ব্রা-ফুটে ওঠা ব্লাউজ, পায়ে গোলাপী রঙের প্লাস্টিকের চটি, হাতে আবার একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। সে যেন আমাকে দেখে একটু লজ্জা পেয়েছে, মুখটা ঘুরিয়ে রইলো অন্যদিকে। স্বাস্থ্যটি বেশ ভালো হয়েছে, দেখলেই বোঝা যায়, দু'বেলা ঠিক মতন খেতে পায়। আগে তিন চারটে ঠিকে কাজ করতো, এখন নিশ্চয়ই তার থেকে ওর খাটনি কম এবং রোজগার বেশী। আমি মনে মনে ওকে আশীর্বাদ করলাম, বেঁচে থাকো, সুখী হও!

রাত্তিরবেলা ছাদের ঘরটা আবার অন্য রকম লাগে। বেশী চাপ পড়েছে বলে রাত জেগে লিখতে শুরু করেছি ক'দিন ধরে। খুব মন দিয়ে দু-এক ঘণ্টা লেখার পর হঠাৎ মনে হয়, ছাত্র বয়েসে যদি এরকম একটা ঘর পেতাম, নিশ্চয়ই সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হতাম। হাত-পা ছড়াবার জন্য মাঝে মাঝে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াই। জাহাজের মতন বিরাট বিরাট সব আলোকোজ্জ্বল বাড়ি, হঠাৎ দপ করে অন্ধকার হয়ে যায়। লোড শেডিং। নিমেষে শহরটাকে মনে হয় মৃত পুরী। শুধু রেল লাইনের পাশের বস্তিতে আলো দেখা যায়, ওখানে ইলেকট্রিক নেই।

ওপরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, কতদিন আকাশ দেখি নি। মাঝে মাঝে দেখা স্বাস্থ্যকর। আমি খোঁজখবর না নিলেও আকাশটা আগের মতনই ঠিকঠাক ভালো আছে। আর একটু টাকা পয়সা পেলে কোন্ তারায় গিয়ে একটা বাড়ি বানাবো, সে বিষয়ে মনে মনে একটা ছক এঁকে ফেলি। সেই মুহূর্তে নিজেকে বেশ সুখী ও স্বাস্থ্যবান মনে হয়।

প্রিয় নামে ডাকলাম, হ্যালো, প্রিন্স অফ ডেনমার্ক !

ঘরে এসে মোম জেবলে আবার লিখতে বসি। জানলার বাইরের অন্ধকারটাকে মনে হয় যেন নারী। একরাশ কালো চুল মেলে চুপচাপ আমাকে দেখছে। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছো ?

দমকা হাওয়ায় নিভে গেল মোমটা। আমি তখন সেই অন্ধকারকে আলিঙ্গন করে বেশ বড় দুটো চুমু খেলাম। বললাম তোমার জিভটা একটু বার করে দাও তো ! তুমি আমার মাথায় হাত রাখো, দু' আঙুল দিয়ে যতটুকু নুন তোলা যায়, আমায় ততটুকু ভালোবাসবে ? তোমায় আমি—

একলা ঘরে থাকলে এ রকম যা খুশী করা যায়। কিন্তু লেখায় মন বসছে না। আবার মন দেবার চেষ্টা করতেই কানে ভেসে এলো একটি বাচ্চার তীক্ষ্ম কান্নার আওয়াজ। যেন কেউ মেরেছে। বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ শুনতে আমার একটুও ভালো লাগে না। ভুরু কুঁচকে যায় আপনা থেকেই।

তারপর শুনতে পাই ঘন ঘন ট্রেনের হুইশ্‌ল। যেন কিসের সংকেত। এটা আমার চেনা। ট্রেন থেমে গেছে, কিছুক্ষণ বাদে বাদে পর পর চারবার লম্বা হুইশ্‌ল দিচ্ছে। ওভারব্রিজের তলাটায় ওয়াগান ব্রেকারদের আড্ডা। পরমানন্দে কিছু লুঠপাট চলছে। নিয়মিত ব্যাপার। যে অন্ধকারকে আমি শুধু নারী ভেবেছিলাম, সেই অন্ধকার ওদের কাছে অন্নপূর্ণা।

আমি আবার ছাদের আলসের কাছে গিয়ে ওদের কান্ডকারখানা দেখবার চেষ্টা করলাম। কিছু দেখা যায় না। এর মধ্যেও শোনা যাচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলের কান্না। সেই ছেলেটা ?

সেই ছেলেটাকে পরদিনই দেখলাম শ্রমিকের ভূমিকায়। ব্রিজের আরম্ভের মুখে যে ট্যাক্সিগুলো দাঁড়িয়ে থাকে সেই ট্যাক্সি ধোয়া-মোছার কাজ নিয়েছে। কোথা থেকে যোগাড় করেছে একটা হলদে কাপড়। বিশাল চেহারার ট্যাক্সি ড্রাইভাররা যখন স্টিয়ারিংয়ের ওপর পা তুলে একটু বিশ্রাম নেয়, সেই সময়টুকু ওই ছেলেটা সামনের কাচ পরিষ্কার করে মাডগার্ডের কাদা মুছে দেয়। রেট দশ পয়সা। কয়েকদিনেই আরও কয়েকটা ছেলে ওই কাজে জুটে গেল। রীতিমতন প্রতিযোগিতা।

একদিন আমি নিজেই তাড়াহুড়ো করে একটা ট্যাক্সিতে এসে চাপলুম। ট্যাক্সির ড্রাইভার টাং টাং করে মিটার ঘুরিয়ে যেই গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে অমনি জানলার কাছে সেই ছেলেটা এসে বললো, আমার পয়সা ? সর্দারজী, আমার পয়সা !

সর্দারজী বললো, ভাগ্, আধা কাম নেহি হুয়া—

পয়সা না দিয়েই সর্দারজী গাড়ি ছেড়ে চলে এলো, ছেলেটা খানিকটা পেছন পেছন ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো এক জায়গায়। সর্দারজী আপন মনেই শব্দ করে হাসছে, যেন একটা মজার ব্যাপার।

আমি একবার ভাবলাম, ঐটুকু ছেলেকে ঠকাবার জন্য সর্দারজীকে এক ধমক দেবো। এখনো পিছু ফিরে পয়সা দেওয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, এটা ওদের নিজস্ব ব্যাপার। একটা বাঘ কি অন্য বাঘের বাচ্চার প্রতি মায়াদয়া দেখায় ? মানুষ তার থেকে কতটা আর আলাদা ! তা ছাড়া, সর্দারজী বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে ভালোবাসে, এটা বোধ হয় সে-রকমই একটা কিছু।

আসলে, আমি এই সব যুক্তি বানাচ্ছিলাম নিজেকে বাঁচাবার জন্য। আমার মনে মনে অনেক কথা এলেও মুখে তা বলতে পারি না। সর্দারজীর সঙ্গে ঝামেলা করতে চাইছিলাম না। তবু মনটা একটু খচখচ করতে লাগলো। দশটা পয়সা থেকে ওই ছেলেটাকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে আমারও কিছুটা ভূমিকা আছে। কোনো এক সুযোগে আমি ওকে পয়সাটা দিয়ে দেবো।

সেই দিন একটু রাত করে বাড়ি ফিরছি, ঠিক দরজার কাছে একটা হোঁচট খেলাম। অন্ধকারের মধ্যেও একটা জিনিস দেখে বুকটা ভয়ে হিম হয়ে গেল। হাইড্র্যান্টের মুখটা খোলা। একটা গোল গর্ত হাঁ করে আছে। সেই গর্তের পাশে একটা ইঁটে ভাগ্যিস আমার

পা লেগেছিল, নইলে গর্তে পড়ে পা-টা নিশ্চয়ই ভাঙতো। ওই নোংরার মধ্যে আমার পা —দৃশ্যটা ভাবতেও আমার গা ঘিনঘিন করছে। বাড়ির কোনো বাচ্চা ছেলে পড়ে গেলে মারাও যেতে পারতো! যোধপুর পার্কে আগে ঠিক এইভাবেই একটি ফুটফুটে মেয়ে মারা গেছে।

রাগে আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে যায়। সব কিছুরই একটা সীমা আছে। হাইড্র্যান্টের ঢাকনা চুরি করা তো প্রায় খুন করার সমান। এর প্রতিকার করার উপায় নেই? আমি এমন চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিলাম যে, প্রতিবেশীরাও অনেকে জেগে উঠলো। তখন দেখা গেল, পাশাপাশি চারপাঁচখানা বাড়ির সদর দরজার সামনে থেকে হাইড্র্যান্টের ঢাকনা চুরি গেছে। হাঁ করে আছে মৃত্যুফাঁদ। সকলেই বলাবলি করতে লাগলেন, এই বস্তির ছেলেগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না। বস্তিটা হয়েছে চোর আর ছিনতাই-বাজদের আড্ডা। সি এম ডি এ যে বলেছিল বস্তি তুলে দেবে—কিছুই করার নাম নেই, যত সব! লোহার ঢাকনাগুলো বিক্রি করলে কটা পয়সাই বা পাওয়া যায়—আর যারা কেনে তারা বোঝে না ওগুলো কোথা থেকে আসে?

সেই রাত্রেই কোনোক্রমে কাঠ-ফাট যোগাড় করে তার ওপর ইঁটপাথর চাপা দিয়ে গর্তগুলো ঢেকে রাখার ব্যবস্থা হয়। আমিই এ ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছি বলে আমার রাগ কমে গিয়ে একটু গর্ব জাগে। সে রাত্রে আমার ভালো ঘুম হয় না।

আবার ভোরেই ঘুম ভেঙে যায় একটি ভিখিরির চিৎকারে। একটি মাঝবয়েসী বুড়ি ঠিক আমাদের জানলার নিচে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, মা, কিছু খাই নি, খেতে দাও মা! নিটোল ভরাট গলা বুড়িটার, গান শিখলে উন্নতি করতে পারতো। সে ওই একই কথা এত বার বলে থাকে যে, অগ্রাহ্য করার উপায় নেই।

বিছানা থেকে উঠে ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে পাঁচটা বাজে। সারা রাত লোড শেডিং, অসহ্য গরম, ভোরের দিকে ঠাণ্ডা হাওয়ার একটু একটু স্নিগ্ধ আমেজ আসে, বিছানাটা প্রিয় মনে হয়—সেই সময় এই চিৎকার! রাগের বদলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। এত ভোরে কখনো ভিখিরির ডাক শুনি নি। ও কি সারা রাত ধরেই এমন করে চেঁচিয়ে ফিরছে? এসব কিসের চিহ্ন?

হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে আমি একটুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলাম। যেদিকেই চাই, মানুষের চেহারা যেন ক্রমশ রোগা আর বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। আমাদের বেশ কয়েকজন পুরনো রাঁধুনি, যারা কখনো কখনো বিনা নোটিশে বা মিথ্যে কথা বলে চাকরি ছেড়ে দেশে পালিয়েছে—এখন প্রতিদিনই তাদের একজন দুজন করে ফিরে আসছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে, সঙ্গে ছেলেপুলে বা নাতিপুতি—হাত পেতে বলছে, মা, যে কোনো একটা কাজ দাও, দেশে খাবার নেই মা, কেউ খেতে পায় না মা—। যুদ্ধ নেই, দাঙ্গা নেই, তবু কলকাতার সব ফুটপাথ, রেল স্টেশন গৃহহারা পরিবারে ভরে যাচ্ছে। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাই হাজার হাজার লাখ লাখ কঙ্কালসার মানুষ ধেয়ে আসছে শহরের দিকে।

জানলা দিয়ে ওপারে পৃথিবীটা এখন কত সুন্দর মনে হয়। হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করে এমন ঝকঝকে নীল আকাশ, ঝলকে ঝলকে ছুটে আসছে সোনালী রোদ, নারকোল গাছের পাতায় বাতাসের চিকন চিকন খেলা। এক ঝাঁক পায়রা আনন্দের জ্যান্ত ছবির মতন লুটোপুটি খাচ্ছে শূন্যে। এখন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বহু দিন বেঁচে থাকতে সাধ হয়। শুধু নিজের একলা বেঁচে থাকা, সেই সঙ্গে কিছু প্রিয়জন—তার বাইরেই একটা বিরাট ক্ষুধা প্রকাণ্ড মুখ বার করে আছে। পৃথিবী এরকম সুন্দরই থাকবে—তবু কি এখান থেকে মানুষের আয়ু শেষ হলো?

হঠাৎ খেয়াল হলো, ভিখিরি বুড়িটা তখনো নিটোল সুরেলা গলায় কেঁদে যাচ্ছে। কোনো সিনেমার অভিনেত্রীও এমন নিখুঁতভাবে কাঁদতে পারবে না। আমি জানলার পাশে লুকিয়ে থেকে একটা দশ পয়সা ছুঁড়ে দিলাম নিচে। ঠং করে পয়সাটার শব্দ হলো কিন্তু সেটা কুড়িয়ে না নিয়ে বুড়িটা বললো, পয়সা চাই না গো, দুটি খেতে দাও, কিছু খাই নি—

ও গো, আমি কিছু খাই নি—

আর কোথাও কারুর জেগে ওঠার কোনো লক্ষণ নেই। আমি একলা জেগে উঠে কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি? আমারই সব দায়িত্ব? কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বললাম, যাও যাও আর কিছু হবে না।

এর দু ঘণ্টা বাদে ডিম সেদ্ধ আর টোস্টের সঙ্গে চা খেতে খেতে এক পলকের জন্যে মনে প্রশ্ন জাগলো, আমি কি কোনো অন্যায় করেছি? আমার বাঁ হাতটা আপনা থেকেই মুঠো পাকিয়ে যায়। যেন একটা বিরাট আদালতে দাঁড়িয়ে আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করছি, অস্ফুট গলায় বললাম, চোপ! একটাও কথা শুনতে চাই না। আর একটা কথা বললেই গুলি চালাবো। আমার বা হাতটা উঁচু হয়ে ওঠে, সে হাতে একটা রাইফেল ধরা, দেয়ালে আমার বাবার ছবিটার দিকে টিপ করে ফায়ার করলাম।

ছাদের ঘরে এসে সেদিন আমি টেবিলটা ফেরালাম। দূরের ওই মাঠ তার পাশের বস্তির দিকে বার বার চোখ চলে গেলে আর লেখা এগুবে না। এদিকের জানলা দিয়ে দেখা যায় একটা বিরাট ফ্ল্যাটবাড়ির পেছনের দিকটা, আর কয়েকটি সুশ্রী অট্টালিকার দোতলা তিনতলার বাসিন্দা—সে সব জায়গায় ইজিচেয়ারে কোনো প্রৌঢ় বা কিশোরী সামনে বই খুলে বসে থাকে। বিভিন্ন রান্নাঘরে মাছ মাংসের গন্ধ-ভরা ধোঁয়া। ছাদের টব-গাছ-গুলোতে ফুল এসেছে বর্ষায়। এদিকে অন্য পৃথিবী।

তবু কি মন বসাবার উপায় আছে। একটা গোলমাল শুনে পিঠ ফেরাতেই হয়। বস্তিতে মারামারি লেগেছে। বিশেষ কিছু না, ওদের নিজেদেরই দুই দলের মধ্যে মারামারি হুড়ো-হুড়ি, ছোট ছোট বাচ্চারাও ইঁট ছোঁড়াছুঁড়ি করছে—কিছুকাল আগেও এই সব মারামারিতে বোমা ফাটতো—এখন বোমার আওয়াজ আর শোনা যায় না। গরীবরা বেশী মারামারি করে, ওদের ছেলেপুলে বেশী হয়—ওদের পেট ছাড়া আর কোনো বস্তু নেই। মারামারিটা ছড়িয়ে পড়েছে রেললাইনের ওপর, ভ্যাঁ ভ্যাঁ আওয়াজ করতে করতে একটা ইলেকট্রিক ট্রেন গতি মন্দ করে। ট্রেনটা অফিসযাত্রীতে ঠাসাঠাসি, ভিড় উপচে পড়ছে দরজার বাইরে—কয়েকটা বস্তির ছেলে সেই সব ট্রেনযাত্রীদের দিকেই পাথর ছুঁড়তে শুরু করে হঠাৎ। উঃ কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ওই ছেলেগুলোকে এক্ষুনি গিয়ে চাবকানো উচিত।

আমি চোখ বন্ধ করি। আবার চোখ খুলতে হয়। একটা ভয়ংকর চ্যাঁচামেচির মধ্যে ট্রেনটা এবার জোরে বেরিয়ে যায়।

ট্রেন এর প্রতিশোধ নিল পরের দিন। আমি তখন বাজারে যাওয়ার জন্য রাস্তায় বেরিয়েছি, দেখলাম রাস্তার সব লোক দৌড়চ্ছে ট্রেন লাইনের দিকে। স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়া যায় না। সব লোক যেদিকে যাচ্ছে আমিও সেদিকে এগোলাম।

ট্রেন লাইনের পাশেই বিরাট লম্বা বস্তি। অনেকের প্রায় লাইনের ওপরেই সংসার। কুকুর ছাগল ও বাচ্চারা লাইনের ওপরে বসে রোদ পোয়ায়।

আজ ট্রেন হুইশল না দিয়ে জোরে বেরিয়ে গেছে। চাপা পড়েছে একটি ছাগল আর একটি মানুষ। আমি পৌঁছে দেখলাম লাইনের ওপর চাপ চাপ রক্ত পড়ে আছে, তা ওই ছাগলটার, দু'খণ্ড হয়ে গেছে একেবারে। পাঁঠা বলি অনেক দেখেছি, সুতরাং ছাগলের রক্ত দেখে গা গুলিয়ে ওঠার কথা নয়। কয়েকটা লুঙ্গি পরা ছেলে ছাগলের টুকরো দুটো ধরাধরি করে তুলে দৌড়ে কোথায় যেন চলে গেল।

ছেলেটার গা থেকে কিন্তু একটুও রক্ত বেরোয় নি। ও নাকি ট্রেনের একেবারে সামনে দিয়ে ছুটে পালাতে গিয়েছিল, ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়েছে লাইন থেকে অনেকটা ধারে। এখানে লাইনটা বাঁক নিয়েছে তো। এখনো বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে এই রকম মনে হয় ওকে দেখলে। ঠিক যেন ব্যথা সামলাবার জন্য পাশ ফিরে পেটে হাত চেপে শুয়ে আছে। সেই লাল রঙের প্যাণ্ট পরা ছেলেটা।

আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে ছেলেটা মরে গেছে। কালকে যাকে বেশ জ্যান্ত দেখেছি, সে কি এরকম দুম্ করে মরে যেতে পারে। কাছে গিয়ে মুখটা ভালো করে দেখার পর আর সন্দেহ থাকে না।

মেয়েটার মা ছুটতে ছুটতে এসে ছেলেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার পেছন পেছন আর একটা মেয়ে। ওর দিদি, যার সঙ্গে ওদের বাড়ির কোনো সম্বন্ধ ছিল না। মেয়েটা এসেই একেবারে গালাগালির ঝড় তুলে দেয়। কাকে সে গালাগালি দিচ্ছে বোঝা না গেলেও তার শোকের প্রকাশ যে ক্রোধের উগ্রতায় এবং তা যে আন্তরিক তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। সে মায়ের কাছ থেকে ভাইকে নিজের কোলে তুলে নিতে চাইছে বারবার।

আমি মাথা ঠান্ডা করার চেষ্টা করি। একটা ক্ষুধার্ত পেট পৃথিবী থেকে কমে গেলে কি ক্ষতি হয়? দশ বছর আগে নিরোধ জনপ্রিয় হলে এই ছেলেটা জন্মাতই না। দেশসুদ্ধ সবাই কি ভাবছে না গরীবদের জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা? মৃত্যু নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করার মানে হয় না। পৃথিবীতে প্রতিনিয়তই তো মানুষ মরছে।

লাল রঙের প্যান্ট পরা ছেলেটার দেহ নিথর হয়ে পড়ে আছে। ওর মা শুয়ে ওলোট-পালোট করছে তার পাশে। মেয়েটা সামলাবার চেষ্টা করছে মাকে। আমার চোখ ছেলেটার পা দুটোর দিকে চলে যায় বারে বারে। ও আর উঠে ছুট লাগাবে না। ওকে আমি একটা সবুজ মাঠে দৌড়োদৌড়ি করতে দেখেছি।

অবধারিতভাবেই আমার সেই শালিক মারার দৃশ্যটা মনে পড়ে যায়। এই সাদৃশ্যের কোনো মর্ম খুঁজে পাই না আমি। শুধু মনে হয় আমার মতন চারপাশে যারা ভিড় করে এই দৃশ্যটা দেখছে তারা যেন সেই কাকগুলির মতন। দর্শকদের চ্যাঁচামেচি কথাবার্তাই বেশি। এর মধ্যে অনেকে যে ভ্রষ্টা যুবতী মেয়েটির আঁচল খোলা বুকের দিকেই বেশী দৃষ্টি রেখেছে—তা এই মৃত্যুর পাশেও নিশ্চিত সত্য। একদল লোক আবার লাইনের ওপর সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে—আজ ওরা এ লাইনে ট্রেন চলতে দেবে না। অথচ আজ একটি বৃষ্টি-ধোয়া চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিন।

অল্প একটু পরেই ভিড় দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ওভারব্রিজের নিচে একটা পুলিসের গাড়ি। তার থেকে নামলো প্রায় এক ডজন পুলিস।

এবার সেই বেড়ালটা আসছে।

কে শত্রু কে বন্ধু

দোতলা বাসের জানলার ধারে বসবার জায়গা পাওয়া একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। অনেকটা দূর যেতে হবে। বাসের অল্প আলোয় একটা বই খুলে পড়ছিলাম। কতটা সময় কেটে গেছে খেয়াল করি নি, হঠাৎ চোখ তুলে বাইরে তাকিয়ে দেখি আমার গন্তব্য পেরিয়ে গেছি। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। ব্যস্ত হয়ে বই মুড়ে দাঁড়ালাম। বাসে তখন বেশ ভিড়। আমার সীট ছেড়ে সবেমাত্র বাইরে এসেছি হঠাৎ আমার চোখে জগৎসংসার অন্ধ হয়ে গেল. আমি পা দুমড়ে বসে পড়লাম।

উঃ করে একটা আওয়াজ করেছিলাম শুধু। হাত দিয়ে ঢেকে ফেলেছিলাম মুখ, তারপর কয়েকটা মুহূর্ত কিছুই শুনতে পাই নি। চোখেও দেখতে পাচ্ছিলাম না। একটু পরে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। শুনতে পেলাম, দু তিনজন লোক জিজ্ঞেস করছে, কি হলো মশাই? ও ভাই কি হলো? আমি হাত দুটো চোখের সামনে আনলাম। দু'হাত ভরা রক্ত।

বছর সাতেক আগের কথা। তখন কলকাতার পথে ঘাটে মানুষ খুন করার উৎসবের রেওয়াজ ছিল না। আহত ও নিহত মানুষ দেখলে লোকে কেনো পালাতো না। চলন্ত বাসে অনেক লোক আমাকে ঘিরে ব্যাকুল হয়ে রইল।

আমার যে ঠিক কি হয়েছে, তা আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম না। আমার দুহাত ভরা শুধু রক্ত, আমার মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে—কোনো ব্যথাও তখন টের পাচ্ছি না। লোকজন ধরাধরি করে আমাকে দাঁড় করালো। রক্ত তখনও পড়ছে অনর্গল। অনেকে চিৎকার করে বাস থামালো।

আমাকে কি কেউ জোরে মেরেছে? কিন্তু বাসের কোনো লোক আততায়ীকে দেখে নি। কেউ দুম্দাড় করে নেমে চলে যায় নি। ব্যাপারটা এমন হঠাৎ হয়েছে যে আমি ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ বসে না পড়লে কেউ লক্ষ্যই করতো না।

কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সেখানে সে রকম কিছু নেই।

একজন লোক আমার দিকে মুখ নিচু করে জিজ্ঞেস করলো, আপনার নাকে কে এরকম-ভাবে ঘুষি মারলো?

আমি রক্তাক্ত মুখ তুলে লোকটিকে দেখতে চাইলাম। রক্তস্রোতে আমার বিস্ময় চাপা পড়েছিল। চোখেও যেন ঘোর লেগেছিল একটু।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে?

অনেকগুলি কণ্ঠ প্রশ্ন করলো, কে? কে? কে? কে?

উত্তর নেই।

কে মেরেছে, কেউ ঠিক বলতে পারছে না। একজনের হাত আমার মুখের সামনে বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে আসতে দেখেছে। হয়তো সেই হাতে কঠিন কোনো জিনিস ছিল। খালি হাতে এতটা আঘাত লাগার কথা নয়। যে মেরেছে সে হয়তো এখনো বাসের দোতলাতেই রয়েছে।

দুর্ঘটনা নয়। কেউ আমাকে মেরেছে, এটা শুনেই আমার ব্যথা বোধ হতে শুরু করলো। অসম্ভব তীব্র ব্যথা।

—আপনি কোথায় যাবেন?

—আমি এখানেই নামবো।

—নিজে নামতে পারবেন?

আমি এবার সোজা হয়ে চারিদিকে তাকালাম। অনেকেই আমার দিকে তাকিয়ে আছে, সবারই মুখ বন্ধুর মতন। যন্ত্রণা অনেকটা কমে গেল।

আমি নামবার জন্য সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছি, একজন লোক বললেন, দাঁড়ান আমি ধরছি আপনাকে।

কারুর সাহায্য নিতে আমার লজ্জা করে। অথচ উপকারী মানুষের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করাও যায় না। কোনো রকমে বললাম, ঠিক আছে ঠিক আছে—

তবু তিনি আমার হাত ধরলেন। তার সঙ্গে নামতে লাগলাম। তখন একটি রিনরিনে কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, আপনার বইটা? বইটা যে রয়ে গেল।

ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি পরা একটি তেইশ-চব্বিশ বছরের মেয়ে মোটামুটি সুশ্রী এবং সপ্রতিভ। বইটা বাড়িয়ে ধরেছে আমার দিকে।

আমি মুখে ধন্যবাদ না জানিয়ে, শুধু কৃতজ্ঞতার ভাব দেখিয়ে বইটা নিলাম। বইটা হারালে খুব মুশকিল হতো, লাইব্রেরি থেকে আনা।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, আপনাকে কে মারলো?

এমনিতে এরকম একটি অচেনা যুবতী মেয়ে আমার সঙ্গে যেচে কথা বলতো না। আমার রক্তমাখা মুখ দেখে ওর মনে বুঝি দয়া হয়েছে।

আমি বললাম, পৃথিবীতে আমার কোনো শত্রু নেই।

মেয়েটি বোধহয় এরকম কোনো উত্তর আশা করে নি। তাই আমার কথা শুনে সে একটু হেসে ফেললো হঠাৎ। রক্তাক্ত চেহারার মানুষকে দেখে কেউ হাসে না।

বাস এর আগেই চলতে শুরু করেছে। আমাকে নামতে হবে পরের স্টপে। মেয়েটির প্রশ্ন ঐ চিন্তা আমার মধ্যে নতুন করে জাগায়। কে আমাকে মারলো? কি দোষ আমি করেছি? হঠাৎ লেগে যাবার ব্যাপারও নয়, এত জোরে লেগেছে। কেউ যদি সামনাসামনি কোনো অভিযোগ জানাতো, ঝগড়া করতো, আচমকা মেরে বসতো, তা হলেও না হয় মানে বুঝতাম। কাপুরুষের মতই আত্মগোপন করে কেন মারলো আমাকে? কোনো কাপুরুষের সঙ্গে আমার শত্রুতা থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

বাসটি ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে। যে ভদ্রলোক আমার হাত ধরে নামাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, রোক্‌কে। রোক্‌কে।

বাস তবু থামলো না। তিনি আরও জোর গলায় বললেন, রোক্‌কে। দেখছেন না অ্যাকসিডেন্ট।

ভদ্রলোক ব্যাপারটাকে নাটকীয় করতে চান। যন্ত্রণার মধ্যেও আমার লজ্জা হয়। আমাকে কেন্দ্র করে কোনো নাটকীয় ব্যাপার আমি পছন্দ করি না। অনেক লোক এক সঙ্গে আমার দিকে তাকালে আমার শরীর কুঁকড়ে যায়।

একতলার কিছু লোক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। কেউই খুব একটা কৌতূহল দেখালো না। কন্ডাকটার দু'জনই নিচতলায় গল্প করছিল, তারা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে? আমি তাদের কোনো উত্তর দিলাম না। বাস থামতেই নেমে পড়লাম।

যন্ত্রণায় তখনও আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। শরীরের কোনো জায়গার বদলে নাকে লেগেছে বলেই ব্যথাটা এত বেশী। রক্ত বন্ধ হয় নি তখনও। আমার প্রথমেই চিন্তা হলো, রক্তটা বন্ধ করা দরকার।

অধিকাংশ দোকানপাটই বন্ধ হয়ে গেছে। কাছাকাছি কোনো ডাক্তারখানা নেই। আমার সঙ্গী ভদ্রলোক বললেন, একটু হাঁটতে পারবেন? আমহার্স্ট স্ট্রীটের কাছে একটা ডাক্তারখানা আছে।

আমি কাছেই একটা টিউবয়েল দেখতে পেলাম। বললাম, আগে রক্তটা ধুয়ে নিই।

আমার জামায় রক্ত, রুমালটা জবজবে ভিজে; প্যান্টে, এমনকি জুতোতেও রক্তের ফোঁটা পড়েছে। এই অবস্থায় রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায় না।

ভদ্রলোক পাম্প করতে লাগলেন, আমি জল দিয়ে ধুতে লাগলাম। ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে খানিকটা ভালো লাগলো। যেন অজানা কারুর স্নেহের মতন। নাকের মধ্যে জলের ঝাপটা দিলেও রক্ত বন্ধ হতে চায় না।

সেই অবস্থায় হঠাৎ আমার মনে পড়লো, একটু আগে বাসে দেখা ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি পরা সেই মেয়েটির কথা, যে আসলে বইটা ফেরত দিয়েছিল। মেয়েটির মুখখানা খুব চেনা মনে হয়, যদিও একথাও ঠিক, ওকে আমি আগে কখনো দেখি নি। কারুর কারুর ক্ষেত্রে হয় এ রকম—একবার দেখলেই মনে হয় অনেকদিনের চেনা। কিন্তু মেয়েটি হাসলো কেন? আমার দুরবস্থা দেখে ওর কি হাসা উচিত? আমি এতই অপমানিত বোধ করলাম যে আমার কান্না এসে গেল। তখন আমি চোখে মুখে জলের ছিটে দিচ্ছি, কেউ আমার কান্না বুঝবে না!

ভদ্রলোক বললেন, কমেছে?

আমি বললাম, অনেকটা। কিন্তু আপনি আমার জন্য কষ্ট করে নামলেন এখানে—

—না, আমারও এখানেই নামবার কথা। কাছেই বাড়ি। আপনি কোথায় যাবেন?

—আমি এখান থেকে থ্রি-বি বাস ধরবো।

—এক্ষুনি বাসে উঠতে পারবেন? শরীর দুর্বল লাগবে না?

—না, চলে যাবো ঠিক।

—আপনার যদি খুব তাড়া না থাকে, তা হলে আমাদের বাড়িতে একবার আসবেন? একটু বসে, তারপর চলে যেতেন। খুব কাছেই আমার বাড়ি।

—না, না, শুধু শুধু আপনাকে বিব্রত করতে চাই না। আপনি এমনিতে আমায় যা সাহায্য করলেন—।

—আরে মশাই, চলুন, অত ভদ্রতা করছেন কেন! আসুন, একটু কফি খেয়ে যাবেন।

বড় রাস্তার অদূরে গলির মধ্যে ভদ্রলোকের বাড়ি। ইতিমধ্যে নাম জেনে নিয়েছি। ওঁর নাম অনুপম সরকার, এক সরকারী অফিসের লাইব্রেরিয়ান।

সদর দরজা খোলাই ছিল। অন্ধকার, সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অনুপমবাবু বললেন, একটু সাবধানে উঠবেন, আবার যেন ধাক্কাটাক্কা না লাগে।

আমি নাকের ওপর হাত চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। অন্য যে জায়গায় লাগে লাগুক,

আবার নাকে লাগলে আমি এবার ঠিক অজ্ঞান হয়ে যাবো।

নিস্তব্ধ বাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে একতলা, দোতলা, তিনতলা পার হয়ে গিয়েও অনুপমবাবু থামলেন না। আমার একটু একটু অস্বস্তি হতে লাগলো। কোথায় চলেছি? এত রাত্রে; একজন সম্পূর্ণ অচেনা লোকের সঙ্গে এখানে না আসাই উচিত ছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ক তলায়?

অনুপমবাবু আমার হাত চেপে ধরে বললেন, আসুন না!

হঠাৎ আমি অন্য একটা কথা ভাবলুম। এই লোকটার মতলব কি? আসলে কোথায় নিয়ে যাবে? এই লোকটাই আসলে মারে নি তো? এখন আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আবার নিয়ে যাচ্ছে আরও কঠিন শাস্তি দেবার জন্য?

যদিও লোকটিকে আমি জীবনে কখনো দেখি নি, এর সঙ্গে আমার শত্রুতা থাকার কোনো কারণ নেই। তবু পৃথিবীতে অনেক অসম্ভব ব্যাপার ঘটে।

আমি থমকে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক সবলে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, আরে মশাই, লজ্জা পাচ্ছেন কেন! আসুন।

গলার আওয়াজ পেয়েই বোধহয় দরজা খুলে গেল। একজন মহিলা সেখানে দাঁড়িয়ে, কুচকুচে কালো রং, স্নিগ্ধ মুখখানা, এক মাথা চুল। অন্ধকারের মধ্যে ভদ্রমহিলা প্রথমে আমাকে দেখতে পান নি, হঠাৎ দেখতে পেয়ে মুখ দিয়ে একটা আর্ত শব্দ করলেন—তারপরই ছুটে ঘরের মধ্যে কোথায় চলে গেলেন।

অনুপমবাবু হেসে আমাকে বললেন, আসুন।

আমার পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। কিন্তু এখন আর ঘরের মধ্যে না গিয়ে উপায় নেই।

বিরাট খাটের ওপর দুটি বাচ্চা ঘুমুচ্ছে। ভদ্রমহিলা সেখানে নেই। ঘরে একটিমাত্র চেয়ার। অনুপমবাবু আমাকে বললেন, এই চেয়ারটায় বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

বসলাম। দূরে একটা ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় দেখতে পেলাম আমার চেহারা। এমন বিসদৃশ এবং বোকা ভঙ্গিতে কোনো মানুষকে বসে থাকতে আমি এর আগে দেখি নি।

একটু বাদেই মহিলা ফিরে এলেন এ ঘরে। নিজের স্বামীর সঙ্গে কোনো কথা বলার আগেই জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে?

আমার বদলে ওঁর স্বামীই বললেন, ভদ্রলোক বাসে আসছিলেন, হঠাৎ কি যে হলো, অদ্ভুত ব্যাপার—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, হঠাৎ লেগে গেছে।

উনি বললেন, না। কে যেন মেরেছে।

—কে মেরেছে?

—তা তো জানি না।

ভদ্রমহিলা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ছিঃ, মারামারি করতে নেই। মানুষের সঙ্গে মারামারি করে কি লাভ!

এতক্ষণ বাদে আমার হাসি পেল। উনি ধরেই নিয়েছেন, আমি মারামারি করেছি। এই রকমই হয় বোধহয়। এক পক্ষের আঘাতে কি রক্তপাত হয় এতটা?

আমি বললাম, না, মারামারির ব্যাপারই নয়। আমার বোধহয় ধাক্কা-টাক্কা লেগেছে কোথাও। এত রাত্রে আপনাদের খুব বিব্রত করলাম। আমি এবার চলি?

অনুপমবাবু বললেন, কি ওঁকে এই অবস্থায় যেতে দেওয়া যায়?

মহিলা বললেন, না, আজ আর যাবার দরকার নেই। আপনি আজ এখানেই থেকে যান না। কোনো রকমে জায়গা হয়ে যাবে।

আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, না না, তার কোনো দরকার নেই। আমাকে বাড়ি ফিরতেই হবে।

মহিলা বললেন, ঠিক আছে, একটু পরে যাবেন। এক্ষুনি ওঠবার দরকার নেই।

অনুপমবাবু আবার হাসতে হাসতে বললেন, করবী তুমি প্রথমে ওঁকে দেখেই পালিয়ে

গেলে কেন? ভয় পেয়েছিলে।

অনুপমের স্ত্রীর নাম করবী। এই কথাটায় খুবই লজ্জা পেয়ে গেলেন কেন প্রথমে বুঝতে পারি নি। খুব নিচু করে বললেন, না, ভয় পাই নি।

এখন বুঝতে পারলাম। ভদ্রমহিলা গায়ে ব্লাউজ পরে ছিলেন না তখন। শোওয়ার জন্য তৈরী হয়েছিলেন। অচেনা পুরুষ দেখে তাই তাড়াতাড়ি পোশাক ঠিক করতে গিয়েছিলেন।

করবীর বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। আর একবার ওঁর দিকে তাকিয়ে মনে হলো, এ রকম সুন্দরী নারী আমি খুব কম দেখেছি। মুখের মধ্যে একটা কমনীয় ভাব, শান্ত দৃষ্টি, এই নারী বোধহয় পৃথিবীতে কোনো পাপের কথা জানে না।

পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে বেশ রহস্যময় লাগছিল গোড়া থেকে। ভদ্রলোক আমাকে ডেকে আনলেনই বা কেন, আজ তিনি আমাকে আরো, থাকবার জন্য পেড়াপীড়ি করলেনই বা কেন। ঘর দোরের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, এদের অবস্থা সচ্ছল নয়।

করবী আমার দিকে আবার তাকিয়ে বললেন, নাকের ওপর দুটো নখের দাগ বসে গেছে। কেউ খুব জোরে মেরেছে। ভীষণ লেগেছিল তাই না! উঃ! খুব লেগেছিল?

আমি দেখলাম করবীর চোখে জল। আমার বিস্ময় বুকের মধ্যে আরও লাফিয়ে উঠলো। উনি কাঁদছেন আমার কষ্টের কথা ভেবে! এ রকম কখনো হয়?

আমি বললাম, না। ততটা লাগে নি।

করবী চোখ মুছলেন। আবার লজ্জিত মুখে বললেন, আপনি একটু বসুন। আমি এক্ষুনি আসছি।

আমি অসহায়ভাবে অনুপমবাবুকে বললাম, আমাকে এবার সত্যি চলে যেতে হবে। আপনার নিশ্চয়ই এখনো খাওয়া-দাওয়া হয় নি।

অনুপমবাবু বললেন, দাঁড়ান, করবীকে না বলে তো যেতে পারবেন না। ওকে এখনো চেনেন নি আপনি।

প্রতি মুহূর্তেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল, এদের বুঝি কিছু একটা মতলব আছে আমাকে নিয়ে। যদিও তার সঙ্গে করবীর চোখের জল ফেলাটা মেলাতে পারছি না।

করবী ফিরে এলো এককাপ দুধ আর একবাটি গরমজল নিয়ে। দুধটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা খেয়ে নিন! অনেকখানি রক্ত বেরিয়েছে তো!

আমি লাফিয়ে উঠলাম। অসম্ভব। এদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। দুটো বাচ্চা রয়েছে—এদের দুধ আমি খাবো কেন? কলকাতায় এই সব পরিবারে যে অঢেল দুধ থাকে না, তা আমি জানি।

আমি কিছুতেই খাবো না। ওরাও দু'জনে মিসে আমাবে দারুণ পেড়াপীড়ি করতে লাগলেন। করবীর গলায় হুকুমের সুর। এই দুধের মধ্যে বিষ মেশানো নেই তো? কিংবা ঘুমের ওষুধ?

শেষ পর্যন্ত ওদের জোরাজুরিতে অতিষ্ঠ হয়ে আমি রীতিমতন বিরক্ত মুখে এক চুমুকে খেয়ে ফেললাম সবটা দুধ। কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না।

করবী বললেন, এবার চুপটি করে বসুন। আমি ঐ জায়গাটা মুছে দিচ্ছি গরমজল দিয়ে।

আমার আর প্রতিবাদ করবারও ক্ষমতা নেই। যা হয় হোক। হাত-পা ছড়িয়ে বসে রইলাম চুপ করে। উনি গরমজলে তুলো ভিজিয়ে খুব যত্ন করে মুছে দিতে লাগলেন আমার ক্ষত। সস্নেহে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, লাগছে না তো! ব্যথা লাগছে না? এবার একটু ডেটল লাগিয়ে দিই? তাহলে আর ভয় নেই।

আমার মুখের খুব কাছেই করবীর মুখ। কি বড় বড় দুটি চোখ, আঙুলগুলো যেন করুণা মাখা। আমার চোখ বুজে আসছিল বার বার। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? এ সব হচ্ছে কি? যাদের বিন্দুমাত্র চিনি না—তারা আমাকে এ রকম যত্ন করছে কেন?

করবীর অনুরোধে আমাকে জামাটাও খুলে ফেলতে হলো। মেয়েদের সামনে আমি কোনোদিন জামা খুলি না—কিন্তু আমার কোনো ওজরই টিকলো না। করবী সেই জামাটা

বাথরুমে নিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে, আমাকে ওঁর স্বামীর একটা শার্ট পরতে দিলেন। বলতে লাগলেন, বাড়িতে ওরকম রক্তমাখা জামা পরে গেলে বাড়ির লোক ভয় পেয়ে যাবে না।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে করবীর সেবা নেবার পর আমি সত্যিই এক সময় বিদায় নিলাম। করবী তাঁর স্বামীকে হুকুম করলেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাসে তুলে দিয়ে আসবার জন্য। অনুপমবাবু আমার শেষ আপত্তি সত্ত্বেও বেরিয়ে এলেন রাস্তায়।

গোড়া থেকে আমি কত রকম সন্দেহ করছিলাম, কিন্তু খারাপ কিছুই ঘটলো না তো। শুধু সেবা আর যত্ন। রাস্তায় বেরিয়ে কিছুটা আসবার পর আমার মনে পড়লো, করবীকে সেরকমভাবে কোনো কৃতজ্ঞতা জানানো হলো না তো।

অনুপমবাবুকে বললাম, আপনার স্ত্রী যা করলেন।

অনুপম বললেন, করবী বড্ড ভালো, জানেন। ওর মতন মেয়ে হয় না। নিজের স্ত্রী বলেই বলছি না।

—সে তো নিশ্চয়ই।

—আর একটু মিশলে দেখবেন, পৃথিবীতে এ যুগে এ রকম মেয়ে হয় না। যে-কোনো মানুষ দুঃখ কষ্ট পেলে ও এত দুঃখ পায়—

—সত্যি এ যুগে এ রকম মেয়ে—

আমার মতন একজন গরীবের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, সারাদিন খাটাখাটনি করে, বাইরে বেরুতে পারে না—তবু আমার ইচ্ছে হয় কি জানেন, বাইরের লোককে ডেকে ডেকে দেখাই। সবাইকে বলি, দেখো, এ যুগেও এরকম মেয়ে আছে। তাই আপনাকে আজ নিয়ে এলাম।

আজ রাত্তিরের সমস্ত ঘটনাটাই রহস্যময়। কেন বাসে একজন মারলো? তারপর কি রকমভাবে এরকম একটি পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হলো। যাদের কাজ হচ্ছে বিনা কারণে উপকার করা। সম্পূর্ণ বিপরীত এই অভিজ্ঞতা।

পরক্ষণে আবার মনে পড়লো আমার আততায়ী তো আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে নি। তার জন্যই অনুপম আর করবীর সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। আমার লাভের পরিমাণটা অনেক বেশী। আততায়ীকে একথাটা জানানো দরকার।

কুসুম গন্ধ

জানলা দিয়ে কেয়া দেখলো, দূরে গলির মোড়ে সুব্রতদা দাঁড়িয়ে আছে। পাজামা আর পাঞ্জাবি পরা, হাতে সিগারেট। সুব্রতদা চঞ্চলভাবে তাকাচ্ছে এদিকে ওদিকে। সঙ্গে আর কেউ নেই।

কেয়ার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। সে বুঝতে পারলো, সুব্রতদা তাদের বাড়িতে আসতে সাহস করছে না।

কেয়া ছুটতে ছুটতে নেমে এলো একতলায়। বসবার ঘরে ওর দিদি মল্লিকা কাশ্মীরী শালওয়ালার সঙ্গে কথা বলছে। কেয়া একটু নিরাশ হলো। এই শালওয়ালাগুলো একেবারে নাছোড়বান্দা। কতক্ষণে যে যাবে, তার ঠিক নেই। মা বেরিয়েছেন একটু আগে। বাবা যদিও বাড়িতে আছেন, কিন্তু তিনি এই শালওয়ালা-ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে কোনো-দিন একটাও কথা বলেন না।

কেয়া ছুটতে ছুটতে নেমে এলো একতলায়। বসবার ঘরে ওর দিদি মল্লিকা কাশ্মীরী তাকালো। জিজ্ঞেস করলো, কি রে?

কেয়া একটু অপ্রস্তুতভাবে বললো, না কিছু না।

—দ্যাখ তো, এই দুটোর মধ্যে কোন রংটা তোর পছন্দ?

কেয়া ঠোঁট উল্টে বললো, একটাও না।

কাশ্মীরী শালওয়ালারা একটু একটু বাংলা বুঝতো। তারা কচি কলাপাতা রঙের শালটা সবটা খুলে ছড়িয়ে বললো, এটা ভালো না? একদম ফাস্ট ক্লাস চীজ্। কত সুন্দর

কালার! এই শাল রাজকাপুর খরিদ করেছে ডিমপলের জন্য, বৈজয়ন্তীমালা তিনখানা কিনেছে।

কেয়া বিরক্ত বোধ করলো। উঃ, এই কি শাল কেনার সময়? আর যদি কিনতেই হয় তো যে-কোনো একটা তাড়াতাড়ি কিনে ফেললেই তো হয়।

কিন্তু মল্লিকা বড় খুঁতখুঁতে। কোনো রং তার সহজে পছন্দ হয় না। ক্রিম রং, অফ-হোয়াইট আর ঘি রঙের পার্থক্য নিয়ে সে মাথা ঘামায়।

কেয়া মল্লিকার পাশে গিয়ে ফিসফিস করে বললো, দিদি, সুব্রতদা এসেছে।

মল্লিকা প্রথমে একটু চমকে উঠলো। তাড়াতাড়ি শাড়ি ঠিক করে বললো, কোথায়? বাড়িতে এসেছে?

—না, গলির মোড়ে পায়চারি করছে।

—তুই কি করে জানলি?

—ওপরে জানলা থেকে দেখলাম।

মল্লিকা এবার রাগত চোখে তাকালো। ভুরু কুঁচকে বললো, আমি কি করবো?

—ডেকে আনবো? দাদা তো এখন বাড়িতে নেই!

—কেন? যার ইচ্ছে হবে সে আসবে! তোর অত পাকামিতে দরকার কি রে? যা ওপরে গিয়ে পড়তে বোস্! পড়াশুনো ছেড়ে এই সব হচ্ছে?

দিদির কাছে বকুনি খেলেই কেয়ার মন খারাপ হয়ে যায়। সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ওপরে এসে জানলা দিয়ে আর একবার উঁকি দিয়ে দেখলো, সুব্রতদা এখনো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সুব্রতদাটা কি? সোজা বাড়িতে চলে আসতে পারে না?

সুব্রতদা দাদার বন্ধু। দাদার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলে আর এ বাড়িতে আসে না। ঝগড়া হয়েছে তো কি হয়েছে? সুব্রতদা শুধু দিদির সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারতো না? আর দিদিই বা কি রকম? সুব্রতদার কথা শুনে পাত্তাই দিল না। এদিকে এত ভাব সুব্রতদার সঙ্গে! একদিন কেয়া দেখে ফেলেছিল, দিদি আর সুব্রতদা—

কেয়া তার খাতায় লুকিয়ে একটা চিঠি লিখতে বসলো :

তুমি রাগ করো না। আমি আজও তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারবো না। আমার কি কোনো স্বাধীনতা আছে? বাড়ির কেউ যদি একটু জানতে পারে—

কে যেন আসছে এদিকে। কেয়া তাড়াতাড়ি খাতাটা বন্ধ করে দিল। তার ওপরে, ফিজিক্স প্র্যাকটিক্যালের খাতাটা খুলে ধরলো।

খানিকটা বাদে মল্লিকা উঠে এল ওপরে। জানলার কাছে এসে সোজাসুজি বাইরে তাকিয়ে বললো, কই, কেউ নেই তো!

কেয়া বললো, তা হলে বোধহয় এতক্ষণ চলে গেছে!

মল্লিকা নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়ে বললো, চলে গেছে তো আমার বয়েই গেছে।

দিদির ওপর এবার রাগ হলো কেয়ার। সুব্রতদাকে অতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে তারপর এখন এসেছে খোঁজ করতে। কেন, শালওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলা কি এতই জরুরী ছিল! ওদের ঘুরে আসতে বলা যেত না?

মল্লিকা জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে বললো, তুই কোনো দিন ওকে বাড়িতে ডেকে আনবি না। যদি নিজের ইচ্ছায় আসতে হয় তো আসবে।

—দিদি, তোর সঙ্গে সুব্রতদার ঝগড়া হয়েছে?

—কে বললো?

—কেউ বলে নি। এমনি জিজ্ঞেস করছি।

—তোর অত কথায় দরকার কি! তুই বড্ড দিন দিন পাকা হচ্ছিস আজকাল।

কেয়া সদ্য স্কুল ছেড়ে কলেজে গেছে। কিছুদিন আগেও সে বাড়িতে ফ্রক পরতো। ফ্রক পরলে এখনও তাকে ছোট্টখাট্টো দেখায়। আবার শাড়ি পরলেই অন্যরকম, পুরোপুরি যুবতী।

মল্লিকা এ বছর এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। এখনো রেজাল্ট বেরোয় নি। বাড়ির সবাই

এখন মল্লিকার বিয়ের কথা চিন্তা করছেন, যদিও মল্লিকা চায় রিসার্চ করতে। আহা বিয়ের পরে বুঝি আর রিসার্চ করা যায় না? কেয়া দিদির ধরন-ধারণ বুঝতে পারে না।

দিন তিনেক বাদে কেয়া তার কলেজের তিনটি মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে হেঁটে বাড়ি ফিরছে, হঠাৎ দেখতে পেল একটা ট্যাক্সিতে তার দিদি মল্লিকা যাচ্ছে। পাশে কে? সুব্রতদা নয় তো। তাহলে কে?

কেয়া একেবারে শিউরে উঠলো। মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল তার। দিদি এ কি করলে? সুব্রতদা যদি দেখে ফেলে, কি ভাববে? ভীষণ দুঃখ পাবে সুব্রতদা।

অবশ্য কারুর সঙ্গে ট্যাক্সি করে কোথাও যাওয়াই খারাপ কিছু না। ট্রামে-বাসে যদি অন্য ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে যাওয়া যায় তাহলে ট্যাক্সিতেই বা যাবে না কেন? কিন্তু দিদি এখন সুব্রতদার সঙ্গে দেখাই করছে না, আর অন্য একজনের সঙ্গে বেড়াচ্ছে। এটা অন্যায়, নিশ্চয় অন্যায়! একটু মান-অভিমান হয়েছে বলেই কি সুব্রতদার মনে এরকমভাবে দুঃখ দিতে হবে?

মল্লিকা দেখতে পায় নি কেয়াকে। সে পাশের লোকটির সঙ্গে কথা বলায় মগ্ন। হুস করে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সিটা। কেয়া আর তার কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে কথাই বলতে পারলো না ভালো করে। মন্থর পায়ে ফিরে এলো বাড়িতে।

সারা বিকেল ও সন্ধেটা কেয়ার মুখ মেঘলা হয়েই রইলো। তার শান্ত ছোট জগৎটাতে দারুণ একটা আলোড়ন এসেছে। এরকমও হয়? একজনকে ভালোবেসে আর একজনের সঙ্গে ট্যাক্সি করে বেড়ানো যায়? তবে যে সে একটা বইতে পড়েছে যে ভালোবাসা এমনই ফুলের মতন স্পর্শকাতর যে অন্য কারুর উষ্ণ নিঃশ্বাসও তার সহ্য হয় না।

কেয়া খাতা খুলে চিঠি লিখতে বসলো :

তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে, আমি তোমাকে বিশ্বাস করবো, এর চেয়ে বড় কিছু নেই। তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না, আমি তোমাকে ভুল বুঝবো না। আমি যদি কোনো দোষ করি, তুমি শাস্তি দেবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমাও করতে হবে। বেশীক্ষণ রাগ করে থাকতে পারবে না। আর তুমি যদি কোনো দোষ করো তুমি সব কথা আমাকে এসে খুলে বলবে তাহলেই আমি তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দেবো। যদিও আমি জানি, তুমি কোনো দোষ করতেই পারো না—

কেয়া লক্ষ্য রেখেছিলো দিদি কখন বাড়ি ফেরে। মল্লিকা ফিরলো আটটার একটু পরে। মল্লিকা এখন অনেকটা স্বাধীন। এখন তার বাড়ি ফেরা সম্পর্কে তেমন কড়াকড়ি নেই। যত শাসন কেয়ার ওপরে।

মল্লিকা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকলো। হ্যান্ডব্যাগটা ছুঁড়ে দিল বিছানার উপরে। তারপর আলনায় শাড়ি-ব্লাউজ খুঁজতে লাগলো।

কেয়ার অনেক কিছু বলার আছে দিদিকে। কিন্তু এক্ষুনি বলতে সাহস পেল না। দিদি এখন গা ধুতে যাবে। গা ধুয়ে না বেরিয়ে আসা পর্যন্ত দিদির মেজাজ ভালো হবে না।

বাথরুমে ঢুকেও মল্লিকা গান গাইছে। কেয়া বুঝলো তার মানে দিদির মেজাজ আজ ভালোই আছে: কিন্তু কেয়া বুঝতেই পারলো না-চার-পাঁচ দিন সুব্রতদার সঙ্গে দেখা হয় নি, তবু দিদির মেজাজ ভালো আছে কি করে? আশ্চর্য ব্যাপার তো!

মল্লিকা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে চুল আঁচড়াচ্ছে, কেয়া খুব সরলভাবে বললো, দিদি আজ তোকে দেখলুম রাস্তায়, তুই ট্যাক্সি করে যাচ্ছিলি।

মল্লিকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বিস্মিতভাবে বললো, তাই নাকি? কখন বল তো?

কেয়ার বুকটা কাঁপছে। দিদি কি তার কাছে মিছে কথা বলবে নাকি? দিদি তো কখনো মিথ্যে কথা বলে না।

সে আস্তে আস্তে বললো, বিকেল সাড়ে চারটের সময়। আমরা তখন কলেজ থেকে ফিরছিলাম।

—তাই নাকি? আমি তোকে দেখিনি তো! তুই আমাকে ডাকলি না কেন? তোকেও

তুলে নিতাম।

—তুই তো উল্টো দিকে যাচ্ছিলি।

—তাতে কি হয়েছে তুইও ঘুরে আসতিস আমার সঙ্গে।

—তোর সঙ্গে কে ছিল রে?

—উনি? উনি অমৃতময় ঘোষ। বিখ্যাত কবি। তুই নাম শুনিস নি? তোরা তো সায়েন্সের মেয়ে, কবিতা-টবিতা পড়িস না!

কেয়ার গা থেকে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। অমৃতময় ঘোষের নাম সে দিদির মুখেই শুনেছে আগে। কবি-টবি যাই হোক, উনি ইউনিভার্সিটিতে দিদির প্রফেসার ছিলেন। বয়সে খুব বেশী না হলেও বিবাহিত।

মল্লিকা বললো, উনি ট্যাক্সিতে যাচ্ছিলেন আমাকে দেখে একটা লিফট দিতে চাইলেন।

কেয়ার আর কিছু শোনার দরকার নেই। একে বিবাহিত তার ওপরে মাস্টারমশাই। তার সঙ্গে এক ট্যাক্সিতে গেলে দোষের কিছুই থাকতে পারে না। সুব্রতদাকে এই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে, নিশ্চয়ই বুঝবে।

মল্লিকা বললো, অমৃতময় ঘোষকে একদিন আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করবো ভাবছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে তুই বা দাদা কেউ তো সাহিত্যের কোনো খবরই রাখিস না—শেষকালে ওঁর সামনে উল্টো-পাল্টা বলে ফেলবি।

কেয়া মনে মনে বললো, তোর বিয়ের পরে তুই তোর বাড়িতে নেমন্তন্ন করিস না! তখন তো আমরা থাকবো না! তখন তুই একাই তোর ইচ্ছে মতন যত খুশী কথা বলিস!

কেয়া মুখে জিজ্ঞাসা করলো, ওঁর সঙ্গে সুব্রতদার আলাপ আছে?

মল্লিকা গম্ভীরভাবে বললো, উনি যার তার সঙ্গে আলাপ করেন না। জানিস কবিরা কি রকম অসামাজিক হয়!

কেয়া মনে মনে ভাবলো, তাহলে ওরকম অসামাজিক লোকদের সঙ্গে মেশবার দরকারটাই বা কি? শেষ পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন মাস্টারমশাইকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করারও কোনো মানে হয় না।

কেয়া আশা করেছিলো, সুব্রতদা দু'তিন দিনের মধ্যে এ বাড়িতে নিশ্চয়ই এসে পড়বে। সুব্রতদার তো কোনো বাধা নেই। মা-বাবা সবাই চেনেন সুব্রতদাকে, সবাই ওঁকে খুব পছন্দ করেন। দাদার সঙ্গে কি কথা কাটাকাটি হয়েছে বলে এ বাড়িতে সুব্রতদার যাওয়া-আসা বন্ধ করাটা সত্যি অদ্ভুত। দাদা এখন কলকাতায় নেই, অফিসের কাজে দিল্লী গেছে, ফিরতে দেরি আছে। এখন তো সুব্রতদা আসতেই পারে। সামান্য মান-অভিমানের জন্য কি এতদিন না-দেখে থাকা যায়? দিদি একবার একটু বললেই—

দিন চারেক পরে সুব্রতদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কেয়ার। আজও সে কলেজ থেকে ফিরছিলো। উল্টো দিকের ফুটপাথ থেকে হনহন করে হেঁটে এলো সুব্রতদা। গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো, কি খবর কেয়া? কেমন আছো?

সুব্রতদাকে দেখে এত আনন্দ হয়েছে কেয়ার যে প্রথমটায় সে কোনো কথাই বলতে পারলো না। একটা নতুন সানগ্লাস পরেছে সুব্রতদা। এত সুন্দর মানিয়েছে!

কেয়া বললো, ভালো আছি! আপনি আমাদের বাড়িতে আর আসেন না কেন? সুব্রতদা বললে, আমি ক'দিন একটু ব্যস্ত আছি।

—এদিকে কোথায় এসেছিলেন?

—এই এদিকে আমাকে একটা কাজে আসতে হয়।

কেয়া দ্রুত চিন্তা করে নিল, সুব্রতদা কি এখানে প্রায়ই আসে নাকি? দিদিকে এই রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সিতে যেতে দেখেছে?

সুব্রত তার ডান হাতের বইটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, তোমার দিদির এই বইটা ছিলো আমার কাছে। আমার যাওয়া হচ্ছে না বলে ফেরত দেওয়া হচ্ছে না। তুমি দিয়ে দিও তো!

কেয়া আর কথা বলার সময় পেল না। বইটা দিয়েই সুব্রত আবার চলে গেল রাস্তার অন্যদিকে। একটা ট্রাম এসে তাকে আড়াল করে দিল।

কেয়া আর একটু হলেই সুব্রতদাকে চেঁচিয়ে ডাকতে যাচ্ছিলো, কিন্তু লজ্জা পেয়ে থেমে গেল। আর একটু দাঁড়ালো না কেন সুব্রতদা? কেয়ার যে অনেক কথা জিজ্ঞেস করার ছিলো!

কলেজের মেয়ে-সঙ্গীরা কেয়াকে জিজ্ঞেস করলো, ভদ্রলোক কে রে? বেশ হ্যান্ডসাম তো।

কেয়া সংক্ষিপ্তভাবে জানালো, আমার দাদার বন্ধু।

একজন ঠাট্টা করে বললো, ও দাদার বন্ধু! বুঝেছি, বুঝেছি।

কেয়া লজ্জা ও বিরক্তি মিশিয়ে বললো, যাঃ কি বলছিস!

বন্ধুরা বললো, দেখি, কি বই দিয়ে গেল দেখি!

কেয়া বইটা কিছুতেই দেখাবে না। বন্ধুরা কাড়াকাড়ি করতে এলেও সে শক্ত করে ধরে রইলো।

বাড়িতে এসে সদর দরজা বন্ধ করে সেখানে দাঁড়িয়েই বইটার পাতা ওল্টাতে লাগলো। হ্যাঁ, সে যা ভেবেছিলো ঠিকই। ভেতরে একটা চিঠি আছে। বন্ধুরা বইটা একবার দেখতে পেলেই হয়েছিলো আর কি!

কেয়া জানে, চিঠিখানা দিদির জন্য। তবু তার দারুণ ইচ্ছে করতে লাগলো, চিঠিখানা একবার খুলে পড়ে। তার যে অনেক কিছু জানা দরকার। পরের চিঠি পড়া অন্যায়, কেয়া তা জানে, তবু ইচ্ছেটা সামলাতে পারছে না।

চিঠিটা তুলে নিয়ে দেখলো, ভালো করে আঠা দিয়ে জোড়া। জলে ভিজিয়ে খোলা যায় বটে, কিন্তু কেয়া আর সাহস করলো না। একেই তার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে।

ওপরে এসে দেখলো দিদি আর সেদিন বাইরে বেরোয় নি, মন দিয়ে একটা কবিতার বই পড়ছে। কিছুদিন ধরে এই নতুন হুজুগ হয়েছে দিদির।

কেয়া বললো, দিদি, সুব্রতদা তোকে এই বইটা পাঠিয়েছে।

মল্লিকা অন্যমনস্কভাবে বললো, রেখে দে ওখানে।

কেয়া বইটা রাখে নি, বাড়িয়ে ধরে আছে। মল্লিকা অন্য বইটা পড়তে পড়তেই এ বইটা নিয়ে রেখে দিল মাটিতে। তারপর বললো, ঠিক আছে, তুই যা, জামাকাপড় ছেড়ে নে।

কেয়া যেতে পারছে না। দিদিটা কি! বইটা ওরকম অবহেলার সঙ্গে একপাশে রেখে দিল। হঠাৎ যদি মা কিংবা বাবা এসে পড়েন, বইটা দেখার জন্য তুলে নেন?

একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে কেয়া বললো, আজ রাস্তায় সুব্রতদার সঙ্গে দেখা হলো।

মল্লিকা সেই রকমই অন্যমনস্কভাবে বললো, হুঁ।

কবিতার বইতে একেবারে ডুবে আছে মল্লিকা, অন্য কোনো দিকে মনই নেই। খুব বিরক্ত হলো কেয়া। এখন একটুখানি কবিতা-ফবিতা পড়া বন্ধ রেখে একবার এই বইটা উল্টেপাল্টে দেখতে পারছে না দিদি?

মল্লিকা মুখ তুলে একটু ধমকের সুরে বললো, তুই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বললাম না কলেজ থেকে ফিরেছিস, শাড়ি-টাড়ি ছেড়ে নে!

দিদির মেজাজ খারাপ, এখন আর এখানে দাঁড়ানো যাবে না। কেয়া চলে এলো। দরজাটা পার হয়ে একবার পেছন ফিরে তাকাতেই দেখলো, দিদি কবিতার বইটা নামিয়ে রেখে, তাড়াতাড়ি সুব্রতদার বইটা তুলে নিয়ে ফরফর করে পাতা ওল্টাচ্ছে।

মুখখানা হাসিতে ভরে গেল কেয়ার। দিদি এতক্ষণ অন্যমনস্কতার ভান করছিলো। দিদি ঠিকই জানতো, বইটার মধ্যে চিঠি আছে। যাক, সুব্রতদা চিঠি লিখেছে, এবার ওদের সব ঝগড়া মিটে যাবে। দিদি কি করে চিঠির উত্তর দেয়?

শনিবার কলেজ ছুটি হলো দুটোয়। ক্লাসের কয়েকটা মেয়ে দুপুরের শোতে সিনেমা দেখতে যাবে, কেয়াকেও নিয়ে যেতে চায়। কেয়া রাজী হলো না। তার ইচ্ছে করছে না। আসলে বাড়ি ফিরেই তাকে চিঠি লিখতে হবে। কাল সকালেই একটা চিঠি পেয়েছে, এখনো তার উত্তর লেখা হয় নি। দুপুরে উত্তরটা লিখেই, বিকেলবেলা—

কেয়া বাড়ি ফিরলো দুপুরে! বাড়ির সবাই এই সময় ঘুমোচ্ছে। বাবা শনিবার দিন দেরি করে বাড়ি ফেরেন। মা তো দুপুরে ঘুমোবেনই। সারা বাড়িটা ঝিমঝিম করছে।

বসবার ঘরের দরজাটার এক পাল্লা ভেজানো। তার সামনে দিয়ে আসবার সময়ে এক পলকে কেয়া দেখতে পেল, ভেতরে সুব্রতদা আর দিদি। না, ওরা খুব কাছাকাছি বসে নেই, দু'জনে টেবিলের দু'দিকে, কথা বলছে। যাক, সুব্রতদা এসেছে তাহলে!

কেয়া সিঁড়ি দিয়ে চটির শব্দ তুলে ওপরে উঠে গেল। খাটের ওপরে বই খাতা ছুঁড়ে ফেলে চটিজোড়াও ঠেলে দিল যেদিকে সেদিকে। তারপর খালি পায়ে পা টিপে টিপে নেমে এলো নিচে। চোরের মতন দাঁড়িয়ে রইলো বসবার ঘরের দরজার পাশে।

কেয়ার মুখে মিটিমিটি হাসি। যদি হঠাৎ ধরা পড়ে যায়, তাহলে সে বলবে, সুব্রতদা চা খাবে কিনা সেই কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলো। ধরা যাতে না পড়ে সেইজন্য কেয়া নিঃশ্বাসও ফেলছে খুব আস্তে।

ওদের কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কোনো কারণে দু'জনেই উত্তেজিত, আস্তে আস্তে কথা বলার চেষ্টাও নেই।

সুব্রতদা বললে, আমি তোমার জন্য সারাজীবনও অপেক্ষা করতে রাজী আছি। কিন্তু তোমার এমনতর ব্যবহারের কোনো মানে বুঝতে পারছি না।

মল্লিকা বললো, আমি মন ঠিক করে ফেলেছি, আমি এখন বিয়ে করবো না। আমি রিসার্চ করবো।

—আমি কি তোমায় রিসার্চে বাধা দিতে চেয়েছি?

—সে জন্য নয়। আমি বিয়ে করার জন্য মনে মনে এখনও তৈরী হতে পারছি না। বিয়ে করা মানেই কিছু না কিছু দায়িত্ব।

—এ কথাটা তোমার ঠিক কবে থেকে মনে হলো? কিছুদিন আগেই তুমিই তো—

—মানুষের মন বদলাতে পারে না?

—আজকাল অমৃতময় ঘোষের সঙ্গে তোমাকে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। সবাই জানে, ও একটা মাতাল, আর মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ানোই—

—তুমি ওঁর সম্পর্কে কোনো খারাপ কথা বলবে না। আমি ওঁকে শ্রদ্ধা করি—

—শ্রদ্ধা করতে হলে বুঝি সন্ধেবেলা গঙ্গার ধারে বেড়াতে যেতে হয়?

—তুমি কি আমার পেছনে স্পাই লাগাবে নাকি? আমার যা খুশী আমি তাই করবো।

—বুঝেছি। সবই বুঝেছি। তুমি আমাকে আর আসতে বারণ করছো তো?

—মোটেই বারণ করি নি। তুমি যদি বন্ধুভাবে আসতে পারো—ওসব বিয়ে-টিয়ের কথা এখন আর আমি...

কেয়া আর শুনতে পারলো না। আর একটু হলেই সে শব্দ করে কেঁদে উঠতো। ছুটে সে দৌড়ে এলো দোতলায়। নিজের বিছানায় আছড়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। দিদির দুটো কথাই তাকে সবচেয়ে যন্ত্রণা দিয়েছে। দিদি এখন বিয়ে করতে চায় না। আর দিদি একটা বিবাহিত বাজে লোকের সঙ্গে প্রেম করছে। এর চেয়ে সর্বনাশের কথা আর কি হতে পারে।

মল্লিকা খানিকটা বাদে ওপরে এসে যখন কেয়াকে দেখতে গেল, তখনও সে কান্না থামাতে পারে নি।

মল্লিকা কাছে এসে বোনের গায়ে হাত দিয়ে বললো, এই তুই কাঁদছিস কেন?

কেয়া কথা বলতে পারে না। তার কান্নাটা যেন ঠিক অভিমানের নয়, গভীর দুঃখের। সে দুঃখের কথা অন্য কারুকে জানানো যায় না।

—এই কেয়া, কি হয়েছে রে তোর?

—কিছু না, কিছু না!

—কিছু না মানে কি। ওঠ, আমার দিকে তাকা তো।

—দিদি তুই সুব্রতদাকে...অপমান করেছিস...তুই সুব্রতদাকে আসতে বারণ করেছিস।

মল্লিকা একটু থমকে ভুরু কুঁচকে তাকালো। তার দৃষ্টি শাণিত ছুরির মতন ঝকঝকে হয়ে গেল। আক্রমণ-উদ্যত বাঘিনীর মতন সে তার বোনের দিকে চেয়ে রইলো একটুক্ষণ। তারপর তার চুলের মুঠি ধরে মুখটা তুলে তীক্ষ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলো,

তোর কি হয়েছে সত্যি করে বল তো?

ভয়ে কেয়ার মুখটা ছোট হয়ে গেল। সে আর কোনো কথা বলতে পারছে না।

মল্লিকা আবার বললো, সুব্রতদার জন্য তোর এত চিন্তা কেন? ক'দিন ধরেই দেখছি! সুব্রতদা তোকে কিছু বলেছে, তোর সংগে ও কিছু করার চেষ্টা করেছে?

—দিদি না, দিদি না—

—সত্যি করে বল! আমি জানি, ও অনেক মেয়ের সংগেই প্রেম করে বেড়ায়। তোর সংগে ও রাস্তায় দেখা করে কেন?

—আমি জানি না! দিদি, আমি সত্যি বলছি, সুব্রতদা আমাকে কোনোদিন কিছু বলে নি। আমার সংগে যখনই দেখা হয়েছে, শুধু তোমার কথাই বলেছে।

মল্লিকা ছেড়ে দিল কেয়াকে। একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, বুঝেছি! তুই সুব্রতদাকে মনে মনে ভালোবাসিস, তাই না?

—দিদি, কি বলছো! এ কখনো হতে পারে!

—লুকোস নি আমার কাছে। যদি সত্যিই ওকে তুই ভালোবেসে থাকিস, তাতে আমি একটুও রাগ করবো না। আমি নিজেই ব্যবস্থা করে দেবো, যাতে ওর সংগে তোর বিয়ে হয়। আমি ওকে কোনোদিনই বিয়ে করবো না।

কেয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে মল্লিকার পা চেপে ধরে বললো, এই আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, সুব্রতদাকে আমি ঠিক দাদার মতন মনে করি। কোনোদিন ওর সম্পর্কে অন্য রকম কিছু ভাবি নি। কোনো দিন না!

মল্লিকা অনেক জেরা করেও কেয়ার কান্নার কারণ জানতে পারলো না। কেয়ার একটা ভীষণ ভীষণ ভীষণ গোপন কথা আছে, যেটা এবাড়ির কেউ জানে না। এখন সে জানাতেও পারবে না।

কেয়া কাঁদছিল শুধু স্বার্থপর কারণে। কেয়া ভালোবাসে অনীতাপিসির মাসতুতো দেওর অরুণাভকে। যে অরুণাভ খড়্গপুরে ফাইনাল ইয়ারে পড়ে। কেয়ার সব সময় ভয় বাড়ির কেউ বুঝি এ কথাটা জেনে যাবে। অরুণাভের কথা যখনই সে ভাবে, যখনই সে চিঠি লেখে ওকে, তখনই বুকের মধ্যে কি রকম যেন একটা মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে যায়। ভয় হয়, সেই গন্ধটা যদি কেউ টের পেয়ে যায়।

দিদির যদি বিয়ে হয়ে যেত! দিদির বিয়ের পর কেয়ার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলেও অতটা ভয়ের কিছু ছিল না। অরুণাভকেও বাড়ির সবাই পছন্দ করতো। ওরা ঠিক করে নিতে পারতো ওদের ভবিষ্যৎ। কিন্তু দিদির বিয়ে কয়েকবার ঠিক হয়েও হলো না। সুব্রতদার সংগে প্রায় ঠিকঠাক ছিল, আজ তাও—। কেয়া কাঁদবে না!

অরুণাভর মুখের ছবিটা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে কেয়া কাঁদতে লাগলো নিজের দুঃখে।

ফুল ও নারী

—এই, তোরা এই সব ফুল কোথা থেকে পাস রে?

—হাওড়া হাট থেকে। খুব সকালবেলা হাওড়া ব্রীজের নিচে ফুলের হাট বসে।

—সকালবেলা যাস কি করে। এখানেই তো রাত এগারোটা বারোটা পর্যন্ত থাকিস!

—কারবার করতে হলে যেতে হবে না?

—সেই সকালবেলা ফুল কিনিস, আর এত রাত পর্যন্ত টাটকা থাকে?

—তুইও তো মাইরি সন্ধেবেলা সেজেগুজে আসিস। তাহলে এত রাত পর্যন্ত টাটকা থাকিস কি করে?

—আহা, কি কথায় ছিরি! যা জিজ্ঞেস করছি বল না!

—সন্ধের পর কবরখানা থেকেও কিছু ফুল পাই।

—ওমা, তোরা কবরখানা থেকে ফুল আনিস?

—এই দ্যাখ না, এই গোলাপের থোশগুলো আজই পার্ক সার্কাস কবরখানা থেকে এনেছি। ভালো জাতের জিনিস।

—ছি, ছি, তোরা কবরখানার জিনিস লোককে বেচছিস? লোকে এই ফুল নিয়ে শোবার ঘর সাজাবে।

—আহা, তোর দরদ যে উথলে উঠলো দেখছি!

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাফিকের সবুজ আলো আবার লাল হলো। ফুলওয়ালা দীনু দৌড়ে গেল থেমে-থাকা গাড়িগুলোর সামনে। হাতের ফুলের তোড়া দুটো নাচাতে লাগলো এক একটা জানলায়।

বিশেষ কেউ ফুল কিনতে চায় না এই সময়। ক্বচিৎ সিনেমাফেরত দম্পতি কিংবা কুপথযাত্রী মাতাল হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেয়, তাও অনেক দরাদরি করতে হয়।

দীনু রজনীগন্ধা, বেল ফুলের মালা বা গোলাপের তোড়ার দর হাঁকে যা খুশী। দরদাম করতে করতে শেষ পর্যন্ত বারো আনা এক টাকায় নামে। রাত ঘন হয়ে এসেছে, এখন যে-কোনো দাম পেলেই বেচে দেবে।

গাড়িগুলো আবার চলতে শুরু করলে দীনু আবার ফিরে আসে বাস গুমটির নিচে। সেখানে গোলাপি নামের মেয়েটা একটা টুলে বসে পা দোলাচ্ছে।

গোলাপির পরনে একটা সস্তা পাট-সিল্কের শাড়ি, বহুকাল কাচা হয় নি সেটা। সেই রকমই একটা ব্লাউজ। আর একটা রবারের চটি।

গোলাপি জিজ্ঞেস করলো, কি রে একটাও গছাতে পারলি?

দীনু বললো, এক জোড়া গোড়ের মালা গেছে।

—তবে তো কাম ফতে করে এসেছিস।

—আর এই গোলাপের তোড়া দুটো আর তিন ডজন রজনীগন্ধা হলেই—

এই বাস-গুমটিতে বাসযাত্রীরা দাঁড়ায় না। আগে এখানে দুটি ভিখিরি পরিবার মৌরসী পাট্টা গেড়েছিল। তাদের রান্না-বান্না গেরস্থালি সবই চলতো এখানে।

কিছুদিন আগে তাদের উচ্ছেদ করে দিয়েছে রঘুরাম। রঘুরাম পার্ক স্ট্রীট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত ফুটপাথ নিজের দখলে এনে ফেলেছে। এখানে কে থাকবে, কে শোবে, সবই তার নির্দেশে ঠিক হবে। ভিখিরি পরিবার দুটি রঘুরামকে এক পয়সাও দিত না, তাই সে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে এক চা-ওয়ালাকে বসিয়েছে।

চা-ওয়ালার নাম ভিখুরাম। সে অতি নিরীহ মানুষ। কারুর সাতে পাঁচে নেই। চা ও লেড়ো বিস্কুট ছাড়া সে রেখেছে কিছু ছাতু ও কাঁচা লঙ্কা। রিক্‌শাওয়ালা ও মুটেরা এসে খেয়ে যায়। বসবার টুল তার একটাই যখন যে এসে বসে।

একটা কেটলিতে চায়ের জল আর পাতা একসঙ্গে ফুটছে অনেকক্ষণ ধরে। এত রাতে আর খদ্দের পাবার সম্ভাবনা কম।

দুটো লোক পার্ক স্ট্রীট ধরে হেঁটে এসে এদিকের ফুটপথে দাঁড়ালো। প্রথমে মনে হলো, তারা ট্যাক্সি খুঁজছে। কিন্তু ভাবভঙ্গি ঠিক সে রকম নয়। টেরিয়ে টেরিয়ে তাকাচ্ছে এদিকে।

দীনু গোলাপির চোখের দিকে ইশারা করে বললো, যা—

গোলাপি বললো, ধুর! এরা টিকবে না। মাতাল!

—মাতাল তো কী হয়েছে! মাতালরাই পয়সা খসায়।

—না ভাই, বেশী মাতালদের আমার ভয় করে।

—এর মধ্যে আবার ভয়ের কী আছে? ফেল কড়ি মাখো তেল।

লোক দুটো ঘন ঘন এদিকে তাকাচ্ছে বলে গোলাপি টুল ছেড়ে উঠলো। তারপর অলস গমনে লোক দুটির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো। গোলাপির রীতিমতন রোগা চেহারা। ভালো করে খেতে পায় না বলে পাঁজরার হাড় বেরিয়ে গেছে। তবু শাড়ির আঁচল দিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রাখে। আর একটু ঢং করার জন্য দু' হাতে পাকাতে থাকে।

একটি লোক মাথা হেলিয়ে জড়িত গলায় জিজ্ঞেস করে, কি, যাবে?
গোলাপি অন্য দিকে তাকিয়ে বলে, কেন যাবো না।
—কত?
- কতক্ষণ টাইম?
—কত নেবে তাই বলো না?
—কতক্ষণ টাইম তা বলবে তো? সারা রাত না একঘণ্টা।
—ধরো সারা রাত।
—পনেরো টাকা। জায়গা আছে?
—জাহাজ যেতে পারবে? খিদিরপুরে?
—ওরে বাবা, জাহাজে আমি যাবো না।
—কেন, জাহাজে যেতে কি হয়েছে?
—যাবো না বলছি তো।
অপর লোকটি বেশী মাতাল। সে রীতিমতন রাগ করে বললো, কেন যাবি না রে? টাকা দেবো, আলবৎ যাবি!
গোলাপিও রাগ করে বললো, একশো টাকা দিলেও যাবো না। জাহাজে গেলে পাঁচ জনে মিলে ছিঁড়ে খায়।
—এঃ, একশো টাকা! তোর মতন পেত্নীকে কে একশো টাকা দেবে রে?
—দূর হ মুখপোড়া।
চটি ফটাস ফটাস করে গোলাপি আবার ফিরে এলো গুমটিতে। মুখে রাগ নেই, একটু তেতো তেতো ভাব।
দীনু জিজ্ঞেস করলো, কি, হলো না?
গোলাপি মুখ ঝামটা দিয়ে বললো, দূর দূর, ওসব ফোর টুয়েন্টি পার্টি। শুধু শুধু দরদস্তুর করে। একটু ওঠ না, বসতে দে টুলটায়।
—তুই তো একটু আগে বসেছিলি।
—যা, যা, লালবাত্তি, লালবাত্তি।
গাড়িগুলো থেমেছে, দীনুকে আবার ছুটে যেতেই হলো। গোলাপি এ ফাঁকে বসে পড়ল টুলটায়।
চা-ওয়ালা বুড়ো বসে বসে ঢুলছে। এরা না গেলে সে সবকিছু বন্ধটন্ধ করে শুতে পারছে না। যে-চাটা ফুটিয়ে ফেলেছে, সেটা বিক্রি না হলে ঐটুকুই ক্ষতি।
গোলাপি জিজ্ঞেস করলো, কি চাচা, তোমার আর খদ্দের আসবে? ঘুম চোখে চা-ওয়ালা কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু হাতটা তুলে কপালে ছোঁয়ালো। এই ভঙ্গির অনেক রকম মানে হয়। রাত প্রায় বারোটা।
দীনু ফিরে এসে বললো, দূর এ খেপে আমার একটাও গেল না!
—তোর আর বিক্রি হবে না আজ।
—তুই বুঝি এখনও খদ্দের পাবি!
—আলবৎ পাবো। এখন আর এমন কি রাত। এই তো সবে শুরু।
—দ্যাখ না। বৃষ্টি আসছে।
—ওরকম অলুক্ষণে কথা বলবি না!
—যা, এই যে একজন এসেছে। এবার বোধহয় হয়ে যাবে। কলেজের ছেলে মনে হয়।
অদূরে একটি পাতলা ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে। বেশ ফুলবাবুর মতন সাজ। ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।
গোলাপি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ছেলেটি বেশী স্মার্ট হবার চেষ্টা করে বললো, কি গো, চিনতে পারছো?
গোলাপি একগাল হেসে বললো, তা চিনতে পারবুনি কেন? রোজ দেখছি।
—কত নেবে?

—তোমার সঙ্গে আর কি দরাদরি করবো, দশ দিও!
—দশ! পাঁচে হয় না।
—পাঁচ? তাহলে কেল্লার ওপারে হিজড়েদের কাছে যাওনা কেন?
—ঠিক আছে, ঠিক আছে, দশই হবে।
—তোমার জায়গা আছে?
—জায়গা?
—বুঝেছি, জায়গা নেই। ট্যাক্সিতে উঠবে? সে পয়সা আছে তো? না কি ময়দানে যাবে?
—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ময়দানে, ময়দানেই ভালো।
—চলো—
ছেলেটিকে পাশে নিয়ে গোলাপি বড় রাস্তা পার হলো। সবেমাত্র ময়দানের মধ্যে পা দিয়েছে এমন সময় দূরে দেখা গেল একটি পুলিস সেপাইকে।
ছেলেটি অত্যন্ত ভয় পেয়ে কেঁপে উঠে বললে, আমি যাবো না।
গোলাপি তার হাত ধরে বললো, আরে চলো না, ভয় নেই। ও কিছু বলবে না।
ছেলেটি তার হাত ছাড়িয়ে এক ঝটকা দিয়ে পালিয়ে গেল দৌড়ে।
গোলাপি এবার বাস-শুমটিতে ফিরে এসে দেখলো দীনু হ্যা হ্যা করে হাসছে।
—কি হলো রে, মক্কেল গেল?
—চুপ্ মার!
—কি রকম দৌড়ালো মাইরি, ঠিক যেন ইঁদুর।
—বলছি না চুপ কর্।
দীনু হাসি থামলে নিয়ে বললো, সেপাই দু'জন এদিকেই আসছে কিন্তু।
গোলাপি বললো, আসুক না। আজ এক পয়সাও দেবো না। সারাদিনে মোটে তিন টাকা রোজগার হয়েছে। এর থেকে আবার কি দেবো।
সিপাহী দু'জন ওদের ছেড়ে এক বারিওয়ালার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।
দীনু চা-ওয়ালাকে বললো, ও চাচা, তোমার আর খদ্দের আসবে না। দাও, আমাদেরই দু'কাপ চা দাও।
গোলাপি বললো, আমি চা খাবো না। এত রাতে চা খাই না আমি।
দীনু চোখ দিয়ে তাকে এক ধমক দিয়ে বললো, খা না। চা খেলে খিদে মরে। রোজগার করেছিস তো মোটে তিন টাকা।
গোলাপি বললো, আর একটা বড় খদ্দের ধরতে না পারলে—
ঝিরঝির ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামলো। আকাশটা একেবারে গম্ভীর হয়ে আছে, এই বৃষ্টি সহজে থামবে না। এই সময়কার বৃষ্টিটা বড্ড বিচ্ছিরি ব্যবসাপাতি সব নষ্ট করে দেয়।
বৃষ্টি ভিজেই দীনু দু'একবার গেল ফুল বেচতে। কেউ নিল না।
গোলাপিও বৃষ্টি ভিজে কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো ল্যাম্প পোস্টের নিচে। কেউ এলো না। দু'জন লোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, গোলাপি নিজে থেকেই তাদের একটু ইঙ্গিত করাতে তারাই ধমকে দিল ওকে।
ক্রমশ রাস্তা একেবারে জনশূন্য হয়ে এলো। গাড়িও প্রায় নেই। আর অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না।
চায়ের শেষ বিন্দুটুকু তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে দীনু বললো, দূরে শালা, আজ দিনটা বড় লোকসান গেল। তিন ডজন ফুল বিক্রি হলো না...
গোলাপি বললো, ওগুলো তো কবরখানা থেকে চুরি করে এনেছিস, ওর জন্য তো পয়সা খরচ হয় নি।
দীনু বললো, তুই-ও তা হলে মুখ ভার করে আছিস কেন? তোরও তো বিনি পয়সার কারবার। তোকে কি পয়সা খরচা করতে হয়?

গোলাপি মুখ ঝামটা দিয়ে বললো, যা না। দু'বেলা না খেতে পেলে গতরখানা টিকবে কি করে?

—পেয়েছিস তো তিন টাকা।

—তিন টাকায় খাওয়া জোটে! শুধু কি আমার একার, বাড়িতে পাঁচখানা পেট হাঁ করে আছে। কাল রেশন তোলার শেষ দিন। অন্তত সতেরোটা টাকাও যদিও জুটতো।

চল, চল, কালকের চিন্তা কাল হবে।

চা-ওয়ালার কাছ থেকে একটা পুঁটলি চেয়ে এনে গোলাপি চলে গেল একটা পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়িতে। অন্ধকারের মধ্যে বদলে নিল পোশাক। ঝলমলে সিল্কের শাড়ি ব্লাউজ ছেড়ে পরে নিল একটা মলিন সাদা শাড়ি। এ সিল্কের কাপড় পরে তো সে আর বাড়ি ফিরতে পারবে না। ওগুলো জমা থাকে চা-ওয়ালার কাছে। তার বস্তিতে সবাই জানে, সে এক সাহেববাড়িতে আয়ার কাজ করে। তাতেই সম্মানটুকু টিকে থাকে।

চা-ওয়ালা চায়ের পয়সা চাইতেই দীনু একেবারে খেঁকিয়ে ওঠে। ফেলেই তো দিতে, তার আবার দাম কি।

চা-ওয়ালা নিরীহ লোক। তবু সে হাত বাড়িয়ে বলে অন্তত পাঁচটা করে পয়সা দিয়ে যা।

—কাল হবে, কাল হবে।

গোলাপি থাকে বেলেঘাটায়, দীনু পার্ক সার্কাসে। খানিকটা পথ ওরা এক সঙ্গে যাবে। দীনুর দু'হাত ভর্তি ফুল।

গোলাপি জিজ্ঞেস করলো, ফুলগুলো নিয়ে এখন কি করবি?

দীনু অবহেলার সঙ্গে বললো, রজনীগন্ধার ষ্টিকগুলো কালকেও চলে যাবে! কিন্তু গোলাপগুলো তাজা থাকবে না!

—ত ও বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিস কেন?

—কি করবো? ফেলে দেবো? তুই নে না।

—আ মুখপোড়া! ফুল নিয়ে আমি কি করবো? চচ্চড়ি করে খাবো নাকি?

—রান্না করে দ্যাখ না যদি খাওয়া যায়।

—তুই দেখ গে যা!

—খাওয়া গেলে কি আর ফেলতাম? রোজই খেয়ে নিতাম!

রাস্তা ভাগ হয়ে যাচ্ছে, এবার দু'জনকে দু'দিকে যেতে হবে। দীনু জোর করে গোলাপির হাতে ফুলের তোড়াটা দিয়ে বললো, মাইরি, আজ তুই এটা নে--

--ফের ন্যাকড়া করছিস! ফুল নিয়ে কি করবো আমি আর? বাসরঘর সাজাবো? কত সোহাগ!

—তোর যা ইচ্ছে হয় করিস। ফেলে দিতে হয় ফেলে দিস না একটু বাদে।

দীনু আর দাঁড়ালো না, নিজের রাস্তা ধরলো।

ফুলের তোড়াটা হাতে নিয়ে গোলাপিও হাঁটতে লাগলো অন্যদিকে।

গোলাপের গন্ধের ঝাপটা এসে লাগছে ওর নাকে। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে ফুলগুলো ফেলে দিলেই হবে।

এখন পর বর্ণনা দিতে গেলে বলতে হয়, মধ্যরাত্রে ফুলের গুচ্ছ হাতে নিয়ে ঘ্রাণ নিচ্ছে একজন নারী।

হোক না কবরখানা থেকে চুরি করা, তবুও তো ফুল। হোক না, না খেতে পেয়ে দেহ বিক্রি করা একজন রাস্তার মেয়েছেলে। তবুও তো নারী।

জঙ্গলের মধ্যে মধু একা। অথচ সব সময়েই মনে হয় যেন আরও কেউ আছে। জন্তু জানোয়ার আছে, পাখি আছে, গাছের ডাল ভেঙে পড়ে, শুকনো পাতা খসে পড়ে, এ তো জানা কথাই। তবু মাঝে মাঝে কি রকম খুচখাচ শব্দ হয়, মট করে একটা গাছের ডাল-ভাঙার শব্দ হয় আর মধু চমকে চমকে ওঠে।

বা-পায়ের গোড়ালিটা মচকে গেছে, মধু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। একটা সেগুন গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে লাঠি বানিয়েছে। চলার সময় সে নিজেই শব্দ করতে ভয় পায়, খুব সাবধানে পা ফেলে। মাঝে মাঝেই এদিকে ওদিকে তাকায়।

বছর সাতেকের মধ্যে মধু এই জঙ্গলে আর ঢোকে নি। তার আগে এসেছিল হাতি-খেদা দলের সঙ্গে। তখন ছিল প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন লোক। একা একা কেউ এই জঙ্গলে এতদূর আসে না। বিশেষত গত কয়েকদিন ধরে তো কেউ আসতে কিছুতেই সাহস পাচ্ছে না।

মধুর খিদে পেয়েছে। কাল রাত্তির থেকেই কিছু খাওয়া হয় নি। কখন খাওয়া জুটবে কে জানে। এই জঙ্গলে ফলমূল কিছু নেই। মাঝে মাঝে শুধু অসংখ্য থ্যাতলানো বটফল ছড়ানো, ও জিনিস কাকেও খায় না।

একটু সাফ-সুতরো জায়গা দেখে মধু থপাস করে বসে পড়ল। হেলান দিল একটা গরান গাছে। সঙ্গে সঙ্গে শুকনো পাতায় খসখস শব্দ উঠল। ঠিক যেন কেউ আসছে। মধু চমকে, ভয় পেয়ে উঠে পড়তে যেতেই দেখল, মানুষজন নয়, একটা খেড়ে আকারের বেজি। দশ-বারো হাত দূরে ছুঁচোলা মুখ নিয়ে মধুর দিকেই তাকিয়ে আছে।

এটা যদি বেজির বদলে মেঠো ইঁদুর হত, তাহলে মধু দৌড়ে গিয়ে ওটাকে মারার চেষ্টা করত। কিন্তু বেজির মাংস চাঁড়ালেও খায় না। মারাও খুব শক্ত ওগুলোকে।

মধু হুস হুস করে শব্দ করল কয়েকবার। বেজিটা ভয় পায় না। ধারালো চোখে তাকিয়ে থাকে এদিকেই। যা ধার ওদের দাঁতে। যদি কণ্ঠনালিটা একবার কামড়ে ধরে—

মধু মাটির ওপর তার হাতের লাঠিটা আছড়াতে লাগল। তাতেও ফল না হওয়ায় একটা টুকরো পাথর ছুঁড়ে মারল বেজিটার দিকে। সেটা এবার মন্থর গতিতে ঢুকে গেল ঝোপের মধ্যে।

তখন মধুর মাথায় আর একটা নতুন চিন্তা এল। বেজিটা এদিকে আসতে চাইছিল মনে হয়। তার মানে, কাছাকাছি কোথাও সাপ থাকতে পারে। সাপের খোঁজ পেয়েছে বোধহয়।

মধু শরীর মুচড়ে এদিক ওদিক দেখে নিল ভাল করে। গরান গাছটায় একটা বড় ফোকর আছে, সেটাই যেন সন্দেহজনক। এই শালা সাপকেই বেশী ভয়। এ জঙ্গলে বাঘ-টাঘ আর তেমন নেই। কচিৎ দু-একটা বেরোয়। চিতা দেখতে পাওয়া যায় মাঝে-সাঝে। ভাল্লুকও অনেক কমে গেছে। থাকার মধ্যে আছে বেশ কিছু হাতি। তা হাতিকে তো ভয় পাওয়ার সেরকম কিছু নেই, খালি কয়েকদিন হলো একটা হাতি গুণ্ডা হয়েছে।

গত সপ্তাহে গোটা পাঁচেক হাতি ঢুকে পড়েছিল পাশের গাঁয়ের ধানক্ষেতে। গাঁয়ের লোকেরা জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে ছুঁড়ে সেগুলোকে তাড়ায়। একটা দাঁতাল যখন ঘর-বাড়ি ভাঙতে আসে, তখন সেটার গায়ে ছুঁড়ে মারা হয়েছিল একটিন কেরোসিন। তারপর মশালের আগুন লাগতেই...। হাতিটা মরলে ভাল ছিল, তার বদলে সাংঘাতিক জখম হয়ে পালিয়েছে। এখন সেটার সামনে পড়লে—তা হোক, মধু ভাবল, এখন জন্তু জানোয়ারের চেয়ে মানুষকেই তার বেশী ভয়। জন্তু জানোয়ারের সামনে পড়লে তবু পালাবার রাস্তা আছে, কিন্তু গাঁয়ের মানুষ তাকে দেখলে আর আস্ত রাখবে না। অন্তত চার-পাঁচদিন এই জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে, তারপর জঙ্গল পেরিয়ে রেল স্টেশনে পৌঁছাতে পারলে...। গোটা চোদ্দ-পনেরো টাকা আছে মধুর কাছে।

পরশুই তার এই সর্বনাশটা হল।

পরীর সঙ্গে তার সব কিছু চুকে-বুকে গিয়েছিল। পরীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল মধু। মেয়েটার স্বাস্থ্যটাস্থ্য ভাল, ক্ষেতির কাজকর্ম করতে পারবে। কিন্তু পরীর বাবা দর হাঁকলে দুশো টাকা। তাছাড়া একটা বলদ, এক জোড়া ছাগল আর দশখানা কাপড়। এত টাকা মধু কোথায় পাবে, তার কি বিলেতে জমিদারি আছে! পরীর বাপকে সে শুনিয়ে দিয়ে এসেছিল, ওর আদ্দেক টাকায় সে পরীর চেয়ে ঢের ভাল মেয়ে পাবে।

বাঁকাবাবুর শ্রাদ্ধের সময় যখন খুব বড় ভোজ হয়েছিল, সেখানে সেই সময় পরী মধুকে আলাদা পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কি গো, টাকা যোগাড় করতে পারলে না? কি রকম মরদ তুমি?

পরীর বাবার কাছে যেমন মেজাজ দেখিয়েছিল, সেরকম সুরে এখানে কথা বলতে পারল না মধু। বেশ নরম করে বলল, আর একটা বছর দেরি করতে পারবি না? এবার তামাক পাতা লাগিয়েছি। যদি পোকা না লাগে—

পাতলা ঠোঁটে ফাজিল হেসে পরী বলেছিল, কি করে দেরি করবে আমার বাপ! অনেক লোক যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে সাধছে।

মধু বলল, তোর বাপ টাকা চায়, আর তুই কিছু চাস না?

পরী কি এক অনির্দিষ্ট কারণে তক্ষুনি তার চুলে বেণী পাকাতে শুরু করে এবং মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে বলে, টাকা পয়সা যোগাড় করবার সামর্থ্য যার নেই, সেরকম কোনো হাড় হা-ভাতের ঘরে আমি যাব নাকি?

এই কথায় দপ করে জ্বলে ওঠে মধু। অত্যন্ত শুদ্ধ ভাষায় বলে, তোর এত টাকার লালসা, তুই শেষ পর্যন্ত কোনো ধনী লোক শ্বেতকুষ্ঠীর ঘরে গিয়ে পড়বি।

এর পর মধু আর পরীর মুখ দেখতে চায় নি। পরীর বিয়ে হয়ে গেল দেড় মাসের মধ্যে, স্বামীর সঙ্গে চলে গেল সঙ্কোষের দিকে এক চা বাগানে।

বিয়ে করার জন্য মধু একশো দশ টাকা জমিয়েছিল, তাই দিয়ে এক জোড়া ছাগল কিনে ফেলল। মাস আষ্টেক বাদে সেই ছাগল জোড়ার বাচ্চা হল তিনটে, পরের হাটে সবশুদ্ধ দেড়শো টাকায় বেচে বেশ খুশি হয়ে গেল মধু।

বছর চারেক বাদে পরী ফিরে এল বাপের ঘরে। তার কোনো সন্তান বাঁচে না। পেট থেকে বাচ্চা বেরিয়ে দু-চারবার হাত পা ছুঁড়েই মরে যায়। পর পর তিনবার। পরীর বড় মন খারাপ।

হঠাৎ একদিন তামাক ক্ষেতের ধারে পরীর সঙ্গে দেখা মধুর। মধু নালা থেকে পাঁক তুলে আনছিল কোদালে, তার ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে পরী, মুখখানা শুকনো, চোখ দুটো কি রকম যেন ভাসা ভাসা।

মুখ তুলে হঠাৎ পরীকে দেখতে পেয়ে খুবই চমকে গিয়েছিল মধু। এ মেয়েটা যেন তার চেনা কেউ নয়। সেই যে রথের মেলায় একবার ক্ষুদির মায়ের ওপর যখন ভর হয়েছিল, তখন তার চোখ মুখের অবস্থা যে রকম হয়েছিল, পরীরও যেন ঠিক সেই রকম। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কি রে, পরী?

পরী খুব ম্লান গলায় বলল, মধু, তুই আমার সর্বনাশ করে দিলি!

আমি? আমি কি করেছি তোর?

তুই আমাকে সুখে থাকতে দিলি না।

নালা থেকে ওপরে উঠে এল মধু। হাত দুটোতে কাদা মাখা, সেই হাত কচলাতে কচলাতে খুব কাঁচুমাচু গলায় বলল, পরী, আমি তো কখনও তোর ক্ষতি করি নি। আমি গরীব, সেই গরীবই রয়ে গেছি, আমাকে বিয়ে করলে তোকে অনেক কষ্ট করতে হত। কিন্তু তোর তো ঠিকাদারের সঙ্গে—

তুই আমায় শাপমান্যি করেছিলি, তুই বলেছিলি আমার স্বামীর শ্বেতকুষ্ঠী হবে।

সে তো কথার কথা। ঠিকেদারবাবুর তো সে রোগ নেই।

আছে, গোপনে আছে।

আমার মুখের কথায় কিছু হয় না রে পরী। আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমি কি সত্যিই তোর ক্ষতি চেয়েছিলাম?

প্রতি বছর আমার বাচ্চা হয়ে মরে যায়।

তেতোর চা বাগানে ডাক্তার নেই? ঠিকেদারবাবুর অনেক পয়সা—

কোনো চিকিৎসাতেই কিছু হয় না।

মধু খুব দুঃখিত বোধ করছিল পরীর জন্য, সেই সময়েই পরীর চোখ দুটো হঠাৎ চকচক করে উঠল। খপ করে মধুর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, হারামজাদা, তুই আমাকে মা হতে দিবি না? এত হিংসে ভরা মন তোর?

এরপর থেকে পথেঘাটে লোকজন দেখলেই পরী ডেকে ডেকে শোনাতে লাগল, মধুর শাপমন্যির জন্যই তার ছেলেপুলে বাঁচে না। কথাটা অনেকে বিশ্বাস করে ফেলে, মধুর দিকে আড়চোখে তাকায়। মধু বেচারা পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

তারপর মধু পরশু রাত্তিরবেলা ধরা পড়ল পরীর ঘরে। ঠিকাদারবাবু হঠাৎ রাত দুপুরে এসে উপস্থিত। বেচারা মধুর দোষ কি, পরীর মুখের কথা বন্ধ করতে হলে তাকে তো পরীর সঙ্গেই ভাব করতে হবে।

মধু এসে পরীর হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে বলেছিল, আর আমার দুর্নাম ছড়াস নি! ছোট ছেলেরা আমাকে দেখলে দূরে সরে যায়—

পরী বলেছিল, আমি যদি কখনও মা হই, তাহলে তোর দুর্নাম কেটে যাবে। আমি তো মা হব না, আমার বরের শ্বেতকুষ্ঠী—

মধুর বড় ধর্মভয়। সেও মা মরা ছেলে: মা শেতলার কাছে মানত করে তার বাপ তাকে বাঁচিয়েছে ছেলেবেলায়। অধর্মের কথা শুনলে তার বুক কাঁপে। পরীর কথায় প্রথমে সে রাজি হয় নি, তারপর একদিন, দুদিন, তিনদিন—। ঠিকাদারবাবু অতি ধূর্ত লোক। বনবিড়ালের মতন কখন নিঃশব্দে হাজির হয়েছে। পাকা খবর নিয়েই এসেছে। এসব খবর হাওয়ায় ওড়ে।

একে তো মধুর নামে শাপমন্যির বদনাম, তারপর ঠিকেদার যদি তাকে পঞ্চায়েতের সামনে দাঁড় করায়, তাহলে আর বাঁচার আশা নেই। মারের চোটেই শেষ করে দেবে। মধু মাত্র দু-এক মুহূর্ত চিন্তা করেছে, তারপর দরজার খিলটা হ্যাঁচকায় খুলে নিয়ে সোজা বসিয়ে দিয়েছে ঠিকেদারবাবুর মাথায়। আর কোনোদিকে চায় নি, লাগিয়েছে এক দৌড়।

মারটা একটু জোরেই হয়ে গিয়েছিল। খানিকদূর দৌড়ে আসার পর মধুর মনে হয়েছিল, সে কি ঠিকেদারবাবুকে মেরেই ফেললে নাকি? ভাবতে গিয়েই তার পা দুটো অসাড় হয়ে যায়। তার তামাকের ক্ষেতে কচি চারা আসছে, তার ঘরে এবছরই নতুন খড়ের ছাউনি লাগিয়েছে, দর্জির কাছে বানাতে দিয়েছিল একটা ছিটের জামা, সবই পড়ে রইল। মধু দৌড়োতে দৌড়োতে এসে ঢুকল জঙ্গলে।

গরান গাছে হেলান দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল মধু। জেগে উঠে পেটটা চেপে ধরল খিদেতে পেটের মধ্যে যেন দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। পকেটে রয়ে গেছে পাঁচ ছটা বিড়ি, কিন্তু দৌড়োবার সময় দেশলাইটা যেন কোথায় পড়ে গেছে। পকেটে বিড়ি থাকতেও টানার উপায় নেই। এমন কি তার পকেটে বারো চোদ্দটা টাকা আছে, তবু তাকে খিদেতে মরতে হচ্ছে, এ এক আজব কথা না! তাহলে টাকা পয়সার মানমর্যাদা কোথায় রইল? বসে থাকতেও ভাল লাগে না, হাঁটতেও ভাল লাগে না। তবু মধু উঠে হাঁটতে আরম্ভ করল।

খানিকটা যাবার পরই সে স্পষ্ট শুনতে পেল পায়ের আওয়াজ। এ মানুষের ছাড়া তো হতে পারে না। মধু দ্রুত ঢুকে পড়ল একটা ঝোপের মধ্যে। ফরেস্ট গার্ডরা মাঝে মাঝে আসে এদিকে। কেউ চুরি করে কাঠ কাটছে কিনা দেখতে, কিংবা ঘুষ নিতে। গুণ্ডা হাতিটাকে মারার জন্যও শিকারী আসবে। কিন্তু সেই সব শিকারীও তো এত গভীর জঙ্গলে ঢুকবে না।

সতর্ক চোখ মেলে বসে রইল মধু। খানিকটা বাদে দেখতে পেলে তার চেয়েও বেশি ভয়ে ভয়ে দুটি ছেলে এদিকেই যেন আসছে। বাবুর মতন চেহারা। উস্কখুস্ক চুল, ছেঁড়া জামা, তবু মুখ দেখলেই বাবুর জাত চেনা যায়।

মধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। চিনতে অসুবিধে হয় না। এরা পলিটিকসের বাবু। বোমা-বন্দুকের কারবার করে। একসময় এনারা পুলিশের ওপর টেক্কা দিয়েছিল, এখন পুলিশ আবার এনাদের ওপর টেক্কা দিচ্ছে।

মধু প্রথমেই দেখতে চাইল, বাবুদের কাছে কোনো খাবার আছে কিনা। কিন্তু ওদেরও হাত খালি। সঙ্গে কোনো ঝোলাঝুলিও নেই। মধু নিরাশ হয়ে গেল। খাবার থাকলে সে বাবুদের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসত।

ছেলে দুটি এগিয়ে এসে সেই গরান গাছটাতেই হেলান দিয়ে বসল, যেখানে একটু আগে মধু বসে ছিল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল।

ওদের মধ্যে একজন বলল, পাগলা হাতি সবসময় একা আসে না রে?

আরেকজন ক্লান্তভাবে বলল, কি জানি!

তারপর সে ঘুমোবার জন্য গা-টা এলিয়ে দিল।

মধু ঝোপ থেকে বেরুবে কি বেরুবে না, দোনামোনা করছিল। পরের মুহূর্তেই সে লাফিয়ে উঠল। শুয়ে থাকা ছেলেটিও স্প্রিং-এর মতন লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বলল, উঃ মরে গেলাম, মরে গেলাম! কিসে কামড়াল আমাকে—

বুঝতে মধুর এক মুহূর্তেও ভুল হয় নি যে ছেলেটিকে সাপে কেটেছে। ঠিক ঐ জায়গায় মধুও শুয়ে ছিল। তাকেও তো কামড়াতে পারত। মা মনসা এত দয়া করলেন কেন তাকে?

অন্য ছেলেটি ঝুঁকে পড়ে বলল, কি হয়েছে রে? এত চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?

অন্য ছেলেটা শুধু বলল, মরে গেলাম, ভীষণ জ্বালা—

এই সময় মধু বেরিয়ে এল বাইরে। সুস্থ ছেলেটি তার দিকে ভয়চকিতভাবে তাকাতেই হাতজোড় করে বলল, আমি গাঁয়ের লোক, কাঠ কুড়োতে এসেছি। তারপর সে অন্য যুবকটির পা দু'খানা ধরে হেঁচড়ে টেনে আনতে আনতে বলল, আপনিও সরে আসুন, ওখানে সাপ আছে।

সাপটাকে দেখা গেল না। গাছের কোটরে উঁকি মারার সাহস কারুর নেই। মধু দাঁতের দাগ পরীক্ষা করেই বুঝল, মারাত্মক বিষধর সাপ।

সাপটা কামড়েছে ছেলেটির ঘাড়ে। ছেলেটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। কি করবে, বুঝতে পারছে না। বিড়বিড় করে বলল, দড়ি দরকার, দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে না?

মধুর মনে পড়ল, মা মনসার গান—'শিরে কৈল সর্পাঘাত, তাগা বাঁধবি কোথা!' এ বিষ তো এক্ষুনি মাথায় উঠে যাবে। আর পনেরো মিনিটের বেশি আয়ু আছে কি না সন্দেহ।

মধু মাটিতে একদলা থুতু ফেলল শব্দ করে। তারপর মস্ত বড় হাঁ করে অন্য ছেলেটিকে বলল, বাবু, দেখুন তো আমার মুখে কোন ঘা আছে কি না?

ছেলেটি বলল, কেন?

দেখুন না!

না। দেখতে পাচ্ছি না।

আপনার কাছে ছুরি আছে?

ছেলেটি পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে দিতেই মধু সেটা দিয়ে সাপেকাটা ছেলেটির ঘাড়ের কাছটা চিরে দিল খানিকটা। তারপর হিংস্র জানোয়ারের মতন, সে ছেলেটির ঘাড়ে মুখ দিয়ে রক্ত শুষতে লাগল।

এক একবার মুখ ভরে রক্ত নেয় আর থুঃ থুঃ করে মাটিতে ছেটায়। অন্য ছেলেটি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে।

সাপে কাটা ছেলেটির মুখ মাটির দিকে। শরীরের কোনো সাড় নেই। মধু পাগলের

মতন এক একবার তার ঘাড় থেকে রক্ত শুষছে আর মাটিতে ফেলছে। এর মধ্যে তার বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছে সব সময়। যদি তার নিজের মুখে একটুও কাটা-ছেঁড়া থাকে, তাহলে সে নিজে আর বাঁচবে না।

প্রায় আধঘন্টা ধরে চলল এইরকম। তারপর মধু একটু পাশে সরে গিয়ে বমি করল। গলায় আঙুল দিয়ে নিজেই বমি করতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। না খেতে পাওয়া খালি, পেটে কত আর বমি হবে। ফিরে এসে সে উল্টে দিল ছেলেটিকে। চোখের পাতা টেনে দেখল। হাত রাখল নাকের কাছে।

অন্য ছেলেটি ব্যস্তভাবে ডাকল, অজয়, অজয়!

ছেলেটি ক্ষীণভাবে উত্তর দিল, কি!

মধু তিড়িং করে লাফ দিয়ে উঠে বলল, বেঁচে গেছে!

লাফ দেবার পরেই মধু মাথা ঘুরে পড়ে গেল। সে ভয় পেয়ে মাটি আঁকড়ে ধরল। সে ঝাপসা চোখে বলার চেষ্টা করল, আমি মরতে চাই না। সমস্ত আকাশ ও মাটি দুলে দুলে যেন তাকে গড়িয়ে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে। সে কাতর গলায় বলতে চাইল, ওগো, তোমরা আমাকে ফেলে দিও না।

একটু বাদেই মধু ধাতস্থ হল। সাপের বিষ তার শরীরে ঢোকে নি। ক্ষুধার্ত শরীরে হঠাৎ লাফ দেওয়ায় তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল শুধু।

মধু আবার উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, বাবু, আপনি এখানে থাকুন। আমি এনার জন্য জল নিয়ে আসি।

কয়েক পা গিয়ে মধু আবার ফিরে এল। লজ্জিতভাবে বলল, বাবু, আপনার দেশলাইটা দেবেন, আমি একটা বিড়ি খাব।

ছেলেটি সিগারেট দিতে চেয়েছিল, মধু তা নিল না। একটু সরে এসে বিড়ি ধরাল। বড় আরাম লাগল। না খেয়ে তবু থাকা যায়, কিন্তু নেশার জিনিস না পেলে কি চলে। বিড়িতে দু-একটা টান দিতেই বেশ মাথাটা পরিষ্কার লাগে।

মধু জানে, কোথায় জল আছে। সকালেই দেখে এসেছে। আস্তে আস্তে সেখানে এসে দাঁড়ায়। একটা নোংরা জলের ডোবা। একবার সতর্ক দৃষ্টি চালিয়ে দেখে নেয় কাছাকাছি কোন জন্তু জানোয়ার আছে কিনা।

মধু হাঁটু গেড়ে বসল ডোবাটার কাছে। নিচু হয়ে এক আঁজলা জল তুলল। তারপর আবার সোজা হতেই অদ্ভুত এক অনুভূতি হল তার। যেন তার শরীরের মধ্যে একটা কোলাহল পড়ে গেছে। কি সব যেন ছোটাছুটি করছে তার রক্তের মধ্যে। মধু বুঝতে পারল, এর নাম আনন্দ। এ রকম আনন্দ সে জীবনে কখনো বোধ করে নি। সে একজনের প্রাণ বাঁচিয়েছে। একজন, যে নিশ্চিত মরে যাচ্ছিল, তাকে মধুই বাঁচিয়েছে। তার ভেতরের এই আনন্দ যেন তার শরীর ফেটে বেরিয়ে আসবে।

অঞ্জলি ভরা জল নিয়ে মধু ওপরের দিকে তাকাল। এক চিলতে মাত্র আকাশ দেখা যায়। জঙ্গলের মধ্যে একটা অন্ধকার অন্ধকার ভাব। সমস্ত গাছপালা যেন তাকেই লক্ষ্য করছে।

মধু কাঁদতে লাগল নিঃশব্দে। তার চোখের জলের ফোঁটা পড়তে লাগল তার হাতের জলে। কোন্ এক অদৃশ্য কর্তৃপক্ষকে সে মনে মনে জিজ্ঞেস করল, আমি ঠিকেদারবাবুকে রাগের মাথায় মেরেছি। তার বদলে আমি আর একজনের প্রাণ বাঁচালাম। এজন্য কি আমি ক্ষমা পাব না?

কেউ উত্তর দিল না মধুকে।

ইরফান আলি দু'নম্বর

সূর্য ওঠবার আগেই কাছাকাছি পাঁচখানা গ্রামের জোয়ান-মদ্দরা সবাই ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। বাবলা গাছের ডাল ভেঙে দাঁত-খড়ি করে বাড়ির কাছাকাছি পুকুরে বা ডোবায় একসঙ্গে মুখ ধুয়ে স্নান করে নিয়েছে। জলখাবার বা নাস্তা সেরেছে দু'মুঠো মুড়ি বা একমুঠো পান্তা দিয়ে। তার পরই দৌড় মেরেছে।

প্রত্যেকদিন ভোরবেলা দেখা যায় কাতারে কাতারে মানুষ ছুটছে হাতিপোতা বাঁধের দিকে। মাঠ ভেঙে, আলের পথে পথে সারবন্দী মানুষ। এ ওর আগে গিয়ে পৌঁছতে চায়। দৌড়োদৌড়ি করে এসেও দেখে তারও আগে আরো অনেক মানুষ পৌঁছে গেছে।

প্রায় হাজার খানেক পুরুষমানুষ হাতিপোতা বাঁধের সামনে দাঁড়িয়ে কাদার মধ্যে ঠ্যাসাঠেলি করে। এখনো ভালো করে আলো ফোটে নি। বিড়ির গন্ধে ম-ম ক'রে হাওয়া।

কাদার মধ্যেই বাঁশ পুঁতে বসানো হয়েছে গেট। তার ওপাশে সারি সারি তাঁবু। ঐ সব তাঁবু থেকেও কুলি-কামিনরা বেরিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। ওরা সব 'পারমেন্ট'—ওদের মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট জন মেয়েও আছে। কালো চকচকে চেহারার স্ত্রীলোকেরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে আড়মোড়া ভাঙে—বাঁশের গেটের একপাশ থেকে হাজার খানেক পুরুষের চোখ পড়ে সেদিকে। সবচেয়ে বড় তাঁবুটায় থাকে পুলিসরা। একবার হঠাৎ লাঠালাঠি শুরু হওয়ার পর সেই যে পুলিস এসেছিল আর যায় নি।

বাঁধ কাটার কাজ শুরু হয়েছে তিন সপ্তাহ ধরে। সরকারী ঠিকাদার নিজস্ব কুলি-কামিন আর যন্ত্রপাতি এনে তাঁবু ফেলেছিল। কাজ শেষ হতে অন্তত ছ'মাসের ধাক্কা। তাই সব কিছুরই পাকাপাকি বন্দোবস্ত।

সপ্তাহখানেক বাদেই এম এল এ ছোটফণীবাবু একদল লোক সঙ্গে করে নিয়ে এসে কাজ আটকে দিলেন। গ্রামের মানুষের মধ্যে এখন আকালের হাহাকার—মাটি কাটার কাজ স্থানীয় লোকদের দিতে হবে। বাইরে থেকে লোক আনা চলবে না।

শুরু হল দাঙ্গাহাঙ্গামা আর থানা-পুলিস। তারপর এক মন্ত্রী এসে মিটমাট করে দিলেন। ঠিকাদারের নিজস্ব লোক থাকবে অর্ধেক, আর বাকি অর্ধেক নেওয়া হবে স্থানীয় লোকদের মধ্যে থেকে জনমজুর হিসেবে।

প্রত্যেকদিন শ' দেড়েক লোককে নেওয়া হয়। হিসেব বড় জটিল। হাজার খানেক লোকের মধ্যে শ' দেড়েক লোক বেছে নেওয়া। অথচ সবাইকেই সুযোগ দেওয়া দরকার। তাই মস্তবড় একটা খাতায় সবার নাম লেখা আছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নাম ডাকা হয়। গাঁয়ের লোকেরা কিছুই বুঝে উঠতে পারে না—কোনদিন কার ডাক পড়বে। তাই আশায় আশায় প্রত্যেকদিনই আসে সবাই। সাড়ে তিনটাকা রোজ—আর দুপুরে পাঁচখানা করে রুটি ও এক-টুকরো গুড়। টাকার হিসেব পরে—দুপুরে ঐ রুটি-গুড়ের লোভেই জিভ শকশক করে ওঠা।

হঠাৎ একটা শোরগোল পড়ে গেল। এসে গেছে আজকের দিনটির ভাগ্যবিচারক—মস্তবড় খাতাটা হাতে নিয়ে ঘোষবাবু আসছেন। ঘোষবাবুর চোখ দুটো ঘুমে এখনো ঢুলুঢুলু, প্যান্টলুন পরা থাকলেও খালি গা—বুকে ঘন রোমের বন-জঙ্গল।

গত বছরেও ঘোষবাবু এই সব গেঁয়ো লোকগুলোর সঙ্গে তুইতোকারি করে কথা বলতেন। হারামজাদা—শুয়োরের বাচ্চা ছিল তাঁর জিভে জল। বহুকাল ধরে এসব কাজ করেছেন, তিনি জানেন গালাগালি দিয়ে কথা না বললে এই লোকগুলো কিছু বোঝে না। কিন্তু এখন দিনকাল পাল্টে গেছে।

ঘোষবাবু মস্ত বড় একটা হাই তুললেন। তারপর হঠাৎ ব্যঙ্গের সুরে বললেন, ভাই সব! কেউ কোনো গোলমাল করবে না। আমি নাম ডাকলে একে একে ঢুকবে। পর পর দু'দিন কেউ কাজ পাবে না—এটা মনে রেখো।

কলগুঞ্জন এক মুহূর্তের জন্য থেমে আবার শুরু হয়। ঘোষবাবুকে ক্রমশ গলা চড়াতে হয়।

রাঘবগঞ্জের কালু শেখ!
হারাণ মণ্ডল!
দিগম্বর দাঁ!
যতীন সাঁপুই!
আশাভান চৌধুরী!
আসলাম মোল্লা......
এবার পোড়া বিশলাইপুর—কার্তিক হাজরা
রসুল মোল্লা......

ক্রমে ক্রমে পাঁচখানা গাঁয়ের নাম ডাকা শেষ হয়। তারপর ঘোষবাবু যেই ধপাস করে খাতাখানা বন্ধ করেন, অমনি বাকি লোকগুলোর বুকের মধ্যে ধড়াস করে ওঠে। আজ আর হল না! পাঁচখানা রুটি গুড়, করকরে সাড়ে তিন টাকা!

ইরফান আলি দাঁড়িয়ে ছিল ঘোষবাবুর কাছেই। সে একেবারে হামলে পড়ল, বড়বাবু, আমার?

ঘোষবাবু বললেন, আজ আর হবে না। আবার কাল!

ইরফানের সঙ্গে আরও সাত আট জন এগিয়ে এসে বলল, আমরা গত হপ্তায় একদিনও কাজ পাই নি!

তারা হিসেব না বুঝলেও এটুকু বোঝে, সাতদিনের মধ্যে তারা একদিনও কাজ পায় নি—কিন্তু অনেকে দু'তিন দিন পেয়েছে। এটা অন্যায় নয়?

তারা গোলমাল শুরু করতে ঘোষবাবু বললেন, দাঁড়াও বাবা, দাঁড়াও! আবার সবার নাম চেক করতে হবে, এ কি সোজা কথা! দেখি ব্যবস্থা হয় কি না!

ওদের জনকয়েককে গেটের ভেতরে ঢুকিয়ে এনে ঘোষবাবু বললেন, বাকি সবাই চলে যাও! চলে যাও! ছোটফলীবাবু গেটের সামনে ভিড় করতে মানা করেছেন!

ঘোষবাবু অভিজ্ঞ লোক। দেড়শো জন লোক নেওয়া হবে—তিনি প্রত্যেকদিন একশো তিরিশ জনের বেশী নাম ডাকেন না। কে আর গুণে গুণে মিলিয়ে দেখছে। এইসব লোকগুলো বুঝুক না বুঝুক গোলমাল করবেই। তাই কুড়িটা নাম তিনি হাতে রেখে দেন। পরে তিনি এমন ভাব দেখান যে, তাঁর দয়াতেই বাকি কুড়িজনের কাজ হল সেদিনকার মতন। এতে সুনাম হয় তাঁর। এই লোকগুলো হাতে থাকে।

ঘোষবাবু এবার একটা টুল নিয়ে বসেন। কাছের তাঁবু থেকে একজন কামিন এসে তাঁকে এক কাপ চা দিয়ে যায়। আদিবাসী রমণীদের তেল চকচকে শরীরে চোখের দৃষ্টি যেন পিছলে পড়ে।

ঘোষবাবু চায়ে চুমুক দিতে দিতে মনোযোগ দিয়ে খাতা পরীক্ষা করেন। মাথা নেড়ে বলেন, উঁহু, এ নাম তো নেই—আপিস থেকে যদি ভুল করো তো আমি কি করব বলো!

তবু এক একে তিনি কয়েকজনের ব্যবস্থা করে দেন। তারা কৃতজ্ঞতায় একেবারে মাটিতে মিশে যায়।

সকলেরই হয়, শুধু ইরফান আলির হয় না। ঘোষবাবু তাকে খেঁকিয়ে বলেন, তোমার আবার কি চাই! এই তো একজন ইরফান আলি—তার কাজ হয়ে গেছে। তুমি আবার কে?

ইরফান হাউমাউ করে বলে, বড়বাবু, সে তো হল গে ইরফান আলি এক নম্বর, আমি দু'নম্বর!

—এক নম্বর দু'নম্বর আবার কি!

তখন আর পাঁচজন সাক্ষী দিল, এক গাঁয়ে দু'জন ইরফান আলি আছে বলে ওদের এক নম্বর, দু'নম্বর বলে লোকে ডাকে। দ্বিতীয় ইরফান আলির নামই অনেকে বলে না, শুধু বলে দু'নম্বর।

ঘোষবাবু দু'নম্বর ইরফান আলির আপাদমস্তক দেখলেন। রোগা ডিগডিগে চেহারা, থুতনিতে রুখু দাড়ি, চোখে সব সময় একটা ভীতু ভীতু ভাব। কোনো রকমে বেঁচে থাকা একজন মানুষ। ঘোষবাবুর কড়া দৃষ্টির সামনে সে প্রায় কুঁকড়ে গিয়ে হাত কচলাচ্ছে।

ঘোষবাবুর একটি কথার ওপর নির্ভর করছে তার পরিবারের পাঁচজন লোকের জন্য দু'মুঠো ভাত—তার নিজের জন্য পাঁচখানা রুটি।

ঘোষবাবুর সেই চেয়ে থাকা যেন অনন্ত সময়ের জন্য। একটা কিছু মীমাংসা হবার আগেই ইরফান আলি দু'নম্বরের সারা জীবনটাই কেটে যাবে। সোঁক ঘোষবাবুর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে!

ঘোষবাবু বললেন, ঠিক আছে, যাও কাজে লেগে যাও! নমটা বদলাতে পার না!

ইরফান আলি দু'নম্বর অতি ব্যস্ত হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য ঘোষবাবুর পায়ে হাত দিতে গিয়ে চায়ের কাপটাই উল্টে দিল। নরম মাটিতে পড়ে কাপটা ভাঙল না বটে, কিন্তু ইরফান আলি ভয়ে আধখানা হয়ে গেল একেবারে। সব কাজেই সে একটা কিছু গন্ডগোল করে ফেলে। খোদাতাল্লা যে কেন তাকে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন কে জানে!

অন্য যারা কাজের আশায় দাঁড়িয়েছিল, তারাই খেঁকিয়ে উঠল ইরফানের ওপর।

ঘোষবাবু কিন্তু রাগ করলেন না। একটা মজা পেয়ে গেলেন হঠাৎ। হাসতে হাসতে বললেন, সাধে কি আর ওর নাম দু'নম্বর রেখেছে। এ কোনোদিনই এক নম্বর হতে পারবে না।

ইরফান হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘোষবাবু বললেন, যাও কাজে লাগ গে!

এরপর আর কৃতজ্ঞতা জানাবার নতুন কোনো প্রচেষ্টা সম্ভব নয়। তাই সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল খাকি রঙের তাঁবুটার দিকে। এখান থেকে বলে দেবে, কাকে কোন সেকটরে কাজ করতে হবে—কোদাল গাঁইতি ঝোড়াও মিলবে এখানে।

ঘোষবাবুর কাছে সে একটা বেয়াকুবি করে ফেললেও ঘোষবাবুর কথাটা তার মনে বড় লেগেছে। সে কোনোদিন এ নম্বর হতে পারবে না। অনেকে গালাগালির সময় তাকে বলে, ভাগ শালা দু'নম্বরী মাল!

সে কি ইচ্ছে করে নিজের নাম রেখেছে! এক নম্বর দু'নম্বর কি সে বানিয়েছে?

সিদ্দীক সাহেবের ছেলে ইরফান তারই সমবয়েসী। বরং একটু ছোটই হবে। কিন্তু সে গাট্টাগোট্টা জোয়ান, গলার আওয়াজটা বাজখাঁই। ভোটের সময় সে গলায় রুমাল বেঁধে সারা গাঁ হামলে বেড়ায়। ঝগড়া কাজিয়ার সময়েও সে সকলের সামনে এসে দাঁড়ায়। সেই জন্যই সবাই তার নাম দিয়েছে এক নম্বর। ইরফান আলি দু'নম্বরকে কেউ মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না।

ঝোড়া আর কোদাল নিয়ে ইরফান কাজে লেগে যায়। মাটি এখানে নরম, কোদালের কোপ বসলেই চাঙড় উঠে আসে। এককালে নাকি এখানে নদী ছিল একটা—কবে সেটা শুকিয়ে-বুজিয়ে গেছে। এখন এটাকে খাল কেটে জুড়ে দিতে হবে কংসাবতীর সঙ্গে। তাহলে সারা বছর জল আসবে। চাষী তার জমিতে জল পাবে—হা পিত্যেশ করে আকাশের চেয়ে থাকতে হবে না।

ইরফান নিজেও ভাগ-চাষ করে। কিন্তু বছরে পাঁচ মাস দেশে কাজ থাকে না। জলের অভাবে রবিশস্য হয় না এদিকে। সেই পাঁচ মাস ইরফান এদিক ওদিক জনমজুরির খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। কিছু জুটল তো খাবার জুটল না জুটলে হরিমটর।

গত পাঁচদিন এক বেলার বেশী খাওয়া জোটে নি। হাত-পায়ে জোর নেই। একটুতেই শিরদাঁড়ায় ব্যথা ওঠে। নীচু হয়ে মাটিতে কোপাতে কোপাতে এক এক সময় মনে হয় আর কোনো দিনও সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

মাটি কেটে কেটে এক জায়গায় জড়ো করার পর ঝুড়ি ভর্তি করে নিয়ে আবার আর এক জায়গায় ফেলতে হচ্ছে। মাটি জমে জমে হয়ে উঠেছে পাহাড়ের মতন। সেইটুকু উঁচুতে উঠতেই ইরফানের হাঁপ ধরে। আদিবাসী মেয়েগুলো কিন্তু ঝুড়ি মাথায় নিয়ে তরতর করে উঠে যায়। পাহাড় দেশের মেয়ে তো! ইরফান সেইদিকে একদৃষ্টে মুগ্ধভাবে চেয়ে থাকে।

এক একবার সে মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকায়। সূর্য কত দূর এগলো। আকাশের

সূর্য কি একদিন দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি এগোতে পারে না? সূর্য মাঝগগনে এলে তবেই দুপুরের ভোঁ পড়বে। তখন রুটি বিলি হবে। খাবারের চিন্তাতেই ইরফানের জিভে জল আসে। কতদিন যে সে পরিপাটি করে পেট ভরে খায় নি!

একটুক্ষণ কাজ থামিয়ে সে কোমরের গিঁটটা সামলে নিল। পানির তেষ্টা লেগেছে খুব! কিন্তু পানি খেতে হলে অনেকটা দূর যেতে হবে—সেই খাকি রঙের তাঁবুর কাছে। তার চেয়ে একটা বিড়ি খেয়ে নিলে হত না! ইরফানের ট্যাঁকে গুটিকয়েক বিড়ি আছে—কিন্তু ম্যাচিস। ম্যাচিস কেনার বিলাসিতা সে করতে পারে না। সনাতন সাঁপুইয়ের কাছে ম্যাচিস পাওয়া যেতে পারে—সেই দিকে সে সবেমাত্র পা বাড়িয়েছে, এই সময় পেছনে একজন কেউ হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

ইরফান আলি দু'নম্বর ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ইরফান আলি এক নম্বর এসে তার পেছনে দাঁড়িয়েছে।

ইরফান আলি এক নম্বরের হাতে কোদাল নেই। তার বদলে একটা ছোট লাঠি। অন্যদের মতন তার খালি গা নয়, সে একটা খাকি জামা পেয়েছে।

ইরফান আলি এক নম্বর বাবুদের গা-শোঁকাশুঁকি করে, বাবুদের পেয়ারের লোক—তাই সে কুলির সর্দার হয়েছে। আর হবি তো হ' এই লটেরই সর্দার। তার চালচলনই এখন অন্যরকম।

সে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, কি রে, কাজ ফেলে চললি কোথায়?

ইরফান আলি দুনম্বর ওকে দেখে ভয় পায়। অনেকেই ভয় পায় এক নম্বর ইরফান আলিকে।

দু'নম্বর ওকে একটু খাতির করার জন্যে বলে, একটা বিড়ি খেতে যাচ্ছিলাম। নেবে নাকি একটা বিড়ি?

ইরফান আলি এক নম্বর আজকাল বিড়ির বদলে সিগারেট খায়। সে একটু অবজ্ঞার সঙ্গে বললে, কাজের সময় বিড়ি খেলে দম ফেটে যায়।

এ সব কথা সে নিশ্চয়ই বাবুদের কাছ থেকে শিখেছে। শুনলেই মনে হয়, মুখস্থ কথা। কাজের সময় বিড়ি খাবে না তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিড়ি খাবে মানুষ?

এক গ্রামের ছেলে হলেও এক নম্বর ইরফান আলি দু'নম্বরকে মোটেই পাত্তা দিতে চায় না। সে মুরুব্বি চালে বলে, হাত চালাও সব, হাত চালাও!

দু'নম্বর বলল, ও ইরফান ভাই, দুপুরের ভোঁ বাজতে আর কতক্ষণ দেরি?

এক নম্বর বলে, এর মধ্যেই সে হিসেব? কাজ করতে এয়েছ না শুধু খানা খেতে এয়েছ? গরমেন্ট এমনি এমনি পয়সা দেবে?

ইরফান আলি দু'নম্বরের মাথাটা নীচু হয়ে যায়। দুপুরের ভোঁয়ের কথাটা তার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। ওটা না বললেই হত। কিন্তু এক নম্বর এমনভাবে কথা বলল, যেন ওর বাপের খাবার কেউ খেতে এসেছে।

ইরফান আলি এক নম্বর তার হাতের লাঠিটা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে যায়। দাঁতের ফাঁক দিয়ে চিকচিক করে মাটিতে থুতু ফেলে। এই কায়দাটা যেন সে নতুন শিখেছে। দু'নম্বর ইরফান আলি সেই দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ—আপন মনেই একটা গালাগাল দেয়, তারপর আবার মাটি কোপাতে শুরু করে।

সূর্য আজ অত্যন্ত অকরুণ। অসহ্য উত্তাপে মানুষের রক্ত পর্যন্ত চুষে নিচ্ছে। আচ্ছা একটু মেঘলা ছায়া ছায়া হলে বিশ্ব-সংসারে কার কি ক্ষতি হত! বেলাও যেন এক জায়গায় থেমে আছে—কখন যে দুপুর হবে, তার ঠিক নেই।

দু'নম্বর ইরফান আলি একমনে মাটি কোপাতে কোপাতে ভাবে—কতদিনে এই খাল কাটা হবে, কংসাবতী নদীতে বাঁধ দেওয়া হবে—তারপর গরমেন্টের লোক ইচ্ছেমতন জল ছাড়বে—তখন আর চাষীদের দুঃখ থাকবে না। ততদিন কি সে আর বাঁচবে? তা ছাড়া জল এলেই বা কি হবে—তার তো কখনো নিজের জমি হবে না?

খিদের চোটে বোধহয় পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে যাবে। গতকালও এতক্ষণ

কোনো খাওয়া জোটে নি, গতকাল তো এত খিদে পায় নি। আজ পাঁচখানা রুটি পাওয়ার সম্ভাবনাতেই খিদে যেন অসম্ভব বেড়ে গেছে। তার বৌ আমিনা এখন নিশ্চয়ই কচুর শাক সেদ্ধ করতে বসেছে। বন জঙ্গল, পুকুর থেকে কচু আর কলমীশাক তুলে আনে—সেদ্ধ করে খেলে পেটের জ্বালা অনেকটা মেটে। সন্ধ্যের আগেই সে আজ মজুরির টাকা দিয়ে চাল কিনে নিয়ে যাবে। এক সের দেড় সের যা জোটে। ভাত না খেলে কি আর মহাপ্রাণী সুস্থ হয়! ভাত এমন চীজ, খোদার সঙ্গে উনিশ বিশ।

পাশ থেকে ভক্তিপদ সরকার বলল, ও ইরফান, কাঁদতেছিস কেন?

ইরফান তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল, কই, কাঁদব কেন?

ভক্তি সরকার বলল, দেখলাম যে চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে।

—আপনা আপনি পানি পড়ে গো দাদা!

—অরে দু'নম্বর পেটে গিঁট বাঁধ, চোখের জল বন্ধ হয়ে যাবে!

ভক্তিপদকে সব সময় বেশ উৎফুল্ল দেখায়। ঝপাং ঝপাং করে কোদালের কোপ মারে আর স্ত্রীলোক সংক্রান্ত উপমা দেয় মাটির সঙ্গে।

ইরফান ভাবে, ভক্তিপদরও তো তার মতন দিন আনি দিন খাই অবস্থা—তবু এমন হাসিখুশী থাকে কি করে? আবার রাত জেগে যাত্রা শুনতে যায়। কিন্তু ভক্তিপদ তো এক নম্বর, ও তো দু'নম্বর নয়।

একটু বাদেই এক নম্বর ইরফান আলি সেখানে এসে দাঁড়াল। বাঁ হাতের তালুর ওপর ডান হাতের লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে চোখ ঘোরাতে লাগল এদিক ওদিক। একজন মজুরের মাথা থেকে মাটি-ভর্তি ঝুড়িটা পড়ে যেতেই সে লাফিয়ে গেল সেদিকে। এক হাতে সে অবলীলাক্রমে ঝুড়িটা তুলে নিয়ে বললে, হেঃ এটুকুও মাথায় রাখতে পার না? এ কি মাথা না কুমড়োর ডগা। ল্যাগব্যাগ করছে যে হে!

দু' নম্বর ইরফান আলি সেদিকে সরু চোখে তাকায়। তার রাগ হয়, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলার সাহস পায় না। ঐ এক নম্বরটার গায়ে মোষের মত জোর—অথচ সে পেয়েছে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ফুরফুরিয়ে ঘুরে বেড়াবার কাজ। গরমেন্টের পোষ্য-পুত্তুর হয়ে সবার ওপর চোখ রাঙাচ্ছে, আর খেটে খেটে মরতে হয় তাদের। ঐ কাজটা সে নিজে যদি পেত!

হঠাৎ ইরফান আলি দু'নম্বরের মনে হয়, তার জীবনের যা যা পাওয়ার কথা ছিল সবই ঐ এক নম্বরটা নিয়ে নিয়েছে। ওর তাগড়াই স্বাস্থ্য, ওর বিবি চন্দ্রমনে, ও বাবুদের নেক-নজরে পড়ে। জীবনে যা কিছু পাবার আছে, এক নম্বরই আগে থেকে পেয়ে যাবে। দু'-নম্বরের জন্য আর কিছু থাকবে না। ঘোষবাবু ঠিকই বলেছিলেন, এ কোনোদিনই এক নম্বর হতে পারবে না।

ভক্তিপদ হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, আরে আরে, এ লোকটার কি হল রে?

অনেকেই ফিরে তাকায়। ইরফান আলি দু' নম্বর মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। মুখ-চোখ কাদায় মাখামাখি। রোদ্দুরে নিশ্চয়ই মাথা ঘুরে গেছে। এমন কিছু ব্যাপার নয়।

সবাই মিলে ধরাধরি করে তাকে ওঠায়। সে যেন ঠিক পায়ে জোর পাচ্ছে না—নুয়ে নুয়ে পড়ছে। চোখ মুখে মাটি-কাদা মেখে বিহ্বলভাবে তাকায় সবার মুখের দিকে।

সবাই তাকে পরামর্শ দেয় একটু জিরিয়ে নিতে।

এক নম্বর ইরফান আলি এসে বলে, যাও, ঘরে চলে যাও, আজ আর তোমার দ্বারা কাজ হবে না।

দু' নম্বরের বাড়ির কাছেই থাকে বদন শেখ। সে বলল, একা যেতে পারবি? না আমি নিয়ে যাব সঙ্গে?

দু'নম্বরের মাথা চিড়িক করে ওঠে। এখন সে বাড়ি যাবে কি? এখনো দুপুরের ঘণ্টা বাজে নি। এখন বাড়ি গেলে সে পাঁচখানা রুটিও পাবে না, অর্ধেক দিনের রোজও পাবে না। সে হাউহাউ করে বলে। না, না, বাড়ি যাব না, বাড়ি যাব না—

বদন শেখ তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে নরমভাবে বলে, ছাওয়াতে একটু বসে থাক

দিক নি। যদি একটু ভালো বুঝিস—

দু' নম্বরের চোখে হঠাৎ আবার জল এসে যায়। সেই জল সামলাতে গিয়ে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে, একটু ম্যাচিস দিতে পার, একটা বিড়ি খেতাম!

এক নম্বর ইরফান আলি দরাজ গলায় হা হা করে হেসে ওঠে। সকলের দিকে তাকিয়ে বলে, কি রকম শেয়ানা—খালি কাজ ফাঁকি দেবার মতলব—খাটতে খাটতে সবার দম ফেটে যাচ্ছে, আর ইনি এখন বিড়ি খাবার ছুতোয়—

দু' নম্বর ইরফান আলি ঘোলাটে চোখে তাকায় এক নম্বরের দিকে। তার চোখের সামনে, সারা আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু ঐ এক নম্বর। তার জীবনে যা কিছু পাওয়ার সব ওর কাছে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ অন্ধ রাগে সে হাতের কোদালটা বসিয়ে দিল সেই বলশালী লোকটির মাথায়। দেখা যাক, এবার সে এক নম্বর হতে পারে কিনা!

রাণী ও অবিনাশ

অবিনাশের চেহারাটা এমনিতেই বেশ লম্বা, পা ফাঁক করে দাঁড়ালে অনেকটা বড় ছায়া পড়ে। কিন্তু এখন ছায়াটা একটু বেশী লম্বা—রাস্তা পেরিয়ে গেছে। সকাল সাড়ে দশটা বাজে, এখন সকলেরই ছায়া ছোটো-ছোটো, আর একটু বাদেই বিন্দু হয়ে যাবে—অথচ অবিনাশের ছায়াটা এমন বিচ্ছিরি লম্বা হল কি করে? রাত্তিরের দিকে পেছন থেকে আলো পড়লে ছায়া আপনি লম্বা হয়ে যায়। অনেক সময় অতিকায়, পঞ্চাশ ষাট ফুট পর্যন্ত. কিন্তু এখন সূর্য প্রায় মাথার ওপরে। অবিনাশ এদিক ওদিক তাকিয়ে আলাদা কোনো আলোর খোঁজ করলো—কিছুই নেই। তা হলে কি করে এতবড় ছায়া—পিচের রাস্তা পেরিয়ে ওপাশের গ্যাস-পোস্ট পর্যন্ত পৌঁছেছে তার মাথা। যাই হোক, ও নিয়ে আর অবিনাশ ব্যস্ত হলো না, বিজ্ঞানের আবিষ্কার-ফাবিষ্কার যত বেশী হচ্ছে—ততই অলৌকিকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে—সে ভাবলে।

ভারী ভারী বাসগুলো তার ছায়ার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, অনেক ব্যস্ত মানুষ, রিক্সা—এমনকি ঠেলাগাড়িও চলে যাচ্ছে তার ছায়ার বা কাঁধের ছায়া মাড়িয়েই—যাই হোক, ব্যথা তো আর লাগছে না। তবু, অবিনাশ কয়েকপা সরে সরে দাঁড়ালো।

প্রজাপতিরঙা ছোটো ছোটো মেয়েরা স্কুল ছুটির পর বেরিয়ে আসছে—অবিনাশ দ্রুত চোখ চালিয়ে দিচ্ছে ওদের মধ্যে একবার করে—না, সর্দারণীরা এখনো বেরোয় নি। মেয়েদের সাইজ ক্রমশ বড় হচ্ছে। কচি কচি মেয়েদের পর এখন আসছে ডাঁসা মেয়েরা। ওয়ান-টু থেকে ক্লাস নাইন টেনের মেয়েদেরও ছুটি হয়ে গেল। এমনকি দু' একটা মেয়ের চেহারা দেখে এখন আর ছাত্রী কি মাস্টারণী বোঝা যায় না। তবে, চশমা-পরা কালো ঠোঁট দু'জন শিক্ষয়িত্রী না হয়ে যায় না। এমনও হতে পারে, রাণী আজ স্কুলে আসে নি। অথবা অন্য স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। কতদিন আগেকার শোনা খবরে এসেছে অবিনাশ। অথবা, রাণী হয়তো এখন আর চাকরি-টাকরি করে না। ওর স্বামীর এতদিনে যথেষ্ট পদোন্নতি হবার কথা। অফিসারদের বউদের কি আর মাস্টারী করলে মানায়! কিন্তু অবিনাশ শেষ পর্যন্ত দেখে যাবে। আর ক' মিনিট—এর পরই তো দুপুরের ছেলেদের স্কুল শুরু হয়ে যায়—সুতরাং আর বেশিক্ষণ নিশ্চিত ভিতরে বসে থাকবে না রাণী যদি স্কুলে এসে থাকে।

প্রথমে যেমন জাহাজের মাস্তুলটুকু শুধু দেখা যায়, তেমনি দূরে অবিনাশ দেখতে পেল রঙীন প্যারাসোল, একটি সুডৌল হাত—মুখ না দেখতে পেলেও অবিনাশ চিনতে পেরেছে—ঐ হাঁটার ভঙ্গিটা তার খুব চেনা। হুঁ, এখনও বেশ শৌখিন আছে দেখছি, চমৎকার কায়দায় শাড়িটা পরেছে, ফুলহাতা মিডভিক্টোরিয়ান ব্লাউজ, শান্তিনিকেতনের চটি। ইস্কুলে কাজ করলে তো এসব শখ বেশী দিন থাকে না। দিদিমণি দিদিমণি দেখাচ্ছে না যা হোক। তবে একটু মোটা হয়েছে ঠিকই।

অবিনাশ এগিয়ে গেল না। আর একটা সিগারেট ধরালো। আগে চোখাচোখি হোক না। আধ ঘণ্টার ওপর অবিনাশ দাড়িয়ে আছে, লোকেরা কি তাকে লক্ষ্য করছে? পাড়ার ছোড়ারা না আবার আওয়াজ দেয়। যাক্ গে। বাসে উঠে পড়বে নাতো টপ করে!

রাণী কিন্তু এদিকে তাকালো না। ছাতা না বন্ধ করে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো। সুতরাং অবিনাশই এগিয়ে গিয়ে ঘুরে কোনো কথা না বলে ওর সামনে দাঁড়ালো। বললো, চিনতে পারো?

—একি, তুমি? রাণী যেন খুব বেশী অবাক হয় নি। কিন্তু প্রকাশ্য রাস্তাতেই অবিনাশের হাত চেপে ধরলো। এতদিনে মনে পড়লো অভাগিনীকে? একটু দয়ামায়া নেই শরীরে তোমার। মেয়েটা বেঁচে আছে কি মরে গেছে একটা খবরও নিলে না।

—সত্যি, কতদিন পর তোমাকে দেখলুম, রাণী।

—পাঁচ বছর আট মাস।

অবিনাশ চমৎকৃত হয়ে গেল। রাণী কি প্রতিটি দিন, প্রতিটি মাস গুণছে নাকি? না, টপ করে মুখে যা এলো বলে দিল। পরে মিলিয়ে দেখতে হবে। শেষ কবে দেখা হয়েছিল—সেই আলিপুরের ট্রামে না শশাঙ্কর বিয়ের সময়, না,—থাক্‌গে যাক্। রাণী ওর বাহু ছুঁয়ে আছে, অবিনাশেরও ইচ্ছে করলো রাণীর কাঁধে হাত রাখে—কিন্তু এইভাবে রাস্তায় ওর ছাত্রী-ফাত্রি বোধহয় দেখে অবাক হবে। থাক্। তুমি কেমন আছো রাণী?

—ভালো নেই। তোমার জন্য সবসময় মন কেমন করে। বলেই রাণী হেসে ফেললো। তারপর হাসতে হাসতেই দুষ্টুমীর হাসি, গোপন করতে না পেরে, বললো, বিশ্বাস হলো না তো? সত্যিই কিন্তু হেসে ফেললো, কি হবে, তোমার জন্য খুব মন কেমন করে!

—থাক্ আর ইয়ার্কি করতে হবে না। শরীরটা নষ্ট করলে কেন? এরকম মোটা হতে হয়? কি সুন্দর ফিগার ছিল তোমার। এখন অত বড় বড়..

—এই, অসভ্যতা করো না, লোকে শুনতে পাবে। কি হবে আর এই পোড়া শরীরের দিকে নজর দিয়ে। আর তো আমার কেউ স্তুতি করার লোক নেই। আমি ঘরের বউ।

—কেন, স্কুলের সেক্রেটারী? তিনি বাড়িতে মাঝে মাঝে চা খেতে ডাকেন না? কিংবা, পাড়ার ছেলেরা স্বামীর বন্ধু, অথবা পাশের ফ্ল্যাটের কোনো সংগীতরসিক, তোমার স্তাবক নিশ্চিত এখনও অসংখ্য।

—না,—রাণী ছদ্মম্লান গলায় বললো, আবিসিনিয়ার রাজকুমার ছাড়া আমার রূপের প্রশংসা আর কেউ করে নি!

এটা একটা পুরোনো ঠাট্টা। রাণীর চেহারাটা ছেলেবেলায় ছিল ভারী সুন্দর, খুব কোঁকড়ানো চুল আর ফর্সা রঙের জন্য ওকে অনেকটা রাণী এলিজাবেথের (প্রথম) মতই দেখাতো। ওর নাম আসলে-প্রতিমা, কিন্তু সবাই 'রাণী রাণী' বলেই ডাকে। কিন্তু অবিনাশকে কোনোক্রমেই রাজা বা রাজকুমার বলা যেতো না ছেলেবেলায়। ছেলেবেলা থেকেই ওর চেহারাটা চোয়াড়ে, কাঠখোট্টা, রং বেশ কালো। তাই রাণী ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতো, 'আহা, সব রাজকুমারই কি সুন্দর হবে নাকি? আফ্রিকার রাজকুমাররা, যত বড় রাজার ছেলেই হোক না—কালো কুচ্ছিৎতো হবেই! তুমি আমার আবিসিনিয়ার রাজকুমার!'

রাণী জিজ্ঞেস করলো, এখন কি চাকরি-টাকরি করছো?

—কিচ্ছু না। বিদেশে গিয়েছিলুম, ফিরে এসে আবার বেকার!

—ফিরলে কেন?

—আমি বিদেশে গিয়েছিলুম, তুমি জানতে?

—জানতুম না? সব খবর রাখি। দেখা না হলে কি হয়। ফিরলে কেন এত তাড়াতাড়ি?

—তোমার জন্য মন কেমন করছিল!

দু'জনেই আবার হেসে উঠলো অনেকক্ষণ। রাণী বললো, জানো, আমার এখন সাড়ে তিনশো—চারশো টাকা রোজগার। আমাকে বিয়ে করলে এখন তোমাকে বসিয়ে খাওয়াতুম। কি, আমাকে বিয়ে না করার জন্য এখন তোমার অনুতাপ হয় না?

—মোটেই না। খুব বেঁচে গেছি। প্রথম প্রথম, তুমি যখন ঐ হুৎকোটাকে বিয়ে করলে, প্রথম দু'তিন মাস বিষম কষ্ট হয়েছিল। মনে হতো, অবিশ্বাসিনী, ছলনাময়ী নারী। বুক ফেটে যেত। মনে হোত, সব মেয়েই এই রকম। তারপর বুঝতে পারলুম, খুব বেঁচে গেছি! ওঃ! বন্ধুবান্ধবদের তো দেখেছি—বিয়ে করে এক একজন মেধরুস্ হয়ে যাচ্ছে, কি রকম বোকা বোকা তেলতেলে মুখ হচ্ছে এক একজনের। আমি কত খোলা হাত পা আছি—যখন খুশী বাড়ি ফিরতে পারি, জামার তলায় ময়লা গেঞ্জি পরলে ক্ষতি নেই, পকেটে পয়সা থাকলো বা না থাকলো যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারি!

—কি নিষ্ঠুর, বাবা। অন্তত মিথ্যে করেও তো বলতে পারতে আমার জন্য কষ্ট হয় তোমার।

—মিথ্যে কথা বলার কি আর বয়স আছে! বুড়ো হয়ে গেলুম প্রায়, আমার বয়েস বত্রিশ, তোমারও তো আটাশ! নাকি আরও বেশী, তখন বয়েস ভাঁড়িয়েছিলে!

—এখন সে-সন্দেহ হচ্ছে কেন?

—বাঃ, পাঁচ বছরে যদি কারুকে দশ বছরের বুড়ি হতে দেখি, তবে সন্দেহ হবে না!

—যাঃ মিথ্যে! মোটেই দশ বছর নয়! দু'বছর ভাঁড়িয়েছিলুম, এখন আমার তিরিশ। আর প্রেম করা—বাহাদুরি তো জানি, লাজুক কোথাকার—এখনও নিশ্চয়ই মেয়েদের গায়ে হাত দিতে হাত কাঁপে। আমিই তো তোমাকে প্রথম সিডিউস করেছিলুম। তাও কি ভয়—

—সেদিন আর নেই! বিদেশে অন্তত শ'খানেক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি।

—ওসব বীরত্ব আমার কাছে দেখাতে হবে না। আমার চেয়ে আর কেউ বেশী চেনে না তোমাকে।

একটু থেমে রইলো দু'জনেই। অবিনাশ রাণীর সারা শরীরে চোখ ঘোরায়। রাণী পাশ-চোখে তা লক্ষ্য ক'রে হাসে।

—সত্যিই বুড়ি হয়ে গেলুম। ইস্কুলে যখন মাস্টারণী সেজে বসে থাকি গম্ভীর হয়ে, এক এক সময় কি রকম হাসি পায়। জীবন কাটিয়ে দেওয়া তাহলে এত সহজ! কালকে জানো—একটা মজার ঘটনা হয়েছিল। ক্লাস টেনের মেয়েরা একটা কাগজ গোপনে চালাচালি করছিল, আমি ধরে ফেললুম। প্রেমপত্র। একজন লিখেছে, বাকিরা সেটা কপি করে নিচ্ছে। খুব বকুনি দিলুম, আসলে কিন্তু মনে মনে খুক্ খুক্ হাসছিলুম। বেশ লিখেছে, আমারও কপি করে নিতে ইচ্ছে করছিল। এক জায়গায় কি লিখেছে জানো, 'তোমার জন্য আমার বুকের মধ্যে ব্যথা করে, যেন অসম্ভব জ্বর হয় আমার।'—কি রকম অসভ্য! আমাদের সময় আমরা লিখতুম 'হৃদয়', এখনকার মেয়েরা লেখে 'বুক'। একটু দুঃখও হল আমার, আর কেউ নেই যাকে আমি আজ আর প্রেমপত্র পাঠাতে পারি।

—কেন, আমার ঠিকানা জানতে না?

—ইস্! শখ্ কম নয়! জানো, চিঠিতে একটা রবীন্দ্রনাথের কোটেশান পর্যন্ত দেয় নি। তার বদলে কোন্ আধুনিক কবির। কি জানি, তোমারই হয়তো।

—কেন, আমার কবিতা চেনো না? পড়ো না বুঝি আজকাল?

—যা তা রাবিশ্ লিখছো তো এখন! কে পড়ে ওসব!

—তোমার ইস্কুলের দু'একটা কচি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও না!

—ফাজলামি করতে হবে না। বাড়ি যাই।

—রাণী, তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা ছিল।

—আর দরকারে কাজ নেই। ঢের বেলা হল, তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আড্ডা দিলে আমার বাড়িতে হাঁড়ি ঠেলবে কে?

—ও, এবার বুঝি রাগ হল।

—না রে, পাগলা, সত্যি বাড়ি যেতে হবে। এগারোটায় ঝি চলে যাবে—তারপর ছেলেটাকে ধরতে হবে না!

—দ্যাখ, খুকি, চালাকি করিস্ না। এতদিন পর দেখা হল, অমনি বাড়ি আর বাড়ি! আচ্ছা, ঠিক আছে, আমিও তোর সঙ্গে বাড়িতে যাই।

—অত খাতির নয়। আমার কন্তা ছুটি নিয়ে বাড়িতে আছে। দেবে গলা ধাক্কা।

—তবে চল্ কোনো চায়ের দোকানে বসি। সত্যি একটা খুব দরকারী কথা আছে, তোর সঙ্গে।

—আবার তুই-তুকারি শুরু করছিস!

—তুই-ই তো প্রথম আরম্ভ করলি। তোর ছেলের কি নাম রেখেছিস ?

—তোর নামে নয়। ভাবছি অবিনাশ নাম দিয়ে একটা বাচ্চা কুকুর পুষবো, সব সময় বুকে জড়িয়ে থাকবো তাকে।

—রাণী তোকে খুব জরুরী একটা কথা বলতে এসেছিলুম!

—কোনো দরকার নেই।

—সত্যি, একটা বিশেষ কথা আছে।

—না, অবি, কেন এসেছিস এতদিন পর? কেন ভেঙে-চুরে দিতে এসেছিস? বেশ তো আছি সংসার পেতে, চাকরি করছি, স্বামী-পুত্র নিয়ে ছেলেবেলার পুতুল খেলার মতো বৌ-বৌ খেলছি। তুই চাস, সব টান্ মেরে ফেলে দিই আবার? কিন্তু তুই তো পাগল, তুই তো আমার পাশে থাকবি না জানি। কেন এসেছিস আমার সর্বনাশ করতে। তুই যা।

—না রে, আমি এসেছি মাত্র একদিনের জন্য। শুধু একদিন। চল্, কোথাও গিয়ে একটু বসে কথা বলি।

—উপায় নেই যে। সবাই ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করবে। এত দেরি করে তো কোনোদিন ফিরি না। ঐ বাস্‌টায় উঠি।

—একটু দাঁড়া। আজ্জা মনে কর খুব ট্র্যাফিক-জ্যাম। বাসে ওঠার কোনোক্রমে উপায় নেই। তা হলে কি করতিস, দেরি তো হতেই।

—তা হলে হেঁটে যেতাম।

— আচ্ছা চল্, হেঁটেই যাই। এইটুকু সময়ে তোকে একটা কথা বলি। এখনো শীত যায় নি, রোদ্দুরের তাত নেই।

অবিনাশ এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি যে রাণী ওর ছায়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুত, সূর্য এখন মাথার কাছে এসেছে। স্বাভাবিক এবং ছোটো হয়ে গেছে অবিনাশের ছায়া। অবিনাশ ঘুরে এসে রাণীর ছায়ার ওপরে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে বেশ আরাম পেল।

রাস্তার লোকজন অনেক কমে গেছে। কোথায় পরের বাড়ি জলের দরের মতো নিলাম হচ্ছে, অধিকাংশ লোক সেখানেই ছুটে যাচ্ছে সন্দেহ কি। দুজনে দুজনের ছায়া সরিয়ে হাঁটতে লাগলো।

রাণী ওর রঙিন ছাতাটা অল্প দোলাচ্ছে। অবিনাশ ওর সুন্দর কারুকাজ করা হাত-ব্যাগটা টেনে নিয়ে বললো, দেখি কি আছে? ঠোঁট উল্টে রাণী বললো, কিছুই নেই, কি আর থাকবে—বাড়ি থেকে ইস্কুল আর ইস্কুল থেকে বাড়ি যাই। ক'টা খুচরো পয়সা আছে।

—ভেবেছিলুম, কটা টাকা চুরি করবো।

—এক সময় তো অনেক চুরি করেছো বাপু।

—তা সত্যি। অনেক টাকা নিয়েছি তোর কাছ থেকে, রাণী।

—কেন আজ দেরি করিয়ে দিলি, এতক্ষণে কবে বাড়ি পৌঁছে যেতুম।

—সত্যিই তোর ইচ্ছে করছে না আমার সঙ্গে থাকতে? একসময় তো আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করতিস।

—ছেলেবেলায় ওরকম হয়। আগে তো বৃষ্টির জন্যও ছটফট করতুম। এখন বৃষ্টি পড়লে বিরক্ত লাগে।

অবিনাশ হঠাৎ গম্ভীর গলায় ডাকলো, রাণী।

রাণী তখুনি জল কুলকুচি করার মতো হেসে বললো, এবার বুঝি বোকা-বোকা প্রেমের কথা শুরু করবি? খবর্দার! এখন আর কচি খুকিটি নেই যে ভোলাতে পারবে!

—কবেই বা তোকে ভোলাতে পেরেছি। ছেলেবেলা থেকেই তো তুই পাকা একটি। প্রেমের কথা তো তুই-ই আমায় শিখিয়েছিস। তোর ওপরের ঠোঁটে পাতলা ঘাম জমেছে।

খুব ইচ্ছে করছে একটা চুমু খাই। এতক্ষণ কথা বলছি—অথচ একটাও চুমু খাই নি তোকে—এরকম আগে কখনও হয়েছে?

—তবে আর কি, রাস্তার মধ্যেই শুরু করো। হাজারটা ক্যামেরায় ছবি উঠুক্।

—ঐ জন্যই তো বলছিলুম কোথাও গিয়ে বসি।

—ইস্, কোথাও বসলেও যেন দিতাম আর কি! এখন থেকে কোথাও বসলে আমরা বসবো টেবিলের দু'পাশে।

—দেখিস চেষ্টা করে। তোর স্বামী যখন থাকবে না, দুপুরে একদিন বাড়িতে গিয়ে হাজির হবো।

—শাশুড়ি থাকে।

—থাকুক্। শাশুড়ি যেদিন গঙ্গায় স্নান করতে যাবে। আমি তক্কে তক্কে থাকবো।

—আমি দরজায় খিল দিয়ে থাকি। খুলবে না। কেন খুলবো? তুই আমার কে?

—আমি জলের পাইপ বেয়ে উঠবো।

—কেন? তুই আমার কে?

—আমি তোর সর্বস্ব! তুই-ই তো বলতিস।

—ইস, কোথাকার সর্বস্ব রে! দেখি মুখখানা।

—তুই আমাকে একেবারে গ্রাহ্যই করিস না রাণী। আমি বিলেত ঘুরে এলুম হাজার হোক, আমি এখন একটা বিলেতফেরৎ।

—ওরকম বিলেতফেরৎ গন্ডায় গন্ডায় রাস্তায় ঘুরছে। তুই আমাকে এতদিন পর বিলেত দেখিয়ে ইম্প্রেস করতে এসেছিস! কি অধঃপতন তোর।

—রাস্তা থেকে একদিন জোর করে ধরে নিয়ে যাবো।

—চেষ্টা করে দেখিস। আমার গায়ে এখনও জোর আছে। তা ছাড়া এমন চেঁচাবো যে রাস্তার হাজারটা লোক এসে গাঁট্টা মেরে তোর মাথা ফাটিয়ে দেবে। বেশ হবে।

—ওসব লোকফোক আমাকে দেখাস নি। আমি অবিনাশ মিত্তির, ছেলেবেলা থেকেই গুন্ডা। একটা গাড়ি নিয়ে এসে চলতি রাস্তা থেকে তোকে টেনে তুলে নিয়ে যাবো।

—নিয়ে গিয়ে কি করবি?

—তোর পায়ের তলায় আমার মুখ ঘষবো।

রাণী হঠাৎ থেমে গিয়ে বললো, এখুনি ঘষ্ না। এই যে দাঁড়িয়েছি। লোকে দেখুক, ক্ষতি নেই।

—তারপর তোর মুখও ঘষ্‌বি, আমার পায়?

—তার দরকার নেই। তোর ঐ কুচ্ছিৎ পা-জোড়া সব সময় রাখা আছে আমার বুকের মধ্যে।

—ও, তা হলে রাণী সান্যালও রোমান্টিক হতে জানে।

—সান্যাল নয়, রায়চৌধুরী এখন। পরস্ত্রী, মনে থাকে না বুঝি?

—বাঃ, পরস্ত্রী। আয় না রাণী, আমরা লুকিয়ে অবৈধ প্রেম করি। পরকীয়া প্রেম খুব ফাসক্লাস জিনিস।

—অবৈধ প্রেমই যদি করবো, তবে পুরোনো প্রেমিকের সঙ্গে কেন? আমি বুঝি নতুন একজন যোগাড় করতে পারি না?

—করেছিস নাকি এর মধ্যেই।

অবিনাশ রাণীর ছাতার একটা খোঁচা খেলো। ছাতার বাঁটের নিচে কাদা ছিল, অবিনাশের জামায় একটা গোল দাগ পড়লো। অবিনাশ যে সে দাগটা তোলার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে আর একটা সিগারেট ধরালো—তাতেই খুশী ছড়িয়ে পড়লো রাণীর মুখে। ঈশ্বরের রাজত্বে কে কিসে খুশী হয় বোঝা যায় না। খুশী হয়ে রাণী বললো, আজকাল এত বেশী সিগারেট খাস কেন?

—তুই খাবি নাকি? আগে তো দু'একটা খেয়েছিস।

—হ্যাঁ, আমি পরপুরুষের সঙ্গে দিনের বেলায় সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে রাস্তা দিয়ে

যাই। তা হলে আর আমার বাকি থাকে কি?

অবিনাশ একটু চুপ করে রইলো। তাকিয়ে দেখলো, ওদের ছায়া-টায়া কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। এমন বিশ্রী রাস্তা—কোথাও একটা গাছ পর্যন্ত নেই যে ছায়া পড়বে। নিছক রোদ্দুর, কোনো মানে নেই। সিগারেটে জোরে টান দিয়ে অবিনাশ বললো, সত্যি রাণী, আমরা অনেক দূর সরে গেছি—অথচ মাত্র ছ'সাত বছর। তোর মুখ থেকে 'পরপুরুষ' শব্দটা কি রকম অদ্ভুত শোনালো। যেন একটা বিদেশী শব্দ, যেন আমি একটা লৌহমানব, হাতে তলোয়ার নিয়ে তোর পাশে দাঁড়িয়ে আছি। অথচ, মনে আছে, প্রত্যেকদিন সকালে—তুই যখন কলেজে যেতিস—

—থাক, পুরোনো কথা। আমি ভালো আছি অবিনাশ।

—আমিও খুব ভালো আছি। বিশ্বাস কর আমি কোনো দুঃখের কথা বলতে আসি নি।

রাস্তাটা উঁচু হয়ে উঠে গেছে। ব্রীজের ওপর দিয়েও হাঁটা পথ আছে—নিচ দিয়েও আছে একটা সরু কাঠের রাস্তা। ওরা নিচ দিয়েই গেল। রেলিং ধরে দাঁড়ালো দু'জনে। নোংরা জলে অল্প স্রোত—অবিনাশ ওর সিগারেটের টুকরোটা ফেললো জলে, ব্রীজের নিচ দিয়ে ভেসে গেল। রাণী একেবারে জল ভালোবাসে না। অবিনাশ রাণীকেই পৃথিবীর একমাত্র মেয়ে জানে—জলের প্রতি যার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। যেমন রাণী এক্ষুণি ঐ জলে থুতু ফেললো।

রাণী বললো, এইবার শুনি কি দরকারটা? কি এমন দরকার আমার কাছে? ইস্, কত বেলা হয়ে গেল যে!

অবিনাশ জানতো রাণী এইবার ও কথা বলবেই। কিন্তু অবিনাশ দ্বিধা করছে। ঠিক কি রকমভাবে আরম্ভ করবে বুঝতে পারছে না। রাণী ওর দিকে দুটো সম্পূর্ণ চোখ তুলে বললো, কী?

—তোকে একটা কথা বলবো রাণী। তুই কিন্তু কিছু মনে করতে পারবি না। দূরে সরে গেলেও আমি তো তোর সেই অবিনাশই আছি।

—অত ভণিতার দরকার কি? কি চাই বল্ না।

—রাণী তোর বুকে সেই তিলটা আছে এখনও।

—হুঁ। ওর খুব একা একা লাগতো—তাই পাশে আর একটা নতুন তিল উঠেছে। যাক্, বাজে কথা—দরকারী কথাটা কি? কি চাইতে এসেছিস এতদিন পর?

—মুক্তি। এক কথায় বলতে গেলে—

—সে আবার কি? তুই-ও আমাকে মুক্তি দিয়েছিস আমিও তোকে দিয়েছি। বন্ধনটা আর কোথায়?

—সে রকম নয়। তুই আমার শরীরকে মুক্তি দিস নি। আমার মন ছাড়া পেয়ে গেছে কিন্তু—

রাণী অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। এই প্রথম অবিনাশের একটা কথা সে বুঝতে পারলো না। সেই জন্যই বোধ হয় অবিনাশের সারা মুখটা ও তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। কোনো সংকেত নেই। অবিনাশ আবার বললো, বেশ থেমে থেমে ঠাণ্ডা গলায়—তোর কথা ভুলে যাবার পর—আমি বেশ কয়েকটা মেয়ের সংস্পর্শে এসেছি, আর, ইয়ে, মানে শুয়েছিও কয়েকজনের সঙ্গে—কোথাও তৃপ্তি পায় নি ঠিক। কেন পাই নি জানিস, সব সময় মনে হয়েছে, সত্যিকারের রহস্য যেন তোর শরীরেই লুকিয়ে আছে! তোর শরীর তো আমি জানি না।

—এবার বাড়ি যাই।

—না, না, শোন্, আমার পক্ষে খুব জরুরী কথা। আমার জীবনমরণ সমস্যা। আমার পুরো ছেলেবেলাটা কেটেছে তোর সঙ্গে—তোর কথা, হাসি, পাগলামি শরীরের গন্ধ—অর্থাৎ যা কিছু ফেমিনিন্—তার স্বাদ আমি তোর কাছেই পেয়েছি। তোকে মনে হত একটা রহস্যের সিন্দুক। তোকে চুমো খেয়েছি, তোর জামার বোতাম খুলে বুকে মুখ চেপে ধরেছি—কি অসম্ভব উথাল পাথাল করতে তখন মাথার মধ্যে। ছেলেবেলায় সকলেরই

যা হয় আর কি। কিন্তু কোনোদিন তোর সঙ্গে শুই নি, সাহস পাই নি—ভাবতুম, অতখানি আমার সইবে না। ঐ অসম্ভব মাধুর্য আমাকে পাগল করে দেবে। আমি টুকরো টুকরো হয়ে যাবো। এইসব আর কি। এখন দেখ, কত বদলে গেছি। চোয়ালের কাছে শক্ত দাগ পড়েছে. প্রেম-ফ্রেম ঘুচে গেছে মন থেকে, মদ খেতে শিখেছি খুব, মেয়েদের এখন অন্যভাবে চাই। অর্থাৎ মেয়েদের জানতে দিতে চাই না ওদের কাছ থেকে আমি কতখানি পাচ্ছি—খুব গোপনে, ওদের একদম বুঝতে না দিয়ে—আমার যেটুকু বিষম দরকার আমাকে নিতেই হবে। ওরা ভাববে বুঝি সাধারণ কাণ্ড-কারখানাই হচ্ছে—আসলে কাক যেমন কোকিলের ছানাকে পালন করে না জেনে—তেমনি মেয়েরা সম্পূর্ণ নিজেদের অজ্ঞাতসারে ওদের শরীরটা পুষে রাখে। কিছুই মনে বোঝে না শরীরের। আমি চাই ওরা না জেনে আমাকে একটা দুর্লভ জিনিস দিয়ে যাবে—। ওদের কোনোদিন বলবো না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, আমি সম্পূর্ণ পাচ্ছি না কখনো—সব সময় মনে হয় কিছু বাকি থেকে যাচ্ছে, একটি সম্পূর্ণ মেয়েকে কখনও পাই নি। তখনই তোর কথা মনে পড়ে—তোর কত-কিই তো আমি জানি—প্রায় গোটা জীবন—কিন্তু আমি তোর সম্পূর্ণ শরীর জানি না। তাই মনে হয়, সমস্ত রহস্য বা তৃপ্তি লেগে আছে তোর শরীরে। আমার জীবনের প্রথম নারীর কাছে। মানে, তুই কিছু মনে করছিস না তো—আমি অন্য মেয়ের সঙ্গে শুয়েছি এ কথা বললুম বলে। তুই-ও তো তোর স্বামীর সঙ্গে শুচ্ছিস—আমি কি আর কিছু মনে করছি। তুই নিশ্চয়ই আশা করিস নি—আমি সারা জীবন তোর বিরহে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকবো।

—বয়ে গেছে আমার মনে করতে! যাক্, এ সব প্রলাপ শুনে আমার লাভ কি। আমি কি করবো?

—তুই বুঝতে পারছিস না রাণী? তোর উচিত আমাকে সাহায্য করা।

—কী রকম সাহায্য? আমার কাছে কি চাইছিস?

—একটি দিন।

—তার মানে?

—আমি তোর সঙ্গে একবার।

—তাতে কি লাভ হবে?

—আমি নিঃসন্দেহ হতে চাই যে—আসলে তুই-ও খুব সাধারণ। অন্য মেয়েদেরই মতো। তোর শরীরেও কোনো আলাদা রহস্য নেই। তোকে হারিয়ে অন্য মেয়েকে পেলেও আমি আসলে একটি সম্পূর্ণ মেয়েকেই পাবো। তার বেশী আর কিছু পাবার নেই।

রাণী হঠাৎ চোখ দুটো খুব নিচু করলো। যেন ওর চোখ দুটো একেবারে ঢুকে গেল মুখমণ্ডলের মধ্যে। কপালের নিচে আর কিছু নেই, সাদা। সেইরকম ভাবেই বললো, অসভ্য, ইতর কোথাকার।

অবিনাশ বিষম অবাক হয়ে গেল। একটু দ্বিধা করে আলতোভাবে রাণীর কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, 'একি রাণী, তুই রাগ করছিস? আমি কিন্তু তোকে আঘাত করার জন্য বলি নি। আসলে, ভেবে দ্যাখ, আমরা দু'জনেই তো খুব সাধারণ। অন্যদেরই মতো। আমি শুধু নিঃসংশয় হতে চাই।

রাণী ফুঁসে উঠে বললো, না, আমি সাধারণ নই। আমি অসাধারণ!

—এটা তো ছেলেমানুষী! আমাদের এত বয়েস হল, এখন তো আমরা জানি। তোকে না পেলে আমি সবটুকু রহস্য পাবো না—একি সম্ভব নাকি!

—হ্যাঁ তাই। তুই যেখানেই যা—তৃপ্তি পাবি না। তোর প্রাণ একটা কৌটোয় পোরা ভ্রমরের মতো আমার কাছেই থাকবে। আমি তাকে মুক্তি দেবো না।

—ওসব কিছু না, রাণী। জীবন অন্য রকম। মানুষ বিষম ভুলে যেতে পারে। অনেক বদলে যেতে পারে। তুই একবার--

—তারপর আমার কি হবে? একজন মাত্র মানুষের কাছেও আমি অসাধারণ থাকবো না? অবি, তোকেও তো আমি সম্পূর্ণ পাই নি। একদিন পেয়ে যদি দেখি, তুইও সাধারণ, আমার স্বামীরই মতো—তা হলে আর আমার জীবনে কি রইলো? তোকে দেখলে এখনও

আমার বুক কেঁপে ওঠে। আজ প্রথম দেখে বিষম রক্ত ছলাৎ করে উঠলো। যদি দেখি,— তুইও তাহলে, আমার এই চাকার-করা, স্বামীর সংসার, ছেলে মানুষ-করা—সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে না? আমার আর কি থাকবে তা হলে? আমার একটিও না-দেখা স্বপ্ন থাকবে না? একজনের কাছে অন্তত রাণী হয়ে থাকবো না? আমার জীবনে থাকবে না একজন অদেখা রাজকুমার? আমার আবিসিনিয়ার রাজকুমার! না, অবি, আমি সব কিছু জানতে চাই না। তুই দূরে হয়ে যা।

—কিন্তু জানাই তো ভালো। নিশ্চিত হবার মতো এমন তৃপ্তি আর নেই। জীবন শেষ করার আগে জেনে যেতে হবে, জীবনে আমার কি কি প্রাপ্য ছিল। রহস্যের ভাবনায় কাটানো খুব কুচ্ছিৎ।

তুই আর আমার সামনে আসিস না। কোনোদিন না। সবচেয়ে ভালো হয় তুই যদি এখন মরে যাস্। তাহলে তোকে জেনে ফেলার কোনো ভয়ই আর থাকে না। তা হলেই তোকে আমি চিরকাল ভালোবাসতে পারবো।

—তুই ভুল করছিস। ওকে ভালোবাসা বলে না। কি দরকার ভালোবাসার। ভালো-বাসা ছাড়াও জীবন খুব সুন্দর কেটে যেতে পারে। বড় কথা হল জানা। যদি তোকে—

—আমি তোকে আর সহ্য করতে পারছি না, অবিনাশ। তুই আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা। তোর চোখে আমি ফের পাগলামি দেখতে পাচ্ছি। তোর জন্য আমার মায়া হয়।

পাশ দিয়ে যে সমস্ত লোক হেঁটে যাচ্ছে—তারা কিছুই বুঝতে পারছে না। এমন শান্ত-ভাবে কথা বলছে রাণী! কিন্তু ওর মুখের একটি সামান্য রেখা দেখেও বোঝা যায়, ও দাঁড়িয়ে আছে ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো। অবিনাশ সত্যি বুঝতে পারছে না, হঠাৎ রাণী কেন এমন রাগ করলো। রাণীর ওপর ওর জোর ছিল কত। কত হুকুম করেছে একসময়। ওর কথায় রাণী একবার একহাত চুল কেটে ফেলেছিল নিজের। কলেজের মাইনের টাকা দিয়ে দিয়েছে অবিনাশকে। আজ একটা সামান্য কথায়—

অবিনাশ বললো, আমি ঝোঁকের মাথায় বলছি না, রাণী। অনেক ভেবে-চিন্তে এসেছি। আমরা দূরে সরে গেছি। কিন্তু আমাদের শারীরিক মুক্তি হয়নি। তোর সংসার আমি নষ্ট করতে চাই না মোটেই। আমাদের জীবন আলাদা হয়ে গেছে—আমরা দূরে দূরেই থাকবো। কিন্তু তার আগে—

হঠাৎ অবিনাশ দেখলো রাণী চলতে শুরু করেছে। পিছনে ফিরলো না, যেন ও একাই চলে যাবে। কি ভেবে অবিনাশ ওকে ডাকতে গিয়েও ডাকলো না। মনে মনে আন্তরিকভাবে বিদায় জানালো রাণীকে। ওখানে দাঁড়িয়েই ও আর একটা সিগারেট ধরালো। একা একা কিছু না ভেবে সিগারেট শেষ করলো। সত্যি সেইটুকু সময় ওর কিছু মনে পড়ল না, রাণীর কথা তো নয়ই, সম্পূর্ণ সাদা মন, ও নিচের ময়লা জলের স্রোত দেখলো। পকেটে হাত দিয়ে একবার খুচরো পয়সাগুলো গুণে দেখলো অনাবশ্যক। তারপর একটা ট্রামের টিকিট পাকিয়ে কান খুঁচতে খুঁচতে রাণীর জন্য হঠাৎ ও খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো, আমি কি রাণীকে অপমান করলুম? আমি তা মোটেই চাই নি। আসলে, যত বয়েস বাড়ছে, রাণী ততই ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছে। আবার বছর পাঁচেক বাদে রাণীকে এই কথাটা বুঝিয়ে বলা যায় কিনা—অবিনাশ পরে ভেবে দেখবে।

বন্ধু ছিল, বন্ধু নয়

গ্র্যাণ্ড হোটেলের খুব কাছেই এক বাস স্টপে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় একটা বিশাল আমদানী করা বিদেশী গাড়ি আমার পাশে এসে থামল। গাড়িখানার রং গাঢ় আকাশী নীল, সমস্ত কাচ বন্ধ, কাচের রং নীল-নীল। সামনে উর্দি-পরা ড্রাইভার, পেছনে একজন মাত্র আরোহী। গাড়িখানা থামা মাত্র হোটেলের অর্দালি এসে পেছনের দরজা খুলে

সসম্ভ্রমে দাঁড়াল। অত্যন্ত মূল্যবান পোশাকে সুসজ্জিত একজন দীর্ঘকায় অবাঙালী পুরুষ নামলো, হোটেলের গেটের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সুনীল না? এই সুনীল?

সাধারণত রূপকথার গল্প এইরকমভাবে আরম্ভ হয়। কিন্তু ঘটনাটি সত্যি। আমি অনেকক্ষণ ধরে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, কখন বাস আসবে কিংবা বাস এলেও উঠতে পারব কিনা ঠিক নেই—এই সময় দুর্লভ গাড়ি থেকে একজন নেমে আমারই নাম ধরে ডাকল।

আমি খানিকটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললাম, ইউ আর কমল আই থিংক?

সে এসে আমার হাত চেপে ধরে বলল, কিরে শালা, আমার সঙ্গে ইংলিশে কথা বলছিস কেন?

ওর গলায় যতখানি আবেগ ও উষ্ণতা ছিল, আমি তা ফোটাতে পারলাম না। মিনমিনে গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কি কমল, ভাল আছ?

—তুই কেমন আছিস, তাই বল।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিলাম, এই একরকম। অনেকদিন পর দেখা তোর সঙ্গে।

—কত বছর বল তো? বছর পনেরো-ষোলো তো হবেই?

—আরো বেশী। বাইশ-তেইশ বছর অন্তত।

—না,রে, অত না। তুই তো আমার বিয়ের সময় এসেছিলি, আমার বিয়ে হয়েছে ঠিক পনেরো সাল আগে।

আমি মনে করে দেখলাম, কমল ঠিকই বলছে বটে। ওর বিয়ের সময় আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু ওকে দেখে আমাদের স্কুলের জীবনের কথাই মনে পড়ে। স্কুলে এক বেঞ্চে পাশা-পাশি আমি আর কমল বসতাম।

আমার স্মৃতিশক্তি বেশ খারাপ। অনেক কিছুই ভুলে যাই, দু'এক বছর আগে দেখেছি এমন অনেক লোকের নামও ভুলে যাই, কিন্তু ছেলেবেলার বন্ধুদের দেখলে ঠিক চিনতে পারি। এতগুলো বছব কেটে গেছে, আমাদের দু'জনের চেহারাই বদলে গেছে অনেক, তবু একবার দেখেই ঠিক চিনতে পেরেছি।

কমল বলল, চল, চল, আমার সঙ্গে চল।

—কোথায়?

—এই হোটেলে আমাব সুইট আছে। আয় সেখানে, অনেক গল্প করব।

—কিন্তু আমি যে একটা দরকারী কাজে যাচ্ছি। এক্ষুনি বাসে উঠব।

—হুৎ তোরি। তোর ক' পয়সার কাজ? আয়, আয়—একটু পরে আমার গাড়ি তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। সেই বাড়িতেই থাকিস তো?

—না!

—আয়, ওপরে আয়, সব শুনব।

কমল আমাকে একরকম টানতে টানতে নিয়ে এল ওপরে। এই হোটেলের দারোয়ান থেকে লিফটম্যান সকলেই ওকে চেনে। ওকে দেখেই সকলে ঝুঁকে সেলাম করে আর কমল পকেট থেকে মুঠো করে একটাকার দু'টাকার নোট বার করে ওদের দিকে ছুঁড়ে দেয়। এই অভ্যাসটা কমলের ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি।

সুইটের দরজা খুলে ভেতরে সব জিনিসপত্র এলোমেলোভাবে ছড়ানো, অনেক দামী জিনিসও মেঝেতে লুটোচ্ছে।

কমল বলল, তুই একটু বোস। ঠিক দশ মিনিট, তার মধ্যেই চলে আসব। লাউঞ্জে একটা মক্কেলের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমি কাজের কথা সেরেই তুরন্ত ফিরে আসব, মাইরি, একটু বোস তুই।

—আচ্ছা ঠিক আছে, বসছি।

—তুই কি খাবি? হুইস্কি, রাম? চিকেন। মটন—

আমি হেসে বললাম, ঠিক আছে, তুই ঘুরে আয় না—

—আমি জলদি জলদি চলে আসব। তোর যা খেতে ইচ্ছে হয়, রুম সার্ভিসকে ডেকে বলে দে। পালাবি না কিন্তু—

কমল ওর কোটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলল বিছানায়। ওয়াড্রোব থেকে আর একটা কোট বার করে পরে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঝড়ের বেগে।

ফাঁক ঘরের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকতে অদ্ভুত লাগল আমার। এখন আমার বাসে ঝুলতে ঝুলতে এক জায়গায় টাকা যোগাড় করার জন্য যাওয়ার কথা। তার বদলে হঠাৎ চলে এলাম এই অপর্যাপ্ত বিলাসিতার মধ্যে।

কমল ওর কোটটা ছুঁড়ে ফেলেছে বিছানায়, তার পকেট থেকে টাকা-পয়সা ছড়িয়ে পড়েছে, সেদিকে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। একটা টোরিল-ঘড়ি গড়াচ্ছে মেঝেতে। একটা সিল্কের মাফলার দেখলেই বোঝা যায়, ওটা দিয়ে জুতো মোছা হয়েছে। কমল চিরকালই এরকম অগোছালো স্বভাবের।

আমি একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালুম। কমল আমার সঙ্গে স্কুলে মাত্র এক বছর পড়েছিল। অন্য স্কুল থেকে ফেল করে এসে ভর্তি হয়েছিল ক্লাস টেনে। পড়াশুনোয় ভাল ছিল না, কিন্তু ছেলেটিকে আমরা সবাই ভালোবাসতাম।

সেই বয়সেই বেশ লম্বা চেহারা ছিল, ওর মুখখানা সুন্দর না হলেও সরলতা মাখানো। ওর পুরো নাম কমল লাখোটিয়া, আমরা জানতাম ও বাঙালী নয় কিন্তু বাংলা বলত জলের মতন, শুধু মাঝে মাঝে লেকিন, কাফি, থোড়া—এই রকম কয়েকটা শব্দ মিশে থাকত, বুঝতে কোনো অসুবিধে হত না আমাদের।

কমলের স্বভাবের দুটি অদ্ভুত ব্যাপার আমাদের বেশী আকৃষ্ট করেছিল। ওর দু'-পকেট বোঝাই থাকত পয়সায়। টিফিনের সময় ও পকেট থেকে মুঠো মুঠো খুচরো পয়সা বার করত। বার করার সময় টুপটাপ করে খসে পড়ত দু চারটে পয়সা মাটিতে, তুলত না। এটা দেখে আমাদের অবাক হবারই কথা। আমরা তখন টিফিনে হাত-খরচ পাই দু'আনা চার আনা। সেই তুলনায় কমলের পকেটে থাকত অন্তত আট-দশ টাকা। তবে, কোনোদিন নোট দেখি নি, সবই খুচরো পয়সায়।

টিফিনের সময় আমরা ঝাল-মুড়ি বা আলু-কাবলি খেতে গেলে, কমল আমাদের সকলের দাম দিয়ে দিত। অন্তত আট-দশ জনের। তার মানে অবশ্য এই নয় যে আমরা বড়লোকের ছেলের পয়সায় নিজেদের খাবার খেতুম। ব্যাপারটা সে-রকম ছিল না। কমল নিজেই টক আর ঝাল খাবার খেতে অসম্ভব ভালোবাসত। অন্তত আট-দশ পাতা আলু-কাবলি আর কুড়ি-পঁচিশটা ফুচকা ও একলাই খেত।

আমরা টিফিনের সময় গেটে দাঁড়ালেই কমল এসে বলত, এই আমাকে খাওয়া, আমাকে খাওয়া ভাই।

আমরা বাধ্য হয়েই রাজী হতাম। কিন্তু আমাদের দু'আনা চার আনা পয়সা ফুরিয়ে যেত দু'চার মিনিটেই। তারপর কমল বলত, আরো খাব, আরো খাব। এই ফুচকাওয়ালা, সব কইকো দেও!

আমরাও খেতুম, কমলও খেত। আমাদের সব পয়সা ফুরিয়ে যাবার পর তারপর কমল খরচ করত অন্তত তিন-চার টাকা। কোনো কোনো দিন আরো অনেক বেশী। সে-সব দিন স্কুল ছুটির পর কমল জোর করে আমাদের নিয়ে যেত কচুরির দোকানে। আমরা আপত্তিও করি নি খুব একটা।

আমরা শুনেছিলাম, কমলরা এত বড় ব্যবসায়ী যে ওদের বাড়িতে খুচরো পয়সা গোণা হয় না। ওদের বিভিন্ন দোকান থেকে যত খুচরো পয়সা আসে, সব জমা করা থাকে একটা বড় গামলায়। বাড়ির ছেলেরা যখন খুশী মুঠো মুঠো তুলে নেয় সেই গামলা থেকে। এই কথা প্রথমে শুনে আমরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম।

কমল মাঝে মাঝে ক্লাসে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস নিয়ে আসত। কখনো আনত একটা ত্রিশিরা কাচ, যাকে প্রিজম্ বলে—যার মধ্য দিয়ে সব সময় রামধনু দেখা যায়। ছেলেবেলায় ঐ সব জিনিসকেই মনে হত মহার্ঘ। একবার এনেছিল একটা সুন্দর কালো

রঙের কৌটো, পাশে চাবি লাগানো। চাবিটা ঘুরিয়ে দিলেই টুং টাং শব্দে বেজে উঠত একটা বাজনা। ওরকম জিনিস আমরা কখনো আগে দেখি নি। এ ছাড়া কতরকমের হাতঘড়ি আর ফাউন্টেন পেন যে নিয়ে আসত, তার ইয়ত্তা নেই।

ওর ঐ সব জিনিস নিয়ে ক্লাসের কোনো ছেলে খুব বেশী আগ্রহ দেখালে—ও তাকে তৎক্ষণাৎ সেই জিনিসটা দান করে দিত। সে নিতে না চাইলেও জোর করে দিত পকেটে। কমলরা বড়লোক ঠিকই কিন্তু জিনিসপত্র সম্পর্কে কোনো মোহ ছিল না। অনেক বড়-লোকের ছেলেও কৃপণ হয়।

আমার সঙ্গে কমলের বিশেষ বন্ধুত্ব হবার আর একটা কারণ ছিল। ছেলেবেলা থেকেই আমি ছিলাম গল্পের বইয়ের পোকা। ইস্কুলে ক্লাস চলার সময়ও হাইবেঞ্চের আড়ালে লুকিয়ে বই পড়তাম। কমলেরও এই নেশা ছিল। ও প্রত্যেকদিন একখানা করে হিন্দী বা বাংলা বই নিয়ে আসত পকেটে করে। আমরা পাশাপাশি বসে গল্পের বইতে বিভোর হয়ে থাকতাম। অনেক সময় একটাই বই দুজনে পড়েছি একসঙ্গে। নীহার গুপ্তর বই কিংবা রোমাঞ্চ সিরিজই ওর প্রিয় ছিল—তবে আরও বেশী পছন্দ করত ভ্রমণ কাহিনী।

কমলের বই পড়ার ধরনও ছিল বিভিন্ন। সদ্য কিনে আনা নতুন বই ও পড়ার আগেই ছিঁড়ে ফেলত তিন চার টুকরো করে। তারপর এক টুকরো পড়া শেষ করে সেটা ফেলে দিত মাটিতে।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তুই বই ছিঁড়ে ফেলিস কেন রে?

ও বলেছিল, বাঃ, মোটা বই এতক্ষণ হাতে ধরে রাখতে তোর অসুবিধে হয় না?

—তা বলে নতুন বই এভাবে ছিঁড়ে নষ্ট করবি?

—বই একবার পড়া হয়ে গেলেই তো শেষ হয়ে গেল! আর কি কাজে লাগে?

আমি আমার প্রিয় বই খুব যত্ন করে জমিয়ে রাখতাম। কমল ওসবের ধার ধারত না। আমি অবশ্য বেশীর ভাগ বই-ই আনতাম লাইব্রেরি থেকে। কেনার ক্ষমতা ছিল না—সুতরাং আমার বই ছিঁড়তে দিতাম না ওকে।

অন্তত মাস ছয়েক কমলের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। স্কুলের ছুটির পরেও আমরা অনেকক্ষণ একসঙ্গে কাটাতাম। কমলরা বিশাল বড়লোক, আমি সাধারণ স্কুল-মাস্টারের ছেলে—তবু আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের কোনো অসুবিধে হয়নি। কমলের কোন অহংকার ছিল না, মনটা খুবই সাদাসিধে ধরনের। এক এক সময় ভাবতাম, কমল বড় হয়ে কি করবে? ঝানু ব্যবসায়ী হবে? কমল নিজেও এক এক সময় বলত, আমি বাবা ব্যবসা-ট্যাবসা বুঝি না। ওসব আমার বড়া ভাইয়া যা করার করবে। আমি ঘুরে বেড়াব। সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াব। আমি আফ্রিকা যাব, সাউথ আমেরিকার জঙ্গলে যাব। তুই যাবি আমার সঙ্গে?

সেই বয়েসেই আমি বুঝতাম, ও সব জায়গায় যেতে হলে অনেক টাকা লাগে। তবু আমি ভাবতাম, জাহাজের খালাসী হয়ে আমিও ঐ সব দেশে ঘুরব।

কমল একেবারে দোষ-শূন্য ছিল না। ও যখন-তখন অসভ্য ও অশ্লীল কথা বলতে ভালোবাসত। শালা কিংবা মাইরি তো ওর মুখে লেগেই থাকত। কমল আমাদের থেকে বড় ছিল দু'তিন বছরের। মেয়ে-সংক্রান্ত আলোচনায় ওর উৎসাহ ছিল বেশ।

আমরাও অবশ্য তখন মেয়েদের সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠতে শুরু করেছি, সমবয়েসী কোনো ফ্রক-পরা মেয়ে কাছাকাছি এলেই বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে, কিন্তু প্রকাশ্যে মেয়েদের নিয়ে আলোচনার সাহস পাই না। কমল সেই সময়েই দাবি করে যে ও তিনটে মেয়েকে চুমু খেয়েছে এবং একটি মেয়েকে নগ্ন অবস্থায় দেখেছে। ঐ সব কথা শুনলেই আমাদের তখন গলা শুকিয়ে যায় এবং কমলকে আমাদের তুলনায় অবিশ্বাস্য রকম বড় মনে হয়।

টেস্ট পরীক্ষার ঠিক এক মাস আগে কমল একটি বাঙালী মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল। মেয়েটির নাম অতসী। কমলের মুখে সব সময় অতসীর গল্প। আমরা তখন পরীক্ষার জন্য চিন্তিত, কিন্তু কমলের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

একদিন কমল আমাকে চুপি চুপি বলল, সুনীল, আমার একটা উপকার করবি? তোর দুটি পায়ে পড়ি ভাই।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি?

—আমায় একটা বাংলায় চিঠি লিখে দিবি?

কমল বাংলা বেশ ভালো পড়তে পারলেও বাংলা হাতের লেখা ছিল অখাদ্য, এবং অজস্র বানান ভুল।

—কাকে চিঠি লিখবি?

—অতসীকে।

—অতসী তো তোদের পাশের বাড়িতেই থাকে, তাকে চিঠি লিখবি কেন?

—অতসী নিজেই বলেছে।

যে-মেয়ের সঙ্গে ছাদে দাঁড়িয়ে কথা হয়, তাকে চিঠি লেখার দরকার যে কি, সেটা আমার তখন বোঝার কথা নয়। কমলের খুব পেড়াপেড়িতে আমি লিখে দিলাম একটা চিঠি, ভাষাটা ওরই, তার মধ্যে ভালোবাসা শব্দটা ছিল তিনবার।

আমার হাতের লেখা ছেলেবেলায় মন্দ ছিল না, চিঠিটা হাতে নিয়ে আনন্দে লাফাল কিছুক্ষণ। তারপর ওর যে কলমটা দিয়ে আমি চিঠিটা লিখেছিলাম, সেটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, নে, এটা আমি তোকে দিয়ে দিলাম!

অত চমৎকার কলম আমি আগে কখনো দেখি নি। কলমটা গোল নয়, ছ'কোনা—এবং এত বিচিত্র রং যে চোখের সামনে আনলে ঝকঝক করে।

আমার একটু লোভ হয় নি তা নয়, তবু বলেছিলাম, না, না, আমি নেব না।

কমল সেটা জোর করে আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

আমি সেই দামী কলমটা বাড়িতে এনে খুব সাবধানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমার বাবা খুব রাগী ছিলেন। বাইরে থেকে কোনো জিনিসপত্র আনা একেবারে পছন্দ করতেন না।

পরদিন সকালবেলা তিনজন অবাঙালী ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। বাবা তখন বাড়ি থেকে বেরুতে যাচ্ছিলেন, একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলেন সেই লোকগুলির সঙ্গে।

সেই লোকগুলি খুব বিনীতভাবে বললেন যে তাঁরা কমল লাখোটিয়ার বাড়ি থেকে আসছেন। কমলের যে ফাউন্টেন পেনটি আমার কাছে আছে সেটি ফেরত দিলে ওদের খুব উপকার হয়। কারণ দাদামশাই ঐ পেনটি সুইজারল্যান্ড থেকে কিনেছিলেন, ওটা ও-র একটা স্মৃতিচিহ্ন।

ওরা পকেট থেকে আর পাঁচ ছ'টা পেন বার করে বললেন, ঐ পেনটার বদলে আমি এর মধ্য থেকে যে-কোনো একটা নিতে পারি।

বাবা তো রেগে একেবারে আগুন হয়ে গেলেন। বাইরের লোকজনের সামনেই আমার ধরে বললে, কোথায় রেখেছিস বার কর! হতভাগা ছেলে। পরের জিনিস চুরি করে বংশের মান-সম্মান নষ্ট করতে বসেছিস?

সেই পেনটার বদলে অন্য কিছু নেওয়া তো দূরে থাক, বাবা সেই লোকগুলির কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং সেদিন সারাদিন আমাকে কিছু খেতে না দেবার হুকুম জারি করলেন।

তারপর কমল আর স্কুলে আসে নি। টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছিল বটে কিন্তু অ্যালাউড হতে পারে নি শেষ পর্যন্ত। কমলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চুকে যায়। বছর পাঁচেক বাদে ওর বিয়ের সময় নেমন্তন্ন করেছিল অবশ্য, আমি দেখেছিলাম কমল সাদা ঘোড়ায় চেপে বিয়ে করতে যাচ্ছে। অতসীকে নয় অবশ্য, ওর জাতের অন্য এক ব্যবসায়ী মেয়েকে।

তারপর এই এতগুলো বছর কেটে গেছে। সেই ফাউন্টেন পেনের ব্যাপারটা নিয়ে পরে আমি আর রাগ পুষে রাখি নি। কারণ আমি বুঝেছিলাম। কমল সেটা আমাকে আন্তরিকভাবেই দিয়েছিল, গুরুত্বটা ঠিক বুঝতে পারে নি।

দশ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট হয়ে গেল, কমল তবু এলো না। আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়? ওর জন্য একটা চিঠি লিখে রেখে চলে যাব ভাবছি এমন সময় কমল

এলো। আমাকে ঠেলে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললে, পালাবার মতলবে ছিলি বুঝি? বোস শালা। কি খাবি বল? হুইস্কি, রাম, ব্র্যান্ডি? খাবার কি খাবি?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুই কি খেতে চাস্?

—আমি তো ওসব ছুঁই না? কিন্তু তুই যা চাস্, তাই আনাব।

—তা হলে আমার জন্যও কিছু না।

—একটা কিছু তো নিবি কমসে কম। তোকে জোর করে খাওয়াব শালা। কেমন আছিস বল? কি করছিস? কাজ-টাজ করছিস কিছু?

কমল এক সময় বইয়ের পোকা ছিল, এখন নিশ্চয়ই বই-টইয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমি যে এখন বই-টই লিখি, কমল তার কোনো খবর রাখে না।

কিছুক্ষণ পুরনো কালের গল্প হল। ইস্কুলের সেই সব দিন, এক একটা ঘটনা মনে পড়লে হাসি আর থামতেই চায় না।

এক সময় আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুই এখন কি করছিস?

—কি আর করব, বাপ-দাদার ব্যবসা করছি। একটুও সময় পাই না মাইরি। ন্যাখ না, নিচে এক শালা দালাল এসে বসেছিল। একটা পঁচিশ লাখ টাকা টেন্ডার ধরবার জন্য ঘুষের ব্যবস্থা করার কথা ছিল। পাকাপাকি কথা ছিল পঁচিশ হাজার। এখন শালা পঞ্চাশ হাজার টাকা চাইছে। মওকা বুঝে অমনি টু পার্সেন্ট হাঁকছে।

—টেন্ডার ধরতে হলে ঘুষ দিতে হয় বুঝি?

—ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ হয়? তুই আছিস কোথায়? আমি লাখ লাখ টাকার কারবার করছি, ঘুষেই তো বেরিয়ে যায় আদ্ধেক টাকা।

হঠাৎ আমি মিইয়ে গেলাম। বহুকাল বাদে স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা, সেই হাসি-খুশী দিলখোলা কমলকে যেন ফিরে পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম এ অন্য লোক। এর জগৎ আলাদা।

আর গল্প জমলো না। ভবিষ্যতে যাতে ওর সঙ্গে আবার নিয়মিত দেখা হয়, কমল সেই জন্য জোর করতে লাগল। কিন্তু আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। আমি ওকে আমার বাড়ির ভুল ঠিকানা জানালাম। নিজের সমস্ত পরিচয় দিলাম মিথ্যে।

একটু বাদেই কমলকে আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে যেতে হবে। আমি বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

কমল ফস করে ওর হাত থেকে ঘড়িটা খুলে বলল, সুনীল। তুই এটা নে। এতদিন পরে দেখা—

আমি চমকে গিয়ে বললাম, সেকি? তোর ঘড়ি আমি নেব কেন?

কমল ছেলেমানুষের মতন মিনতি করে বলল, তোকে একটা কিছু দিতে ইচ্ছে করছে! প্লীজ নে। এটা জাপান থেকে কিনে এনেছিলাম, খুব ভালো ঘড়ি।

আমি দৃঢ়ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, না।

—তোকে এত করে অনুরোধ করছি, নিবি না? তোর হাতে ঘড়ি নেই কিনা দেখলাম—

আমি বললাম, আজকাল সময় বড় খারাপ পড়েছে যে, সেই জন্যই আমি আর সময় দেখি না।

দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। ঘড়িটার জন্য এবার আমার একটুও লোভ হয় নি। স্কুলে থাকতে কমল যখন এনতার টাকা-পয়সা খরচ করত কিংবা জিনিসপত্র বিলিয়ে দিত, তখন আমরা মনে করতাম, ও ওর বাড়ির টাকা নষ্ট করছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারি, কিছুই ওর বাড়ির টাকা নয়, সবই অন্য লোকের টাকা। সেবার ওর কলমটা নেবার জন্য বাবা আমার কান মুলে দিয়েছিলেন। এখন ওর ঘড়িটা নিলে হাজার হাজার অদৃশ্য হাত হয়তো আমার কান মুলে দেবার জন্য এগিয়ে আসতো।

গেটের মুখেই দাঁড়িয়েছিল রতন, তার দিকে এক পলক তাকিয়েই হেমেন বুঝতে পারল। তবু বিশ্বাস হয় না। রতনের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, কিরে? রতন প্রথমটায় কোনো কথা বলতে পারল না, দাদার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মাটির দিকে তাকাল, তার পর বলল, পৌনে চারটের সময়—

—কি?

—ভালো হয়ে আসছিল, নিঃশ্বাসও অনেকটা ঠিক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ—

—নেই!

নেই। তার কোনোক্রমেই এ কথাটা ফেরানো যাবে না। হাসপাতালের গেটে দাঁড়িয়ে হেমেনের মনে হল, আর সবই ঠিক আছে, শুধু একজন নেই। ঠিক চার বছর বয়েস হয়েছিল মেয়েটার, সামনের বেস্পতিবার ওর জন্মদিন করার কথা ছিল। কিছু না ভেবেই হেমেন একবার পেছনের দিকে তাকাল।

—তোর বৌদিকে খবর দিয়েছিস?

—না।

মণিকা বেলা দুটো পর্যন্ত হাসপাতালেই ছিল, তার পর তাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে হেমেন গিয়েছিল একবার অফিসে ঘুরে আসতে। তখন তো অবস্থা বেশ ভালোই ছিল, শ্বাসকষ্ট কমে গিয়েছিল, চোখ মেলে চেয়েছিল, ডঃ বাগচী বেশ জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, আর কোনো ভয় নেই. এর থেকে অনেক ক্রিটিক্যাল অবস্থাতেও ডিপথিরিয়া রুগী বেঁচে যায় আজকাল। ডাক্তারের কথা শুনে মণিকাও ভরসা পেয়েছিল নিশ্চয়ই. না হলে সে হাসপাতাল থেকে যেতে রাজী হত না।

খবরটা শুনে হেমেন খুব যে আঘাত পেল, তা নয়। সে কি মনে মনে একটু তৈরি হয়েই ছিল না? অফিসের কো-অপারেটিভ থেকে টাকা ধার করার সময় তার কি মনে হয় নি, হঠাৎ যদি কিছু একটা হয়ে যায়, তা হলে হাতে কিছু টাকা থাকা দরকার! পরশু সন্ধ্যেবেলা যখন অনীতার প্রথম ডিপথিরিয়া ধরা পড়ল—সেই সময় তার বুকটা যেমন কেঁপে উঠেছিল, সেই তুলনায় এখন সে অনেক সহজভাবেই ঘটনাটা নিল। মেয়ের চেয়েও এখন মণিকার কথাটাই তার মনে পড়ল বেশি করে। মণিকা কি আঘাতটা সামলাতে পারবে? বড্ড চাপা মেয়ে, কখন যে কি করবে কিছু ঠিক নেই।

রতনকে বলল, তুই এখানেই থাক্। আমি তোর বৌদিকে খবরটা দিয়ে আসি।

—তুমি একবার দেখবে না?

—এখন আর দেখে কি করব।

—বৌদিকে আর হাসপাতালে এনে কি হবে? আমরাই খুকীকে বাড়িতে নিয়ে যাই।

—নিয়ে যাব?

হেমেন এই প্রথম একটু দিশেহারা হয়ে পড়ল। রতনের সঙ্গে কথা বলছিল খুব আলগাভাবে, আসলে সে মনে মনে ভেবে নিচ্ছিল, এর পর, পর পর কি করবে। মণিকাকে কি করে খবর দেবে, আর কাকে কাকে জানাবে, শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা। ঐটুকু মেয়েকে তো আর খাটে করে নিতে হবে না—কিন্তু রতন বলছে এখনই বাড়ি নিয়ে যেতে, একেবারে মরা মেয়ে কোলে নিয়ে মণিকার সামনে দাঁড়াব—না, না।

—হাসপাতাল থেকে কিছু বলেছে না কি? এক্ষুণি নিয়ে যেতে হবে?

—না, তা কিছু বলে নি।

—তুই তা হলে অপেক্ষা কর, মণিকাকে নিয়েই আসি। শেষ সময়ে তুই কাছে ছিলি? কথা-টথা বলেছে?

—আমাকে যেতে দেয় নি তবে জ্ঞান নাকি ফিরেছিল, কথা বলারও চেষ্টা করেছিল।

—কি বলেছে? ওর মাকে খুঁজছিল?

—তা জানি না। স্টাফ নার্স বলল যে কথা বলার চেষ্টা করছিল।

মণিকা একেবারে বেড়াল সহ্য করতে পারে না। বেড়াল দেখলেই তার ঘেন্না হয়। কিন্তু পাশের ফ্ল্যাটের পোষা বেড়ালটা যখন-তখন আসত, অনীতা সেটাকে নিয়ে খেলা করত—বারণ করলেও শুনত না, ঐটুকু মেয়ে, ওরা তো বেড়াল দেখলে—। বেড়ালটার ওপর রাগ করতে গিয়েও করতে পারল না হেমেন। ওই বেড়াল থেকেই যে ডিপথিরিয়া হয়েছে, তার কোনো মানে নেই, পাশের ফ্ল্যাটেও তো দুটো বাচ্চা আছে, তারা সব সময় বেড়ালটাকে নিয়ে চট্‌কায়, তাদের তো হয় নি। পাড়ার ডাক্তারটি যদি সঙ্গে সঙ্গে রোগ ধরতে পেরে হাসপাতালে পাঠাতে বলত, পুরো একটা দিন দেরি করে দিল টন্সিল টন্সিল বলে—কিন্তু সে ডাক্তারটারও দোষ নেই, সে কি আর ইচ্ছে করে তার মেয়েকে মেরে ফেলতে চেয়েছে? সে তার সাধ্যমতন চেষ্টা করেছে। আসলে সবই হল—। সবই হল কি? নিয়তি। এর নাম নিয়তি? হেমেন তো কখনও নিয়তিতে বিশ্বাস করে নি।

অন্য সময় মানুষের নিষ্ঠুরতা, হাসপাতালের অবস্থা নিয়ে হেমেন অনেক কিছু ভেবেছে। কিন্তু এখন হেমেন কারুর সম্পর্কেই কোনো অভিযোগ টের পেল না। তার মেয়ের অসুখ হওয়ার পর সে যার যার সংস্পর্শে এসেছে, সবাই তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছে। হাসপাতালে এত ভিড়, ডাক্তার নার্সরা তো অনীতার নামও জানে না—তাদের কাছে ও ছিল পেসেন্ট কিংবা বেড নম্বর সাত, কথা বলার সময় বলত আপনার পেসেন্ট আপনার মেয়ে বলত না—তবু তো ওরা যন্ত্রের মতন ব্যবহার করে নি, অনেক যত্ন করেছে, বয়স্কা নার্সটি তো অত ব্যস্ততার মধ্যেও মণিকার সঙ্গে এসে নরমভাবে কথা বলেছে। তার কিংবা মণিকার অফিসে ছুটি দিতে একটুও আপত্তি করেনি। তাদের অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার অন্য দিন তার সঙ্গে খুব রুক্ষ ব্যবহার করে, কিন্তু আজ এমন আন্তরিকভাবে কথা বলছিল যে হেমেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এমন-কি যে ট্যাক্সিতে অনীতাকে হাসপাতালে এনেছিল সেই ট্যাক্সি-ড্রাইভারও কত ভাল ব্যবহার করেছিল!

বেলেঘাটায় আই. ডি. হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে দশ মিনিটের মধ্যে হেমেন একটা ট্যাক্সি ধরতে পারল না। তার মেয়ে মারা গেছে, আর সে এখন ট্যাক্সির জন্য ছুটোছুটি করছে—এ ব্যাপারটা যেন কেমন অবাস্তব মনে হল তার কাছে। মণিকা এখনো জানে না। সে এখন কি করছে কে জানে! কাল সারারাত ঘুমোয় নি, ঘুমিয়ে পড়েছে কি? পাঁচটার সময় ওর হাসপাতালে আসবার কথা আছে—হেমেন আর দেরি করলে মণিকা হয়তো বেরিয়ে পড়বে। হেমেন এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছে অথচ ট্যাক্সি পাবার যে কোনো উপায় নেই। সে কি মাঝরাস্তায় হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়বে, চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে তার যাত্রীদের বলবে, আমার মেয়ে এইমাত্র মারা গেছে, আপনারা দয়া করে আমাকে গাড়িটা ছেড়ে দিন, আমার বিষম দরকার—তা হলে যে কেউ ট্যাক্সি ছেড়ে দেবে নিশ্চয়ই। কিন্তু হেমেন ওরকম করতে পারবে না।

ট্যাক্সির জন্য সময় নষ্ট করার চেয়ে বাসে যাওয়াও বরং ভালো। মনস্থির করে হেমেন একটা বাসেই উঠে পড়ল। বেশ ভিড় তবু চেষ্টা করে পা-দানিতে না ঝুলে সে ভেতরে ঢুকে গেল কোনোক্রমে। একটু বাদেই তার মনে হল সে তো অনীতার কথা তেমনভাবে ভাবছে না। একমাথা কোঁকড়া চুলে অনীতার টলটলে মুখখানা মাঝে মাঝে তার চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সে অন্যদের কথাই বেশি ভাবছে, মণিকার কথা, তার মা-কে খবরটা দিলে তিনি কি রকম আঘাত পাবেন, তাদের অফিসের এক কলিগের ছেলে মারা গেছে ছ'মাস আগে—তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত বিষণ্ণ মুখ। এমন-কি রতনের কথা ভেবেও তার একটু কষ্ট হল—ও বেচারা একা একা দাঁড়িয়ে আছে হাসপাতালের গেটে সেই দুপুর থেকে—ওরও তো কম কষ্ট হয় নি, কত ভালোবাসত অনীতাকে। হেমেন নিজের মধ্যে খুব বড়ো রকম কোনো পরিবর্তন টের পেল না। অনীতা নেই শুনেও তো তার চোখে জল আসে নি শুধু ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা, অনেকক্ষণ খিদে চেপে রাখলে যে-রকম হয়। খুব একা একা লাগছে, রতনকে সঙ্গে নিয়ে এলেই ভালো হত—এখান থেকে বাড়িতে মণিকার সামনে পৌঁছনো পর্যন্ত রাস্তাটা যেন বিষম লম্বা, এতখানি রাস্তা তাকে একা একা যেতে হবে এটাই যেন অসহ্য, মরুভূমির মধ্যে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় একা একা হাঁটার

মতন। এক একটা স্টপে বাস থামার পর আবার ছাড়তে দেরি হলে সে গভীর মনোযোগ দিয়ে লোকজনের ওঠা-নামা দেখছে।

একটি লোক কর্কশ গলায় হেমেনকে বলল, সামনে এগিয়ে যান না।

হেমেন মৃদুভাবে বলল, যাচ্ছি।

—যাচ্ছি মানে কি! তখন থেকে গেটের মুখে—

লোকটি হেমেনকে বেশ জোরে ধাক্কা দিয়ে পা মাড়িয়ে এগিয়ে গেল। হেমেন তাকে কিছু বলল না। আহা, লোকটা তো আর জানে না, একটু আগে আমার মেয়ে মারা গেছে! জানলে নিশ্চয়ই ওরকমভাবে বলত না। ও কি জানে, অনীতা, আমাদের অনীতা, পরশু বিকেলেও ছুটোছুটি করেছে, জন্মদিনে ওকে একটা সুটকেশ দিতে হবে বলেছিল, অনীতা নেই। আমি বেঁচে আছি, আমার প্রাণ দিয়েও যদি ওকে বাঁচানো সম্ভব হত—অনীতা নেই—কি করে আমি বেঁচে থাকব, আর মণিকা—

বাস থেকে নেমে হেমেন তাড়াহুড়ো না করে সহজভাবে আস্তে আস্তেই হাঁটতে লাগল। মণিকাকে একবারেই বলা যাবে না। আস্তে আস্তে, প্রথমে বলবে, ওর অসুখটা আবার বেড়েছে. বিশেষ ভয় নেই যদিও—। এই বলে মণিকাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুবে, তার পর হাসপাতালে যাবার পথে, কিংবা—হাসপাতালে পেঁছে ইস, মণিকাদের বাড়িতে আগে খবর দিয়ে ওর বোনটোন কারুকে সঙ্গে নিয়ে এলে হত—এই সময় মেয়েরা কেউ সঙ্গে থাকলে—সে একা একা কি করে এত সব—

পাড়ার একটি ছেলে হেমেনকে ডাকল। ছেলেটি সেজেগুজে কোথায় বেরুচ্ছে, মুখভর্তি পান। বেশ হালকাভাবেই সে বলল, হেমেনদা, আজ এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছেন যে? ও, আপনার মেয়ের অসুখ, কেমন আছে?

হেমেন তক্ষুনি ওকে বলবে কি না বুঝতে পারল না। অস্পষ্টভাবে বলল, এই-ই—তার পর কয়েক পা এগিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আবার পিছনে ফিরে ছেলেটিকে ডেকে বলল, শোনো বাবলু, অনীতা একটু আগে মারা গেছে!

ছেলেটির হাসিখুশী মুখখানা মুহূর্তে চুপসে গেল, একটা কালো ছায়া পড়ল। খুব আস্তে আস্তে বলল, সে-কি! কখন?

ছেলেটি পাড়ার মস্তান ধরনের, তার এ রকম আন্তরিক দুঃখিত মুখ হেমেন কখনো দেখে নি: ওকে কথাটা বলে ফেলে হেমেন অনেকটা নির্লিপ্ত হয়ে যেতে পারল। তার মনে হল, ও সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছিল, ওকে এখন এই শোকের খবরটা না দিলেই ভালো হত। তার মেয়ে মারা গেছে বলে পৃথিবীসুদ্ধ সবাই তো আর কাজ থামিয়ে থাকবে না। বাড়িতে বাড়িতে ঝনঝন করে রেডিও বাজছে, সিনেমা হলগুলো মানুষে ভর্তি, খেলার মাঠে খেলা চলছে—সে নিজেও তো খবরের কাগজে যখন পড়ে—কোনো বাচ্চা ছেলেমেয়ে গাড়ি চাপা পড়ে কিংবা জলে ডুবে মারা গেছে—কতটা আর দুঃখ পায়। এমনকি কোনো আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও এ রকম হলে বড়জোর একবার—। অনীতা শুধু তার আর মণিকার ছিল, ওদের দুজনের জীবনের যা দাম—তার চেয়েও বেশি। অনীতা, অনীতা...। এই প্রথম হেমেনের চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল, বুকটা কাঁপতে লাগল. মণিকা কি করে সহ্য করবে, মণিকা—

—দাদা। আমি আপনার সঙ্গে যাব? যদি কোনো দরকার লাগে—

—না, ভাই, ঠিক আছে।

—বলুন না, আমার কোনো কাজ নেই, হাসপাতালে-টাসপাতালে যদি—

—না না, বাবলু. ঠিক আছে।

মণিকা কি দোতালার জানলায় দাঁড়িয়ে থাকবে? বাড়ির সামনে এলেই চোখাচোখি হবে? তার মুখ দেখেই—। হেমেন রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিল। প্রথমেই কিছুতে বলা যাবে না মণিকাকে। যে গেছে সে তো গেছেই. এখন মণিকা, এত চাপা মেয়ে—

জানলায় কিংবা বারান্দায় মণিকা নেই। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে হেমেন তার ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়াল। অন্যমনস্কভাবেই একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল হেমেন। দরজা বন্ধ, কিন্তু

হাত দিয়ে ঠেলতেই খুলে গেল। তাদের শোবার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, তার চুলগুলো সব খোলা। টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সে হেমেনের দিকে তাকিয়েই বলল, কখন?—

মাত্র চারটে বছর বেঁচে ছিল পৃথিবীতে, তবু অনীতার জিনিসপত্রেই ঘর ভরা। দিন পনের হল সে আর নেই, তবু ঘরে যেখানে তার জিনিসপত্র যেরকম ছিল, এখনো সেখানেই আছে। যে জানে না, তার মনে হবে, মেয়ে বুঝি পাশের ঘরে খেলা করতে গেছে। তার আলাদা বিছানা, তার প্র্যাম, তার হাই চেয়ার, ডজন ডজন পুতুল, তার ছবির বই—সামনের জানুআরি থেকে তার স্কুলে ভর্তি হবার কথা ছিল।

মণিকা ভেঙে পড়ে নি। দিন তিনেক শুধু যখন-তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠত। এখন শুধু মৃদু গলায় কথা বলে। বারো দিনের দিন থেকে মণিকা আবার অফিসে যেতে শুরু করল। হেমেন বারণ করেছিল, কিন্তু মণিকার আর ছুটি পাওনা নেই, বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে অফিসে লোকজনের মধ্যে থাকলে তার বরং খানিকটা ভার কেটে যাবে।

বরাবরই হেমেন আর মণিকা একসঙ্গে অফিসে বেরোয়। একই বাসে ওঠে, মণিকা নেমে পড়ে ডালহাউসিতে, হেমেন যায় লিট্‌ল র‍্যাসেল স্ট্রীটে। এখন শুধু একটা পরিবর্তন হয়েছে। আগে বাসের জন্য দাঁড়াবার সময় হেমেন পানের দোকান থেকে দুটো মিষ্টি পান কিনত—মণিকা পান খেতে ভালোবাসত, হেমেন খেত ঐ একটাই সারাদিনে। অনীতা মারা যাবার পর প্রথম দিন একসঙ্গে অফিসে বেরিয়ে হেমেন পান কিনতে ভুলে গেল। মণিকাও কিছু বলল না। পরদিন সেটা খেয়াল হতেই হেমেন বুঝতে পারল মণিকা পান খাওয়া ছেড়েই দিয়েছে। হেমেন অনুরোধ করতেও আর খেতে চাইল না। হেমেন অবশ্য সিগারেট ছাড়তে পারে নি, বরং আগের থেকে এখন আরো বেশি সিগারেট খায়। সিগারেট টানতে টানতে সে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

আগে অফিস থেকে দুজনে আলাদা-আলাদা ফিরত, এখন হেমেন তার অফিস থেকে একটু আগে বেরিয়ে মণিকার অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর দুজনে একসঙ্গে ফেরে। বাসে-ট্রামে খুব বেশি ভিড় থাকলে হেঁটে হেঁটেই আসে—কত অল্প সময়ে যে রাস্তাটুকু ফুরিয়ে যায়, তা টেরই পায় না। মণিকা খুব আস্তে আস্তে বলে, জানো, খুকীর যখন প্রথম চোখ লাল করে জ্বর আসে, তখনই যেন আমি বুঝতে পেরেছিলুম, ও আর থাকবে না—

—গত বছরেও তো ওর জ্বর হয়েছিল, অনেক বেশি ভুগলো।

—তখন ভয় হয় নি, এবার—জ্বরের ঘোরে জিজ্ঞেস করেছিল। মা, জন্মদিনে আমায় সুটকেস কিনে দেবে তো? ঠিক দেবে? এ কথা কেন বলেছিল বলো তো? ও যখন যা চেয়েছে, কোনোদিন কি তাতে আপত্তি করেছি?

—জ্বরের ঘোরে ওরকম এমনিই মনে আসে—সেবারেও তো—

—ও ঠিকই বুঝেছিল, আমরা কিনে দেব না, ওর জন্মদিন চলে গেল, সত্যিই তো আমরা সুটকেস কিনি নি—ও যেখানে আছে, সেখানে আছে, সেখান থেকে দেখছি—আমরা ওকে—

—ও কোথায় আছে?

—কোথায় কি নেই? সত্যি নেই? একেবারে হারিয়ে গেছে?

—মণি, আমি জানি না—

—ওর জন্মের আগে তুমি-আমি দুজনেই ছেলে চেয়েছিলুম, আমরা মেয়ে চাই নি—ও বুঝতে পেরেছিল, তাই অভিমান করে চলে গেল—

—মণি, তা নয় ওকে যা আমরা ভালোবাসতাম—

রাস্তায় জনস্রোত এক দিকে যায়, ওরা দুজন তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ওরা দুজনে শুধু দুজনের চোখে চোখে কথা বলে, ওদের পাশে পাশে অনীতার স্মৃতি-মূর্তি

যায়—ওরা পৃথিবীর আর কিছু জানে না। বিয়ের আগে যখন ওরা পাশাপাশি রাস্তা দিয়ে হাঁটত—তখনো ওরা নিজেদের মধ্যে এত বিভোর হয়ে থাকে নি।

রতন শিবপুরের হোস্টেলে ফিরে গেছে, তবু প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলা আসে। অনীতার খেলনাগুলো নিয়ে সে-ই কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে, তার পর ক্লান্তভাবে বলে, বৌদি, এগুলো এবার আলমারিতে তুলে রাখো, সব সময় চোখের সামনে রেখে আর কি লাভ? মণিকা সংক্ষেপে জবাব দেয়, হ্যাঁ, রাখব। অনেক আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবও আসে রোজই, বিষণ্ণ ভারি মুখ নিয়ে তারা ঢোকে, প্রথমে কিছুক্ষণ অনীতার কথা বলে, অনীতা দেখতে কত সুন্দর ছিল, কী আশ্চর্য ছিল তার বুদ্ধি, ওরা দু-একজন এ রকম শাপভ্রষ্ট হয়ে আসে, দিন ফুরোলেই আবার ফিরে যায়—শুধু মায়ার বাঁধনেবেঁধে বাপ-মাকে দগ্ধে মারে। ঈশ্বরের লীলার কথাও বলেন কেউ কেউ। একটু বাদেই তাঁরা প্রসঙ্গান্তরে চলে যান—অন্য কথায় ভোলাবার চেষ্টা করে হেমেন আর মণিকাকে। ওরা প্রসঙ্গান্তরে গেলেই হেমেন একটু স্বস্তি পায়—যতক্ষণ ওঁরা অনীতার কথা বলছিলেন, ওঁদের আন্তরিকতার কোনো সন্দেহ ছিল না—তবু সব কথাই কেন যেন হালকা হালকা, হেমেন বুঝতে পারে, অনীতা আগে ছিল আর সকলেরও—এখন শুধু তার তার মণিকার সম্পূর্ণ নিজস্ব, তাদের দুজনের বুকের মধ্যে সে বেড়ে উঠছে। ওঁরা যখন অন্য কথা বলেন, তখন হেমেন মাঝে মাঝে আড়চোখে মণিকার দিকে তাকায়, দেখে যে মণিকাও ঠিক তখন আর দিকে চেয়ে আছে।

মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে ধড়মড় করে উঠে বসে মণিকা। হেমেনকে ধাক্কা দিয়ে বলে, আচ্ছা, হাসপাতালে খুকী শেষ কথা কি বলেছিল বলো তো? পাতলা ঘুম হেমেনের সহজেই ভেঙে যায়, তবু ওর কথা বুঝতে পারে না, আচ্ছন্ন গলায় জিজ্ঞেস করে, কি বললে? অজান্তেই পাশের দিকে হাত চলে যায়, অনীতা পাশেই শুতো—যে-কোনো সময় হাত বাড়ালেই হেমেন তার ছোট্ট উষ্ণ শরীরটার স্পর্শ পেত।

—ও শেষ কথা কি বলেছিল?

—তা তো জানি না, রতন বলেছিল, ও শেষে কিছু একটা বলার চেষ্টা করেছিল, বলতে পারে নি—

—আমি এইমাত্র ওকে স্বপ্ন দেখলুম, ও মা মা বলে ডাকল, কি অভিমান ওর গলায়—বলো না, ও শেষ কথা কি বলেছিল?

—সত্যিই জানি না, মণি—তুমি শোও।

—ও বুঝতে পেরেছিল, আমরা ওকে চাই নি, আমরা ছেলে চেয়েছিলাম—

—না, না। তা বোঝার বয়েস ওর হয় নি—ওর জন্মের আগে আমরা কি চেয়েছিলুম—তার চেয়েও অনেক বড়ো ওর জন্মের পর ওকে কত বেশি চেয়েছিলাম।

তবু ও বুঝেছে, এখন যেখানে আছে, সেখান থেকেও অভিমান করে আমায় ডাকল, মা মা।

—এখন ও কোথায় আছে?

—কোথায়? কোথায়?

—ও আর কোথাও নেই।

হেমেন উঠে বসে মণিকার কাঁধে হাত রাখল। অন্ধকারেও অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল, মণিকার চোখে জল নেই, চোখ দুটো থরথর করছে। সারা শহর অন্ধকার, কোথাও কোনো শব্দ নেই। হেমেনের মনে হল পৃথিবীর চেয়েও বড়ো এক বিশাল শূন্যতা, এত বিশাল যে সেই শূন্যতার কথা ভাবলেই শীত শীত করে, তার মধ্যে শুধু ওরা দুজন মুখোমুখি বসে আছে, আর কেউ নেই, কোনো অবলম্বন নেই। এই শূন্যতার মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে অনীতা—তবু ওরা দুজনে বেঁচে আছে। হেমেন কখনো ঈশ্বর মানে নি, ইহকাল-পরকাল মানে নি—তার মনে হল, ঈশ্বর মানলে তবু ঈশ্বরের নামে সান্ত্বনা পাওয়া যেত। মনে করতে পারত, স্বর্গের সৌরভময় উদ্যানে অনীতা খেলা করছে দেবশিশুদের সঙ্গে। সে ভালো আছে। কিন্তু অবিশ্বাস তাকে একেবারে নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে—অনীতা আর নেই, আর কোথাও নেই—এ কথা ভাবতেই তার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল—মণিকাকে সে

কি বোঝাবে?

অফিসে প্রথম প্রথম সবাই হেমেনের সঙ্গে অতি সন্তর্পণে সমীহ করে কথা বলত। মাস-খানেক পেরিয়ে যাবার পর সবাই আবার স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল। হেমেনের চেয়ে উঁচু পোস্টে আছে—এমন প্রায় দশ-এগারো জন। তাদের কেউ হেমেনের সঙ্গে সামান্য অবহেলায় কিংবা উঁচু গলায় কথা বললে হেমেন আজকাল সইতে পারে না। আগে এ-সব সে গায়েই মাখত না। এখন সর্বাঙ্গ জ্বালা করে, চোখ জ্বালা করে, অনীতার কথা আরো বেশি মনে করে। অনীতার হাস্যময় মুখখানা দপ্‌ করে ফুটে ওঠে তার চোখের সামনে —মাথা নিচু করে হেমেন মনে মনে বলে, তুই কি সত্যি বুঝতে পারিস নি তোকে এত ভালোবাসতুম, কেন ছেড়ে গেলি! অনীতা—

শোক ওদের দুজনকে পৃথিবী থেকে একেবারে আলাদা করে দিয়েছে। ওরা মহীয়ান হয়ে উঠেছে। ওরা মাটির ওপর নরমভাবে পা ফেলে হাঁটে, কখনো একটাও মিথ্যে কথা বলে না, ফেরিওয়ালার কাছে জিনিসপত্র কেনার সময় দর করে না—ট্রামে বাসে কেউ ধাক্কা-ধাক্কি করলে একটা কথাও বলে না। অন্য কারুর সঙ্গে অনীতার কথা আলোচনা করাও ওরা পছন্দ করে না। অন্যদের সামনে চুপ করে থাকে কিংবা অন্য কথা বলে, শুধু দুজনে যখন সম্পূর্ণ নিরালা—তখন ওরা চোখাচোখি তাকায়—তখন ওদের মিলিত আত্মা অনীতার ছায়া হয়ে মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

মণিকা এক একদিন ওকে বলে, হয়তো আমি কোনো পাপ করেছিলাম, তাই।

—ছি মণি, অত দুর্বল হয়ে যেও না—ও-সব কুসংস্কার।

—তা হলে কেন এমন হল? কেন আমার—আমি যে কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না, পৃথিবীর এত লোক থাকতে শুধু আমারই এমন কঠিন শাস্তি—

—শুধু কি তোমার একার—

—তোমার আর আমার! তাব তো কারুর না! কেন?

অনীতার মৃত্যু-সংবাদ প্রথম শুনে হেমেনের চোখে জল আসে নি। প্রথম দুদিন সে একেবারেই কাঁদে নি। কিন্তু, এখন, এতদিন বাদে, ঘন ঘন চোখ ভিজে আসে। কিছু বোঝবার আগেই জল গড়িয়ে আসে, মণিকার সামনে থেকে সে তাড়াতাড়ি চোখ ফেরায়। মণিকা প্রথম দুদিন অজ্ঞানের মতো আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। তার পর কয়েকদিন মাঝে মাঝে যখন-তখন ফুঁপিয়ে উঠেছে। এখন মণিকা আর একটুও কাঁদে না। হেমেনের চোখে জল দেখে সে বড়ো বড়ো চোখ মেলে শুকনোভাবে তাকিয়ে থাকে। যেন সে খুব অবাক হয়ে গেছে। মণিকার ওরকম তাকানো দেখে হেমেনের একটু একটু ভয় হয়। গা ছমছম করে অজানা আশঙ্কায়।

হেমেন যুক্তি দিয়ে জানে, এরকম ঘটনা শুধু তাদেরই প্রথম ঘটে নি। পৃথিবীতে এরকম আঘাত আরো অনেকে পেয়েছে, তার পর আস্তে আস্তে সামলে উঠেছে, সময়ে সব কিছুই সরে যায়। কিন্তু কতদিন সময়? দুমাস হয়ে গেল, কিন্তু দিন দিন যেন বেড়ে যাচ্ছে। অনীতা মারা গেছে, কিন্তু তার বিচ্ছেদ যেন একটা জীবন্ত ব্যাপার—প্রতিদিনই সেটা একটু একটু করে বেড়ে উঠছে। এখন প্রায় সব সময়ই অনীতার কথা মনে পড়ে, হঠাৎ হঠাৎ দৃষ্টি-বিভ্রম হয়, যেন স্পষ্ট পাশের ঘর থেকে অনীতাকে ছুটে আসতে দেখে, কিংবা পর্দাটা একটু ফাঁক করে দুষ্টুমির সুরে বলছে, বা-বা, এই—যে, হেমেন চমকে চমকে ওঠে। মাঝে মাঝে তার এমন কষ্ট হয় যে, হাড়-পাঁজরা পর্যন্ত ব্যথা করে ওঠে, জানলার দিকে মুখ রেখে হেমেন হুহু করে কাঁদতে থাকে। মণিকা আর একটুও কাঁদে না, সেই যেন খুব সহজে সামলে নিয়েছে, হেমেনকে কাঁদতে দেখলে নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়ায়। শুধু দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে মণিকা। হেমেনের হাতে তার হাতটা ছোঁয়া লাগলেই বুঝতে পারে, মণিকার হাতটা ঠাণ্ডা, বড়ো ঠাণ্ডা।

বন্ধুদের পরামর্শে হেমেন অফিসে ছুটি নিয়ে মণিকাকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে গেল। এমন করে তো আর চলবে না, যা অবধারিত তাকে মেনে নিতেই হবে—এখন অন্য দিকে মন ফেরালে শরীর আর থাকবে না। কেউ কেউ বলেছিল যে, আর-একটি সন্তান হলেই আস্তে আস্তে ভুলে যাবে। এ কথা শুনে শিউরে উঠেছিল হেমেন। অনীতার জায়গা কি

আর কারুকে দিয়ে ভরানো সম্ভব? অনীতাকে ভোলার জনাই আর একজনকে পৃথিবীতে আনবে—এমন কদর্য কথা মানুষ ভাবতে পারে? কিন্তু মণিকাকে অন্য দিকে মন ফেরাতে সে বলবে কি করে? সে নিজের মুখে কিছুতেই তাকে ধর্মকর্ম নিয়ে মাততে বলতে পারবে না! মণিকাও নিজে থেকে সে-রকম কোনো উৎসাহ দেখায় নি। মণিকাকে সে পুরী যাবার কথা বলতেই এক কথায় রাজী হয়ে গেল। যেন মণিকাও ভাবছিল হেমেনের মন-ফেরানোর জন্য কোনো কিছু করা দরকার।

কেন পুরীর কথাই তার মনে এল। কেন মণিকা আপত্তি করল না। আগে হেমেনের মনেই পড়ে নি, স্বর্গদ্বার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওর খেয়াল হল, বিয়ের ঠিক এক মাস বাদে ওরা এই পুরীতেই বেড়াতে এসেছিল। তখন খুশিতে উজ্জ্বল মণিকা, সিল্কের আঁচল উড়ছিল হাওয়ায়, চঞ্চল পায়ে বালির ওপর এঁকেবেঁকে হেঁটে ছিল ওরা দুজনে. হেমেন সিগারেট ধরাতে গিয়ে হাওয়া আটকাবার জন্য মণিকাকে বলেছিল একেবারে আমার গা ঘেঁষে হাওয়ার উল্টোদিকে দাঁড়াও তো! হোটেল কত মানুষজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, দল বেঁধে স্নান করেছিল সবাই মিলে, মণিকা তিন ঘণ্টা পরেও জল ছেড়ে উঠতে চায় নি। সেই-সব কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ায় হেমেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়, বুঝতে পারে না মণিকারও মনে পড়ছে কি না। হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্কভাবেই হেমেন একটা ঝিনুক কুড়িয়ে নেয়। নখ দিয়ে বালিগুলো খুঁটে খুঁটে বার করতে গিয়ে হেমেনের মনে পড়ে যায়, মণিকা বলেছিল সে সময়, নিজের ইচ্ছে মতন সংসার সাজাব, এতদিন পর স্বাধীন হলাম—এত ভালো লাগছে—আমি কিন্তু এখন বাচ্চাটাচ্চা চাই না—বড্ড ঝামেলা—হেমেন মণিকার দিকে তাকাল, মণিকার দৃষ্টি অন্যদিকে—হঠাৎ অজানা এক অনুভূতিতে হেমেনের শরীর শিরশির করে উঠল।

এখন ওরা হোটেলের দোতলার বারান্দায় নিঃশব্দে বসে থাকে। সামনে যতদূর দেখা যায়—সমুদ্রের নীল শূন্যতা। বেলাভূমির মানুষজনের অস্পষ্ট কোলাহল ঢেকে যায় বাতাসের ঘোর শব্দে। খাবারঘরে খেতে গিয়েও ওরা চুপ করে থাকে মাঝে মাঝে হেমেন আড়চোখে মণিকার দিকে তাকাতে গেলেই চোখাচোখি হয়ে যায়, দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামায়। যেন কোনো অপরাধ করেছে ওরা।

কখনো কখনো দুজনে বাইরে বেরোয়। খুব কাছাকাছি, প্রায় গা ঘেঁষে ওরা হাঁটে, অনেক দূরে চলে যায়, আবার ফেরে। যতক্ষণ আশেপাশে মানুষ দেখা যায়, ওরা একটা কথাও বলে না। কলকাতায় থাকতে ওরা পরস্পরকে সান্ত্বনা দেবার সুরে কথা বলত, এখানে এসে হঠাৎ যেন সব কথা শেষ হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে যখন ওরা শহর ছাড়িয়ে যায়, শুধু বালিয়াড়ি আর ঝাউবন, পাশে অতিকায় সমুদ্র ও মাথার ওপরে আকাশ, সূর্য নেমে গেছে দিগন্তের খাদে—তবু প্রচ্ছন্ন ম্লান আলো. সেই সময় মণিকা মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে, ডিপথিরিয়া হলে কি কোনো বাচ্চাই বাঁচে না?

—নিশ্চয়ই বাঁচে, প্রায় সবাই বেঁচে যায় আজকাল।

—তবে ও কেন—

—এর কোনো উত্তর নেই, আমরা তো চেষ্টার ত্রুটি করি নি, তবু এ-সব—

—এ সবই কি?

নিয়তি কথাটা বলতে গিয়েও হেমেনের মুখে আটকে যায়। সে কি সত্যিই জানে নিয়তি এর নাম? সে বিবর্ণ গলায় বলল, আমি জানি না মণি, আমি জানি না--

—তুমিও জানো না? ওর জন্মের সময় আমি কি কষ্ট পেয়েছিলুম—আমিই বাঁচব কিনা সন্দেহ ছিল। ডাক্তার বলেছিল, সন্তান বাঁচলেও মা বাঁচবে কিনা ঠিক নেই , কি, বলে নি এ কথা ডাক্তার? এখন ও নেই, তবু আমি বেঁচে রইলুম কেন? কেন, বলো?

—এর কি কোনো উত্তর হয়? আমি জানি না, এবার ও-সব কথা ভুলে যাও—

—না, তুমি বলো, এর মানে কি?

—মণি, ছেলেমানুষী কোরো না, সত্যিই আমি জানি না—ওরকম আর ভেবো না, এ কথার কোনো মানে হয় না।

—তুমি জানো না!

—না।

—তুমিও জানো না? তা হলে আমি কার কাছে জিজ্ঞেস করব!

মণিকা বিহ্বলভাবে তাকাল হেমেনের দিকে। যেন এতদিনে ও সম্পূর্ণ একা হয়ে গেল। এখন পৃথিবীর আর সবাইকে বাদ দিয়ে অনীতার শোক ছিল শুধু ওদের দুজনের, ওরা দুজনে ভাগাভাগি করে নিচ্ছিল। ঈশ্বর হারিয়ে পরজন্ম হারিয়ে মণিকা শুধু হেমেনকে অবলম্বন করেছিল। এখন সেখান থেকেও সে একা হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। প্রথমে ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল, তারপর জলপ্রপাত ভেঙে পড়ার মতন এক দমকায় কেঁদে উঠল। বিশাল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ওপরে মুখ তুলে আর্ত অসহায় গলায় মণিকা ডুকরে চেঁচিয়ে উঠল, আমি তা হলে কাকে জিজ্ঞেস করব? অনীতা—অনীতা—খুকী—ই, আমার খুকী—

শূন্য বাড়ি

একজন আমাকে বললো, ঐ যে ঐটা অনন্ত সরকারের বাড়ি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে অনন্ত সরকার?'

একটি বৃদ্ধ জানালেন, ডাঃ অনন্ত সরকারের নাম শোনেন নাই? মস্তবড় ডাক্তার, কলকাতায় ওনার ডিসপেনসারি ছিল!

এই গ্রামের একজন ডক্তারের কলকাতায় গিয়ে ডিসপেনসারি খোলা নিশ্চয়ই একটা উল্লেখযোগ্য কীর্তি। কিন্তু আমি কলকাতার নাগরিক হলেও তো কলকাতার সব ডাক্তারকে চেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়! আমি ডাঃ অনন্ত সরকারের নাম শুনি নি।

গ্রামের নাম মামুদপুর। মাত্র পাঁচদিন আগেও এখানে পাকিস্তানী সৈন্যরা ছিল। এখন তারা পালিয়েছে খুলনার দিকে। লড়াই এখনও শেষ হয় নি। গতকালও এখান থেকে গোলাগুলির শব্দ শোনা গেছে।

রাস্তার দু'ধারে বাঙ্কার আর ফক্স হোল, এখনও সেখানে যুদ্ধের চিহ্ন রয়েছে, বাড়ির দেয়ালে গুলির দাগ, পথের ওপর শুকনো রক্ত। পালাবার আগে কয়েকটা ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানীরা, কাঠের তক্তা ফেলে কোনোরকমে কাজ চালাবার মত মেরামত করে নেওয়া হয়েছে। বিজয়ী মুক্তিফৌজদের সঙ্গে আমরা কয়েকজন সেখানে ঢুকলাম। আট ন' মাস বাদে সেই গ্রামের রাস্তা দিয়ে সাধারণ পোশাক পরা মানুষ স্বাভাবিকভাবে হাঁটলো।

ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। অনেক নির্যাতন, অনেক মৃত্যুর কাহিনী। স্বাধীনতার জন্য আনন্দ, প্রিয়জনকে হারাবার দুঃখ। এর মধ্যে একজন আমাকে ডাক্তার অনন্ত সরকারের বাড়ির কথা উল্লেখ করলেন। গ্রামের মানুষ-জনের কথা শুনে মনে হলো ডাক্তারটি এ গ্রামে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন।

একটি দশ এগারো বছরের ছেলে বললো, চলুন, আপনাদের ঐ বাড়িটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন, ওখানে কি আছে? ছেলেটি হাত উল্টে বললে, কিছু নেই!

আমি ভয় পাচ্ছিলাম, গিয়ে হয়তো কোনো মৃতদেহ দেখতে হবে, কিংবা অত্যাচারের জ্বলন্ত চিহ্ন। দেখতে দেখতে মন অবশ হয়ে আসে, আর দেখতে ইচ্ছে করে না। চতুর্দিকে এত মৃত্যু, তবু একটি মৃতদেহ দেখলেও আমি শিউরে উঠি। কিন্তু ছেলেটি বললো কিছু নেই। যে বাড়িতে কিছুই নেই সেখানেই বা দেখার কি আছে? এই দুঃসহ কয়েকমাসে অনেক মুসলমান মরেছে, অনেক হিন্দু মরেছে—হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী মরেছে ও নির্যাতিত হয়েছে তা-ও ঠিক, তবু আলাদাভাবে কোনো হিন্দুর বাড়ি দেখতে যাবার কোনো বাসনা আমার মনে জাগে না। এই মুহূর্তে আলাদাভাবে হিন্দু-মুসলমান আর কিছু নেই, সবাই

বাঙালী।

তবু ছেলেটি বললো, চলুন, বাড়িটা দেখবেন না?

অনিচ্ছার সংগে আমি বললাম, চলো!

ভাগ্যিস গিয়েছিলাম!

আমার সংগী ছেলেটির নাম আনোয়ার। ওরা পালিয়ে গিয়েছিল গ্রাম থেকে, পরশুদিন ফিরেছে। ওর দাদা মুক্তিবাহিনীর সৈনিক। ওর জ্যাঠামহাশয়কে মেরে ফেলেছে রাজাকাররা! সে সব কাহিনী আগেই শুনেছি। এই সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছে বলেই ছেলেটির চোখ মুখ এমন জ্বল-জ্বল করছে—যে রকম আমি আগে আর অন্য কোনো এগারো বছরের ছেলের মুখে দেখিনি। গ্রামের সব বাড়িতেই একজন দু'জন করে মানুষ ফিরেছে। অনেকে পোড়া ঘরে আবার বেড়া দিচ্ছে, কেউ কেউ সাফ-সুতরো করছে ভাঙা বাড়ি। কিন্তু, আনোয়ার আমাকে বললে, ডাক্তারবাবুর বাড়ির আর কেউ ফিরবে না!

সে বাড়ির চৌহদ্দিতে আমি তখন সদ্য পা দিয়েছি। জিজ্ঞেস করলাম, কেন? ফিরবে না কেন?

আনোয়ার ক্ষুণ্ণভাবে বললে, ওনার কি আর কেউ আছেন?

—নেই?

—মনে তো হয় না!

গেট পেরিয়ে ঢুকলে প্রথমেই একটা ছোট পুকুর। তার পরিষ্কার জল টলটল করছে। একটা ফড়িং জলের ওপর ভেসে থাকা পানার ওপর একবার করে বসতে যাচ্ছে আর উঠে আসছে।

সেই পুকুরের পাড় দিয়ে, রাস্তা পেরিয়ে বাড়ি ঢোকার সদর দরজা। পুরোনো অভ্যাসবশত সেই সদর দরজা দিয়ে ঢোকার সময় একটু ইতস্তত করি। পরের বাড়িতে কি বিনা অনুমতিতে ঢোকা যায়? পরক্ষণেই মনে পড়লো, আনোয়ার জানিয়েছে, এ বাড়িতে কেউ নেই, কিছু নেই।

এ গ্রামে পাকাবাড়ি খুব বেশী নেই, তার মধ্যে এ বাড়িটা বেশ বড়ই বলতে হবে। অনেক দূর থেকে দেখা যায়। চারদিকে দেওয়াল ঘেরা। ভেতরে মস্ত বড় উঠোন, একপাশে বাগান, একপাশে ধানের গোলা, আরেক পাশে টিউবওয়েল আর একপাশে রান্নাঘর। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ বাড়িতেই রান্নাঘর মূল বাড়ি থেকে একটু দূরেই হয়।

টিউবওয়েলটা এখনও সচল, টিপে দেখলাম জল পড়ে। বাগানে এখনও কিছু ফুল ফুটে আছে। গাঁদা ফুল অযত্নেও ফোটে। কিন্তু বাড়িতে একটাও মানুষ নেই। সারা বাড়িটা অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধ। জীবনে কখনো ফাঁকা বাড়িতে ঢুকিনি তা নয়, কিন্তু এ বাড়িটা অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধ মনে হলো। একটা চড়াই বা শালিকও নেই। কাকের ডাকও শুনিনি। যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে আছে এই বাড়িটা। আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম।

—এইখানে ডাক্তারবাবুকে মেরেছিল?

—কি?

আনোয়ারের কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। উঠোন থেকে সবে মাত্র বাড়ির সিঁড়িতে ওঠার জন্য পা দিয়েছি, এমন সময় আনোয়ার বললো ঐ কথাটা। তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিলাম।

আনোয়ার সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে আবার বললো, ঐখানে ডাক্তারবাবুকে মেরেছিল। ঠিক যেখানে আপনি দাঁড়িয়েছিলেন!

—কে মেরেছিল?

—খান সেনারা।

—কেন?

এই প্রশ্নটা করেই বুঝলাম, বোকার মতন প্রশ্ন করছি। কেন মেরেছে তার কারণ এটুকু ছেলে আনোয়ার কি করে জানবে? এত লক্ষ লক্ষ মানুষকে কেন মেরেছে? কোনো যুক্তিই তো নেই!

ডাঃ অনন্ত সরকারের ভাগ্য ভালো ছিল না। গ্রাম ছেড়ে শহরে ডিসপেনসারি খুলে বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। হ্যারিসন রোড অর্থাৎ বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোডে ছিল ওঁর ডিসপেনসারি। পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে কলকাতায় আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু একবার কলকাতার দাঙ্গায় ওঁর দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেল। প্রাণে বেঁচে ছিলেন কোনোক্রমে, আবার ফিরে এলেন দেশের বাড়িতে। গ্রামের মুসলমানরা তাঁকে ভালবাসতো খুব, ঐ গ্রামে তিনিই একমাত্র অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার। গ্রামের মানুষ ভিড় করে এসে ওঁকে জানিয়েছিল, ওঁর যাতে কোনো ক্ষতি কেউ না করতে পারে, তারা তা দেখবে, ডাক্তারবাবু যেন গ্রাম ছেড়ে না যান। ডাক্তারবাবু কথা দিয়েছিলেন, তিনি এ গ্রাম ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না। এমন কি যশোরের সরকারী হাসপাতালের ভার নেবার জন্য যখন তাঁকে পাকিস্তান সরকার ডেকেছিলেন তখনও তিনি বলেছিলেন, না, আমি গ্রামেই থাকবো, শহরে যাবো না।

ডাঃ অনন্ত সরকার বিয়ে করেন নি। তাঁর ছোট দু'ভাই বিবাহিত এবং এ বাড়িতেই থাকতো। মেজ ভাইয়ের বৌ আগেই মারা গেল -মেজো ভাই দাদার কম্পাউন্ডারের কাজ করতেন।

ছোট ভাই ইস্কুল মাস্টার, তার বিয়ে হয়েছিল মাত্র দেড় বছর আগে। আনোয়ার আমাকে বললো, ছোট বৌদিদির নাম ছিল নিরুপমা—কি সোন্দর দ্যাখতে ছিল তেনারে।

ডাক্তারবাবুকে কেন খান সেনারা মারলো, আনোয়ার তা-ও জানে। আমাকে সে গল্প শোনাবেই। আমি মৃত্যুর কাহিনী আর শুনতে চাই না—তবু আনোয়ার ছাড়বে না।

খান সেনারা যখন এ গ্রামে আস্তানা গেড়েছিল, তখন গ্রামের লোক ডাক্তারবাবুকে পরামর্শ দিয়েছিল লুকিয়ে থাকতে। চার পাঁচ মাস আগেকার কথা। তাব আগে এ গ্রামে বিশেষ কোনো গন্ডগোল হয় নি—এখানে মুসলিম লীগের চিহ্ন নেই, আওয়ামি লীগেরই একচেটিয়া আধিপত্য। কিন্তু গ্রামের পাশেই নদী। সেই নদীর ওপরে ব্রিজের দু পাশে বসলে পাক সেনাদের ঘাঁটি। ততদিনে এ গ্রামেও খবর এসে গেছে যে খান সেনারা হিন্দু আর আওয়ামি লীগের সমর্থকদের দেখলেই মারছে। বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ডাক্তার-বাবুর পক্ষে এখন পালিয়ে যাওয়াও নিরাপদ নয়—যেতে হলে পাকিস্তানী সৈন্যদের ছাউনি পেরিয়ে যেতে হবে—তারা যদি না ছাড়ে? ডাক্তারবাবু লুকিয়ে থাকুন। গ্রামের মুসলমানরা তাঁকে রক্ষা করবে।

এক মাস দেড় মাস লুকিয়ে ছিলেন ডাক্তারবাবু। গ্রামের একটি মানুষও তাঁর কথা জনায় নি। তবু জেনে গেল ওরা, ভিন্ গ্রামের কোনো রাজাকার হয়তো জানিয়ে দিয়েছে। ডাক্তারবাবু আশপাশের কয়েকটি গ্রামে চিকিৎসা করতে যেতেন, চিনতো তাঁকে অনেকে।

প্রথম যেদিন খান সেনা এলো এ বাড়িতে, সেদিন কিন্তু তারা মারতে আসে নি। ডাক্তারবাবুকে খানিকটা সম্মান দেখিয়েই নিয়ে গেল সেনা ছাউনিতে। ততদিনে গ্রামের লোকেরা জেনে গেছে, সেনা ছাউনিতে যারা যায়, তাদের মধ্যে প্রায় কেউই ফেরে না। কিন্তু ডাক্তারবাবু ফিরে এলেন। একজন কম্যান্ডারের কলেরা হয়েছে, তার চিকিৎসা করতে হবে। ডাক্তারবাবু নাকি পরীক্ষা করে বলেছিলেন, একে এক্ষুনি হাসপাতালে না নিয়ে গেলে বাঁচানো যাবে না, এখানে এর ঠিক মতন চিকিৎসা হওয়া সম্ভব নয়।

তখন একজন সৈন্য ডাক্তারবাবুর গালে এক চড় মেরে বলেছিল, তোর কাছে উপদেশ চাওয়া হয় নি, তোকে যা করতে বলা হয়েছে তাই কর।

ডাক্তারবাবু অসাধ্য সাধন করেছিলেন। দুদিন সেখানে থেকে চিকিৎসা করে কম্যান্ডারকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। সেইজন্য খান সেনারা ডাক্তারবাবুকে মস্তবড় পুরস্কার দিয়েছে, তাঁকে প্রাণে না মেরে ছেড়ে দিয়েছে। তারপর বাড়ি ফিরে আসার পর গাঁয়ের কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক বলেছিলেন, ডাক্তারবাবু, আপনি এই বেলা পালিয়ে যান। আপনি খান সেনাদের চিকিৎসা করেছেন—একথা জানতে পারলে হয়তো মুক্তি যোদ্ধারাই আপনাকে মারবে। তারা ভাববে, আপনি ওদের দালাল। আপনি ওদের সাহায্য করেছেন—কিন্তু তখন ডাক্তারবাবুর পালাবার পথ নেই।

পরদিনই সেনা ছাউনিতে ডাক্তারবাবুর আবার ডাক পড়লো। আরও তিনজন অসুস্থ,

তার মধ্যে একজন খান সেনা মুক্তি যোদ্ধাদের বুলেটে আহত। চিকিৎসা না করে ডাক্তার-বাবুর উপায় নেই। ইঞ্জেকশান দিয়ে, ব্যান্ডেজ বেঁধে ফিরে এলেন। সন্ধেবেলাতেই এক গাড়ি খান সেনা এলো তার বাড়িতে। ডাক্তারবাবুকে ডাকলো। ডাক্তারবাবু ঘর থেকে বেরুনো মাত্রই মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হলো তাঁকে। তাঁর চিকিৎসায় একজন খান সেনা মারা গেছে—নিশ্চয়ই ঐ শয়তান কাফের ডাক্তারটা ইচ্ছে করেই তাকে মেরেছে।

আনোয়ার আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, ঠিক যেখানে আপনি দাঁড়িয়েছিলেন, ঐখেনটাতেই পড়ে গিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। সারারাত ঐখানেই ছিলেন।

আমি আনোয়ারকে জিজ্ঞেস করলুম তুমি তখন কোথায় ছিলে?

—বাঁশ বাগানে পালিয়ে ছিলাম। চক্ষে কিছু দেখিনি, গুলির শব্দ শুনেছি।

—ডাক্তারবাবুর বাড়ির অন্য লোকেরা?

—তেনারা ছিলেন আমাদের বাড়িতে। সারা রাত ধরে তো খান সেনারা এ বাড়ি লুঠ করলো।

সিঁড়ির সেই অংশটা এড়িয়ে ওপরে উঠলাম। সামনেই প্রথম ঘরটিতে বসে ডাক্তার-বাবু রুগী দেখতেন। আলমারি, চেয়ার, টেবিল সব লন্ডভন্ড। এখনো কয়েকটা ওষুধের শিশি গড়াচ্ছে। যে সালে অনন্ত সরকার ডাক্তারি পাস করেছিলেন, সেই সালের মেডিক্যাল কলেজের ইউনিয়নের একটা গ্রুপ ফটো এখনও দেওয়ালে ঝুলছে। আনোয়ার আমাকে দেখিয়ে দিল। ডান দিকের কোণে—ঐ যে ডাক্তার দাদার ছবি। প্যান্ট-কোট পরা একটি তরুণ, অনেক বছর আগের চেহারা, নিশ্চয়ই ইদানীং ডাক্তারবাবুর চেহারা অনেক বদলে গিয়েছিল।

পাশের ঘরটি ছিল ডাক্তারবাবুর শয়নকক্ষ। ফাটা বালিশের তুলোয় ঘর ভর্তি। ভাঙা গড়গড়া পড়ে আছে দরজার পাশে, ডাক্তারবাবুর তামাক খাবার শখ ছিল।

—তোমাদের বাড়িতে ডাক্তারবাবুর বাড়ির লোকেরা কদিন লুকিয়ে ছিল, আনোয়ার?

—পাঁচ দিন না ছ'দিন হবে। আমার ঠিক মনে নাই।

—তারপর ওরা গেলেন কোথায়?

—এ বাড়িতেই আবার ফিরে আসলেন।

হ্যাঁ, সেটাই একমাত্র পথ ছিল। রাজাকাররা চারদিক খুঁজে বেড়াচ্ছে। রাত বিরেতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হানা দেয়। আওয়ামী লীগের নেতা বশীর আহমদ আর বজ্জব আলি কোথায় লুকিয়ে আছেন, তাঁদের খোঁজে। হিন্দুদের খোঁজে। অনেকে বললে, ডাক্তারবাবুর বাড়ির ওপর যখন একবার হামলা হয়ে গেছে, তখন ওখানে আর ওরা আসবে না। কেউ যে ওখানে আছে, তা সন্দেহই করতে পারবে না। ডাক্তারবাবুর দুই ভাই আর ওনার ছোট ভাইয়ের বৌ এসে লুকিয়ে রইলো রান্নাঘরে। রান্নাঘরের পেছনে দরজা আছে, প্রয়োজন হলে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পারবে।

এই ঘরটা ডাক্তারবাবুর মেজ ভাই বসন্ত সরকারের। উনি হাঁপানিতে ভুগতেন। ওঁর যখন-তখন কাশির আওয়াজটাই ছিল লুকিয়ে থাকার পক্ষে বিপজ্জনক। বসন্ত সরকারের ঘরটা একেবারে ফাঁকা। এক টুকরো সুতোও সেখানে পড়ে নেই।

বসন্ত সরকার মারা গেছেন নভেম্বর মাসের দশ তারিখ। আনোয়ারের মনে আছে। ওর জ্যাঠামশাই আবদুর রৌফও সেদিন মারা যান। রাজাকাররা খুঁজে পেয়েছিল বসন্ত সরকারকে এবং তাঁকে সাহায্য করার অপরাধে গ্রামের আরও তিনজন প্রৌঢ় মুসলমানকেও সেদিন তারা ধরে নিয়ে যায়। আনোয়ারদের বাড়িতে আগুন লাগে সেদিন—ছ্যাঁচা বাঁশের ছাউনি, সবটাই পুড়ে গেছে।

রাজাকাররা বসন্ত সরকার, আবদুর রৌফ ও আর দু'জনকে টানতে টানতে নিয়ে যায় রাস্তা দিয়ে। বসন্ত সরকার অনবরত কাশছিলেন হাঁপানির টানে। সারা গ্রামের লোক শুনেছে ব শির শব্দ। কেউ বাড়ি থেকে বেরোয় নি। কাশির শব্দ হঠাৎ থেমে যাওয়ায় সবাই বুঝলো, বসন্ত সরকার আর হাঁপানির জন্য কষ্ট পাবে না কখনো। নদীর বাঁধের ওপর নিয়ে গিয়ে বসন্ত সরকারের গলা কেটে দেওয়া হয়। তারপর আবদুর রৌফ

ও আর দু'জনকে বলা হয়, সেই মৃতদেহটা নদীর জলে ফেলে দিতে। প্রাণের দায়ে ওঁরা তাও করেছেন—তারপর আবদুর রৌফকে মেরে আর দু'জনকে বলা হলো সেই দেহটা নদীতে ফেলতে। বাকি দু'জন তখন দৌড়োতে শুরু করেন এবং গুলি খেয়ে মারা যান।

এই ঘরটা দেখলেই বোঝা যায়, এটাতে ছোট ভাই হেমন্ত সরকার এবং তার স্ত্রী নিরুপমা থাকতো। ঘরটাতে এখনও খানিকটা মেয়েলি গন্ধ আছে। মাত্র দেড় বছর আগে ওদের বিয়ে হয়েছিল। সারা ঘরে ড্রেসিং টেবিলের ভাঙা কাচ ছড়ানো। আমার পায়ে বুট জুতো, কিন্তু আনোয়ারের খালি পা—ওকে সাবধান হতে বললাম। একটা জানালায় ছেঁড়া পর্দা এখনও একটু একটু দুলছে হাওয়ায়। ঐ পর্দা সেলাই করেছিল একটি মেয়েলি হাত। খাটটা মাঝখান ভাঙা অবস্থায় কাত হয়ে রয়েছে। ড্রেসিং টেবিলটা মনে হয় যেন কেউ কুড়ুল দিয়ে কুপিয়েছে প্রচন্ড রাগে। কে করেছে এ রকম, এসব জিনিস এমনভাবে ভেঙে নষ্ট করে খান সেনাদের কি লাভ। নিয়ে যেতে পারতো, রাজাকারদের লুঠ করার অধিকার দিতে পারতো। নাকি হেমন্ত সরকার নিজেই ভেঙে নষ্ট করে দিয়ে গেছে?

আনোয়ার টানাটানি করে একটা ড্রয়ার খুললো। ভেতরে কতকগুলো চুলের কাঁটা আর ফিতে। ড্রয়ারে যে খবরের কাগজ পাতা আছে, সেটা তুলে দেখলাম, ইত্তেফাকের একটা পাতা। খবরের কাগজের নিচ থেকে একটা ছবি বার করে আনোয়ার আমাকে দেখালো। স্বামী-স্ত্রীর ছবি, গোপন জায়গায় রাখা ছিল। আনোয়ার খুব একটা বাড়িয়ে বলে নি, নিরুপমাকে দেখতে ভালোই ছিল, একটু গ্রাম্য ধরনের সুন্দরী, কপালে মস্ত বড় টিপ, ঠোঁটে যে লাজুক হাসিটি তার কোনো বর্ণনা হয় না। হঠাৎ যেন মনে হয়, কিছুই হারায় নি। সবই আছে। এই ঘরে এখনও নিরুপমা আর হেমন্ত সরকারের নিঃশ্বাস ভেসে বেড়াচ্ছে।

হেমন্ত সরকার বৌকে নিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে মাঝরাতে। হেমন্ত সরকারকে মাঠের মাঝখানে মেরে রেখে নিরুপমাকে ছাউনিতে নিয়ে যায় খান সেনারা। তবে, অনেকের ধারণা, হেমন্ত সরকার মারা যায় নি, কেন না, পরদিন সকালে কেউ তার লাশ দেখে নি। এমনও হতে পারে, শেয়াল-কুকুরে টেনে নিয়ে গেছে। আবার কারুর দৃঢ় বিশ্বাস, হেমন্ত সরকার সাংঘাতিক আহত অবস্থায় মাঠে পড়েছিল—তারপর কোনোক্রমে পালিয়ে যায় নদী পেরিয়ে। একদিন সে ফিরে আসবে প্রতিশোধ নিতে।

উঁকি মেরে দেখলাম, খাটের নিচে একটা ছেঁড়াখোঁড়া বই পড়ে আছে। কৌতূহল হলো, হাঁটু গেড়ে বসে বইটা টেনে আনলাম। মলাট ছেঁড়া বহু পুরোনো বই, উপেন গাঙ্গুলীর 'বিদুষী ভার্যা'। এই অবস্থাতেও আমার ঠোঁটে সামান্য হাসি আসে। বোধহয় নিরুপমার গল্পের বই পড়ার ঝোঁক ছিল। সে কি যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছিল? সে কি ভালো রান্না করতে পারতো? তার কি শখ ছিল, স্বামীর সঙ্গে একবার কোথাও অনেক দূরে বেড়াতে যাওয়ার? তার বুকে ছিল সন্তান পাওয়ার স্বপ্ন? বইটার মাঝখানে একটা পাতার কোণ তেকোণ করে মোড়া—এমনও হতে পারে, যে-সময় খান সেনারা ডক্তারবাবুকে মারতে আসে তখন সে বইটার এই পাতাটা পড়ছিল?—লোকজনের আওয়াজ শুনে সে পাতা মুড়ে রেখে কৌতূহলী হয়ে বাইরে যায়।

নিরুপমাকে খান সেনারা ইস্কুল বাড়ির একটা ঘরে তালাবন্ধ করে রাখে কয়েকদিন। দিনরাত সে অশ্রান্তভাবে চেঁচাতো—পশুর মতন অর্থহীন চিৎকার। গ্রামের অনেক মানুষ সেই চিৎকার শুনেছে। এক একজন খান সেনা সেই ঘরে ঢুকলে চিৎকার বেড়ে যেত। প্রথম রাতেই নিরুপমা পাগল হয়ে গিয়েছিল। তার পরনে শাড়ি ছিল না পাছে সে আত্মহত্যা করে। দিন রাত্রে সে এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমোয় নি—দুর্বোধ্য চিৎকার এক মুহূর্তের জন্যও থামে নি।

বইটার ভাঁজ মুড়ে রেখে দিলাম খাটের ওপর। চোখ বুলোলাম চারদিকে। মাত্র দেড় বছর নিরুপমা এই ঘরে সংসার পেতেছিল। নিশ্চয়ই যত্ন করে গুছিয়েছিল ঘরখানা। এখন তা দেখে কিছুই বোঝা যায় না। নিরুপমা যদি আবার এ বাড়িতে ফিরে আসে, কান্নাকাটি না করে প্রথমেই নিশ্চয়ই কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঘর গুছোতে লেগে যাবে।

খান সেনারা চলে যাবার পর ইস্কুল বাড়ির ঐ ঘরে নিরুপমার পচা গলা দেহ পাওয়া গিয়েছিল, গলায় একটা বেল্ট জড়ানো। কেউ বলে, কোনো একজন খান সেনা নিরুপমার চ্যাঁচানি বন্ধ করার জন্য বিরক্ত হয়ে ওর গলায় বেল্ট জড়িয়ে ফাঁস টেনে দিয়েছে। আবার কেউ বলে, নিরুপমা নিজেই একজন খান সেনার বেল্ট কেড়ে নিয়ে গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যা করে।

ঘটনার বিবরণ শোনাতে শোনাতে আনোয়ার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। আমার হাত জড়িয়ে ধরে বললো, ছোট বৌদি আমারে বড় ভালবাসতেন। আমারে বড় ভালবাসতেন।

আনোয়ারের কান্না থামানো যায় না। আমি ওকে কাঁদতে দিলাম কিছুক্ষণ। চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। মৃতদের বদলে এগারো বছরের এই জীবন্ত বালকটি এই মুহূর্তে আমাকে বেশী আকৃষ্ট করে। কৈশোর কালের কান্না কত আন্তরিক। কাঁদুক এখন আনোয়ার। আমার মত বয়স হয়ে গেলে আর প্রাণ খুলে এরকম কাঁদতে পারবে না। ওর কাঁধের ওপর হাত রেখে কিছুক্ষণের জন্য আমি একটু শান্তি পেলাম।

আজিমগঞ্জের মেয়ে

চন্দ্রনাথ বললো, চলো, তোমাকে এবার একটা চোরের বাড়িতে নিয়ে যাবো! খুব ধুরন্ধর চোর, লোকটার সঙ্গে কথা বলে আরাম পাবে!

আমি বললুম, আজকাল কে চোর নয়? চেহারা দেখেই কি চেনা যাবে যে লোকটা চোর? তুমিও যে গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে মান্যগণ্য লোক সেজে আছো, তুমিও তো বই চোর!

চন্দ্রনাথ হেসে বললো, বই চুরিকে ঠিক চুরির পর্যায়ে ফেলা যায় না। মাঠের মাঝখানে তুমি একটা মুক্তো কুড়িয়ে পেয়ে যদি কোনো সুন্দরী মেয়ের গলায় ঝুলিয়ে দাও, তাকে কি কেউ চুরি বলবে? তেমনি, কোনো বাজে লোকের উই ধরা আলমারি থেকে বইগুলো নিয়ে এসে কোনো খাঁটি লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়াও চুরি নয়।

—ঠিক আছে, বুঝেছি! তা এই লোকটাও কি তোমার মতন বই চোর নাকি?

—না, এ খাঁটি চোর। ও নিজের মুখেই সেটা স্বীকার করে, কোনো লজ্জা নেই!

—কি নাম লোকটার?

—লটপট শিং।

—ধ্যাৎ। এই দুপুর রোদ্দুরে ইয়ার্কি ভালো লাগে না! এবার কোথায় যাবে ঠিক করে বলো!

—কি হলো! মাইরি বলছি, লটপট শিংয়ের বাড়ি যাবো। খুব খাতির-যত্ন করবে।

—লটপট শিং কারুর নাম হয় না!

—আমি তো ঐ নামেই জানি লোকটাকে—ভালো নাম অন্য কিছু থাকতে পারে-

—এই অচেনা জায়গায় কোনো চোরের বাড়িতে যাওয়া কি ঠিক হবে?

আমি যেন একটা শিশু, কিছুই বুঝি না, এ ভঙ্গিতে চন্দ্রনাথ হা-হা করে হেসে বললো। আমি কি তোমায় একটা যা-তা জায়গায় নিয়ে যাবো নাকি; চলো না দেখবে। মার্বেল পাথরের বাড়ি, স্প্রিং-এর গদি মোড়া খাট, রুপোর থালায় খাবার দেবে—

আজিমগঞ্জের গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটছিলুম। গ্রীষ্মের শুকনো গঙ্গা, হেঁটে পার হচ্ছে মানুষজন, তবু এই গঙ্গার চেহারা দেখেও লছমনঝোলার কাছে যে তীব্র বেগবান স্রোতস্বিনীকে দেখেছিলাম, তার কথা মনে পড়ে। গোটা মুর্শিদাবাদ জেলাটাই এখন দরিদ্র শুকনো, তবু যেমন সেই ঐতিহাসিক আবহাওয়া মুছে যায় নি, মনে হয় যে-কোনো সময়ই বোধ হয় দেখা যাবে অশ্বারোহী বাহিনী অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা তুলে ধুলো উড়িয়ে চলে যাবে।

কিন্তু আপাতত দুপুর পেরিয়ে গেছে, এখন সমস্ত শরীরটা চাইছে জলের স্পর্শ।

স্নান করে চারটি গরম গরম ভাত ও মাছের ঝোল খাবার জন্য শক্‌শক্‌ করছে জিভ।

ঘুরছি সকাল থেকে। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে। চন্দ্রনাথ দুর্লভ পুরোনো বই সংগ্রহ করে, প্রাচীন শিল্পসামগ্রীও কিনে এনে বিক্রি করে দেশ বিদেশের নানান্ মিউজিয়ামের কাছে। বাংলাদেশের পড়ন্ত জমিদার বাড়িগুলোতে ঘুরে বেড়ায় চন্দ্রনাথ, যে-সব বাড়িতে এককালে কারুর হয়তো জ্ঞান ও শিল্পচর্চায় আগ্রহ ছিল—এখানকার বংশধরদের মধ্যে তার ক্ষীণতম রেশও নেই—বহু মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য বই আলমারিতে উইয়ে কাটছে কিংবা মিশে যাচ্ছে গুদোমঘরের মাটিতে—চন্দ্রনাথ সেই সব বই কিনতে যায়। অনেক সময় বর্তমান মালিক একগুঁয়েমির জন্য কিংবা উত্তরাধিকারের গোলমালের জন্য—সেই সব বই নষ্ট হোক, তবু বিক্রি করতে চায় না -চন্দ্রনাথ তখন বাড়ির চাকর-বাকরদের ঘুষ দিয়ে সেইসব বইপত্র চুরি করাবার ব্যবস্থা করে, নিজেও ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে দু'একখানা বই সবার অলক্ষ্যে পকেটে ঢুকিয়ে নেয়। অ্যাডভেঞ্চারের লোভে আমিও এই সব অভিযানে মাঝে মাঝে চন্দ্রনাথের সঙ্গী হই।

আমি আবার বললুম, চোর আমাদের খাবারও খেতে দেবে বলছো? চন্দ্রনাথ বললো আগের বারও ঠিক এই সময় গিয়েছিলাম ওর বাড়িতে। ও প্রথমেই বললো, সেই অতদূর কলকাতা থেকে এসেছেন—আগে চান করে গরীবের সঙ্গে ডালভাত খেয়ে নিন, বিশ্রাম করুন, ও বেলা তারপর কথা হবে। ডাল ভাত কি—সে একেবারে এলাহী মোগলাই খাবার, রুপোর থালা গেলাস—

—তোমার এই লটপট শিং বাংলা জানে?

—বাংলা ছাড়া আর কিছুই সে জানে না।

এই লটপট শিং-এর ব্যাপারটা ক্রমেই আমার কাছে রহস্যময় ঘোরালো মনে হতে লাগলো। চন্দ্রনাথও কিছুই ভেঙে বলছে না! আবার জিজ্ঞেস করলুম, কিরকম চেহারা তোমার এই লটপট শিং-এর!

—ছ ফুটের ওপর লম্বা, ধপ্‌ধপে ফর্সা রং, এই রকম চওড়া কব্জী, বেড়ালের ল্যাজের মতন মোটা গোঁফ। জাতে রাজপুত তো—

—ব্যাপারখানা কি বলো তো? জাতে রাজপুত, এদিকে বাংলা ছাড়া আর কোনো ভাষা জানে না, তার ওপর চোর—চেহারার বর্ণনা দিলে তাগ্‌ড়া জোয়ানের মতন, অথচ নাম লটপট শিং—

—চলোই না, দেখলেই বুঝতে পারবে!

—দ্যাখো চন্দ্রনাথ, এই দুপুরবেলা যদি রসিকতা করার চেষ্টা করো, তা হলে খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি! খিদেয় পেট জ্বলছে—এইসব ছোট শহরে বেশী বেলা হয়ে গেলে কোনো হোটেলে খাবার পাওয়া যাবে না!

—লটপট শিং-এর বাড়ির রান্না খুব চমৎকার।

—এত বেলায় কি আমাদের জন্য রান্না চাপাবে নাকি? তার বয়ে গেছে! তোমার সঙ্গে তো ব্যবসার সম্পর্ক! তাছাড়া ও বাড়ি থাকবে কিনা—

—রান্না করেই রাখবে। আমার সঙ্গে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। দিন দশেক আগে চিঠি দিয়ে ওকে জানিয়ে দিয়েছি যে আজ আমরা দুজনে যাবো!

—চিঠির উত্তর পেয়েছো তো?

—উত্তর আবার দেবে কি! লটপট শিং লেখাপড়াই জানে না। তোমার ভয় নেই, ও মুর্শিদাবাদ জেলা ছেড়ে কোথাও যায় না—দু' একবার শুধু—

—জেল খেটেছে, তাই তো? তোমার সঙ্গে ওর আলাপ কি করে হলো, জেলখানার মধ্যেই বুঝি!

—লটপট শিং কোনোদিন জেল খাটে নি!

—চুরি করছে আর কোনোদিন জেল খাটে নি? তোমার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে ও বেশ বড়লোক। চুরি করে, না ডাকাতি করে?

—লটপট শিং খুব স্টাইলের চোর, যা-তা জিনিস কখনো চুরি করে না! ও মন্দির থেকে মূর্তি চুরি করে, দেয়াল থেকে সুন্দর সুন্দর মোটিফ ভেঙে আনে—এটাই ওর

প্রধান পেশা। তা ছাড়া...লটপট শিং এখন মোটেই বড়লোক নয়, বেশ গরীব, কিন্তু এককালের বনেদী বংশ তো, তাই এই গোটা মুর্শিদাবাদের বড় জমিদারদের সঙ্গে ওর কিছু না কিছু আত্মীয়তা আছে। নানান্ ছুতোয় সেসব বাড়িতে যায়, তারপর হাত সাফাই করে নানা ধরনের কিউরিও. ধরো একটা জেড-এর মূর্তি কিংবা কাট গ্লাসের সেট বা পুরোনো ম্যানাস্ক্রিপ্ট্ এসব নিয়ে আসে। অন্তত একশো বছরের পুরোনো না হলে কোনো জিনিস ছোঁয় না লটপট শিং। অনেক সাহেব-সুবো ওর খদ্দের। লোকটা অনেক টাকা করতে পারতো, কিন্তু মদ খেয়েই ওড়ায় সব।

—তুমি ওর কাছে যাচ্ছো কি উদ্দেশ্যে?

—গত বছর ওর কাছে কোরআনের পারশিয়ান ম্যানাসক্রিপ্টের একটা সেট দেখেছিলাম —খুব দামি সেট, টাকা ছিল না বলে তখন কিনতে পারিনি—কিন্তু এবার ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে একটা অর্ডার পেয়েছি, কোরআনের সেটটা যদি পাই—

—লোকটাকে এখন সত্যিই খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, ওর বাড়ি আর কতদূর?

—এই তো এসে গেছি!

গঙ্গার ধার ছেড়ে আমরা ঢুকে এসেছি শহরের মধ্যে। আমি আগে কখনো এ জায়গায় আসিনি, আমার কাছে এখানকার সব রাস্তাই অচেনা। কিন্তু চন্দ্রনাথ খুবই পরিচিত ভঙ্গিতে হাঁটছে। পুরোনো শহর—মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে কোনো প্রাচীন জমিদার বা সম্ভ্রান্ত লোকের বিশাল বাড়ি ভাঙাচুড়ো পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। প্রাসাদের দেয়াল ফুড়ে উঠেছে বটগাছ, উঠোনে আসশ্যাওড়ার জঙ্গল। কিছু ঘর একেবারে ভাঙা, কিছু ঘর হয়তো এখনো মানুষের বাসযোগ্য—তবু এখানে কেউ থাকে না। এমন বাড়ি বা পুরোনো কালের দেউড়ি বা নহবৎখানা এখানে সেখানে প্রায়ই চোখে পড়ে।

সেইরকম একটা বাড়ির কাছাকাছি এসে চন্দ্রনাথ বললো, মনে হচ্ছে, এই বাড়িটাই—

তাকিয়ে দেখলাম, সে বাড়িটার অবস্থা খুবই শোচনীয়, ছাদের কড়ি-বরগা ভেঙে পড়েছে। কোনো ঘরেরই দরজা-জানালা নেই, সে সব খুলে নিয়ে গেছে অন্য লোকে। কিন্তু বোঝা যায় যখন বাড়িটা জীবন্ত ছিল, একটা বিরাট প্রাসাদ, অন্তত সত্তর আশি-খানা ঘর ছিল, তা ছাড়া কি সব বারান্দা!

বললাম, গোম্বুজের ধরন দেখে তো হচ্ছে এটা কোনো মুসলমানের বাড়ি ছিল, তোমার লটপট শিং রাজপুতের এরকম বাড়ি কি করে হবে?

চন্দ্রনাথ বললো, অতসব জানি না, এখানেই ও থাকে। চলো দেখিয়ে দিচ্ছি! পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সেই ভাঙা বাড়ির আয়তন কি বিপুল, চলছে তো চলছেই, এই বাড়ির ভাঙা ইটগুলো দিয়ে একটা বিরাট পুকুর বুজিয়ে ফেলা যায়! বাড়িটার একেবারে পেছন দিকে এসে, একটা পড়ন্ত সিঁড়ির পাশে খানিকটা জায়গা একটু পরিষ্কার করা হয়েছে মনে হলো, সেখানে দুটো ঘর মোটামুটি আস্ত, জানালায় পর্দা ঝুলছে।

সিঁড়ির তলা দিয়ে কোনো রকমে মাথা বাঁচিয়ে এগিয়ে গেলাম একটা দরজার দিকে। আমার বিশ্বাসই হলো না, এই বাড়িতে চন্দ্রনাথের সেই রহস্যময় লটপট শিং থাকে। খানিকটা শ্লেষের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, কি হে? এই বাড়িতে রুপোর থালায় মোগলাই খানা খাওয়াবে আমাদের?

চন্দ্রনাথ বললো, রুপোর থালা হয়তো এবার পাবে না, সেটা খুব সম্ভব এর মধ্যে বেচে দিয়েছে। সবই তো ওর চোরাই মাল। এবার বোধহয় খাঁটি পোর্সিলিনের প্লেটে দেবে—যে-প্লেটে কোম্পানির আমলের দেওয়ান খেতো।

—থালা বাসন যাই হোক্, খাবারটা পাওয়া যাবে তো!

—আরে, এরা বনেদী লোক, খাওয়াটাই তো এদের আসল! দ্যাখো না!

দরজার সামনে সিঁড়ির একধাপে একটা বিরাট কুকুর বসে আছে। দেখলেই মনে হয় কুকুরটারও বয়েস অনেক। আমাদের দেখে কুকুরটা উঠে দাঁড়ালো না, কোনো শব্দ করলো না, শুধু স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। কুকুর দেখলে আমি খুব ভয় পাই, আমার আর

এগুতে সাহস হলো না। চন্দ্রনাথও দাঁড়িয়ে পড়লো, বিড়বিড় করে বললো, কুকুরটা তো আগের বার দেখেছি বলে মনে পড়ছে না!

—তাহলে বোধহয় এ বাড়িই নয়!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই বাড়ি—কিন্তু মাইরি কুকুরটা।

হঠাৎ চন্দ্রনাথের মুখ চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। লাজুকভাবে হেসে বললো, মনে পড়েছে, খুব জোর বেঁচে গেছি, মনে পড়েছে।

—কি মনে পড়েছে? এটা ওর বাড়ি নয়?

—না, না, এটাই ওর বাড়ি। কিন্তু ওর নামটা মনে পড়েছে, ওর নাম লটপট শিং নয়, লজপত শিং।

—তাই বলো, লটপট শিং কারুর নাম হয়! জাতে রাজপুত, ওরকম ভুল নাম শুনলে খাওয়ানোর বদলে গলা ধাক্কা দিত! আচ্ছা, শোনো, লোকটা তো রাজপুত, তাহলে মোগলাই খানা খাওয়াবে কি করে?

—মুর্শিদাবাদে তিন-চার পুরুষ ধরে থেকে থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে। তোমার খালি খাওয়ার চিন্তা, এসেছি একটা জরুরী কাজে।

চন্দ্রনাথ ভরসা করে আরও দু'পা এগিয়ে গেল, কুকুরটা এবার আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু তেড়ে এলো না, গর্জনও করলো না। আমি সভয়ে চন্দ্রনাথের পেছনে দাঁড়ালাম। চন্দ্রনাথ গলা চড়িয়ে ডাকলো, শিংজী? লজপত শিংজী? বাড়িতে আছেন? কোনো সাড়াশব্দ নেই। কুকুরটা স্থিরভাবে চেয়ে আছে। চন্দ্রনাথ এবার আরও জোরে চ্যাঁচালো!

আমি বললাম, এ বাড়িতে বোধহয় কোনো লোকই থাকে না।

—ভ্যাট, জানালায় পর্দা ঝোলানো দেখেছি। গত বছরেও এই নীল পর্দা দেখেছিলাম।

শব্দ করে দরজা খুলে গেল। খোলা দরজায় এসে দাঁড়ালো একটি মেয়ে। মেয়েটির বয়েস আঠেরো-উনিশের মতন, এমনই তার চেহারা যে, বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। খুব সুন্দরী সে নয়, কিন্তু তার চেহারায় এমন একটা তেজ ও দীপ্তি আছে, যে জন্য চোখ ফেরানো যায় না। বেশ লম্বা মেয়েটি, চুলগুলো সব খোলা, আলগা ধরনের একটা হলদে শাড়ী পরে আছে। দেখলে মনে হয় ঠিক বাঙালী নয়, অথচ রাজপুতানীও বলা যায় না। স্বাস্থ্য ঝলমল করছে সমস্ত শরীরে। স্তন দুটি উদ্ধত হয়ে আছে, ছোট ছোট জ্বলজ্বলে চোখে মেয়েটি আমাদের দিকে তাকালো। কুকুরটা এবার গরর্-গরর্ করে উঠলো একবার, মেয়েটি তার পিঠে হাত দিতেই চুপ করলো।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলো, লজপত শিং বাড়িতে আছেন?

মেয়েটি মুখে কিছু বললো না, দু'দিকে মাথা নেড়ে জানালো না।

—বাড়ি নেই?

মেয়েটি আবার মাথা দোলালো।

—কিন্তু থাকবার কথা ছিল! কখন বেরিয়েছেন? এক্ষুণি কি ফিরবেন?

মেয়েটি আবার মাথা দুদিকে দুলিয়ে না বললো।

আমার হঠাৎ মনে হলো, মেয়েটি হয়তো বোবা। ঠোঁট টিপে দাঁড়িয়ে আছে যা জিজ্ঞেস করছি, শুধু মাথা নেড়ে না বলছে। অথচ, দরজা খোলার পর দু'জন অপরিচিত লোককে দেখে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, কি দরকার—এগুলো জিজ্ঞেস করাই স্বাভাবিক ছিল না কি! হয়তো সত্যিই ও বোবা আমাদের কোনো কথাই শুনতে পাচ্ছে না, আন্দাজে ঘাড় নেড়ে যাচ্ছে। লজপত শিং-এর কি উচিত এই বোবা মেয়েকে দিয়ে দরজা খোলানোর! তা ছাড়া, আমরা যত জোরে কথা বলছি, বাড়ির অন্য লোকদেরও তো শুনতে পাওয়া উচিত। আমি বেশ চেঁচিয়েই জিজ্ঞেস করলুম, লজপত শিং কি মুর্শিদাবাদের বাইরে কোথাও গেছেন?

মেয়েটি এবার কথা বললো, যদিও মুখে তার কোনো ভাবান্তর ঘটলো না, শান্ত গলায় বললো, উনি মারা গেছেন।

—অ্যাঁ? মরা গেছেন? কবে?

—সাত আট মাস আগে।

ভদ্রতা করেও খানিকটা শোক জানানো দরকার, তাই আমি আর চন্দ্রনাথ একটুক্ষণ নীরবতা পালন করলুম। তারপর চন্দ্রনাথ জিভ দিয়ে একটু চুক্ চুক্ শব্দ করে বললো, কি হয়েছিল? ওরকম ভালো চেহারা ছিল!

দু'দিকের কপাটে দুটি হাত রেখে মেয়েটি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। ঠিক যে-টুকু প্রশ্ন, তার থেকে একটিও বেশী কথা বললো না। এবারও সে সংক্ষেপে জানালো, উনি খুন হয়েছিলেন।

—খুন? কোথায়? এই শহরেই?

মেয়েটি এবার একটা হাত তুলে তাদের ঘরের সামনের চত্বরটার দিকে হাত দেখিয়ে বললো, এই জায়গায়!

এরপর আমাদের কৌতূহল চেপে রাখা দুরূহ। কিন্তু মেয়েটি যেরকম উত্তর দিচ্ছে কাটাকাটাভাবে, তাতে ভদ্রতাসংগতভাবে আমাদের আর কোনো প্রশ্ন না করাই উচিত। কিন্তু তক্ষুণি চলে আসাও সম্ভব নয়।

চন্দ্রনাথ গলার স্বর খুব নরম করে বললো, আমার খুব বন্ধু ছিলেন শিংজী। আমি গত বছরেও এ বাড়িতে এসেছিলম। এঁসব কিছুই জানি না। একটা চিঠিও লিখেছিলাম ক'দিন আগে। সেই চিঠি পেয়েছেন?

মেয়েটি আবার ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ।

—আচ্ছা লজপত শিংজীর কাছে যে বিক্রির জন্য কিছু জিনিস থাকতো, যেমন কিছু কিছু মূর্তি বা পুরেনো বই—সে সব আর কিছু আছে কি?

—কিছু কিছু আছে।

—এক সেট কোরআন শরীফ ছিল?

—আছে।

—সেটা একবার দেখতে পারি?

মেয়েটি কি যেন একটু ভাবলো, আমাদের দু'জনের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে চোখ ফেললো। তারপর বললো, ভেতরে আসুন।

আমরা দু'জনেই কুকুরটার দিকে তাকালুম। মেয়েটি কুকুরটার গায়ে হাত দিয়ে বললো, যাঃ! কুকুরটা একটু সরে গিয়ে আমাদের জায়গা দিল। বুড়ো কুকুর নড়তে চড়তে সময় লাগে, তবু দাঁতগুলো দেখলে মনে হয়, এখনো এক কামড়ে যে-কোনো লোকের ঘাড় ভেঙে দিতে পারে।

প্রথম ঘরটা ছোট। সেটা পেরিয়ে আর একটা ঘরে এলাম, সেটা প্রকাণ্ড বড়, হল-ঘরের মতন ছাদ নেমে এসেছে—একটা শালবল্লা দিয়ে ঠেক্না দেওয়া। মেয়েটির বয়স কম, কিন্তু কোনো উচ্ছলতা নেই, খানিকটা নিরাসক্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গি, চোখ দুটো দেখে মনে হয়, পৃথিবীর কোনো মানুষকেই ও বিশ্বাস করে না, আমাদের দিকে বারবার যাচাই করা চোখে তাকাচ্ছে। ঘরটার মধ্যে অল্প অল্প অন্ধকার—আমি সান গ্লাসটা চোখ থেকে খুলে নিলুম। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, পাশে একটা ছোট ঘর, সেখানে এই দিনের বেলা গরমেও আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে কে একজন শুয়ে আছে।

আমি নিম্নস্বরে জিজ্ঞেস করলুম, কারা খুন করেছে আপনার বাবাকে?

মেয়েটি আমার দিকে না তাকিয়েই বললো, কেউ ধরা পড়ে নি!

—কেন খুন করেছিল, তার কিছু কারণ?

—জানি না!

এদিকে আর কথাবার্তা এগুবে না বলে আমি চুপ করে গেলাম। চন্দ্রনাথ চলে গেছে ঘরের অন্য প্রান্তে, একটা দেয়ালে আলমারির সামনে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটা ভাঙা টেরা-কোটার মূর্তি, কিছু পুরোনো কালের কাপ ডিশ, একজোড়া হাতির দাঁতের পাখা, পিতলের রাধাকৃষ্ণ—এইসব রয়েছে।

ঘরের মাঝখানে একটা তক্তাপোশ পাতা, তাতে বহুকালের জীর্ণ একটা চাদর পাতা,

অবশ্য দেখলে বোঝা যায়—চাদরটা এককালে দামী ছিল। কোনো বালিশ নেই, দেখে মনে হলো, এটাই বসবার জায়গা—কেননা, ঘরে আর কোনো আসবাব নেই। আমি সেটার ওপর বসলুম, চন্দ্রনাথ কত রকম খাবার-দাবারের আশা দিয়ে নিয়ে এসেছিল, তার তো আর কোনোই সম্ভাবনা নেই, সুতরাং মেয়েটিকেই একটু চোখ ভরে দেখে নিতে লাগলাম। মেয়েটির শরীরের প্রত্যেকটা রেখা খুব স্পষ্ট, সরু কোমর—ভারী নিতম্ব ও বুক—কিন্তু তার মুখের নির্লিপ্ত ভঙ্গির জন্য এর মধ্যেই তাকে বেশ বয়স্কা মনে হয়। আমি যতবার তাকাচ্ছি, মেয়েটিও আমার চোখে চোখ ফেলছে. কোনো রকম লজ্জা কিংবা নির্লজ্জতার চিহ্ন তার মুখে নেই, সে যেন আমার কাছ থেকে কিছু একটা শোনার প্রতীক্ষা করছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নাম কি?

—শোভা। শোভা সিংহ।

—এ বাড়িতে আর কেউ থাকে না?

—আমার মা থাকেন, তার অসুখ।

—ব্যস, এতবড় বাড়িতে আপনারা শুধু দু'জন? আপনাদের ভয় করে না?

—না।

—আপনি কি কলেজে পড়েন?

কেন এ প্রশ্ন করলুম, তা আমি নিজেও জানি না। এখানে কলেজ আছে কিনা কিংবা থাকলেও সেখানে মেয়েদের পড়ার সুযোগ আছে কিনা—সেসব কিছুই জানি না, কলেজে পড়ার মতন অবস্থাও নয় মেয়েটির। তবু, মেয়েটির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালাতে ইচ্ছে করছিল—মেয়েটি এমনই কম কথা বলে যে অনবরত নতুন প্রশ্ন ভাবতে হচ্ছিল আমার। মেয়েটি কিন্তু এতক্ষণ বাদে আমার এই কথা শুনে একটু হাসলো। ঠিক হাসি বলা যায় না, একটু হাসির ছায়া খেলা করে গেল তার মুখে. বললো, কলেজে? আমি কোনোদিন ইস্কুলেও পড়িনি।

একথা শুনেও মেয়েটিকে আমি অতিরিক্ত সম্মান দিয়ে বললাম, শোভাদেবী, এ ঘরটা বড় অন্ধকার, জানলার পর্দাগুলো তুলে দিন না?

মেয়েটি আবার সংক্ষিপ্তভাবে বললো, না। আমার মুখে শোভাদেবী সম্বোধন শুনে সে হাসলোও না, খুশীর ভাবও দেখলো না. বরং হঠাৎ আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

চন্দ্রনাথ আলমারি খুলে একজোড়া বুদ্ধমূর্তি বার করতে গেল, মেয়েটি অমনি তাড়াতাড়ি সেদিকে গিয়ে খানিকটা কর্কশভাবে বললো, হাত দেবেন না। আমার কোনো জিনিসে হাত দেবেন না।

চন্দ্রনাথ খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে বললো. একটু দেখছি জিনিসটা।

—না, হাত দেবেন না। আমার বাবার জিনিসে কারুকে হাত দিতে দিই না।

চন্দ্রনাথ এবার খানিকটা শক্তভাবে বললো, এসব আপনার বাবার নিজের জিনিস নয়—এগুলো উনি বিক্রির জন্য, ইয়ে, মানে যোগাড় করে আনতেন। তা কেনার আগে আমরা একবার জিনিস দেখে নেবো না?

—আমি এগুলো বিক্রি করবো না! আমি এসব জিনিসের দাম জানি না।

—আমরা দাম জানি। আমরা আপনার বাবার পুরোনো খদ্দের। আমরা ঠিক দাম দেবো।

—না আপনারা আমাকে ঠকাবেন। আমি এসব জিনিসের দাম জানি না, আমি বিক্রি করবো না।

এবার আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললুম. না, না, আমরা ঠকাবো কেন। আমাদের বিশ্বাস করুন।

—আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।

চন্দ্রনাথ চোখের ইশারায় আমাকে তর্ক করতে বারণ করলো। মেয়েটিকে বললো, ঠিক আছে এগুলো আমরা কিনবো না। ঐ বাক্সটায় তো সেই কোরআন রাখা আছে? একটু দেখতে পারি?

অনুমতি না নিয়েই বাক্সর ডালা খুললো। আমিও উঁকি মারলুম। মখমল দিয়ে মোড়া কয়েক খণ্ডে কোরআন শরীফের পাণ্ডুলিপি। চন্দ্রনাথ বললো, হ্যাঁ, এটাই। আপনার বাবার সঙ্গে এটা নিয়ে আমার কথা হয়ে গিয়েছিল, তখন টাকা ছিল না—আজ এটা নিয়ে যাবো।

—আমি বিক্রি করবো না।

—এটাও বিক্রি করবেন না? তা হলে, আপনি আমাদের ভেতরে আসতে বললেন কেন?

—আপনারাই তো আসতে চাইলেন, আপনারা শুধু দেখতে চেয়েছিলেন—আমি এসবের ঠিক ঠাক দাম জানি না, বাবা বলতো।

—আপনার বাবার সঙ্গে আমার এটার দাম হয়েছিল আড়াই শো টাকা।

—আমি তো তা জানি না।

—ঠিক আছে। আমরা তিনশো টাকা দিচ্ছি।

—আমি বেচবো না।

—কি মুশকিল! আপনি এগুলো রেখে কি করবেন? আপনার তো এগুলো কাজে লাগবে না?

—বাবা একদিন আমাকে মেরেছিলেন! আমি একটা কাচের পেলেট ভেঙে ফেলেছিলাম, বাবা আমাকে লাঠি দিয়ে মেরেছিলেন—মা যখন বললেন, শুধু একটা ভাঙার জন্য এত মারলে? তখন বাবা বললেন, ঐ পেলেটটার দাম আড়াই শো টাকা—আমরা এসব জিনিসের দাম বুঝি না!

—আপনার বাবা একটু বাড়িয়ে বলেছেন। একটা প্লেটের দাম আড়াই শো টাকা হয় না।

—আমার বাবা এসব জিনিস যোগাড় করতে গিয়ে খুন হয়েছেন। আমি এসব ভুল দামে কিছুতে ছাড়বো না। আমার এক কাকা এইসব চীজের কারবার করেন, তিনি থাকেন মালদায়—তাঁকে চিঠি লিখেছি—তিনি এসে দরদাম করে দিয়ে যাবেন।

—কিন্তু কোরআনের সেটটা আমার দরকার ছিল।

—ঠিক আছে আপনারা ঠিকানা রেখে যান, কাকা আসবার পর—

আমি মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেলাম, খুব নরম ভদ্র গলায় বললুম, দেখুন, লজপত সিং আমাদের বন্ধু ছিলেন। তিনি মারা গেছেন শুনে আমরা দুঃখিত হয়েছি—আপনাকে আমরা ঠকাতে আসিনি। আপনাদের নিশ্চয়ই এখন খুব অসুবিধে চলছে—সুতরাং এগুলো বিক্রি করলে...একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করবেন না। আপনাদের সংসার এখন চলে কি করে?

মেয়েটি একটুও নরম না হয়ে বললো, তাতে আপনার দরকার?

—কোনো দরকার নেই! এমনিই—

—চলে না! রোজগার করার কেউ নেই, চলবে কি করে আবার!

—তা হলে এগুলো বিক্রি করলে কিছু টাকা পেতেন—অন্তত কোরআনের সেটটা।

—আমি তো এক কথা বলে দিয়েছি! যে-জিনিসের আমি দাম জানি না, তা আমি বেচতে পারবো না।

—ও, আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা তাহলে চলে যাচ্ছি। দেখুন, অনেক রোদ্দুরে ঘুরে এসেছি, এক গেলাস জল খাওয়াতে পারেন?

মেয়েটি আবার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করলো। তারপর বললো, হ্যাঁ, জল খাওয়াবো না কেন? দাঁড়ান—

মেয়েটি জল আনতে যেতেই আমি চন্দ্রনাথকে বললাম, মাইরি দারুণ ঝাল লংকা টাইপের মেয়ে! এই ফাঁকে দু'একটা মূর্তিটুর্তি হাতিয়ে পকেটে ভরবো নাকি?

চন্দ্রনাথ বললো—না—না, কোথা থেকে হয়তো দেখে ফেলবে। আমার বেশী দরকার ঐ বইগুলো, তাতো আর পকেটে ভরা যাবে না।

একটা নোংরা কাচের গেলাসে মেয়েটি জল নিয়ে এলো। মেয়েটির আঙুলে আঙুল ঠেকিয়ে গেলাসটা নিয়ে এক ঢোকে জল শেষ করে আমি বললাম, আচ্ছা চলি, নমস্কার,

আমরা কিন্তু আপনাকে ঠকাতে আসিনি। বইটা দিলেই পারতেন। না হয় আরও পঁচিশ টাকা বেশী—

—আমার কথা আমি বলে দিয়েছি। তিনশো, না তিরিশ, না তিন হাজার—ওর দাম তো আমি জানি না। ওসব আমি এখন বেচতে পারবো না। নমস্কার।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুদূর আসবার পর চন্দ্রনাথ বললো, রাজপুতের মেয়ে তো, এখনো সেই তেজটুকু আছে। মেয়েটার কি জেদ দেখলে?

আমি বললাম, তুমি আগের বার যখন এসেছিলে, এ বাড়িতে লজপত শিং-এর সঙ্গে খেয়েছিলে, তখন এই মেয়েটিকে দেখো নি?

—ভেতরে চুড়ির টুং-টং আর ফিসফিস কথা শুনেছি মেয়েলি গলায়। কিন্তু লজপত শিং ভারী গোঁড়া লোক ছিল, বাড়ির মেয়েদের বাইরে বেরুতে দেবে, সে রকম লোক নয়!

—বেশ মজার ব্যাপার না? একশো দেড়শো বছর আগে রাজপুতানা থেকে কি জন্য এসেছিল কে জানে! বাংলাদেশে থেকে সব কিছু ভুলে গেছে, বাবা ছিল চোর মেয়েটা হয়তো কিছুদিন বাদে কারুর বাড়ি ঝি-গিরি করবে—

—যাই বলো, এমন জেদী আর বোকা মেয়ে আমি আর দেখিনি। বাবা মারা গেছে, সংসারে এখন রোজগার করার কেউ নেই, মায়ের অসুখ, নিশ্চয়ই খুব টানাটানি চলছে— জিনিসগুলো বেচলে কিছুটা সামলে নিতে পারতো।

—ওর কোন কাকা আসবে—সেও ওকে ঠকাবে না তার ঠিক কি? এতদিনেও একবার আসেনি, বোঝাই যাচ্ছে কি রকম কাকা! পাড়ার ছেলেরা ঐ মেয়েটাকে জ্বালায় না?

—ঐ যে বাঘের মতন কুকুর থাকে পাহারায়? ঐ কুকুর দেখলে কার সাধ্য কাছে এগুবে?

অনেক ঘুরেও শেষে হোটেলে খাবার পাওয়া গেল না, মেজাজটা তিরিক্ষে হয়ে গেল। আর যাই করি, দুপুরে চারটি ভাত পেটে না পড়লে বিশ্ব সংসারের কিছুই ভালো লাগে না। মিষ্টির দোকান থেকে কিছু পান্তুয়া দই খেয়ে নিয়ে পেট ভরে জল খেলাম। ট্রেন সেই সন্ধ্যের সময়। আজ আর অন্য কোথাও ঘোরাঘুরি করার ইচ্ছে নেই। গঙ্গার পারে এসে একটা গাছের ছায়ায় বসলাম দুজনে। মেয়েটা সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলাম। চন্দ্রনাথ কোরআনের দুঃখ ভুলতে পারলো না। আমি বললুম, ওসব বাদ দাও, মেয়েটাকে দেখতে বেশ ছিল। ডাঁসা চেহারা!

কখন দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছি, যখন ঘুম ভাঙলো তখন ছায়া নেমেছে নদীতে, বাতাস ঠাণ্ডা হয়েছে, কলরব শান্ত হয়েছে। ধড়ফড় করে উঠে আমরা এগুলাম স্টেশনের দিকে। চন্দ্রনাথ বললো, ধুৎ, এবার আজিমগঞ্জে আসাটাই লস্ হয়ে গেল—ঐ শালা লজপত শিংটার এত তাড়াতাড়ি খুন হবার দরকারই বা কি ছিল? কোরআনটা বেচে দেবার পর খুন হলেই তো পারতো!

আমি হাসতে হাসতে বললুম, মদটদ খেয়ে কারুর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করেছিল বোধহয়। রাজপুতের রক্ত তো।

—মরবি তো মর্। ঐ রকম একখানা জাঁহাবাজ মেয়ে না রেখে গেলে চলতো না। ; যদি কোনো ছেলেটেলে থাকতো, সে নিশ্চয়ই লোভের মাথায়—

—শোনো চন্দ্রনাথ, রাজপুত বলতে সব সময় আমাদের মনে হয় তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করছে। কিন্তু ওরা তো বড় ব্যবসায়ীও হয়। ভারতবর্ষের অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীই তো রাজপুতানার লোক। মেয়েটা সেই ধারা পেয়েছে, জিনিসের ঠিক দাম না জেনে কিছুতেই বেচবে না, তার আগে না খেয়ে মরে যাক্, সেও ভি আচ্ছা!

স্টেশনে প্রায় পৌঁছে গেছি, সেই সময় আমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লাম। পকেটে হাত দিয়ে বললুম, সর্বনাশ! আমার ইয়েটা কোথায়?

—ইয়ে কি? মানি ব্যাগ?

—না, আমার সানগ্লাসটা!

—কোথায় ফেললে? গঙ্গার পাড়ে নিশ্চয়ই?

—না, না, আমার স্পষ্ট মনে আছে, লজপত শিংএর ঘরে খাটের ওপর রেখেছিলাম!

—তা হলে আর কি হবে! শোভা শিং ওটাকেও আলমারিতে সাজিয়ে রাখবে, ওটারও তো দাম জানে না।

—চালাক নাকি! ওটা আমাকে ফেরত আনতেই হবে! আমার দাদা ওটা ফ্রান্স থেকে এনেছিল, উপহারের জিনিস।

—এখন আবার অতদূরে যাবো? ট্রেন ফেল করবো তা হলে।

—রাত্তিরে আর একটা ট্রেন আছে। চলো মাইরি।

চন্দ্রনাথ গজগজ করতে লাগলো। আমি জোর করে ওকে নিয়ে ফিরে এলাম পথ চিনে চিনে।

লজপত শিং-এর বাড়ির পাশে গলিটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাশের মানুষ দেখা যায় না। হাতড়াতে হাতড়াতে দুজনে এগুচ্ছি। দেশলাই জেবলে জেবলে দেখে নিচ্ছি রাস্তা। পেছন থেকে একটা রিক্‌শা প্রায় নিঃশব্দে এসে আমাদের ঘাড়ের ওপর পড়ছিল আর একটু হলে। আমরা দ্রুত সরে দাঁড়ালাম, রিক্‌শার যাত্রী একটা গালাগাল দিয়ে উঠলো, গলা শুনেই বোঝা গেল লোকটা মাতাল।

রিক্‌শাটা থামলো ঠিক সেই ঘরের সামনে। কুকুরটা প্রচণ্ড শব্দে ডেকে উঠলো। রিক্‌শার যাত্রী ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরা এক বাবু, টলতে টলতে নামলো। কুকুরটার উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো, ফিস্‌স, ফিস্‌স, আস্তে, চেনা লোক—

আমরা থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে গেল। লণ্ঠন হাতে নিয়ে সেই মেয়েটি দাঁড়ালো। ঠিক সেই রকমই নির্লিপ্ত, উদাসীন মুখ, কিন্তু কুকুরটার গায়ে হাত দিয়ে বললো, সরে যা। লোকটা এগিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কি বলে পকেট থেকে ব্যাগ বার করলে। মেয়েটা দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে লোকটাকে ভেতরে ঢোকার জায়গা দিল!

চন্দ্রনাথ চুপি চুপি আমাকে বললো, এবার বুঝলে তো ওদের সংসার কি করে চলে?

আমি বললাম, আমি আরও একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছি। মেয়েটা জিনিসগুলো বেচবে না, তবু কেন ও আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকতে দিয়েছিল! ও দেখতে চেয়েছিল, যে জিনিসের ও দাম জানে, যে-জিনিস বিক্রি করতে গেলে ও ঠকবে না, আমরা সেটা কিনতে চাই কিনা!

—কি সেটা?

—ওর শরীর।

দূর উদাস

এই ডাবু, বুড়োকে ডাক।

—ডাকছি ওস্তাদ।

—ছুটে যাবি, দৌড়ে আসবি। কুত্তাকা চাল। বিল্লিকা চাল নেহি, সমঝা?

—সমঝ গিয়া ওস্তাদ! চা-টা মেরে দিয়েই যাচ্ছি।

—যাবার সময় খোঁজ নিয়ে যাবি, নটা পঁচিশের রাণাঘাট লোক্যাল লেট আছে কি না।

—এস্টেশানে যাবো?

—হ্যাঁ, যাবি। আর বুড়োকে বলবি এক্ষুণি আসতে।

চায়ের দোকান থেকে উঠে ডাবু বেরিয়ে গেল। তার চলার ধরনটা একটু অদ্ভুত। দেখলে মনে হয় তার কোনো স্নায়ুর অসুখ আছে। সে সামনে তাকিয়ে চলতে জানে না, হঠাৎ ডান দিকে বাঁ দিকে, পেছনে মাথা ঘোরায়। তার দুটো হাত কখনও এক সঙ্গে বাইরে থাকে না—একটা হাত পকেটে থাকবেই। চলতে চলতে সে অনবরত রাস্তা পার হয়ে ফুটপাথ বদল করে। কোনো মেয়ে দেখলেই তার চোখ আটকে যায়। তখন সে একটুখানি থামে। তখন সে ঠোঁট নাড়ে ও চোখ পিটপিট করে। মেয়েটির স্বাস্থ্য যত ভালো হবে, তার এই ধরনের প্রক্রিয়া তত বৃদ্ধি পাবে।

—এই পরী, এদিকে আয়।

—কী ওস্তাদ!

—দ্যাখ তো এই লাইটারটার কী হয়েছে? জ্বলছে না শালা! কাল সকালেই তেল ভরেছি।

—পাথর ফুরিয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

—ধ্যাৎ তেরিকা।

—সে কি ওস্তাদ! ফেলে দিলে। দামী জিনিসটা!

—চুপ মর। আবার আসবে।

পরী চুপ করে গেল। ওস্তাদ অর্থাৎ পল্টুর এরকম উপসর্গ সে চিনতে পারে। এক একদিন হয় এরকম পল্টুর, যেদিন জিনিসপত্তর নষ্ট করার একটা ঝোঁক চাপে তার। ঐ যে দামী লাইটারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, ওটা পরী যদি এখন ধড়িয়ে নিতে চায়, প্রচণ্ড ধাতানি খাবে। খানিকটা আগে সিগারেট কিনে টাকা ভাঙাবার সময় পল্টুর হাত থেকে একটা টাকা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, পল্টু আর টাকটা তুললোই না। কাছেই একটা ভিখিরির ছেলে অন্য একজন লোকের পাশে দাঁড়িয়ে ঘ্যানঘ্যান করছিল, পল্টু তাকে ডেকে টাকাটা দেখিয়ে বললো, এই লে লে, এই যে, লে!

আরও অনেক কিছু পল্টু আজ ফেলে দেবে বা নষ্ট করবে।

পল্টু, পরী, ডাবু, বুড়ো—ওদের প্রত্যেকেরই একটা করে ভালো নাম আছে। কিন্তু বহুদিন সেই নাম ব্যবহৃত হয়নি, কেউ ডাকেনি।

ওরা বসেছিল চায়ের দোকানের একটা কেবিনের মধ্যে। পর্দা ফেলা নেই, কিন্তু ওদের ওখানে কেউ ঢুকবে না। না ডাকলে বেয়ারাও আসবে না উঁকি মারতে।

পল্টু তার কাপে যেটুকু চা ছিল সেটা ঢেলে ফেলে দিল অ্যাসট্রেতে। তারপর মাটিতে রাখা ঝোলাটা থেকে নিচু হয়ে সাবধানে হাত চালিয়ে আনলো একটা মদের বোতল। নিজের কাপে পুরো ভর্তি করে পরীকে বললো, দে কাপ দে। ডাবুর সামনে বার করিনি, ও একটুতেই ধচকে যায়। কি জিনিস দেখেছিস?

পরী মদের বোতলটার লেবেল পরীক্ষা করে বললো, আরেঃ বাস! দারুণ—

পল্টু কাপটা মুখের কাছে তুলে সেই র জিনিসটা খেয়ে ফেললো এক চুমুকে। মুখের একটা শিরাও কাঁপলো না, হেঁচকি উঠলো না। পরী সপ্রশংসভাবে তাকিয়ে আছে সেদিকে। এই না হলে আর ওস্তাদ।

ঐ তীব্র আরক পান করার প্রতিক্রিয়া মাত্র দেখা গেল পল্টুর চোখে। চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে লালচে হয়ে গেল।

কাপ আবার ভর্তি করে পল্টু বললো, এইসব দিনে কাকে বেশী মনে পড়ে জানিস? পাগলাকে। পাগলা চলে গিয়ে আমার ডান হাতখানা নষ্ট হয়ে গেছে।

পরী বললো, পাগলা শালা কেন পালিটিকসে ভিড়তে গেল। আমি তখুনি বলেছিলাম, ও সব ছেঁড়া ঝামেলা। এক একদিন এক এক রকম কথা বলে—

পল্টু গম্ভীর হয়ে যায়। আপনমনে বলে, পাগলার মাগীটাও ছিল ঝনঝাটিয়া।

ডাবু এসে বললো, বুড়ো আসতে পারবে না। ও বললো ওর জ্বর হয়েছে।

পল্টু ক্রুদ্ধভাবে বললো, ও বললো, না তুই দেখলি?

—বুড়ো শুয়ে আছে দেখলাম। সাবি আমাকে বললো—

পল্টু উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চল, দেখে আসি। ট্রেন লেট আছে?

—কুড়ি মিনিট।

রাস্তা দিয়ে ওরা তিনজন পাশাপাশি হাঁটে না। ছড়িয়ে থাকে। এই শহরতলির পথ, ঘাট, বাড়ি, দোকানপাট ও জীবনযাত্রার যে একটি নিজস্ব নিয়ম আছে, ওরা তার থেকে একটু বাইরে। ওরা একই সঙ্গে সতর্ক ও ছটফটে।

মানুষ শিকারীর জাত। পশু শিকারকে ভিত্তি করে এক সময় মানবগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। অনেকদিন কাটলো এই পৃথিবীতে। এখন বড় বড় পশুরা প্রায় নির্মূল, খাবারের জন্য পোষ মানা পশুদের চাষ হয়। তবু নিসপিস করে মানুষের হাত। মানুষ

এখন শিকার করে মানুষকে। সুসভ্য প্রাসাদ-নিবাসী মানুষও মানুষ শিকারী। এরা তারই একটা উল্টো পিঠ।

এখানকার রাস্তা সব ভাগ করা। এরকম দুটি দলের একই সময়ে একই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই। অরণ্যের নিয়মও এই রকম।

তবে পল্টু উপস্থিত থাকলে তার দলকে কেউ বিশেষ ঘাঁটায় না। এখন কিন্তু পল্টুই ওদের নির্বিঘ্নে চলে যবার অধিকার দিল। দল নিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে পল্টু। হাতের সিগারেটটা আদ্ধেকও শেষ হয়নি, সেটা ফেলে দিয়ে আর একটা ধরালো মনোযোগ দিয়ে—

রেল লাইন পেরিয়ে গেলে বস্তি। বস্তির এক কোণে বুড়োর ঘর। বুড়োর বয়স বছর তিরিশেক। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে বুড়ো, খাটিয়ার পাশে একটি পাতলা চেহারার মেয়ে দাঁড়িয়ে।

পল্টু ঘরে ঢুকে বুড়োর গা থেকে চাদরটা একটানে তুলে ফেলে বললো, ওই শালা!

—মাইরি, আমার জ্বর হয়েছে, আজ আমি যাবো না!

—ভাল্লুক শালা! তোর জ্বরের ইয়ে মারি।

পরী হাসছে। পল্টুর যেমন জিনিসপত্তর নষ্ট করা, বুড়োর তেমন জ্বর। প্রত্যেকবার এইরকম হয়।

পল্টু মদের বোতলটা বার করে বুড়োর মুখে ঠেসে দিয়ে বললো, খা শালা, তোর জ্বরের বাপ পালাবে!

পাতলা চেহারার মেয়েটি পল্টুকে তেজের সঙ্গে বললো, কি হচ্ছে কি? ও আজ যাবে না! আমি বলছি, যাবে না!

পল্টু হাসলো। এরকম ভয়ংকরভাবে হাসা কি সে অভ্যেস করেছে, না তার সহজাত? দেখলেই গা শিরশির করে।

খপ করে সে মেয়েটির একটি হাত চেপে ধরেই সঙ্গে সঙ্গে মুচড়ে দিয়ে বললো, দিই ভেঙে দিই?

যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে মেয়েটি বললো, উঃ লাগছে, লাগছে—

পল্টু হাসতে হাসতে আরো মোচড়াতে লাগলো। বুড়ো ততক্ষণে ধড়মড় করে উঠে বসেছে। খানিকটা অনুনয়, খানিকটা ভর্ৎসনা মিশিয়ে বললো, কি যে করো তুমি ওস্তাদ। মেয়েছেলের গায়ে হাত দাও কেন?

পল্টু সে কথা গ্রাহ্য না করে মেয়েটির হাত ছেড়ে দিয়ে তার গালে ঠাস্ করে একটা চড় কষালো। বললো, আমার মুখের ওপর কোনোদিন কথা বলবি না, বুঝলি?

তারপর বুড়োর দিকে ফিরে বললো, যন্তর নিয়েছিস? চল্।

মেয়েটি তার যন্ত্রণাকাতর হাতটি আদর করতে করতে বললো, মরো, আজই তোমরা সব্বাই মরো! আমি হরির লুট দেবো! মা শেতলার পুজো দেবো। তোমাদের চিতায় বসে কেত্তন গাইবো!

একটা দশ টাকার নোট মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পল্টু বললো, চলি সাবি। তোর বুড়োকে ঠিক ফিরিয়ে এনে দেবো। আমি মরি আর না মরি, তোর বুড়োকে ঠিক ফেরত পাবি। মাংস আনিয়ে রাখবি, বুঝলি?

এরপর ওরা বস্তির পেছনে দাঁড় করানো একটা জীপ গাড়িতে চেপে অনর্থক ঘোরাঘুরি করলো মিনিট পনেরো। কোনো উদ্দেশ্য নেই, একটি গাড়ি চেপে ঘোরা। গাড়িতে, ঘুরতে ঘুরতেই মদের বোতলটা শেষ হয়ে গেছে। পল্টু সেটা ছুঁড়ে দিল রাস্তায়, ঝনঝন করে ভাঙলো। জীপ এসে থামলো রেল স্টেশনের সামনে, ওরা তিনজন নামলো, পরী জীপটা চালিয়ে চলে গেল অন্য কোথাও।

স্টেশনেও ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নেই, ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ট্রেন আসতে তিনজনে উঠলো তিনটে কামরায়। যেন কেউ কারুকে চেনে না। মিনিট পনেরো চলার পর ট্রেনটা দুটো লম্বা একটা ছোট হুইসল দিতে দিতে গতি মন্থর করে থেমে গেল অন্ধকার মাঠে। কেন থামলো, কেউ জানে না।

তিনটে কামরা থেকে টপাটপ নেমে পড়লো ওরা তিনজন। দু' এক মুহূর্ত কি কথার বিনিময় হলো। তারপর তিনজনেই উঠে পড়লো একটা কামরায়। ট্রেন আবার খুব আস্তে আস্তে চলতে শুরু করেছে।

পল্টুর হাতে রিভলবার। ডাবু আর বুড়োর হাতে ছুরি। কামরাটায় উনিশ কুড়ি জনের বেশী যাত্রী নেই। পল্টু হিংস্র দাঁত দেখিয়ে বললো, কেউ একটু চেল্লালে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো। বার কর শালারা কি আছে!

কামরার লোকেরা পুতুলের মতন নিথর নিস্তব্ধ। শুধু একজন মাঝ বয়েসী মহিলা আর্ত শব্দ করে উঠলেন। তিনিই ওখানে একমাত্র মহিলা। কেউ কিছু বার করে দিল না। বুড়ো সত্যিকারের একজন বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, ঘড়িটা খোল শালা। হাঁ করে দেখছিস কি?

ঘড়ি খোলার অনুরোধে, কিংবা শালা বলে সম্বোধন করার জন্যই হোক—বৃদ্ধটি রীতিমতন হতভম্ব হয়ে যায়।

নিতান্ত অকারণেই, শুধু দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য, পল্টু তার কাছাকাছি যে লোকটি ছিল তার বুকে রিভলবারটা ঠেকিয়ে চারটি বীভৎসতম গালাগালি দিল, তারপর এত জোর ঘুষি মারলো তার মুখে যে লোকটির ঠোঁট দিয়ে সংগে সংগে রক্ত বেরিয়ে এলো। এবার টাকা পয়সা, ঘড়ি পড়তে লাগলো টপাটপ। ডাবু সেসব ভরে নিচ্ছে থলিতে, বুড়ো গিয়ে জনে জনে পরীক্ষা করছে। একজন লোকের গেঁজের মধ্যে সাত হাজার টাকা পাওয়া গেল। অত টাকা সংগে নিয়ে সে রাত্রির ট্রেনে ঘোরে কেন তার বা উত্তর কে দেবে!

প্রৌঢ়া মহিলা তার গলার হারটা কিছুতেই দেবেন না। অলংকারের প্রতি মেয়েদের বড্ড বেশী মায়া। পল্টু নিজে এগিয়ে গেল মহিলার কাছে। হারটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছিঁড়তে গেল। সহজে ছেঁড়ে না। মেয়েদের প্রতি পল্টু স্বভাবতই নিষ্ঠুর। মহিলার বুকে এক হাতের ভর রেখে অন্য হাতে টানাটানি করতে লাগলো হারটা। যখন সেটা ছিঁড়লো, তখন মহিলা দম বন্ধ হয়ে যাবার মতন একটা আর্তনাদ করলেন। শারীরিক যন্ত্রণায় কিংবা সোনা হারাবার দুঃখে।

সব মিলিয়ে জিনিসপত্তর মন্দ হয় নি, কিন্তু তবু ওদের নামার তাড়া নেই। দু'জন লোককে বেছে নিয়ে ডাবু আর বুড়ো তাদের বুকের কাছে ছুরি ধরে প্যান্ট খোলাচ্ছে। এটা নিছক খেলা নয়, প্যান্টগুলোর সত্তর-আশী টাকা করে দাম, টেরিলিন। একজন লোক প্যান্ট ও শার্ট দুটোই খুলে দিয়েছে। অন্য লোকটির লজ্জা বেশী। সে কিছুতেই প্যান্ট খুলতে চায় না। বুড়োর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ছুরিটা বসিয়ে দিল লোকটির পেটে। লোকটির লজ্জার মূল্য।

রক্ত দর্শনের সংগে সংগে দৃশ্যটা বদলে গেল। এতক্ষণ সবাই চুপ ছিল। এবার ভয়ার্ত চেঁচামেচি। ওরাও এবার অতি দ্রুত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে। ট্রেন চলছে তখনও খুব আস্তে আস্তে। ওরা লাফিয়ে নেমে পড়লো। এবং কামরার চেঁচামেচি বেড়ে গেল বহুগুণ।

এরপর বোমা ছোঁড়ার দায়িত্ব বুড়োর। ঝোলা থেকে বার করে পর পর তিনটে বোমা ফাটালো পালাবার আগে। ট্রেন থেমে গেছে একেবারে। কয়েকজন পুলিশ ব্যস্তভাবে ছোটাছুটি করছে—ঠিক যে কামরাটায় গোলমাল সেটা বাদ দিয়ে। এবং পল্টুরা যেদিকে ছুটে গেছে, তার বিপরীত দিকে ওরা তাড়া করে গেল। শূন্য অন্ধকারের উদ্দেশ্যে।

পরী জীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, ওরা উঠে পড়তেই জিজ্ঞেস করলো, মালকড়ি কি রকম, ভালো?

পল্টু বললো, মন্দ না! চল্।

যেন রসগোল্লার রস, এই ভঙ্গিতে পল্টু বুড়োকে বললো, এই, তোর হাতে রক্ত লেগে আছে, আমার গায়ে লাগাস নি।

জীপ ছুটছে। নিখুঁত প্রোগ্রাম। এর আগের দুটি অনুষ্ঠানও এইভাবে সফল হয়েছে। কোনো জায়গা থেকে কোনো বাধা আসে না। এবার কিন্তু ত হলো না। একটু বাদেই দেখা গেল, অার দুটি জীপ ওদের তাড়া করে আসছে। এরকম তো কথা ছিল না।

পরীর মাথা ঠাণ্ডা, তাদের গাড়ি অনেকটা এগিয়ে আছে, খুব বেশী ভয়ের কারণ নেই। কিছুক্ষণ রেস চলবার পর পরী বললে, ওস্তাদ, সামনের চেক পোসটে বাম্প আছে। গাড়ি এসস্লো করতে হবে।

পল্টু ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দেখবার চেষ্টা করে বললো, ঐ জীপে ও সি আছে নাকি দ্যাখ তো? ও সি যদি থাকে—

ভাবুও এতক্ষণ পেছনে তাকিয়েছিল। তার দৃষ্টি বাইনোকুলারের মতন দূরকে কাছে আনে। এবার আঁতকে উঠে বললো, পুলিশ নয়, মিলিটারি!

মিলিটারির সঙ্গে রেস দেবার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া এমনও হতে পারে, মিলিটারি ওদের তাড়া করছে না। ওরা সাইড দিলেই চলে যাবে। একটু এগিয়েই ডান পাশে একটু সরু রাস্তা আছে, সেটাতে যদি ওরা বেঁকতে চায়, তাহলেও গাড়িটার গতি কমাতে হবে ওদের।

পল্টু বললো, সাইড কর, পরী সাইড কর।

কিন্তু গাড়ির গতি কমে আসতেই ও গাড়ি থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুটে এলো। আর তো উপায় নেই। কপালের গেরো যাকে বলে। হয়তো এ তল্লাটটায় হঠাৎ কারাফিউ হয়ে গেছে, মিলিটারি নেমেছে। পলিটিকসের ছোঁড়ারা কিছু একটা করেছে এদিকটায়। ওদের দোষে পল্টুদের এই বিপদ।

হঠাৎ ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়েই পরী এক লাফে নেমে অন্ধকারে পালালো। এত দ্রুত সে চম্পট দিল যে তার সঙ্গীরাও এক মুহূর্ত আগে বুঝতে পারেনি তার মতলব। ভাবুও নেমে পড়েছে। পল্টুর হাতে রিভলবার। কিন্তু এটা নিয়ে মিলিটারির সঙ্গে লড়া যাবে না। পালাবার সুবিধের জন্য বুড়ো ও পল্টু বোমা ছুঁড়তে লাগলো রাস্তায়।

দৌড়ে ওরা অনেকটা চলে এসেছিল, ততক্ষণে মিলিটারিও গাড়ি থেকে নেমে তাড়া করছে। সরাসরি পিঠের মধ্যে গুলি খেয়ে বুড়ো মুখ থুবড়ে পড়লো। একটা মোটা অশ্বত্থ গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়েছে পল্টু। এখনো পালানো যায়। কিন্তু একজন লোক এগিয়ে আসছে বুড়োর দেহটার দিকে। বদলা না নিয়ে পালিয়ে যাওয়া পল্টুর রক্তে নেই। বুড়ো যদি এখনো বেঁচে থাকে—

বুট দিয়ে বুড়োর দেহটা ধাক্কা দিয়েছিল যে-লোকটা, পল্টু পরপর তিনটে গুলি চালিয়ে তার দেহটা ফুঁড়ে দিল। তারপর কোথা থেকে একটা গুলি এসে লাগলো তার ডান বাহুতে।

পল্টুদের দুর্ভাগ্য, তারা পড়ে গিয়েছিল সামরিক অফিসারদের দুটি জীপের সামনে। ট্রেন থেকে কিছু লোক নেমে সামরিক অফিসারদের জীপ অবরোধ করে ডাকাতির কথা জানিয়েছে।

গুলি খেয়ে পল্টু পড়ে গেল মাটিতে, সঙ্গে সঙ্গেই উঠে আবার ছুটতে গেল। একটা সবল হাত চেপে ধরলো তার ঘাড়।

হাতের যন্ত্রণায় পল্টু তখন মরীয়া। পাগলা কুকুরের মতন ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুরি তুলতে যেতেই খেল একটা প্রচণ্ড থাপ্পড়। তবু বিস্ময়ের সঙ্গে পল্টু বললো, সাধনদা!

সামরিক অফিসারটি জিজ্ঞেস করলেন, কে?

—সাধনদা, আমি পল্টু ছেড়ে দাও।

—কে?

সামান্য একটু হাত আলগা হয়েছিল সেই সুযোগে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পল্টু আবার ছুটছে। যাবার আগে পল্টু তার প্রতিপক্ষের থুতনিতে তার মাথা দিয়ে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা ও একটি গালাগাল দিতে পেরেছে শুধু। এবার আর তাকে কেউ ধরতে পারবে না।

পেছন থেকে চিৎকার ভেসে এলো, হল্ট! গুলি করবো!

পল্টু আর দাঁড়ায় কখনো! তার দু' পায়ে এখনো শক্তি আছে, বুড়োকে মারার বদলা নিয়েছে, আর তার কোনো দুঃখ নেই।

আবার চিৎকার শোনা গেল, দাঁড়াও!

পল্টু দাঁড়াতে পারলো না। স্টেনগানের গুলিতে তার শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেল। একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারলো না। শরীরটা মাটিতে পড়ার আগেই তার শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেছে!

—কি রে পল্টু, তোর খবর কি?

—সাধনদা, আমার মা মারা গেছেন!

—তাই নাকি? কবে? ইস্—

—এই তো, মাস দেড়েক হলো—

—তা তোর ন্যাড়া মাথা দেখে আমি ভাবছিলুম—প্রথমে ঠিক চিনতেই পারি নি। কি হয়েছিল?

—কিছুই না, এমনি একটু সর্দি জ্বরটর আসলে ভেতরে ভেতরে—

—ইস্, খবরই পাই নি। তোর মা আমাকে খুব ভালোবাসতেন।

—তোমরা তো ছিলে না কলকাতায়।

—হ্যাঁ, আমরা তো এখন দিল্লিতেই থাকি। তোরা এখন থাকিস কোথায়? তোর বাবা, ইয়ে, উনি বেঁচে আছেন নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ। বাবা খড়দায় একটা ছোট দোকান করেছে। আমরা ওখানেই থাকি।

—তোর চেহারাটা এরকম চোয়াড়ে চোয়াড়ে হয়ে গেছে কেন? পড়াশুনো তো আর করলি না!

পল্টু লজ্জা পেল। মুখ নিচু করে বললো, আমার দ্বারা হলো না। আমার মাথা নেই।

সাধন হাসতে হাসতে বললো, দিব্যি একটা মাথা তো রয়েছে দেখতে পাচ্ছি? স্কুল ফাইনালে ক'বার ফেল করলি?

—দু'বার।

—বারবার তিনবার হবে না?

—তুমি তো জান সাধনদা, মা নেই, বাবা আমাকে আর পড়াবে না।

—তুই তা হলে এখন কি করবি?

—একটা চাকরিবাকরি দেখতে হবে। ড্রাইভিং শিখছি! যদি ড্রাইভারির চাকরি পাই।

—এত কম বয়েসে তোকে কে চাকরি দেবে? কত বয়েস তোর এখন? ষোলো না সতেরো?

—উনিশ।

—উনিশ হয়ে গেল? ড্রাইভারি করে কি করবি? দ্যাখ যদি কোনো কারখানায় ঢুকতে পারিস!

—তোমার তো অনেক জায়গায় চেনা আছে। একটু চেষ্টা করো না আমার জন্য!

—আচ্ছা দেখবো। আজকাল চাকরিবাকরির বাজার এত টাইট!

—তুমি কি আবার দিল্লি ফিরে যাবে?

—হ্যাঁ। এখন এক মাসের ছুটিতে আছি। জানিস তো, আমি এখন আর্মিতে—

—জানি। তোমরা এখনো সেই মনোহরপুকুরের বাড়িতেই আছো তো?

—ঐখানেই। আসিস একদিন। চলি—

—দাঁড়াও না। অনেকদিন বাদে তোমাকে দেখলাম।

—চল, চা খাবি?

সাধন পল্টুর কাঁধে হাত রেখে কাছাকাছি চায়ের দোকানের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো। যেতে যেতে আন্তরিকভাবে বললো, তোর মা মারা গেছেন শুনে আমার মনটা খুব খারাপ লাগছে। আমাকে এত ভালবাসতেন। আমার মাও খবরটা শুনে খুব দুঃখ পাবেন।

—মা, ঐ দ্যাখো সাধনদা!

—কোথায়? ওমা তাই তো, সাধনই তো।

—ডাকবো?

—যা, যা ডাক ডাক!

—এই সাধনদা, সাধনদা! আমায় চিনতে পারছো না?

—কে?

—আমি পল্টু।

—আরেঃ, পল্টু! তোকে চিনতেই পারি নি। কত বড় হয়ে গেছিস।

—বাঃ, তুমিও তো বড় হয়েছো! ঐ যে মা দাঁড়িয়ে আছেন!

—তাই নাকি? চল দেখা করে আসি।

সাধন এসে নিচু হয়ে পল্টুর মায়ের পায়ের ধুলো নিল। মা আশীর্বাদ করলেন, বেঁচে থাকো বাবা। সুখী হও। কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম!

সাধন বললো, হ্যাঁ, খুড়িমা। অনেকদিন পর। পল্টুকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি, চিনতেই পারি নি। কত বড় হয়ে গেছে। তুই কোন ক্লাসে পড়িস রে পল্টু?

—ক্লাস সেভেন। দেশবন্ধু বিদ্যালয়।

মা জিজ্ঞেস করলেন, সাধন, তুমি এখন কি পড়ো?

—আমি এবার আই এস সি পরীক্ষা দিলাম।

—বেশ বেশ। আরও লেখাপড়া শেখো, বাপমায়ের মুখ উজ্জ্বল করো। এখানে হঠাৎ কি করে এলে?

—বন্ধুদের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ বেড়াতে এসেছি! এই বহরমপুরের স্টেশনের ধারে একটা হোটেলে উঠেছি।

—হোটেলে উঠেছো? কেন? তুমি আমাদের বাড়িতে থাকবে চলো।

—না খুড়িমা, বন্ধুদের সঙ্গে এসেছি তো! তা ছাড়া আমরা কালই চলে যাবো—

—তোমার মা কেমন আছে? কলকাতায় কোথায় থাকো তোমরা?

—আমরা মনোহরপুকুরে একটা বাড়ি কিনেছি। একদিন আসুন না—মা খুব খুশী হবেন। মাকে বলবো আপনাদের কথা।

—আমি আর গেছি। কেই বা নিয়ে যাবে। ওনার তো অসুখ—

—কেন, পল্টু নিয়ে যেতে পারে না? এই পল্টে তুই ট্রেনে চেপে যেতে পারবি না? শিয়ালদায় নেমে এইট বি বাসে চাপবি।

—হ্যাঁ, পারবো—

মা বললেন, চলো সাধন, একটু আমাদের বাসায় বসবে চলো। কাছেই, বেশী দূর না। এতদিন পর তোমাকে দেখলাম—

—খুড়িমা একটু দাঁড়ান, আমার বন্ধুদের একটু বলে আসি—

—দরজা খুলে ঘরে ঢুকে মা বললেন, বসো, এই খাটের ওপর বসো। থাক, থাক, জুতো খুলতে হবে না! ঘরদোরের যা অবস্থা! মানুষজন কেউ এলে লজ্জা করে। তোমার কাছে লজ্জা নেই। দেশে থাকতে তোমার মা আর আমি কত বন্ধু ছিলাম। ওর বাড়ি যা রান্না হতো আমাকে না দিয়ে খেতো না। আমিও নিজে রান্না করে—

—হ্যাঁ খুড়িমা, মনে আছে আমার!

—তোমার বোন চন্দনার বিয়ে হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ বিয়ে হয়ে গেছে। দিদিও এখন দিল্লিতে থাকে। জামাইবাবু সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের অফিসার।

—বাঃ! খুব ভালো! খুব খুশী হয়েছি। সুখে শান্তিতে থাকুক। আর তোমার ছোটভাই নয়ন?

—ও দার্জিলিং-এ পড়ছে। ঝর্ণাদি কোথায় খুড়িমা?

—ঝর্ণাকে তো নার্সিং-এ দিয়েছি। ট্রেনিং পাস করলে যদি কিছু রোজগার করতে পারে। বিয়ে তো দিতে পারলাম না। দেবোই বা কোথেকে, রোজগার নেই সংসারে কারুর। তোমার কাকার তো অসুখ। ঐ যে কাশির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো না? মাঝে মাঝেই জ্বর আর কাশি!

—ডক্তার দেখান নি!

—হাসপাতালে দেখিয়েছি। তারা বলে ওখানে ভর্তি হতে। কিন্তু ভর্তি হওয়া কি সহজ!

—খুড়িমা, আপনারও তো চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। আগে কী সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল আপনার!

—না, না, আমার কিছু হয় নি। আমি ভালো আছি।

—আমি তা হলে এখন উঠি? বন্ধুরা অপেক্ষা করবে। পল্টু কোথায় গেল?

—বসো, আর একটু বসো। তোমাকে এতদিন পরে দেখে কত ভালো লাগলো। তোমরা সব সুখে শান্তিতে আছো। শুনেও প্রাণে আনন্দ হয়।

—এই পল্টু, কোথায় গিয়েছিলি? একি খুড়িমা, আপনি আবার এসব [illegible]রটাবার আনালেন কেন? না, না—

—কিছু না, কিছু না, একটু মিষ্টি। এতদিন পরে দেখলাম, তুমি আমায় প্রণাম করলে, আর একটু মিষ্টি খাওয়াবো না?

—গ্রামে থাকার সময়, যখনই আপনার বাড়িতে যেতাম, কত কি খেতাম—[illegible] আছে আমার—

—সে সব কথা আর—

—এই পল্টু, তোর থুতনিতে ওরকমভাবে কাটলো কি করে রে?

পল্টু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। একবার মায়ের মুখের দিকে তাকালো, একবার সাধনদার দিকে। তারপর আড়ষ্টভাবে বললো, কালকে পড়ে গিয়েছিলাম!

পল্টুর মা কেঁদে ফেললেন। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বললেন, না পড়ে যায় নি। মানুষ কত নিষ্ঠুর হয়। কাছেই একটা বাড়িতে পল্টু খেলতে যায়। তারা বড়লোক, আমরা না হয় কিছুই না, তবু আমাদের ছেলেও তো ছেলে। তার বাপমায়ের মনে কি লাগে না? বাড়ির মধ্যে লুকোচুরি খেলছিল, পল্টুর হাতে ধাক্কা লেগে নাকি একটা দামী ফুলদানি ভেঙে গেছে। না হয় ভেঙেইছে। কিন্তু ও তো ছেলেমানুষ, ওকি বুঝে-সুঝে ইচ্ছে করে ভেঙেছে? তাদের ছেলের হাতে লেগেও তো ভাঙতে পারে। তাই জন্য কেউ মারে? কী রকমভাবে মেরেছে দ্যাখো! জামায় রক্ত মেখে কাঁদতে কাঁদতে যখন ছেলেটা বাড়িতে এলো, আমার বুকের মধ্যে কী রকম...আমি ঠোঙা বিক্রি করে কত কষ্ট করে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি—যদি ও মানুষ হয়ে একদিন আমাদের দুঃখ দূর করে—

একটি পাঁচ বছরের ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে লাফাতে লাফাতে এসে বললো, মা, তুমি সাধনকে পায়েস দিয়েছো, আমাকে দাওনি।

—ছিঃ পল্টু, সাধন বলতে নেই। সাধনদাদা বলতে হয়। তোমার চেয়ে বয়েসে বড় না?

—তুমি সাধনদাদাকে কেন পায়েস দিয়েছো আগে? আমাকে দাও নি!

লম্বা টানা বারান্দায় কার্পেটের আসনের ওপর বাবু হয়ে বসেছে আট বছয়ের ছেলে সাধন। মন দিয়ে পায়েস খাচ্ছে।

মা বললেন, দিচ্ছি, যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসো!

পল্টু লাফাতে লাফাতে হাত ধুতে গেল। মা সাধনকে জিজ্ঞেস করলেন, আর একটু নেবে? নাও আর দু' হাতা, নারকেলের নাড়ু নাও! এই তো লক্ষ্মী ছেলে, কী সুন্দর কথা শোনে।

পল্টু এসেই সাধনের দেখাদেখি বাবু হয়ে বসে বললো, আমাকেও সাধনদাদার মতন নাড়ু দাও!

—তুই তো সকালে খেয়েছিস। পেট কামড়াবে!

—না, আমাকে এখন দাও!

—তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও তাহলে। তারপর দুজনে খেলা করতে যাবে। কেমন?

ঝগড়া করবে না কিন্তু!

সাধন পরিপাটি করে চেটেপুটে পায়েস খেয়ে উঠলো। পল্টুর মা তার মুখ ধুইয়ে মুছে দিলেন। সিকনি গড়াচ্ছিল সাধনের নাক দিয়ে, মুছে দিলেন সেটাও। তারপর পল্টুর মুখ ধুইয়ে দিয়ে বললেন, যাও এবার খেলতে যাও।

সাধনের বাবা আর মা এলেন সেই সময়। ওঁরা পাশের আর একটা বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সাধনের মা সাধনকে বললেন, চল, এবার বাড়ি যেতে হবে।

পল্টুর মা বললেন, এক্ষুনি কি যাবি! বোস্, ওরা খেলা করুক্ ততক্ষণ।

সাধনের মা পল্টুকে কোলে নেবার চেষ্টা করলেন। পল্টু কিছুতেই কোলে উঠবে না। তিনি বললেন, কনক, তোর ছেলেটা কি সুন্দর দেখতে হয়েছে! মাথা ভর্তি চুল, টানাটানা চোখ—

পল্টুর মা স্মিত হেসে চেয়ে রইলেন, ছেলের দিকে। সাধন আর পল্টু খেলা করতে চলে গেল।

নদীর পার দিয়ে উঁচু বাঁধ। বর্ষাকাল, একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ বনানী পৃথবী এখন জলে ধোওয়া পরিষ্কার। ঘাসের ডগায় বিন্দু বিন্দু জল। ফুরফুর করছে বিকেলবেলার হাওয়া। তার মধ্যে খেলা করছে দুটি শিশু।

একটা ঝাঁকড়া কদমগাছে থোকা থোকা ফুল ফুটে আছে অজস্র। ফুলগুলো পর্যন্ত ওদের হাত যায় না। লাফিয়ে লাফিয়েও ধরতে পারলো না।

পল্টু বললো, সাধনদাদা, তুমি গাছে উঠতে পারো?

সাধন বিজ্ঞের মতন বললো, বর্ষাকালে গাছে উঠতে নেই। গাছের মধ্যে সাপ থাকে। সবুজ সবুজ সাপ।

—আমি সাপ দেখেছি। তুমি দেখেছো?

—অনেক। অনেক।

—কদম ফুল গাছে সাপ থাকে না।

—হ্যাঁ, তোকে বলেছে! তুই ভারি জানিস!

—হ্যাঁ, জানিই তো। দিদি আর আমি এই গাছটায় একদিন উঠেছিলাম।

—যা, মিথ্যুক!

—সত্যি! দেখবে, আবার উঠবো?

—আমি তাহলে খুড়িমাকে বলে দেবো। গাছ ভিজে! আয় আমরা লুকোচুরি খেলি!

খানিকটা বাদে পল্টু ছুটতে ছুটতে বাড়িতে এসে ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, মা, সাধনদাদা আমাকে মেরেছে!

সাধনের মা বললেন, মেরেছে তোমাকে? ডাকো সাধনকে। বকে দিই! এসো, সোনা ছেলে, কোথায় লেগেছে তোমার? আদর করে দিচ্ছি। একটু না বেশী?

পল্টু বললো, একটু।

পল্টুর মা ধমক বললেন, যাও। খেলতে খেলতে ওরকম নালিশ করে না! খেলার সময় ওরকম হয়? আবার গিয়ে খেলা করো!

লুকোচুরি খেলায় সাধন পল্টুকে আর খুঁজে পায় না। খুব সাবধানে নদীর বাঁধে উঠে উঁকি মেরে দেখলো। সেখানে কেউ নেই। কোথাও নেই পল্টু।

ভয়ে ভয়ে কাঁপা গলায় সাধন চেঁচিয়ে উঠলো, এই পল্টু! কোথায় গেলি? পল্টু—উ-উ-উ।

কাছে থেকেই আওয়াজ ভেসে এলো, টুকি!

সাধন ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকালো। কোথাও দেখতে পেল না।

কদম গাছের ওপরে ফুলের ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে পল্টু। রিনরিনে গলায় বলে উঠলো, টুকি! আমায় ধরতে পারে না! আমায় ধরতে পারে না! সাধনদাদা আমায় ধরতে পারে না!...

আগের দিন সন্ধেবেলাতেই একটু একটু সন্দেহ হয়েছিল, সকালবেলা উঠে দেখলুম, আমার কপালের ঠিক মাঝখানে একটা ব্রণ উঠেছে। সাদা, টুসটুসে, ব্যথা কি! আয়নায় দেখা গেল, অগ্নুনের শিখার মতন, কাছাকাছি হাত নিয়ে যেতে ভয় হয়। আমার একটু দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

হয় এরকম আমার মাঝে-মাঝে। গালে, থুতনিতে। সবচেয়ে বিরক্তিকর লাগে ঠোঁটের কোনায় হলে। সেই চোদ্দ-পনেরো বছর থেকে শুরু হয়েছে। বড় পিসীমা সে সময় বলতেন, ও কিছু না, ও কিছু না, বয়েস ফোড়া, সময়কালে সেরে যাবে। কি জানি বড় পিসীমা সময় বলতে কি বুঝিয়েছিলেন, সাতাশ বছর বয়েস হলো, এখনও আমার নিষ্কলঙ্ক মুখের সময় আসে নি? বড় পিসীমা যেদিন মারা যান, সেদিন দাড়ি কামাতে গিয়ে একটা ব্রণ কেটে ফেলায় কী রক্তই বেরিয়েছিল আমার, খুব মনে আছে।

ব্রণ আমার গা সহা হয়ে গেছে। সাদা হয়ে এলেই আমি দেশলাই জেবলে একটা সেফটি-পিন পুড়িয়ে প্যাট করে গেলে দিই। ভেতরের সাদা জিনিসটা টিপে বার করে দিলে চুপসে যায়, তখন আর অতটা চোখে পড়ে না। নইলে, মুখের ওপর পাকা ব্রণ থাকলে অনেকে ভালো করে আমার মুখের দিকে তাকাতে চায় না—কথা বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমি নিজে তো দেখেছি—অন্য কারুর মুখ ভর্তি ব্রণ দেখলে আমার গা বমি বমি করে, তাকাতে ইচ্ছে করে না।

কপালের ওপর ব্রণ, এতে একটা সুবিধে হয়েছে অবশ্য, দাড়ি কামাতে অসুবিধে হবে না, কেটে যাবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এ ব্রণ গেলে দেওয়াও যাবে না। কপালের ওপর ক্ষত তৈরি করতে নেই—এটা শুধু কুসংস্কার নয়—দারুণ সেপটিক হয়ে যেতে পারে। ইরিসিপ্লাস না এই ধরনের কি যেন একটা অসুখ আছে—অরুণেশ দাস মজুমদার বলে একটা ছেলে আমাদের সঙ্গে কলেজে পড়তো, তিনদিনের ছুটিতে মেদিনীপুরের দেশের বাড়িতে গেল—আর ফিরলো না, বৌদির সেলাইয়ের সুঁচ দিয়ে কপালের ব্রণ গেলেছিল। অরুণেশ হঠাৎ মরে গেল বলেই সেবার আমি ম্যাগাজিন এডিটর হতে পেরেছিলাম। যতই খারাপ দেখাক, কপালের ব্রণ আমি গালতে পারবো না। কিন্তু আজ গায়ত্রীর বুকে আমার কপাল সমেত মুখখানা একবার চেপে ধরবো ভেবেছিলাম।

গায়ত্রী ব্রণ দেখলে কখনো ঘেন্না করে না, অন্তত সে রকম কোনো ভাব কখনো দেখায় নি। বরং গায়ত্রী আমার জন্য নিতানতুন ওষুধ কিনে আনে। শাঁখের গুঁড়ো, হজমের ওষুধ, হরেক রকম মলম। গায়ত্রীর মসৃণ মুখের চামড়া, একটা দাগ নেই, কোনোদিন একটা ঘামাচিও হতে দেখিনি—তবু ব্রণের ওষুধ ও কার কাছ থেকে এবং কোন প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করে, আমি জানি না। বলেও না কখনো। গায়ত্রী ওর পাতলা স্বচ্ছ হাতখানি আমার মুখে বুলোতে বুলোতে কতদিন বলেছে, ছেলেমানুষ, তুমি এখনও একটা ছেলেমানুষ।

চন্দন কিংবা চুন কিংবা স্টিকিং প্লাস্টার লাগাবার কথা আমি ভাবতেই পারি না। তাহলে প্রথমেই চোখে পড়ে, চোখের সামনে ক্যাট ক্যাট করে। কপালের ঠিক মাঝখানে ঐ দৃশ্যমান কলঙ্ক নিয়ে রাস্তায় হাঁটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চোদ্দ বছর বয়স থেকে যার ব্রণ উঠছে, সেই লোকেরও আজ কপালের ওপর একটা মাত্র ব্রণ ওঠায় সত্যিকারের মন খারাপ হলো। আমি গোটা তিনেক দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। অন্তত আজকের দিনটায় ওটা না উঠলে হতো না! দেড় মাস পর আজ গায়ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে। হঠাৎ দেবনাথের কথা মনে পড়ায় আমার বেশ রাগ হলো। বন্ধুদের মধ্যে দেবনাথকেই সবচেয়ে সুন্দর বলা যায়। কোঁকড়ানো চুল, ধারালো নাক ও ঠোঁট, ঝকঝকে চামড়া, সব কিছুর সঙ্গে দামী কাঁচের গ্লাসের মিল আছে। ঐ রকম সুন্দর মুখ নিয়ে দেবনাথ খবরের কাগজের অফিসে যুদ্ধের ইংরেজি খবরের বাংলা অনুবাদ করছে। অন্তত আজ বিকেলে ঐ কাজের জন্য দেবনাথের অমন সুন্দর মুখের কোনো দরকার ছিল না। আমার ছিল।

চৌরঙ্গীর ওপর, লিন্ডসে স্ট্রীট ছাড়ালে বাইবেল সোসাইটির বাড়ি—যেখানে একটা

কাচের বাক্সের মধ্যে একটি বাইবেল খোলা অবস্থায় রাখা থাকে—প্রতিদিন কে বা কারা তার একটি করে পাতা উল্টে দেয়, সেই বাড়ির বারান্দার নিচে গায়ত্রী এসে দাঁড়াবে ঠিক ছ'টার সময়। আমি একটু আগেই বেরিয়েছিলাম। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই গায়ত্রী কোনোদিন আসে না, সুতরাং ওখানে আমাকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবেই—তাই বাসে ওঠার আগে আমি আর একটা সিগারেট ধরালাম। সেই আমার প্রথম ভুল। ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে যারা মরে, তাদের অনেকেরই বোধহয় আগের ট্রেনে যাবার কথা থাকে।

সিগারেটটা মুখে রেখে দেশলাই জেবলেছি, কে যেন ফু দিয়ে সেটা নিবিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখি কেউ না। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠেছে, পাক দিয়ে ঘুরছে ধুলো। চোখ আড়াল করলুম আমি ধুলো আটকাবার জন্য। বিকেলবেলা এরকম হাওয়া ওঠা ভালো নয়, বিকেলটা না নষ্ট করে দেয়। কিছুতেই সুযোগ হয় না, গায়ত্রী অনেক চেষ্টা করেও আসতে পারে না, লুকিয়ে দেখা করতে হয়। আজ দেড় মাস পরে, আমি গায়ত্রীকে সান্ত্বনা দেবো এবং সান্ত্বনা চাইবো। একটু পরেই চোখ খুলে দেখি, সেই ঘূর্ণি ঝড়টা উঠে গেছে শূন্যে, রাস্তা আবার আগের মতন শান্ত এবং রাস্তার উল্টো দিক থেকে আমারই জন্য একজন হেঁটে আসছে! সিগারেটটা ধরিয়েই আবার ফেলে দিতে হলো, কেননা, বাবার বন্ধু প্রতাপকাকা। প্রতাপকাকা বললেন, রাস্তার ওপার থেকে তোকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিলুম, তুই দেখতে পাস নি সন্তু?

আমি বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বললুম, না তো, আপনি আমাকে ডাকছিলেন?

—হ্যাঁ, তোদের বাড়িতে আমাকে যেতে হতো—ভালোই হলো তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তোর মা-কে বলিস .কপালের ওপর তোর ওটা কি হয়েছে? অতবড় ফোড়া?

—ফোড়া না, ব্রণ, এমন কিছু নয়—

—না, না কপালের ওপর ওরকম প্রকাণ্ড একটা, শোন, আঙুলে রুমাল পেঁচিয়ে তারপর টিপে দে এমনি করে—

—না, না, প্রতাপকাকা, বিষম ব্যথা—

—আচ্ছা শোন, তোর মাকে বলিস...

প্রতাপকাকা যতক্ষণ কথা বললেন, ততক্ষণে দুটো বাস চলে গেল বেশ ফাঁকা। তখন বুঝতে পারি নি—সেই দুটি বাসই আমার সমস্ত সৌভাগ্য নিঃশেষ করে নিয়ে যাচ্ছে। ঐ দুটোর যে-কোনো একটায় উঠলে—।

তৃতীয় বাসে বেশ ভিড়, কিন্তু না উঠে উপায় নেই—এরপর দেরি হয়ে যাবে। পা-দানিতে সিঁড়ির কাছে একজন পাঞ্জাবী গোয়ালা সিঁড়ির নিচে দুধের বালতিটা রেখে আমার পাশে। সম্রাটের মতন তার দাড়িময় মুখের সৌষ্ঠব। কিন্তু গায়ে খুব বদগন্ধ। দুটি মেয়ে নেমে যাবার আগে আমার দিকে বার বার ফিরে ফিরে তাকায়। বস্তুত ওরা আমার ব্রণের জন্যই তাকিয়েছিল, কিন্তু ওদের সেই চাহনিই আমাকে ব্রণের কথা ভোলাবার পক্ষে যথেষ্ট এবং আমাকে অমনোযোগী করে। কিছুক্ষণের জন্য গায়ত্রীর কথাও আমার মনে থাকে না। সেই অবসরকালে কণ্ডাক্টর টিকিট চাইতে এলে, আমার তো পয়সা হাতেই ছিল, অন্যমনস্ক হাত দেওয়া-নেওয়া সেরে নেয়, পাঞ্জাবী গোয়ালাটি কোমরের গেঁজের গিঁট খোলার চেষ্টা করে। হয়তো অসতর্ক মুহূর্তে আমি মুখ ঘুরিয়েছিলাম, কিংবা তার হাত পিছলে গিয়েছিল, অব্যর্থভাবে গোয়ালাটির কনুই আমার কপালে আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ প্রথমেই আমার মনে হলো আমি অন্ধ হয়ে গেছি—এমনই তীব্র যন্ত্রণা, এর থেকে বেশী শারীরিক যন্ত্রণা আমি কখনো পাই নি। অস্পষ্টভাবে কানে এলো, মাফ কিজিয়ে, নেই দেখা, বিলকুল খুন গিরতা। মনের মধ্যে বিদ্যুৎভাবে খেলে গেল গোয়ালার ময়লাসঙ্গী হাত, কতরকম বীজাণু, সেপটিক, ইরিসিপ্লাস, অরুণেশ দাস মজুমদার। কপালে রুমাল চেপে আমি বাস থেকে নেমে পড়লুম।

ব্যথা একটু কমতেই, চিন্তা স্বাভাবিক হয়ে আসে, মনে হয়, মৃত্যু অত সোজা নয়। এখন চাই একটা আয়না, কপালের ক্ষত কতখানি। সিগারেট কেনার জন্য এক টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে পানের দোকানের মহাভারতের ছবি আঁকা ক্যালেণ্ডারের পাশের ঝাপসা আয়নার সামনে আমার মুখ। একেবারে থেঁৎলে গেছে ব্রণটা, এখনও রক্ত বেরুচ্ছে। এক

একটা ব্রণ এই রকম অভিমানী—অসময়ে ফাটলে কিছুতেই রক্তস্রোত বন্ধ করতে চায় না। পানওয়ালা সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললো, বাবু ধূপকাঠি কিনবেন? আমার কাছে ভালো ধূপকাঠি আছে—

আমি ধরা গলায় বললুম, না, না—

—খুব ভালো গন্ধ। রিফ্যুজি মেয়েদের তৈরি করা, দু' প্যাকেট নিন, সাত আনায় হবে—

—না, না—

—গরীব মেয়েগুলো রোজগারের চেষ্টা করছে একটু সাহায্য করুন—

আমি কাতরভাবে তাকে জানালুম, না ভাই, আমি ধূপকাঠি নেব না। এখানে ডাক্তারখানা কোথায় বলতে পার?

—ও কিছু না, একটু চুন লাগিয়ে নিন—

—না, চুন লাগাবো না—ডাক্তারখানা—

লোকটি নির্লিপ্তের মতন জানালো, কি জানি, ডাক্তারখানা কোথায়।

কী নিষ্ঠুর লোকটা! এই কি আমার ধূপকাঠি কেনার সময়? আমি ধূপকাঠি কিনি নি বলে আমাকে ও ডাক্তারখানা দেখাবে না। রাস্তাটার দু'ধারে, শুধু পোশাক আর মনোহারী জিনিসের দোকানই চোখে পড়ে। কিন্তু ডাক্তারখানা বা ওষুধের দোকান একটা কোথাও থাকবেই লুকিয়ে।

কাপড়ের দোকানের সিঁড়িতে এক ধাপ উঠে এতক্ষণে আমার গায়ত্রীর কথা আবার মনে পড়ে। গায়ত্রী দাঁড়িয়ে থাকবে। সুতরাং গলায় সোনার চেন-পরা মলমলের পাঞ্জাবি গায়ে লোকটিকে ডাক্তারের কথা জিজ্ঞেস করার আগে আমি প্রশ্ন করলাম, এখন ক'টা বাজে?

লোকটি আঁৎকে উঠে বললো, এ কি, আপনার সারা মুখে রক্ত! মাথা ফেটে গেছে বুঝি? ওরকম রুমাল চেপে দাঁড়িয়ে আছেন? হাসপাতালে যান—ট্যাক্সী ডেকে দেবো?

অবিচলিতভাবে পুনরায় আমার প্রশ্ন, এখন ক'টা বাজে?

এমারজেন্সি সব সময় খোলা। কি করে ফাটলো?

—ক'টা বাজে আগে বলুন!

—সাড়ে পাঁচটা।

—আপনার ঘড়ি ঠিক আছে? স্লো নয় তো?

লোকটি গলা ছেড়ে কাকে ডাকলো, হেরম্ব, এদিকে এসো তো একবার—বাণ্ডিলটা নামিয়ে রেখে এসো!

এখনও সময় আছে। ব্যথার জন্য মনে হয়েছিল অনেক সময় কেটে গেছে। বললুম, আমার বিশেষ কিছু হয় নি, একটা ফোড়া ফেটে. এখানে ওষুধের দোকান কি ; ডাক্তারখানা আছে?

—বাঁদিকে চলে যান, পাঁচ সাতখানা বাড়ি পরে একজন ডাক্তার থাকেন। এঃ হে, মেঝেতে রক্ত পড়লো, হেরম্ব, জল নিয়ে এসো—বললুম না—বাণ্ডিলটা নামিয়ে রেখে এক্ষুনি একবার এদিকে এসো—

কপাল থেকে রুমালটা সরাতেই রক্ত আবার গলগল করে বেরুতে চায়। পুনরায় রুমাল চাপা। কাপড়ের দোকানের মেঝেতে পাতা দু ফোঁটা রক্ত। যাক্ ছটা বাজতে এখনো দেরি।

পাঁচখানাও না, সাতখানাও না, আমি গুনতে গুনতে আসছিলাম, ঠিক একুশখানা বাড়ির পর এক বাড়িতে ডাক্তারের নেম প্লেট। বেল টিপতেই আর্দালি। আসুন ভেতরে। এখানে একটু বসুন। আমার খুব তাড়াতাড়ি আছে। আর্দালি সুইং দরজা ঠেলে অপর কক্ষে ঢুকে গেল, তখুনি বেরিয়ে এসে বললো, আসুন।

টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে ডাক্তারটি কোনো বই পড়ছিলেন। চোখ তুলে আমাকে

দেখেই বললেন, কি? স্ট্যাবিং?

আমি বিনীতভাবে বললুম, না, হঠাৎ একটা ব্রণ ফেটে গেছে—

বিনীত, কেননা, এর আগের মুহূর্তেও ডাক্তারের ফি'র কথা মনে পড়ে নি। আমার দরকার শুধু অ্যান্টিসেপটিক মলম—কিন্তু এই ডাক্তারের সময় নষ্ট করার জন্য যদি। কত? আট, ষোলো, বত্রিশ? পকেটে তিন টাকা। ঘরখানায় আলো খুব জোরালো নয়, এত বেশী চামড়া বাঁধানো বই যে ডাক্তারের বদলে উকিলের ঘর বলে ভুল হয়। আরও চোখে পড়ে, তিনদিকের দেয়ালে প্রায় পনেরো-ষোলোটা টিকটিকি, বেশ কেঁদো সাইজের।

ডাক্তার এবার বেশ ধীরে সুস্থে তিনটে ড্রয়ার খুঁজে একটা মলমের টিউব বার করলেন। সেটা হাতে রেখেই একটা আলমারি খুললেন। আলমারি ভর্তি থাকে থাকে সাজানো কাঁচের স্লাইড। অন্তত হাজার দুয়েক। তার থেকে একটা স্লাইড নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলেন। আমি তখনও দাঁড়িয়ে। কাছে আসার পর আমার মনে হলো, এই ডাক্তারকে আমি আগে কোথাও দেখেছি? মনে নেই। হুকুমের সুরে তিনি বললেন, রুমাল সরান। সরে গেল। কাঁচের স্লাইডে তিনি আমার কপাল থেকে এক ফোঁটা রক্ত নিলেন। তারপর রক্তটার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন। যেন ওঁর খুব দুঃখ। এইভাবে মানুষ কখনো কখনো প্রথম দেখা নদীর দিকে তাকায়। ডাক্তারের হাতের কব্জীর ঘড়িতে দেখে নিলাম—পাঁচটা চল্লিশ, আর বেশী সময় নেই। বাসে এখান থেকে পনেরো মিনিট লাগবেই মেরে কেটে। আমি অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম। খালি চোখে রক্তে অবার কে কি দেখতে পায়। ভড়ং। ফি-তো দিচ্ছি না! এই ডাক্তারকে আগে কোথায় দেখেছি? ডাক্তার এবার মুখ ফিরিয়ে আবার হুকুম, আঙুল দেখি!

আঙুলগুলো ছড়িয়ে হাতের পাঞ্জাটা এগিয়ে দিলাম। ডাক্তার টিউব টিপে একটু-খানি মলম আমার তর্জনীতে লাগিয়ে ডান দিকের একটা হেলানো চেয়ার দেখিয়ে বললেন, যান, ঐখানে ব'সে কপালে মলমটা লাগান।

চেয়ারে বসার কোনো ইচ্ছেই নেই আমার; সময় নেই, অতএব, আরও বিনীত বিগলিত হাস্যময় মুখ, না, আমি আর বসবো না, আমাকে এক্ষুনি একটা কাজে যেতে হবে। অনেক ধন্যবাদ, মানে একটাও ওষুধের দোকান নেই কাছাকাছি, তাই আপনাকে বিরক্ত করতে হলো, মলমটা—

—বসুন ঐ চেয়ারে!

অবাক। হুকুম? কেন, কি এমন ব্যাপার হয়েছে? ভারী তো একটু মলম, এ ডাক্তারের কাছে তেমন পেসেন্টও তো আসে না। রথীনের মামার চেম্বারে দেখেছি সব সময় কানা খোঁড়ায় গিজগিজ করে। বসলুম না, দাঁড়িয়েই রইলুম। ডাক্তার চলে গেছেন টেবিলের ডান পাশে, মাইক্রোস্কোপের ওপরে ডাক্তারের মনোযোগী চোখ। চোখ না তুললে কথা বলতে পারছি না। এবারের কথাটা ডাক্তারের চোখের দিকে চোখ রেখে নির্ভীকভাবে বলতে হবে। উপকার করেছেন ঠিকই কিন্তু এমন কিছু নয়, যার জন্যে আপনার হুকুম শুনতে হবে! এর জন্য ফি আশা করাও আপনার অন্যায়।

নাকের কাছটা হঠাৎ ভিজে ভিজে লাগলো। একটা ফোঁটা টলটল করছে। হঠাৎ সর্দি হয়ে গেল? ছিটেফোঁটাও তো ছিল না সকালে? আঙুল ছোঁয়ালুম। আঙুলের ডগা রক্ত মেখে ফিরে এলো। এখনও রক্ত। এবারে আঙুল গেল কপালে, খুব সাবধানে ছুঁল। ভিজে ভিজে। মলম লাগিয়েও রক্তবন্ধ হয় নি। রুমালটায় ছাপ ছাপ রক্ত। আমার হাতে। তাহলে নিশ্চিত মুখেও। ভালো করে না ধুয়ে তো যাওয়া যাবে না। এক একটা ব্রণ এরকম তেরিয়া ধরনের হয়, কপালের ব্রণ তো কোনো নিয়মই মানে না। অনেক ডাক্তারের ঘরে হাত ধোওয়ার জন্য বেসিন থাকে। এঁর নেই। আয়নাও নেই। এই প্রথম আমার মন খারাপ লাগলো। গায়ত্রীর কাছে এরকম রক্তমাখা হাত আর মুখ নিয়ে কুৎসিতভাবে কি করে যাবো? আর কপালের রক্তপাত বন্ধ করতেই হবে।

ডাক্তার মাইক্রোস্কোপে তন্ময়। আমি ক্রমশ অধৈর্য। মলমের টিউবটা কোথায় গেল? আমি একটু জোরে বললুম, মলমটা আর একটু দেবেন? আমার রক্ত বন্ধ হয় নি। মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ উঠল না, উত্তর এলো, বেশী মলম লাগালে বেশী কাজ হয়

কে বলেছে?

—কিন্তু আমার রক্ত পড়া তো বন্ধ করতে হবে।

—বললাম তো, ঐ চেয়ারটায় বসুন!

ঘরের ভেতর দিকে আর একটা দরজা আছে, আগে লক্ষ্য করিনি। খোলার পর চোখে পড়লো। খোলা দরজায় একটি মেয়ের শরীরের এক অংশ দাঁড়ালো। মুখ ঝুঁকলো ঘরের মধ্যে. কোঁকড়া চুল, চিবুক দেখলে উনিশ বছরের বেশী মনে হয় না, ভারী চমৎকার দাঁত, সেই দাঁতের ঝিলিক প্রশ্ন, বাবা, তুমি এখন চা খাবে?

—না।

—খাবার তৈরী হয়ে গেছে।

—এখন না একটু পরে।

মেয়েটিকে দেখেই আমি মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। রক্ত মেখে আমার কপালের চেহারাটা এখন কি রকম হয়ে আছে কে জানে। কিন্তু মেয়েটি ঘরের দ্বিতীয় প্রাণীর উপস্থিতি ভ্রূক্ষেপই করলে না, সম্পূর্ণ শরীরটা নিয়ে ঘরে এলো. দোহারা চেহারা, তুঁতে রঙের শাড়ি, আমি আড়চোখে দেখছি, সে টেবিল থেকে দুটো আলপিন তুলে নিয়ে আবার পিছনের দরজা দিয়ে চলে গেল।

ডাক্তার চোখ তুলে সাড়ম্বরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মুখখানা কিন্তু সত্যি-কারের বিষাদময়। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, জানতুম! আমি আগেই জানতুম।

আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলো। এতক্ষণ ধরে আমার রক্তে কি দেখছিলেন! কি হয়েছে আমার? রক্ত পড়া থামছে না কেন? নাঃ, এসব বাজে ভয়। 'জানতুম'। কি জানতেন? দরকার নেই জেনে। মলমটা বিনা পয়সায় হলেও রক্ত পরীক্ষার জন্য ফি দিতেই হয়।

—দেখুন, আমার রক্তটা বন্ধ হচ্ছে না। দয়া করে এর একটা ব্যবস্থা করবেন?

—ঐ রক্ত শরীরে থেকেই বা লাভ কি? যতটা বেরিয়ে যায় যাক।

—তার মানে? আমি রাস্তা দিয়ে এভাবে যাবো কি করে?

—যেতে হবে না। সেইজন্যই তো ঐ চেয়ারে বসতে বললুম।

—আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে যে।

—কোথায় যাবেন?

অচেনা লোককে কেউ এ প্রশ্ন করে না। ডাক্তারটা আসল তো? নাকি কোনো পাগল? একটা ব্রণ ফাটার রক্তও তো বন্ধ করতে পারে না। জলের ঝাপটা দিতে পারলে বরং।

—আমার রক্তে কি দেখলেন?

—আমার এই ক্যাবিনেটে সাড়ে সাতশো রক্তের স্লাইড আছে। ওর সব কটাতে যা দেখেছি, আপনারটাও তাই। দূষিত পচা রক্ত।

—অসম্ভব, আমার কোনো অসুখ নেই।

—আসল অসুখটাই বাধিয়ে বসে আছেন। ঐ সাড়ে সাতশো—প্রত্যেকেরই বয়েস তিরিশের নীচে—সকলেরই এক রোগ।

অস্বীকার করতে পারবো না, ভয়ে বুকটা ছমছম করছে। অজান্তে কোনো মারাত্মক অসুখ শরীরে দানা বেঁধেছে? কখনো তো টের পাই নি। হঠাৎ একদিন মূল ধরে নাড়া দেবে? মরে যাবো? মৃত্যুর কথা ভাবলে বুক মোচড়ায়। না, মরতে চাই না। একটুও মরতে ইচ্ছে হয় না!

পূর্ব নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে আমার শরীর। মুখ প্রশ্ন করে, কি অসুখ।

—এক্ষুণি যেতে হবে বলছিলেন যে?

—অসুখটা কি বলুন। পরে এসে আপনার কাছে চিকিৎসার ব্যাপার...

—কি নাম?

—ঈশ্বর দাশগুপ্ত।

—বয়েস?

—সাতাশ।

—অসুখটার নাম কাপুরুষতা।

ডাক্তারের ঠিক দু'চোখের ওপর আমার দু'চোখ। দেখছি। দেখা হয়ে গেল। লোকটা নিশ্চয় বাতিকগ্রস্ত। কিংবা আদর্শবাদী-টাদী কিছু একটা হবে। গুরুত্ব দেবার দরকার নেই। উঠে দাঁড়িয়ে সামান্য হেসে বললুম, আচ্ছা চলি। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়লো, রক্তটা ধুতে হবে। কপালে, নাকে, হাতে। এইরকমভাবে রাস্তায়—। ডাক্তারও উঠে দাঁড়িয়েছেন, প্রায় হুংকারের মত বললেন, অস্বীকার করতে পারবেন, কাপুরুষতার কথা! আমার বয়েস সাতচল্লিশ, আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার সাহস আছে?

পাঞ্জা লড়ার ভঙ্গিতে নিজের কব্জি মুচড়ে দিলেন তিনি, ঘড়িটা একেবারে আমার চোখের সামনে। ছটা বাজতে পাঁচ। আঃ, কেন তিনটে বাস ছেড়েছিলাম। কেন প্রতাপ-কাকা। কেন গয়লাটার কনুই। এখনও ট্যাক্সী নিতে পারলে—। চঞ্চল হয়ে বললুম, দেখুন, আজ আমায় এক্ষুণি যেতে হবে, পরে আর একদিন এসে আপনার সঙ্গে কথা বলবো। এখন একটু যদি—

—এক হাত পাঞ্জা লড়ারও সাহস নেই?

—আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। যদি একটু—

—কতক্ষণ আর লাগবে? এক মিনিট—

—কিছুতেই আর পারবো না! যদি একটু জল—

—কোথায় যেতে হবে?

—একটি মেয়ে ছটার সময় দাঁড়িয়ে থাকবে, ভীষণ দেরি হয়ে গেছে কিন্তু রক্ত বন্ধ হলো না।

—মেয়েটির সঙ্গে কতদিনের পরিচয়?

পিছনের দরজা ঠেলে আবার সেই মেয়েটি। সেই তুঁতে রঙা শাড়ি, দোহারা উনিশ। এবারও ঘরের তৃতীয় ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করা গলায়, বাবা, তোমাকে মা ডাকছে—

—এখন না, একটু পরে—

—খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে!

এবার মেয়েটি আমার দিকে ফিরে, আপনি একটু বসুন, বাবা এক্ষুণি ঘুরে আসছেন। হঠাৎ আশা পেয়ে আমি মেয়েটিকে অনুনয় করি, দেখুন, আপনার বাবার সঙ্গে আমার আর কোনো দরকার নেই, আপনাদের এখানে কাছাকাছি কোনো বাথরুম আছে? আমি একটু মুখটা ধুতাম—

ডাক্তার চেঁচিয়ে বললেন, তার আগে একটা কথার উত্তর দিন। মেয়েটির সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?

—আট ন বছর।

—নিশ্চয়ই মেয়েটি বিবাহিতা?

—না, না,

—আবার মিথ্যে কথা? কাপুরুষ, কাপুরুষ! চোখের পাতা ফেলা দেখে বুঝতে পারছি মিথ্যে কথা।

আমি মেয়েটিকে সনির্বন্ধ অনুরোধে, বাথরুমটা যদি দেখিয়ে দেন।

—একতলার বাথরুম তো বন্ধ। পিসীমা গেছেন। দোতলার আসুন—

—না, না, থাক, দোতলায় না। যদি একটু জল।

—শুধু জল চাই? বাইরে তো বৃষ্টি পড়ছে, তাতে ধুয়ে নিন না—

—বৃষ্টি পড়ছে?

—খুব জোরে। বেরুলেই ভিজে যাবেন—

—তা হোক, আমি চলি। অনেক ধন্যবাদ।

ডাক্তার তাঁর মেয়েকে বললেন, রিস্টু, ঐ লোকটার অসুখ কোনো দিন সারবে না।

আমি আর ডাক্তারের কথায় বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বেরিয়ে এলাম সুইং ডোর ঠেলে। বসবার ঘর পেরিয়ে; বাইরে সত্যিই বৃষ্টি।

কিছুক্ষণ আগে যে ঘূর্ণি হাওয়া উঠেছিল, তারই অনুসরণকারী এই বৃষ্টি। বেশ

ঝেঁপে এসেছে। আমি ভিজতে ভিজতে রাস্তার মাঝখানে। দু'হাত পেতে জল নিয়ে হাত দুটো রগড়ে নিলাম। আকাশের দিকে মুখ রাখতেই কিছুক্ষণ সচ্ছলভাবে জলবর্ষণ হলো, ব্রণ-থ্যাৎলানো জায়গাটা জ্বালা ক'রে উঠলো। একটা ট্যাক্সির জন্য আমার মনপ্রাণ আকুল।

অফিস ছুটির পর যে রাস্তাঘাট মানুষে ছেয়ে যায়, সেসব মানুষ এখন কোথায়? খাঁখাঁ করছে চৌরঙ্গি। জলে ভেজা রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া গাড়ির চিটচিটে শব্দ। অন্য দু একটা গাড়িবারান্দার নিচে কিছু লোক জমে আছে, কিন্তু বাইবেল সোসাইটির বাড়ির বারান্দার নিচেটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। কেউ নেই। সাড়ে ছটা বাজে। গায়ত্রী এসে চলে গেছে? এই বৃষ্টির মধ্যে গেল কি করে? বুকের মধ্যে একটা বিষম উত্তেজনা। কোনোদিন গায়ত্রীর বাড়িতে গিয়ে দেখা করিনি। কিন্তু আজ গায়ত্রীর সংগে আমার দেখা করতেই হবে। ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে নিতে বললাম।

ট্যাক্সি স্টার্ট নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম ফুটপাথের ধার ঘেঁষে গায়ত্রী হাঁটছে। বসন্তকালের আকস্মিক বৃষ্টি, কেউ ছাতা বা বর্ষাতি নিয়ে বেরোয় নি, সুতরাং পথে লোক নেই। গায়ত্রী একা হাঁটছে ভিজতে ভিজতে—মিউজিয়ামের পাশের প্রশস্ত ফুটপাথে। মন্থর, অভিমানী তার পদক্ষেপ। কষ্ট হলো, গায়ত্রী আমাকে ভুল ভেবেছে। বৃষ্টির ভয়ে আমি আসিনি! তাই ও ইচ্ছে করে বৃষ্টিতে ভিজছে। ট্যাক্সিওলা, রোখকে! গায়ত্রী!

দরজা খুলে আমি অতি ব্যস্ততায় নেমে পড়েছি। এবার সে ঘুরে তাকালো। গায়ত্রী নয়। লম্বাটে ধরনের মুখ, অতিরিক্ত ফর্সা. কিন্তু সেই মুখ, বিষণ্ণ ছিল। অন্য মেয়ে. কিন্তু একটু একটু চেনা মনে হলো। ডাক্তারটিকেও একটু চেনা মনে হয়েছিল, কোথাও যেন আগে দেখেছি, কিন্তু মনে করতে পারিনি। এরও নাম মনে এলো না। কিন্তু মেয়েটি আমাকে চিনতে পেরে বললো, সনৎবাবু? আপনি কোনদিকে যাচ্ছেন? আমাকে একটু বেকবাগানের মোড়ে পৌঁছে দেবেন? একটাও ট্যাক্সি পাচ্ছি না—সাড়ে ছ'টার মধ্যে পৌঁছবার কথা।

আমি খিদিরপুরের জন্য রওনা হয়েছিলাম, বেকবাগান অন্যদিকে. কিন্তু না বলা যায় না। আসুন। সঙ্কুচিতভাবে আমি সরে বসলাম। মেয়েটি হাতব্যাগের মধ্য থেকে শুকনো রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে—ভাগ্যিস আপনার সংগে দেখা হলো। সাড়ে ছ'টা এখানেই বেজে গেছে!

আমার একমাত্র সৌভাগ্য, আমি একটা ট্যাক্সি অধিকার করতে পেরেছি—মেয়েটিকে তার ভাগ দিতে হবে। কিন্তু কে এই মেয়েটি? বেকবাগানের দিকে দ্রুত ধাবমান ট্যাক্সির দশ মিনিটের মধ্যে মেয়েটির কাছ থেকে—আমার যে ওর নাম মনে নেই সে কথা বুঝতে না দিয়ে, ওর নাম কি করে জানা যায়? জিজ্ঞেস করি, গায়ত্রীর সংগে আপনার দু'-চারদিনের মধ্যে দেখা হয়েছিল?

—কে গায়ত্রী?

—গায়ত্রীকে চেনেন না? গায়ত্রী সান্যাল?

—না তো!

—আপনি আমাকে চিনলেন কি করে?

—ও মা, আপনি বুঝি আমায় চিনতে পারেন নি?

—না।

—তাহলে একটা অচেনা মেয়েকে ট্যাক্সিতে তুললেন কেন?

—আপনি তো আমার নাম ধরে ডাকলেন।

—শুধু সেইজন্যই? আপনি কোনদিকে যাচ্ছিলেন?

—খিদিরপুর।

—তাহলে বেকবাগানে যাচ্ছেন কেন?

—তাতে কি হয়েছে, আপনাকে পেঁছে দিচ্ছি।

—না, আমি যাবো না, আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন।

—আরে না, না, তা কি হয়! চলুন না, বেকবাগান আর কতদূরে।

—না, আমি কিছুতেই যাবো না। আপনি আমার নাম জানেন না?

—আপনি কি করে জানলেন যে আমার নাম সনৎ?

—সেটা আপনার দেখার দরকার নেই। ট্যাক্সি এখানে বেঁধে দিন!

—আরে একি করছেন! চলুন না, এইটুকু তো পেঁছে দেওয়া!

মেয়েটি দরজা খুলতে গেলে, আমি হাত বাড়িয়ে তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করি। মেয়েটি হিংস্রভাবে মুখ ঘুরিয়ে, আপনি আমার গায়ে হাত দিচ্ছেন যে? লজ্জা করে না? একটা অচেনা মেয়ের...

—আরে ছি ছি,, তা নয়। আমি আপনাকে পেঁছে দিতে চাইছিলাম।

—একটা অচেনা মেয়েকে পেঁছে দেওয়ার অত গরজ কিসের আপনার?

—অচেনা কোথায়? আপনি তো আমাকে চেনেন।

—দু'জনে দু'জনকে না চিনলে চেনা হয় না। আপনি হাত সরান আমি নেমে যাব। আমাকে অপমান করতে চাইছেন আপনি।

আমার হাসিও পাচ্ছিল. আবার বুকের মধ্যে একটু কান্না কান্না ভাব। এই এক ধরনের অভিমান। ধৈর্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটিকে আমি নেমে যেতে দিলাম। নেমে গিয়ে মেয়েটি ব্যাগ খুলে একটা টাকা বার করে আমার দিকে এগিয়ে দেয়। কথা বলতে গেলেই কথা বাড়বে। মেয়েটি তিক্ত গলায় বললো. এই নিন. এই রাস্তটুকুর ভাড়া। আমি হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে ড্রাইভারকে বললাম, চালিয়ে। মেয়েটি এবার একটু হাসলো, বললো, আপনার কপালে কেটে গেছে বোধ হয়। রক্ত পড়ছে। মুছে ফেলুন।

দূর থেকে দেখেছি, এ বাড়িতে কোনোদিন ঢুকিনি। দরজা ধাক্কা দিতে সুব্রতদা নিজেই খুললেন। আমাকে দেখে মুখে চোখে হাসি, বললেন, আরে সন্তু, কি ব্যাপার, এসো, এসো, এসো, ভাবতেই পারিনি—কতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা। ইস্, একেবারে ভিজে গেছ যে—তোয়ালে দিচ্ছি, মুখটুখ মুছে নাও!

সাদা তোয়ালের মাঝে মাঝে লাল ছাপ পড়তে লাগলো। ইস্, কি বিরক্তিকর! সুব্রতদা কোনো ভণিতা করলেন না, পলকের ছোঁয়া লাগা মুখেই বললেন, গায়ত্রীর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছো তো? কিন্তু, সে কি আর তোমার সঙ্গে আজ দেখা করবে? যা রাগ করে বসে আছে সারাদিন!

—কেন রাগ করেছে কেন?

—কি জানি! সন্ধেবেলা বেরুবে বলেছিল, আমি এত বললুম, কিছুতেই আর বেরুলো না। সকালবেলা খুব একচোট ঝগড়া হয়ে গেছে তো!

—কি নিয়ে ঝগড়া?

সুব্রতদা সস্নেহে আমার কাঁধে দু'হাত। বললেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি নিয়ে ঝগড়া হয়, তা কি জিজ্ঞেস করতে আছে ভাই?

—সুব্রতদা, আপনি ওকে আবার মেরেছেন?

—ছিঃ ওসব কথা জিজ্ঞেস করে না।

কাঁধ থেকে সুব্রতদার হাত সরিয়ে আমি একটু দূরে দাঁড়ালাম। চোয়াল কঠিন। বললাম, সুব্রতদা, আপনি জঘন্যভাবে অসভ্যের মতন গায়ত্রীর ওপর অত্যাচার করেন, আমি সব জানি। এর একটা শেষ হওয়া দরকার।

—সব শেষ হয়ে গেছে। আর কিছু হবে না।

—তার মানে?

—গায়ত্রী আর কখনো তোমার সঙ্গে দেখা করবে না, আমাকে কথা দিয়েছে।

—আমার সঙ্গে দেখা করাটা কোনো ব্যাপার নয়। বিয়ের পর দেড় বছর আমরা

একদিনও দেখা করিনি। কিন্তু আপনি পশুর মতন...সুব্রতদা, আপনি গায়ত্রীকে জোর করে বিয়ে করেছিলেন কেন?

—নিজে কষ্ট পাবার জন্য। এই ছ' বছরে আমার জীবনটা তো জ্বলে পুড়ে গেল!

—গায়ত্রী আপনার সঙ্গে গোড়ার দিকে অনেক মানিয়ে চলার চেষ্টা করেছে। গায়ত্রীর মত ভালো মেয়ে—

সুব্রতদা পরম আহ্লাদ পেয়ে হাসার মতন মুখ করে বললেন, কিন্তু তার যে একটা উকিল ছিল তোমার মতন—

—আমি কি করেছি?

—তুমি আর কি করবে? তুমি কিছুই করোনি, তোমার কিছু করার সাধ্যও নেই, তুমি শুধু শখের প্রেমিক সেজে থেকেছো। গায়ত্রীর মাথাটা তাতেই বিগড়েছে।

—সুব্রতদা, আমি গায়ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করতে যাবো ওপরে।

—খুব ভালো কথা। তার আগে একটা কথা শুনবে ভাই? মাথা ঠাণ্ডা করে শোনো। গায়ত্রীর সঙ্গে আমার মিটমাট হয়ে গেছে। সে আর আমার অবাধ্য হবে না। তুমি আর মাঝখান থেকে উৎপাত করতে এসো না। ডাক্তার এসে বলে গেছেন, গায়ত্রীর বাচ্চা হবে। চারমাস চলছে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াই। এইজন্যই সুব্রতদার সারা শরীর ভরা খুশী। পুনশ্চ আমার কাঁধে বন্ধুর মতন সুব্রতদার হাত। ফিসফিস করে বললেন, বিয়ে তো করোনি, এসব বুঝবে না। আমি বরাবরই গায়ত্রীকে বলেছিলুম, আমার দিক থেকে কোনো দোষ নেই, ডাক্তার বলছেন—

—আপনি সত্যি বলছেন?

এ প্রশ্নটা বলার জন্যই বলা। সুব্রতদার চোখ ঝিকঝিকে, লম্পট পাষণ্ডটা আমার দিকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতন তাকিয়ে বললো, এ-সব কথা কেউ মিথ্যে বলে? একটা সিগারেট দাও তো। আছে?

দোতলা বাড়িটার কোথাও কোনো শব্দ নেই। চাকর-টাকরও কারুকে দেখা যাচ্ছে না। সুব্রতদার কানের কাছে একটুখানি সাবানের ফেনা। এইমাত্র দাড়ি কামিয়েছেন।

—নেই, সিগারেট নেই।

—যাকগে, তুমি তাহলে ওপরে যাবে গায়ত্রীর কাছে? ভেবে দ্যাখো, সে এখন মা হতে যাচ্ছে—এখন কি আর তোমাদের ওসব ছেলেমানুষী মানায়?

—শুধু একবার দেখা করবো—

চলো। সুব্রতদা আমার হাত ধরে সিঁড়ির কাছে এলেন। দুধাপ উঠে আবার থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, কি বলবে ওকে?

—জানি না।

—আর কোনোদিন আসবে না বলো?

—ও যদি না চায়, ও যদি বারণ করে...

—ও কি বোঝে? তোমাতে আমাতে কথা হচ্ছে—পুরুষমানুষের ব্যাপার, মেয়েরা এসবের কি বোঝে?

—সুব্রতদা, আমাকে একবার ওপরে যেতে দিন!

আরও কয়েক ধাপ উঠে সুব্রতদা আবার দাঁড়ালেন। কি যেন উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করলেন। মুখটা একটু বদলে গেল। খরগোশের মতন চোখ। তারপর আবার হাসলেন—ও কিছু না! সন্তু, একটা কথা সত্যি করে বলো তো? তুমি কোনোদিন গায়ত্রীর সঙ্গে,

—ছাড়ুন ছাড়ুন আমাকে। ঠেসে ধরছেন কেন?

—সন্তু, তোমাকে যদি এই সিঁড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দিই?

—কেন আমি কি করেছি?

—তুমি কিছু করোনি। সেইটাই তো তোমার দোষ। তুমি একটি ন্যাকা-

—আমার কাঁধ ছাড়ুন! ভালো হবে না বলছি!

ইয়ার্কি করছি, তাও বোঝো না? তোমার কপালে রক্ত কেন? ব্রণ ফাটিয়েছো তুমি? দেখি, দেখি,—

—খবরদার, আপনি আমার কপালে হাত দেবেন না। না, বলছি—

—হাত দেবো কেন? রক্ত ছুঁতে আমার ঘেন্না করে! দেখছিলাম—

নিচের দরজায় শব্দ হলো। সুব্রতদা আবার উৎকীর্ণ, সারা বাড়ির স্তব্ধতা ফাটিয়ে বিরাট গলায় চিৎকার করে উঠলেন, কে? কে? দরজায় আবার শব্দ। আমাকে ছেড়ে বিদ্যুতের গতি, সুব্রতদা লাফিয়ে সিঁড়ি থেকে নেমে ছুটলেন। পিছনে পিছনে আমিও। দরজার সামনে গায়ত্রী দাঁড়িয়ে। সর্বাঙ্গ ভিজে, নতমুখ, চুল থেকে টপটপ করে জল গড়াচ্ছে। সিঁথির সিঁদুর গলে একটুখানি গড়িয়ে এসেছে নিচে। অনেকটা আমারই মতন রক্তাক্ত কপালের দৃশ্য। দরজায় হাত রেখে গায়ত্রী স্থির চোখে দেখলো দু'জনকে। আমার চোখে চোখ রাখলো না। শরীরটা কাঁপছে ওর। আমি গায়ত্রীকে ডাকতে ভয় পেলাম। একদম মরতে ইচ্ছে করে না আমার। আমার খুব বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

পৃথিবীতে যত বিষ, গলায় সব মিশিয়ে সুব্রতদা দাঁতে দাঁত চেপে চেপে বললেন, তুমি আবার ফিরে এসেছো? লজ্জা করে না? গায়ত্রী আমার দিকে তাকালো না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, কাঁদতেই লাগলো, আমি ঠায় দাঁড়িয়ে—গায়ত্রীর দিকে আমার দু-চোখ। গায়ত্রী চোখ মুছলো, আমাকে দেখলো না, সুব্রতদার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললো, আমাকে ক্ষমা করো, না ফিরে আমার উপায় নেই, আমাকে ক্ষমা করো।

মনের অসুখ

এত রাত হবার কথা ছিল না, পর পর দুটো লেভেল ক্রশিং-এই অনেক দেরি হয়ে গেল। পেছনের বাঁদিকের চাকাটা ফ্ল্যাট হয়ে গিয়েছিল ধানবাদের কাছে, দেবকুমার নিজেই জ্যাক নামিয়ে চাকা বদলে ফেলেছেন। এখন একটু একটু ভয় হচ্ছে, আবার আর একটা চাকা যদি খারাপ হয়ে যায়—সেটা বদলাবার তো কোনো উপায় নেই। অবশ্য, এক রাত্তিরে দুটো চাকা খারাপ হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই কম।

সাড়ে বারোটার মধ্যে দুর্গাপুর পৌঁছে যেতে পারবেন, দেবকুমার ভাবলেন। সাড়ে দশটা-এগারোটার মধ্যে পৌঁছোনোর কথা ছিল। বাড়িতে ওরা একটু ভাববে। নীপার বুকের ব্যথাটা আজ আবার একটু বেড়েছে, তার ওপর উদ্বেগ হলে আরও বাড়তে পারে। অবশ্য নীপার এতক্ষণ জেগে থাকার কথা নয়, তার ওষুধের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ব্রোমাইড মেশানো থাকে—দশটা বাজতে না বাজতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু যদি ওষুধ খেতে ভুলে যায় নীপা? দেবকুমারই তাকে প্রত্যেকবার মনে করিয়ে দেন, দুপুরে ফ্যাক্টরি থেকে টেলিফোন করেন, খাবার পরের ওষুধটা খেয়েছো? যাও, আমি টেলিফোন ধরে আছি, ওষুধ খেয়ে এসে আমাকে বলবে। না, কোনো কথা নয়, আগে ওষুধটা খেয়ে এসো—

বুক ধড়ফড়ানি খুব শক্ত অসুখ নয়। অন্তত ডজনখানেক ডাক্তার বলেছে, নীপার হার্টের অবস্থা মোটেই তেমন খারাপ নয়। দু মাস আগেও কার্ডিওগ্রাম করানো হয়েছে। আর নীপার বয়েসও তো মাত্র সাঁইত্রিশ। অসুখটা নীপার শরীরের নয়, মনের—এই মন মানে হৃৎপিণ্ড নয়। বুক ধড়ফড় করতে করতে এমন কষ্ট পায় নীপা যে গোটা বিছানায় ছটফট করে, অনেক সময় অজ্ঞান হয়ে যায় পর্যন্ত। অর্থাৎ কষ্ট পায় শরীর। নীপার মনেও তো কষ্ট থাকার কোনো কথা নয়। কেউ কেউ বলেছেন, পেটে খুব বেশী উইন্ড হলে বুকে এমন ধাক্কা মারে। কিন্তু এ কি ধরনের বুনো হাওয়া?

দেরি হবার কথা ছিল না দেবকুমারের। সাড়ে সাতটার মধ্যেও বেরুতে পারলে এতক্ষণ দুর্গাপুরে পৌঁছে যেতেন কিন্তু সিন্দ্রিতে ক্যাপ্টেন চোপরা একেবারে পুরো-দস্তুর সাহেব, ঠিক সন্ধে সাতটার সময় ডিনার খান। সাতটা বেজে গেলে ডিনার না বলে বলে কুইক সাপার। দেবকুমার এসব জানবেন কি করে? কথা বলতে বলতে সাতটা বেজে গিয়েছিল, চোপরার জন্য তখন ডিনারের টেবিল সাজানো হয়ে গেছে, তিনি জোর জবরদস্তি

করে দেবকুমারকেও ডিনার খাইয়ে ছাড়লেন। ডিনারের পর তিনি আবার ব্র্যান্ডির বোতল খুলে বসে ছিলেন, দেবকুমার সেটা খেতে আর রাজী হন নি। চোপরা বলেছিলেন ভাইয়া, দু' এক পেগ ব্র্যান্ডি খেলে আরও ভালোভাবে গাড়ি চলানো যায়। অ্যাট লিস্ট ওয়ান ফর দা রোড তো কম্‌সে কম্‌...। এসব রাস্তা দেবকুমারের নখদর্পণে, গাড়ি চালাবার জন্য ব্র্যান্ডি খাওয়া-না-খাওয়ায় কিছু আসে যায় না—কিন্তু অ্যালকহল তাঁর সহ্য হয় না। একটু খেলেই গা দিয়ে র‍্যাশ বেরোয়। ট্রেনিং-এর সময় যখন রাশিয়ায় ছিলেন, তখন সেই প্রচণ্ড শীতেও রুশ বন্ধুদের অনুরোধে ভড্‌কা খেতে পারেননি।

আসানসোলের খানিকটা আগে আবার একটা লেভেল ক্রশিং বন্ধ। এবার সত্যিই দেবকুমারের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। একটা মালগাড়ি যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কখন এনার আবার চলার মর্জি হবে তার ঠিক নেই। রাগ করেও কোনো লাভ নেই, চোয়াল দুটো শুধু শক্ত হয়ে রইলো, ইঞ্জিন বন্ধ করে দেবকুমার একটা সিগারেট ধরালেন।

রাউরকেল্লাতে নীপার স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল। দুর্গাপুরে আসার পর থেকেই বুকের ব্যথাটা বেড়েছে। দুটি সন্তানের জননী, কিন্তু কিছু দিন আগেও নীপা কোমরে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে কি সুন্দর ব্যাডমিন্টন খেলতো। লোকজনকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে ভালোবাসতো, রান্না-বান্না করতো নিজেই। এখন নীপার কোনোরকম কাজ করা বারণ, সুন্দর পোর্সিলিনের পুতুলের মতন খুব সাবধানে সাজিয়ে রাখতে হয় তাকে। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ও যাতে নীপা তাড়াতাড়ি করে না ফেলে, তাই দেবকুমার নিজে তার সঙ্গে পা মিলিয়ে আস্তে আস্তে নামেন। দেবকুমার ফ্যাক্টরিতে যাবার সময় নীপা বারান্দার ইজিচেয়ারে শাল মুড়ি দিয়ে বসে থাকে—মুখে একটা শীর্ণ হাসি—দূর থেকে এখনও নীপাকে ভারী সুন্দর দেখায়। অসুখটা মনের, কিন্তু কষ্ট হয় শরীরের।

মালগাড়িটা আবার চলতে শুরু করেছে। কতটা লম্বা কে জানে। অনেক সময় মালগাড়িগুলোকে এক মাইল দেড় মাইল লম্বা মনে হয়। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে দেবকুমার চাবিতে হাত দিলেন।

—বাবু! বাবু!

দেবকুমার চমকে তাকালেন। অন্ধকার ভেদ করে কারা এসেছে গাড়ির কাছে। প্রথমে দেখতে পেলেন একটি স্ত্রীলোককে। মনে হয় কুলিরমণী। উস্কোখুস্কো চুল, চোখে মুখে দারুণ আতঙ্কের ছাপ, বোধহয় ছুটতে ছুটতে এসেছে, তাই হাঁপাচ্ছে।

—বাবু, আমার আদমির ভারী অসুখ—হাসপাতালে...বাবু মেহেরবাণি করে...মুরীদ ...বাবু, আপনার পায়ে ধরছি...

তার আদমি কোথায়, একথা জিজ্ঞেস করতে হলো না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হলো আর একটা লোক, তার কাঁধে কম্বল জড়ানো একটা মানুষ। লোকটার পা দু'খানা ঝুলছে লটপট করে, খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা একটা প্রৌঢ় মুখ, ঠোঁটের পাশে গ্যাঁজলা লেগে আছে, এতক্ষণে মরে গেছে কিনা ঠিক নেই। এসব জায়গায় হাসপাতাল অনেক সময় রুগী মরে যাবার পর পৌঁছোয়।

মালগাড়িটা পার হয়ে গেছে, গেট খুলে যাচ্ছে। দেবকুমার ইচ্ছে করলে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে হুস করে বেরিয়ে যেতে পারতেন। একটা ট্রাক পেছন থেকে হর্ন দিচ্ছে। জি টি রোডে রাত্তিরবেলা কতরকম বিপদ হয়, কে না জানে। অচেনা লোককে গাড়িতে তোলার কোনো মানেই হয় না। কিন্তু স্ত্রীলোকটির গলার আওয়াজে এমন একটা আর্ত সুর ছিল যে দেবকুমারের বুকের ভেতরে সেটা ঝনঝন করে বাজতে লাগলো। তাছাড়া মুমূর্ষু লোকটার খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা মুখটা না দেখে ফেললেও কথা ছিল। মাইল সাতেক দূরে আসানসোল—সেখানে হাসপাতাল আছে। বিশেষ কিছু সময় পেলেন না, ঝট করে পেছনের দরজা খুলে দিয়ে দেবকুমার বললেন, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো।

লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে গিয়েই দেবকুমার গাড়ি থামালেন। ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, দেখি ওর হাত দেখি।

দেবকুমার নাড়ি দেখে নিতে চান, লোকটা এখনো বেঁচে আছে কিনা। শুধু শুধু একটা মড়া বয়ে নিয়ে যাবার কোনো মানে হয় না। কম্বলে জড়ামড়ি হওয়া অবস্থা থেকে

লোকটার হাত খুঁজে বার করতে বেশ সময় লাগলো, দেবকুমার কব্জী ধরে বুঝলেন, এখনও নাড়ী আছে। কতটা দুর্বল তা বুঝতে পারলেন না, তবে বেঁচে আছে ঠিকই। ঠিকভাবে বসার ক্ষমতা নেই, দুমড়ে মুচড়ে কোনো রকমে পড়ে আছে, নড়বড়ে ঘাড়টা স্ত্রীলোকটির গায়ে হেলানো।

—কি হয়েছে কি?

—দিনভর টাট্টি আর বমি, ঘণ্টা দু'ঘণ্টা হলো একদম নেতিয়ে গেল।

—ক'বার গেছে?

—তিশ-চল্লিশ দফে তো!

—তিরিশ-চল্লিশবার? ডাক্তার দেখাওনি? এখানে ডাক্তার নেই?

—ডাক্তারবাবু ছুটিতে গেছেন।

কথা বলছে স্ত্রীলোকটিই। বাকি লোকটি চুপ করে আড়ষ্টভাবে বসে আছে। এদের জীবনে ঘটনা বেশি নেই, তাই মৃত্যুর মতন ঘটনার প্রতিক্রিয়াও সহজে বোঝা যায় না। লোকটার কলেরা হয়েছে, এখন বাঁচার সম্ভাবনা আর নেই-ই বলতে গেলে। কিছুদিন আগেও গাড়ির খাটিয়ায় শুয়েই মরতো—সবাই বলতো ভবিতব্য, এখন হাসপাতালে পাঠাবার কথা ভাবে।

—এ তোমার স্বামী?

—হাঁ বাবু।

—আর এই ছেলেটা? তোমার ছেলে?

—না, এ আমার ভাই আছে। আমার দুটো মেয়ে কয়লাখানিতে কাজ করে। কালা পাহাড়ীতে—

দেবকুমার একটু অবাক না হয়ে পারলেন না। ওদের সংসার আর তাঁর সংসার ঠিক একরকম। তাঁরও দুটি মেয়ে শান্তিনিকেতনে থাকে। দুর্গাপুর থেকে শান্তিনিকেতন এত কাছে, যখন তখন দেখতে যাবার কোনো অসুবিধে নেই—আর শনি-রবিবার তারা চলে আসে মা-কে দেখার জন্য। নীপার ভাই তিমিরও কিছুদিন ধরে দুর্গাপুরে এসে আছে। বি এস সি পাস করতে পাবে নি—এসেছে চাকরির চেষ্টায়- দেবকুমার এখনও তাকে কোথাও ঢোকাতে পারেন নি। তিমিরের যে রকম তাস খেলার নেশা ধরেছে এই বয়েসে, চাকরিতে ঢুকলেও বিশেষ উন্নতি করতে পারবে বলে মনে হয় না। বাড়ির বিশেষ কাজ হয় না তাকে দিয়ে।

তাঁর বাড়িতেও নীপার অসুখ আর এই স্ত্রীলোকটির স্বামীর অসুখ। মনের অসুখ নয়, শরীরের, মৃত্যু খুব কাছাকাছি। ওদের তো কখনো মনের অসুখ হয় না! স্বামীকে হাসপাতালে দিয়ে স্ত্রীলোকটি সারারাত বসে থাকবে হাসপাতালের গেটে, ভোরের আগেই বোধ হয় মৃত্যুর খবর পেয়ে যাবে—তারপর ..। দেবকুমার ওসব জটিল চিন্তার মধ্যে যেতে চান না।

বাড়ি পৌঁছুতে আর একটু দেরি হয়ে যাবে, তা হোক। স্ত্রীলোকটি তার স্বামীকে বাঁচাবার জন্য সব রকম চেষ্টা করেছিল, অন্তত এই সান্ত্বনাটুকু সে পাক। হাসপাতালে এদের চিকিৎসা করাতে কত টাকাপয়সা লাগে দেবকুমার তা কিছুই জানে না। ছেলেবেলা থেকেই তিনি যেভাবে মানুষ হয়েছেন, তাতে এরা খুব দূরের মানুষ। আগে এদের জন্মমৃত্যু সম্পর্কে দেবকুমার কখনো গাঢ়ভাবে চিন্তা করেন নি। কিন্তু আজ এই উদ্‌ভ্রান্ত স্ত্রীলোকটির স্বামী তার গাড়িতে উঠেছে, একে বাঁচাবার সব রকম চেষ্টার জন্য দেবকুমার একটা দায়িত্ব অনুভব করলেন। মনে মনে হিসেব করলেন, তাঁর ব্যাগে এখনও পঞ্চাশ-ষাট টাকা আছে, পেটরোল যা আছে তাতেই চলে যাবে, আর কিনতে হবে না। হাসপাতালে পৌঁছে ওদের গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিলেই হবে।

নীপার অসুখ আর সারবে না—এ কথা দেবকুমার যেমন জেনে গেছেন। কিন্তু এক দিনের জন্যও চিকিৎসার ত্রুটি তো করেন নি দেবকুমার। আসলে চিকিৎসাটাই সান্ত্বনা—। নীপা একদিন রাত্রে বলেছিল, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না—শুধু শুধু তোমাকে আমি..। দেবকুমার বলেছিলেন, তুমি মরে গেলে আমিই বা আর বাঁচবো কি করে? হেরে

গিয়ে মানুষ আর কতদিন বাঁচতে পারে? নীপা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কার কাছে হেরে গিয়ে? দেবকুমার উত্তর দিয়েছিলেন তোমার মনের কাছে—

অসুস্থ লোকটা একটা গোঙানি দিয়ে নড়েচড়ে উঠলো। জ্ঞান ফিরছে যখন, আশার কথা। রীতিমত যন্ত্রণা আবার কঁকিয়ে উঠে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বললো লোকটা। স্ত্রীলোকটি ডাকল, বাবু বাবু!

ঘাড় না ঘুরিয়েই দেবকুমার বললেন, কি? এই তো এসে গেছি, আর দেরি নেই—

—টাট্টি লেগেছে।

—অ্যাঁ?

দেবকুমার গাড়ি নষ্ট করতে চান না। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, নামতে পারবে? ধরে ধরে নামাতে পারবে? স্ত্রীলোকটি জানালো, পারবো।

পেছনের ট্রাকটাকে পাশ দিয়ে দেবকুমার রাস্তার ধারে গাড়ি থামালেন। অসুস্থ লোকটি এক ঝটকায় কম্বল সরিয়ে ফেলে সোজা হয়ে উঠে বসলো। হাতে তার ডান্ডা।

দেবকুমার বেশী অবাক হবারও সময় পেলেন না। তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে মাথা আড়াল করে কি যেন বলতে গেলেন। প্রথম আঘাতটা হাতের ওপর লাগলো। দেবকুমার চেঁচিয়ে বললেন, না না দয়া করো। দয়া করো আমাকে। দ্বিতীয় আঘাত সরাসরি মাথার মাঝখানে পড়তেই দেবকুমার সীট থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন, দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলেন হাওয়া, বুকের মধ্যে আগুনের হল্কা, চোখের ওপর গরম চট্‌চটে রক্ত, চেঁচিয়ে বলতে গেলেন, আমাকে দয়া করো, আমাকে বাঁচাও—আর একটা চোট খেয়েই টলে কাত হয়ে পড়লেন। গলায় সাঁড়াশীর মতন একটা হাত। স্ত্রী-লোকটিই প্রথমে দেবকুমারের কব্জী থেকে ঘড়ি খুলে নিল। স্টিয়ারিং-এর ওপর থেকে মাথাটা ঝুলে পড়তেই কি ভেবে যেন কম্বল গায়ে লোকটি অনাবশ্যকভাবে আর এক ঘা ডান্ডা বসিয়ে দিল দেবকুমারের ঘাড়ে।

দেবকুমার মারা যান নি। ভোরের আগেই একটা পুলিশের গাড়ি তাঁকে দেখতে পায়। যে হাসপাতালে দেবকুমার ওদের নিয়ে আসবেন ভেবেছিলেন, সেখানেই তাঁকে ভর্তি করা হলো। তাঁর পকেটে কোনো রকম কাগজপত্রও পাওয়া যায় নি বলে, বাড়িতে খবর-পাঠাতে পুরো একদিন দেরি হয়ে যায়। তা হোক, তবু প্রথম চোখ মেলে দেবকুমার নীপাকেই দেখেছিলেন।

সেই ঘটনার পর কেটে গেছে দেড় বছর। দেবকুমারের শরীরে আর কোন ক্ষত নেই, বাঁ হাতের আঙুলগুলো শুধু বেঁকাতে পারেন না। চাকরিটা ছাড়তে হয়েছে, সিউড়িতে নিজেদের বাড়িটাই একটু সারিয়ে-টারিয়ে নিয়ে সেখানে এসে আছেন। দেবকুমারের মাথায় একটু গোলমাল দেখা দিয়েছে, কারুর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলতে চান না, বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকেন ইজিচেয়ারে। নীপা এখন অনেকটা সুস্থ, অনেকদিন তার বুকের ব্যথাটা হয় নি, এখন নীপা নিজের হাতে সব কাজ-টাজ করে, দেবকুমারের সেবা করে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, দেবকুমারকে নিয়ে বিকেলবেলা বেড়াতে বেরিয়েছে নীপা। দেবকুমারের সেই আগের মতনই দীর্ঘ উন্নত-সুদর্শন চেহারা, বিশাল দুটি চোখ—কিন্তু মুখখানা বড় বিমর্ষ ম্লান—নীপা নানারকম মজার কথা বলে দেবকুমারের মন ভাল রাখার চেষ্টা করছে।

সেদিন রাত্রির সেই ঘটনাটা দেবকুমার কারুকে বলেন নি। ডাক্তারকে পুলিশকে এমন কি নীপাকেও না। শুধু বলেছিলেন, রাস্তায় হঠাৎ ডাকাতরা আমার গাড়ি আটকে ছিল, আমার আর কিছু মনে নেই।

অথচ দেবকুমারের সবই মনে আছে। সেই তিনটি মুখ এখনো তার চোখে ভাসে। মাথার মধ্যে অন্য অনেক কিছু গন্ডগোল হয়ে গেছে অবশ্য, অফিসে কিছুদিনের জন্য জয়েন করে নিজেই বুঝেছিলেন, আর তাঁর পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়—সব কিছু গুলিয়ে গেছে, নিজে একটু আগে কি বলেছেন, তাই মনে থাকে না। কিন্তু সেই তিনটি মুখ, সেদিনের রাত্রের ঘটনা একটুও ভোলেন নি।

তবু নীপাকে বলেন, আমাকে একটু গাড়িতে করে ঐ আসানসোলের কাছে জি টি

রোডে ঘুরিয়ে আনবে? ওখানে গিয়ে যদি সব কথা মনে পড়ে—। নীপা দু'বার নিয়ে গিয়েছিল, দিনের বেলা অবশ্য। দেবকুমার সেখানেও কিছু বলেন নি নীপাকে, রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে রাস্তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পয়সা বিলিয়েছেন। নীপা কিছুই বুঝতে পারে না।

দেবকুমার এখন মাঝে মাঝে ডায়েরি লেখেন। কোনো কোনো দিন রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়, দেবকুমার বিছানা থেকে উঠে এক গ্লাস জল খান, একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবলেশ-হীন চোখে তাকিয়ে থাকেন বাইরের দিকে। নীপা তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আর ঘুম আসতে চায় না দেবকুমারের, তিনি তখন ডায়েরি লিখতে বসেন—সে ডায়েরি নীপাকেও দেখান নি।

তাঁর ডায়েরির দুটি অংশ : "সেই লোকটির কোনো অসুখ ছিল না, এ কথা ভাবা ভুল। কম্বল গায়ে সেই লোকটি, তার স্ত্রী, স্ত্রীর ভাই—ওরাও মানসিক রোগী। ওদের চোখের দৃষ্টির কথা ভাবলে এখন বুঝতে পারি—তা সুস্থ মানুষের দৃষ্টি নয়। সাধারণ ডাকাত ওরা নয়। ওদের অসুখ এখন এমন একটা জায়গায় এসেছে, সেখানে ওরা উপকারীকেও আঘাত করতে চায়। গোটা সমাজের অসুখ না সারলে, ওরাও সারবে না। ওরা সুস্থ হয়ে না উঠলে, সুস্থ হবার আশা নেই।"

আর একটি অংশ : "নীপার মনের অসুখ সম্পর্কে আগে আমার পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল না। এখন দেখছি আমার নিজেরই মনের অসুখ। হ্যাঁ, অসুখটা আমার মনের, মস্তিষ্কের নয়। আমার স্মৃতিভ্রংশ হলেও পুরোপুরি হয় নি কেন? আমি প্রায়ই একটা স্বপ্ন দেখি। সেদিন রাত্রে অজ্ঞান অবস্থায় এই স্বপ্নটা দেখেছিলাম—তারপর প্রায়ই দেখতে পাই।—কয়েকদিন অন্তর আমি দেখি, আমার হঠাৎ দারুণ অসুখ হয়েছে মাঝ রাত্রে, কিছুতেই কোনো ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না,—শহরের সব ডাক্তার এখন ছুটিতে—আমার গাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে, নীপা আর তিমির আমাকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বড় রাস্তার সামনে, একটা গাড়ি পেলে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। নীপার চোখে মুখে দারুণ ত্রাস, সে যেন মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, তাড়াতে চাইছে প্রাণপণে। অবিকল সেই স্ত্রীলোকটির মতন, কিন্তু অভিনয় নয়। নীপা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বলেই মৃত্যু সম্পর্কে তার খাঁটি ভয়। আমার অসহ্য কষ্ট, কিন্তু আমার অসুখের জন্য নীপার এই ব্যাকুলতা দেখে একটু আরামও পাচ্ছি।...দূর থেকে একটা মোটরগাড়ি আসছে হেড লাইট জ্বালিয়ে, নীপা হাত তুলে ব্যাকুলভাবে চিৎকার করে গাড়িটা থামাতে চাইছে...স্বপ্নের মধ্যে এই জায়গাটায় আমি দারুণ ভয় পেয়ে যাই, ঘামে আমার শরীর ভিজে যায়, বুকের মধ্যে ধকধক করে আর বার বার মনে হয়, যদি গাড়িটা না থামে ; যদি গাড়িটা আমাদের না নিতে চায়? এই মাঝরাতে, যদি আমাদের ডাকাত মনে করে?"

মনীষার দুই প্রেমিক

আমি মনীষাকে ভালোবাসি। মনীষা আমাকে ভালোবাসে না। মনীষা অমলকে ভালোবাসে।

ব্যাপারটা এরকমই সরল। কিন্তু অমল সম্পর্কে আমার একটা দুশ্চিন্তা থেকে যায়। এক বিশাল সন্ধেবেলা দিকচিহ্নহীন মন্থর আলোর মধ্যে অমল ও মনীষাকে যখন আমি পাশাপাশি দেখতে পাই—অমলের চওড়া কব্জির ধার ঘেঁষে মনীষার মসৃণতা সামান্য গ্রীবা তুলে মনীষা রাসবিহারী অ্যাভিনিউকে কৃতজ্ঞ ও ধন্য করে—আমি তখন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলি। যাক্, একই বাতাসের মধ্যে তো আমরা আছি। অমল, তুমি সৎ হও, আরও বড় হও, কতখানি দায়িত্ব এখন তোমার ওপর। অমল, তুমি পারবে তো? নিশ্চয়ই পারবে, কেন পারবে না? আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাকে সাহায্য করবো।

অমল বিমান চালায়। ভোরবেলা একটা স্টেশন ওয়াগন এসে অমলের বাড়ির সামনে হর্ন দেয়, অমল বেরিয়ে আসে—তখনও চোখে মুখে ঘুম, কিন্তু সাদা পরিচ্ছদে তাকে কী

সুন্দর দেখায়! দাড়ি কামাবার পর অমলের গালে একটা নীলচে আভা পড়ে, ঠোঁট দুটি ওর ভারী পাতলা—সিগারেট ঠোঁটে চেপে কথা বলবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে টুপ করে সিগারেটটা খসে পড়ে যায়। স্টেশন ওয়াগনে উঠে অমল ফের নিজের বাড়ির তিনতলার জানলার দিকে তাকায়। একটু পরেই দমদম থেকে অমল ইস্তাম্বুল উড়ে চলে যাবে। আবার ফিরেও আসবে।

অমল বিমান চালায়। অমল মোটরগাড়ি চালাতে জানে কিনা—আমি ঠিক জানি না। কিন্তু একথা জানি, অমল সাইকেল চালাতে পারে না। অমল কি সাঁতার জানে? খোঁজ নিতে হবে তো! সাইকেল ও সাঁতার দুটোই আমি জানি, দেওঘর থেকে ত্রিকুট পাহাড় পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে গিয়েছিলাম একবার, গিরিডিতে উশ্রী জলপ্রপাতে একবার সাঁতার কাটতে গিয়ে স্রোতের টানে পড়ে বহুদূর ভেসে গিয়েছিলাম, বাঁচবো এমন আশা ছিল না তবুও তো বেঁচে গেছি। কিন্তু ছি ছি, এসব আমি কি ভাবছি! আমি কি গর্ব করবো নাকি এ নিয়ে? ভাট। সাইকেল কিংবা সাঁতার জানা এমন কিছুই না! ও তো কত হেঁজিপেঁজি লোকেও জানে। কিন্তু অমল বৈমানিক, দৃঢ় স্বাস্থ্যময়, গৌরবর্ণ উজ্জ্বল মুখ অমল নীলিমার বুক চিরে রুপালী বিমান নিয়ে উড়ে যায় ইস্তাম্বুল কিংবা সাও পাওলো বন্দর পর্যন্ত। আবার ফিরে আসে। কিন্তু অমল, তোমাকে আরও মহীয়ান হতে হবে।

সবার চোখে পড়ে না, কিন্তু আমি জানি, একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, মনীষার পা পৃথিবীর মাটি ছোঁয় না। এই ধুলোবালির নোংরা পৃথিবী থেকে কয়েক আঙুল উঁচুতে সে থাকে। মনে আছে, সেই বৃষ্টির দিনের কথা? একটু আগেও রোদ ছিল, হঠাৎ সব মুছে গিয়ে খয়েরি রঙের ছায়া পড়লো সারা শহরে, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এলো। আমি ছুটে একটা গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়ালাম। দেখতে দেখতে রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমলো, গাড়ি-ঘোড়া অচল হলো, বৃষ্টির তখনও সমান তেজ। জলের ছাঁটে ভিজে যাওয়া সিগারেট টানতে যে রকম বিরক্তি, সেই রকম বিরক্ত বা বিমর্ষভাবে আমি দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় ছিলাম। এমন সময় মনীষাকে দেখতে পাই, দু'জন সখীর সঙ্গে সে জল ভাঙতে ভাঙতে উচ্ছল হয়ে আসছে। আমাকে ডাকতে হয় নি, মনীষাই সব জায়গায় সকলকে প্রথম দেখতে পায়—মনীষাই আমাকে দেখে চেঁচিয়ে বললো, এই বরুণদা, একা একা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আসুন, আসুন, চলে আসুন! আজ বৃষ্টিতে ভিজবো!

জলের মধ্যে মানুষ ছুটতে পারে না, কিন্তু আমার ইচ্ছে হলো ছুটে যাই। একটু আগেও গায়ে সামান্য জলের ছাঁট অপছন্দ করছিলুম, কিন্তু তখন মনে হলো হাঁটু গভীর জলে সাঁতার কাটি। সখী দু'জন ইডেন হসপিটাল রোডের হস্টেলে চলে গেল, আমি আর মনীষা মাঝরাস্তা দিয়ে হাঁটছি জল ভেঙে ভেঙে, তখনও অঝোরে বৃষ্টি, সারা রাস্তায় আর কেউ নেই, সব পায়রারা খোপে ঢুকে গেছে—চুপচুপে ভিজে গেছি আমরা দু'জনে, মনীষার কানের লতিতে মুক্তোর দুলের মতন টলটল করছে এক ফোঁটা জল, এইমাত্র সেটা খসে পড়লো। সেদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মনীষা অন্য কারুর মত নয়—এই চেনা পৃথিবী, এই নোংরা জল কাদা, রাস্তার গর্ত, ভেসে যাওয়া মরা বেড়ালছানা —এসবের মধ্যে থেকেও মনীষা এত আনন্দ পাচ্ছে কি করে? বেড়াতে গেলে মানুষ এমন আনন্দ পায়—মনীষা যেন অন্য গ্রহ থেকে এখানে দুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। আমরা এখানকার শিকড়-প্রোথিত অধিবাসী, অনেক কিছুই আমাদের কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে —মনীষার কাছে সব কিছুই নতুন এবং আনন্দোজ্জ্বল।

বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ওয়েলিংটন পর্যন্ত চলে আসি। এই সময় ট্যাক্সি পাওয়া কত কঠিন, কিন্তু একটা খালি ট্যাক্সি এসে আমাদের পাশে দাঁড়ায়, বিশালকায় ড্রাইভার ক্রীতদাসের মতন বিনীত ভঙ্গিতে মনীষার দিকে চেয়ে বল্লে, আসুন! যেন তার নিয়তি তাকে মনীষার কাছে পাঠিয়েছে, তার আর উপায় নেই। মনীষা হঠাৎ আবিষ্কারের মতন আনন্দে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, এবার ট্যাক্সি চড়বেন? যতক্ষণ বৃষ্টি না থামে, ততক্ষণ ঘুরবো কিন্তু!

দরজা খোলার পর মনীষা যখন নিচু হয়ে ঢুকতে যায়, তখন তার ফর্সা পেট আমার

চোখে পড়ে, জলে ভেজা নাভি, দার্জিলিং-এর কুয়াশায় আমি একদিন এই রকম চাঁদ দেখেছিলাম। আঁচল নিংড়ে মুখ মুছতে মুছতে মনীষা বলে, আঃ যা ভালো লাগছে আজ! এই বরুণদা, আপনি অত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন? আমি বিনা দ্বিধায় মনীষার কাঁধে হাত রেখে বলি, তুমি একদম পাগল! বৃষ্টিতে ভিজতে এত ভালো লাগে তোমার?

—ভীষণ! ভীষণ! বৃষ্টিতে ভিজলেও আমার কক্ষণো ঠান্ডা লাগে না।

—তুমি তাকাও তো আমার দিকে! তোমাকে ভালো করে দেখি।

—ভালো করে দেখবেন; আমি পাগল না আপনি পাগল?

—তা হলে দুজনেই।

—মোটেই না, আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পাগল হতে রাজী নই! এ কথা বলার সময়েও মনীষা আমার দিকে ঘুরে তাকায়। নির্নিমেষে আমি দেখি। সুকুমার ভুরুর নিচে দুটি দ্বিধাহীন চোখ, এই যে নাক—ইটালীর শিল্পীরা এক সময় এই রকম নাক সৃষ্টি করেছে, উড়ন্ত পাখির ছড়ানো ডানার মত ঠোঁটের ভঙ্গি, একটু দুষ্টু দুষ্টু হাসি মাখানো। একথা ঠিক, ওর ভেজা শাড়ি-ব্লাউজের রং ভেদ করে জেগে ওঠা বুপোর জামবাটির মতন স্তন আমার চোখে পড়লেও, সেখানে আমার হাত দিতে ইচ্ছে করেনি, ইচ্ছে করেনি কুয়াশায় আধো-ভেজা চাঁদ ছুঁতে। এক এক সময় হয় এ রকম, তখন সৌন্দর্যকে নষ্ট করতে ইচ্ছে হয় না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মনীষার সেই সিক্ত সৌন্দর্যের পাশে আমার লোমে ভরা শক্ত হাতটা সেই মুহূর্তে মানাবে না। আমার ইচ্ছে হয়েছিল, মনীষা আরও হাসুক, উচ্ছল হাসির তরঙ্গে ওর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠুক, তা হলেই ওর রূপ আরও গাঢ় হবে। কিন্তু কি করে ওকে আরও খুশী করবো—ভেবেই পাচ্ছিলাম না। আমি বললাম, মনীষা, ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হলো, নইলে আমি বোধ হয় এখনও বোকার মতন সেই গাড়ি-বারান্দার নিচেই দাঁড়িয়ে থাকতাম!

রাস্তার জলের দিকে তাকিয়ে মনীষা বললো, দেখুন, দেখুন, কি রকম ঢেউ দিচ্ছে, ঠিক নদীর মতন।

—তুমি এদিকে কোথায় এসেছিলে?

—ইউনিভার্সিটিতে। লাইব্রেরীর দুখানা বই ছিল ফেরত দিয়ে গেলাম। ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল।

—কেন, তুমি রিসার্চ করবে না?

—ঠিক নেই। আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন?

—তুমি আসবে, সেই প্রতীক্ষায় ছিলাম।

চোখে চোখ রাখলো, একটু হাসলো, হাসি মিশিয়েই বললো, সত্যি, কোনোদিন আমার জন্য প্রতীক্ষা করবেন? আপনি যা অহংকারী!

অমল আমাদের বাড়ির তিনখানা বাড়ি পরে থাকে। আমি নয়, সত্যিকারের অহংকারী হচ্ছে অমল। পাড়ার কোনো লোকের সঙ্গে মেশে না। আমাকে দেখেছে, মুখ চেনে, তবু আমার সঙ্গে কোনোদিন কথা বলেনি। তা হোক, তবু অমলকে আমি পছন্দ করি। অমলের চেহারায় ব্যবহারে একটা দীপ্ত পৌরুষ আছে—অহংকারের যোগ্য সে, আমি ঐরকম অহংকার দেখতে ভালোবাসি। সপ্তাহে তিনদিন অন্তত অমল কলকাতায় থাকে, ছুটির দিন সকালে, ন'টা আন্দাজ অমল বাড়ি থেকে বেরোয়, তার গভীর ভুরুর নিচের চোখ দুটিতে তখনও ঘুম লেগে থাকে—ধপধপে পাজামা ও পাঞ্জাবি পরা, পাঞ্জাবির হাত গোটানো, পথের দু' পাশে না তাকিয়ে অমল হাজরা মোড় পর্যন্ত যায়, অধিকাংশ দিনই সে ল্যান্সডাউন রোড ধরে হাঁটতে থাকে—অমলকে আমি কোনোদিন বাসে উঠতে দেখিনি, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসে অমল একটু দাঁড়ায়, সিগারেট ধরিয়ে অমল এবার পূর্ণ চোখ মেলে চৌরাস্তার মানুষজন দেখে। বস্তুত, পথের সমস্ত মানুষও একবার অমলকে দেখে, এমনই তার পৃথক ব্যক্তিত্ব। তখনও মনীষার সঙ্গে অমলের পরিচয় তত প্রগাঢ় হয় নি, অমল রাস্তা পেরিয়ে সর্দার অ্যাভিনিউয়ের দিকে তার এক বন্ধুর বাড়িতে চলে যায়।

একদিনে নয়, অমলকে দেখতে ও চিনতে আমার সময় লেগেছে। আগে আমি অন্যমনস্কভাবে অমলের প্রশংসাকারী ছিলাম। অথবা, তার ঠিক পটভূমিকায় তাকে আমি

দেখিনি।

হঠাৎ দেখা না হলে মনীষার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো উপায় নেই। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সব জায়গায় মনীষার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। দিল্লী থেকে কয়েক দিনের জন্য এসেছে কোনো বন্ধু, তার সঙ্গে দেখা করতে গেছি—সেখানে সমস্ত বাড়িতে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে রয়েছে মনীষা। সেই বন্ধুর সঙ্গে ওর কি রকম আত্মীয়তা। সাদা সিল্কের শাড়িতে মনীষাকে খুবই হাল্কা, প্রায় অপার্থিব দেখায়—আমার কাছে এসে মনীষা বলে, একি, আপনার জামার মাঝখানের বোতামটা লাগান নি কেন? অবলীলায় মনীষা আমার বুকের খুব কাছে দাঁড়িয়ে বোতাম লাগিয়ে দেয়।

মনীষাদের বাড়িতে আমি কখনো যাবো না। ঐ বিশাল বাড়িতে অন্তত সাতখানা ঘর ফাঁকা থাকে, যদি সেখানে কোনোদিন আমি দস্যু হয়ে উঠি? যদি রূপ-হন্তারক হতে সাধ হয় আমার? মনীষা একদিন আয়নার সামনে দাঁতে ফিতে কামড়ে চুল বাঁধছিল, আমি ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—সেই দৃশ্যটা আমার বুকে বিঁধে আছে। সেই দৃশ্যটা আমি ভুলতে পারি না। মনীষা আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে—কিন্তু আয়নার মধ্যে আমরা দু'জনকে দেখছিলাম—আমরা দু'জনে একই দিকে তাকিয়ে—অথচ দু'জনকে আমরা পরস্পর দেখতে পাচ্ছি,—মনীষার আঁচলটা বুক থেকে খসে পড়বো পড়বো—অথচ খসে নি, কি এক অসম্ভব কায়দায় সে দুটি মাত্র হাতে চুল, চুলের ফিতে, চিরুনি এবং আঁচল সামলাচ্ছে—চোখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি। মনীষা কখনো অপ্রতিভ হয় না—পিছনে আমাকে দেখতে পেয়ে বললো, কি মেয়েদের প্রসাধনের রহস্য দেখার খুব ইচ্ছে বুঝি? ঠিক আছে, দাঁড়িয়ে থাকুন, দেখবেন—আমি এগারো রকমের স্নো-পাউডার মাখবো!

আমি বললুম, ওরে বাবা, এত সাজ-পোশাক, কোথাও বেড়াতে যাবে বুঝি?

—হুঁ।

—কোথায়?

—ছাদে।

আয়নার ফ্রেমের মধ্যে দেখা সেই এক শ্রেষ্ঠ শিল্প। সেই শিল্পের মধ্যে আমার স্থান ছিল না। আমি নিজেকে সেখান থেকে সরিয়ে নিলুম। কিন্তু মুশকিল এই, আয়নার মধ্যে নিজের মুখের ছায়া না ফেলে অন্য কিছুও যে দেখা যায় না।

সেইরকমই এক রবিবারের সকালে অমল ল্যান্সডাউন রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে মোড়ে এসে পৌঁছলো, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ধরে আসছিল মনীষা, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ওরা ঠিক সমকোণে মিলিত হলো—সম্ভ্রমপূর্ণ ভদ্রতার সঙ্গে অমল মনীষাকে বললো, কি ভালো আছেন?

মনীষা উদ্ভাসিত মুখে বললো, আরেঃ আপনি? আপনি ব্যাংকক্ গিয়েছিলেন না? কবে ফিরলেন?

—কাল সন্ধেবেলা।

—পরশু গিয়ে কাল ফিরে এলেন?

অমল সংযতভাবে হেসে বললো, হ্যাঁ। আপনি এখন কোনদিকে যাবেন?

—একটু লেক মার্কেটের কাছে যাবো।

—চলুন, এক সঙ্গে যাওয়া যাক্।

সেই প্রথম আমি অমলকে সোজা না গিয়ে ডানদিকে বেঁকতে দেখলাম। আমি খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। মনীষা আমাকে দেখতে পায় নি। সেই প্রথম মনীষা আমাকে দেখতে পেল না। কিন্তু আমি ওকে ডাকি নি কেন? আমি ডাকলে মনীষা আমার সঙ্গেই যেতো-অমলের সঙ্গে যেতো না—অমলের সঙ্গে ওর তখনও তেমন গাঢ় চেনা ছিল না! কিন্তু আমি ডাকি নি কেন? ঠিক জানি না। হঠাৎ মনে হয়েছিল, মনীষা আর অমল যদি কখনো পাশাপাশি আয়নার সামনে দাঁড়ায়, অমলকে সরে যেতে হবে না।

ওদের দু'জনকে বড় সুন্দর মানায়। বুকটা টনটন করে উঠেছিল। পরমুহূর্তে ভেবেছিলাম, ধ্যাৎ। চেহারাই কি সব নাকি? আমি একটু বেশী রোগা—কিন্তু রোগা মানুষরা কি ভালোবাসার যোগ্য হতে পারে না?

জি এম আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে বললেন, তুমি তো বিয়ে করো নি, সন্ধেগুলো কাটাও কি করে?

অফিসে জি এম-এর মুখ থেকে এরকম প্রশ্ন আশা করিনি। সামান্য হেসে বললুম, কি আর করবো, বাড়ি ফিরে স্নান করি, তারপর চা খেয়ে বইটই পড়ি, রেকর্ড শুনি।

--সে কি হে? আর কোনো এন্টারটেইনমেন্ট নেই? তবে যে শুনি তোমাদের মতন ইয়ংম্যানদের জন্য কলকাতা শহরে, মানে, অনেক নাইট স্পট্।

--স্যার, ব্যাপারটা কি বলুন তো?

--শোনো, দিল্লী অফিস থেকে মিঃ চোপরা আসছেন। ওঁকে আমরা তাজ গ্রান্ডে ডিনার দিচ্ছি। তুমিও থাকবে। মিঃ চোপরা একটু ইয়ে মানে লাইট স্বভাবের লোক, তুমি ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিয়ে ওকে কলকাতার নাইট লাইফ একটু দেখিয়ে আনবে।

—নাইট লাইফ মানে?

—সে আমি কি বলবো? তোমরা ইয়ংম্যান যা ভালো বুঝবে! চোপরার একটু ফুর্তিটুর্তি করার বাতিক আছে!

--স্যার আমি পারবো না। অন্য কারুকে এ ভার দিন।

—সেকি? পারবে না কি? চোপরার সঙ্গে তোমার অলাপ হয়ে থাকলে তোমারই তো সুবিধে। সহজেই লিফ্‌ট পেয়ে যাবে—ওরাই তো হর্তাকর্তা।

—না স্যার, এসব ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা নেই। পাঞ্জাবী তো—ওর সঙ্গে যদি আমার রুচিতে না মেলে।

—পারবে না? ঠিক আছে, দাসাপ্পাকে বলে দেখি। ওর আবার ইংরেজী উচ্চারণটা ভালো নয়--

সন্ধের পর স্বয়ং জি এম গাড়ি নিয়ে আমার বাড়িতে উপস্থিত। বললেন, শিগগির তৈরি হয়ে নাও, তোমাকেই যেতে হবে। দাসাপ্পার মেয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে, হাসপাতালে--সে আসতে পারবে না। নাও নাও, তাড়াতাড়ি, আটটায় ডিনার।

—কিন্তু স্যার, আমার যে ওসব ভালো লাগে না! ডিনারের পর আমি আর কোথাও যাবো না কিন্তু!

—বাজে বোকো না! তোমারই ভালোর জন্য বলছি--চোপরাকে খুশী করতে না পারলে তোমারও বিপদ, আমারও বিপদ। তোমাকে আমি তিনশো টাকা আলাদা দিয়ে দেবো—ডিনারের পর ওকে নিয়ে একটু...

—আমাকে ছেড়ে দিন! আমি পারবো না।

—শুধু শুধু দেরি করছো! চট্‌পট তৈরি হয়ে নাও, এখন কথা বলার সময় নেই। চাকরি করতে গেলে বড় কর্তাদের খুশী করতেই হয়--তাও তো আমাদের আমলে আমরা সাহেবদের...

জি এম-কে বসিয়ে রেখেই আমাকে পোশাক পাল্টে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বেঁধে নিতে হলো। জি এম আমার সর্বাঙ্গের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, জুতোটায় একবার ব্রাশ ঘষে নাও।

ওঁর সঙ্গে নিচে নেমে, যখন গাড়িতে উঠছি, সেই সময় হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি মনীষার যোগ্য নই। আমি মনীষার যোগ্য নই। আমি ওপরে ওঠার বদলে আরও নিচে নেমে যাচ্ছি।

মনীষাকে দেখলে রাজহংসীর কথাই প্রথমে মনে পড়ে। পরিষ্কার টলটলে জলে যেখানে রাজহংসী নিজের ছায়া নিজেই দেখে। টাটকা তৈরি ঘিয়ের মতন মনীষার গায়ের রং, ঠোঁট দুটি একটু লালচে—এমন সাদা দাঁত শুধু শিশুদেরই থাকে। মনীষার ঠোঁট আর চোখ দুটো সব সময় ভিজে ভিজে, এই চোখকেই ইংরেজীতে বলে 'লিকুইড আইজ'—মনীষাকে আমি কখনও গম্ভীর হতে দেখিনি, বেড়াতে গিয়ে কি আর কেউ গম্ভীর থাকে! ঐ যে বললুম, মনীষাকে দেখলেই মনে হয়—এ পৃথিবীতে সে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। এ পৃথিবীর কোনো কিছুই ওর কাছে পুরোনো নয়।

ঠিক চার মাস বারোদিন মনীষাকে দেখিনি। দেখিনি, কিংবা দেখা হয় নি, কিংবা

মনীষা আমাকে খুঁজে পায় নি। তারপর একদিন লেক স্টেডিয়ামের ধারে মনীষাকে দেখতে পেলাম। মনীষার শরীরের এক-একটা অংশ আমার এক-একদিন নতুন করে ভালো লাগে।

সেদিন চোখে পড়লো ওর পা দুটো। জয়পুরী কাজ করা লাল রঙের চটি পরেছে, কি সুন্দর ঐ পা দুটো—মসৃণ নরম, এ পৃথিবীতে মনীষাই একমাত্র মেয়ে এই ধুলো-মলিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলেও যার পায়ে এক ছিটে ধুলো লাগে না। মনে হলো, মনীষার ঐ পা দুখানি হাতের মুঠোয় নিয়ে গন্ধ শুঁকলে আমি ফুলের গন্ধ পাবো!

মনীষা হাসলো, অবাক হলো এবং অভিমানের সুরে বললো যান্, আপনার সঙ্গে আর কথা বলবো না!

--কেন? আমি কি দোষ করেছি?

—আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? আপনি মোটেই আমার কথা ভাবেন না।

—মনি, অভিমান করলে তোমাকে এত সুন্দর দেখায়!

সাড়ে চার মাস বাদে দেখা হলেও পথের মধ্যে মনীষার হাত ধরা যায়। হাত ধরে আমি বললুম, মনি, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছো? আমার সঙ্গে চলো—

--এখন! ক'টা বাজে? ওমা, সাড়ে পাঁচটা? একজন যে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে।

--একজন? একজন তাহলে অপেক্ষা করে আছে? সে তা হলে অহংকারী নয়?

মনীষা ঠিক বুঝতে পারলো না, একটু অন্যমনস্কভাবে বললো আপনি চেনেন তাকে, অমল রায়, চলুন না, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন--উনি দাঁড়িয়ে থাকবেন।

একবার লোভ হয়েছিল বলি, না, অমলের কাছে যেতে হবে না--তুমি আমার সঙ্গে চলো! দেখাই যাক্ না এ কথা বলার পর কি ফল হয়! কিন্তু অতটা ঝুঁকি নিলাম না, আলতোভাবে বললুম, না, তুমি একাই যাও, আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছিলাম।

মনীষার চলে যাওয়ার দিকে আমি তাকিয়ে থাকি। আমার কোনো রাগ বা অভিমান হয় না। এতে কোনো সন্দেহ নেই, অমলই মনীষার যোগ্য! কিন্তু অমল, তুমি মনে করো না, তুমি মনীষাকে জিতে নিয়েছো। তা মোটেই না। আমিই মনীষাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। অমল, তোমাকে মনীষার যোগ্য হতে হবে। তুমি বিচ্যুত হয়ো না।

আকাশে অমল বিমান চালিয়ে ইস্তাম্বুল যাচ্ছে--আমার কল্পনা করতে ভালো লাগে --সে বিমানে আর কেউ নেই, মনীষা ছাড়া, ওরা দু'জন শূন্য থেকে উঠে যাচ্ছে মহাশূন্যে, ইস্তাম্বুলের পথ ছাড়িয়ে গেল অজানা পথে- ইস্, ওদের দুজনকে কি সুন্দর মানায়— শিল্প এরই নাম।

আমার হাত টন্‌টন্ করছে, আমি আর পারছি না, দাঁতে দাঁত চেপে গেছে, মুখ চোখ ফেটে যেন রক্ত বেরুবে, আমি আর পারছি না.. না । আমার ছোট ভাই টাপু ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে, ন্যাড়া ছাদে, পিছোতে পিছোতে হঠাৎ গড়িয়ে পড়ে গিয়েও কার্নিস ধরে ফেলে ঝুলেছিল, ওর আর্ত চিৎকারে আমি ছুটে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরেছি, কিন্তু টেনে তুলতে পারছি না, চোদ্দ বছরের টাপু এত ভারী, কিছুতেই আর ধরে রাখ'তে পারছি না, আমার হাত দুটো যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে শরীর থেকে—টাপু একটু একটু করে নিচে নেমে যাচ্ছে আর পাগলের মতন চেঁচাচ্ছে, আমিও একটু একটু এগিয়ে যাচ্ছি— এবার দু'জনেই পড়বো—তিন তলা থেকে শান বাঁধানো ফুটপাথে--প্রাণ ভয়ে একবার আমার ইচ্ছে হলো টাপুকে ছেড়ে দিই। ছেড়ে দেবো, ছেড়ে দেবো, টাপুকে—এখান থেকে পড়লে টাপুকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না-টাপু আমাকে টানছে, জলে ডোবা মানুষকে বাঁচাতে গেলে দু'জনেই অনেক সময় যেমন মরে—আমিও পাগলের মতন চেঁচাতে লাগলুম —সেই সময় পিছন থেকে কারা যেন তিন-চারজন আমাকে ধরলো—টাপুকেও টেনে তুললো। ঝড়ের বেগে ছুটে এসে মা টাপুকে বুকে চেপে ধরলেন। সেই তিন চারজন আমার পিঠ চাপড়ে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। কিন্তু ওরা জানে না, আমি এক সময় টাপুকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম। টাপুকে ফেলে আমি নিজে বাঁচতে চেয়েছিলাম। এমন কিছু অস্বাভাবিক কি? জীবনের চূড়ান্ত মুহূর্তে বেশীর ভাগ মানুষই শুধু নিজের জীবনের কথা ভাবে। টাপুকে মেরে ফেলে নিজে বাঁচতে চেয়েছিলাম। বেশীর ভাগ মানুষই তাই

করতো। আমি বেশীর ভাগ মানুষের দলে। এই সব স্বার্থপর বর্ণকালা, অন্ধ মানুষ কেউই প্রেমিক হতে পারে না' নাঃ, আমি মনীষার যোগ্য নই, সত্যিই। অমল মনীষাকে তুমিই নাও। আমি বিনা দ্বিধায় সরে দাঁড়াচ্ছি। মনীষার সঙ্গে আর কোনোদিনই দেখা করবো না।

পরদিনই মনীষাকে টেলিফোন করলাম। আগে কখনো ওকে এমন ভাবে ডাকিনি। মনি, তুমি আগামীকাল ঠিক ছ'টার সময় লেক স্টেডিয়ামের কাছে আসবে। আসতেই হবে। অন্য হাজার কাজ থাকলেও ক্যানসেল করে দাও!

মনীষা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললো, আসবো আসবো, ঠিক আসবো, কেন কি ব্যাপার?

—দেখা হলে বলবো, কালই দেখা হওয়া চাই, ঠিক আসবে, উইদাউট ফেইল! কথা দাও আমাকে!

মনীষার গলা কি একটু কেঁপে গেল? একবার কি সে টেলিফোনটা কাছ থেকে সরিয়ে তার অনিন্দ্য দুই ভুরু একটুক্ষণ ভাবলো কিছু? দু'-তিন মুহূর্ত বাদে মনীষা বললো, বলছি তো যাবো? আপনি একটা পাগল!

কাল এলো। অফিস যাইনি। অফিসে গেলেই আত্মায় একটা ময়লা দাগ পড়ে। বিকেলে স্নান করে দাড়ি কামিয়েছি। আয়নার সামনে আমার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ চেহারা। আয়নার সামনে থেকে যেই সরে গেলাম—চোখে ভেসে উঠলো অন্য একটা আয়না। তার সামনে মনীষা, দুটি মাত্র হাতে চুল, চিরুনি, ফিতে এবং আঁচল সামলাচ্ছে—মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি—তার পাশে আমি—না, না, এটা মানায় না, শিল্প হিসেবে এটা অসার্থক। আমি সরে গেলাম। সে ছবি থেকে—অন্য মূর্তি এলো সেখানে—হ্যাঁ, এখন দুটি মুখের আলো একরকম, আমি মানতে বাধ্য।

স্টেডিয়ামের কাছে গেলাম না আমি। অমল মনীষাকে তুমি নাও, আমি তোমাকে দিলাম!

মাঝে মাঝে দূর থেকে ওদের দু'জনকে দেখি। তৃপ্তিতে আমার বুক ভরে যায়। গ্রীক-পুরুষের মতন সুদর্শন অমল, তার মুখ যোগ্য অহংকারে উদ্ভাসিত, প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবীকে জয় করার আস্থা। আর মনীষা? তাকে দেখলে মনে হয়—প্রতি মুহূর্তে অমলকে আরও যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

আজকাল খুব বেশী সিনেমা দেখি। সময় কাটে না বলে প্রায় প্রতিদিনই নাইট-শো-তে সিনেমা দেখতে যাই। সেইরকমই একদিন সিনেমা দেখে বেরিয়ে রাত্রি সাড়ে এগারোটা আন্দাজ চৌরঙ্গিতে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়েছিলুম। গ্র্যান্ড হোটেল থেকে অমলকে বেরুতে দেখলুম। সঙ্গে ও কে? অবনীশ না? কি সর্বনাশ, অবনীশের সঙ্গে অমলের চেনা হলো কি করে? খুব যেন বন্ধুত্ব মনে হচ্ছে। অমলের পা টলছে একটু মদ খেয়েছে, তা থাক্ না, পাইলটের কাজ করে—ওকে কত দেশে যেতে হয়, কত লোকের সঙ্গে মিশতে হয়—মদ খাওয়া এমন কিছু দোষের নয়, কিন্তু পা না টললেই ভালো ছিল। অবনীশের সঙ্গে অত বন্ধুত্ব হলো কি করে? অবনীশ সেনগুপ্ত তো সাংঘাতিক লোক। বড়লোকের ছেলেদের বখানোই ওর কাজ। খুব সুন্দর চটপটে কথা বলে, কথার মোহে ভোলায়, বড় বড় হোটেলে এসে মদ খাওয়ার সঙ্গী হয়, তারপর নিজের বাড়ির জুয়ার আড্ডাতে টেনে নিয়ে যায়। এলগিন রোডে ওর কুখ্যাত জুয়ার আড্ডা, জুয়ার নেশা ধরিয়ে অবনীশ সেই সব ছেলেদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। আমি একদিন মাত্র ওর পাল্লায় পড়েছিলাম। অমলকে দেখে তো মনে হচ্ছে অবনীশের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। রাস্তায় গলা জড়াজড়ি করে দু'জনে ওপাশে অমলের গাড়িতে উঠলো। অমল নতুন গাড়ি কিনেছে। অমল নিশ্চয়ই অবনীশের স্বরূপ জানে না।

পরদিন এলগিন রোডে অবনীশের বাড়িতে আমি হাজির হলুম। দরজা খুললো, অবনীশের শয়তানী কাজের যোগ্য সঙ্গিনী, তার স্ত্রী—স্বরূপা। স্বরূপার মোহিনী ভঙ্গি অগ্রাহ্য করে আমি অবনীশকে ডাকলুম এবং বিনা ভূমিকায় বললুম, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, লালবাজারের ডি সি ডি ডি আমার মেসোমশাই হন। আমি আপনার

এই বেআইনী জুয়োর আড্ডা এক্ষুণি ধরিয়ে দিতে পারি। লোক্যাল থানায় ঘুষ দিয়ে পার পেলেও লালবাজারকে এড়াতে পারবেন না। কিন্তু সে-সব আমি করবো না, একটি মাত্র শর্তে, আপনি অমল রায়ের সংসর্গ একেবারে ত্যাগ করবেন। তার ছায়াও মাড়াবেন না। সে এখানে আসতে চাইলেও তাকে বাধা দেবেন। মোট কথা অমল রায়কে কোনোদিন আমি এ বাড়িতে দেখতে চাই না। কি রাজী?

অবনীশ হতভম্ব হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, আচ্ছা রাজী। কিন্তু অমল রায় আপনার কে হয়?

—আমার অত্যন্ত নিকট আত্মীয় সে। কিন্তু আমি যে আপনার কাছে এসেছিলাম এ কথাও তাকে বলতে পারবেন না।

আমি নিজে কখনো বাজার করতে যাই না। দু'একদিন গিয়ে দেখেছি, আমি একেবারেই দরদাম করতে পারি না—আমায় সবাই ঠকায়। তবু হঠাৎ একদিন বাজারে যাবার শখ হলো। বাজারে অমলের সঙ্গে দেখা হলো। আশ্চর্য যোগাযোগ। অমলও নিশ্চয়ই কোনোদিন বাজার করে না। বাজারকরা টাইপই ও নয়। যে-লোক এক-একদিন এক এক দেশে থাকে—সে আজ ল্যান্সডাউন রোডের বাজারে এসেছে নিছক কৌতুকের বশেই নিশ্চয়ই। চাকরকে নিয়ে অমল খুব কেনাকাটি করছে। অমল যে প্রত্যেকটা জিনিসই কিনতে খুব ঠকছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, এবং বেশ মজা লাগলো। অলক্ষ্যে আমি ওর দিকে নজর রাখছিলুম। কাদা প্যাচপ্যাচ করছে বাজারে, অমলের পায়েও কাদা লেগেছে, ঘামে ভিজে গেছে পিঠ। একটুর জন্য আমি অমলকে হারিয়ে ফেলেছিলুম, হঠাৎ শুনতে পেলুম টম্যাটোর দোকানে কি একটা গোলমাল। তাকিয়ে দেখি সেখানে অমল, রাগে তার মুখখানি টকটকে লাল, অমল বেশ চিৎকার করে কথা বলছে। আমি সেদিকে এগিয়ে গেলুম। অমল একবার তরকারিওয়ালাকে বললো এক চড় মেরে তোমার দাঁত ভেঙে দেবো! অমল চড় মারার জন্য হাতও তুলেছে। আমি দারুণ আঘাত পেলুম—এই দৃশ্য দেখে। মনে মনে বললুম, ছি, ছি, অমল, এমন ব্যবহার তো তোমাকে মানায় না! তরকারিওয়ালাকে চড় মারাটা মোটেই রুচিসম্মত নয়—তার যতই দোষ থাক্, হয়তো অমল বেশী রাগের মাথাতেই—আমি গিয়ে অমলের পাশে দাঁড়ালুম, মৃদু স্বরে বললুম, অত মাথা গরম করবেন না। তাতে আপনারই—। অমল আমার দিকে তাকালো, চেনার ভাব দেখালো না, কিন্তু আমাকে একজন সাহায্যকারী হিসেবে ভেবে নিয়ে বললো, বুঝলেন তো, আজকাল এই সব রাস্কেলদের এমন বাড় বেড়েছে—যা মুখে আসবে তাই বলবে। আমি আরও আঘাত পেলুম, তরকারিওয়ালারও একটা আত্মসম্মান আছে, সেখানে আঘাত দেওয়া তো অমলের উচিত নয়। আমি কথায় কথায় ভুলিয়ে অমলকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম। এসব ছোটখাটো ব্যাপার ধর্তব্য নয় অবশ্য, অমলের তো এসবের অভ্যেস নেই—হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিল। ইস্, তরকারিওয়ালা উল্টে যদি ওকে একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে বসতো!

অন্ধ ভিখারীকে পেরিয়ে গিয়েও মনীষা আবার ফিরে আসে, তারপর ব্যাগ খুলে মনীষা যখন ঝুঁকে তাকে পয়সা দেয়—তখন মনে হয়, মনীষা শুধু ওকে পয়সাই দিচ্ছে না, তার সঙ্গে নিজের আত্মার একটা টুকরোও দিয়ে দেয়। মনীষা, তোমার এত বেশী আছে যে অমলের ছোটখাটো দোষ তাতে সব ঢেকে যাবে। অমল দিন দিন আরও তোমার যোগ্য হয়ে উঠবে। আমি তো পারি নি, অমল পারবে।

অমলকে আমি চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করি। বাতাসের তরঙ্গে একটা চিন্তা সব সময় অমলের কাছে পাঠাবার চেষ্টা করি, অমল, তুমি মনীষার প্রেমিক, এই বিরাট দায়িত্বের কথা মনে রেখো। তোমাকে নিচে নামলে চলবে না।

অফিসের কাজে দমদমের ফ্যাক্টরিতে যেতে হলো দুপুরবেলা। মিঃ চোপরা দিল্লী ফিরে যাবার পরই আমার একটা লিফ্‌ট হয়েছে। অফিস থেকে আমাকে গাড়ি দেবারও প্রস্তাব উঠেছে। শিগগিরই যার গাড়ি হবে তাকে এখন ট্রাম বাসে চড়লে মানায় না। মিশন রো থেকেই ট্যাক্সি নিয়ে দমদম যাচ্ছিলাম, দমদম রোডের ওপর একটা বেশ বড় ভিড় চোখে পড়লো। একটা মোটরগাড়ি ঘিরে উত্তেজিত জনতা, আমি সেটা পাশ কাটিয়েই

যাবো ভাবছিলাম—হঠাৎ হালকা নীল রঙের গাড়িটা দেখে কি রকম সন্দেহ হলো—অমলের গাড়ি না? তাইতো, ঐতো ভিড় ছাড়িয়ে অমলের মাথা দেখা যাচ্ছে। পাইলটের পোশাকে —অমল এয়ারপোর্ট থেকে ফিরছে। কি সর্বনাশ! অমলের গাড়ি কোনো লোককে চাপা দিয়েছে নাকি? তা হলে তো ওরা অমলকে মেরে ফেলবে। আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বললুম, রোক্কে রেক্কে! ঘ্যাচ্ করে ট্যাক্সি ব্রেক কষতেই আমি দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে এলাম। চেঁচিয়ে উঠলাম, অমল, অমল।

আমাকে দেখে অমল যেন ভরসা পেল, ভিড়ের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে কি যেন বললো। অমলের টাইয়ের গিঁট আলগা, মাথার চুল এলোমেলো। অমলের গাড়িতে একটি যুবতী বসে আছে, মনীষা নয়। যুবতীটির সাজ পোশাকে এমন একটা কৃত্রিম সৌন্দর্য আছে যে এক পলক দেখলেই বোঝা যায় এয়ার হোস্টেস। এবার হোস্টেসটিকে অমল নিশ্চয়ই বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছিল।

কোনো লোক চাপা পড়ে নি, চাপা পড়েছে একটা ছাগল। ছাগলটা থ্যাঁতলানো অবস্থায় পড়ে আছে রাস্তার মাঝখানে টকটকে লাল রক্ত। লোকগুলো কিন্তু মানুষ চাপা পড়ার মতনই উত্তেজিত। অমল চেঁচিয়ে বললো, যার ছাগল সে সামলাতে পারে নি কেন? রাস্তাটা কি ছাগল চরানোর জায়গা? ক্রুদ্ধ জনতা চেঁচিয়ে বললো, অত তেজ দেখাবেন না, মোটরগাড়ি আছে বলে ভাবে। ফুটানি দে না শালাকে দু'ঘা।

অমল আকাশে উড়ে বেড়ায়—এইসব মানুষ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা নেই। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে অমলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, না, না, আমাদের আর একটু সাবধান হওয়া উচিত। আমরা এই ছাগলটার দাম যদি দিই—

'আমরা' কথাটা আমি ইচ্ছে করেই বললুম। কেন না, ছাগলটার দাম চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা হবে নিশ্চয়ই—অমলের কাছে দৈবাৎ সে টাকা নাও থাকতে পারে। আমার কাছে দৈবাৎ আছে। টাকাটা আমি তৎক্ষণাৎ বার করে দিতে পারতুম। কিন্তু দিলুম না, তাতে নিশ্চয় অমলের অহংকারে লাগবে। আগে দরদাম ঠিক হোক, তারপর না হয় আমি অমলকে ধার দেবার প্রস্তাব করবো। আমাকে না-চেনার ভান করলে কি হয়, অমল আমাকে ঠিকই চেনে, অন্তত এক পাড়ার লোক হিসেবে চেনে। অমল রুক্ষ গলায় বললো, কেন দাম দেবো কেন? আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে আসছিলাম, হর্ন দিয়েছি।

—ইঃ উনি হর্ন দিয়েছেন। ছাগলকে হর্ন দিয়েছেন!

—ক্যারদানি কত! পাশে মেয়েছেলে নিয়ে, দিন রাত্তির জ্ঞান নেই!

আমি অমলের বাহুতে চাপ দিয়ে অনুনয়ের সুরে বললুম, না, না, দাম দেওয়াই উচিত আমাদের, যার ছাগল তার তো ক্ষতি হয়েছে ঠিকই! কত দাম; ছাগলটার কত দাম বলুন?

ছাগলের মালিক কাছেই ছিল, সে বললো, একশো টাকা।

অমল বললো, একশো টাকা। একটা ছাগলের দাম একশো টাকা? অন্যায় জুলুম করে—

—তবু তো কম করে বলেছি! অন্তত আঠারো কেজি মাংস হবে, বারাসতের হাটে বেচলে।

আমি অমলকে মৃদু স্বরে জানালুম, আমার কাছে টাকা আছে। অমল রুক্ষভাবে বললো, টাকা থাকা না-থাকার প্রশ্ন নয়। জুলুম করে এরা—

লোকগুলো এবার আরও গরম হয়ে উঠেছে। ক্রমশ আমাদের গা ঘেঁষে আসছে! শুরু হয়েছে গালাগালি। এসব সময়ে কি সাংঘাতিক কাণ্ড হয় অমলের ধারণা নেই। ওরা আমাদের সবাইকে মেরে গাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। অমলও এবার যেন একটু বিচলিত হয়ে বললো, ঠিক আছে, কত টাকা দিতে হবে? কত টাকা? আমি বললুম, দাঁড়ান, আপনি চুপ করুন, আমি দরদাম ঠিক করছি।

ভিড়ের দু' তিনজন লোক এক সঙ্গে কথা বলছিল, আমি তাদের উত্তর দিচ্ছিলাম, হঠাৎ দারুণ চিৎকার শুনলাম, পালাচ্ছে, পালাচ্ছে শালা—এই শালাকে ছাড়িস না, ধর্ ধর্।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। হঠাৎ একটা সুযোগে অমল গাড়িতে

উঠে স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। ভিড় ভেদ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল, আমার দিকে তাকালোও না—এক দল লোক হইহই করে ছুটে গেল সেই গাড়ির দিকে, আর একদল আমার কলার চেপে ধরলো। অমলের গাড়িকে আর ধরা গেল না—আমি দু' বার শুধু অমল, অমল বলে চেঁচিয়েই হঠাৎ চুপ করে গেলুম।

কিন্তু মনে মনে আমি কাতরভাবে আর্তনাদ করতে লাগলুম, অমল, তুমি যেও না, তুমি যেও না! এ কাপুরুষতা তোমাকে মানায় না। তুমি মনীষার প্রেমিক, তোমার মধ্যেও এই দীনতা দেখলে আমি তা সহ্য করবো কি করে? অমল, তুমি মনীষার এমন অপমান করো না! তা হলে যে প্রমাণ হয়ে যাবে, এ পৃথিবীতে আর একজনও যোগ্য প্রেমিক নেই মনীষার।

একা সন্ধেবেলা

অমন অকস্মাৎ ব্রেক কষায় আমার কপাল ঠুকে গেল। আমি বুঝতে পারলুম না লোকটা আত্মহত্যা করতে চায় কিনা। ড্রাইভার কুশলী হাতে গাড়িটা থামিয়ে আরও দক্ষতার সঙ্গে গালাগালির ঝর্ণা বইয়ে দিল। লোকটা এগিয়ে এলো দরজার কাছে, রোগা, লম্বা, সারা ফর্সা মুখে ঘাম, ঝুঁকে নিচু হয়ে কি রকম যেন গলায় বলল, আমার উপায় ছিল না, উপায় ছিল না, আধ ঘণ্টা ধরে ট্যাক্সি খুঁজছি, আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে হবে—দয়া করে—

আমি ও ট্যাক্সি ড্রাইভার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম—কেন না—লোকটার কথা বলার মধ্যে সাপ খেলানো বাঁশীর সুর ছিল। লোকটার দুটো চোখ যেন একশোটা চোখ, আমার দিকে সর্বস্বভাবে তাকিয়ে আছে, লোকটা আবার আরম্ভ করে, আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে হবে, আমি আর পারছি না দাঁড়াতে, দয়া করে—। 'দয়া' কথাটা এমন ঘিনঘিনে এবং অস্বস্তিকর লাগে যে সঙ্গে সঙ্গে সংস্রব ছাড়তে ইচ্ছে হয়, আমি বলি, ঠিক আছে, আমি নেমে যাচ্ছি। ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, সে বাঙালী ছিল—না, না, আপনি বসুন, তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে, আপনারা ক'জন?

লোকটা এ কথার কোনো উত্তর না দিয়েই দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ে। একটু পাশের গলিতে একবার চলুন। আমি লোকটার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নাগরিক গাম্ভীর্য নিয়ে বসে থাকি। বাঁ-দিকে মোড় ঘুরিয়ে বেশীদূরে যেতে হয় না, একটা সাদা তিনতলা, একটাও গাড়িবারান্দা বা ব্যালকনি নেই, তাই বিশ্রী, বাড়ির সামনে গাড়িটাকে থামানো হল। এক মিনিট, বলেই লোকটা দ্রুত ভিতরে চলে যায়, মনে হল বাড়িটা কোনো প্রাইভেট ক্লিনিক, অনেক বড় সাইনবোর্ড এবং বহু ডিগ্রীধারী ডাক্তারের নাম। আপনার শুধু শুধু দেরি হচ্ছে, ড্রাইভার আমাকে বলে, আপনার অসুবিধে থাকলে এখনো চলে যেতে পারি। থাক্, এই ধরনের একটা কথা আমি মুখে উচ্চারণ না করে তাকে ভঙ্গি দিয়ে বোঝাই। সাদা পোশাক পরা দু'জন লোক একটা স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে এল। পিছনে সেই লোকটা ও একটি দুঃখিত চেহারার ডাক্তার। গাঢ় নীল রঙে রুপোলী তারা বসানো শাড়িপরা মহিলাকে নিয়ে এল ওরা, ততক্ষণে আমি উঠে এসে ড্রাইভারের পাশে বসেছি, আমি একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখলুম। সেই একবারই আমি দেখেছি ঐ মহিলার মুখ এ জীবনে, আর একবারও পিছন ফিরে তাকাই নি, কিন্তু সেই মুখ গেঁথে গেল আমার দু'চোখের নরম জায়গায়, এক ঝলক দেখেই আমি সব বুঝতে পেরেছিলুম, একি দুর্ঘটনা আজ আমার মনে মনে বললুম। আকাশের দিকে ফেরানো সেই নিস্পন্দ মুখ ভোলা যায় না, ভুলতে পারিনি আমি, সেই জন্যই আজ একথা লিখছি, যদি সেই মুখের ছবি অন্য কারুকে দিয়ে আমি পেতে পারি বিস্মরণ।

ড্রাইভারটি নেমে দাঁড়িয়েছে, কোমরে হাত দিয়ে ব্যাপারটাকে শুঁকে দেখার মতো বলল, অজ্ঞান হয়ে গেছে? একটা হাত ঝুলছে তুলে দিন না! বাহক ক'জনের অন্যতম জানাল, মর গিয়া।

—মরে গেছে? এঃ—

লোকটি ডক্তারকে জিজ্ঞেস করছে, ঐ রক্তটা বিক্রি হবে? যখন দরকার ছিল, তখন কিনতে পারিনি, টাকা ছিল না। শেষ পর্যন্ত টাকা ধার করে ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে যখন কিনে আনলুম, তখন কাজে লাগল না।

দেখি! সার্টিফিকেটটা রাখুন!

লোকটির সঙ্গে ড্রাইভারের বচসা লেগে গেল। না, না, এসব পারবো না...দয়া করুন, দয়া করুন, লোকটা আমার জানলার কাছে এসে হাত জোড় করে বলল, আপনি একটু দয়া করুন। যতবার 'দয়া' শুনছিলুম, আমার শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছিল। লোকটি বারবার ড্রাইভার ও অপরিচিত একজনের কাছে দয়া চাইছে, ওকি স্ত্রীর মৃত্যুর আগের মুহূর্তে ঈশ্বরের কাছে দয়া চেয়েছিল? মনে হয় না, কারণ ওকে দেখলে মনে হয়, অতবড় আকাঙ্ক্ষা ওর নেই, অতখানি সাহস। আমি চোখ বন্ধ করে ও কানে কুলুপ লাগিয়ে রইলুম। একটু বাদে বুঝতে পারলুম, কোনো একটা মিটমাট হয়েছে, মহিলার শরীর পিছনে শোয়ানো হল, দীর্ঘকায়া, স্বাস্থ্যবতী সেই প্রাণহীনা। স্বামী একপাশে বসে মাথাটা তুলে নিল কোলের ওপর। আমি চুপ করে বসেই রইলুম। আমার সামনে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে একখানি মুখ, দু' একটা চুল উড়ে পড়ছে, খুব ফর্সা নয়, একটাও যন্ত্রণার রেখা নেই, প্রতিমার মতো স্ত্রী, কেউ চন্দন দেয় নি কপালে, চোখ দুটি অপলক খোলা, আর কোনোদিন পলক পড়বে না একথা চোখে লেখা নেই। ড্রাইভার বলল, অন্তত একটা অ্যাম্বুলেন্স তো ডকতে পারতেন।

—এ কাজে পাওয়া যায় না। চেষ্টা করেছিলুম। আমার মা অন্ধ তিনি আসতে পারেন নি—লোকটার গলার আওয়াজ বাষ্পময় কিন্তু অস্পষ্ট নয়—মা কান্নাকাটি করছেন, তাকে শেষ দেখা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি!

'অন্ধ মাকে শেষ দেখাতে' কথাটার মধ্যে খুবই সরলতা ছিল, কিন্তু কথাটার অর্থহীনতা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল সে। আমার প্রশ্ন দোষ, আমি মনে মনে কথা বলি—নইলে লোকটির সঙ্গে যদি দু'একটা কথা বলতুম, যদি গলা ও জিভ দ্রুত কাঁপিয়ে দু'একবার আহা, আহা ও দ্রুত ভারী নিঃশ্বাস ফেলা যেত, তাহলে আমি সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারতুম, কিন্তু তার বদলে আমি মনে মনে অন্তত চারটি ছোট গল্প বা একাঙ্ক ভেবে নিলুম ও বিষয়ে, খানিকটা যেন রহস্যের গন্ধও নাকে আসতে লাগল— এবং যদি কোনো রহস্য বা পাপ থাকে এই মৃত্যুতে তাহলে আমি যে বিপদে পড়ব বা কমলার সঙ্গে আজ সন্ধেবেলা দেখা হবে না—এই রকম ছোট ছোট ভয় হতে লাগল। তবু আমি কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে পারিনি, মনে হল, কারণ যাই হোক, যে-কোনো প্রশ্নই ঐ মহিলার মৃত্যুকে অপমান করবে। মহিলা না মেয়েটি? যদি বিয়ে না হতো, তবে অনায়াসেই ও একবার দেখা মুখটিকে বেণী দোলানো, বুকে ধরা বই ও খাতা, বাস স্টপের যে কোনো মেয়ের মতো ভাবা যেত—আঠারো কি উনিশ, কিন্তু মৃত্যু ঐ মুখকে অনেক গম্ভীর ও উদাসীন করেছে। পকেটে হাত দিয়েও হঠাৎ আমার মনে হল সিগারেট খাওয়াটা অন্যায় এখন। লোকটার সঙ্গে ট্যাক্সি ড্রাইভারের কি যেন কথা হচ্ছিল, আমি শুনিনি, গাড়ি তখন চলছিল আমি বাইরের দিকে চেয়েছিলুম।

হঠাৎ একটা পাখির বাচ্চার মত চিঁচি আওয়াজে আমি চমকে আর একটু হলে পিছন ফিরে তাকাতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলুম, কারণ আবার আমি ঐ মহিলার মুখ দেখতে চাইনি, যদিও মুখখানি গাড়ির উইন্ড স্ক্রিন জুড়ে ভাসছিল। লোকটির দু হাতে কতকগুলি জড়ো করা কাপড় ছিল, আমি আগে ভেবেছিলুম, স্ত্রীর পরিত্যক্ত ভূষণাদি, এবার বুঝলুম, একমাত্র পরিত্যক্ত ভূষণ, একটি শিশু। তখনই মনে পড়ল, 'আপনারা ক'জন?'—ট্যাক্সিওয়ালার এই প্রশ্নে লোকটা কোনো উত্তর দেয়নি, ক'জন ও জানে না, মৃত সদ্যোজাত ও শোকার্ত, এই তিনজন মিলে একটি সম্পূর্ণ ইউনিট বোধহয় ভেবেছে। মৃত্যু নিয়ে কোনো কথা বলতে পারিনি, ইচ্ছে হল, প্রাণ নিয়ে কোনো কথা নিশ্চয়ই বলা যাবে। আমি মনে মনে একবার রিহার্সাল দিয়ে তারপর উচ্চারণ করলুম, বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করুন। ওই হবে আপনার একমাত্র সান্ত্বনা। ভদ্রলোক কোনো উত্তর দিলেন না। হয়তো আমার কথাটা খুবই বোকার মত অপ্রাসঙ্গিক হয়েছিল,

অথবা এর আগে দশবার শুনেছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ ও তার মধ্যে শিশুটির চিঁচিঁ ও ট্যাঁট্যাঁ। কিন্তু একটু পরেই লোকটি যা বলল, তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। পিছন থেকে আমাকে ছুরি মারার মতো নৃশংস—ও মরার আগে কি বলেছিল জানেন? বলেছিল, ভগবান, যদি আর একটু বছর অন্তত বাঁচতুম—

এ কথায় আমি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেলুম, আবার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, গলা বন্ধ হয়ে এল, কপাল ও চোখের শিরা ফেটে কান্না আসতে লাগল। আমি দু' হাতে মাথা চেপে মুখ নিচু করলুম। এক বছর, মোটে এক বছর চেয়েছিল। কি হতো এক বছরে, কি ছিল ওর বাসনা। অন্তত আর এক বছর ঐ কচি মেয়েটা আর এক বছর চেয়েছিল! হয়ত কাপড় কিনে রেখেছে—জানলার পর্দা সেলাই করা হয় নি, বেল ফুলের চারা লাগিয়েছিল—প্রথম ফুলটা দেখে যেতে পারল না—আর কি, এক বছরে আর কি কি, বাচ্চাটাকে এক বছরের স্তন্য এক বছরের কান্না ও ভালোবাসা ঐ চিৎ করে শোয়ানো মুখটি চেয়েছিল, হয়তো চেয়েছিল আরও কয়েকবার উপুড় হতে ও পাশ ফিরতে, এক বছর অন্তত এক বছর...

...আমার দইটা একটু ধরবেন, দইটা একটু ধরবেন, দইটা একটু ধরবেন, আমার...। মফস্বলের শেষ বাসে ফিরছিলাম। আমি ভাগ্যবান, উঠতে পেরেছিলাম ভেতরে—তারপরও কুড়ি কি পঁচিশজন লোক পাদানির বাইরে শূন্যে দাঁড়িয়েছিল, এক একটা ঝাঁকুনিতে লোকগুলি কোথায় উঠছিল ও পড়ছিল জানি না। দরজার তিন হাত বাইরে থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, আমার দইটা একটু ধরবেন, এক হাতে বড় মুশকিল' একটা হাত জানলা দিয়ে এগিয়ে এল, পাতলা কাগজে মোড়া একটা একপো দই-এর খুরি—সাবধান, প্রাণটা বাঁচিয়ে—কে যেন বলল, আমি খুরিটা ধরলুম। দেখবেন প্রাণটা বাঁচিয়ে তারপর দই বাঁচাবেন, কে যেন বলল। আর আমাদের আর প্রাণের দাম—দই-এর মালিকের উদাসীন গলা ভেসে আসে। এর বদলে হেঁটে যান না—। দশ মাইল দূরে বাড়ি তাহলে আর ফিরতে হবে না। এত ভিড় নিজের জায়গা নেই তবু দই নিয়ে ওঠার শখ আছে, আর একজন বলল। কোনোরকমে বাড়ি ফিরে দই দিয়ে চারটি ভাত খাবো—বেঁচে থাকার সুখ এইটুকু—লোকটি আবার বলে, আমি চুপ করে ছিলুম। তারপর বেশীক্ষণ কাটেনি। পাঁচ কি দশ মিনিট। আমার হাতে দইয়ের খুরি। লোকটা বাইরে ঝুলছে ও অনবরত কথা বলে যাচ্ছে। আমি বললুম, নামবার সময় দইটা নিতে ভুলবেন না যেন। লোকটি বললো, সে আপনি ভাববেন না। তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়েছিল বাসটা। শব্দ নানা রকমের অদ্ভুত, খুবই চিৎকার মানুষের—একটু দূরে বাসটা থেমে যায়। শত শত কণ্ঠের বিউগল বাজিয়ে বহু লোক নেমে গেল—শুধু যারা বসার জায়গা পেয়েছিল তারা ছাড়া, আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলুম।

—শেষ হয়ে গেছে, খতম হয়ে গেছে।

—একেবারে সঙ্গে সঙ্গে স্পট ডেথ!

—উঃ দেখা যায় না, আমারও এরকম হতে পারতো।

—মার শালা ড্রাইভারকে!

—নিয়তি! একেবারে চাকার তলায় টেনে নিয়েছে।

আমি দই-এর ভাঁড় হাতে দাঁড়িয়েছিলাম। নিজেকে বিষম নিঃসঙ্গ বোধ হতে লাগল। সেই লোকটাই। নেমে গিয়ে লোকটাকে দেখব এমন সাহস নেই। দই দিয়ে মেখে চারটি ভাত খাবে বলেছিল লোকটা। বেঁচে থাকার সুখ।

—মাথার ঘিলু বেরিয়ে একেবারে দই হয়ে গেছে।

এমন অবসন্ন লাগলো আমার! আমার কিছু করার ছিল না, তবু নিজেকে মনে হতে লাগল চোর ও খুনী। আমি আস্তে আস্তে হাত থেকে ওর বেঁচে থাকার সুখটুকু মাটিতে নামিয়ে রেখে চলে গিয়েছিলুম! মনে হয়েছিল, দশ মাইল দূরে ওর বাড়িতে ঢাকা-ভাতের থালার ওপর লোকটার বাসনা এখনো ঘুরছে।

বাচ্চাটার ট্যাঁট্যাঁ থামে না। এসে গেছি, বলতেই ট্যাক্সি দাঁড়ালো। বহু বুড়োবুড়ি ও পাড়ার ছেলে-ছোকরার ভিড় হয়। মহিলাকে শোয়ানো অবস্থাতেই নামানো হল হাঁটু ও কাঁধ না মুড়ে, আমি তখনও পিছন ফিরে তাকাইনি, আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে, লোকটা তখনও ট্যাক্সিতে বসে থাকে। ও নিজের শোকে অভিভূত, না আমাকে পিছন থেকে ছুরি মারার ফল দেখছে বুঝতে পারি না। অন্তত আর এক বছর......আমি সহ্য করতে পারি না, আমার চোখ দপদপ করতে থাকে। কে একজন মুখ বাড়িয়ে কি বলতেই লোকটা নেমে পড়ে—যাবার সময় আমার সঙ্গে ভদ্রতা করে যায়, আপনার কষ্ট হল, কি বলে যে......। লোকটার উপর অসম্ভব রাগে আমার শরীর জ্বলে ওঠে, এমন ছদ্মবেশী শয়তান কখনো দেখিনি মনে হয়। স্ত্রীর মৃত্যুতেও লোকটা রাগ করতে পারছে না, কার জন্য, কার প্রতি অভিযোগ করবে—এই কি ওর ভদ্রতার সময়? ওর পক্ষে চরম ভদ্রতা হতো যদি ও হুহু করে কাঁদত, শব্দ করে চিৎকার করে কাঁদত। চৌরঙ্গীতে ট্যাক্সি থামিয়ে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে কেঁদে উঠত, বলত, আমি যাকে ভালোবাসি তার মৃত্যু হয়েছে, সে আর একটা বছর অন্তত বেঁচে থাকতে চেয়েছিল—হাজার হাজার মানুষ যাদের মৃত্যুবোধ নেই, যারা ভালোবাসায় ভুলে আছে তাদের বুকের মধ্যে কান্না ঢুকিয়ে দিত যদি। তার বদলে আমাকে একা—

—আপনি খুব ইয়ে হয়ে পড়েছেন স্যার, চলুন আপনাকে এবার পৌঁছে দি, টালীগঞ্জ যাবেন তো? ট্যাক্সিওয়ালা বলল, আপনাদের তো অভ্যাস নেই, আমরা কত রকম দেখছি। সয়ে গেছে। একদিন সারাদিন যদি ট্যাক্সিতে ঘুরতেন, দেখতেন কলকাতা এক তাজ্জব জায়গা। আমাদের কতরকম এক্সপিরিয়েন্স হয় স্যার! সেবার আরেকবার হল কি, ওঃ, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয় মশাই, আমি তখন—

যাক্, আমাকে আর ওসব গল্প বলবেন না। আমার ভাল লাগে না।

—শুনুন না, ভয়ের কিছু নেই, সেবারে গত বছরে জানুয়ারী মাসে, না জানুয়ারী না তখন গরম পড়ে গেছে, মার্চ মাসে, হ্যাঁ, ষোলই মার্চ বা তিরিশ হবে তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা, আমি তখন ডানলপ ব্রীজ থেকে ফিরছি, ফুল স্পীডে চালিয়ে..

মা! মা! মা! অভিজিৎ, শানু, কানু, ওঃ, ওঃ, খুকু, মা, মা—সে ভয় করেছিলুম, আমার মনে পড়ে গেল, মনে করব না ভেবেছিলুম, এর মধ্যে দু' একবার শব্দগুলি চাকতে ঘুরে গিয়েছিল, এবার সম্পূর্ণ ফিরে এল, ট্যাক্সিওয়ালার একটা কথাও আমার কানে গেল না। আমার দাদার কথা মনে পড়ল।

মা, মা, অভিজিৎ, ওঃ, ওঃ, খুকু—মাঝরাত্তিরে দাদা মশারি ছিঁড়ে চিৎকার করে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে এমনই অসম্ভব ভয়ার্ত চিৎকার যে আমাদের সকলের ঘুম ভাঙতে এক মুহূর্তও দেরি হয় নি। সবচেয়ে আগে মায়ের ঘুম ভেঙে ছিল, মা পাখির মত ঝাঁপিয়ে পড়ে দাদাকে ধরল, কি হল, অমু—অমু। দাদা সারা ঘরময় ছুটোছুটি করছিল - আমার অসম্ভব পেটে ব্যথা হচ্ছে মা, আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে! দাদা ছুটে গেল দরজার কাছে, ফিরে এসে পরমুহূর্তে আলমারিটা ধরে দাঁড়াল, পরে বিছানাতে শুতে গিয়েই আবার উঠে দাঁড়াল—মরে গেলাম মা, শেষ হয়ে গেল, উঃ। মা ছুটে গিয়ে দাদার মাথাটা বুকে চেপে ধরল। কতদিন পর দাদার মাথা মায়ের বুকে—বোধহয় কুড়ি বছর। একটু শান্ত হতে না হতেই দাদা আবার সমস্ত শরীর বেঁকিয়ে ছুটে গেল ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা, পায়ের শব্দ হতে লাগল, প্রচণ্ড হাতের ধাক্কায় একটা র‍্যাকেট উল্টে গেল। মা চেঁচিয়ে উঠলেন, ডাক্তার—ডাক্তার—! তারপর বললেন, একটু নুন জল খা। আমি রান্নাঘরে ছুটে গেলাম নুন আনতে, মা আমার পিছনে পিছনে, মা বলল আমাকে, আমার বুক কাঁপছে, একি হল। আমি বললুম, কোনো ভয় নেই।—না, না, মা বলল, আমার বুক কাঁপছে। দাদা কাল ভোরবেলা দিল্লী যাবে ইন্টারভিউ দিতে, আমরা সকাল সকাল শুয়েছিলাম, খাওয়ার সময়ও দাদা কত গল্প করেছে। নুন এনে দাদার হাতে দিলাম, জল—জল, দাদা এক জীবনের তৃষ্ণা নিয়ে যেন হাহাকার করে উঠল, নিজেই ছুটে গিয়ে

কুঁজোটা তুলে নিল, কুঁজোটা উপুড় করে গলায় ঢালছে, আমি দেখলাম দাদার হাত কাঁপছে—দাদা আমাদের মধ্যে ছিল সবচেয়ে বলশালী, খুব গুছোনো স্বভাবের ছিল, রোজ ব্যায়াম করত, কাল দিল্লী যাবে বলে সাবান টুথপেস্ট, তোয়ালে কিনে এনে গুছিয়ে রেখেছে! দাদার হাত থেকে কুঁজোটা পড়ে ভেঙে গেল, দাদা আরও ছটফট করতে লাগল—মরে গেলুম—মা, একি হল। মা, অভিজিৎ, অভিজিৎ ওঃ মা! আমি—মা আর খুকু তিনজনে মিলেও দাদাকে ধরে রাখতে পারলুম না। দাদা আহত সিংহের মতো সারা ঘর দাপাদাপি করতে লাগল, যেন দাদাকে অশরীরী কিছু ভর করেছে। একবার শুতে যাচ্ছে, আবার উঠেই ছুটছে, দরজা ধরতে গিয়ে ফিরে আসছে, মায়ের কোলে মুখ লুকোতে গিয়ে ছটফট করে চলে যাচ্ছে শেষরাতে খাটে শুতে গিয়ে খাটের কোণায় প্রচণ্ডভাবে মাথা ঠুকে গেল, দাদা মাটিতে পড়ে নিস্পন্দ হয়ে গেল, কপাল ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। জল আর স্মেলিং সল্ট, মা অমু—অমু—মা ডাকতে লাগলেন।

শানু ও কানু গিয়েছিল ডাক্তারকে ডাকতে, ছুটে গিয়ে ডাকাতের মত দুমদুম করে দরজা ধাক্কা দিয়ে ডাক্তারকে তুলিয়ে দুজনে দু'হাত ধরে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে। ডাক্তার যখন ঢুকলেন, তখনও দাদার জ্ঞান ফেরেনি, নাক ও ঠোঁট দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। ডাক্তার এসে হাতটা ছুঁয়েই বললেন, আর উপায় নেই। তবে আর একটু আগে এলেও বোধ হয় কোনো লাভ হত না।

সকালবেলা দিল্লীর ট্রেন ধরতে হবে বলে শোবার সময় দাদা মাকে বলে রেখেছিল খুব ভোরে ডেকে দিতে। তার বদলে নিজেই মাঝরাত্তিরে উঠে দাদা অন্য কোথায় চলে গেল। দাদার মৃত্যুতে সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল, ওর অভিজিৎ অভিজিৎ বলে ডাকা। অভিজিৎ নামে কাউকে আমরা চিনি না, দাদার বন্ধুদের মধ্যেও ও নামে কেউ নেই। অন্তত মৃত্যুর আগে নাম ধরে ডাকবে এমন কোনো লোকের কথা আমরা শুনিনি। সবচেয়ে আশ্চর্য হঠাৎ দাদার মৃত্যু। অমন স্বাস্থ্যবান ও সাবধানী ছিল দাদা, মাত্র মিনিট দশেক নোটিস পেয়েছিল মৃত্যুর। পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল, সেদিন বিকেল বেলা অতি সাবধানী দাদা একটা ডাক্তারখানা থেকে কলেরার ইঞ্জেকশন নিয়েছিল, সেই ইঞ্জেকশনে ভেজাল ছিল সম্ভবত সেইটাই দাদার মৃত্যুর কারণ।

দিল্লী যাবার জন্য কেনা জিনিসপত্র দাদার আলাদা করেই রাখা ছিল অনেকদিন। একদিন অন্যমনস্কভাবে আমি সেই টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজছিলাম বাথরুমে, হঠাৎ যেন আমার কিরকম অন্যরকম লাগল, আমার মাথার মধ্যে যেন দিল্লী দিল্লী এই শব্দের ঢেউ হাল্কাভাবে বয়ে গেল, আমি লক্ষ্য করলুম, ব্রাশটা আমি খুব সাবধানে ওপরে ও নিচে সমভাবে চালাচ্ছি, দাদার এরকম স্বভাব ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে একটা শিহরণ হল। হঠাৎ আমার মনে হল, এই টুথপেস্টের টিউবের মধ্যে দাদার অসম্পূর্ণ বাসনা ঘুমিয়ে আছে। মানুষ মরে, কিন্তু বাসনা মরে না, আমার মনে হল, সঙ্গে সঙ্গে সেদিন আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম।

—তারপর তিন মাস হাসপাতালে পড়ে ছিলাম, এই দেখুন এখনো কাটা দাগ আছে। ড্রাইভার তখনও গল্প চালিয়ে যাচ্ছিল, আমি ওর কাটা দাগের দিকে না তাকিয়ে চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। তারপর বললাম, থামিয়ে দিন, আমি এখানে নামব।

—টালীগঞ্জ যাবেন না?

—না।

নেমে, ক্যাথিড্রালের পাশের রেলিং ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। দাদার কথা মনে পড়লেই আমার নিজেরও পেটে একটা ব্যথা হয়। হয়তো ব্যথাটা কাল্পনিক, কিন্তু এক এক সময় এমন প্রবল হয় যে, দুটো ট্যাবলেট না খেলে কমে না। এখন অবশ্য ব্যথাটা চট করে কমে এল, কালো সন্ধ্যে হয়ে আসা আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টি হবে কি হবে না আমি অন্যমনস্কভাবে ভেবেছিলুম। রাস্তায় মানুষের অতিশয় হৈচৈ, ট্রাম ও বাসের শব্দ, লাল ও সবুজ আলোর শব্দ, অসম্ভব গর্জন করে একটা জেট প্লেন উড়ে গেল, সন্ধেবেলা এমনভাবে দাঁড়িয়ে আউটরাম ঘাট থেকে জাহাজের গম্ভীর ডাকও আমি আগে কখনো শুনিনি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে আমার বেশ ভালো লাগল, এ ফুটপাথ দিয়ে

লোক হাঁটে না, আমি প্রায় একা ছিলুম; আস্তে আস্তে, খুব গোপনে, চেতনার অগোচরে একটা অন্যরকম ব্যাপার হতে লাগল, খানিকটা বাদে আমি টের পেলুম। সব শব্দগুলো এক হয়ে মিশে আসছে। ট্রাম বাসের শব্দ, জনকণ্ঠ, প্লেন ও জাহাজের ডাক মিশে গিয়ে একটা সম্পূর্ণ আলাদা আওয়াজ উঠছে। এ আওয়াজ এ শব্দ আমার মৃত্যুর শব্দ মনে হল। মৃত্যুর শব্দ কি আমি জানি না, অথবা মৃত্যুর আগে কেউ এ-রকম শব্দ শোনে কিনা আমি জানি না—কিন্তু নিশ্চিত বিশ্বাস হল আমার, আমার মৃত্যুর শব্দ। মনে পড়ল, আমার কুষ্ঠিতে আছে অপঘাতে মৃত্যু। 'কুষ্ঠি' কথাটা খুব হাস্যকর আমি জানি, ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করা যায় না, ওসব ভুয়ো, মেলে না, কে না জানে। আমারও মেলে নি, ছিল দেশবিখ্যাত বিদ্বান হবো, মেলে নি, ছিল বিপুল ধন উপার্জন ও ব্যয় করব, মেলে নি, ছিল পরমা সুন্দরী রমণীর ভালোবাসা পাব, একেবারে মেলে নি কিন্তু জানি, নিশ্চিত, দৃঢ়ভাবে জানি, শেষটা মিলবে, অপঘাতে মৃত্যু ঠিক মিলবে। আমার মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে লেল্যান্ড, কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় পাখা ভেঙে পড়বে, কিংবা হঠাৎ আততায়ীর ছুরি, অথবা মাঠের মধ্যে বজ্রাঘাত অথবা সমস্ত আকাশ কালো করে অ্যাটম বম্ যা বিষবাষ্প, দেশসুদ্ধ লোক মরলেও আমার আলাদা মৃত্যুর আলাদা ভয়, আমি জানি মৃত্যু আমাকেও নোটিস দেবে না।

সেই সময় সমস্ত রাস্তা জুড়ে ভেসে উঠল একটা মেয়ের মুখ, আকাশের দিকে ফেরানো মুখ, যে মুখ মাত্র একবার আমি দেখেছি কিন্তু আজও ভুলতে পারিনি, আর যদি অন্তত আর একটা বছর বাঁচতে পারতুম!' এক বছর? এক বছর? অসম্ভব ঢের সময়, তিন মাস, এক মাস, একদিন, অন্তত একবেলা। কমপক্ষে আজকের সন্ধেটা বেঁচে থাকার বিষম ইচ্ছে হল আমার, একটা সন্ধে, কোথায় গেলে বাঁচব, টালীগঞ্জে নমলার কাছে, না, মনে পড়ল কোথাও আমার বন্ধুবান্ধবরা বিস্মৃতি নিয়ে হৈ-হল্লা, বেলেল্লা করছে, ইচ্ছে হল সেখানে গিয়ে বাঁচি, একটা সন্ধে বেঁচে থাকার লোভে আমি বন্ধুদের উদ্দেশ্যে ছুটতে লাগলাম, রাস্তা পেরিয়ে ট্র্যাফিক লাইটের কথা ভুলে গিয়ে।

মধ্যবিত্ত

সকালবেলার দুধটা ও-বাড়ির ঝি এনে দেয়। অত ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না শুভেন্দুর। আগে রেবা নিজেই যেত, ছেলেমেয়েদের হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে বোতল দুটো হাতে নিয়ে ফিরতো। কিন্তু ছেলেমেয়ে নিয়ে রেবা রোজ রোজ দুধের লাইনে দাঁড়াবে—এটাও শুভেন্দুর পছন্দ নয়। অথচ আপত্তি তোলারও উপায় নেই, তা হলেই রেবা ঝংকার দিয়ে উঠবে, অতই যদি তোমার ইয়ে তবে দুটো ঝি চাকর রেখে দাও না। চা মুখের কাছে ধরে না দিলে তো বিছানা ছেড়ে উঠতেও পারেন না বাবু!

ও-বাড়ির সাবিত্রী নিজেই একদিন বলেছিলেন, আমার ঝি তো রোজ যায়ই দুধ আনতে, তোমারটাও সে এনে দেবে, রেবা! ছেলেমেয়ের সংসার নিয়ে কি রোজ রোজ সকালে বেরুনো যায়!

শুভেন্দু বেঁচে গেছে, রেবাও খুশী। কিন্তু মাসের পর মাস এরকম উপকার তো নেওয়া যায় না। প্রতিদান হিসেবে শুভেন্দুও কিছু কিছু উপকার করে দেয়। ব্যাংকে চাল কিনতে যাবার সময় শুভেন্দু ও-বাড়িতে জিজ্ঞেস করে যায়, আপনার চাল লাগবে নাকি বৌদি? আমি তো যাচ্ছিই—। সাবিত্রী খুশী হয়ে বলে ওঠে, খুব ভালো হল—আমার জন্য আট-দশ কিলো আতপ চাল যদি পান আনবেন তো! আমার খুড়ি-শাশুড়ী এসে দিন পনেরো থাকবেন—আতপ চাল না পেলে মহাবিপদ হবে তখন। একই তো না শুচিবাই।

শহরতলির বাজার থেকে নিজেদের জন্য চার কিলো চাল কিনলো শুভেন্দু। বাসেই ফিরতো, কিন্তু সাবিত্রীর দশ কিলো চালের জন্য তাকে রিকশা নিতে হল। কিন্তু রিকশা ভাড়াটা আর সাবিত্রীর কাছ থেকে চেয়ে নিলো না।

মাঝে মাঝে ও-বাড়ির বাজারও করে দেয় শুভেন্দু। অজিতের প্রায়ই নাইট ডিউটি থাকে—তখন আর তার বাজার করার সময় থাকে না। একসঙ্গে দু'তিন দিনের বাজার করে রাখে। তাতে টাটকা মাছ খাওয়া হয় না। ডিম দিয়ে চালাতে হয়। ডিম আবার সাবিত্রীর পছন্দ নয়, ঝিকে বাজারেও পাঠাতে পারে না বিশ্বাস করে। বাজারের থলি হাতে শুভেন্দুকে যেতে দেখে একদিন সাবিত্রী জানলা দিয়ে ডেকে বলেছিল, ঠাকুরপো, বাজারে যাচ্ছেন? আমাদের জন্য কিছু টাটকা মাছ পেলে আনবেন তো! টাটকা পোনা পেলে আধ কিলো নিয়ে নেবেন। তারপর থেকে শুভেন্দু নিজেই প্রায়ই জিজ্ঞেস করে যায়।

একটা দেড় কিলোর আস্ত কাতলা মাছ কিনে ফেললো শুভেন্দু। আস্ত মাছ, তখনও কানকো নাড়াচ্ছে। কিন্তু মাসের বাইশ তারিখে এতটা মাছ শুধু নিজের কেনার বিলাসিতা করার উপায় তার নেই। সাবিত্রীদের জন্য আর অন্য মাছ কিনলো না—এটাই দু'জনে ভাগ করে নেবে ঠিক করলো। বাজার থেকে ফেরার পথে সাবিত্রীদের বাড়িই আগে পড়ে—শুভেন্দু অন্যমনস্কভাবে গলি দিয়ে ঘুরে আগে নিজের বাড়িতেই এল। রেবাকে বললো, মাছটাকে সমান দু'ভাগ করে দাও, সাবিত্রী বৌদিদের আদ্দেকটা দিয়ে আসি।

মাছ দেখে রেবা খুশী। কিন্তু ভাগ করা এক ঝামেলা। বঁটিটায় ভালো ধার নেই, তা ছাড়া, ল্যাজা মুড়োসুদ্ধু কি আর সমান সমান ভাগ করা যায়! রেবা খুঁত খুঁত করে। শুভেন্দু উদারভাবে হেসে বলে, সবগুলো টুকরো করে—তারপর গুণে গুণে দু'ভাগ করে দাও—অত চুলচেরা হিসেবে তোমার কে করতে বলেছে!

হাতে ছাই মেখে রেবা মাছ কুটতে বসে, মোড়াটা টেনে নিয়ে তার ওপর বসে শুভেন্দু দেখতে থাকে। ঝটপটে তাজা মাছটাকে ধরে রেবা একেবারেই মুণ্ডুটা কেটে দেয়, টাটকা লাল রক্ত গড়ায় বঁটিতে—দেখতে শুভেন্দুর বেশ ভালো লাগে।

—মাছের তেলটা কি করবো? তুমি তো তেল-ভাজা খেতে ভালোবাসো—তেলটাও দু'ভাগ করবো?—রেবা জিজ্ঞেস করে।

শুভেন্দু দু-এক মুহূর্ত চিন্তা করে, অঙ্কের হিসেব মেলাবার ভঙ্গিতে। তারপর বলে, কাটা মাছ কিনলে, তাতে তো আর তেলটা ওজনে ধরে না। ওটা তুমি আমাদের দিকেই রেখে দাও।

—পেটির মাছগুলো কি করবো? তুমি তো গাদার মাছ পছন্দ করো না।

শুভেন্দু এবার কঠোর বিচারকের মতন জানিয়ে দেয়, না-না, মাছ সব সমান দু'ভাগ করবে—পেটি—গাদা মিলিয়ে—দু'জনেই সমান পয়সা দিচ্ছি তো।

কিন্তু মুড়োটা দু'ভাগ করার সময় ভোঁতা বঁটিতে দুটো টুকরো বেশ উল্লেখযোগ্য-ভাবে ছোট বড় হয়ে যায়। এবং বড় টুকরোটাই যখন রেবা নিজেদের ভাগে রেখে দেয়—তখন শুভেন্দু আপত্তি করে না, বরং শুভেন্দু গোপনে বেশ খুশী হয়ে ওঠে। রেবার সঙ্গে চোখাচোখি হতে দু'জনেই গোপন চুক্তির হাসি হাসে।

—দাও, বৌদিদের থলিতে ওদের ভাগটা ভরে দাও।

একই পাড়ার, একই রাস্তার কিছুটা ব্যবধানে এদিকে ওদিকে দু'জনের বাড়ি। দু'জনেই ভাড়াটে। একদিন রাস্তায় মুখোমুখি হতে অজিত বলেছিল, চেনা-চেনা মনে হচ্ছে, ঠিক কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে?

শুভেন্দুর স্মৃতিশক্তি বেশ প্রখর, সে বললো তোমার নাম তো অজিত, সেই সুরেন্দ্র-নাথ কলেজে নাইনটিন ফিফটি টু—ফিফটি থ্রি।

অজিত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার নামটা ঠিক মনে পড়ছে না—কিন্তু তোমার রোল নাম্বার ছিল ফরটি ওয়ান।

শুভেন্দু হাসতে হাসতে বলেছিল, রোল নাম্বার মনে আছে, আর নাম মনে নেই? অবশ্য চোদ্দ-পনেরো বছর আগের কথা।

তারপর দুই পরিবারে ভাব হতে দেরি হয় নি। দু'জনেই পরস্পরের বউকে বৌদি ডাকে—বৌদের কাছেও ওরা ঠাকুরপো। একই রকমের চাকরি প্রায়, একই রকমের

সংসার। দুটো বাচ্চা হবার পর শুভেন্দু ঝি ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, আর সাবিত্রীর এখনও ছেলেপুলে হয় নি বলে ইনস্টলমেন্টে স্টিলের আলমারি কিনছে।

মাছের থলিটা নামিয়ে রেখে শুভেন্দু বলে, নিন্ বৌদি, আজ খুব টাটকা মাছ।

থলির মুখটা ফাঁক করে দেখে সাবিত্রী বললো, কি মাছ? কাতলা?

সাবিত্রীর স্বরে খুব একটা উৎসাহ ফুটলো না। কই ছাড়া আর কিছু সাবিত্রীর ঠিক পছন্দ হয় না। সাবিত্রী আবার বললো, ইস্, এ যে অনেকখানি মাছ দেখছি। কতটা আছে?

—সাড়ে সাত শো। বলতে গিয়ে শুভেন্দুর হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠলো। কিন্তু জোর করে দুর্বলতা দমন করে সে আবার বললো সাড়ে সাত শো। মানে দেড় কিলোর মাছটা দু'ভাগ করে—

সাবিত্রী বললো, যাক্ ভালোই হয়েছে, আজ আর তা হলে মোচার ঘণ্টটা রাঁধবো না। দু'জন তো খাইয়ে—এতখানি মাছ যখন—

শুভেন্দু পকেটে হাত ঢুকিয়েছে। দাম তার হিসেব করাই আছে—সাড়ে চার টাকা কিলো—তা হলে সাবিত্রীর পড়ে তিন টাকা সাঁইত্রিশ—পাঁচ টাকার নোট থেকে ফেরত পাবে এক টাকা তেষট্টি, কিন্তু হঠাৎ কি ঝোঁক চাপলো, শুভেন্দু পুলকিতভাবে বলে ফেললো, আজ খুব সস্তা পেলাম, জ্যান্ত কাতলা, তিন টাকা কেজি।

—তিন টাকা? সাবিত্রীর মুখখানা খুশীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

থলের মাছটা মেঝেতে এবার ঢেলে ফেলে সাবিত্রী বললো, এরকম টাটকা মাছ, তিন টাকা? এইজন্যই আমি মানদাকে বাজারে পাঠাতে চাই না। পরশু দিনই তো পোনা বলে এনেছে, আমি দেখেই বুঝেছি পোনা নয়, কাতলা—তা-ও নাকি পাঁচ টাকা কিলো—দু-চার পয়সা চুরি করবি কর, এরকম ডাহা চুরি—

শুভেন্দু উপভোগের হাসি হাসতে হাসতে বললে, একটু-আধটু চুরি না করলে ওদেরইবা চলবে কি করে বলুন?

সাবিত্রীর আকস্মিক খুশী মুখখানা শুভেন্দু চোখ ভরে দেখে। নিজেকে বেশ একটা কীর্তিমান মনে হয় তার। বাজারে একটা চেনা মাছওলা তাকে কি রকম খাতির করে এবং কোনোদিন পচা মাছ দিতে সাহস করে না—এই ধরনের একটা গল্প শুরু করে। এবং গল্পের ফাঁকে বাঁ পকেট থেকে নিজের পয়সা তুলে সাবিত্রীর ফেরত পয়সায় ভরে দিতে তার কোনো গ্লানি হয় না। শুধু একটু খচ্খচ্ করে, ঝোঁকের মাথায় একেবারে তিন টাকা না বলে সাড়ে তিন টাকা বললেও বোধ হয় হতো। তা হলে সাবিত্রীর খুশী কি এর চেয়ে কম হতো?

—অজিত কি ঘুমোচ্ছে নাকি? কথাটা জিজ্ঞেস করে শুভেন্দু এদিক ওদিক তাকায়। তোলা উনুনে কেটলিতে জল ফুটছে।

—না, বাড়িতে ফেরে নি। নাইট ডিউটির পর কোথায় যেন ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরবে বলে গেছে।

—তা হলে এখন কেটলিতে জল ফুটছে? এত বেলায়?

—সকাল থেকে চা খাইনি। বানাচ্ছি আপনি খাবেন?

শুভেন্দু আরাম করে বসে। চিনির খুব টানাটানি, রেবা তাই সকালে এক কাপের বেশী চা দেয় না আজকাল। একদিন খুব পীড়াপীড়ি করতে বাতাসা দিয়ে চা বানিয়ে দিয়েছিল। সাবিত্রী বৌদি অনেক শৌখিন, উনি চিনি ছাড়া চা খান না। তিন টাকা সাড়ে তিন টাকার অস্বস্তিটা শুভেন্দুর অনেকখানি কেটে যায়। বাড়িতে ছেলেমেয়ে দুটো সব সময় চেঁচামেচিতে বাড়ি মাথায় করে—এ-বাড়িটা কি সুন্দর নিরিবিলি। সাবিত্রীর আঁটো শরীরের ব্যস্ত চলাফেরার দিকে শুভেন্দু তাকিয়ে থাকে।

সন্ধের সময় খেয়েদেয়ে নাইট ডিউটির জন্যই বেরিয়েছিল অজিত। গিয়ে শুনলো, মালিকদের এক ভাই মারা গেছে বলে সেদিন অফিস বন্ধ থাকবে। কম রাত্তিরে ঘুমোনো তার অভ্যেস নেই, সুতরাং নাইট শো-তে সিনেমা দেখবে ঠিক করে সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলো। ফিরে দেখলো, সাবিত্রী গেছে রেবাদের বাড়িতে গল্প করতে। অজিতও

সেখানে চলে এল। কি একটা হাসির কথায় ওরা তিনজন তখন দুলে দুলে হাসছে, এমনকি, ছেলেমেয়ে দুটোও হাততালি দিচ্ছে না বুঝে। অজিতকে দেখে ওরা অবাক। অজিত নাইট ডিউটি দেয়—আর সকালে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। অজিতের সঙ্গে প্রায় দেখাই হয় না শুভেন্দুর। সব শুনে শুভেন্দু বললো, ভালোই হয়েছে, এসো আজ এখানে আড্ডা দেওয়া যাক। রেবা খিচুড়ি চাড়িয়ে দাও না—এখানেই সবাই খেয়ে নিই। অজিত খেয়েছে তো কি হয়েছে, আবার খাবে!

অজিত বললো, তার চেয়ে চলো, আজ সবাই মিলে একটা সিনেমা দেখে আসি। অনেকদিন ওসব দেখি-টেখিনি—বৈজয়ন্তীমালার কি যেন একটা বই এসেছে—

শুভেন্দু বললো, ধুৎ! সিনেমা দেখে কি হবে। এই তো বেশ গল্প জমেছিল—তা ছাড়া ওসব হিন্দী বই-টই আমার তেমন ভালো লাগে না।

—তা হলে চলো বাংলাই যাই—অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি না কি বই, যার কথা যেন তুমি বলেছিলে সাবু?

সাবিত্রী বললো, হ্যাঁ ঠাকুরপো, চলুন, সবাই একসঙ্গে দেখে আসি।

শুভেন্দু তবু ইতস্তত করে, বলে, রবিবার চলুন না। এখন, নাইট শো-তে যাওয়ার অনেক ঝঞ্ঝাট।

সাবিত্রী বলে আহা, একদিন তো মোটে, সবাই মিলে বেশ একটু আনন্দ করে যাবো। রেবা, তোমারও তো ও বইটা দেখা হয় নি বলছিলে। কত্তাকে বলো না একটু আলিস্যি ভাঙতে।

রেবা বললো, হ্যাঁ। বইটা দেখার তো খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু—। রেবা আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে কোনো বার্তা পাবার আশা করে।

অজিতের খুব উৎসাহ—সে সিনেমা দেখবেই আজ। কিন্তু শুভেন্দু আর রেবার একসঙ্গে যাওয়ার সত্যিই খুব অসুবিধে—সন্তু-মান্তু কার কাছে থাকবে? ওদের সঙ্গেও নিয়ে যাওয়া যায় না, রাত জাগার অভ্যেস নেই—ওরা একেবারে ঘুমিয়ে কাদা হবে। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল, রেবা যাবে ওদের সঙ্গে, শুভেন্দু ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়িতে থাকবে। অজিত আর সাবিত্রী বাড়ি চলে গেল, সাবিত্রীর তো কাপড় বদলাতে হবে।

ছেলেমেয়ে দুটোকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে শুইয়ে তারপর রেবা নিজের সাজপোশাকে মন দেয়। ইদানীং গায়ে একটু মাংস লাগায় ব্লাউজগুলো ছোট ছোট হয়ে এসেছে। তলপেট খানিকটা উঁচু উঁচু—শুধু সায়া-পরা, এই অবস্থায় কেউ দেখলে ভাববে—বুঝি রেবার আবার শিগগিরই ছেলেমেয়ে হবে—কিন্তু রেবা আর ওসবের মধ্যে যেতে চায় না। দুটো বাচ্চা হবার পর ব্রেসিয়ার পরা এক রকম ছেড়েই দিয়েছিল রেবা—আজ আবার তোরঙ্গ খুলে একটা বার করলে।—শুভেন্দু খাটের ওপর বসে অন্যমনস্কভাবে কি যেন একটা বই পড়ছে। রেবা কাছে এগিয়ে এসে বললো, শোনো—

বই থেকে মুখ না তুলেই, বললো, কি? বলো?

—অজিত ঠাকুরপোকে আমার টিকিটের দামটা দিয়ে দেবো?

—অজিত কি তা নিতে চাইবে?

—আমার লজ্জা করে। অন্য কেউ টিকিট কাটলে আমার অস্বস্তি হয়। তুমি বরং না করে দিলেই পারতে!

—অজিত অত করে বলছিল! যাও না, কি হয়েছে তাতে। তুমি বরং এক কাজ করো, গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দিযো। বাস না করে যদি ট্যাক্সিতে যায়—শুভেন্দু একটু দ্বিধা করলো, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বললো, ট্যাক্সিভাড়াটাও দিয়ে দিয়ো—তা হলে টিকিটের চেয়ে অনেক বেশী দেওয়া হবে।

আহা গাড়িতে ব্যাটাছেলে থাকলে—মেয়েমানুষে বুঝি ভাড়া দিতে পারে? কি রকম খারাপ দেখায় না?

—তুমি দিতে চাইবে—তাতে যদি আপত্তি করে তো—ক' টাকা আর আছে?

—দেখিনি। দেখছি। সতেরো-আঠারো টাকার বেশী নেই, তা ঠিক জানি।

—একটা পাঁচ টাকার নোট নিয়ে যাও। ভাড়া দিতে চাইবে, খানিকটা জোরাজুরি

বরবে—তাও যদি না নিতে চায়—তোমার ডিউটি ফুরিয়ে গেল। ভদ্রতা যতখানি করবার তা করলেই তো হল।

—তবু আমার কি রকম লাগবে।

রেবার সত্যিকারের অস্বস্তিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে শুভেন্দুর মায়া হয়। সামান্য হেসে সে বলে, আহা, অত খুঁতখুঁত করো না। সিনেমা দেখতে যাচ্ছো—ভালো মন নিয়ে যাও। না-হয় সামনের মাসে আমরাও টিকিট কিনে ওদের একটা সিনেমা দেখিয়ে দেবো। এই শাড়িটা পরেছো কেন, ঐ সবুজ শাড়িটা পরে নাও—ওটাতে তোমাকে ভালো মানায়।

ওরা ফিরে না-আসা পর্যন্ত শুভেন্দু জেগে থাকে। ছেলেমেয়ে দুটো বিরক্ত না করে অঘোরে ঘুমোয়, শুভেন্দু একখানা লম্বা উপন্যাস প্রায় শেষ করে ফেলে। বাড়ির সামনে ট্যাক্সির আওয়াজ পেয়ে সে সচকিত হয়ে ওঠে। অজিত আর সাবিত্রী ওপরে ওঠে না, সেইখান থেকেই হাত নাড়িয়ে বিদায় নেয়। অনেকদিন বাদে রেবা খুশীতে ঝলমল করে। কি চমৎকার বই, উত্তমকুমারকে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল! আসবার সময় ট্যাক্সিতে কি সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া। অজিত ঠাকুরপো যে গান জানে তাও রেবা জানতো না। আসবার পথে কি চমৎকার সিনেমারই গানগুলো গুনগুন করে গেয়ে শোনালো।

শাড়িটা যত্ন করে খুলে পাঠ করে রাখতে রাখতে রেবার কি যেন মনে পড়ে যায়। তাড়াতাড়ি হাতব্যাগটা খুলে নীল রঙের পাঁচ টাকার নোটটা বার করে শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে—দ্যাখো, এক পয়সাও খরচ হয় নি।

—তুমি দিতে চেয়েছিলে তো?

—হ্যাঁ—! আমাকে ধমকে দিলেন। যাবার সময় ট্যাক্সি, আসবার সময় ট্যাক্সি, দু'টাকা কুড়ির টিকিট—আবার বাক্স ভর্তি আইসক্রীম খাওয়ালেন। খুব ভালো লোক, এমন আমুদে, মানে ওরা দুজনেই খুব ভালো।

—হ্যাঁ, সেই কলেজের সময় থেকেই জানি তো অজিতটা খুব আমুদে আর দিলদরিয়া। নাইট ডিউটিতে খাটতে খাটতে বেচারার স্বাস্থ্যটা একটু ভেঙে গেছে এখন।

—আমি কিন্তু রান্না করে ওদের দু'জনকে খাওয়াবো বলেছি একদিন। এক রবিবার।

—বেশ তো। সাবিত্রী বৌদিও তো গত মাসে সন্তু-মান্তুকে খাওয়ালেন একদিন।

—তুমি সেদিন মুরগী কিনে এনো কিন্তু। দুটো মুরগী লাগবে—খুব বড় সাইজ হলে একটাতেও হবে অবশ্য, কিন্তু ছোট ছোট কেনাই ভালো, মাংসে কচি হয়, আর চারটে ঠ্যাং পাওয়া যাবে।

—আনবো আনবো। এর পর দেখো অজিতও একদিন আমাদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে আমি বলে রাখলুম, দেখো তুমি মেলে কিনা। ওর স্বভাবই এইরকম, জানি তো!

সাবিত্রীর ঝি ছুটতে ছুটতে এ-বাড়িতে এসে খবর দিল। দিদিমণি অজ্ঞান হয়ে গেছে। রাত্তির সওয়া আটটা বাজে মোটে। আধ ঘণ্টা আগে অজিত নাইট ডিউটি দিতে চলে গেছে—এখনও বোধহয় অফিসে পৌঁছোয় নি। শুভেন্দু আর রেবা তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। ঝি বললো, দিদিমণি হঠাৎ বাথরুমে যেতে গিয়ে কি দেখে যেন ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। সাবিত্রীর মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে রেবা আর শুভেন্দু ধরাধরি করে তাকে খাটে এনে শোওয়ালো।

শুভেন্দুই এ-পাড়ার অপেক্ষাকৃত পুরোনো বাসিন্দা। তার ডাক্তারের সঙ্গে চেনা আছে, দরকার হলে ধরে ওষুধ আনতে পারে। শুভেন্দু দ্রুত গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনলো।

বিশেষ কিছুই হয় নি সাবিত্রীর।

শুভেন্দু ভেবেছিল অজিতের অফিসে ফোন করবে কিনা, টেলিফোন নম্বর সে জানেও না অবশ্য, তবে অজিতের অফিস সেই ক্লাইভ রো-তে, বাড়ি থেকে প্রায় এক ঘণ্টার পথ।

জ্ঞান ফিরে আসবার পর সাবিত্রীই টেলিফোন করতে বারণ করলো।

সাবিত্রী ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। বথরুমের জানলার পাশে সে দুটো মানুষের ছায়া দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। বীভৎস চেহারা।

শহরতলির এ অঞ্চলটা সন্ধের পরই বেশ নির্জন হয়ে যায়, রাস্তার আলো নিবু নিবু হয়ে জ্বলে, বেশির ভাগ বাড়ির ঘরকন্নার কাজ মিটে যায় আটটা-নটার মধ্যে। তবু কাঁচা রাত্তিরে ভূত? শুভেন্দুর ইচ্ছে না থাকলেও হেসে উঠলো। বললো, বৌদি, আপনার ফিটের ব্যামো-ট্যামো আছে নাকি?

—কোনোদিন না!—সাবিত্রীর জ্ঞান ভালো করে ফিরে এলেও হাঁটুর কাছে একটু মচকে গিয়ে ব্যথা করছে। রেবা বললো, ভূত না হলেও চোর-ডাকাত হওয়া বিচিত্র নয়। প্রায়ই তো শুনি এখানে ওখানে!

শুভেন্দু বললো, এই সন্ধে রাত্তিরে চোর-ডাকাত? তাদের প্রাণের ভয় নেই?

—দিনে দুপুরেও তো আসে।

সাবিত্রী সত্যিই কাতর হয়ে পড়েছে, বিছানা ছেড়ে ওঠে না, রোগিনীর মত শুয়ে থেকে অনর্থক অজিতের নামে দোষারোপ করতে থাকে। কি ছাই চাকরি—শুধু নাইট ডিউটি আর নাইট ডিউটি। আগে তবু মাসে এক দু' সপ্তাহ ডে-ডিউটি থাকতো, আজকাল টনা। এ দেশে যেন আর কেউ চাকরি করে না!

শুভেন্দুর সন্দেহ হয় কোনো একটা তুচ্ছ কারণে আজ অজিতের সঙ্গে সাবিত্রী বৌদির বোধহয় খুব ঝগড়া হয়েছে। নইলে বেশ শক্ত ধরনের স্ত্রীলোক, তার তো অকস্মাৎ ভূতের ভয় পাবার কথা নয়। তবু সাবিত্রীর ভয়-পাওয়া অসহায় মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকতে তার ভালো লাগে। এমনকি, ছেলেমানুষের মত ইচ্ছে হয়, মুখে কালি-ঝুলি মেখে সেই ভূত সেজে আবার সাবিত্রীকে ভয় দেখায়।

সাবিত্রী ফিসফিস করে রেবাকে বললো, মানদা কোথায়?

ঝি কাছাকাছি নেই। সাবিত্রী কনুই-এ ভর দিয়ে উঠে বসে বলে, ও হারামজাদীকে আমি কালই তাড়াবো! আজ রাত্তিরেই বিদায় করবো। ওকেই আমার বেশী ভয়!

—কেন? কেন? শুভেন্দু আর রেবা দুজনেই কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

সাবিত্রী বলে, ওকে কি কোনো বিশ্বাস আছে? আজ সন্ধেবেলাতেই দেখলুম, দোতলা থেকে রাস্তায় কার সঙ্গে যেন ইশারা করে কি কথা বলছে। রাত্তির বেলা ও যদি সাট করে কোনো গুন্ডা-বদমাসকে বাড়িতে ঢোকায়, অনায়াসেই আমার গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে না? তারপর গয়নাগাটি যা আছে।

রেবা সমর্থন জানিয়ে বলে, এই-জন্যই তো আমি ঝি-চাকর রাখা পছন্দ করি না। নিজের হাতে সব কাজ করবো, তা-ও ভালো, তবু সব সময় চোরের ভয়—

শুভেন্দু মনে মনে হাসে। ক'দিন আগেই একটা ঝি রাখার জন্য রেবা খুব বায়না তুলেছিল। তার যে এত চোরের ভয় তা তো সে জানতো না!

রেবা সাবিত্রীকে গাঢ় সহানুভূতির সুরে বলে, সত্যিই এরকম রাতের পর রাত একা থাকা, তোমার সাহস বটে! আমি হলে তো পারতুম না, ভয়েই মরে যেতুম। তাও দু'-একটা ছেলেমেয়ে থাকলেও বা কথা ছিল। একটা মাত্র প্রাণী।

সাবিত্রী উত্তর দেয় না। বড় নিঃশ্বাস ফেলে। যত রাত বাড়তে থাকে, তত সাবিত্রীর ভয় বাড়তে থাকে, তত সাবিত্রীর ভয় বাড়ে। ডাক্তার এসে ঘুমের ট্যাবলেট দিয়ে গেছে, সেটা খেয়ে ঘুমোতেও তার ভয়। রাতের পর রাত যে দরজা-জানলা এঁটে একা ঘুমিয়েছে, আজ রাজ্যের ভয় তাকে পেয়ে বসে। সাবিত্রী রেবার হাত ধরে অনুরোধ করে, সেই রাতটা অন্তত রেবাকে এসে তার কাছে থাকতে। ছেলেমেয়ে নিয়েই আসুক।—তার তো বেশ বড় ঘর—সবাই কুলিয়ে যাবে।

—তার চেয়ে বৌদি আপনি আসুন না—আমাদের বাড়িতে থাকবেন—আমাদেরও তো দুটো ঘর! আপনি রেবার সঙ্গে থাকবেন—শুভেন্দু প্রস্তাব দেয়।

সাবিত্রীর চোখ মুখে কষ্ট ফুটিয়ে বলে, শরীরটা বড় দুর্বল লাগছে, হাঁটতে গেলে যদি ঘুরে পড়ে যাই আবার? কথা বলতে বলতে সাবিত্রী মেঝের আলমারি-ট্রাঙ্কগুলোর

ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়। শুভেন্দু বুঝতে পারে, গয়নাগাটি জিনিসপত্র খালি বাড়িতে ফেলে সাবিত্রী যেতে চায় না। নিচতালার ভাড়াটেদের সঙ্গে অজিত কি কারণে যেন একদিন তুমুল ঝগড়া করেছিল--তারা তো ওপরতলায় ডাকাত পড়লেও ফিরে চাইবে না।

খুব অপ্রত্যাশিতভাবেই রেবা রাজী হয়ে যায়। বরং তার মুখ-চোখে এমন একটা উৎসাহের ভাব ফুটে ওঠে যে শুভেন্দু অবাক হয়ে যায়। যেন রেবা হঠাৎ কোথাও বেড়াতে যাবার প্রস্তাব পেয়েছে। ঘুরে ঘুরে সে সাবিত্রীর ঘরখানা পরিদর্শন করে। অজিতের আলাদা খাট--বেশ পরিষ্কার করে বিছানা পাতা, সুন্দর শান্তিনিকেতনী বেডকভার- সেই খাটে বসে পড়ে রেবা বলে, এই তো এই খাটেই আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে কুলিয়ে যাবো। এবার থেকে তো রোজ রাত্তিরেই আমি এখানে এসে থাকলে পারি! এই বলে সে শুভেন্দুর দিকে বসের দৃষ্টিতে চায়।

ছেলেমেয়েকে খাইয়ে ও-বাড়ির বিছানা টিছানা পেতে রেখে তারপর আসবে-এই জন্য তাড়াতাড়ি চলে যায় রেবা। ততক্ষণ সাবিত্রীকে পাহারা দেবার জন্য শুভেন্দু এখানে থাকে। ঘুরে ঘুরে জানলা-দরজাগুলো পরীক্ষা করে দেখে শুভেন্দু। বেশ মজবুতেই আছে, জানলা-দরজা সব বন্ধ করে পাখা চালিয়ে শুলে ভয়ের কিছু নেই।

শুভেন্দু ভূতের কথা তুলে সাবিত্রীকে রাগাতে চায়। কি রকম দেখলেন? ভূসো হাঁড়ির মত মুখ? চোখ দুটোর ওখানে গর্ত, না আগুন জ্বলছিল?

সাবিত্রী রাগ করে না, হাসেও না--দুঃখিতভাবে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, আপনি ওসব বুঝবেন না, আমার সত্যিই ভয় করে! এই বলে সে একটা হাত বাড়িয়ে দেয়। শুভেন্দু এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বিছানার কাছে বসে ডাক্তারের রুগী দেখার মতন অবলীলাক্রমে সাবিত্রীর হাতটা ধরে। একটু একটু ঘামে ভেজা গরম হাত। শুভেন্দু সাবিত্রীর চোখের দিকে তাকায়। নিষ্পলক চোখ। এ দৃষ্টি যে শুভেন্দুর একেবারে অচেনা -তাতো নয়। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেই শুভেন্দু হাতটা আরও এগিয়ে এনে সাবিত্রীর কপালে রাখে। সুস্থ মানুষের তপ্ত কপাল। সাবিত্রী তখনও কোনো কথা বলে না। আপন মনেই শুভেন্দু তার একটা আঙুল সাবিত্রীর ঠোঁটে ছোঁয়ায়। নরম ঠোঁট ফাঁক করে দেয় সাবিত্রী, তার দৃষ্টি আরও ঘন হয়ে আসে। সাবিত্রীর ভয় পাওয়ার কারণটা বুঝতে পেরে শুভেন্দুও হঠাৎ যেন ভয় পায়। ভূত দেখার প্রত্যাশার চোখে তাড়াতাড়ি জানলা-দরজার দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে সেখান থেকে।

রেবার কথা ভেবে শুভেন্দুর হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তার বরাবর ডে ডিউটি, প্রত্যেক দিন দুপুরবেলা রেবা বাড়িতে একা থাকে—ছেলেমেয়ে দুটোও ইস্কুলে চলে যায়। একটা ঝি চাকর রাখতে পারে নি, রেবার অনেক কষ্ট। শুভেন্দু রেবাকে আরও বেশী কষ্ট দিতে চায় না। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরায় শুভেন্দু। যেন দারুণ একটা রসিকতা করছে এই ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বলে, শুয়ে থাকুন বৌদি। রেবা এক্ষুনি এসে পড়বে।

সেই ছেলেটা

এগারোটা পনেরোয় ক্লাস শেষ হল, পরের ক্লাস বারোটায়। মাঝখানে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়। তপন যদি এক্ষুনি কলেজ থেকে বেরিয়ে যায়, ছুটতে ছুটতে গিয়ে বাস ধরে, তাহলে পৌঁছতে পনেরো মিনিট লাগবে। ফিরে আসতে আবার পনেরো মিনিট। বাস থেকে নেমে খুব জোরে হেঁটে গেলেও দু' মিনিট লাগবে, ফেরার সময় আবার দু' মিনিট। তাহলে হাতে রইল এগারো মিনিট। এই এগারো মিনিটের জন্য তপন মিঠুর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

মিঠুদের বাড়ির সদর দরজা সব সময় বন্ধ থাকে। বিশাল, ভারী কাঠের দরজা,

সেকেলে আমলের। সদর দরজায় গিয়ে তপন ডাকতে পারবে না। খুলতে কতক্ষণ সময় লাগবে কে জানে! তা ছাড়া, অন্য কেউ যদি দরজা খোলে, তাকে তো তপন বলতে পারবে না—আমি কলেজ থেকে ছুটতে ছুটতে মিঠুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

একটাই মাত্র উপায় আছে। মিঠুদের একতলার পড়ার ঘরের পাশে একটা সরু গলি আছে। সেইদিকে একটা জানলা। গলির মধ্যে ঢুকে সেই জানলায় দাঁড়ালো। মিঠু এখন পড়ার ঘরে থাকবেই। সামনেই মিঠুর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা। তাছাড়া মিঠু বেশীর ভাগ সময়েই পড়ার ঘরে থাকে।

বাস থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে গিয়ে তপন সেই জানলার কাছে দাঁড়ালো। মিঠু নেই! ইস্, এর কোন মানে হয়!

পড়ার টেবিলে মিঠুর বইপত্র ছড়ানো। খাতার ওপরে খোলা ফাউন্টেন পেন। মনে হচ্ছে মিঠু এইমাত্র উঠে গেছে। কিন্তু এক্ষুনি কি ফিরবে? পেন খোলা রেখে কেউ ওরকমভাবে উঠে যায়? একটু হাওয়া দিলেই পেনটা মাটিতে পড়ে যেতে পারে। মিঠু বড্ড অন্যমনস্ক।

তপন অধৈর্য হয়ে ছটফট করতে লাগল। এক একটা সেকেণ্ড চলে যাচ্ছে, তার যে কত দাম! মাত্র এগারো মিনিট সময়। পরের ক্লাসে হাজির থাকতেই হবে। তপন কলেজে ক্লাস কাটতে পারে না। সবে মাত্র সে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য ছাত্রদের মতন ক্লাস পালিয়ে সিনেমা দেখা কিংবা অন্য কোথাও যাওয়ার মতন বিলাসিতা করার উপায় তার নেই। তার দুই মামা ঐ কলেজের অধ্যাপক। তার একজন খুড়তুতো ভাই তারই সঙ্গে একই ইয়ারে, একই সেকশনে পড়ে। তপনের গতিবিধির ওপরে সকলের শ্যেনদৃষ্টি।

তিন মিনিট কেটে গেল, মিঠু তবু এল না। জানলার শিকে মুখ লাগিয়ে তপন অসহায়ের মতন চেয়ে আছে। মিঠুকে ডাকারও কোন উপায় নেই। জানলার এপাশ থেকে দেখলে মনে হবে যেন জেলখানার বন্দী।

মিঠুর সঙ্গে সকালে দেখা করার উপায় নেই, তখন ঐ পড়ার ঘরে মিঠুর অন্য ভাইবোনেরা থাকে। সন্ধেবেলাও তারা থাকে, তার ওপরে আবার থাকে মাস্টারমশাই। শুধু মাঝে মাঝে বিকেলবেলা দেখা হয়। কিন্তু ঐটুকু দেখায় কি আশা মেটে? হঠাৎ হঠাৎ ধকধক করে মিঠুর কথা মনে পড়ে যায়।

ঘরে ঢুকে মিঠু ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ল। অন্য কোন দিকে তাকায় নি, জানলার দিকে তাকায় নি। চেয়ারের পিঠ জানলার দিকে ফেরানো।

তপন তার বাবার ঘড়ি হাতে দিয়ে এসেছে। আর মাত্র সাত মিনিট বাকি। তবু তপন তক্ষুনি ডাকল না।

বাড়িতে মিঠু এখনও ফ্রক পরে। ফ্রক না স্কার্ট কি যেন বলে। বিকেল বেলা মিঠু যখন শাড়ি পরে বেড়ায়, তখন তাকে অন্য রকম দেখায়। এখন আরেক রকম। এখনো স্নান করে নি, চুলগুলো সব পিঠের ওপর খোলা। অন্যমনস্কভাবে বাঁ হাতের আঙুল-গুলো দিয়ে চুলের মধ্যে চিরুনির মতন চালাচ্ছে। পরীক্ষার আগে সব মেয়ের চেহারাই একটু এলোমেলো হয়। পিঠের একটা বোতাম লাগায় নি, দেখা যাচ্ছে ব্রা'র স্ট্র্যাপ। এক্ষুনি ডাকলে তো এটা দেখা যেত না। চেয়ারে বসেই গভীর মনোযোগ দিয়ে মিঠু অঙ্ক কষতে লেগে গেছে। পড়াশুনোয় ওর খুব মনোযোগ। মিঠুর কান দুটো পিছন থেকেও কি সুন্দর দেখায়!

মিঠুকে চমকে দেবার জন্য তপন ওকে না ডেকে জানলার শিকে টং-টং শব্দ করল।

মিঠু কিন্তু একটুও চমকাল না। ধীরে-সুস্থে মুখ ফিরিয়ে ঠোঁট টিপে হেসে বলল, দেখতুম, আর কতক্ষণ না ডেকে থাকতে পার।

তার মানে মিঠু আগেই দেখেছে? মেয়েরা যে কখন কিভাবে দেখতে পায়, সেটাই এত রহস্যময় ব্যাপার! মিঠুকে কিছুতেই চমকে দেওয়া যায় না।

চেয়ারে বসে বসেই মিঠু জিজ্ঞেস করল, কলেজ নেই বুঝি?

—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম তো।

—ছুটি হয়ে গেল?

—না, আবার যাব।

—তুমি পাগল নাকি? কলেজের মাঝখানে চলে এসেছ?

তপন উত্তর দিল না। নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল মিঠুর দিকে।

আর মাত্র পাঁচ মিনিট!

—এই, উঠে এস না! এখানে এস, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

মিঠু বলল, কি, বল না। শুনতে পাচ্ছি তো!

—না, কাছে এস!

—ওসব চলবে না!

—একটা জরুরী কথা আছে।

—জরুরী কথাটা ওখান থেকে বলুন মশাই! চটপট বলে ফেলুন। আমি পরীক্ষার পড়া করছি। তোমাকেও কলেজে ফিরতে হবে।

মিঠু দুষ্টু ভঙ্গিতে হাসছে। তপনকে শাস্তি দিচ্ছে। জেলখানার বন্দীর মতন জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে তপন, সেখান থেকে মিঠু অনেক দূরে। তপন যদি জানলার শিকগুলো ভেঙে ফেলতে পারত!

আর সাড়ে তিন মিনিট। এইটুকু সময়ে কী-ই বা কথা বলা যাবে! বুকের মধ্যে হাজারটা কথা জমা আছে। এইটুকু সময়ে সেইসব কথা বলা যাবে না বলেই তপন একটা চিঠি লিখে এনেছে চারপাতা।

বুকপকেট থেকে তপন সেটা বার করে বলল, একটা চিঠি।

মিঠু বলল, ছুঁড়ে দাও।

—না, ছুঁড়ে দেব না। কাছে এসে নিতে পারছ না?

—তুমি বড্ড জ্বালাতন কর। দাও না বাবা' ছুঁড়ে দাও, লুফে নিচ্ছি। তপন আড়চোখে ঘড়িতে সময় দেখল। সময় নেই, চিঠিটা পকেটে ভরে বলল, তা আমি দেব না। আমি চলে যাচ্ছি।

চিঠি পেতে মিঠু খুব ভালবাসে। চিঠি ফেরত নিয়ে যাওয়া সে সহ্য করবে না। এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই, ভাল হবে না বলছি! আমার জিনিস আমাকে দাও!

তপন হুকুমের সুরে বলল, তাহলে কাছে এস।

মিঠু এক পা দু' পা করে জানলার খানিকটা কাছে এসে দাঁড়াল। তপন বলল, আরও কাছে।

হাতের সীমানায় মিঠুকে পেয়েই তপন খপ করে তার কোমর জড়িয়ে ধরল।

একদিন তপন দেখেছিল, মিঠুকে একটা চিঠি দেবার পর সেটা তার বুকের জামার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। মিষ্টি হেসে বলেছিল, আমার বুকের সঙ্গে থাক।

তপনের ইচ্ছে আজ নিজের হাতে মিঠুর বুকের জামার মধ্যে চিঠিখানা রেখে দেবে সে।

কোমর জড়িয়ে ধরতেই মিঠু ছটফট করে উঠল। শাসনের ভঙ্গিতে চোখ রাঙিয়ে বলল, এই, কি হচ্ছে কি?

চিঠিখানা বার করে তপন খুব আলতো করে রেখে দিল মিঠুর বুকের মধ্যে। তারপর নিজের মুখখানা মিঠুর গায়ের সঙ্গে চেপে ধরে তার কিশোরী সত্তার গন্ধ নিল।

কয়েকটা মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। পরক্ষণেই তপন খানিকটা লজ্জা পেয়ে মিঠুকে ছেড়ে দিয়ে, আর একটিও কথা না বলে সরে গেল জানলা থেকে। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে চলে গেল বাস-স্টপের দিকে। কলেজে যখন পৌঁছল, ঠিক তক্ষুনি ঘণ্টা বাজছে। তপনের বুকের মধ্যেও ঢিপঢিপ শব্দ তখনো থামে নি।

পরদিন একটানা ক্লাস। যাবার উপায় নেই। মিঠু চিঠির উত্তর দেবে।

তার পরদিন পর পর দুটো ক্লাস অফ। চমৎকার সুযোগ। কিন্তু যেই বেরুতে যাবে, অমনি তার খুড়তুতো ভাই তাকে ধরল। ইউনিয়নের মিটিং আছে তপনকে যেতে হবে।

তপন অন্য কোন ছুতো খুঁজতে পারল না। তাকে বিরস মুখে ইউনিয়নের মিটিং শুনতে হল।

তার পরদিন আবার দুটো ক্লাস নেই। তপন অনেকখানি আশা নিয়ে ছুটে গেল।

কিন্তু মিঠুদের জানলার কাছে না দাঁড়িয়ে তাকে সোজা হেঁটে চলে যেতে হল হনহনিয়ে। ভাগ্যিস প্রথমেই সে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে নি। ঘরের মধ্যে মিঠুর সঙ্গে তার ক্লাসের আরও দুটি মেয়ে।

এই সময় পড়ার ঘরে মিঠুর গুরুজনদের কারুর থাকার সম্ভাবনা নেই। মিঠুর বাবা দাদারা অফিসে বেরিয়ে যান, মিঠুর মা ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত থাকেন। অবশ্য ওঁরা হঠাৎ তপনকে দেখলেও কিছু বলবেন না—তপনকে ওঁরা চেনেন, কিন্তু তপনের লজ্জা করবে।

মিঠুর বন্ধুরা এই সময় না এলে পারত না? ওরা তো বিকেলে এলেই পারে। মিঠু ওদের কাটিয়ে দিতে পারছে না? অবশ্য মিঠু তো জানত না যে তপন আজ আসবে! কেনই বা জানবে না!

মিঠুদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল তপন। দৃষ্টি এক দিকে নিবদ্ধ। কিন্তু মিঠুর বন্ধুদের বেরুবার নামটি নেই। এক জায়গায় বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করেই দেড় ঘণ্টা চলে গেল।

পরদিন দেখা হল। সেই রকম দুপুরে, জানলায় দাঁড়িয়ে। মিঠু চোখ রাঙিয়ে বলল, এ ক'দিন আস নি কেন?

তপন বলল, রোজ রোজ বুঝি আসা যায়? কলেজে কত রকম কাজ থাকে।

মিঠু ঠোঁট উল্টে বলল, আ-হা-হা!

—কই, আমার চিঠির উত্তর?

—লেখা হয় নি।

—সত্যি?

—হ্যাঁ সত্যি। তার বদলে একটা ছবি এঁকেছি।

—কিসের ছবি?

—তোমার। এই দ্যাখো।

দূর থেকে খাতা খুলে দেখল মিঠু। মস্ত বড় করে আঁকা একটা সূর্য, তার নিচে আর একটা ছোট সূর্য। মিঠু ছবির ব্যাখ্যা করে দিল। এই গনগনে দুপুরে আকাশে সূর্য জ্বলছে, তার নিচে আর একজন সূর্য অর্থাৎ তপন হেঁটে আসছে।

তপন বলল, কাছে এসে দেখ ও! ভাল দেখতে পাচ্ছি না।

মিঠু আর কাছে আসবে না। বলল, না। ওসব চলবে না।

তপন বলল, তোমাদের বাড়ির দরজা খোলা আছে দেখলাম। আমি কিন্তু ভেতরে চলে আসতে পারি।

—এস না। কে বারণ করছে!

দুপুর একটা বাজে। মিঠুদের সারা বাড়ি নিঝুম। তপন যদি সদর দরজা দিয়ে ঢুকে মিঠুর পড়ার ঘরে যায়, কিছুক্ষণ গল্প করে—তার থেকে সুন্দর জিনিস আর হতে পারে না। তার বিনিময়ে তপন একটা রাজ্য দিয়ে দিতে পারে। অথচ তপনের দ্বিধা যায় না। ঠিক ভয় নয়, দ্বিধা।

তপন আবার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, এই বল না, সত্যি যাব?

মিঠু রহস্যময়ীর মতন হাসল। হাসিমুখে ভুরু কুঁচকে বলল, আমার বুঝি পরীক্ষার পড়া করতে হবে না? তোমার সঙ্গে গল্প করলেই চলবে?

তপন ঠিক বুঝতে পারল না, মিঠু কি চায়। সে কি চাইছে, তপন ভেতরে আসুক? নাকি সত্যিই তার পড়াশুনোর কথা ভাবছে? তপন না এলে মিঠু রাগ করে, অথচ আসার পর পড়াশুনোর অজুহাত দেখায়, এর মানে কি?

তপন বলল, তা হলে আমি চলে যাই।

মিঠু বলল, না, এখনো পাঁচ মিনিট সময় বাকি আছে।

এইরকমভাবে তিন চারবার দেখা হয়। কলেজ থেকে তপন টুক করে চলে আসে,

জানলার শিক ধরে দাঁড়ায়, মিঠুকে কাছে আসার জন্য অনুনয়-বিনয় করে, মিঠু আসে না, তবু তপন যখন আবার ফিরে যায়, তার বুকের মধ্যে অদ্ভুত আনন্দ। শুধু দেখা, শুধু দু' একটা কথা বলা—সেই সময়টাতে পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

সেইরকমই এক দুপুরে তপন জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে. পেছন থেকে হঠাৎ তব ঘাড়ে একটা আঘাত। এখানে কি হচ্ছে?

তপন চমকে উঠে দেখল, তার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়, গুণ্ডা ধরনের একটা ছেলে। ঠিক গুণ্ডা নয়, ছেলেটির রং ফর্সা, জামা-কাপড় পরিষ্কার কিন্তু পান চিবুনো মুখখানা নিষ্ঠুরের মতন।

সেই ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, চুরির মতলব? এই বই-খাতা কার?

ভাগ্যিস মিঠু তখন ঘরে ছিল না। মিঠু গিয়েছিল তপনের জন্য এক গেলাস জল আনতে। এই বুদ্ধিটা তপন সেদিনই মাথা থেকে বার করেছিল। মিঠু কিছুতেই জানলার কাছে আসে না। হাজার অনুরোধ করলেও মুচকি হাসে। কেন কাগজ বা বই দিতে হলেও দূর থেকে ছুঁড়ে দেয়। তপন তাই আজ মিঠুর কাছে এক গেলাস জল চেয়েছে। জল তো আর ছুঁড়ে দিতে পারবে না।

মিঠু আসবার আগেই তপন জানলা থেকে সরে এল। ভয়ে, অপমানে তার মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। ভয় তার নিজের জন্য নয়। যদি এই ছেলেটা চাঁচামেচি করে? যদি মিঠুর বাড়ির সব লোক জেনে যায়? সে দুপুরবেলা চুপি চুপি কেন আসে, তার তো কোন যুক্তি নেই। কেউ তো বুঝবে না যে, সে ইচ্ছে করলে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারলেও, জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে কেন?

তপন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিঠুদের বাড়ি থেকে দূরে সরে যেতে চাইছিল। সেই ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, কি হচ্ছিল ওখানে?

তপন শুকনো অস্পষ্ট গলায় বলল, তা দিয়ে আপনার দরকার?

—দরকার আছে বৈকি! চুরির মতলব? এইসব বই-খাতা কার?

—আমার।

আরও দুটি ছেলে একটু দূরে ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। কলারে রুমাল গোঁজা। তাদের একজন বলল, প্রায়ই এসে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি মাইরি। কি আছে রে ঘরের মধ্যে?

একজন তপনকে ধরে রাখল। আর দুজন গেল মিঠুর ঘরের জানলায় উঁকি মারতে। তপন তার প্রাণের বিনিময়েও যদি ওদের আটকাতে পারত। কিন্তু কোন উপায় নেই। সবচেয়ে বড় বাধা, তপন কোন গোলমাল বাধাবার ঝুঁকি নিতে পারে না। যেন আর কেউ জানতে না পারে।

ছেলে দুটি জানলা দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল, কি সব মন্তব্য করতে লাগল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। ফিরে এসে হাসিতে ফেটে পড়ে বলল, মাইরি, মালের ব্যাপার।

তপন এলোপাতাড়ি ঘুষি চালাতে পারত। সে নিজে মরে গেলেও তার আগে এদের একজনকে শিক্ষা দিয়ে যেতে পারত। সে শুধু ভয় পাচ্ছে, মিঠুদের বাড়ি দোতলা থেকে যদি কেউ উঁকি মারে! সে কাতরভাবে ফর্সা ছেলেটিকে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন।

ছেলেটি তপনের কলার শক্ত করে ধরে আছে। একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলল, রসের নাগর! এ পাড়ায় লদকা-লদকি করতে আসা হয়েছে? কোথায় থাকা হয়?

একজন বলল, দুধের খোকা। এর মধ্যেই এসব!

আর একজন বলল, দে, ছেড়ে দে। নইলে এক্ষুনি বোধহয় ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলবে।

আরও খানিকটা অপমান করে ফর্সা ছেলেটি হঠাৎ তপনকে ছেড়ে দিয়ে বলল, যা, ভাগ্! ফের এদিকে এলে—

সমস্ত অপমান সহ্য করেও তপন চলে যাচ্ছিল। ফর্সা ছেলেটি তাকে আবার ডাকল, এই খোকা শোন—

তপন আবার কাছে আসতেই ছেলেটি বিনা বাক্যব্যয়ে আচমকা তপনের পায়ে একটা

ল্যাং মারল। তপন নিজেকে সামলাবার সময় পেল না, বই-খাতা শুদ্ধ পড়ে গেল ঝপাস করে। ছেলে তিনটে হোহো করে হেসে উঠল।

শুধু যে জামা-প্যাণ্টে ধুলো লেগে গেছে তাই নয়, তপনের বাঁ-হাতের অনেকটা ছাল উঠে গেছে, থুতনির কাছে কেটে গেছে খানিকটা।

ছড়ানো বইপত্র গুছিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল ফর্সা ছেলেটির দিকে। ছেলে তিনটে তখনও বেদম হাসছে। একজন হাসতে হাসতে বলল, পালা, নইলে আবার ল্যাং খাবি!

তপন আস্তে আস্তে হেঁটে গেল বাস-স্টপের দিকে। তখন তার কিছুই করার নেই। একটা তিনটে ছেলের বিরুদ্ধে কি করবে! রাগের বদলে তার কান্নাই পাচ্ছিল বেশী। সে তো ঐ ছেলে তিনটির কোন ক্ষতিই করে নি—তবু ওরা কেন তাকে এরকম অপমান করল? তাকে আছাড় খাইয়ে কি ওদের আনন্দ? সে জানলার বাইরে থেকে মিঠুর সঙ্গে একটু গল্প করতে আসে—এতে অন্যের কি যায় আসে!

এরপর বেশ কয়েকটা দুপুরে তপন আবার ওখানে এসেছে। দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে। মিঠুদের বাড়ীটা দূর থেকে দেখতে, আর ঐ ছেলেগুলোকে খুঁজতে। মিঠুর পড়ার ঘরের জানলা এখন সব সময় বন্ধ থাকে। মিঠু নিজেই বন্ধ রাখে, না বাড়ির লোকের নির্দেশে তা কে জানে; হয়তো ছেলেগুলো আরও অনেকবার উঁকি-ঝুঁকি মেরেছে।

ছেলেগুলোকেও তপন আর দেখতে পায় নি। তারা ঐ পাড়ার বা অন্য পাড়ার—তাও জানে না সে। কলকাতা শহরে হঠাৎ দেখা হবার সম্ভাবনা কম।

দেখা না হোক, তপন সেই ফর্সা ছেলেটার মুখখানা ছবির মতন মনে রেখেছে, কোনদিন ভুলবে না। সেই ফর্সা লম্বাটে মুখ, পান খাওয়া ঠোঁটে নিষ্ঠুর ভঙ্গি, ওর সঙ্গে তপনের একদিন না একদিন দেখা হবেই। তারপর তপন শোধ নেবে।

ঐ ঘটনার পর এগারো বছর কেটে গেছে। তপন এখন রাইটার্স বিল্ডিংস-এ চাকরি করে। মিঠুর বিয়ে হয়ে গেছে, সে থাকে বোম্বাইতে। সেই ঘটনার পর খানিকটা ভুল-বুঝাবুঝি হয়েছিল ঠিকই, বেশ কিছুদিন দেখা হয় নি—কিন্তু ঐ কারণেই যে মিঠুর সঙ্গে তার বিয়ে হয় নি, তা নয়। বিয়ে না হবার আরও অনেক কারণ থাকে। এ ব্যাপারে তপনের মনে খুব যে একটা দুঃখ জমে আছে তাও নয়। সব দুঃখই আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে যায়।

কিন্তু সেই দুপুরের ঘটনাটা তার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। তখন একটু কষ্ট হয়। কলেজ থেকে ছুটে গিয়ে মিঠুর সঙ্গে দেখা করার মধ্যে যে আনন্দ ছিল, সেই ফর্সা ছেলেটা সেই আনন্দ নষ্ট করে দিয়ে নিজে কি আনন্দ পেয়েছিল? মিঠুর মুখখানা একটু অস্পষ্ট হয়ে এলেও সেই ছেলেটার মুখখানা দারুণভাবে মনে আছে।

মাঝে মাঝেই তপন সেই ছেলেটির কথা ভাবে। এখন আর প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা তেমন নেই। এখন দেখা হয়ে গেলে তপন হয়তো ওকে কিছুই বলবে না। ছেলেবেলার ঐসব রাগ বেশীদিন থাকে না। শুধু তপন মাঝে মাঝে ভাবে, একজনকে অনর্থক অপমান করে সেই ছেলেটা কি নিজে জীবনে শান্তি পেয়েছে? সে কি সার্থক হয়েছে জীবনের কোন ব্যাপারে? সে কি পেয়েছে একটা শান্তির সংসার? নাকি সারা জীবন সে একটা অভিশপ্ত জীবন কাটাচ্ছে?

সেই ছেলেটার জন্য এখন মাঝে মাঝে তপনের একটু মায়া হয়। সেই ছেলেটা যদি কোন কারণে তপনের কাছে কোনদিন কোন সাহায্য চাইতে আসে, বলা যায় না, তপন হয়তো তাকে সাহায্য করেও ফেলবে। তার আগে তপন তাকে শুনিয়ে দেবে, মনে করিয়ে দেবে সেই ঘটনাটা—দেখবে, ছেলেটার—এখন লোকটার—মুখের ভাব কি রকম হয়!

বিকেল শেষ হয়ে সদ্য সন্ধ্যা নেমেছে। রাস্তার আলোগুলো একে একে জ্বললো। ট্রামে-বাসে অসম্ভব ভিড়। কাকেরা এই সময় ঘরে ফেরে, আকাশের রঙও এখন কাকের ডানার মতন।

ঠিকে ঝিদেরও এখন বাড়ি ফেরার সময়। ধনী পাড়ার সারবন্দী বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে নারীর দল, রেল লাইন পেরিয়ে খালের ভিতর দিকে যাবার আগে কেউ কেউ দু'দণ্ড গল্প করে।

গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল মানদা আর কেষ্টর মা। বেশ শক্তপোক্ত শরীরের গড়ন, কিন্তু মুখে নানারকম রেখা দেখলে মনে হয় বুড়ি। সারাদিন চারটে বাড়িতে ঠিকে কাজ এবেলা-ওবেলা, চরকির মতন ঘুরতে হয়। সন্ধের সময় ছুটি, ঠিক ছুটি নয়—এখন নিজের সংসার ঠেলা।

মানদার এক ভাই হারিয়ে গেছে, সেই গল্প করছিল। কেষ্টর মায়ের হাতে কিছু বাঁধাকপির পাতা ও আলুর খোসা। রায়বাড়ির গিন্নী বাঁধাকপির ওপরের কয়েকটা পাতা ফেলে দেয়, আলুর খোসা ও-বাড়ির কেউ খায় না। কেষ্টর মা নিয়ে আসে। এতে তার সংসারে দিব্যি একটা তরকারি হয়ে যায়।

এই সময় চারতলার উপর থেকে ধপ্ করে কি যেন একটা পড়লো। প্রথমে মনে হয়েছিল একটা ন্যাকড়ার পুঁটলি, কিন্তু সেটা নড়চড়া করছে দেখে মানদা বললো, ওমা, ওটা কি পড়লো। বেড়াল নাকি?

একতলার ভাড়াটেরা বাড়ি নেই। তাদের ঘরে আলো জ্বলে নি বলে রাস্তার এই-খানটা আরো অন্ধকার। মানদা জিভ দিয়ে চুকচুক করে আওয়াজ করে বললে, আহা, বেড়ালটা এমনভাবে পড়ে মরলো! কোন বেড়ালকে তো এমনভাবে পড়তে দেখিনি।

কেষ্টর মায়ের দয়া বেশী। সাদা জিনিসটা তখনও নড়চে-চড়ছে দেখে হাত দিয়ে সেটাকে তুলতে গেল। তারপর আঁতকে উঠে বললে, ও দিদি, এটা তো বেড়াল নয়। খরগোশ! টুবলুবাবুর খরগোশ!

মানদা জিজ্ঞেস করলো, ও বাড়িতে আবার খরগোশ এলো কবে?

কেষ্টর মায়ের তখন উত্তর দেবার সময় নেই। এখনও মুখে জল দিলে বাঁচতে পারে, কেষ্টর মা আহত খরগোশটাকে বুকে করে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এল চারতলায়। চীৎকার করে বললো, ও বৌদিদি, দেখো তোমাদের খরগোশ রাস্তায় পড়ে গেছে।

প্রশান্ত রায়ের স্ত্রী অলকা রায় খাবার টেবিলে চায়ের কাপ সামনে নিয়ে তাঁর দেওর ও জায়ের সঙ্গে গল্প করছিলেন। চমকে উঠে বললেন, কি?

টুবলু মাত্র সপ্তাহখানেক আগে। অলকার একমাত্র ছেলে বয়স চার বছর তিন মাস, একশো গুণতে জানে। মোটরগাড়ির নম্বর পড়তে পারে এবং অরণ্যদেবের গল্প শোনার নেশা) বায়না ধরেছিল খরগোশ পুষবে। বালিগঞ্জ লেকের লিলিপুলে জ্যান্ত খরগোশ দেখার পরই তার এই শখ চাপে। বাড়িতে খরগোশ রাখার অনেক ঝামেলা। প্রশান্ত রায় ছেলেকে অন্য খেলনা-টেলনা দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু টুবলুবাবুর জেদ বড় বেশী, শেষপর্যন্ত অলকাও স্বামীকে বলেছিলেন, অত করে বলছে, দাওনা একটা খরগোশ কিনে!

তিনদিন আগে প্রশান্ত রায় নিউ মার্কেট থেকে কুড়ি টাকা দিয়ে কিনে আনলেন এক জোড়া খরগোশ। সেই সঙ্গে কাঠের খাঁচা। রাস্তার দিকে চওড়া বারান্দা, সেইখানে রাখা হবে খাঁচা। ধপধপে সাদা উলের বলের মত খরগোশ দুটো, লাল লাল চোখ, দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে তারা দু'পায়ে ভর দিয়ে ক্লাউনের ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। টুবলু একেবারে মেতে উঠলো খরগোশ দু'টোকে নিয়ে। এখন আর সে চান করতে দেরি করে না, খাবার খেয়ে নেয় চটপট—কতক্ষণে খরগোশের সঙ্গে খেলা করবে, এই শুধু চিন্তা। প্রশান্ত রায় ও অলকা খুব খুশী।

খরগোশ খুব সহজে পোষ মানে। তারা টুবলুকে একটুও ভয় পায় না—এঘরে ওঘরে

তারা দৌড়োদৌড়ি করে বেড়ায়, পেছনে টুবলু।

তবে খরগোশ বড্ড ঘরদোর নোংরা করে। সেইজন্য তাদের মাঝে মাঝে খাঁচায় বন্ধ করে রাখতেই হয়। টুবলু যখন বাড়ি থাকে না তখন তারা খাঁচা-বন্দী থাকে।

টুবলু এখন মামাবাড়িতে, কিন্তু খরগোশ দুটোকে খাঁচায় ভর্তি করার কথা মনে ছিল না। তারা বারান্দায় খেলা করছিল। দুটি খরগোশের একই রকম চেহারা, একই রকম বয়েস, তবু তাদের মধ্যে একজন একটু বোকা, একজন চালাক। বোকা খরগোশটি খাঁচার বাক্সের উপর লাফিয়ে উঠে রেলিং থেকে উঁকি মেরেছিল বাইরে। দেখছিল অদ্ভুত ব্যস্ত মানুষ ও গাড়িতে ভর্তি রাস্তা। তাল সামলাতে পারে নি, পড়ে গেছে নিচে। চারতলা থেকে। চালাক খরগোশটি বারান্দার এক কোণে বসে আছে গুটিসুটি মেরে।

মুমূর্ষু খরগোশটিকে দেখে অলকা হায় হায় করে উঠলো। কেষ্টর মা তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এসে মুখে ঢাললো। খরগোশটি ছলছল চোখে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে। হাত পা এলিয়ে পড়েছে। বেড়াল আহত হলে নাকি নুন দিয়ে চাপা দিতে হয়। কিন্তু খরগোশের কোন ওষুধের কথা কারো মনে পড়লো না। দু'মিনিটের মধ্যে সে মারা গেল।

মাত্র তিনদিন আগে বাড়িতে আনা হয়েছে তাকে, সেই খরগোশের জন্য খুব বেশী শোক হবার কথা নয়। দশ মাসের পোষা টিয়াপাখিটা হঠাৎ মরে যাওয়ায় অলকা কেঁদে ছিলেন। কিন্তু এখন খরগোশের চেয়েও বেশী চিন্তা হলো টুবলুর জন্য। সে তো মামাবাড়ি থেকে ফিরেই খরগোশের খোঁজ করবে। তখন তাকে কি বলা হবে? কেষ্টর মার কিন্তু দুঃখ হতে লাগলো খরগোশটার জন্য। এমন সুন্দর প্রাণীটা, এরকম বেঘোরে মারা গেল। অলকা বললেন, কেষ্টর মা, তুমি এটাকে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় অনেক দূরে ফেলে দাও। টুবলু যেন এসে মরা খরগোশ না দেখে।

টুবলু চার বছরের শিশু, তার পক্ষে এসব মৃত্যুর দৃশ্য না দেখাই ভালো। একটু আগে যে বেঁচে ছিল, এখন সে বেঁচে নেই—এ দুর্বোধ্য ব্যাপারটা বোধহয় সে বুঝতেই চাইবে না। তার চেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে খরগোশটা কোথাও পালিয়ে গেছে—একথা বলাই ভালো। হারিয়ে যাওয়ার কথা শুনলে অনেক কল্পনা খেলা করে। ছেলে ফিরলে কি রকমভাবে গল্পটা বলবেন, অলকা তাই ভাবতে লাগলেন।

কেষ্টর মা মরা খরগোশটা নিয়ে বেরুলো। মানদা চলে গেছে। বৌদি বলেছেন, বাড়ির কাছেই না ফেলে দূরে কোথাও ফেলতে। খানিকটা রাস্তা আসবার পর কেষ্টর মা'র মনে হলো, না ফেলে খরগোশটা বাড়ি নিয়ে গেলে কেমন হয়।

কেষ্টর মায়ের পাঁচটি ছেলেমেয়ে। যার নাম কেষ্ট সে মারা গেছে অনেকদিন আগে—তবু সকলে এখনো তাকে কেষ্টর মা বলে ডাকে। কেষ্টর পর তিন তিনটে মেয়ে, সবচেয়ে ছোটটি আবার ছেলে, তার নাম এককড়ি। রোগা ডিগডিগে চেহারা, বছর ছয়েক বয়েস, কিন্তু দেখলে চার বছরের বেশী মনে হয় না। এককড়ি কখনো খরগোশ দেখে নি। এমন কি কেষ্টর মা নিজেও এর আগে কখনো হাতে ধরে দেখে নি কেমন খরগোশ। হোক না মরা, তবু বাড়ির ছেলেমেয়েরা একটা নতুন জিনিস দেখবে। খানিকটা পরে ফেলে দিলেই চলবে। বাবুদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের ভাঙা বাতিল করা খেলনা কেষ্টর মা অনেক সময় নিজের ছেলেমেয়ের জন্য বাড়িতে নিয়ে গেছে—এখন নিয়ে চললো একটা মরা খরগোশ!

রেল লাইন পেরিয়ে বস্তিতে ঢোকার মুখে কিসের একটা জটলা। কিছু লোকের উত্তেজিত চিৎকার। প্রায়ই এরকম লেগে থাকে। কেষ্টর মা সেদিকে মন দিল না। এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে এককড়ির কান্নার আওয়াজ। প্রায়ই সন্ধেবেলা তার একটু জ্বর আসে, আর এই রকম ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদে।

অন্যদিন কেষ্টর মা বাড়ি ফিরেই এককড়ির পিঠে দুম দুম করে কটা কিল মে'রে কান্না থামায়। আজ তার হাতে গুঁজে দিল মরা খরগোশটা। এককড়ি কান্না থামিয়ে ভয় পেয়ে সেটা ফেলে দিল হাত থেকে। খরগোশ কাকে বলে সে জানে না। সে দেখছে লম্বা লম্বা কানওয়ালা বেড়ালের মত জন্তু। এককড়ির দিদি লক্ষ্মী খিলখিল করে হেসে উঠলো তা দেখে। লক্ষ্মীর বয়েস এগারো, সেও সদ্য ঠিকে কাজে লেগেছে, বাবুদের

বাড়িতে ক্যালেণ্ডারে সে খরগোশের ছবি দেখেছে। লক্ষ্মী যতবার তার ভাইয়ের হাতে খরগোশটা তুলে দেয় সে ততবার ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই নিয়ে বেশ খেলা জমলো।

তারপর, ভাত যখন সেদ্ধ হয়ে এসেছে, তখন কেষ্টর মা বললো, খুব হয়েছে, লক্ষ্মী, এবার ওটা রেল লাইনের ওপর ফেলে দিয়ে এসে খেতে বোস্।

লক্ষ্মী খরগোশটা নিয়ে বেরিয়ে গিয়েই আবার সেটা হাতে নিয়ে ফিরে এলো। সঙ্গে এসেছে তার কাকা সুবল। সুবল থাকে দু'তিনখানা ঘর পরে, রোজ সন্ধের পর সে খাটিয়ায় বসে তাস পেটে, পয়সা-কড়ির খেলা হয়, ডেকে ডেকেও তাকে তোলা যায় না। সে যখন উঠে এসেছে; নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ব্যাপার। সুবল বেঁটেখাটো চেহারা, চোখ দুটো ধূর্তের মতন।

সে হাঁক দিয়ে বললো, অ বৌদি, তুমি অমন দামি জিনিসটা ফেলে দিতে বলছো লক্ষ্মীকে? তোমার আক্কেল কি গো।

কেষ্টর মা অবাক হয়ে তাকালো। কথাটার মানেই বুঝতে পারলো না।

সুবল বললো, এক একটা খরগোশের দাম কি জানো? দু' গণ্ডা তিন গণ্ডা ট্যাকার কম নয়।

কেষ্টর মা এবার বললো, আহা, মরা জিনিসের আবার দাম কি!

সুবল বললো, মরা হাতির দাম যদি লাখ ট্যাকা হয়, মরা খরগোশের দাম কি কিছুই নয়! খরগোশের মাংস'র কি রকম টেস্ হয় জানো? ঠিক যেন বেলের মোরব্বা!

কেষ্টর মা মুখ বেঁকিয়ে বললো, এ ম্যা গো! খরগোশের মাংস আবার কেউ খায় নাকি? তা হলে তো কুকুর-বেড়াল খেলেই হয়!

সুবল উপহাসের হাসি হাসলো। এরা বস্তিতে থেকে ঝি-গিরি করে, এরা এসব কি জানবে! তাও অবলা মেয়েমানুষ বলে কথা। সুবল গেঞ্জির কলে কাজ করে, সে এখন শ্রমিক। আগে কিছুদিন সে সোনারপুরে এক বাবুদের বাড়িতে চাকরের কাজ করতো—সেই বাবুরাই এখন তাকে গেঞ্জির কলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আগে চাকরের কাজ করার সময় সে দেখেছিল সে বাড়ির বাবুরা প্রায়ই সুন্দরবনে শিকারে যেতেন—একবার একটা হরিণ মেরে এনেছিলেন, তাছাড়া নানারকম পাখি আর খরগোশ। সে বাড়িতেই সুবল খেয়েছে খরগোশের মাংস। সে জানে!

সুবল সবিস্তারে বলতে লাগলো সেইসব গল্প। বাবুরা খরগোশের মাংস রেঁধে বন্ধুবান্ধবদের খাওয়ায়, এমনই স্বদের জিনিস! সবাই খেয়ে ধন্য ধন্য করে। আর সেই জিনিস কেষ্টর মা ফেলে দিতে যাচ্ছে! মুখ্যু মেয়েমানুষ আর কাকে বলে! ছেলেমেয়েরা হাঁ করে শুনছে সেই গল্প, কেষ্টর মা'র মনটাও একটু দোনামোনা হয়ে গেল। তবু সে বললো, এইটুকুনি তো প্রাণী, তার আবার মাংস খাবে কি?

সুবল খরগোশটার কান ধরে উঁচু করে বললো, এইটুকুনি? তাও কম করে হাফ কিলো মাংস হবে। তাই বা মিনি-মাংনা কে দিচ্ছে?

কেষ্টর মা বললো, ওসব অখাদ্য-কুখাদ্য আমি রাঁধতে জানি না!

সুবল উদারভাবে বললো, আমি রেঁধে দেখিয়ে দিচ্ছি। শিখে নাও।

সুবল নিজেই বার করে দিল একটা এক টাকার নোট। লক্ষ্মীকে বললো, যা তো মোড়ের দোকান থেকে দু' আনার আলু, এক আনার পিঁয়াজ দু' পয়সার আদা নিয়ে আয় তো! আর এক কোয়া রসুন ফাউ চেয়ে আনবি, বুঝলি? বলি তোমার ঘরে সর্ষের তেল আছে তো, না তাও নেই?

তার বিছানার তলা থেকে সুবল বার করলো বড় সাইজের ছুরি। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়ই শুধু এটা কাজে লাগে। সেই ছুরি দিয়ে সুবল খরগোশের ছাল ছাড়াতে বসলো। প্রথমেই সে কেটে বাদ দিল কান দুটো। হাত পায়ের নখ ছেঁটে দিল, তারপর ফাঁসিয়ে ফেললো পেট। অবিলম্বে বেরিয়ে এলো লাল টুকটুকে এক তাল মাংস।

ছেলেমেয়েরা গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছে। এই বস্তির জীবনে একটা অন্যরকম ঘটনা। কেষ্টর মায়ের ঘরের সামনের উঠোনে রীতিমতন উৎসব পড়ে গেছে। তোলা উনুনে সুবল নিজে রান্না চাপিয়েছে। পাছে সবাইকে ভাগ দিতে হয়, তাই সে

অন্যদের ভাড়া দিচ্ছে মাঝে মাঝে, যাঃ, যাঃ!

হ্যাঁ, একটা মনে রাখবার মতন ঘটনা বটে। মাসে একদিনও মাছ খায় কিনা সন্দেহ, সেই বাড়িতে মাংস! তার কি অপূর্ব স্বাদ। চেটেপুটে খেয়ে ছেলেমেয়েরা কলাইয়ের থালাগুলো এমন পরিষ্কার করে ফেললো যে আর না মাজলেও চলে। কেষ্টর মায়ের ভাগ্যে দুটো টুকরো মাত্র পড়েছিল, এককড়ি সেদিকে লোলুপভাবে তাকিয়ে বলতে লাগলো, মা, আমাকে আর একটু দে! এই দে না! কেষ্টর মা এক টুকরো ছেলেকে দিয়ে, অন্য মেয়েরা আবার চাইবার আগেই আর এক টুকরো পুরে দিলো নিজের মুখে। স্বাদটা লেগে রইলো বহুক্ষণ। সুবল ঠিকই বলেছিল, ঠিক যেন বেলের মোরব্বা!

সুবলের চোখে মুখে কৃতিত্বের হাসি!

পরদিন সকালে রায়বাবুদের বাড়িতে বাসন মাজতে যেতেই টুবলুর সঙ্গে দেখা। ঝকঝকে সুন্দর চেহারা টুবলুর। খরগোশ হারানোর কোন দুঃখের চিহ্ন তার মুখে লেগে নেই। কিন্তু চোখ বড় বড় করে পরিষ্কার রিনরিনে গলায় বললো, জানো কেষ্টর মা, আমাদের একটা খরগোশ না সিঁড়ি দিয়ে চুপিচুপি নেমে কোথায় পালিয়ে গেছে!

অলকা চোখের ইশারা করলেন। কেষ্টর মা যেন অন্য কিছু না বলে। কেষ্টর মা হেসে বললো, ওমা, তাই নাকি?

টুবলু বললো, হ্যাঁ, চুপি চুপি বেরিয়ে রাস্তায় নেমেই দৌড়ে পালিয়েছে। তারপর একটা কুকুর ওকে তাড়া করলো, ও তখন দৌড়োতে দৌড়োতে একটা বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। বাঘটা যেই তাড়া করছে, খরগোশটা অমনি একটা গর্তের মধ্যে।

টুবলু অনেকখানি গল্প বানিয়ে ফেলেছে। সেই গল্পে সে বিভোর। তার গল্পের উপসংহার হচ্ছে এই। খরগোশটা আবার এখানে ফিরে আসবে।

ঘর মুছতে মুছতে কেষ্টর মা লক্ষ্য করলো, টুবলু একা একা অন্য খরগোশটার সঙ্গে কথা বলছে আপন মনে। তাকে সে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, তোমার ভাই হারিয়ে গেছে তো! তোমার বুঝি খুব দুঃখ হচ্ছে? সে আবার ফিরে আসবে! যেই সন্ধে হবে, অমনি চুপি চুপি সিঁড়ি দিয়ে—

প্রথম দিনটা টুবলু এইরকমভাবে ভুলে রইল। পরের দিন কিন্তু সে আর শান্ত থাকতে পারল না। সাধারণত সে কাঁদে না, কিন্তু খাবার সময় সে হাতের ধাক্কায় ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে বললো, না, আমার আর একটা খরগোশ কোথায়! আমার আর একটা খরগোশ এনে দাও!

ভাত-তরকারি-মুরগির মাংস ছড়িয়ে ফেললো মেঝেতে। ধৈর্য হারিয়ে অলকা এক চড় কষালেন ছেলেকে। তখন টুবলুর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আর থামতেই চায় না। কেষ্টর মারও মনে দুঃখ লাগতে লাগল। অবোধ শিশু, ওকে তো বোঝানো যাবে না! দাদাবাবু অফিসের কাজে বাইরে গেছেন। তিনি থাকলে না হয় আর একটা খরগোশ কিনে এনে দিতে পারতেন। এদের তো টাকার অভাব নেই! একবাটি মুরগীর মাংস মাটিতে ফেলে দিল তো আর একবাটি নিয়ে এলেন বৌদি।

কয়েকদিন পর এক বিকেলবেলা রায়বাবুদের বাড়িতে কেউ নেই, শুধু আছেন রাঁধুনি। ছেলেকে মামাবাড়িতে রেখে কর্তা-গিন্নী গেছেন সিনেমা দেখতে। ঘরদোর খোলা, এ বাড়ির দাদা-বৌদিরা ঝি-চাকরদের খুব বিশ্বাস করে, তারাও বিশ্বাসের মর্যাদা রাখে।

ঘরদোর পরিষ্কার করে রাঁধুনির সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করলো কেষ্টর মা। বাবুরা বাড়িতে না থাকলে কাজ করেও সোয়াস্তি পাওয়া যায়। একটু বাদে রাঁধুনি বামনি বললো, ও কেষ্টর মা, তুই একটু বসবি। আমি একটা দোক্তা পাতা কিনে আনবো— খালি বাড়ি ফেলে তো আর যেতে পারি না!

কেষ্টর মা তখন সেই ফ্ল্যাটে একা। দরজা বন্ধ করে বারান্দায় দাঁড়ালো। রাঁধুনি তাড়াতাড়ি ফিরলে হয়, আবার আর এক বাড়িতে কাজ সারতে যেতে হবে। ছেলেটা ক'দিন ধরে ভুগে সদ্য সেরে উঠে পথ্য করেছে। দিন রাত খাই খাই করে! তার নোলা যেন শকশক করে সব সময়! মেজো মেয়েটা এক বাড়িতে সারা দিনের কাজ করতো—হঠাৎ তার চাকরি গেছে। সে বাড়ির বাবু নাকি মেয়েটার দিকে নজর দিয়েছিলেন, বাড়ির গিন্নীর

নজরে পড়ে কুরুক্ষেত্তর! সোমত্থ মেয়ে, এবার তার বিয়ে না দিলে চলে না। বিয়ে দিয়েই বা কি হবে! তার যা কপাল, কোনদিন কি সুখ সইবে?

হঠাৎ পায়ে কি একটা লাগতেই চমকে উঠলো কেষ্টর মা। একলা খরগোশটা কখন খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে তার পায়ে মুখ ঘষছে। এই কদিনেই একটু বড় হয়েছে, যেন একটা তুলোর দলা। টুবলু বাবু বড্ড ভালোবাসে খরগোশটাকে।

আদর করার জন্য কেষ্টর মা খরগোশটাকে কোলে তুলে নিল। খাদ্যের আশায় সেটা তার আঙুল শুঁকছে। কি সুন্দর গাটা, হাত দিলে কি রকম আরাম লাগে। হঠাৎ কেষ্টর মায়ের কানে একটা কথা বাজলো। সেই সেদিন তার ছেলে এককাঁড়ি বার বার বলছিল, মা আর একটু দে! মা আর একটু দে!

ন'মাসে ছ'মাসে ছেলেকে এক টুকরো মাছ কি মাংস খাওয়াবারও সাধ্য নেই। শুধু সেদিন সেই একটা রাত বড় তৃপ্তি করে খেয়েছিল, বড় আনন্দে কেটেছিল।

এই খরগোশটাও হঠাৎ বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়তে পারে না? এটা ভীতু, এটা ওঠে না বক্সের ওপর লাফিয়ে। এ বাড়ির গিন্নী মরা খরগোশ রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসতে বলে। একটা মরলে আর একটি মরতেই বা দোষ কি?

কেষ্টর মা খরগোশটার পিঠের চামড়া খিমচে উঁচু করে ধরলো। হাত বাড়িয়ে দিল বারান্দা থেকে রাস্তার দিকে। এইটুকু প্রাণী, এর বেঁচে থাকার কি আসে যায়? বাবুরা নাকি এইসব খরগোশ গুলি করে মারে। টুবলু যদি খুব কাঁদে, তার বাবা তার জন্য আবার খরগোশ কিনে দেবে। সুন্দর খরগোশটা লাল চোখ মেলে শান্তভাবে তাকিয়ে আছে। একটুও ভয় পায় নি। কেষ্টর মা মুঠো আলগা করে দিল।

মঞ্জরী

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছি সেই কতক্ষণ ধরে। কখন বাস আসবে তার ঠিক নেই। এতক্ষণে মাত্র একটা বাস এসেছিল, তাতে এত ভিড় যে পা রাখাও অসম্ভব। আমি হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে পারি না। অথচ বাসে যাওয়া ছাড়া আর তো কোনো উপায়ও নেই এখন। মধ্য কলকাতায় বিকেলবেলায় ট্যাক্সি পাওয়া একটা অলৌকিক ব্যাপার, ট্যাক্সি পাওয়ার চেয়ে একটা নতুন গাড়ি কিনে ফেলা অনেক সহজ।

বিরক্ত হয়ে ভাবছি শেষপর্যন্ত হেঁটেই যাবো কিনা, হঠাৎ এই সময়ে রাস্তার ওপারের একটা বইয়ের দোকান থেকে মঞ্জরী বেরিয়ে এলো। সঙ্গে আর একটি মেয়ে। আশ্চর্য, মঞ্জরী এতক্ষণ আমার এত কাছাকাছি ছিল আর আমি শুধু শুধু বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছি! ও দোকানের দিকে তাকিয়ে ছিলাম কয়েকবার, বেশ ভিড়, দু' একটি মেয়ের পিঠ দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু তেমন মনোযোগ দিই নি।

এক এক সময় মনে হয়, পৃথিবীতে কোনো ময়লা নেই, দুর্গন্ধ নেই, ঘাম নেই। কোথাও মানুষকে মানুষ মারছে না। মোলায়েম স্নিগ্ধ হাওয়ায় পৃথিবীটা ভরে গেছে। মঞ্জরীকে দেখলে আমার এই রকম হয়। একথাও স্বীকার করতে লজ্জা নেই মঞ্জরীকে দেখলে আমার বুক কাঁপে। কেন কাঁপে? পৃথিবীর কোনো বিশেষজ্ঞ এর ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

মঞ্জরী আমাকে এখনো দেখতে পায় নি। ডাকবো? মঞ্জরীর সঙ্গে আর একটি মেয়ে রয়েছে, তাকে আমি চিনি না। যাই হোক, আমার আর এখন বাসে ওঠবার তাড়া নেই, কোথায় যেন যাবার কথা ছিল তাও ভুলে গেছি।

মঞ্জরী তার সঙ্গের মেয়েটির সঙ্গে কথা বলায় খুব মগ্ন হয়ে আছে। দোকান থেকে বেরিয়ে ওরা উল্টোদিকের ফুটপাথ ধরেই হাঁটতে লাগলো। একটুক্ষণের মধ্যেই ওরা আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে।

রাস্তা না পেরিয়ে আমিও এ ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। এরকম করার যে কি মানে হয় কে জানে? আমি কি এক্ষুনি রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে মঞ্জরীর নাম ধরে ডাকতে

পারি না? সেটাই তো সবচেয়ে স্বাভাবিক। কিন্তু এই রাস্তাটা যেন একটা নদী, আমরা দু'জনে দু'দিকে রয়েছি, পার হবার উপায় নেই।

একটা ট্যাক্সি দারুণ শব্দে ব্রেক কষলো। একটি ছেলে প্রায় চাপা পড়ে যাচ্ছিল। একটুর জন্য বেঁচে গেছে। বেঁচে গেল ট্যাক্সিড্রাইভারটিও। সেই শব্দে রাস্তার সব লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে, তাকিয়েছে সেইদিকে, মঞ্জরীরও। এবারও মঞ্জরী আমাকে দেখতে পেল না। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, এই মঞ্জরী–

মনে মনে আমি দেখতে চাইছিলাম, মঞ্জরীই রাস্তা পেরিয়ে আসে কি না, কিংবা আমাকে যেতে বলবে ওদিকে। যেন এর ওপরেই অনেকখানি নির্ভর করেছে। মঞ্জরী আমার ডাক শুনতে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক তাকালো, তারপর আমাকে দেখতে পেয়ে হাসি ঝলমল করে তুললো মুখখানা। আমি তখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে ডাকলো না, মঞ্জরীই সেই মেয়েটির সঙ্গে চলে এলো রাস্তার এদিকে। যাক, একটা ব্যাপার চুকে গেল।

মঞ্জরীকে দেখার পর আমার আর কোথাও যাবার থাকে না, কোনো কাজের কথাই মনে থাকে না, কিন্তু মুখে সে কথা বলা যায় না। আমি একটু ব্যস্ত ভাব দেখিয়ে বললুম, এই এদিকে এসেছিলাম একটু বিশেষ কাজে। তোমরা কোথায় যাচ্ছো?

—বই কিনতে এসেছিলাম। একে চেনেন, এর নাম সর্বাণী। আপনাদের বাড়ির কাছেই থাকে।

মঞ্জরী দেখতে সুন্দর, বড্ড বেশী সুন্দর—এত সুন্দর যে একটু ভয় করে। কেননা, কোনো সুন্দর জিনিসই পৃথিবীতে বেশীদিন থাকে না। সর্বাণী মেয়েটি সাদামাটা। দেখতে খারাপ নয়, তবে কেউ সুন্দরীও বলবে না। অন্তত মঞ্জরীর পাশে দাঁড়ালে। সর্বাণী বোধহয় একটু বেশী লাজুক। আমাকে দেখে ছোট্ট একটু নমস্কার করলো।

আমি মঞ্জরীকে বললাম, বাড়ি ফিরবে কি করে? এখন তো বাসে-ট্রামে উঠতে পারবে না। একটা মিছিল বেরিয়েছে, তাই ট্র্যাফিক জাম।

মঞ্জরী হাসতে হাসতে বললো, আমি বাড়ি ফিরবো না।

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় যাবে?

—কোথাও একটা গেলেই হয়। এখনো ঠিক করিনি।

এখন, এই মুহূর্তে সর্বাণীর উচিত বিদায় নেওয়া। আমাদের দু'জনকে আলাদা থাকতে দেওয়া। এখন মঞ্জরী বাড়ি যাবে না, আমারও কোথাও যাবার নেই, আমরা পৃথিবীর শেষ সীমান্তে যেতে পারি।

মঞ্জরী অপ্রত্যাশিতভাবে বললো, সুনীলদা, আপনি একটু সর্বাণীকে পৌঁছে দিন না। ও তো আপনার বাড়ির দিকেই।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আমি তো এখন বাড়ি ফিরবো না।

—কেন ফিরবেন না? না হয় আমার কথা শুনেই একটু ফিরুন। সর্বাণী যদি বাসে উঠতে না পারে—আপনার উচিত নয় ওকে পৌঁছে দেওয়া?

সর্বাণী অপ্রস্তুত হয়ে বললো, না না, আমাকে পৌঁছে দিতে হবে না। আমি ঠিক যেতে পারবো।

মঞ্জরী রীতিমতন ধমক দিয়ে বললো, না, তুই দাঁড়া। সুনীলদা তোকে পৌঁছে দেবে।

আমি বললুম, তা না হয় পৌঁছে দেবো, কিন্তু তোমাকে রাস্তার মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে যাবো নাকি? তুমি কোথায় যাবে?

মঞ্জরী কি বুঝতে পারছে না, আমি শুধু ওর সঙ্গে যাবার জন্যই ব্যাকুল। কতদিন নিরালায় ওর সামনে মুখোমুখি বসে কথা বলিনি!

মঞ্জরী খুব দুষ্টু দুষ্টু মুখ করে বললো, আপনি কি ভাবছেন আমি নিরুদ্দেশে যাচ্ছি নাকি?

—তুমি যে বললে বাড়ি ফিরবে না? সন্ধের পর বেশীক্ষণ তো, তোমায় বাইরে থাকতে দেখিনি!

—বাড়িতে তো ফিরবোই না! এই তো কাছে, আমহার্স্ট স্ট্রীটে আমার মামার বাড়ি—ক'দিন ধরে ওখনেই আছি।

—বাঃ। তাহলে তো খুবই ভালো হলো। চলো, কোথাও বসে একটু চা খাই। কিংবা, কফি হাউসে যাবে?

—এখন? ইমপসিবল্! আমাকে সাড়ে ছটার মধ্যে ফিরতেই হবে।

প্রথমবার যদি রাজী না হয়, তাহলে হাজার অনুরোধ করলেও মঞ্জরীকে আর রাজী করানো যাবে না, আমি জানি। আমিও গম্ভীরভাবে বললাম, ঠিক আছে, তাহলে চলি—

—একি, আপনি যে বললেন সর্বাণীকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন?

—আমি সত্যি এখন বাড়ি ফিরবো না, আমার অনেক দেরি আছে।

সর্বাণী রীতিমতন লজ্জা পেয়ে বলতে লাগলো, সত্যি কোনো দরকার নেই, আমি নিজেই যেতে পারবো, রোজ যাই—

মঞ্জরী আমার চোখে চোখ রেখে বললো, সুনীলদা, প্লীজ আজ ওকে পৌঁছে দিন। আমার একটা কথা রাখবেন না?

মঞ্জরী আমার কোনো কথা রাখবে না, কিন্তু ওর কথা আমাকে রাখতেই হবে। এই ওর জোর। এই জোর ও কোথা থেকে পেল কে জানে। কিন্তু আমিও তো অগ্রাহ্য করতে পারি না।

সর্বাণীকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিলাম ঠিকই, কিন্তু সারা রাস্তা সে আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বললো না। বলবেই বা কেন?

মঞ্জরীর সঙ্গে আবার একদিন দেখা হলো রমেনের বাড়িতে। রমেনের বোনের বিয়ে ছিল সেদিন। এক গাদা ভিড় ঠেলে এসে মঞ্জরী আমাকে বললো, সুনীলদা, আপনাকে আমি ভীষণ খুঁজছি। আপনার সঙ্গে আমার খুব দরকার।

লাল রঙের বেনারসীতে মঞ্জরী একেবারে রাজেন্দ্রাণীর মতন সেজেছে। তার মুখেও একটা লালচে আভা। আমি বললুম, উঃ কি দারুণ সেজেছো—আজ তোমারই বিয়ে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

প্রশংসায় লজ্জা পায় না মঞ্জরী। ছেলেমানুষের মতন খুশী হয়। বললো, আমি ঠিক জানতুম, আপনি প্রশংসা করবেন। আপনার কথা ভেবেই তো এরকম সাজলুম।

—সত্যি!

—সত্যি না তো কি মিথ্যে কথা বলছি!

—আমার তো আজ এখানে আসবার কথাই ছিল না। আমার আজ জামসেদপুরে যাবার কথা—নেহাত ট্রেন বন্ধ—

—আমি ঠিক জানতুম, আপনি আসবেন!

এসব প্রেমের কথা নয়। ইয়ার্কির কথা। মঞ্জরী এরকম বলতে ভালোবাসে। আমিও শুনতে ভালোবাসি। আশেপাশের লোকদের অগ্রাহ্য করে বললো, আপনাকে আমি ক'দিন ধরে যা খুঁজছি না! এত দরকার আপনার সঙ্গে।

—কোথায় কোথায় খুঁজলে বলো তো?

—সব জায়গায়! কোথাও আপনাকে পাওয়া যায় না! কোথায় থাকেন সারাদিন?

—আমার বাড়িতে একবারও খোঁজ করেছিলে? একজন মানুষকে পাওয়ার সবচেয়ে সোজা উপায় তো তার বাড়িতে—

—আপনি একবার আমার খোঁজ নিতে পারেন না?

—তুমি তো সব সময়ই ব্যস্ত। কত তোমার অ্যাডমায়ারার! যাকগে আমার সঙ্গে কি দারুণ দরকারী কথা আছে বলছিলে?

—আমার ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কার্ডটা হারিয়ে গেছে। কি করে রিনিউ করতে হয় আমি জানি না। আপনি একটু করে দেবেন?

আমি একটু দমে গেলাম। একটু কেন, বেশ খানিকটা। এই দরকার!

খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, এইজন্য? এ কি আর কেউ করে দিতে পারতো না? এটা তো এমন কিছু শক্ত কাজ নয়?

—আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না।

—এইজন্যই বুঝি আমাকে তোমার মনে পড়ে?

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে ভুরু কুঁচকে অদ্ভুতভাবে হাসলো মঞ্জরী। এ মেয়েকে ঠিক ছলনাময়ীও বলা যায় না। মঞ্জরী শুধু মঞ্জরীর মতন। ওকে একটু আঘাত দেবার জন্য আমি বললাম, আজকাল আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বেশী যাই না। ও কাজ আমার দ্বারা হবে না। অন্য কারুকে বলো।

গাঢ় অবিশ্বাসের চোখে মঞ্জরী আমার দিকে তাকালো, একটু ম্লান হয়ে বললো, আপনি আমার জন্য এটুকু করে দেবেন না? কার্ডটা হারাবার পর থেকেই আপনার কথা ভেবে রেখেছি।

—আচ্ছা, আচ্ছা দেবো'খন। আমাকে দেখলেই তোমার শুধু কাজের কথা মনে পড়ে। আমি যে তোমার জন্য অতদূরে যাবো—তার জন্য আমাকে তুমি কি দেবে?

মঞ্জরী আমার বাহুতে ওর হাত ছুঁইয়ে বললো, আপনি কি চান বলুন?

—আমি কেন চাইবো? তুমি নিজে থেকে বুঝি দিতে পারো না?

—আপনি না চাইলে আমি বুঝবো কি করে? বলুন, আপনি কি চান?

—যা চাইবো, তাই-ই দেবে?

—চেষ্টা করবো।

আমার বাহুতে মঞ্জরীর হাত, আমি চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ঝর্ণার জলের মতন ঝকঝকে মুখ, ওর দৃষ্টিতে কোনো মালিন্য নেই। আমি আর কি চাইবো? দেবী মূর্তির সামনে বসে স্বামী বিবেকানন্দও কিছু চাইতে পারেন নি। এই হচ্ছে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য এর দিকে তাকিয়ে থাকলে বুক শিরশির করে, কিন্তু এই সৌন্দর্য কখনো সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। গাছ থেকে ছেঁড়ার পরের মুহূর্তেই ফুল আর সেই ফুল থাকে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, না, কিছু চাই না।

—সেইজন্যই তো আপনাকে এত ভালো লাগে। আপনি কিছু চান না।

—আর সবাই বুঝি চায়?

—আপনি বুঝি জানেন না? পৃথিবীতে সবাই তো সব সময় হাত বাড়িয়ে বলছে, দাও, দাও, আরও দাও—

—আমি সে কথা বলিনি! তোমার কাছে অন্যরা অনেক কিছু চায়?

মঞ্জরী আমার হাতের ওপর ছোট্ট একটা চড় মেরে বললো, ধ্যাৎ!

মঞ্জরী এই পৃথিবীতে এসে অনেক কিছু পেয়েছে। জন্মেছে সচ্ছল পরিবারে, গা ভরা রূপ ও স্বাস্থ্য—সেই সঙ্গে ওর মালিন্যহীন প্রাণশক্তি। সুঠাম সুবেশ যুবকরা মঞ্জরীর চারপাশে তো ঘুরঘুর করবেই। মঞ্জরীর সঙ্গে দেখা করার বেশী সুযোগ আমার হয় না। কখনো কখনো খুব ইচ্ছে হয়, কোথাও নিরালায় মঞ্জরীকে নিয়ে বসে থাকি—আর কোন চোখ সেখানে উঁকি দেবে না—আমি মঞ্জরীকে একটু ছুঁয়ে দেখবো। ঐ রূপ, ঐ সৌন্দর্যের বিভা সব সময় মনের মধ্যে ছায়া ফেলে থাকে। অবশ্য মঞ্জরীর সঙ্গে সেরকমভাবে দেখা হয় খুব কমই। মঞ্জরী যখন আমাকে দেখে, কথা বলে খুবই অন্তরঙ্গভাবে—আবার যখন দেখা হয় না তখন ভুলে যায় আমাকে।

হঠাৎ কোনো কাজের দরকার হলে মনে পড়ে আমাকে। হঠাৎ বিকেলবেলা অফিসে টেলিফোন বেজে ওঠে, তুলেই শুনতে পাই মঞ্জরীর ব্যস্ত গলা, সুনীলদা, কোথায় আপনি? বারবার টেলিফোন করেও পাওয়া যায় না।

আমি শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করি, তুমি কতবার টেলিফোন করেছিলে?

—অনেকবার! আপনি আমাকে একবার টেলিফোন করতে পারেন না?

—অকারণে তোমাকে টেলিফোন করবো কেন?

—অকারণে? আমার সঙ্গে বুঝি আপনার কথা বলতে ইচ্ছে করে না?

—ইচ্ছে করলেই কি পৃথিবীতে সবকিছু হয়? আমার তো আরও অনেক কিছু

ইচ্ছে করে। যাকগে, কি জন্য হঠাৎ তলব?

—কিছুর জন্য না! এমনিই। শুনুন, আজ সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে আসবেন। আসতেই হবে কিন্তু!

—আজই? অন্য একদিন গেলে হয় না?

—না, না, আজই। কোনো কথা শুনতে চাই না, আসতে হবেই! আপনার সঙ্গে ভীষণ দরকার।

অন্য কেউ যদি পাশ থেকে শুনতো এই কথাবার্তা, তাহলে কি মনে করতো না যে আমাদের দু'জনের মধ্যে গভীর টান? এমন জোর দিয়ে তো যে-কোনো মেয়ে ডাকতে পারে না। আমারও তো না গিয়ে উপায় নেই।

এবারও গিয়ে যথারীতি নিরাশ হলাম গোপনে। খুবই অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। মঞ্জরীর এক মামা থাকেন নিউগিনিতে। তিনি একখানা মস্তবড় খাতা-ভর্তি ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন, নিজের টাকাতেই ছাপাবেন। কিন্তু তার আগে, মঞ্জরী চায় আমি যেন সেটা আগাগোড়া পড়ে আমার মতামত জানাই। আমি তো লেখক, তাই আমার মতামতের মূল্য আছে। তা ছাড়া বানান ও ভাষাও ঠিক করে দিতে হবে আমাকে।

আমি বললাম, এইজন্য টেলিফোনে এত জরুরী ডাক? এটা তো আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেও পারতে।

—কেন, আপনাকে আমি ডাকতে পারি না? আপনার সময় নষ্ট হলো?

—তা তো হলেই! তাছাড়া এসব আজেবাজে লেখা আমার পড়তে ভালো লাগে না। এই রকম ঘুচিমুচি হাতের লেখা—

—সুনীলদা, আমার জন্য আপনি এইটুকু কষ্ট করবেন না?

সেই অধিকারহীন দাবি জানায় মঞ্জরী। কি করে যেন জেনে গেছে, এক হিসেবে আমি ওর ক্রীতদাস। ও যদি বলে, সুনীলদা আমার জন্য আপনি সাপের মাথার মণি এনে দিন! আমার জন্য এটুকু কষ্ট করবেন না?—তাহলেও আমাকে সাপের মাথার মণির জন্যই যেতে হবে।

মঞ্জরীর বিয়েতে আমি যাইনি। মঞ্জরী যখন নেমন্তন্ন করতে এসেছিল, আমি বাড়িতে ছিলাম না, নিজের মুখে নেমন্তন্ন জানাবার সুযোগ পায় নি। আমিও একটা ছুতো করে সেই সময়টা কলকাতার বাইরে চলে গেলাম। আমার ঈর্ষা খুব প্রবল। আমার চোখের সামনে মঞ্জরীর হাতের ওপর কেউ হাত রাখবে—এটা সহ্য করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। যদিও জানতাম, মঞ্জরীর একদিন তো বিয়ে হবেই—কিন্তু সে দৃশ্য আমার নিজের চোখে দেখার দরকার নেই। পৃথিবীতে আমার চোখের আড়ালে তো কত রূপ ঝরে যায়, কত সৌন্দর্য অন্যের ভোগে লাগে, তা নিয়ে তো আর আমার মন খারাপ লাগে না।

বিয়ের পর মঞ্জরী চলে গেল বাঙ্গালোরে। ওর স্বামী ওখানে খুব একটা বড় কাজ করে। মঞ্জরী ওখানেই থাকবে। সুতরাং আমার সঙ্গে ওর আর দেখা হবে না। অফিস থেকে আমাকে সাউথ ইন্ডিয়া পাঠাতে চেয়েছিল বিশেষ কাজে, আমি কিছুতেই রাজী হলুম না যেতে। মাঝে মাঝে মঞ্জরীর খবর এর-ওর মুখে শুনতে পাই। মনে মনে ভাবি, মঞ্জরী যেন সুখে থাকে, ভালো থাকে।

এলিট সিনেমার সামনে মঞ্জরীকে দেখে সত্যি খুব চমকে গিয়েছিলাম। কবে যে কলকাতায় এসেছে, তা-ও শুনিনি। বিয়ে হয়েছে দু'বছর আগে, কিন্তু একটুও বদলায় নি চেহারা। কিংবা হয়তো বদলেছে, আমার চোখে ধরা পড়ে নি। পাশে দাঁড়িয়ে ওর স্বামী, বেশ সুপুরুষ ও ভদ্র।

মঞ্জরীই আমাকে প্রথম দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বললো, এই সুনীলদা, ঐই তো আজ ধরেছি। আমাদের বিয়েতে যান নি কেন?

প্রশ্নটা এড়িয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, মঞ্জরী, তুমি কেমন আছো?

—ভালো আছি।

আবও কিছুক্ষণ কথা হলো। কিন্তু সে সব আমি মন দিয়ে শুনি নি। একটি কথাই আমার কানে বাজতে লাগলো, ভালো আছি। ভালো তো থাকবেই, দুঃখ মানায় না

মঞ্জরীকে, আমিও চাই মঞ্জরী ভালো থাকুক। কিন্তু আমাকে আর দরকার নেই মঞ্জরীর। এবার আর বললো না, একটা দারুণ দরকারে আপনাকে খুঁজছি।

আর বলবে না, আমার জন্য এইটুকু কষ্ট করবেন না?

যে-কথার উত্তরে আমি বলতে পারতাম, তার বদলে আমাকে কি দেবে তুমি?

—আপনি কি চান বলুন?

—আমি কিচ্ছু চাই না।

এসব কথা আর বলা হবে না। বুকের মধ্যে সরু সুতোর মতন একটা ব্যথা ঘুরে বেড়ায়। বিদায় নেবার আগে মঞ্জরী বললো, সুনীলদা, আপনার খবর-টবর সব ভালো তো? ভালো আছেন তো?

আমি হেসে উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, ভালো আছি। খুব ভালো আছি।

তাঁর পত্র

গেটের কাছে অনেকক্ষণ ধরেই ঘুরঘুর করছিল ছেলেটি। এক সময় সাহস করে কলিংবেল বাজালো।

দরজা খুলল একজন প্রৌঢ় লোক, কোন কিছু জিজ্ঞেস না করে প্রশ্নসূচক চোখে চাইল ছেলেটির দিকে। ছেলেটির বয়েস একুশ কি বাইশ, প্যান্ট ও শার্ট পরেছে, কিন্তু দেখলে মনে হয় ও দুটেই তার নিজস্ব নয়, প্যাণ্টটা বেশ বড় ও ঢলঢলে, শার্টটা খুবই ছোট। বুটজুতো পরেছে, তবে জুতোর ওপর দিকটা ফাটা ফাটা।

ছেলেটি সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করে বলল, গগনবাবু কি বাড়ি আছেন?

—আছেন।

—একটু দেখা করতে পারি?

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি ছেলেটির আপাদমস্তক আর একবার দেখে নিয়ে বলল, কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—আমি? আমি বৌবাজারে থাকি।

—বিশেষ কোন দরকার আছে? উনি এই সময়টা ব্যস্ত থাকেন।

—আমি, মানে, গগনবাবুর চেনা একজনের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে এসেছি—ওনার সঙ্গে একটু কথা বলব।

—ঠিক আছে, এস।

ছোট বারান্দা পেরিয়ে বসবার ঘর, সেখানে ঢুকতে গিয়ে ছেলেটি জুতো খুলতে যাচ্ছিল, প্রৌঢ়টি বলল, জুতো খুলতে হবে না, ঠিক আছে।

ভেতরে সোফা-কৌচ সাজানো। ছেলেটি বসল অত্যন্ত সন্তর্পণে। ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। দেয়ালের ক্যালেন্ডারে বিদেশের কোন কুসুম-উদ্যানের অপরূপ দৃশ্য। অন্যদিকের দেয়ালে একটা চিত্রিত মুখোশ।

চটি ফটফটিয়ে এলেন গগনেন্দ্রনাথ, ষাটের কাছাকাছি বয়েস, স্বাস্থ্য এখনও ভাল আছে, তবে মাথার চুল সব সাদা। হাতে একখানা ইংরেজি বই, সেই বইটা খোলা অবস্থাতেই ধরা রইল, গগনেন্দ্র ভুরু কুঁচকে তাকালেন ছেলেটির দিকে। এই ভুরু কোঁচকানো কোন বিরক্তির চিহ্ন নয়, চশমা না থাকলে তিনি এইভাবেই তাকান।

ছেলেটি শশবাস্তে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টেবিলে একটা ধাক্কা খেল। বেশ লেগেছে কিন্তু ব্যথার জায়গায় হাত বুলোবারও সুযোগ পেল না তাড়াতাড়ি এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গগনেন্দ্রনাথের পায়ের কাছে। গগনেন্দ্রনাথ আঁতকে উঠে সরে যাবার চেষ্টা করলেন। দেশের আবহাওয়া এমনই বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল যে কোন অচেনা যুবককে কাছে এগিয়ে আসতে দেখলেই মানুষ ভয় পেত। এখানে ব্যাপারটা সেরকম নয়। ছেলেটি প্রণাম করতে গিয়েছিল গগনেন্দ্রনাথের পায়ে হাত দিয়ে, অতি ব্যস্ততার জন্য তার ভঙ্গিটি স্বাভাবিক হয় নি।

গগনেন্দ্রনাথ ব্যাপারটা হৃদয়ংগম করতে পেরে বললেন, আরে, হয়েছে, হয়েছে। বস, বস।
ছেলেটি তবু দাঁড়িয়ে রইল।
গগনেন্দ্রনাথ নিজে বসে তারপর হুকুম করলেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস! কি ব্যাপার?
ছেলেটি বসে পড়ে, মাথা নিচু করে নখ খুটছে। কথা খুঁজে পাচ্ছে না। গগনেন্দ্র-নাথের বিশাল ব্যক্তিত্বের সামনে ছেলেটি খুবই ছোট হয়ে গেছে।
গগনেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, কি নাম তোমার?
—সত্যকাম দত্ত।
—কোথায় থাক?
—বৌবাজারে।
—আমার কাছে কি জন্য এসেছ?
ছেলেটি আবার ইতস্তত করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমি এবার পার্ট টু পরীক্ষা দিয়েছি। আমার ইচ্ছে আছে, পাস করে ডাক্তারি পড়ব।
—তা বেশ তো!
—আমি খুব ছোটবেলা থেকেই ভেবে রেখেছিলাম, আমি বড় হয়ে ডাক্তারি পড়ব।
—ডাক্তারিতে আজকাল ভর্তি হওয়াই তো খুব শক্ত। ভালো রেজাল্ট না করতে পারলে তো সুবিধে হবে না!
—আমার আশা আছে, আমার রেজাল্ট ভালোই হবে। আরও একটু ভালো হত, যদি পরীক্ষার আগেই আমার টাইফয়েড না হত! সেইজন্যই বোধহয় স্কলারশীপ পাব না—
—তুমি ম্যাট্রিকে কোন্ ডিভিসানে গিয়েছিলে?
—ম্যাট্রিক তো নয়, স্কুল ফাইন্যাল। তাতে স্কলারশীপ পেয়েছিলাম—তা না হলে তো আমার পড়াশুনোই হত না!
—হুঁ, বেশ।
—সেইজন্যই ভাবছি, এবার যদি স্কলারশীপ না পাই, তাহলে ডাক্তারি পড়ব কি করে?
গগনেন্দ্রনাথ মনে মনে শঙ্কিত হলেন, এ তো মনে হচ্ছে সাহায্য চাইবার আবেদন।
গগনেন্দ্রনাথ হাতের বইখানার দিকে মনোযোগ দিলেন। দু-এক লাইন পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি করতে পারি, বল তো?
—আপনি আমাকে একটা থাকার জায়গা দেবেন?
—কেন, তোমার থাকার জায়গা নেই? বৌবাজারে এখন কোথায় থাকো?
—একটা মেসে। সেখানে তিরিশ-বত্রিশজন থাকে। আমার কাছ থেকে পয়সা অনেক কম নেয়। কিন্তু ওখানে পড়াশুনো করা যায় না। খুব হৈচৈ হয়। ওখানে থাকলে আমার ডাক্তারি পড়া অসম্ভব; তা ছাড়া স্কলারশীপ না পেলে খরচই বা চালাব কি করে?
—ধর, তুমি যদি থাকার জায়গা পেয়েও যাও, তারপর পড়ার খরচ চালাবে কি করে? ডাক্তারি পড়ার খরচ তো কম নয়!
—সে আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেব। ডাক্তারি আমাকে পড়তেই হবে। আমাদের মেসের এক ভদ্রলোক আমাকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু আমি চাকরি করব না, পড়ব।
—তোমার বাবা, তোমার বাড়ির লোকজন, কোথায় থাকেন?
—আমার বাড়ির লোকজন কেউ নেই।
—হুঁ! দ্যাখো, তোমার পড়াশুনোর দিকে এত উৎসাহ, তোমাকে দেখে আমার ভালোই লাগছে। তোমাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশীই হতাম। কিন্তু ভাই আমার বাড়িতে তো তোমাকে রাখতে পারছি না। আমার বাড়িতে জায়গা তো নেই। বাড়ি-ভর্তি লোকজন, আমার বড় ছেলের বিয়ে হল গত মাসে।
—যে-কোন একটা ছোটখাটো ঘর, ছাদে কিংবা সিঁড়ির নিচে, আমি যাতে একটু পড়াশুনো করতে পারি।

—সে রকম জায়গাও নেই। তাছাড়া আর একটা কথা তোমাকে খোলাখুলিই বলছি—তোমাকে তো ভাই আমি চিনি না, শুনি না—একজন অজ্ঞাতকুলশীলকে তো বাড়িতে জায়গা দেওয়া যায় না!

ছেলেটি একটুক্ষণ চুপ করে রইল। গগনেন্দ্রর প্রখর চোখের দিকে তাকিয়েই বেশীক্ষণ চোখ রাখতে পারল না। হাঁটু দুটোকে জোড়া করে আবার ফাঁক করলে। সোফার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হেলান দিয়ে বলল, আমি আপনার খুব অচেনা নই। আমার মায়ের নাম মমতা।

ছেলেটি খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল বলেই বোধহয় গগনেন্দ্র ঠিক শুনতে পেলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মায়ের কি নাম বললে? আমি চিনি?

—আমার মায়ের নাম মমতা।

—মমতা? মমতা? তোমার বাবার নাম কি?

ছেলেটি আরও আস্তে আস্তে তখন খুব ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, আমার বাবাকে আমি কখনো দেখিনি। আমার মা বলেছিলেন, আমার বাবার নাম গগনেন্দ্রনাথ দত্ত।

গগনেন্দ্র আমূল চমকে উঠলেন। প্রায় চিৎকার করে বললেন, মমতা? মিথ্যে কথা বলেছে। সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। মমতা কোথায়? সে তো বেনারসে—

—বেনারসেই আমার জন্ম।

—এখন সে কোথায়?

—মা মারা গেছেন।

গগনেন্দ্র নির্বাকভাবে তাকিয়ে রইলেন ছেলেটির দিকে। ছেলেটির মুখে মমতার মুখের আদল আছে। কুড়ি-বাইশ বছর আগে মমতাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কাশীতে। অবনী সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে অবনী বলেছিল, মমতা এক ধনী মাড়োয়ারীর নজরে পড়েছে, তখন তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

বিধবা হবার পর মমতাকে গগনেন্দ্র আর অবনী একটা বাড়ি ভাড়া করে দিয়েছিলেন রামবাগানে। মমতার শরীরে তখন রূপের আগুন, আত্মীয়স্বজন-হারা নিরাশ্রয় সেই মেয়েটিকে অন্যরা ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেতই—গগনেন্দ্র আর অবনী সে সুযোগ দেন নি, তাঁরা দুজনে মিলেই ভাগ করে নিয়েছিলেন। তখন তাঁদের দুজনেরই মধ্য-যৌবন—ভোগ-বাসনা তখন খুব তীব্র হয়, কয়েকটা মাস খুব মাতামাতি করে কেটেছিল! অবনী আর গগনেন্দ্র দুজনেই বিবাহিত, বাড়িতে ছেলেপুরে আছে—সুতরাং ব্যাপারটা চালাতে হয়েছিল অতিশয় গোপনে।

কিছুদিন বেশ ভালই কেটেছিল, কিন্তু গণ্ডগোল লাগল অন্যদিক থেকে। মমতাকে যে পাড়ায় ঘর ভাড়া করে রাখা হয়েছিল, সে পাড়ার কয়েকজন মস্তান ছেলের নজর পড়েছিল মমতার দিকে। তারা পেছনে লাগল। সে পাড়া থেকে উঠে গিয়েও নিস্তার পাওয়া গেল না—ছেলেগুলো ঠিক গন্ধ শুঁকে শুঁকে এল এবং হামলা করতে লাগল। ব্যাপারটা এমনই যে..এ-জন্য পুলিসে খবর দেওয়া যায় না। শেষপর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়াল যে অবনী আর গগনেন্দ্র মমতার কাছে গেলে সাংঘাতিক একটা কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। মমতার বাড়ির সামনে মস্তান ছেলেগুলো চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেয়, তারা ওদের দেখলেই হৈচৈ বাধিয়ে পাড়ার সব লোক জড় করবে।

সবচেয়ে বড় ভয়, পারিবারিকভাবে জানাজানি হয়ে যাবার ভয়। গগনেন্দ্র একবার ভেবেছিলেন, তিনি বেমালুম কেটে পড়বেন। অবনীরও তখন সেই রকম মনোভাব। কিন্তু মমতাকে একেবারে এসব নেকড়েদের মধ্যে ছেড়ে দেবারও বিপদ আছে। পুরোপুরি বেশ্যা হবার মতন বুদ্ধি নেই তার, সে নরম স্বভাবের মেয়ে। যদি পুলিসে ধরা পড়ে আর কান্নাকাটি করে সব বলে দেয়—তাহলেই গগনেন্দ্র আর অবনীর নাম জড়িয়ে পড়বে।

শেষপর্যন্ত ঠিক করলেন, মমতাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়ার। আর কোন উপায়ান্তর নেই। অবনীই সেই ভার নিয়েছিল। বেনারসই বাঙালী বিধবাদের আদর্শ জায়গা। গগনেন্দ্র বেশ কিছু টাকা দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর সন্দেহ হয়েছিল, অবনী বেনারসে গিয়ে আরও কিছুদিন ফুর্তি লুটবে। সুতরাং অবনীরই বেশী টাকা দেওয়া

উচিত।

সে-সব কতকাল আগের কথা। কুড়ি-বাইশ বছর পেরিয়ে গেছে। রক্তের জোর কমে যাওয়ায় ওসব এখন অতীতের দুঃস্বপ্ন। অবনী মারা গেছেন গত বছর, হঠাৎ হার্ট স্ট্রোকে একদিনেই শেষ। গগনেন্দ্র খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সাবধানী, সিঁড়ি দিয়ে ওঠেন আস্তে আস্তে, তাঁর মেজমেয়ের দুই সন্তান—নাতি-নাতনীদের নিয়ে তিনি এখন পরিতৃপ্ত দাদু।

একটা কথা গগনেন্দ্রর স্পষ্ট মনে আছে, বেনারস যাবার সময় মমতা গর্ভবতী ছিল না। সেরকম কোন কথা সে জানায় নি ঘুণাক্ষরেও। সুতরাং তার পরেও যদি কিছু হয়ে থাকে, সে দায়িত্ব অবনীর কিংবা বারো-ভূতের। ওঃ, অবনীটা এত শয়তান, কোনদিন এসব কথা বলে নি। ভাবতে ভাবতে গগনেন্দ্রর ঘাম এসে গেল।

গগনেন্দ্র ছেলেটির দিকে তীব্র চোখে চাইলেন। এ ছেলেটা কি তাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছে? একটি পয়সাও দেবেন না তিনি, দেখা যাক ও কি করতে পারে। অতদিন আগেকার ব্যাপার, স্ক্যান্ডাল রটালেও কেউ বিশ্বাস করবে না। গগনেন্দ্র সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ, তাঁর বিরুদ্ধে ঐটুকু একটা ছেলের মুখের কথার কি মূল্য আছে!

গগনেন্দ্র কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ এতদিন বাদে তুমি আমার কাছে এসেছ কি মতলবে?

ছেলেটি লজ্জায় প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে বলল, আমি আসতাম না। কিন্তু কলকাতা শহরে কে আমাকে থাকার জায়গা দেবে? টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে আপনার ঠিকানা পেলাম—

—টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে তো অনেক লোকেরই নাম ঠিকানা থাকে। আমি তোমাকে জায়গা দিতে পারব না।

—আমার মা বলেছিলেন, যদি কখনো কোন বিশেষ দরকার হয়, আপনার সঙ্গে দেখা করতে—এতদিন দেখা করি নি, আমার লজ্জা করত।

—মমতা যে তোমার মা, এর কোন প্রমাণ আছে?

—প্রমাণ? মানে, না তো। প্রমাণ কি থাকবে?

—তোমার মা কবে মারা গেছেন?

—তিন বছর সাড়ে তিন বছর আগে। আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে থাকতাম।

—তোমার মা আমার ছাড়া আর কারুর নাম বলেন নি?

—না তো। মনে পড়ছে না।

—তোমার মাকে আমি সামান্য চিনতাম। কিন্তু তার এসব কথা বলার মানে কি?

ছেলেটা কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। মাথা নিচু করে বসে রইল। গগনেন্দ্র একবার ভাবলেন, কিছু টাকা দিয়ে ছেলেটিকে বিদায় করবেন। মনটা একটু নরম হয়ে এসেছিল। মমতা অবনীর আগেই মারা গেছে। তবু সে অবনীর নাম বলে নি। লোহার কারবার করে অবনী শেষ দিকে ফুলে উঠেছিল। ব্ল্যাকমেল করতে হলে তাঁর চেয়ে অবনী অনেক বেশী শাঁসালো মক্কেল। তবু মমতা তাঁর নাম করেছে। গগনেন্দ্রর বরাবরই সন্দেহ ছিল, মমতা অবনীর চেয়ে তাঁকেই বেশী ভালবাসে। অবনীর চেহারা ছিল গরিলার মতন, মেয়েমানুষের ভালবাসার মূল্য দেবার ক্ষমতা ছিল না তার!

গগনেন্দ্র এখন বৃদ্ধ, মমতা মারা গেছে—তবু যৌবন বয়সের ভালবাসার স্মৃতি মনটা নরম করে দেয়। অবনী বেশী টাকাপয়সা খরচ করলেও মমতা যে অবনীর চেয়ে গগনেন্দ্রকেই বেশী ভালবাসত—এই তথ্যটা আবার জেনে অদ্ভুত ধরনের তৃপ্তি আসে। ছেলেটিকে কিছু টাকা সাহায্য করার প্রস্তাব উত্থাপন করতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ আবার কঠোর হয়ে উঠলেন। নিজেকে সতর্ক করে দিয়ে ভাবলেন, একবার সাহায্য করলেই ছেলেটি লাই পেয়ে যাবে, বার বার আসবে। প্রথমবার সাহায্য করে দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যান করবার যুক্তি থাকবে না। বাড়ির লোকেরা সন্দেহ করতে পারে। এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা ঠিক নয়। উঃ, এই শয়তানটা বলে কি না এ তাঁর ছেলে! এই বয়সে এত বড় অপবাদ…যদি কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে…

গগনেন্দ্রর চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করল, তোমার মা একটা বেশ্যা ছিল। বেশ্যার ছেলের কোন বাবা থাকে? তোমার মায়ের এত সাহস যে সে আমার নাম জড়িয়ে দিতে চেয়েছে!

গগনেন্দ্র একথা বললেন না। ছেলেটি এতই বিনীত এবং ভদ্র ভাব করে আছে যে এর সামনে এর মায়ের কুৎসা গাওয়া চলে না। গগনেন্দ্ররও এইটুকু অন্তত রুচি আছে যে, ছেলের সামনে তিনি মায়ের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন না।

গগনেন্দ্র গভীরভাবে বললেন, তোমার মা যাঁর কথা বলেছেন, সে নিশ্চয়ই অন্য লোক।

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, তা হতে পারে।

—এই নামে অনেক লোক থাকা সম্ভব। আছেও। টেলিফোন গাইডেই দু' তিনজন আছে। তোমার মা-কে আমি সে-রকমভাবে চিনতাম না।

—আমি শুধু একটু থাকার জায়গা চাইতে এসেছি। বাইরেই খেয়ে নিতাম, শুধু একটু পড়াশুনোর জন্য।

—আমার বাড়িতে তা সম্ভব নয়।

—কোনরকমেই সম্ভব নয়?

গগনেন্দ্র অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বললেন, না।

ছেলেটি চুপ করে রইল। গগনেন্দ্রর চোখের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ সরিয়ে নিল, তারপর বলল, ঠিক আছে, আমি তা হলে যাই?

—এসো।

ছেলেটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে আবার ফিরে এসে পায়ের ধুলো নিল গগনেন্দ্রর। গগনেন্দ্র কোন আশীর্বাদ করলেন না। ছেলেটি আবার বলল, আচ্ছা যাচ্ছি। গগনেন্দ্র উত্তর দিলেন না।

ছেলেটি চলে যাবার পর গগনেন্দ্র হাতের বইখানা ধপাস করে রেখে দিলেন টেবিলে। দোতলায় তাঁর নিজের ঘরে এসে আলমারি খুলে বার করলেন একটা ছবির অ্যালবাম। পাতা উল্টে উল্টে তাঁর চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর বয়েসের একটা ছবি বার করলেন। এই সময় মমতার সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল। সে-সময় সত্যিই তিনি সুপুরুষ ছিলেন। সরকারী খাদ্য দপ্তরের বড়বাবু ছিলেন, হাতে বেশ উপরি দু'পয়সা আসত। অবনীর পয়সা আরও বেশী ছিল, তবু মমতা তাকে ভালবাসে নি। মমতা ভালবাসাতেই চেয়েছিল, চেয়েছিল একটা আশ্রয়। সেই সময় তাকে থিয়েটারে নামাবার একটা প্রস্তাব হয়েছিল, মমতা তাতে রাজী হয়নি। তার সাধ ছিল কারুর সঙ্গে ঘর বেঁধে থাকার। সে সুখ তার জুটল না, সেটা তার কপালের দোষ।

কিন্তু ঐ ক'মাসের ভালবাসার জন্য একটা ছেলের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া! মমতার মনে মনে এত বিষ ছিল! কাশীতে গিয়ে কত কীর্তি করেছে, তা কে জানে! শেষ জীবনে রামকৃষ্ণ মিশনে থাকত,-তার আগের কথা কি কেউ জানে?

অ্যালবামের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে গগনেন্দ্র চলে এলেন আরও গোড়ার দিকে। তাঁর একুশ-বাইশ বছরের ছবি। গগনেন্দ্র দারুণ চমকে উঠলেন, একটু আগে যে ছেলেটি এসেছিল, ওর সঙ্গে তাঁর ঐ বয়সের চেহারায় দারুণ মিল! তবে কি? না, না, হতেই পারে না! অসম্ভব! এ-রকম মিল হঠাৎ হয়ে যেতেও পারে! কি ভাগ্যিস তাঁর বাড়ির আর কেউ ছেলেটিকে দেখে নি। শুধু বনমালী দেখেছে, সে কিছু বুঝবে না। তাঁর গিন্নী দেখলে নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করত। মেয়েরা চেহারার মিল বেশী বুঝতে পারে। ছেলেটা কি আবার ফিরে আসবে? বনমালীকে বলে দিতে হবে, অচেনা কোন ছেলে-পুলে এলে কোনক্রমেই যেন বাড়ির মধ্যে ঢুকতে না দেওয়া হয়। ছেলেটা বনমালীকে বলেছিল, ও একটা চিঠি এনেছে, কই চিঠি তো দেখাল না। কার চিঠি, মমতার? তবে কি? না, না, হতেই পারে না! মমতা বেনারস যাবার সময় কিছুই বলে নি।

অ্যালবামটা বন্ধ করে সন্তর্পণে রেখে দিলেন আলমারিতে। তারপর ইজিচেয়ারে বসে পায়ের ওপর পা তুলে চোখ বুজলেন। সঙ্গে সঙ্গে গগনেন্দ্রর চোখে ভেসে উঠল একটি একুশ-বাইশ বছরের ছেলের চেহারা। ঐ ছেলেটির নয়, তাঁর নিজের। তাঁর প্রথম যৌবন

বয়েস। বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েই গগনেন্দ্র খুব বিপদে পড়েছিলেন। হঠাৎ তার বাবা মারা যান। অনেকগুলো ভাইবোন নিয়ে বিষম আর্থিক দুরবস্থা। বি.এ. পরীক্ষার ফি পর্যন্ত যোগাড় করতে পারেন নি, সাহায্য করার কেউ ছিল না। দূরসম্পর্কের এক কাকার কাছে গিয়েছিলেন পরীক্ষার ফিয়ের টাকাটা চাইতে—সেই স্বার্থপর, কৃপণ কাকা মাত্র দুটো টাকা দিয়ে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে...

আজ এই ছেলেটিকেও ফিরিয়ে দিলেন গগনেন্দ্র। ছেলেটির পড়াশুনো করার আন্তরিক সাধ। শেষপর্যন্ত বোধহয় ওর ডাক্তারি পড়া হবে না। কেরানীর চাকরিই নিতে হবে। গগনেন্দ্রর সামর্থ্য এবং ইচ্ছে থাকলেও ওকে সাহায্য করার উপায় নেই। এই বয়েসে আর বিপদের ঝুঁকি নেওয়া যায় না। মমতা তাঁকে ভালোবাসত, কিন্তু সেই ভালোবাসার মূলে এত অশান্তি! ছেলেটি যদি মমতার নাম উচ্চারণ না করত, তা হলে কি তিনি তাকে সাহায্য করতে পারতেন? ছেলেটি পড়াশুনো করার জন্য একটু থাকার জায়গা চেয়েছিল—কিন্তু যে পুত্র পরিচয় দেয়, সে যদি সম্পূর্ণ বাড়ির অধিকার দাবি করে? ঐ ছেলেটি তা করে নি—

বৃদ্ধ গগনেন্দ্রর দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে নেমে এল। তিনি যে দীর্ঘ-নিঃশ্বাসটি ফেললেন, সেটি তাঁর যৌবনের জন্য দীর্ঘশ্বাস।

প্রেমিক ও স্বামী

যুবকটির সঙ্গে দোকানটায় ঢোকার মুখেই দেখা হয়েছিল নিখিলের। তখন যুবকটি নিখিলের চোখের দিকে দু'এক পলক তাকিয়ে থেকেই চোখ ফিরিয়ে নেয়। কোনো কথা বলে নি।

নিখিলও ঠিক মনে করতে পারলো না যুবকটিকে আগে কোথায় দেখেছে কিংবা তার নাম কি। অথচ চেনা চেনা মনে হচ্ছে। যাক গে, নিখিল আর ও নিয়ে মাথা ঘামালো না। সিঁড়ির ওপর একটা লোহার টুকরো পড়ে ছিল, নিখিল শান্তাকে বললো, দেখো, হোঁচট খেয়ো না।

রবিবারের সকাল। নিখিল শান্তাকে নিয়ে পার্ক স্ট্রীটের একটা নিলামের দোকানে এসেছে। বিশেষ কোনো কিছু কেনার যে উদ্দেশ্য আছে তা নয়। যদি হঠাৎ কিছু চোখে লেগে যায়। এখানে সাহেব বাড়ির রুপোবাঁধানো আয়না থেকে শুরু করে শ্বেতপাথরের টেবিল পর্যন্ত অনেক কিছুই পাওয়া যায়। সবাই বেশ সেজেগুজে আসে, কিছু না কিনেও দু'একবার দাম হাঁকতে মন্দ লাগে না।

রোজ-উডের একটা ছোট্ট বেড সাইড টেবল খুব পছন্দ হয়েছে শান্তার, সে দাম বলতে শুরু করেছে। আরম্ভ হয়েছে পনেরো টাকা থেকে—একজন স্থূলকায় মাড়োয়ারী এবং একজন গম্ভীর চেহারার পার্শী মহিলা অনবরত দাম বাড়িয়ে যাচ্ছেন—পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত দর ওঠার পর নিখিল ইশারা করলো শান্তাকে। এরপর জেদাজেদির জন্য দাম বেড়ে যাবে—সাধারণত এরকমই হয়। শান্তা তবু বললো, ষাট টাকা। তারপর থেমে গেল। শেষপর্যন্ত পার্শী মহিলাই সেটা কিনে নিলেন একানব্বই টাকায়।

শান্তা নিখিলের দিকে ফিরে ফিসফিস করে বললো, তুমি বারণ করলে কেন? জিনিসটা ভালো ছিল কিন্তু!

নিখিল বললো, তা বলে অত দাম দেবার কোনো মানে হয় না। রোজউড হোক আর যাই হোক—এইটুকু তো জিনিস, পঞ্চাশ টাকার বেশী দাম হয় না।

এই সময় সেই যুবকটি এসে ওদের পাশে দাঁড়ালো। শান্তার দিকে তাকিয়ে বললো, কেমন আছেন? চিনতে পারছেন আমাকে?

শান্তা চিনতে পেরেছে। হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো, ওমা, আপনি? বাঃ, কেন চিনতে পারবো না! আপনি এখন কলকাতায় আছেন?

যুবকটি এবার নিখিলের দিকে তাকিয়ে ভদ্রতাসম্মত হাসি দিয়ে বললো, আপনি

ভালো?

নিখিল এবার সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলো ওকে। ছেলেটির নাম অলোক ব্যানার্জি, দু'বছর আগে দেখা হয়েছিল দার্জিলিং-এ।

নিখিল চট্ করে একটা মজার ব্যাপার ভেবে নিল। মজাটা হচ্ছে এই, দোকানে ঢোকার মুখে সে ছেলেটিকে চিনতে পারে নি--ছেলেটিও নিশ্চয়ই চিনতে পারে নি।—তা হলে কথা বলতো। ছেলেটি তখন শান্তাকে দেখে নি কিন্তু ছেলেটি শান্তাকে দেখেই চিনতে পেরেছে—এবং শান্তাও চিনতে পেরেছে ওকে। অথচ একসঙ্গেই তো-আলাপ।

দেখা হয়েছিল দার্জিলিং-এ। নিখিল আর শান্তা সদ্য বিয়ে করে গিয়েছিল হানিমুনে। তখন বর্ষাকাল—বিশেষ লোকজন নেই। হোটেলে পাশের ঘরটাতেই থাকতো এই অলোক ব্যানার্জি। নিজে থেকেই যেচে আলাপ করেছিল।

অলোক শান্তাকে বললো, টেব্‌লটা না কিনে ভালোই করেছেন। ওর লক্‌টা খারাপ, আমি আগেই দেখেছি।

শান্তা জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখন কলকাতায় থাকেন?

অলোক বললো, হ্যাঁ, আপাতত দু'এক বছরের জন্য কলকাতায়।

দার্জিলিং-এ যখন প্রথম আলাপ হয়, তখন অলোক বলেছিল, ও জামসেদপুরে থাকে। একলা একলা দার্জিলিং-এ গিয়েছিল কেন? সে সম্পর্কে অলোক জানিয়েছিল যে, প্রায়ই সে একা একা নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কোনো এক জায়গায় বেশীদিন থাকতে তার ভালো লাগে না। কখনো পাহাড়ী জায়গায়, কখনো সমুদ্রের ধারে—ছুটি পেলেই সে চলে যায়।

ব্যাপারটা খুব রোমান্টিক মনে হয়েছিল ওদের কাছে। যুবা বয়েসে সাধারণত কেউ একা একা বেড়াতে যায় না। নিখিল যেমন কখনো যায়নি। হয় যাওয়া হয় বন্ধু-বান্ধব মিলে দল বেঁধে--অথবা বিবাহিত হলে স্ত্রীর সঙ্গে।

একদিন জলাপাহাড় অঞ্চলে একটা পাথরের ওপর একা অলোক ব্যানার্জিকে অন্যমনস্কভাবে বসে থাকতে দেখে শান্তা পরিহাসের সঙ্গে বলেছিল, দ্যাখো, দ্যাখো, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ব্যর্থ প্রেমিক। কিংবা কবি-টবি নয় তো! নইলে সন্ধেবেলা কেউ ঐরকম একা বসে থাকে?

শান্তা আর নিখিল দার্জিলিং-এ ছিল দশদিন। এর মধ্যে অলোক ব্যানার্জির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়েছে। কখনো বেড়াতে যাবার মুখেই দেখা হওয়ায় অলোক ব্যানার্জি বলেছে, কোন্ দিকে যাচ্ছেন? চলুন না, একসঙ্গেই যাওয়া যাক্!

নতুন বিয়ের পর যারা হানিমুনে গেছে—অন্যদের উচিত নয় তাদের সঙ্গে বেশী দেখা করা। তাদের নিরালায় থাকতে দেওয়া উচিত। কিন্তু অলোক ব্যানার্জি তা বোঝে নি। এ নিয়ে শান্তা প্রথম দু'একবার বলেছে, ভদ্রলোক বড্ড গায়ে পড়া—আমরা আলাদা কোথাও যাবো—তার উপায় নেই। ঠিক ওর সঙ্গে দেখা হবেই! নিখিল উদারভাবে বলেছে, তাতে কি হয়েছে, লোকটা তো খারাপ নয়! কথাবার্তা বেশ ভদ্র! পৃথিবীতে একেবারে নিরালা জায়গা আর তুমি কোথায় পাবে?

কয়েকদিনের মধ্যেই অবশ্য শান্তা লোকটিকে মোটামুটি সহ্য করে নেয়। অলোক ব্যানার্জি সবসময় বেশ ফিটফাট সেজেগুজে থাকে, ব্যবহার খুবই ভদ্র, নানারকম বিষয়ে কথাবার্তা বলতে পারে। এরকম লোক গায়েপড়া হলেও এড়ানো যায় না।

নিখিল দু'চারদিনের মধ্যেই একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলেছিল। অলোক ব্যানার্জি পেশায় সেল্‌স রিপ্রেজেন্টেটিভ। নানা জায়গায় ওকে একা একা ঘুরে বেড়াতে হয় চাকরির কারণে। সেটাকেই ও একটু রোমান্টিক রূপ দিয়ে বলেছে। হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে অলোক ব্যানার্জির কথাবার্তা শুনে নিখিল বুঝতে পেরেছে—এই হোটেলেই সে বছরে দু'তিনবার আসে। অথচ শান্তার কাছে কথায় কথায় ও একবার বলেছিল, দার্জিলিং-এ এই ওর প্রথম আসা। ওদের সঙ্গে একসঙ্গে ঘুম-এ গিয়েছিল, শুধু ওদের সঙ্গ পাবার জন্যই! নইলে দার্জিলিং-এ বারবার এসে কেউ প্রতিবার ঘুম কিংবা টাইগার হিল্‌স দেখতে যায় না।

নিখিল অবশ্য এ কথাটা বলে নি শান্তাকে। ঐটুকু মিথ্যে কথা বলে লোকটি এমন কিছু দোষ করে নি। শুধু ওর সম্পর্কে শান্তার ধারণা খারাপ করে দেবার কোনো মানে হয় না। নিখিল শান্তার স্বামী, আর অলোক ব্যানার্জির চোখে শান্তা একজন সদ্য পরিচিতা সুন্দরী মহিলা। একজন সদ্য পরিচিতা সুন্দরী মহিলার কাছে নিজেকে কিছুটা উল্লেখযোগ্য করে তোলার জন্য ওরকম একটু-আধটু মিথ্যে কথা সব পুরুষ-মানুষই বলে। নিখিলও হয়তো বলতো। সংসারে মন টেকে না এমন একজন যুবক সমুদ্র কিংবা পাহাড়ী জায়গায় ঘুরে বেড়ায়—এই চরিত্রটি মেয়েদের পছন্দ হবে। তার বদলে, চাকরির জন্য নানা জায়গায় টুরে যেতে হয়—এই সাদা সত্যি কথাটা এমন কিছু না।

যুবকটি শেষপর্যন্ত শান্তার প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল বোধহয়। শেষের দিকে শান্তাকে দেখলেই একটা গদ্‌গদ ভাব এসে যেত। মাথা নুইয়ে নুইয়ে এমনভাবে কথা বলতো যে দেখলেই প্রেমিক প্রেমিক মনে হয়। কখন নিখিল একটু দূরে যাবে—শান্তার সঙ্গে একটু নিরালায় কথা বলা সম্ভব হবে—সেই সুযোগ খুঁজতো।

সদ্য বিবাহিত এবং স্বামী সঙ্গে উপস্থিত—এমন মেয়ের প্রেমে পড়া যে উচিত নয় সেটা বুঝতে পারে নি ছেলেটি! তা আর কি করা যাবে! প্রেম তো সবাই হিসেব করে পড়ে না! ভালোবাসা অন্ধ—একথা আর তাহলে বলে কেন? নিখিল এইসব ভাবতো। নিখিল মনে মনে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করতো। হঠাৎ বেড়াতে এসে দেখা, একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে মনটা একটু নরম হয়ে যাওয়া—তার সঙ্গ পাবার একটু ইচ্ছে—এর বেশী কিছু তো নয়! এতে দোষের কিছু নেই।

নিখিল অবশ্য মনে মনে বুঝতে পারলো, অলোক ব্যানার্জি মনে মনে তাকে অপছন্দ করে। তা তো করবেই। মনে মনে কোনো মেয়েকে ভালোবাসলে তার স্বামীকে কে-ই বা পছন্দ করে! স্বামীরা অত্যন্ত দুর্ভাগা প্রাণী। তাদের কেউ-ই পছন্দ করে না। নিখিল মাঝে মাঝে নিজেকে অলোক ব্যানার্জির জায়গায় বসিয়ে ভাবতো, সে যদি শান্তার মতন কোনো মেয়ের সঙ্গে এইরকম প্রেমে পড়তো—তাহলে সেও কি মনে মনে চাইতো না—স্বামীটা এখানে না থাকলেই ভালো হয়! বস্তুত এরকম ঘটনা তো নিখিলের জীবনেও ঘটেছে।

নিখিল অবশ্য অলোক ব্যানার্জিকে খুব বেশী খুশী করতে পারে নি। অলোকের সঙ্গে শান্তাকে বেশীক্ষণ একা থাকার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি। সদ্য বিবাহিত স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে পরপুরুষের কাছে রেখে দূরে সরে থাকা মোটেই স্বাভাবিক নয়। সেটা কি ভালো দেখায়? ভদ্রতা সভ্যতা মেনে যতদূর যা করা যায়, নিখিল তাই করেছে।

শান্তাও কি ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি? নিশ্চয়ই বুঝেছিল এবং বুঝেও না বোঝার ভান করেছিল। একটি ফিটফাট চেহারার সুদর্শন যুবক সব সময় খাতির করে, প্রশংসা করে কথা বলছে—এটা কোন্ মেয়ের না ভালো লাগে? এমন কি সদ্য বিবাহিত মেয়েদেরও ভালো লাগে। এর প্রতিদান হিসেবে শান্তা আর কি-ই বা দিতে পারে, টুকরো টুকরো হাসি আর দু'চারটে রহস্য-ঘেঁষা সংলাপ. মেয়েদের বিশেষ কিছু দিতে হয় না। মেয়েরা যে মেয়ে—এটাই তাদের মস্তবড় গুণ, ছেলেদের কাছে। সুন্দরী হলে তো কথাই নেই। নিখিল জানতো, শান্তা কক্ষনো চুপিচুপি রাত্তিরবেলা অলোক ব্যানার্জির ঘরে ঢুকবে না। শান্তা ভালো মেয়ে এবং সে নিখিলকে সত্যিই ভালোবাসে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকারের ভালোবাসা থাকলে এইরকম দু'একটা ছোটখাটো প্রেমিক-প্রেমিকার সাইড ক্যারেক্টার এলেও কোনো ক্ষতি হয় না।

জলাপাহাড়েই তার একদিন একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। সেদিনও ওখানে অলোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। নিখিল অবশ্য বুঝতে পেরেছিল অলোক ইচ্ছে করেই সেখানে আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছে। অলোক জানতো ওরা এদিকেই আসবে। এরকম অনেকেই করে। অলোক ওদের দেখে বললো, আরেঃ! আপনারাও আজ এদিকে এসেছেন? আমার কিছু করার উপায় নেই, তাই ঘুরতে ঘুরতে এদিকটায় এলাম।

নিখিল বললো, চলুন, একসঙ্গেই বেড়ানো যাক।

শান্তা বললো, বেড়াবার কি উপায় আছে? সারাদিন ধরেই তো বৃষ্টি! এতদিনে একবারও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পেলাম না!

অলোক বললো, আজ মেঘ সরে যাচ্ছে! দেখুন, দেখুন—কি রকম উড়ে যাচ্ছে হালকা হালকা মেঘ। আজ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যেতে পারে!

নিখিল ওকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি রেন কোট কিংবা ছাতা আনেন নি কেন? শুধু শুধু ভিজছেন।

অলোক বললো, একটু ভিজলে কি আর হবে!

নিখিলদের সঙ্গে একটা মাত্র ছাতা। তাতে তারা স্বামী-স্ত্রী গা ঘেঁষাঘেঁষি করে গেলে কোনো দোষ নেই। হনিমুনের সময় সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পাশাপাশি আর একজন ভিজতে ভিজতে গেলে অস্বস্তি লাগে। নিখিল বললো, আপনিও আসুন না!

অলোক খুব আপত্তি করা সত্ত্বেও নিখিল তাকে টেনে আনলো। তবে, এক ছাতার তলায় স্বামী, স্ত্রী আর স্ত্রীর প্রেমিককে কিছুতেই ধরানো যায় না—তাতে তিনজনেরই অসুবিধে। যাই হোক একটু বাদে বৃষ্টি কমে গেল অনেকটা। পাউডারের মতন মিহি-মিহি বৃষ্টি এসে লাগছে গায়ে—নিখিল ছাতা গুটিয়ে ফেলেছে। বহু দূরে পর্যন্ত নিচু উপত্যকায় যেন হালকা একটা জাল বেছানো রয়েছে।

এদিকটা খুবই নির্জন, আর কোনো ভ্রমণ-পিপাসুকে দেখা যায় না। এই সময় শান্তার হঠাৎ বাথরুম পেয়ে গেল। সৌভাগ্যের বিষয়, ছোট বাথরুম। শান্তা ইশারায় নিখিলকে জানালো সে কথা—এখন নিখিলকে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। এসব কথা শৌখিন প্রেমিকদের কাছে বলা যায় না, স্বামীকেই বলতে হয়।

এমনিতে কোনো অসুবিধে ছিল না। কাছাকাছি মানুষজন নেই—একটা কোনো গাছের আড়ালে শান্তা বসে পড়তে পারতো। নিখিল দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিত। কিন্তু অলোক রয়েছে যে। অলোকের সামনে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করাই যে লজ্জার ব্যাপার। নিখিল শান্তাকে ইশারায় জিজ্ঞেস করলো, হোটেলে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে না?

—না। শান্তা অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে না। ওরা অনেকটা দূরে চলে এসেছে।

অগত্যা নিখিলকে ব্যবস্থা করতেই হলো। একটা সুবিধামতন গাছ দেখে নিখিল গম্ভীর মুখ করে শান্তাকে বললো, তুমি কোথায় যাবে বলছিলে যাও, আমি আর অলোকবাবু রাস্তায় দাঁড়াচ্ছি।

অলোক প্রথমটায় বুঝতে পারে নি। অবাক হয়ে শান্তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ভাগ্যিস কিছু জিজ্ঞেস করে নি। অলোক যেমন সব সময় শান্তার জন্য কিছু না কিছু করার জন্য ব্যস্ত, এ ব্যাপারেও সে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়ে ফেললে হয়েছিল আর কি। যাই হোক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বেচারা খুব লজ্জা পেয়ে গেল।

নিখিল অলোককে নিয়ে একটু দূরে এসে দাঁড়িয়ে বললো, এই নিন, সিগারেট নিন!

তারপর আজেবাজে কথা বলতে লাগলো। দুজনের মধ্যে কোনোরকম মতের মিল নেই—কথাবার্তা আর কি হবে? নিখিল হঠাৎ লক্ষ্য করলো, অলোক বেশ চঞ্চল হয়ে পড়েছে। কথা বলায় তার একটুও মন নেই। যেন তার ভেতরের একটা দুর্বার ইচ্ছে চাইছে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখতে শান্তাকে। এটাও তো স্বাভাবিক। নিখিল তার স্ত্রীকে প্রতি রাত্রে দেখে—তার এখন ওরকম ইচ্ছে জাগবার কথা নয়। কিন্তু একজন সুন্দরী মহিলা সম্পর্কে একজন অনাত্মীয় পুরুষের তো সেরকম মনোভাব হবে না। ভদ্রতা সভ্যতার মোড়ক দিয়ে এটাকে যতই ঢেকে রাখা যাক—ব্যাপারটা তো জলের মতন সোজা। বেশ কৌতুক বোধ করে নিখিল মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

যাই হোক, সেবার নিখিলরা চলে আসবার পরও অলোক ব্যানার্জি দার্জিলিং-এ থেকে যায়। অলোক ওদের স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছিল। ঠিকানা বিনিময়, আবার দেখা হবার আশ্বাস ইত্যাদি যা যা হয়—সেবার তো হয়েছিলই। অলোক জামসেদপুরে বেড়াতে যাবার জন্য বারবার অনুরোধ করেছিল ওদের। নিখিলও বলেছিল,

কলকাতায় এলে অলোক যেন নিশ্চয়ই ওদের বাড়িতে আসে। চিঠিপত্রেও নিশ্চয়ই যোগাযোগ থাকবে ইত্যাদি। ট্রেন ছেড়ে দেবার পরও নিখিল দেখলো, অলোক তখনও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। শান্তার প্রেমিক পেছনে পড়ে রইলো।

চলে আসবার আগের দিন নিখিল টের পেয়েছিল যে অলোক ব্যানার্জি বিবাহিত। কি একটা কথা প্রসঙ্গে ব্যাপারটা বোঝা গিয়েছিল। এটা জানার জন্য নিখিলের কৌতূহল ছিল, অথচ জিজ্ঞেস করাও যায় না সরাসরি—তাই সে প্রসঙ্গটা ধরে ঠিক বুঝে নিয়েছে। অলোক অবশ্য কোনোদিনই বলে নি যে সে বিবাহিত নয়—কিন্তু নিজের স্ত্রীর কথা সে একবারও উচ্চারণ করে নি এবং তার ঐ একা-একা ভাবটার জন্য ধরেই নিতে হয় যে সংসারেও সে একা। শান্তার সেই রকমই ধারণা।

নিখিল অবশ্য শান্তার এই ভুলটাও ভেঙে দেয় নি। অলোক ব্যানার্জি এ কথাটা চেপে গেছে, বেশ করেছে। এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বিবাহিত লোকদের কি প্রেমে পড়া নিষিদ্ধ? পৃথিবীতে ঢের ঢের বিবাহিত পুরুষই প্রেম করে। তবে মেয়েরা তাদের প্রেমিক হিসেবে বিবাহিত পুরুষদের চেয়ে অবিবাহিত ছেলেদেরই বেশী পছন্দ করে। প্রেমিক—এই ধারণাটাই বিবাহের সম্পর্কের ঊর্ধ্বে যেন। নিখিল চেয়েছিল শান্তার এই শৌখিন প্রেম-প্রেম খেলাটুকু অধিকৃতই থাক। শেষ মুহূর্তে ধারণা ভেঙে দেওয়া নিষ্ঠুরতা।

অলোকের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রাখা হয় নি অবশ্য। বেড়াতে গিয়ে যাদের সঙ্গে আলাপ—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেই আলাপ আর বেশীদূর গড়ায় না। তাছাড়া দার্জিলিং-এ যাকে ভালো লাগে, কলকাতায় তাকে আর ভালো না-ও লাগতে পারে। কখনো কখনো ওরা স্বামী-স্ত্রীতে অলোক ব্যানার্জির প্রসঙ্গ তুলে হাসাহাসি করেছে বটে—তবে বেশী আর কিছু না।

আবার হঠাৎ এই নিলামের দোকানে দেখা। অনেকক্ষণ ওরা একসঙ্গে রইলো। অলোক কিনে ফেললো একটা বুক কেস এবং প্রায় তার পেড়াপীড়িতেই শান্তাকে কিনতে হলো একজোড়া ফুলদানি। দার্জিলিং-এর গল্পও হলো অনেকক্ষণ এবং অলোককে একদিন তাদের বাড়িতে অবশ্যই আসতে বলা হলো।

কিন্তু আসতে বলা মানেই নেমন্তন্ন করা নয়। বিশেষ কোনো দিন ঠিক করে নেমন্তন্ন করা। আর, আপনি একদিন আসবেন—এই বলার মধ্যে অনেক তফাত। নিখিল নেমন্তন্ন করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় নি। শুধু তা-ই নয়, অলোক ব্যানার্জিকে আজ দেখে সে খুশী হয় নি। শান্তা আর অলোকের মধ্যে কথা হয়। তাকে স্বামী সেজে পাশে সারাক্ষণ বোকা বোকাভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হব। তাছাড়া ভদ্রলোকের যেরকম প্রেমে পড়ার বাতিক, তাতে বেশী প্রেম জমিয়ে ফেললেই মুশকিল। দার্জিলিং-এ ছুটির সময় সে এ ব্যাপারটাতে মজা পেয়েছিল—কলকাতায় নানা কাজের ঝামেলায় এসব ঠিক সহ্য করা যায় না। কোনো ভদ্রলোক কি তার স্ত্রীকে সব সময় পাহারা দিতে পারে? তা ছাড়া, কলকাতায় শান্তার তো পুরনো দিনের দু'তিনজন বন্ধু আছেই—দার্জিলিং-এর বন্ধুকে তার কলকাতায় দরকার নেই।

নিখিল আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিল। অলোক যদিও একবার বলেছে যে সে কলকাতায় ফার্ন রোডে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে কিন্তু সেখানে তাদের একবারও যেতে বলে নি। ভদ্রলোকের স্ত্রী-কে কি খুব কুৎসিত দেখতে?

বাড়ি ফিরে শান্তা বললো, ভদ্রলোক বেশ মজার, তাই না? সব সময় এত বেশী বেশী ভদ্রতা দেখাতে চায় যে বোকা বোকা দেখায়!

নিখিল গম্ভীরভাবে বললো, ও দেখছি, এখনো তোমার প্রেমে পড়ে আছে।

শান্তা চোখ কুঁচকে হাসিমুখে বললো, তবে? তুমি ভাবো কি? এখনো লোকে আমার প্রেমে পড়ে!

নিখিলও না হেসে পারলো না। হাসতে হাসতে বললো, দুপুরবেলা যখন আমি বাড়ি থাকবো না—তখন যেন না আসা শুরু করে! দেখো বাবা!

শান্তা নিখিলকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো, তুমি বড্ড অসভ্য!

আসবার আগেই আর একদিন নিখিলের সঙ্গে তার রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। ছুটির দিন, তবু নিখিলের অফিস ছিল। অফিস থেকে ফেরার পথে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে দেখলো, সঙ্গে একজন মহিলাকে নিয়ে অলোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিখিল আগে দেখেও কথা বলে নি—হয়তো ছেলেটি আর একটি প্রেমিকা জুটিয়েছে—এ সময় কথা বলতে গেলে বিব্রত হবে। মহিলাটি বিবাহিতা—বিবাহিতা মহিলাদের সঙ্গেই প্রেমে পড়ার ন্যাক আছে ওর।

অলোক ব্যানার্জিই নিজে কথা বললো। ডেকে বললো, এই যে নিখিলবাবু, কি খবর?

আলাপ হলো। মহিলাটি অলোকের স্ত্রী। মনে হয় সাত আট বছরের পুরনো বিয়ে-এর আগে যে অলোক নিজেকে অবিবাহিত হিসেবে পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছে, সে সম্পর্কে এখন আর তার মুখে কোনো লজ্জার চিহ্ন নেই। কোথাও বসে চা খাওয়ার প্রস্তাব দিল অলোকই—কিন্তু নিখিলের তাড়া আছে। তখন ঠিক হলো, ট্যাক্সি পাওয়া তো একটা সমস্যা—সুতরাং একটা ট্যাক্সি পেলে তাতে ওরা একসঙ্গে যাবে। নিখিলের বাড়িই দূরে. নিখিল ওদের নামিয়ে দেবে।

অলোকের স্ত্রীর নাম মমতা. ভারী সরল আর ছেলেমানুষ ধরনের। খুব সহজেই জমিয়ে নিতে পারে। নিখিলকে বললো. আপনাদের কথা ওর কাছে অনেক শুনেছি। আপনার স্ত্রী তো খুব সুন্দরী। একদিন নিয়ে আসুন না আমাদের বাড়ি।

নিখিল বললো, তার আগে আপনারা একদিন আসুন।

ট্যাক্সি পাওয়া গেল অতিকষ্টে। নিখিল সামনে বসতে যাচ্ছিল, অলোক বললো. না. না, আপনি ভেতরে আসুন। অনেক জায়গা আছে।

মমতা মাঝখানে বসলো. দু'পাশে দু'জন। কিছুক্ষণ গল্প করার পর নিখিল হঠাৎ লক্ষ্য করলো যে অলোক খুব কম কথা বলছে। মাঝে মাঝে হুঁ হাঁ দিয়ে যাচ্ছে শুধু। অথচ দার্জিলিং-এ দেখেছে তার সুন্দর কথার ফোয়ারা ছোটে। এমনকি এ কথাও বোঝা যাচ্ছে, অলোক তার স্ত্রীকে একটু একটু ভয় পায়।

নিখিল হঠাৎ দুম করে মমতাকে বলে ফেললো, আপনি ভারি সুন্দর সেন্ট মেখেছেন তো। চমৎকার গন্ধটা।

মমতা একটু লজ্জা পেল। নিখিল তাকালো অলোকের দিকে। অলোকের মুখখানা উদাসীন ধরনের। ভূমিকা বদলে গেছে—অলোক এখন আর প্রেমিক নয়, সে স্বামী। যে-কোনো স্বামীর মতনই গো-বেচারা ভঙ্গিতে সে অন্য লোকের মুখে স্ত্রীর প্রশংসা শুনতে বাধ্য হচ্ছে।

ব্যাপারটায় নিখিল এত উৎসাহ পেয়ে গেল যে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে মমতাকে বললো. শুনুন, সামনের সোমবার আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভারসারি। সেদিন সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে আপনারা খাবেন। আসতেই হবে কিন্তু, বুঝলেন!

বাকিটা রাস্তা নিখিল আর মমতাই শুধু কথা বলে গেল। অলোকের আর কোনো উৎসাহ নেই; সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সিগারেট টানতে লাগলো অন্যমনস্কভাবে।

বিজনের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য

চার্চ লেনের মুখটার কাছে দাঁড়িয়ে বিজন সিঙ্গাপুরী কলা খাচ্ছিল। দুপুরের দিকে অফিস পাড়ায় টিফিন শুরু হয়ে গেছে, রাস্তায় বেশ ভিড়। ছেলেবেলায় স্কুলে পড়ার সময় বিজন কিছুদিন বয়স্কাউট হয়েছিল, সেই সময়কার কতকগুলো পুরোনো অভ্যেস তার এখনো রয়ে গেছে। যেমন, রাস্তার কল থেকে শুধু শুধু জল পড়ছে দেখলে বিজন এসে বন্ধ করে দেয়, ফল খেয়ে রাস্তায় খোসা ফেলে না। সুতরাং খোসাগুলো এক হাতে রেখে শেষ কলাটা যখন মুখে পুরেছে. এই সময় ছোট্ট দুটি ঘটনা ঘটলো।

বিজনের পাশে দাঁড়িয়ে একটা লোক সস্তার ফাউন্টেন পেন বিক্রি করছিল, সেই লোকটা কি কারণে যেন একটু সরে এসে বিজনকে একটা ধাক্কা দেয়। বিজনের হাত থেকে

কলার খোসাগুলো মাটিতে পড়ে গেল। বিজন লোকটাকে একটা ধমক দেবে ভেবে ছিল, কিন্তু লোকটা একজন বোকামতন মহিলাকে প্রায় একটা পেন গছাচ্ছে সেই মুহূর্তে, তাই বিজনের একটু মায়া হলো। কলার খোসা তিনটে এমনভাবে ফুটপাথে ছড়িয়ে আছে যে, অবিলম্বে কোনো লোক আছাড় খেতে পারে! বিজন এমন কি নিচু হয়ে খোসাগুলো মাটি থেকে তুলতে যাচ্ছিল, তারপর ভাবলো, এটা বড্ডই বাড়াবাড়ি। তখন সে পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে ওগুলোকে ফুটপাথ থেকে সরিয়ে রাস্তার পাশে ফেলে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

এই সময়, রাস্তার ওপাশ থেকে সুট পরা দু'জন সম্ভ্রান্ত কুলীন চেহারার লোক অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছিল, রাস্তার এলোমেলো ভিড় থেকে স্পর্শ বাঁচাতে গিয়ে তাদের মধ্যে একজন বিজনের বাঁ পাশে গুঁতো মারলো। বিজন সেই মুহূর্তে পা দিয়ে কলার খোসা সরাতে ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক, ধাক্কায় বিজনের অন্য পা কলার খোসার ওপরে পড়লো, খানিকটা পিছলে গিয়ে বিজন বেশ জোরালোভাবে একখানা আছাড় খেল। সুট পরা লোক দুটি নিজেদের মধ্যে এমনই মশগুল ছিল যে, পিছনের ঘটনা লক্ষ্য করলো না, এগিয়ে গেল নির্দিষ্ট দিকে। একটা বাচ্চা মেয়ে সামনে ত্যানা মেলে সুর করা করুণ গলায় ভিক্ষে চাইছিল, সে পর্যন্ত ফিক করে হেসে উঠলো অত বড় একটা লোককে আছাড় খেতে দেখে।

আছাড় খেয়ে বিজনের বেশী কিছু ক্ষতি হয় নি, শুধু ও বিষম অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই সামান্য ঘটনার যেন কি একটা বিশাল অর্থ আছে। জন্মের সময় যে নার্স বা দাই উপস্থিত থাকে—বহু কাল বাদে তার সঙ্গে পরিচয় হলে মানুষের যেরকম মনে হয়—বিজনের সেইরকম একটা দমবন্ধ করা অভিজ্ঞতা হলো। শরীরে তেমন চোট লাগে নি, চশমাটা শুধু ছিটকে গিয়ে ভেঙে গেছে, খালি চোখে সেই অতিমানুষ ভর্তি রাস্তার দিকে এক মুহূর্তে তাকিয়েই বিজন সবকিছু পরিবর্তনের অর্থ বুঝতে পারলো।

বিজন তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ফাউন্টেন পেনওয়ালা তার বোকা খদ্দেরনীকে তখনো খুচরো ফেরত দেয় নি, কিন্তু সে বিজনের দিকে এগিয়ে এসে বললো, কলার খোসা নিয়ে কেউ খেলা করে? তখন থেকেই দেখছি...বেশী লাগলো নাকি?

বিজন ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে রুক্ষ গলায় বললো, না, কিছু হয় নি।

ফাউন্টেন পেনওলা বললো, ইস চশমাটা ভেঙে গেল দাদা। আমিই ধাক্কা দিলাম নাকি?

বিজনের আর দেরি করার সময় নেই, লোকটার হাত থেকে চশমাটা কেড়ে নিতে গেল প্রায়। লোকটা তবু বললো, মাপ করবেন, দেখি নাই, ইস, এই বাজারে—

বিজন হন্‌হন্ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। কালো সুট পরা লোক দু'টি তখনও চোখের আড়ালে যায় নি। একটি লোক খুবই রোগা, পোশাক ঢলঢল করছে শরীরে, কিন্তু হাঁটার মধ্যে একটা গাম্ভীর্য আনার চেষ্টা আছে। তার পাশের লোকটি —যে বিজনকে ধাক্কা দিয়েছে, তার মাঝারি স্বাস্থ্য, ভিড়ে হারিয়ে যাবার মতন মুখ। পাছে না হারায়—তাই বিজন খুব দ্রুত এগিয়ে এলো। কিন্তু কাছাকাছি এসে পৌঁছোবার আগেই ওরা দু'জন ঢুকে পড়লো একটা অফিসে। দারোয়ান ওদের সেলাম করলো, লিফ্‌ট থেমেই ছিল, সেইরকমই কথা বলতে বলতে ওরা লিফ্‌টের মধ্যে দাঁড়াতেই, লিফ্‌ট শূন্যে উঠে গেল।

ঠিক সময়ে উপস্থিত হতে না পেরে বিজন সামান্য একটু হাসলো। সিগারেট-দেশলাই বার করে ধরিয়ে বিজন দেয়ালে সাঁটা পিতলের ফলকগুলো পড়তে লাগলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে। একটা জিনিস লক্ষ্য করে বিজন অবাক হয়ে গেল, চশমা ছাড়াও পড়তে তার কোনো অসুবিধেই হচ্ছে না। আবহাওয়া অনুযায়ী স্বাভাবিক রং যা হওয়া উচিত ছিল—বিজনের কাছে তার থেকে একটু গাঢ়, কিন্তু সব কিছুই দৃষ্টিগ্রাহ্য।

সেই বাড়িটাতে ৭টা অফিস, সুতরাং খুঁজে পাওয়া মুশকিল। লিফ্‌টটা আবার ফিরে আসতে বিজন লিফ্‌টম্যানকে জিজ্ঞেস করলো ঐ দুই বাবু কোন্ অফিসে কাজ

করেন ভাই ?

লিফ্‌টম্যান বললো, দু'জন দত্তলায়, আপনি কাকে চান ?

বিজন হাত দিয়ে শরীরের আকার বোঝাবার চেষ্টা করে বললো, ঐ যে যিনি ইয়ে মতন—

—দাশগুপ্ত সাহেব ? মুলিগান-ডেভিস, চারতালা. যাবেন ?

—না, এইমাত্র তো ফিরলেন, এখন ব্যস্ত থাকবেন. পরে দেখা করবো।

আড়াইটে বাজে, অফিসগুলো ছুটি হয় সাড়ে পাঁচটায় সুতরাং বিজনের হাতে অনেক সময় আছে। চার্চ লেন ধরে বিজন আবার খুব মন্থরভাবে হাঁটতে লাগলো। মোড়ের মাথায় এসে দেখলো ফাউন্টেন পেনওয়ালা আর একটা বোকা বুড়োকে ভজাচ্ছে। ভিখিরি মেয়েটার ত্যানায় কয়েকটা খুচরো পয়সা পড়েছে। ঠিক একই রকম চেহারার মানুষের ভিড়। একটা গরু সেই কলার খোসাগুলো খাচ্ছে মহানন্দে। নোংরা জলের মধ্যে পড়ে আছে তার চশমার ভাঙা কাঁচ. প্রায় সাত বছর ওগুলো তার চোখের সামনে ছিল। মিঃ দাশগুপ্ত'র কি মোটরগাড়ি আছে ? না তাহলে তিনি হেঁটে রাস্তা পার হবেন কেন ?

মিন্টুদির অফিসে দেখা করতে গেলে তার কলিগরা বিজনকে মিন্টুদির প্রেমিক ভাবে। অথচ আপন পিসতুতো বোন। ভাই-এর ছদ্মবেশ ধরতে কি প্রেমিকদের সম্মানে বাধে না ? আগে তুমি বলতো, এখন মিন্টুদির অফিসে গেলে বিজন সকলকে সাড়ম্বরে শুনিয়ে মিন্টুদির সঙ্গে তুই-তুকারি করে। মিন্টুদি, তোদের বেয়ারাকে বল এক গ্লাস জল আনতে, তোদের অফিসটা বড্ড গুমোট—এইরকম। কিন্তু আগে প্রেমিকারই মতন খেলাচ্ছলে মিন্টুদিকে পাঁজাকোলা করে তুলে ভয় দেখিয়েছে. বলেছে, তোমার বন্ধু স্বপ্নার সঙ্গে আমার একটু ভাব করিয়ে দাও না মিন্টুদি. বেশ সিনেমা-টিনেমা দেখবো একসঙ্গে, বড্ড একা একা লাগে।

মিন্টুদির টেবিলের উল্টোদিকের চেয়ারে একজন অচেনা লোক বসে আছে। কে জানে, ও সত্যিই মিন্টুদির প্রেমিকা কি না ! ঢুকে পড়ে একটু অস্বস্তি লাগছিল বিজনের, কিন্তু লোকটি সেই মুহূর্তে উঠে পড়ে বিজনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অপরের গরম-করা চেয়ারে বসতে বিজনের ভালো লাগে না। চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে বিজন জিজ্ঞেস করলো, তুই কি বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দিচ্ছিস্ ?

ধড়মড় করে চমকে উঠে মিন্টুদি বললো—বিয়ে ? তার মানে ?

বিজন বিস্ফারিত মুখে বললো, সে কি, এখনো অফিসের লোকদের বলিস্ নি ? নেমন্তন্নে ফাঁকি দিবি বুঝি ?

জ্ঞানী অপরাধিনীর মতন বিবর্ণমুখে মিন্টুদি বললো. দিদির সঙ্গে ফাজলামি হচ্ছে, না ? জ্বালাতে এসেছিস. অফিস পাড়ায় এসেছিস কেন ?

—একটা ব্যাঙ্কে এসেছিলুম।

—ব্যাঙ্ক ? আজকাল কি তুই ব্যাঙ্কেও টাকা রাখতে শুরু করেছিস নাকি ? এত টাকা ? কে দিল ?

—টাকা রাখতে নয়, ব্যাঙ্কে একটা ইণ্টারভিউ দিলাম।

—ইণ্টারভিউ ? এ মাসে কটা হলো ?

—এটাই শেষ। চাকরি হয়ে যাচ্ছে সামনের মাস থেকে।

—সত্যি ? দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? বোস্ না ! কি হলো বল্ ?-

আজ আমার একটা শুভদিন. চাকরির পাকা কথা হয়ে গেল। তোর বিয়েতে আমি [illegible] দামি উপহার দেবো।

আবার ফাজলামি ! কত মাইনে ? ও কি, তোর চশমা কোথায় ?

নেই। সেইজন্যই তো আজ দিব্যদৃষ্টিতে সব কিছু দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি তোর বিয়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। মিন্টুদি দশটা টাকা ধার দে।

চা ও সন্দেশ খাবার পর মিন্টুদি জিজ্ঞেস করলো. এখন কোন্ দিকে যাবি ? চল্ একসঙ্গে ফিরবো, তুই বোস্।

কোন্ দিকে ? বিজন এক মুহূর্ত থামলো। কোনদিকে বাড়ি হতে পারে ওর ?

দাশগুপ্ত কি খুব বড় অফিসার? গাড়ি নেই যখন—গাড়ি যে নেই সে বিষয়ে বিজন এখন নিশ্চিত, তবুও, উত্তর কলকাতায় বাড়ি না হওয়াই সম্ভব, টালিগঞ্জ কিংবা গড়িয়াহাটার দিকে—বিজন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, না, কোন্ দিকে যাবো ঠিক নেই।

রাইটার্স বিল্ডিংস-এর লাইব্রেরী থেকে বিজন যখন বেরুলো, তখন পাঁচটা পঁচিশ। তবুও বিজনের কোনো তাড়া নেই। কেরানী আর অফিসাররা একসঙ্গে বেরোয় না, অফিসারদের দেরিতে বেরোনোই নিয়ম। দাশগুপ্ত যে অফিসার সে সম্পর্কে বিজনের কোনো সন্দেহই নেই, কেননা লিফ্‌টম্যান বাবু না বলে বলেছিল দাশগুপ্ত সাহেব। বিজন ধীর পায়ে লালদীঘি পেরিয়ে চার্চ লেনে ঢুকলো।

হুড়হুড় করে বেরুচ্ছে সবাই, যারা যত সাধারণ এবং নিচু তাদের ব্যস্ততা তত বেশী। বিজন মানুষগুলোর মুখের দিকে না তাকিয়ে চলন্ত জুতোগুলো লক্ষ্য করতে লাগলো। চটি, পাম্প, বুট, কাবুলি, স্যামসন--যে জুতোগুলো সস্তা সেগুলোই দ্রুত চলেছে, দামি জুতোগুলোর নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি। সামনের মাস থেকে বিজনকেও এই ভিড়ের মধ্যে রোজ মিশতে হবে—বিজন ঠিক করলো একজোড়া দামি নতুন জুতো কিনে নেবে।

সেই অফিস বাড়িটার সামনে এসে বিজন পর পর দুটো সিগারেট শেষ করলো। চারজনকে নিয়ে লিফ্‌ট নামলো, একবার মাত্র মুখ দেখেছে, কিন্তু দাশগুপ্তকে ওদের মধ্য থেকে চিনতে বিজনের অসুবিধা হলো না। চারজনই একসঙ্গে বেরিয়ে এলো, খুব একটা জরুরী বিষয় নিয়ে কথা বলছে বোধ হয়—অন্যদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, বাইরে এসে ওরা সবাই সামনে দাঁড়ানো স্টেশন ওয়াগানটায় উঠে পড়লো। সেই গাড়িতে দু'জন মেম সমেত আরও ছ'জন ব্যক্তি আগেই বসেছিল। বিজন এটা ভেবে রাখে নি। অনেক অফিসে অফিসারদের পৌঁছে দেবার জন্য গাড়ি বন্দোবস্ত আছে।

স্টেশন ওয়াগানটা ছেড়ে যেতেই বিজন আবার আপন মনে হাসলো। তারপর সোজা সেই বাড়িটায় ঢুকে পড়ে লিফ্‌ট না নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে চার-তলায় উঠলো। মুলিগান ডেভিস কোম্পানির অফিসে তখনও দু'চারজন লোক আছে, লোহার গেটটা টেনে বন্ধ করা হচ্ছে। বিজন ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, দাশগুপ্ত সাহেব বেরিয়ে গেছেন?

একজন বেয়ারা বললো, হ্যাঁ, এই তো, এইমাত্র—

ইস্! দেখা হলো না!

কোলাপসিবল গেটের হাতল ধরে একটু থেমে থেকে বিজন আবার জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা দাশগুপ্ত সাহেবের বাড়ি কোথায়? বিশেষ দরকার—

--আমির আলি এভিনিউতে থাকেন, নম্বর জানি না।

—ও বুঝতে পেরেছি। দাশগুপ্ত সাহেবের পুরো নাম কি যেন?

—পি. এন. দাশগুপ্ত।

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে আবার নেমে এলো বিজন। ট্রামে বাসে এখন খুব ভিড়, একটু বাদে উঠতে হবে। শীতের দিন বলে বিকেলটা চুরি হয়ে গেছে। এর মধ্যেই প্রগাঢ় সন্ধ্যা! মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়ে একটা দমকল ছুটে গেল। দমকলগুলো তো সারাদিনই বসেই থাকে—প্রত্যেক সন্ধেবেলা এইরকম সারা শহর ঘুরে মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়ে গেলে মন্দ হয় না। পি এন? প্রিয়নাথ? উঁহু এনামগুলো মানাচ্ছে না। পিনাকীনাথ? প্রবুদ্ধ কিংবা প্রমথনাথ?

সি টি ও-তে ঢুকে বিজন টেলিফোন গাইডটা খুললো। পি. এন. দাশগুপ্ত দু'জন আছে আমির আলি এভিনিউতে। এমনও হতে পারে—গলির মধ্যে অন্য কোনো নামের রাস্তায় বাড়ি। দেখা যাক। একজন পি. এন. দাশগুপ্ত ডাক্তার, তাকে বাদ দেওয়া যায়।

কমলা রঙের তিনতলা বাড়ি। বসতবাড়ি না ফ্ল্যাটবাড়ি ঠিক বোঝা যায় না। দরজার দু'পাশে দুই প্রস্থ নেম প্লেট, দাশগুপ্ত আর সেনগুপ্ত। দাশগুপ্ত দু'জন—অনিন্দ্যনয়ন আর প্রশান্তনয়ন। এর মধ্যে প্রশান্তনয়ন একজন কস্ট অ্যাকাউনটেন্ট—তাও লেখা আছে। এই সে নিশ্চয়ই। কী কাণ্ড! প্রশান্তনয়ন একজন কস্ট অ্যাকাউনটেন্টের নাম—যার হওয়া উচিত শকুন-চক্ষু! উপন্যাসের থেকেও জীবন অনেক অবিশ্বাস্য।

দরজার দু'পাশে দুটো কলিং বেল, দাশগুপ্তের দিকটায় বিজন বেল টিপতেই পিছন

থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো, কাকে ডাকছেন? ঘুরে তাকিয়ে বিজন দেখলো, একটা বছর সতেরো বয়সের মেয়ে, বেশ দেখতে, চকচকে মুখ, চোখের দৃষ্টিতে যৌবন এসে গেছে, হাতে একটা ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট। বিজন মুখখানা হাসি হাসি করে খুব ভালভাবে জিজ্ঞেস করলো প্রশান্ত ফিরেছে নাকি অফিস থেকে?

মেয়েটি হাসির উত্তরে হাসি দেখালো না। অত সহজে আপনার সামনে হাসব কেন —এইরকম একটা মুখের ভাব নিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, দাঁড়ান দেখছি। তারপর মেয়েটি ডেকে উঠলো, মেজদা—তার ডাক আস্তে আস্তে দূরে এবং সিঁড়ির ওপরে মিলিয়ে যায়।

প্রশান্তনয়ন বাড়ি থাক্ বা না থাক্—এই মেয়েটি কি আবার খবর দিতে আসবে? বিজন নিজেকে জিজ্ঞেস করলো, বাজি? পকেট থেকে একটা সিকি বার করে বললো, বলো, হেড না টেল? হেড? খুব সন্তর্পণে টুসকি মেরে সিকিটাকে শূন্যে পাঠিয়ে আবার মুঠোয় পুরলো। খুলে দেখলো, টেল। অনেক সময় হেড টেল করে যেটা ওঠে বিজনের, আসলে ঘটে তার উল্টোটা। পরীক্ষার সময় হেড টেল করে প্রতিবার ওর ফেল উঠেছে, অথচ পাস করে গেছে ঠিক। যাই হোক, বিজন নিজের কাছে প্রতিশ্রুতি দিল, মেয়েটি যদি ফিরে আসে, তাহলে সব কিছু বদ'ল যাবে। তাহলে সব অন্যরকম।

বুড়ো চাকরটা এসে বললে, দাদাবাবু বাড়ি নেই, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

বিজন হতাশ বিরক্তিতে বললো, এখনও অফিস থেকে ফেরে নি?

—না।

—ঠিক আছে—

—আপনার কি নাম বলবো?

বলো, ওর এক বন্ধু এসেছিল দেখা করতে, বিজন রায়চৌধুরী।

মিন্টুদি যদিও ইনকাম ট্যাক্স অফিসে চাকরি করে, কিন্তু বি এ পাস করেছিল ফিলসফি অনার্স নিয়ে। মিন্টুদি বিজনকে প্রায়ই বলে, কি ভাবে দিনগুলো নষ্ট করছিস বাউণ্ডুলেপনা করে। প্রত্যেকেরই জীবনের একটা উদ্দেশ্য থাকা দরকার। সব মেয়েরাই উপদেশ দিতে ভালোবাসে তাদের মধ্যে কেউ ফিলসফিতে পাস করলে তো কথাই নেই। বিজনের যে-সব বন্ধু-বান্ধবরা তাদের নিজেদের ধারণা অনুযায়ী সার্থক হয়েছে তারাও কথায় কথায় বিজনকে বলেছে, জন্তু-জানোয়ারের মতন উদ্দেশ্যহীনভাবে জীবন কাটাবার কোনো মানে হয়? জীবনে একটা কিছু করতে গেলে. .।

বস্তুত, জন্তু-জানোয়ারদের সম্পর্কে ঐ অপবাদটা বিজনের পছন্দ হয় নি। বিজন এ পর্যন্ত একটাও এমন জন্তু দেখে নি—যে বিনা উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ায়।

আজ যেন বিজন ওর জীবনের একটা সত্যিকারের উদ্দেশ্য পেয়ে গেছে। ওর একমাত্র উদ্দেশ্য প্রশান্তনয়ন দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা করা। সেই সন্ধেবেলাতেই বিজন ঐ বাড়িতে ঘুরে ঘুরে ফিরে এলো—কিন্তু প্রশান্ত বা সেই সতেরো বছরের মেয়েটি—কারুর সঙ্গেই আর দেখা হলো না। বিজন অবশ্য নিজেকে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছে—প্রশান্ত না ঐ মেয়েটি—কার সঙ্গে দেখা করা তার বিশেষ ইচ্ছে। না, এ সম্পর্কে ওর সঠিক উত্তর আছে, প্রশান্তর সঙ্গেই ওর দেখা করা উদ্দেশ্য, কিন্তু ঐ মেয়েটির সঙ্গেও যদি ওর দেখা হয় এবং ওর হাসি মুখের উত্তরে সেও হাসি মুখ দেখায়, তবে বিজন পরবর্তী ঘটনাগুলো বদলে ফেলবে। একটা অযৌক্তিক ব্যাপারের মুখোমুখি শুধু আর একটা ঐরকম অযৌক্তিক ব্যাপারকেই দাঁড় করানো যায়। প্রশান্তনয়নের বোনের নাম কি? যদি শোনে হরিণ-নয়না, তাহলেও বিজন খুব বেশী অবাক হবে না।

সেদিন সন্ধের পর বিজন তিনবার প্রশান্তনয়নকে ডাকতে এসেছিল। একবারও পাওয়া গেল না। অফিসের গাড়ি করেই ফিরেছে অথচ বাড়ি ফিরলো না—এ আবার কি রকম! হয়তো মাঝপথে কোনো বন্ধুর বাড়িতে নেমে গেছে। আড্ডা মারছে। প্রশান্তনয়নের বিয়ে হয়েছে কিনা তাও তো বিজন জানে না, হয়তো কোথাও প্রেম-ট্রেম করতে গেছে। কিন্তু অফিসের পোশাকে প্রেম? তা হলে প্রেমালাপের মাঝে-মাঝে 'হেন্সফোর্থ' কিংবা 'নটউইথস্ট্যান্ডিং'—প্রভৃতি কথাগুলো ঢুকে যাবে না?

পরদিন সকাল আটটায় বিজন এসে আবার দরজার বেল টিপলো। বুড়ো চাকর এসে বললো, ওপরে আসুন। সিঁড়ির পাশের দেয়াল ধপধপে সাদা, এত সাদা রঙে গায়ে ঠাণ্ডা লাগে। কমলালেবু রঙের শাড়ি পরে কালকের সেই মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে নামছে, বিজন জানে একবার চোখাচোখি হবেই। ঠিক সেই মুহূর্তটিতে বিজন তার উদ্ভাসিত হাসি মুখ মেয়েটির দিকে মেলে ধরলো, কিন্তু ঐটুকু মেয়ে কী গম্ভীর, হাসলো না, নিরেট মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে নেমে গেল। একজন অপরিচিত পুরুষের হাসি দেখে কোনো মেয়েকে হাসতে হবেই, এর মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু একটা যুক্তিহীন ব্যাপারই তো বিজন আশা করছিল, তাহলে, তখন, সেই মুহূর্ত থেকেও সে ঘটনাগুলো বদলে দিতে পারতো। কিন্তু আর উপায় নেই।

দোতলার মুখে প্রশান্তনয়ন ড্রেসিং গাউন পরে দাঁড়িয়েছিল, ওকে দেখেই বললো, এই যে আসুন, আসুন। আপনিই কাল দু'-তিনবার এসেছিলেন?

প্রশান্তনয়ন সদ্য দাড়ি কামিয়েছে, মুখখানা ভিজে ভিজে, ঘরে তখনও ক্রিমের সুগন্ধ। সোফা সেটটি সাজানো, দেয়ালে দু'তিনখানা ক্যালেন্ডার ছাড়া কোনো ছবি নেই। অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজভাবে মুখে হাসি ফুটিয়ে বিজন বললো, কেমন আছেন? বাঃ, বেশ চমৎকার ঘরখানা আপনার। দক্ষিণ দিকটা একেবারে খোলা--

প্রশান্তনয়নের মুখ দেখে বোঝা যায়, ভিতরে খুব অনুসন্ধান চলছে। প্রতিনমস্কার করে বললো, আপনি...

—চিনতে পারেন নি তো?

—হ্যাঁ মানে, কোথায়, ঠিক মনে পড়ছে না।

বিজন কৌতুক করা গলায় বললো, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, চিনতে পারেন নি। আমার নাম, বিজন। বিজন রায়চৌধুরী।

—আপনার সঙ্গে কোথায় আলাপ হয়েছিল বলুন তো?

--আলাপ ঠিক হয় নি, দেখা হয়েছিল। কাল দুপুরে, চার্চ লেনের মোড়ে--

—কাল?

প্রশান্তনয়ন ভ্রূ কুঁচকে খানিকক্ষণ ভাবার চেষ্টা করলো। তারপর খানিকটা বিনীত হাস্যে বললো, আমার স্মৃতিশক্তি খুব ভালো না, মনে করতে পারছি না কিন্তু যাকগে, আপনি কি...

হ্যাঁ, আমি একটা বিশেষ দরকারে এসেছি। আপনার নামটা কিন্তু বেশ আনইউজুয়াল, বুঝতে পারি নি। আপনার বোনের নাম কি?

—আমার বোন? কোন্ বোন?

—ঐ যে যার বয়েস ১৭-১৮ হবে। একটু সিঁড়িতে দেখলাম।

প্রশান্তনয়নের মুখ এবার সতর্ক হয়ে গেল, একটু রুক্ষ গলায় বললো, কেন বলুন তো? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না--

—না, এমনিই, কৌতূহলে। আমার দরকারটা অবশ্য অন্য। কাল দুপুর ঠিক দুটো বেজে তেত্রিশ মিনিটের সময় আমি চার্চ লেনের মুখে দাঁড়িয়ে সিঙ্গাপুরী কলা খাচ্ছিলুম। আমি কলা খেতে ভালবাসি না, ওটা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের জন্যই বরাদ্দ রেখেছি, একমাত্র সিঙ্গাপুরী কলা, মানে, শুধু সবুজ রঙের ফলের ওপর আমার একটু লোভ আছে।

প্রশান্তনয়ন তখন পি. এন. দাশগুপ্ত হিসাবে রূপান্তরিত হয়ে নীরসভাবে বললো, মাপ করবেন, আমার সাড়ে ন'টায় অফিস, আপনার দরকারের কথাটা যদি সংক্ষেপে বলেন।

কোনো কথা না বলে বিজন প্রায় এক মিনিট তার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর উদাসীনভাবে হেসে বললো, আপনার কোনো উপায়ই নেই। আপনাকে সবটুকু শুনতেই হবে।

—তার মানে?

বিজন এই সাময়িক বাধা উপেক্ষা করে আবার খুব শান্ত গলায় বলতে লাগলো,

কলার খোলাগুলো আমি হাতে রেখেছিলুম, একজন ফাউন্টেন পেনওয়ালার ধাক্কায় সেগুলো মাটিতে পড়ে যায়, সে অবশ্য সেজন্য ক্ষমা চেয়েছে, তারপর আমি সেগুলোকে পা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিলাম, এমন সময় আপনি আপনার এক বন্ধুর সংগে যেতে যেতে আমাকে অন্যমনস্কভাবে ধাক্কা দিলেন, মানুষের শরীরে মানুষের ছোঁয়া লাগলো—তবু আপনি ফিরে তাকান নি, এমনই ব্যস্ত ছিলেন।

—আমি; কাল দুপুরে? অ্যাবসলিউটলি ননসেন্স। আমি কাল দুপুরে কারুকে কোনো ধাক্কা দিইনি, তা হলে আমার মনে থাকত।

আপনার ধাক্কা লাগার ফলে আমি বেশ জোরে আছাড় খেয়ে পড়ে যাই। আমার কোমরে সামান্য চোট লেগেছে এবং চশমাটা যদিও ভেঙে গেছে, কিন্তু জীবনে আগে আর কখনো কারুর ধাক্কা খাইনি কিংবা পড়ে যাই নি তা তো নয়। সুতরাং এটাকে একটা অস্বাভাবিক ঘটনা বলা যেতো না, যদি না কাল দুপুরে হঠাৎ আমার মনের মধ্যে একটা জরুরী প্রশ্ন জাগতো।

—আপনি ভুল করছেন মিঃ রায়চৌধুরী। কার ধাক্কায় পড়ে গিয়ে আপনার চশমা ভেঙে গেছে—এটা নিশ্চয়ই দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু সে অন্য লোক, আমি নই, বোধ হয় ভুল হয়েছে।

বিজন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে খুব ধীর গলায় বললো, কাল দুপুরের পর থেকে আজ এই পর্যন্ত সর্বক্ষণ আমি শুধু আপনার কথা ভাবছি। আপনার মুখ, চোখ, হাঁটার ভঙ্গি—আপনার সংগে আমি মনে মনে এত কথা বলেছি যে, আপনি আমার বন্ধুর মত চেনা। আমার ভুল হতে পারে না।

প্রশান্তনয়ন ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললো, এমন ধাক্কা দিলুম যে, পড়ে গেল একটা লোক অথচ আমি, আশ্চর্য, চশমা পর্যন্ত ভাঙলো—

চশমাটা ভেঙে বোধ হয় ভালোই হয়েছে। সেইজন্য আমার মনের মধ্যে প্রশ্নগুলো জাগলো, না হলে হয়তো...

—ঠিক আছে, যদি আমার জন্য আপনার চশমা ভেঙেই থাকে, ইট ইজ এ লস্ নো ডাউট, আমি কি করতে পারি বলুন?

—আপনি এখন অফিস যাবেন, নিশ্চয়ই ব্যস্ত, আপনার সংগে পরে অন্য কোথাও দেখা করে কিছু কথা বলতে চাই। আমার দু' একটি প্রশ্ন আছে—

—আর তো কথার কিছু নেই। আমি আপনার চশমার দাম দিয়ে দিতে পারি। কত টাকা, বলুন?

—টাকা?

বিজন একেবারে আমূল অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালো। বললো, টাকার কথা তো আমি বলি নি। আপনি টাকা দিতে চান?

—তা ছাড়া আর আপনার উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে। কত টাকা গচ্চা দিতে হবে চটপট বলুন।

কত টাকা? বিজন একবার ঘাড় ঘুরিয়ে সারা ঘরটা দেখলো, যেন পরিবেশের মূল্য যাচাই করে নিচ্ছে। তারপর হাসতে হাসতে বললো, ঠিক আছে, তা হলে আপনি আমাকে এক লক্ষ টাকা দিন।

—কী! এক লক্ষ টাকা? চশমার দাম!

—আমি তো চশমার দাম চাই নি! চশমাটা আর কি! আমি আমার দৃষ্টি বদলের জন্য কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছিলুম—টাকার সংগে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এক লক্ষ টাকা তো আর নয়, একটা সমগ্র জীবন, ওতে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

পি এন. দাশগুপ্ত গলা চড়িয়ে ডাকলেন, তপু, তপু, একবার শুনে যা—।

দরজার কাছে আর একটি যুবা এসে দাঁড়ালো, গেঞ্জি গায়ে—শরীরে অনেক সবল পেশী। পি. এন দাশগুপ্ত বললো, তপু, দ্যাখ তো, এই লোকটা পাগল না জোচ্চোর—কি চায়। একবার বলছে, আমি নাকি ধাক্কা দিয়ে ওর চশমা ভেঙে দিয়েছি, আবার বলছে, আপনার বোনের নাম কি—

তপন্ নামের সেই শারীরিক শক্তি এগিয়ে এসে বললো, কার কথা জিজ্ঞেস করছে, রিন্টুর কথা? আপনি কোন্ পাড়ায় থাকেন দাদা?

বিজন হাসতে হাসতেই মানুষের প্রতি মানুষের কথা বলার ভঙ্গিতে বললো, না, এমনিই নাম জিজ্ঞেস করছিলাম শুধু। আর কোন বদ মতলব আমার নেই। আপনার দাদা আমার বন্ধু, ওর সঙ্গে আমি দু' একটা দরকারি কথা বলতে এসেছিলাম।

পি. এন. দাশগুপ্ত বললো, বন্ধু, হাঃ! তপু বললো, ঠিক আছে বন্ধু, ওঁর যখন কথা বলার সময় নেই, অফিস যেতে হবে, তাহলে আপনি এবার চট্‌পট্ কেটে পড়ুন।

বিজন বললো, ওঁর এখন সময় নেই, সেইজন্যই আমি পরে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চাইছিলুম। আমার দরকারটা খুব জরুরী।

পি. এন. দাশগুপ্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, আপনার সঙ্গে কোনো কথা বলার ইচ্ছে নেই। মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর। ভেবেছ, যা তা বলে টাকা আদায় করবে।

তপু বিজনের কাঁধে হাত রেখে সামান্য ঠেলে বললো, বাইরে, বাইরে, আর কোনো কথা নয়, ভালোয় ভালোয়—। বিজন বললো, ছিঃ এরকমভাবে গায়ে হাত দেওয়া ঠিক নয়।

তপুর চোয়াল শক্ত হয়ে এলো, পি. এন দাশগুপ্ত বললো, তপু বেশী কিছু করিস না। নো স্ক্যান্ডাল! তপু হিংস্রভাবে বললো, স্ক্যান্ডাল আবার কি। পাড়াটায় যত লুচ্চা-বদমাইশ এসে ভিড় করছে আজকাল,—যা-ও। তপু জোরে ধাক্কা দিতেই বিজনের মাথা আর একটু হলে দরজায় ঠুকে যাচ্ছিল, অতি কষ্টে সামলে, বিজন খুবই ক্লান্ত ও দুঃখিতভাবে বললো, ছিঃ, নিজের বাড়িতে বসে কারুর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা মোটেই উচিত নয়। অন্যায়!

প্রশান্তনয়ন বিজনের হাত দু'খানা চেপে ধরে চরম কাতরভাবে বললো, আমি না দেখে আপনাকে ধাক্কা দিয়েছিলাম, বুঝতে পারিনি আপনি পড়ে গেছেন বা চশমা ভেঙে গেছে—কিন্তু সেটা কি খুব মারাত্মক কোনো অপরাধ? বলুন!

সন্ধের অন্ধকারে নির্জন গঙ্গার পাড়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে আছে। বিজন হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে শুকনোভাবে জবাব দিল, আমি তো বলিনি আপনার সেরকম কিছু দোষ হয়েছে।

তা হলে আপনি আমাদের বেঁচে থাকা অসহ্য করে তুলেছেন কেন? কেন আপনি দিনরাত ছায়ার মতন লেগে আছেন আমার সঙ্গে। গত একুশ দিন ধরে আমার বাড়ির সামনে অফিস, ক্লাবে, রাস্তায় যেখানেই তাকিয়েছি—সব সময় আপনাকে নিয়তির মতন ঘুরতে দেখেছি। আমার বান্ধবীর সঙ্গে বেড়াতে গেলেও দেখেছি দূরে আপনি পাথরের মতন চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছেন। আপনাকে কতবার অপমান করিয়েছি লোক দিয়ে তবু আপনি যান নি—শেষপর্যন্ত আমার নার্ভে অসহ্য হয়ে উঠলো, আমি অফিসে কাজ করতে পারি না, খেতে পারি না, ঘুমোতে পারি না—সব সময় শুধু দুঃস্বপ্ন দেখি—একজোড়া চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে—কেন?

ব্যাপারটা আপনিই এতখানি ঘোরালো করে তুলেছেন।

—স্বীকার করছি, আপনি যেদিন আমার বাড়িতে এলেন, সেদিন চশমার দাম দিতে চাওয়াটা আমার অন্যায় হয়েছিল, আমার ভাই গোঁয়ারের মতন আপনাকে অপমান করেছে—সে জন্য আপনি আমার কী শাস্তি দিতে চান দিন।

—শাস্তির কথা আমার মনে পড়ে নি। আপনাকে শুধু আমার দু' একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল, আপনি চঞ্চল হয়ে শুনতেই চাইলেন না—

শুধু আমাকেই বা আপনি প্রশ্ন করবেন কেন? আরও তো কতো লোক আছে—পথেঘাটে এরকম ধাক্কা কি লাগে না?

তা লাগে। কিন্তু আপনিই যে প্রশ্নগুলো আমার চোখের সামনে তুলে ধরলেন। আমার জীবনে কোন উদ্দেশ্য ছিল না, আপনাকে দেখে উদ্দেশ্য পেয়ে গেলাম। দোষ আপনার নয়, আমার নয়, সেই মুহূর্তটার দোষ—

সেদিন আপনাকে ধাক্কা মারার ব্যাপারটা আমি টের পেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি

ওরকমভাবে পড়ে যেতেই—আমি আর ফিরে আসতে সাহস করিনি। আমার সঙ্গে আমাদের বোম্বে অফিসের ম্যানেজার ছিলেন—যদি তাঁর সামনেই আপনি আমাকে যা-তা অপমান করেন সেইজন্য...

—আপনি আমাকে কি প্রশ্ন করবেন?

গঙ্গা থেকে হুহু করে ভিজে হাওয়া ঝাপটা মারছে ওদের চোখে মুখে। কুহকের মতন ডাক দিয়ে বিজন ভুলিয়ে এনেছে প্রশান্তনয়নকে। এই ক'দিনে ওদের দু'জনেরই মুখ খানিকটা পাংশু ও চোখ বেশী উজ্জ্বল হয়েছে। ক্লান্তভাবে চোয়ালে হাত বুলতে বুলতে বিজন বললো, এই একুশ দিনে প্রশ্নটা অনেক পুরোনো হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমি এত বেশী ভেবেছি যে, এর ধার কমে গেছে। কাল থেকে আমি নতুন চাকরিতে জয়েন করবো—এখন আর এসব প্রশ্ন না তুললেও হয়। কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে আমার মনে প্রশ্নগুলো জেগেছিল—তখন ভেবেছিলাম—তার উত্তর জানাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। এখন যদি আবার ওগুলো ভুলে যাই আবার প্রমাণ হবে—আমার জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই। সারাজীবন আমি কলার খোসা রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়েছি—যাতে অন্য লোক তাতে পা দিয়ে না আছাড় খায়। কিন্তু সেগুলো সরাতে গিয়ে যদি একদিন আমি নিজেই আছাড় খাই—তা হলেও আমার মনে কোনোরকম প্রশ্ন জাগবে না?

প্রশান্তনয়ন শরীরটাকে ছোট করে ফেলার ভঙ্গি করে উত্তর দিল, ব্যাপারটা আমি এরকমভাবে ভেবে দেখিনি।

—তখন আমার মনে হলো—এটাই কি তা হলে আমার সারাজীবনের ব্যর্থতার কারণ? তবে কি, সারাজীবন আমি যত কলার খোসা রাস্তার পাশে সরিয়ে দিয়েছি—সেগুলোকে আবার রাস্তার মাঝখানে এনে রাখা শুরু করবো?.. আমি জানি—এর কোনো উত্তর হয় না। তারপরই আপনার দিকে আমার চোখ পড়লো। তখনই মনে হলো, আপনার কাছে আর একটা জিনিসের উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

বিজন একটু চুপ করলো। প্রশান্তনয়ন জলের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয়, বহুদিন সে জলের দিকে এরকম একদৃষ্টে তাকায় নি। বিজনের গলার আওয়াজ ক্রমশ উৎসাহহীন ও নিস্তেজ হয়ে আসছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বিজন আবার বললো, আপনার বাড়ি, ঘর-সংসারের সঙ্গে আমি পরিচিত হতে চেয়েছিলুম। উদ্দেশ্য ছিল আপনার সম্পর্কে একটা সম্পূর্ণ ধারণা তৈরি করা। এতদিন আমি নিজে যে-ভাবে জীবন কাটিয়েছি—কোনোদিন সেটাকে ভুল ভাবি নি। মানুষের সঙ্গে সমস্ত সংঘর্ষ এড়িয়ে গেছি। তারপর মনে হলো, জীবনটা বদলানো দরকার। কিন্তু সেটা কি রকম? পাশে যদি বন্ধু বা অফিসের বড়কর্তা কিংবা প্রেমিকা থাকে—তবে পথের যে কোনো লোককে ধাক্কা দিয়ে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না-করে চলে যাওয়া—সেই কি অন্য রকম জীবন? সেই জীবন কত উঁচুতে পৌঁছোয়, সেই জীবনে সুখ কতখানি—সেটা জানার জন্যই আপনাকে জানা আমার দরকার ছিল।

প্রশান্তনয়ন অত দ্রুত মুখ ফিরিয়ে বললো, আপনি আমাকে যা ইচ্ছে শাস্তি দিন, আমাকে আর অপমান করবেন না। এখানে কেউ নেই; আপনি আমাকে কান ধরতে বলুন জুতো—

বিজন দুঃখের সুরে বললো, আপনাকে অপমান করা বা শাস্তি দেবার কথা আমি একবারও কল্পনা করিনি। আপনাকে আমার জীবনের দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যায় কিনা আমি সেই কথাই জানতে চেয়েছিলুম! আমার নিজের জীবনটা ত্যাগ করে আরেক রকম জীবন অবলম্বন করতে চেয়েছিলাম আমি—যে জীবনের একটু স্থির উদ্দেশ্য আছে, যে জীবন উন্নতি করে, যে জীবন বড় হয়, কিন্তু সেই জীবনে আরম্ভ করার পদ্ধতি কি—কতখানি ত্যাগ করতে হয়—আমার জানার কৌতূহল ছিল কিন্তু—

—দয়া করে আর ওসব কথা তাহলে তুলবেন না! আপনাকে বন্ধু আর একটা কথা বলি, এরকমভাবে জীবন কাটানো যায় না। এর প্রশ্ন-উত্তর নিয়ে জীবনের কিছুই যায় আসে না। এক এক মানুষের জীবনের এক এক রকম নিয়ম আছে মানে, কতকগুলো স্বভাবের ইয়ে, মানে সবাই নিজের নিজের কল্পনা অনুযায়ী চাল থাকতে চায় এত সব

যুক্তি তর্ক...

সম্পূর্ণ পরাজিতের ভঙ্গিতে বিজন বললো, তাতো জানিই। তা কি আর আমি জানি না। শুধু ঐ মুহূর্তটিতে আমার অন্যরকম মনে হয়েছিল। সেইজন্যই তো বলছিলাম, দোষ আপনার নয়, আমার নয়, ঐ মুহূর্তটারই দোষ।

ভুল প্রতিশ্রুতি

বাস থেকে নেমে দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে এলো খানিকটা। সন্ধে হয়ে এসেছে, দোকান-পাটে ঝলমলে আলো। দু'জনেরই কথা বলার ছিল, কিন্তু কোনো কথাই বলা হলো না।

পারমিতাকে এবার গলিতে ঢুকতে হবে। সে একটু দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, এই কাছেই আমার বাড়ি।

রবি বললো, ঠিক আছে, আমি যাই তাহলে?

পারমিতা বললো, আসবে আমাদের বাড়িতে? এসো না, আমার কর্তার সঙ্গে আলাপ করবে?

--আজ থাক, আর একদিন না হয়?

—কেন, এসো না, আজই চলো। ও এতক্ষণ বাড়ি পেঁছে গেছে। অফিস থেকে সোজা চলে আসে। সকালবেলা তো আমাদের প্রায় দেখাই হয় না। আমি ভোরবেলা স্কুলে বেরিয়ে যাই, ও তখনো ঘুম থেকে ওঠে না। আমি স্কুল থেকে যখন বেরিয়ে আসি, ও তার আগেই অফিসে বেরিয়ে যায়।

রবি বললো, আজ আমার অন্য কাজ আছে। আর একদিন আসবো।

পারমিতা বললো, ঠিক আসবে? এই সাত বছরে তো একবারও খোঁজ নাও নি।

—তুমি আমার খোঁজ নিয়েছিলে?

—আহা, মেয়েদের পক্ষে খোঁজ নেওয়া সম্ভব নাকি!

রবি পারমিতার মুখের দিকে দু'এক পলক তাকিয়ে রইলো। বিয়ের পরই পারমিতা চলে গিয়েছিল দিল্লীতে। রবির বুকের মধ্যে তখন অসহ্য জ্বালা। সে পারমিতাকে চিঠি না লিখে পারে নি। পারমিতা সংক্ষিপ্ত উত্তরে জানিয়েছিল, তার স্বামী এই রকম চিঠি লেখালেখি পছন্দ করে না। রবি আর কখনো লেখেনি, পারমিতার খবরও রাখতে চায় নি। এতকাল বাদে কলকাতার বাসে আজ দেখা।

রবি বললো, আমি গেলে তোমার স্বামী কি খুশী হবেন?

পারমিতা হাল্কাভাবে বললো, কি হয়েছে তাতে! মানুষের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব আসতে নেই?

—বিবাহিত মেয়েদের বন্ধু থাকতে নেই।

—বিবাহিত ছেলেদের বুঝি থাকতে বাধা নেই?

—তোমার স্বামীর আছে নাকি?

—তুমি কবে আসবে বলো?

—দেখি আর একদিন সময়টময় করে—

—এই গলি দিয়ে সোজা গেলে দেখবে একটা হলদে রংয়ের তিনতলা বাড়ি। আমরা তিনতলাতেই থাকি। ফ্ল্যাটবাড়ি—সোজা ওপরে উঠে যাবে, কারুকে কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই।

—আচ্ছা, মনে থাকবে। চলি।

পারমিতার সঙ্গে এতদিন দেখা হয় নি, যোগাযোগ ছিল না—রবি পারমিতার কথা অনেকটা ভুলে গিয়েছিল। কিংবা ভুলে যায় নি, স্মৃতির ওপর জমেছিল কুয়াশা। সেই কুয়াশা সরে গেল আবার। সেদিন দেখা হওয়ার পর থেকেই রবির বুকের মধ্যে সব সময়

জ্বলজ্বল করতে লাগলো পারমিতার মুখ। এই ক'বছরে পারমিতার চেহারা বিশেষ কিছু বদলায় নি। এক সময় কত রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পারমিতা। একদিন রবির বুকে মাথা রেখে বলেছিল, রবিকে সে কোন দিন ভুলবে না। রবি যা চাইবে, পারমিতা সব দেবে।

অল্প বয়সে ওরকম অনেক কিছুই হয়। কঠিন সংসারে ঢুকলে ওসব প্রতিশ্রুতি মিলিয়ে যায়। রবি পারমিতার কাছে কিছুই চায় নি।

দেখা হওয়ার পর নতুনভাবে ছটফটানি জেগে উঠলো। বারবার রবির মনে হতে লাগলো পারমিতার কাছে এখন কিছু চাইলে কি রকম হয়? যদি সেই প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

দিন সাতেক বাদে রবি আর পারলো না; দুপুরের দিকে চলে এলো পারমিতাদের বাড়ির সামনে। দুপুরবেলা ওর স্বামী থাকে না, পারমিতাদের সংসারে আরও কেউ থাকে কিনা সেটা জিজ্ঞেস করা হয় নি। তবু একটু ঝুঁকি নিতেই হবে। পারমিতার সঙ্গে সে একা কথা বলতে চায়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল তিনতলায়। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করতে লাগলো। এই রকম দুপুরবেলা কারুর বাড়িতে আসা কি ঠিক? কিন্তু পারমিতা তাকে আসতে বলেছিল। এত দূর এসে আর ফেরা যায় না।

দরজা খুললো পারমিতাই। খানিকটা যেন অবাক্ হয়েই বললো, তুমি?

—এই সময় এসে বিরক্ত করলাম?

—না, না, এসো।

—হঠাৎ ইচ্ছে হল।

—আমি ভাবতেই পারিনি, তুমি আসবে। এত বছর বাদে।

পারমিতার বসবার ঘরখানি বেশ সাজানো গোছানো। দুজনে বসলো একটু দূরত্ব রেখে দুটি সোফায়। বোধহয় ঘুমোচ্ছিল পারমিতা, চোখেমুখে একটু একটু ঘুম লেগে আছে। চুলগুলো এলোমেলো, শাড়িরাউজ একটু শিথিল।

রবির বুকের মধ্যে হুহু করে উঠলো। একদিন এই মেয়েটিকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছে সে। এখন সে উঠে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরতে পারে না? বলতে পারে না, তুমি আমার, তুমি আমার, তুমি কথা দিয়েছিলে, আমি যা চাইবো—।

কিন্তু রবি বরং এতদিন বাদে পারমিতার সঙ্গে নিরালা ঘরে বসে একটু আড়ষ্টই বোধ করে। চোখের দিকে চোখ রেখে তাকাতে পারে না।

—তোমাদের বাড়িতে আর কেউ থাকে না?

পারমিতা হেসে বললো, তুমি ভালো দিনেই এসেছ। আমাদের সঙ্গে আমার এক বিধবা ননদ থাকেন। তিনি আজ নেই, ভবানীপুরে গেছেন একজন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে।

—তোমার স্বামী কখন ফেরেন?

—ফিরতে ফিরতে ছ'টা হয়।

—কোন্ অফিস ওঁর?

পাইওনীয়ার ইণ্ডাস্ট্রীজ। বিড়লাদের। দিল্লী থেকে ওকে বাঙ্গালোরে পাঠাতে চেয়েছিল। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে কলকাতায় আসা গেছে। এখন অবশ্য মনে হচ্ছে, না এলেই ভালো হতো।

—কেন, কলকাতা ভালো লাগছে না?

—কলকাতা বেশ ভালোই লাগছে। কিন্তু কলকাতায় ফিরে এসেই ওর মতিভ্রম হলো।

—কেন, রণজিৎবাবু কি করেছেন?

—আর বলো না! ওর অফিসে একটা স্টেনো আছে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে, নাম স্টেলা। তার সঙ্গে ওর এখন খুব দহরম-মহরম!

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ। মেয়েটাকে প্রায়ই বাড়ি পৌঁছে দেয়। সব সময় ওর মুখে শুনি সেই শাঁকচুন্নির গুণগান। ও রকম কাজের মেয়ে আর হয় না। ও রকম ভালো ব্যবহার আর কারুর নেই। ওকে ছাড়া কোনো কাজ হয় না।

—তোমার খুব হিংসে হয় বুঝি?

—হিংসে না, ভয়!

—অফিসে একসঙ্গে মেয়েরা কাজ করলে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেই হয়। তা নিয়ে আজকাল অত চিন্তা করলে চলে না।

—কাজের সঙ্গে সম্পর্ক, কিন্তু তার বাড়িতে গিয়ে নেমন্তন্ন খাওয়া কেন? অ্যাংলো মেয়েদের মতন মাংস নাকি কেউ রাঁধতে পারে না।

—রণজিৎবাবু যখন এসব ব্যাপার তোমাকে সব বলেন, তার মানে দোষের কিছু নেই।

—পুরুষরা অনেক সময় নির্লজ্জ হয়। একদিন সেই মেয়েটাকে এ বাড়িতে পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল। রাগে আমার গা জ্বলে গেছে।

রবি চুপ করে গেল।

পারমিতা বললো, সে মেয়েটাকে তো আমি দেখেছি—রংটা একটু ফর্সা হলেও চোয়াড়ে চোয়াড়ে চেহারা—ঐরকম মেয়েদের দেখেও পুরুষরা কিসে মুগ্ধ হয় বলতে পারো?

রবি আর কিছু না বলে চুপ করে শুনে যেতে লাগলো। এক সময় তার খেয়াল হলো এতদিন পর দেখা সত্ত্বেও পারমিতা তার সম্পর্কে একটা কথাও জিজ্ঞেস করে নি। সে খালি তার স্বামী আর অ্যাংলো মেয়েটির কথাই বলে যাচ্ছে। রবি আর সেই কৈশোরকালের প্রেমিক নয়, যে-কোনো একজন মানুষ।

পারমিতা ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, ও এইসব করে বেড়াতে পারে আর আমার বুঝি কোনো বন্ধু থাকতে পারে না?

পারমিতা উঠে দাঁড়ালো। শরীরের সব কটি রেখাগুলো জাগিয়ে আড়মোড়া ভাঙলো একবার। বুক থেকে আঁচল পড়ে গেছে। মুখে অন্যরকম হাসি ফুটিয়ে বললো, তুমি যে এসেছো, আমার এত ভালো লাগছে!

রবির মুখখানা কালো হয়ে গেছে। অপ্রত্যাশিতভাবে বললো, আমি আজ চলি। এদিকে এসেছিলাম, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে গেলাম।

দারুণ অবাক্ হয়ে পারমিতা বললো, এখন চলে যাবে? কেন? হঠাৎ কি হলো তোমার?

রবি কঠিন গলায় বললো, আমাকে যেতেই হবে। আমার জরুরী কাজ আছে।

পারমিতা চেষ্টা করেও রবিকে আটকাতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত হতাশভাবে জিজ্ঞেস করলো, আবার কবে আসবে? কাল? কিংবা এই সোমবার—সেদিন কেউ থাকবে না—

রবি বললো, আর আসতে পারবো না। আমি দুর্গাপুরে একটা চাকরি পেয়েছি। দু'দিনের মধ্যেই চলে যেতে হবে।

পারমিতার কাছ থেকে ভালভাবে বিদায় না নিয়েই রবি বেরিয়ে পড়লো। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না।

স্বামীর ওপর রাগ বা অভিমান করে পারমিতা এখন অন্য যে কোনো একজন পুরুষকে তার শয্যাসঙ্গী করে নিতে চায়। রবি একসময় পারমিতার প্রেমিক ছিল, সে যে-কোনো পুরুষ হতে পারবে না।

নবীন যৌবন

দুপুরে খবর পেলাম কৌশিককে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। এই নিয়ে তিনবার।

প্রথমবার কৌশিকের আত্মহত্যার ব্যর্থ প্রয়াসের খবর পেয়ে যতটা উত্তেজিত ও বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম, এবার তেমন হলো না। একটু বিরক্তই বোধ করলাম বরং। খবরটা শুনেই মনে হলো, এবার কৌশিককে একদিন আচ্ছা করে একটা ধমক দিতে হবে। এ সব কি ছেলেমানুষী!

তার আগে অবশ্য জানা দরকার কৌশিক শেষপর্যন্ত বেঁচে উঠবে কি না। হাসপাতালে একবার যেতে হবে।

হাসপাতালে কৌশিকের চিকিৎসা ঠিকমত হচ্ছে কিনা, সে সম্পর্কে অবশ্য চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই। কৌশিক নিজেই থার্ড ইয়ারের ডাক্তারির ছাত্র, হস্টেলে থাকে। ওদেরই কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালে ওকে রাখা হয়েছে, ওর সহপাঠী এবং মাস্টারমশাই-ডাক্তাররা নিশ্চিত ভালোভাবেই দেখাশুনা করছেন।

কৌশিক আমার এক বন্ধুর ছোট ভাই। আমার সেই বন্ধু এখন চাকরি সূত্রে থাকে বিলাসপুরে। সে আমাকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিল, আমার ভাইটা যাতে একেবারে বখে না যায়, তুই একটু দেখিস। কখনো যদি তোর কাছে টাকা ধার চায়, কিছুতেই দিবি না, ওর একটু বেশী খরচ করা স্বভাব।

কৌশিক মাঝে মাঝে আসে আমাদের বাড়িতে। ওদের হস্টেলে কখনো শাক-চচ্চড়ি-সুক্তো এইসব রান্না হয় না বলে আমাদের বাড়িতে এসে খেতে চাইতো। কোনোদিন টাকা ধার চায় নি। বেশ মধুর স্বভাবের ছেলে, ওকে দেখলে সকলেই পছন্দ করে। পড়াশুনোতেও বেশ ভালো ছাত্র, সুতরাং ওকে দেখাশুনো করার কিছুই নেই।

শুধু ওর ঐ এক দোষ, আত্মহত্যা করার স্বভাব। প্রথমবার ও ডান হাতের শিরা কেটে গরম জলে হাত ডুবিয়ে বসে ছিল। অজ্ঞান হয়ে যাবার পর ওর হাতটা সরে যায় গরম জলের গামলা থেকে, হস্টেলের একজন চাকরের চোখে পড়ে যায়। প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল শরীর থেকে।

সেবার খবর পেয়েই আমি হাসপাতালে ছুটেছিলাম। সারাদিন বসেছিলাম উদ্বিগ্ন মুখে। কৌশিক সুস্থ হয়ে ওঠার পর অনেক জোর করেও জানতে পারিনি, কেন ও আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। একটি সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান মেধাবী ছেলে, সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়ে আছে, সে কেন আত্মহত্যা করতে চাইবে? কৌশিক শুধু মৃদু মৃদু হেসে বলেছিল, কি যেন, কি রকম যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল মাথাটা। নিজেই বুঝতে পারি নি।

অল্প বয়েসে আত্মহত্যার ইচ্ছে জাগাটা খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ঐ সময়ে মৃত্যু সম্পর্কে একটা তীব্র কৌতূহল এবং আকর্ষণ জাগে। কখনো কখনো মনে হয়, টুপ করে হঠাৎ মরে গেলে কি হয়, দেখাই যাক না। এ রকম আমারও কতবার হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আমি মরে গেলে তারপর কি হবে, তা আমি জানতে পারবো না তাই সত্যি সত্যি কখনো মরতে যাই নি।

কৌশিককেও তাই কোনো উপদেশ না দিয়ে শুধু বলেছিলাম, আর ওরকম পাগলামি করো না।

তখনই কানাঘুষোয় শুনতে পাচ্ছিলাম, কৌশিক একটি মেয়ের সঙ্গে খুব প্রেম করছে। প্রায়ই ওদের একসঙ্গে দেখা যায় সিনেমায়।

খবরটা শুনে আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলাম। বাইশ-তেইশ বছরের একটি ছেলের পক্ষে একটু-আধটু প্রেম করা খুব স্বাস্থ্যকর ব্যাপার। প্রেমে পড়লেই মানুষের মনে স্নেহ, মায়া, মমতা—এই সব গুণগুলোও জেগে ওঠে। একটি মেয়েকে ভালোবাসতে শিখে কৌশিক এবার নিজের জীবনটাকেও ভালোবাসবে। যে-সব যুবক কারুকে ভালোবাসতে পারে নি কিংবা ভালোবাসা পায় নি, তারাই তাদের শুকনো জীবনটাকে নিয়ে কি করবে ঠিক ভেবে পায় না।

কিছুদিন পরেই কৌশিক মেয়েটিকে নিয়ে একদিন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলো। মেয়েটির নাম বিদ্যুৎপর্ণা। গায়ের রংটা যদিও মেঘলা আকাশের মতন, কিন্তু মেয়েটি বেশ তেজস্বিনী ধরনের। কথাবার্তা বেশ সাবলীল। কৌশিকের সহপাঠিনী।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত কলেজের ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়লে সব সময় চেষ্টা করতো, কি করে ব্যাপারটা গোপন রাখবে। এখন তারা অনেক সহজ হয়েছে। নিছক চক্ষুলজ্জার বালাই নিয়ে সময় নষ্ট করে না।

তা ছাড়া, প্রেম ও বন্ধুত্বের মাঝখানেও একটা সীমারেখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগে সকলে মনে করতো, একটা ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের কথা বলা কিংবা দু' একদিন একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানো মানেই প্রেমের ব্যাপার। এখন, প্রেমে না পড়েও একটি ছেলে আর একটি মেয়ের মধ্যে অনায়াসে বন্ধুত্ব হতে পারে।

কৌশিক বিদ্যুৎপর্ণাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসে বললো সুনীলদা, এ আমার বন্ধু বিদ্যুৎপর্ণা।

আমি বললাম, বাঃ নামটা তো বেশ চমৎকার।

বিদ্যুৎপর্ণা বললো, আপনার এই নামটা ভালো লাগলো? আমার একটুও পছন্দ হয় না, বড্ড পুরোনো ধরনের।

কৌশিক বললো, এ কিন্তু দারুণ পাজী মেয়ে। দেখতে শান্তশিষ্ট হলে কি হয়?

বিদ্যুৎপর্ণা কৌশিককে লক্ষ্য করে বললো, আর ও তো একটা পাগল! আপনি তা বুঝে গেছেন নিশ্চয়ই!

খুব সহজেই আমাদের আলাপ-পরিচয় জমে উঠলো। ওরা ওদের ডাক্তারি ক্লাসের অনেক মজার মজার গল্প বললো? যে সব ছাত্র এবং অধ্যাপকদের আমি কখনো চোখেও দেখিনি তাদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অনেক কিছু জানা হয়ে গেল আমার।

এর পর ওদের দু'জনকে মাঝে মাঝে একসঙ্গে দেখেছি। মনে হয়েছে, ওরা বেশ আনন্দে আছে। এই বয়েসটায় তো আনন্দে থাকারই কথা। দুঃখতেও আনন্দ থাকে এই সময়।

একদিন আমার অফিসে টিফিনের পর একটু দেরি করে পৌঁছেছি, দেখি গেটের কাছে কৌশিক আর বিদ্যুৎপর্ণা দাঁড়িয়ে আছে।

কৌশিক আমাকে দেখে এগিয়ে এসে ধমক দিয়ে বললো, আপনি এত দেরি করলেন কেন? কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আছি আপনার জন্য!

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার? খুব জরুরী কাজ আছে মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ। খুব জরুরী। তিনটে টাকা দিন তাড়াতাড়ি। বিদ্যুৎপর্ণাকে সিনেমা দেখাবো বলেছি, তিন টাকা শর্ট পড়ে যাচ্ছে।

আমি দেখলাম, এটা একটা বেশ ভালো কারণ। এজন্য অনায়াসেই টাকাটা দেওয়া যায়। এবং এ ব্যাপারটা বিলাসপুরে আমার বন্ধুকে না জানালেও চলে।

টাকাটা নিয়ে কৌশিক তাড়াতাড়ি চলে গেল।

এর পাঁচ দিন পরেই খবর পেলাম, কৌশিক দ্বিতীয়বার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে। এবার আরও অবাক হলাম। এই বয়সে পরিপূর্ণ সুখের সময়, এখন আবার এই চেষ্টার সময় কি? তাহলে কি বিদ্যুৎপর্ণার সঙ্গে কোনো কারণে ঝগড়া হয়েছে? সেটাই একমাত্র কারণ হতে পারে। প্রেমে পড়ার আনন্দের চেয়ে প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার দুঃখ অনেক বেশী তীব্র।

কিন্তু সেবার হাসপাতালের গেটেই বিদ্যুৎপর্ণার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বিদ্যুৎপর্ণাও আমারই মতন হতভম্ব। সেও কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। কৌশিকের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ তো দূরের কথা, গত কয়েকদিনের মধ্যে একবারও ঝগড়া পর্যন্ত হয় নি। আগের দিন সন্ধেবেলাতেও ওরা একসঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এ, সেখানে আর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো, তিনজনে মিলে খাবার খেয়েছে রেস্টুরেন্টে, কত গল্প। তারপরই রাত্তিরবেলা এ কি কাণ্ড!

বিদ্যুৎপর্ণাকে দেখে সেদিনই মনে হয়েছিল, ও সত্যিই ভালোবাসে কৌশিককে। মুখে গভীর দুঃখের রেখা।

সেবার কৌশিক সেরে ওঠার পর আমি আর বিদ্যুৎপর্ণা দু'জনে মিলে ওকে অনেক জেরা করেছিলাম। কৌশিক কোনো উত্তর দেয় নি। সর্বক্ষণ লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু

করে ছিল।

বিদ্যুৎপর্ণা শেষপর্যন্ত রেগে গিয়ে বলেছিল, তুমি আমাদের কাছেও সব কথা খুলে বলবে না? তা হলে আর কক্ষনো তোমার সঙ্গে মিশবো না।

কৌশিক বলেছিল, আচ্ছা এবারকার মতন ক্ষমা করে দাও। আর কক্ষনো এরকম করবো না, কথা দিচ্ছি।

আমি বিদ্যুৎপর্ণাকে গোপনে বলেছিলাম, ও হয়তো আমাদের সামনে বলবে না— একা তোমার কাছে বলতে পারে। তুমি কথায় কথায় একসময় বার করে নিও।

বিদ্যুৎপর্ণা কিছু জানতে পেরেছিল কিনা আমি তা জানি না। আমাকে আর কিছু বলে নি। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই কৌশিক আবার স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। আমাদের বাড়িতে এসে লাফালাফি করতো আগের মতন। কৌশিক খুব কথা বলতে ভালোবাসে, প্রচণ্ড জোরে জোরে হাসে।

এক একদিন ঘোর দুপুরবেলা আমার বাড়িতে বিদ্যুৎপর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলেছে, সুনীলদা, আমরা একটু গল্প করতে এলাম।

বিদ্যুৎপর্ণার কাঁধে কৌশিকের হাত। কোনো রকম সংকোচ বা জড়তা নেই। ওদের দেখে আমার ভালো লেগেছিল।

তারপর বছরখানেক কেটে গেছে। ওদের দু'জনের চমৎকার জুটি হয়েছিল। ওদের দেখে অনেকে হিংসে করতে পারে, এমনভাবে ওরা সুখী। পড়াশুনোও ঠিকঠাক করছে, সুতরাং বলার কিছু নেই।

আবার হঠাৎ এই আত্মহত্যার প্রচেষ্টা সংবাদ।

হাসপাতালের একজন চেনা ডাক্তারকে টেলিফোন করে জানতে পারলাম, কৌশিকের জ্ঞান ফেরে নি। এবারে ও চল্লিশটা স্লিপিং পিল খেয়েছিল, ওর রুমমেট ছুটিতে, সারা রাত কেটে গেছে, কেউ টের পায় নি? স্টমাকে পাম্প করা হয়েছে বটে কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা এখনো কাটে নি। অর্থাৎ এবার কৌশিক বাঁচবে কিনা এখনো ঠিক নেই।

অফিস থেকে বেরিয়ে তক্ষুনি হাসপাতালে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে পড়লো বিদ্যুৎপর্ণার কথা। বিদ্যুৎপর্ণা যদি এখন বাড়িতে থাকে, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে ভালো হয়। একা একা হাসপাতালে যেতে আমার খুব অস্বস্তি লাগে।

বিদ্যুৎপর্ণার বাবা কলকাতার একজন বিখ্যাত অধ্যাপক। সুতরাং সেই নাম দেখে, টেলিফোন নাম্বার খুঁজে পেতে দেরি হলো না।

টেলিফোনে বিদ্যুৎপর্ণাকে পেয়ে আমি একটু অবাক হলাম। কেন যেন আমার ধারণা হয়েছিল, কৌশিকের জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত বিদ্যুৎপর্ণা হাসপাতালেই বসে থাকবে।

বিদ্যুৎপর্ণার কথা শুনে আরও অবাক হলাম।

বিদ্যুৎপর্ণা সহজভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার, সুনীলদা, হঠাৎ আমাকে মনে পড়লো যে?

—সে কি, তুমি খবরটা শোনো নি?

—কি খবর?

—কৌশিকের? তুমি কিছুই জানো না নাকি?

বিদ্যুৎপর্ণা নিস্পৃহভাবে বললো, ও হ্যাঁ, শুনেছি। এতে আর নতুনত্ব কি আছে?

—তুমি হাসপাতালে যাও নি?

—না।

—বিদ্যুৎপর্ণা, এবার ব্যাপারটা সীরিয়াস। এখনো জ্ঞান ফেরে নি।

—আমি তার কি করতে পারি বলুন!

—আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম। এ ব্যাপারটা বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব নয়! বিদ্যুৎপর্ণাকে বছরখানেক ধরে দেখছি। সে মোটেই হালকা ধরনের মেয়ে নয়। আজ একটা ছেলে কাল অন্য একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াবার মতন নয় সে। কৌশিককে ও সত্যি ভালোবাসে, আমি দেখেছি। তবু আজ কৌশিকের মৃত্যু সম্ভাবনা জেনেও ও এরকমভাবে কথা বলতে পারছে।

আমি আস্তে আস্তে বললাম, আমি এক্ষুনি হাসপাতালে যাচ্ছি। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

—না। আপনি ঘুরে আসুন।

—ছিঃ, বিদ্যুৎপর্ণা। এখন মান অভিমানের সময় নয়। চলো, আমার সঙ্গে চলো।

বিদ্যুৎপর্ণা কঠিন গলায় বললো, না।

আমি টেলিফোন রেখে দিয়ে বিমূঢ়ভাবে বেরিয়ে পড়লাম অফিস থেকে।

কৌশিক আর বিদ্যুৎপর্ণা আমার চেয়ে বারো চোদ্দ বছরের ছোট। বারো বছরে এক যুগ হয়। ওরা আমার থেকে এক যুগ এগিয়ে আছে। ওদের চিন্তা কিংবা ব্যবহার আমাদের চেয়ে আলাদা।

হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম কৌশিকের তখনো জ্ঞান ফেরে নি। চেনা ডাক্তারটি অবশ্য অভয় দিয়ে বললেন, বিপদ কেটে গেছে, এখন যে-কোনো সময়ে জ্ঞান ফিরে আসতে পারে।

আমি আধ ঘণ্টা বসে রইলাম কৌশিকের বিছানার পাশে। জ্ঞান ফেরার কোনো লক্ষণই দেখতে পেলাম না। আমার ভয় করতে লাগলো। এ রকম একটা সুন্দর তাজা প্রাণ নষ্ট হয়ে যাবে? এর আগের দু'বারে বিলাসপুরে আমার বন্ধুকে কোনো কিছু জানাই নি। কিন্তু আজ এক্ষুনি একটা টেলিগ্রাম করা দরকার। সত্যিই যদি কিছু একটা হয়ে যায়, তারপর আর আপসোসের শেষ থাকবে না।

হাসপাতাল থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসছিলাম, দেখি গেটের পাশে বিদ্যুৎপর্ণা দাঁড়িয়ে আছে একা।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে ওর মুখের দিকে চাইলাম। তারপর বললাম, এখনো জ্ঞান ফেরেনি। তুমি দেখতে যাবে?

বিদ্যুৎপর্ণা দৃঢ় গলায় বললো, না। ওর মরে যাওয়াই উচিত। এসব ছেলে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না।

এ রকম কথা শুনে রাগ করার কোনো মানে হয় না। হাসপাতালের গেটের পাশে যে একা দাঁড়িয়ে আছে, তার এই রকম কথা বলার নিশ্চয়ই গভীর কোনো কারণ আছে।

আমি হেসে বললাম, খুব রাগ হয়েছে বুঝি? ও বুঝি খুব কষ্ট দিয়েছে তোমাকে!

—ওর মতন ছেলের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। ও না করলে, আমাকেই আত্মহত্যা করতে হতো। কিন্তু আমি কেন মরতে যাবো বলুন তো?

—কি হয়েছিল কি?

—কি আবার হবে? কৌশিক একটা পাগল, আপনারা জানতেন না?

—আমরা সবাই তো একটু আধটু পাগল। তোমাকে ভালোবেসে ওর পাগলামি তো সেরে গিয়েছিল।

—একে ভালোবাসা বলে না। এটা একটা অসুখ।

বিদ্যুৎপর্ণার মুখে শুনলাম, কৌশিকের প্রত্যেকবারই আত্মহত্যার কারণ এক। এবং সে কারণটা এতই সামান্য যে অবিশ্বাস্য মনে হয়।

কৌশিক কিছুতেই সহ্য করতে পারে না যদি বিদ্যুৎপর্ণার সঙ্গে অন্য কোনো যুবক কথা বলে। ক্লাসের কোনো ছেলে কিংবা রাস্তায় চেনা কেউ যদি বিদ্যুৎপর্ণার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে চায়, অমনি কৌশিকের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। অনেক সময় সে বিদ্যুৎপর্ণাকে কিছু না বলেই সরে পড়ে সেখান থেকে।

বিদ্যুৎপর্ণা প্রথম দিকে বুঝতেই পারে নি। কৌশিক এ জন্য মুখে কখনো আপত্তি জানাতো না। দু'তিন দিন রাগ করে বসে থাকতো। তারপর আবার নিজেই ছুটে এসেছে বিদ্যুৎপর্ণার কাছে।

বিদ্যুৎপর্ণার মুখে এখনো রাগের চিহ্ন লেগে আছে। একটু গলা চড়িয়ে বললো, আগের বার কি হয়েছিল জানেন? ও আর আমি ভিক্টোরিয়াতে বেড়াতে গেছি সন্ধেবেলা —এমন সময় ওরই এক পুরোনো বন্ধু অমলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। তারপর আমরা একসঙ্গে বেড়ালাম কিছুক্ষণ, একটা চীনে দোকানে খেতে গেলাম—কত রকম মজা

করলাম, ওর ব্যবহারে সেদিন কিছুই বুঝতে পারিনি। অমল ছেলেটি খুব আমুদে, নানারকম ঠাট্টা করতে ভালোবাসে। অমল দোষের মধ্যে কি করেছিল জানেন? মাটি থেকে কয়েকটা ভুঁইচাঁপা ফুল কুড়িয়েছিল, আমায় একটা দিন তো, চুলে গুঁজবো। অমল সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, আমি গুঁজে দিচ্ছি। আমি কিছু বলার আগেই অমল জোর করে ফুলটা তো গুঁজে দিল আমার খোঁপায়। কিন্তু বলুন, এটা কি দারুণ একটা অপরাধ? এ জন্য কেউ আত্মহত্যা করে?

আমি কোনো মন্তব্য না করে প্রশ্ন করলাম, আর এবার কি হয়েছিল?

বিদ্যুৎপর্ণা বললো, জানি না।

--বলোই না।

—এবার আরও বেশী পাগল হয়েছিল। বিলেত থেকে আমার এক মামাতো ভাই কিছুদিন আগে ফিরেছে, আমার আপন মামাতো ভাই, ছেলেবেলায় একসঙ্গে কত খেলা করেছি—দারুণ ভালো ছেলে, চেহারাও সুন্দর---আমার সেই মামাতো ভাই সম্পর্কে ওর কাছে একদিন খুব প্রশংসা করেছিলাম। তাতেই বাবু চটে গেলেন। আমাকে রেগেমেগে বললো কি জানেন। আমি যেন আমার মামাতো ভাইয়ের নাম আর কোনোদিন ওর কাছে উচ্চারণ না করি! এ কথা শুনলে আমার রাগ হয় না? আমার বুঝি রাগ নেই?

—তুমি বুঝি খুব রেগে গিয়েছিলে ওর ওপরে?

—কেন রাগবো না বলুন? তারপর আবার বলে কি, আমি আমার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে মিশতেও পারবো না, কথাও বলতে পারবো না। এ কখনো হয়? এরকম আবদার কখনো শুনেছেন?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বিদ্যুৎপর্ণা, কৌশিকের অনেক কিছু থাকতে পারে, কিন্তু তবুও তুমি ওকে এখনো ভালো বাস না?

বিদ্যুৎপর্ণার মুখখানা আরক্ত হয়ে গেল। ঝাঁঝের ছলে বললো, ওকে ভালোবাসতেও আমার বয়ে গেছে। এ রকম যদি করে—আপনিই বলুন না, এ রকম অদ্ভুত কথা কেউ বলতে পারে?

আমি বললাম, হ্যাঁ পারে। তুমি রামায়ণ পড়োনি? স্বয়ং রামও এই রকম কথা বলেছিলেন। তিনি সীতাকে বলেছিলেন, তুমি আমার সামনে ভরতের প্রশংসা করো না। ঋদ্ধিমান পুরুষেরা কখনো পরের প্রশংসা সইতে পারে না। ভেবে দ্যাখো, নিজের ভাই, এবং ভরতের মতন ভাই—

—এ রকম কথার কোনো মানে হয় না।

ভালোবাসার সময় পুরুষদের এ রকমই হয়। আমারও হয়েছে অনেকবার। ভেবে-ছিলাম, নতুন যুগে অনেক কিছুই বদলে গেছে। কিন্তু ভালোবাসার নিয়মকানুন কিছুই বদলায় নি!

বিদ্যুৎপর্ণার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার টেলিগ্রাম করার কথাটা মনে ছিল না। হঠাৎ মনে পড়লো। ওর কাছ থেকে বিদায় নিতে যাবো, এমন সময় আমার সেই চেনা ডাক্তার খবর পাঠালেন যে কৌশিকের জ্ঞান ফিরেছে।

এবার বিদ্যুৎপর্ণা নিজে থেকেই বললো, জ্ঞান হবার পর ও প্রথমে আমাকেই খুঁজবে। চলুন, দেখে আসি।

দু'জনে মিলে ফিরে এলাম হাসপাতালের মধ্যে। কৌশিকের ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এসে ডাক্তার বললেন, জ্ঞান ফিরেছে, কথা বলছে, যান।

আমি ঘরে ঢুকতে গিয়েও থমকে গেলাম। বিদ্যুৎপর্ণাকে বললাম, এখন তুমি একাই যাও। হয়তো তোমার পাশে এই মুহূর্তে আমাকে ও সহ্য করতে পারবে না। এখন মনটা দুর্বল তো!

বিয়েবাড়ির এত ভিড়ের মধ্যে কে কি রকম পোশাক পরে, তা আমার নজরে আসে না। মেয়েরা কিন্তু সবই লক্ষ করে। সাড়ে সাতশো জন নিমন্ত্রিত পুরুষ আর আটশো জন মহিলাকে বাড়ির মেয়েরা পোশাক দিয়ে ঠিক চিনে রাখে।

আমার মাসতুতো বোন খুকু তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমাকে সামনে পেয়েই বললে, এই ছোড়দা, একটা হলদে কালো চেক চেক শার্ট-পরা ছেলেকে দেখেছিস?

আমি কিছু না ভেবেই বললাম, না তো?

দেখিসনি? তোর সামনে দিয়েই তো এইমাত্র গেল!

তখন আমার মনে হল, হলদে-কালো চেক চেক শার্ট-পরা তিন চারজন ছেলেকেই বোধহয় আমি দেখেছি! কিংবা তারও বেশী হতে পারে! কিন্তু কোথায় দেখেছি, তা তো মনে নেই?

খুকুকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন, কি হয়েছে?

খুকু দারুণ উত্তেজিতভাবে ফিসফিস করে বলল নতুন বৌয়ের একটা টিকলি হারিয়ে গেছে। হলদে কালো শার্ট-পরা একটা অচেনা ছেলে ওখানে অনেকক্ষণ ঘুরঘুর করছিল।

চাঞ্চল্যকর সংবাদ, এতে কোন সন্দেহ নেই। আমার মাসতুতো ভাই দীপঙ্করের আজই বৌভাত! সুতরাং আত্মীয় হিসেবে আমার অনেক কাজকর্ম করার কথা। কিন্তু নেমন্তন্ন বাড়ির কোন কাজই আমাকে দিয়ে হয় না বলে আমি শুধু এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে ব্যস্ততার ভান করছিলুম। কিন্তু এই একটা কাজে খুব উৎসাহ দেখানো যেতে পারে। শখের গোয়েন্দাগিরিতে কার না উৎসাহ থাকে। বললাম, চল তো গিয়ে দেখি।

ঠিক হলদে-কালো না হলেও, হলদে খয়েরি রঙের একটা চেক শার্ট আমারও আছে। ভাগ্যিস সেটা আমি আজ পরে আসিনি। আমার আপন মাসতুতো ভাইয়ের বিয়ে, সুতবাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে আজ ধুতি পাঞ্জাবি পরতে হয়েছে।

খুকুর বুদ্ধি আছে, ঘটনাটা সে বেশী লোককে জানাল না। বিয়ে বাড়ির আনন্দ উৎসবের মধ্যে একটা চোর ধরার হুজুগ তোলা ঠিক নয়। সে চুপিচুপি কয়েকজনকে জানাল। গেটের কাছে দুজনকে নজর রাখতে বলল।

আমি ওপরে উঠে এলাম।

দোতলার সবচেয়ে বড় ঘরটিতে নতুন কনেকে বসানো হয়েছে। তাকে ঘিরে যথারীতি মেয়েদের ভিড়।

কনেকে এই প্রথম আমি ভাল করে দেখলাম। আজ বৌভাত। বিয়ের দিনও আমি ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সেদিন ভিড়ের মধ্যে উঁকি দিয়ে ওকে ভাল দেখতে পাইনি।

বিয়ের দিন মোটামুটি চেহারার সব মেয়েকেই বেশী সুন্দরী দেখায়—একে আরো জমকালো দেখাচ্ছিল। লাল রঙের বেনারসীটাতে আবার নানারকম জরির কাজ, কোমরের ওপর থেকে মাথার চুল পর্যন্ত গয়নায় একেবারে মোড়া। মুখে কত রকম যে রং মাখানো হয়েছে তার ঠিক নেই, দারুণ গরমের মধ্যে মেয়েটি বসে বসে ঘামছিল, মুখে অবশ্য হাসি ফুটিয়ে রেখেছে। বিয়ে কিংবা বৌভাতের দিনে কনে বৌয়ের কোনো ব্যক্তিত্ব থাকতে নেই, কারুর সঙ্গে জোরে কথা বলতে নেই। শুধু মিষ্টি হেসে নমস্কার করাই তার একমাত্র কাজ।

আমি বললুম, ঐ তো মাথায় টিকলি রয়েছে!

খুকু আমাকে চোখ দিয়ে ধমক লাগাল।

আমি নির্বোধ। টিকলি বুঝি একটার বেশী দুটো থাকতে নেই? যার এগার জোড়া দুল, চারখানা হার, তিনজোড়া বালা, আঠারো গাছা চুড়ি, তেইশটা আংটি, তারপরেও বাজু, আমলেট-টামলেট আরও কি, তার তো তিনটে টিকলি থাকবেই।

দীপঙ্কর জার্মানি থেকে বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এসেছে তো, তাই তার বাজার দর ভাল। শুনেছি, এগারটা পাত্রী দেখার পর এই মেয়েকে বাছা হয়েছে। আমার মাসীরা প্রগতি-

শীল। বিয়েতে পণ নেন নি, তবে চল্লিশ না পঞ্চাশ ভরি সোনা, জাপানী ঘড়ি, রেফ্রি-জারেটার আশিখানা প্রণামী, বরযাত্রীদের বাসভাড়া এসব না নিলে এ-এরকম পাত্রের মান থাকে কি করে? গরদের পাঞ্জাবি পরে দীপঙ্কর নিচে তার বন্ধুদের তদারক করছে মুখখানা রীতিমত খুশি খুশি। বিয়ের তত্ত্ব ছাড়া নিমন্ত্রিতদের কাছ থেকে উপহারও এসেছে অনেক। শাড়ি ও গয়নার বাক্স ডাঁই করে রাখা।

আমি ভাবলুম, এত গয়নার মধ্যে একটা টিকলি আছে কি নেই, তা জানা গেল কি করে? সব সময়ই কি একজন কেউ গুণে দেখছে?

না, ব্যাপার খুব সাঙ্ঘাতিক। সেই টিকলিটা দিয়েছেন নতুন বৌয়ের বড় বৌদি। তিনি তাঁর নিজের জিনিসে খেয়াল রাখবেন, না! তিনি একনজর দেখেই বুঝেছেন তাঁর টিকলিটা নেই। শুভদিনে তাঁর আশীর্বাদী জিনিসটা হারিয়ে যাওয়া খুবই অন্যায় কথা। বড় বৌদি এমনিতেই নাকি রাগী, তিনি আবার বলেছেন তাঁর শরীর ভাল নেই বলে, এ বাড়িতে কিছু খাবেন না। কুটুমবাড়ির লোকদের কাছে এ বাড়ির লোকদের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু বাড়িতে তো মেয়েদেরই ভিড়, পুরুষরা দরজার কাছ থেকে উঁকি মেরে চলে যায়। কেউ বা উপহারের প্যাকেটটা হাত বাড়িয়ে দিয়েই কেটে পড়ে। এর মধ্যে চেক শার্ট-পরা একটা ছেলে কনে বৌয়ের কাছাকাছি গেল কি করে? যে করেই হোক গিয়ে-ছিল ঠিকই। এরা ভেবেছে কুটুমবাড়ির কেউ, ওরা ভেবেছে এ বাড়ির কেউ। এখানে তো দু-পক্ষের সবার সঙ্গে চেনা জানা হয় নি। দীপঙ্কর নাকি কনের ছোট ভাইকেও গুরুজন ভেবে প্রণাম করে ফেলেছে।

আমার মনে হল, সামান্য একটা সোনার জিনিস চুরি গেছে, এই নিয়ে এখন হৈচৈ না করাই ভাল। পরে ভাল করে খুঁজে দেখলেই হবে। নতুন বৌয়ের মুখ দেখে মনে হয়, সেও বোধহয় এখন কোন গোলমাল চায় না।

কিংবা, তার মুখ দেখে যদি আমি বুঝতে ভুল করি, তা বলে দীপঙ্কর কি তাকে আর একটা টিকলি কিনে দিতে পারবে না? তার জন্যে ফুলশয্যার রাতটাকে বিষণ্ণ করার কোনে মানে হয় না।

আমি খুকুকে বললাম, এখন আর সে ছেলেটাকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে। তাছাড়া, সে-ই যে নিয়েছে তার কি কোনো মানে আছে?

খুকু বলল, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি মাঝখানে এসেছিল আর একটা পাখা লাগাতে।

তার গায়ে আবার কি রঙের শার্ট ছিল?

মোটা লাল রঙের গেঞ্জি।

আর প্যান্টটা? খাঁকি?

ছোড়দা, তুমি ইয়ার্কি করছ?

এখন চেপে যা। এখন এই গয়না চুরি নিয়ে বেশী কথাবার্তা বলার কোনো মানে হয় না। তাতে অন্য নিমন্ত্রিতরা অপমান বোধ করবেন।

কিন্তু আমার উপদেশ গ্রাহ্য করতে কারুর বয়েই গেছে। আমি তো একটা অকর্মার ঢেঁকি ছাড়া আর কিছুই না।

অবিলম্বে মেসোমশাই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? কি হয়েছে?

তারপর মামা মাসী পিসে খুড়োর দল বিশেষত সর্বঘটে কাঁঠালি কলা আমার মেজকাকা এসে নানারকম জেরা শুরু করলেন। গয়নার স্তূপ ঠিকঠাক সাজিয়ে গোনা-গুনি শুরু হয়ে গেল। অন্য মহিলারা আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন, দু-একজন উঠে গেলেন ঘর থেকে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই শোনা গেল, একজন প্রবীণ গোঁফওয়ালা লোককে সারাবাড়িতে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে, অথচ তাকে কেউ চেনে না। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। ইলেকট্রিক মিস্তিরি যে চারজন রয়েছে তাদের মধ্যে একজনও লাল গেঞ্জি-পরা নয়। তাহলে সেই মোটা লাল রঙের গেঞ্জি-পরা লোকটা কে? একজন রোগা মতন মহিলা নতুন বৌয়ের

কাছ ঘেঁষে অনেকক্ষণ বসে ছিলেন, তিনিই বা হঠাৎ কোথায় গেলেন?

হলদে কালো চেক শার্ট সম্পর্কেও নানারকম মতভেদ দেখা গেল। কেউ বলল, হলদে কালো চেক তো নয়, গোলাপী-কালো চেক। আবার আরেকজন বলল, হলদে-কালো বা গোলাপী-কালোর মতন ক্যাটকেটে জামা আজকাল কেউ পরে না, ওটা ছিল কচি কলাপাতা রঙের সঙ্গে আপেল রঙের স্ট্রাইপ।

চুরির কথাটা আস্তে আস্তে সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল। থার্ড ব্যাচে যারা খেতে বসেছিলেন, তারা চাটনি পরিবেশনের সময় এই খবরটা শুনে এমন আলোচনায় মেতে গেলেন যে খাওয়া শেষ করতে দেরি করে ফেললেন অনেক। বিশ্ব সমস্যার চেয়ে সামান্য একটা সোনার গয়না চুরির গল্প অনেক বেশী আকর্ষণীয়।

তবু একথা ঠিক, দীপংকরের বৌভাতের উৎসব একটু ম্লান হয়ে গেল। অনেকেই নানারকম কাজের অজুহাত দেখিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

একটা অসৌজন্যের ব্যাপার আমার মাসী-মেসোমশাইদের মনে পড়ে নি। এত লোক-জনের মধ্যে হঠাৎ একটা চুরির কাহিনী ছড়িয়ে দিলে কারুর কারুর মনে খুব অস্বস্তি জাগে। এক ধরনের মানুষ আছে, যারা যে-কোনো গোলমালের সময়ই নিজেকে দায়ী করে, আমাকে চোর ভাবছে না তো? এর সঙ্গে গরীব বড়লোকের কোনো সম্পর্ক নেই। অনেক অনেক বিখ্যাত লোককেও আমি দেশলাই চুরি করতে দেখেছি। খুব ধনী লোকেরাও ক্লিপটোম্যানিয়াক হয়। সকলেই অভাবে চুরি করে না, স্বভাবেও কেউ কেউ চোর হয়।

অযত্নে পড়ে থাকা গয়না অন্য কারুর চোখে পড়লে সে তক্ষুনি সেটা ফেরত দিতেও পারে, আবার ভাবতে পারে, লুকিয়ে রেখে ওদের আর একটু চিন্তিত করি। সেই রকম কেউ লুকিয়ে রাখে নি তো! সকলকেই যে চিন্তিত করে তুলেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সেই গয়না আর পাওয়া গেল না।

আজকাল বিয়েবাড়িগুলো সব প্রায় একই রকম হয়। বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নেই। দীপংকরের বিয়েতে ঐ একটা গয়না চুরির ব্যাপারে বৈচিত্র্য রয়ে গেল। এরপর কয়েকদিন দীপংকরের স্ত্রী স্বস্তির নানা রকম প্রশংসা শুনতে লাগলুম। অমন রূপসী মেয়ে কিন্তু একটুও অহংকার নেই। পিওর ম্যাথমেটিক্স নিয়ে এম-এ. পাস, অথচ কথা শুনে কে বুঝবে যে অত বিদুষী মেয়ে। যেমন নম্র, তেমন হাসিখুশি শ্বশুরে শাশুড়ীকে যা ভক্তি শ্রদ্ধা করে তাতে আজকালকার বৌদের আদর্শ স্থানীয় হতে পারে। শুধু একটি ব্যাপারে সে একটু রহস্যময়ী।

গয়না-চুরির প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে নি। আজকাল এসব ব্যাপারে কেউ পুলিশে খবর দেয় না। তবু জল্পনা-কল্পনা চলতেই লাগল। এই রকম জল্পনা-কল্পনার সময় নতুন বৌ হঠাৎ মন্তব্য করেছে, কে নিয়েছে আমি জানি। ও কথা থাক। তখন সকলে মিলে তাকে অনেক পেড়াপেড়ি করলেও সে আর নাম বলে নি। বার বার বলছে, ও কথা থাক।

তাতে ব্যাপারটা অন্য দিকে মোড় নেয়। এ কথার একমাত্র মানে হয় বাইরের কোনো উটকো লোক এসে চুরি করে নিয়ে যায় নি। চেনাশুনো কেউই। এরকম কথা শুনলেই গা ঘিরঘির করে।

চেনাশুনো সব লোকের চরিত্র আজ নতুনভাবে উদ্ভাসিত হয়। শুধু যে জিনিসটার দামের লোভেই কেউ নিয়েছে, তা না-ও হতে পারে; হয়তো জব্দ করার জন্য, কুটুম্বদের কাছে মুখ ছোট করার জন্য। বেছে বেছে সেইজন্য বৌয়ের হার। বড় বৌদির জিনিসটাই নিয়েছে। বড় বৌদি সেদিন কোনো খাবার মুখে না দিয়ে কি অপমানটাই না করে গেলেন।

আত্মীয়-স্বজন অনেকের সম্বন্ধেই কানাকানি শুরু হয়ে যায়। দেখা যায়, জব্দ করার জন্য কিংবা অপমান করার জন্য অনেকেই নাকি মুখিয়ে আছে। অমুক কি রকম মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে, কিন্তু ভেতরে যে কি বিষ আছে তা আর বুঝতে বাকি নেই। অমুক কাকীমা কি রকম শুনিয়ে গেলেন যে, তাঁর এক বোনপোর বিয়েতে এর ডবল জাঁকজমক হয়েছিল।

আমার মাসতুতো ভাই বোনদের এক বিধবা পিসীমা বহুদিন ধরে ও বাড়িতে আছেন। সকলে তাঁর প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ ছিল এতদিন। ও বাড়ির ছেলেমেয়েদের তিনি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন, সকলকে মায়ের চেয়েও বেশী যত্ন করেন। হঠাৎ দেখা গেল তিনি ঘরে ঢুকে পড়লে সবাই কথাবার্তা থামিয়ে দেয়। অনেকেই এখন লক্ষ্য করে ওঁর ব্যবহারটা যেন ইদানীং কেমন কেমন। ওঁর একটি মাত্র ছেলে, ছেলেটি কুলাঙ্গার হয়েছে, অনেক চেষ্টা করেও তাকে লেখাপড়া শেখানো যায় নি, এখন কোনো ক্রমে একটা ফ্যাক্টরিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ছেলের ওপর ওঁর বড্ড বেশী বেশী টান। এখন লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলেকে বেশী খাবার দেন। ছেলের যা হাতখরচের বহর! সেই খরচ যোগাতে পিসীমা কি করে ফেলেছেন তার ঠিক কি! বয়েস বেশী হলে অনেকের মাথার ঠিক থাকে না।

পিসীমা বুদ্ধিমতী। দু'দিনেই বুঝে গেলেন অন্যদের মনোভাব। একদিন সন্ধেবেলা নতুন বৌয়ের ঘরে ঢুকে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হ্যাঁ গো নতুন বৌ, আমি তোমার টিকলি নিয়েছি? তুমি বলেছ, তুমি জানো কে নিয়েছে। তাহলে আমার মুখের ওপর বল! একথা যদি সত্যি হয়, আমি ঠিক গিয়ে মরব! এতকাল এদের দেখলুম—

নতুন বৌ খাট থেকে নেমে এসে পিসীমার হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে বলল, দিদি, এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না!

নতুন বৌ খুবই নম্রতার সঙ্গে পিসীমাকে বোঝাল যে পিসীমার কথা সে ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করে নি।

পিসীমা একটু শান্ত হলেন। চোখের জল মুছে বললেন, তাহলে তুমি ঠাকুরের নামে দিব্যি গেলে বল।

নতুন বৌ বলল, আমি যে-কোনো দিব্যি গেলে বলছি। আমি তো আপনার কথা ভাবিইনি। অন্য কেউই আপনার সম্পর্কে এরকম ভাবতে পারে না। আপনি ভুল শুনেছেন।

তাহলে কে নিয়েছে?

সেটা আমি বলতে পারব না।

একজন সন্দেহ-মুক্ত হলো। পিসীমা হঠাৎ বেশী বেশী খুশী হয়ে তাঁর যৌবন-কালের গল্প বলতে লাগলেন।

এরপর আর একটা আলোচ্য বিষয় এল। কে নেয় নি, নতুন বৌ সে কথা বলতে রাজি আছে। তাহলে চেনাশুনোদের মধ্যে কে কে নেয় নি, তা বলে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

খুকু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, বৌদি, তা হলে বল, আমি কি নিয়েছি তোমার টিকলিটা?

তার বৌদিও হাসতে হাসতে উত্তর দিল, এ কি ভাই। তোমরা কি এখানে কোর্ট বসাবে নাকি? একটা সামান্য জিনিস, ছেড়ে দাও না!

বিয়ের পর আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি এক একদিন নেমন্তন্ন খাওয়াই রেওয়াজ। সেই অনুসারে দীপঙ্কর আর ওর স্ত্রী স্বস্তিও একদিন আমাদের বাড়িতে এল, আমি অসামাজিক জীব, রাত এগারোটার আগে কোনোদিন বাড়ি ফিরি না। আমার বাড়িতে কেউ এলে আমার সঙ্গে দেখাই হয় না। তবে কিনা দীপঙ্কর জার্মানি যাবার আগে পর্যন্ত আমার খুবই ভক্ত ছিল, তাই সেদিন আমি সন্ধেবেলা বাড়িতেই রইলাম।

দীপঙ্কর শ্বশুরবাড়ি থেকে দেওয়া সুট, জুতো, ঘড়ি পরে (মোজা আর রুমাল ও-বাড়ির বোধহয়) একেবারের শ্বশুরবাড়ির ছেলে সেজে এসেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে শ্বশুরবাড়ির মেয়েকে। ওকে আর চেনাই যায় না।

স্বস্তি ভেতরে গেলে, আমি দীপঙ্করকে নিয়ে বাইরে গিয়ে বসলাম। দু-চারটে টুকিটাকি কথার পর জিজ্ঞেস করলাম, কি রে, সিগারেট খাস না?

লাজুক মুখ করে ও বলল, তোমার সামনে খাব ছোড়দা?

পাঁচ বছর জার্মানিতে থেকেও ও এখানে আমার মতন সামান্য গুরুজনের সামনে

সিগারেট ধরায় না। সম্বন্ধ করা বিয়ে করে। অন্য মেয়েদের সঙ্গে ইয়ার্কির সুরে কথা বলে না। আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে ঠিকঠাক নেমন্তন্ন রাখতে যায়। অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফেরে। রীতিমত ভাল ছেলে যাকে বলে।

আর আমরা বিলেত জার্মানি কোথাও যাইনি, তবু গুরুজন-ফুরুজনকে অযথা ভক্তি করি না, বাড়ি ফেরার ঠিক নেই, বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে যাওয়ার কথা ভাবলেই ঘেন্না হয়, এ রকম আরও কত কি। বিলেত জার্মানির থেকেও আমরা অনেক বেশী আধুনিক।

দীপঙ্কর পকেট থেকে দামী সিগারেটের প্যাকেট বার করল। এবং সুদৃশ্য লাইটার। অর্থাৎ অ্যামেচার।

সিগারেট ধরিয়ে কয়েক টান দেবার পর লক্ষ্য করলাম, ওর সঙ্গে আমার গল্প করার মতন কোনো বিষয়ই নেই। অথচ আগে দেখা হলে কত বকবক করতাম। ওর পাঁচ বছর প্রবাসের ফলে হয় দীপঙ্করই অনেক বদলে গেছে, কিংবা আমিই বদলে গেছি।

সুতরাং কিছু একটা বলতে হবেই, এইজন্য বললাম, হ্যাঁ রে, তোদের বিয়ের সময় সেই সোনার গয়না চুরির ব্যাপারটা কি হল রে?

দীপঙ্কর বলল, সেটা আর পাওয়া যায় নি।

জিনিসটা দামী ছিল?

পাঁচ-ছশো টাকা দাম হবে।

কথার ভঙ্গি শুনেই বুঝতে পারলাম, দীপঙ্কর পাঁচ-ছশো টাকাকে বেশ মূল্য দেয়। পাঁচ-ছশো টাকা হাতের মুঠোয় এক্ষুনি থাকলে তার একটা মূল্য আছে, কিন্তু যে টাকা হাতে নেই, তার আবার মূল্য কি!

শুনেছিলুম যেন তোর বউ জানে যে কে নিয়েছে?

হুঁ?

কে নিয়েছে?

আমি তো জানি না।

তোকেও বলে নি?

না।

সে কি, নতুন বউরা স্বামীকেও সব কথা বলে না নাকি?

বিয়ে তো করলে না, বুঝবে কি করে এসব?

সুযোগ পেয়েই দীপঙ্কর একটা বিজ্ঞের হাসি দিল। এই সব প্রসঙ্গ এলেই বিবাহিত লোকেরা অবিবাহিত লোকদের এক হাত নেয়। যেন বিয়ে করে একটা মস্ত কাজ করেছে। তাও তো নিজে করতে পারিস নে, বাপ মা হাত ধরে বিয়ে দিয়েছে।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করব।

না ছোড়দা, তার দরকার নেই। সবাই ওকে এই এক কথা জিজ্ঞেস করে বলে, ও আজকাল বিরক্ত হয়!

ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলজনক সন্দেহ নেই। আমি গল্প-টল্প লিখি বলে আমার কৌতূহলটা আরও বেশী হবে।

খাবার টেবিলে স্বস্তির সঙ্গে আমার প্রথম ভাল করে আলাপ হল। মেয়েটি নম্র হলেও সপ্রতিভ। কথাবার্তা বেশ ভাল বলতে পারে। অনাবশ্যক জড়তা নেই। মেয়েদের আলাদা পরিবেশে কি রকম আলাদা মনে হয়। কনে বউ হিসেবে যে জড়ভরত জাতীয় মেয়েটিকে দেখেছিলাম, আজ সে অন্য রকম। দীপঙ্করের মুখে কিন্তু সেদিনের মতন আজও একটা গদ্‌গদ ভাব।

নতুন বউ হয়েও স্বস্তি আবার পরিবেশনে মা ও বৌদিকে সাহায্য করল। নিয়ম মেনে প্রশংসা করল প্রত্যেকটি রান্নার। তার ব্যবহারে সে সবাইকে মুগ্ধ করে দিল একেবারে!

স্বস্তি আজও অনেক গয়না পরে এসেছে। নতুন বউদের মাথায় বেশী সিঁদুর এবং গায়ে বেশী গয়না রাখতেই হয় বোধহয়। মা এবং বৌদি তার গয়নার ডিজাইনগুলো নিয়ে যখন আলোচনা করতে লাগলেন, তখন সেও বেশ উৎসাহের সঙ্গে দেখাতে লাগল।

পিওর ম্যাথামেটিক্সে এম-এ পাস হওয়া সত্ত্বেও সে গয়না বেশ ভালবাসে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ভাগ্যিস সে কোনো বাকসর্বস্ব ছাত্রনেতা কিংবা ভ্যাগাবণ্ড সাহিত্যিকের সঙ্গে প্রেম করে বসে নি, তা হলে এতসব গয়না পরতে পারত না। কিংবা দু-একটা ছুটকো-ছাটকা প্রেম করেছে বোধ হয়, কিন্তু বিয়ে করবে বাবা মায়ের দেখে দেওয়া পাত্রকে ; এটা আগেই ঠিক ছিল। আজ তো এইটাই কায়দা।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, অনেক গয়না পরলেও মাথায় টিকলি তো পরে নি স্বস্তি! তারপরই মনে পড়ল বিয়ের দিন ছাড়া অন্য কোনো সময় কি বাঙালী মেয়েরা টিকলি পরে? কদাচিৎ এমন দেখেছি বোধহয়। তা হলে তিনটে টিকলি দিয়ে কি হয়। কি আর হবে, ওগুলো পরে গলিয়ে অন্য গয়না বানানো হবে। যদি অন্য গয়না সব থাকে? তাহলেও আরো গয়না হবে—নইলে এতরকম ডিজাইন বেরিয়েছে কেন? তাছাড়া গয়নাই তো মেয়েদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

খাওয়া-দাওয়া এবং গল্প সারার-পর ওরা বাড়ি যাবে, আমি নিচে ওদের গাড়িতে তুলে দিতে এলাম। সেখানে গাড়ি আছে ড্রাইভার নেই। ড্রাইভারটা কোথায় গেছে আড্ডা মারতে। দীপঙ্কর নিজে গাড়ি চালাতে জানে বটে, কিন্তু অফিস থেকেই তাকে গাড়ি আর ড্রাইভার দিয়েছে বলে নিজে চালায় না।

ড্রাইভারের অপেক্ষায় আমরা সেখানেই দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলাম। ওরা শীগ্‌গিরই বেড়াতে যাচ্ছে কাশ্মীরে, আমি কাশ্মীর সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান দিলুম। তারপর হল সদ্য দেখা সিনেমার গল্প। তারপর দীপঙ্করের নিষেধ সত্ত্বেও আমি ফস করে জিজ্ঞেস করলাম স্বস্তিকে, তোমার সেই গয়নাটা কি হল?

স্বস্তি একটু থেমে বলল, ওটা আর পাওয়া যাবে না।

কে নিয়েছে, তুমি তো জানো?

তা জানি।

তাহলে তার কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছ না কেন?

সেটা সম্ভব নয়। জিনিসটার ডিজাইনটা খুব সুন্দর ছিল, এইজন্যই আমার যা একটু দুঃখ হয়। যদি টাকা পয়সাও নিত—

এরপর একটা কথা আমার না বললেও চলত, তবু বলে ফেললাম। আমি বললুম, তুমি যখন কারুকে তার নাম বলবেই না, তখন এ-কথাটাও তোমার বলা উচিত হয় নি যে তুমি জান কে নিয়েছে।

স্বস্তি বলল, তা ঠিক, আমার বলা উচিত হয় নি। হঠাৎ বলে ফেলেছিলাম।

একটু থেমেই সে মত পাল্টে ফেলল। সে বলল, আমি যে নিজের চোখে দেখেছি একজনকে নিতে। ঐ কথা বলেছি, যাতে সে অন্তত বোঝে যে আমি ঠিকই টের পেয়েছি ; আর কেউ না হয় না-ই জানল।

ড্রাইভার এসে গেছে, সুতরাং এ আলোচনা আর বেশী দূর এগোল না।

এরপর কদিন ধরে আমি অনবরত ভাবতে লাগলাম, গয়নাটা কে নিতে পারে। ভেবে ভেবে কোনো কূল-কিনারাই পেলাম না। ডিটেকটিভ-সুলভ বুদ্ধি আমার একটুও নেই। তারপর নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে উঠলাম। জীবনে কত কি ব্যাপার আছে, শুধু শুধু আমি পরের একটা গয়না নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেন।

কিন্তু গয়না আমাকে পেয়ে বসল। রাস্তাঘাটে আগে মেয়েদের শুধু মুখ কিংবা উপযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখতুম, এখন তাদের গয়নাও দেখি। কোনো কোনো মেয়ের গায়ে একটাও গয়না নেই, অনেকের আবার এক-গা গয়না। কারুকে একটি মাত্র গয়নাতেই বেশ ভাল দেখায়। গয়নায় কারুর রূপ খোলে, নিরাভরণ রূপসীও আছে। নাঃ, এ ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে।

তবে, গয়না নিয়েই একটা মজার ব্যাপার হল। একদিন আমি নাইট শো-তে এক ইংরেজি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। পায়ে কি যেন ঠেকল। অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে মনে হল, একটা সোনার বালা। সঙ্গে সঙ্গে আমি সেটার ওপর পা চাপা দিলাম। তারপর অন্য কেউ যেন দেখতে না পায়, এইভাবে নিচু হয়ে সেটা নিয়েই ভরে ফেললাম

পকেটে।

পরক্ষণেই মনে হল, আমি এ-রকম করলাম কেন? এ তো চোরের মতন ব্যবহার। অন্য কারুর একটা জিনিস এখানে পড়ে আছে, সেটা এ-রকম চুপিচুপি পকেটে ভরে ফেলার কি মানে হয়? আমি দেখছি নিজেকেও এখন চিনি না। আমার শরীরটা শিরশির করতে লাগল। বাকি সময়টা সিনেমাতে আর মন বসাতেই পারলাম না। তক্ষুনি ঠিক করে ফেললাম, এটা যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

ছবি শেষ হবার পর প্রথমে গেলাম বাথরুমে, পকেট থেকে জিনিসটা বার করে দেখলাম ভালভাবে। বেশ মোটা একটা মকরমুখো বালা, সোনার ভরি সম্পর্কে আমার কোনো আন্দাজ নেই, তবে বেশ দামীই হবে মনে হয়।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ম্যানেজারের খোঁজ করলাম। সবাই তখন বন্ধ-টন্ধ করবার জন্য ব্যস্ত, সহজে কেউ কথার উত্তরই দিতে চায় না। তারপর জানা গেল ম্যানেজার অনেক আগেই চলে গেছে।

যাকে তাকে তো এ-রকম একটা দামী জিনিস দিয়ে চলে যাওয়া যায় না। তাই আমি বালাটা বাড়িতে নিয়ে এলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ আবার সেটাকে দেখলাম নেড়ে-চেড়ে। জোড়ের জায়গাটা একটু ভাঙা। সেই জন্যই বোধহয় হাত থেকে খুলে পড়ে গেছে। ইস, যার বালা তার এখন মনের কি অবস্থা! নারী হৃদয়ে সোনার কি স্থান, তা আমি এখন জেনেছি।

বালাটার কথা বাড়িতে কারুকে বললাম না। কে কি রকম উপদেশ দেবে কে জানে! নিজের বুদ্ধি মতন চলাই ভাল। পরদিন বিকেলে আমি আবার গেলাম সেই সিনেমা হাউসে। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বললাম।

ম্যানেজার লোকটা সুবিধের না। চোখের দৃষ্টি চঞ্চল। বালাটা হাতে নিয়ে একটা শিস দিয়ে বলল, ভরি দু-এক তো হবেই। আপনি এটা নিয়ে কি করতে চান?

যার জিনিস, তাকে ফেরত দিতে চাই। যদি এখানে খোঁজ করে—

ঠিক আছে, রেখে যান।

এমনি এমনি ছাড়লাম না। ম্যানেজারের কাছ থেকে রসিদ লিখিয়ে নিলাম। বালাটার বর্ণনা দিয়ে তাতে লেখা থাকল যে, সেটি উনি আমার কাছ থেকে জমা রাখছেন। উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে যদি কেউ ফেরত নিতে আসে, তাহলে তিনি তার কাছ থেকেও একটা রসিদ রাখবেন এবং আমাকে সেটা দেখাতে হবে। একটা টেলিফোন নম্বর দিয়ে গেলাম। দরকার হলে আমাকে খবর দেবেন।

তারপর আমার মাথায় ঘুরতে লাগল একটা অদ্ভুত চিন্তা। যার বালা, তাকে দেখতে কি রকম? তার কি নতুন বিয়ে হয়েছে? বালাটা হারাবার ফলে তার এখন মানসিক অবস্থা কি রকম? বালাটা ফিরে পেয়ে সে কি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাবে?

এইসব অলস চিন্তা আর কি? কোনো মানেই হয় না।

এমন কি এই কথাও আমার মনে হল, ম্যানেজারটা আমাকে ঠকাবে না তো? সে তো যা-তা কারুর নামে একটা রসিদ লিখিয়ে নিয়ে বালাটা মেরে দিতেই পারে! অত সহজে ওকে আমি ছাড়ছি না। সেই রসিদের ঠিকানা দেখে আমি বাড়িতে খোঁজ করব।

ধরা যাক, সে রকম একটা বাড়িতে আমি গেছি। কে দরজা খুলে দেবে? দরজা খোলার পর আমি যখন বলব...

আবার অলস চিন্তা! পরদিন ম্যানেজারকে ফোন করে জানলুম, কেউ বালাটার খোঁজ নিতে আসে নি। এই ব্যাপারটা আবার আমাকে ভাবিয়ে তুলল। একটা দামী বালা ফেলে গিয়েও খোঁজ করছে না? এতই বড়লোক? বড়লোক হলেও সোনা সম্পর্কে তো মায়া থাকে। হয়তো সিনেমা হলে ফেলে যাওয়ার কথা মনেই পড়ে নি। অন্য জায়গায় খুঁজে মরছে। কিংবা হঠাৎ কলকাতার বাইরে চলে গেছে? মহা মুশকিলের ব্যাপার তো! বালাটা এ সিনেমার ম্যানেজারকে হজম করতে দেওয়া যায় না। ওর কাছ থেকে ফেরত নিতে হবে। কিন্তু নিয়ে আমিই বা কি করব? মেয়েলি গয়না, পরের জিনিস, আমি কেন নেব? এসব জিনিস বোধহয় গভর্নমেণ্টকে জমা দেওয়া উচিত। কিন্তু গভর্নমেণ্ট মানেই

তো একজন অফিসার, তাকে বিশ্বাস করা যায়!

তারপর তিনদিন ম্যানেজারকে ফোন করে জানলুম, কেউ আসে নি নিতে।

এই সময় একদিন রাস্তায় দীপংকর স্বস্তির সংগে দেখা। ওদের দেখেই আমার চট করে একটা কথা মনে পড়ল। বালাটা স্বস্তিকে দিয়ে দিলে কেমন হয়? ওদের একটা জিনিস হারিয়েছে, আমি একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছি, সেটা ওদের পাওয়াই ন্যায়সংগত।

কিন্তু এই প্রস্তাব কি দেওয়া চলে? ওরা অপমান বোধ করবে না তো? কুড়িয়ে পাওয়া পয়সা অনেকে ভিখিরিকে দান করে। কুড়িয়ে পাওয়া সোনার গয়না পেলে কি করতে হয়?

কথায় কথায় আমি ঘটনাটা বললুম। স্বস্তি মুখখানা করুণ করুণ করে বলল, ইস, যার হারিয়েছে তার কি অবস্থা! আর কেউ তার অবস্থা বুঝতে না পারুক, আমি ঠিক বুঝতে পারছি।

আমার এখন কি করা উচিত বল তো?

আপনার উচিত কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া। সিনেমা ম্যানেজারকে ওটা দিলেন কেন?

ঠিক তো।

আপনি নিজের কাছে রাখুন।

সিনেমা ম্যানেজারকে ফোন করতেই তিনি বললেন, আপনি এক্ষুনি এখানে চলে আসুন।

আমি ভাবলাম, তাহলে বুঝি আসল মালিক এসেছে। তক্ষুনি ছুটলাম। গিয়ে দেখলাম ঘর ফাঁকা, আর কেউ নেই।

ম্যানেজার আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, আপনি আমাকে বিপদে ফেলতে চান? রসিদটা এনেছেন?

কেন?

আপনি আমাকে একটা বাজে জিনিস দিয়ে একটা সোনার গয়নার রসিদ লিখিয়ে নিয়ে গেছেন? দিন, শীগ্‌গির রসিদটা ফেরত দিন।

বাজে জিনিস মানে?

আজ একটা স্যাকরার দোকানে নিয়ে গিয়েছিলুম, ওরা দেখেই বলল ঝুটো মাল। রোল্ড গোল্ড, সাত আট টাকার বেশী দাম হবে না। বাজে ক্লাসের মেয়েরা পরে, অনেক সময় সিনেমা অ্যাকট্রেসরাও—

ম্যানেজারের কাছ থেকে বালাটা নিয়ে আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। ম্যানেজার কেন ওটা স্যাকরার দোকানে নিয়ে গিয়েছিল, সেটা জিজ্ঞেস করিনি। সোনা ভেবে এই জিনিসটাকে নিয়ে আমিও তো কয়েকদিন সময় নষ্ট করেছি। জানি, দীপংকর আর স্বস্তির সংগে দেখা হলেই এ ব্যাপারটার কথা জিজ্ঞেস করবে। যেমন আমি ওদের সেই হারানো টিকলিটার কথা ভুলতে পারি না। সোনা কি না।

ঝুটো বালাটা আমি চাকার মত রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে দিলাম আর কেউ পেয়ে মজা বুঝুক।

তুমি সুখী

বাসে হঠাৎ দেখা, অনেকদিন পরে। অমিতার হাতে দু'তিনটি প্যাকেট, দোতলা বাসের একেবারে ভেতর দিকে একটি মাত্র সীট খালি আছে অমিতা সেখানে গিয়ে বসে পড়বার পর দেখল, পাশের মহিলাটি ছন্দা।

দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয় নি কখনও, কিন্তু পরস্পরকে এড়িয়ে গেছে এর আগে। কলকাতা শহরে হঠাৎ কোথাও কোথাও দেখা হয়ে যায়ই। সমাজের একই স্তরের মানুষ ওরা দুজনে, একই রকম পরিচয়ের সুতরাং গতিবিধি ও রুচির মিল থাকবেই। সত্যজিৎ রায়ের সিনেমায়, ময়দানের সংস্কৃতি সম্মেলনে বা রবীন্দ্র সদনের কোন অনুষ্ঠানে কিংবা

নিউ মার্কেটে কখনও কখনও অমিতা আর ছন্দা কাছাকাছি এসে গেছে, কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলে নি—যদিও রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া হয় তবু এমন অন্যমনস্কতার ভান করেছে যেন দেখতেই পায় নি। চোখাচোখি হলে নিশ্চয়ই কথা বলত। কারণ, ওদের দুজনের প্রকাশ্যে ঝগড়া হয় নি কখনও।

আজ বাসে পাশাপাশি বসে কথা না বলে পারা যায় না। প্রথমে দুজনেই অবশ্য একটু দ্বিধা করল। কে আগে কথা বলবে। অমিতার সুবিধে আছে, সে তার প্যাকেট-গুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকতে পারে। সুতরাং ছন্দাই বলল, আরে, অমিতা না?

অমিতা দারুণ চমকের ভাব করে বলল, এ কি ছন্দা? উঃ কতদিন পরে দেখা! এতদিন কলকাতাতেই ছিলি?

অমিতার কথার মধ্যে এই সুর আছে, যেন সে ছন্দার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিল, অনেক-বার খুঁজেছে তাকে। মাত্র দেড় মাস আগেই যে কলাভবনে রবিশঙ্করের সেতারের অনুষ্ঠানে মাত্র দুটো রো সামনেই ছন্দাকে দেখেছিল, সেটা গোপন করে যায়।

ছন্দা বলল, বাঃ, আমি আবার কলকাতা ছেড়ে কোথায় যাব? তুই কোথায় ছিলি এতদিন; তোর পাত্তাই নেই।

দুজনেই মোটামুটি সুন্দরী। বছর আটেক আগে বিয়ে হয়ে গেলেও ওদের মুখ চোখে গিন্নি গিন্নি ছাপ পড়েনি। দুজনেরই স্বামী সুপ্রতিষ্ঠিত। ছিমছাম সংসার। অমিতা তার হাতের প্যাকেটগুলো ঠিক সামলাতে পারছিল না, খসে খসে পড়ে যাচ্ছিল। ছন্দা বলল, দে, আমি দু-একটা ধরছি। অনেক কেনাকাটা করেছিস তো? ছন্দা টেনে নিল দুটো প্যাকেট।

অমিতা বলল, এখানকার লণ্ড্রিতে অনেকদিন জামাকাপড় কাচাতে দেওয়া ছিল, ও রোজই ভুলে যায়, তাই আজ আমিই নিয়ে নিলাম। সেই দুটো প্যাকেট।

আর দুটো—

একটা শাড়ি কিনলাম হঠাৎ ঝোঁকের মাথায়, তারপর ওর জন্য শার্ট আর প্যান্টের পীস, এদুটো অবশ্য কেনার দরকারই ছিল।

ছন্দার মুখে চোখে যে ভাবটা ফুটে ওঠে, সেটার ভাষা হল, শাড়িটা খুলে দেখব? নতুন শাড়ি কিনলে দেখতে চায় না, এমন কোন মেয়ে আছে নাকি? কিন্তু ছন্দা সে কথাটা মুখ ফুটে বলল না।

অমিতাও চাইছিল শাড়িটা ছন্দাকে দেখাতে, কিন্তু ছন্দা নিজে থেকে না বললে সে কি করে দেখাবে? ছন্দা যদি মনে করে সে চাল মারছে!

অমিতা তাই বললে, তুই কোথায় যাচ্ছিস এদিকে?

ছন্দা বলল, মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে। এই এক চাকরি হয়েছে, রোজ দুপুরবেলা বেরুতে হয়।

তোর ক'টি ছেলেমেয়ে?

দুটি। ছেলে এখন ইস্কুলে যায় না ভাগ্যিস।

মেয়ে কোন স্কুলে পড়ে? বাস নেই?

বাস আছে। কিন্তু স্কুলে যাবার সময় তো মেয়ের বাবাই পৌঁছে দিয়ে যায়, শুধু ফেরার জন্য বাসে নেয় না।

সত্যি, আজকাল ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর যা ঝামেলা—দুজনেই প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। ট্যাক্সি ধর্মঘট, বিদ্যুৎ সঙ্কট, রেশনের চাল ইত্যাদি বিষয়ে—অর্থাৎ কেউই ব্যক্তিগত কথায় আসতে চায় না।

ছন্দাই তবু এক সময় বলে, তোর ক'টি ছেলেমেয়ে বললি না তো!

অমিতা হাসতে হাসতে বলল, আমার ভাই ওসব ঝঞ্ঝাট এখনও নেই।

এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে অমিতার মুখের হাসিটা জোর করে ফোটানো। যে নারীর সন্তান আছে, সে-ই তার ছেলেমেয়ের ঝঞ্ঝাট নিয়ে অনুযোগ করতে পারে। সন্তানহীনার পক্ষে এ অনুযোগ মানায়নি!

ছন্দা এটা বুঝতে পেরেও খোঁচা মারবার জন্যই আবার জিজ্ঞেস করল, তোর একটিও

হয় নি এখনও?

অমিতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, না।

ছন্দা এবার তাকে বেশ নকল সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তাহলে তুই তো বেশ ভালই আছিস। ইচ্ছে মতন যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারিস। আমার তো মেয়ের ইস্কুলের সঙ্গেই জীবনটা বাঁধা।

ছেলেকে এই সময় কোথায় রেখে আসিস?

বাড়িতে একটি ঝি আছে, খুব বিশ্বাসী।

এরপর কথা ফুরিয়ে যায়। দুজনে একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। দুজনেই কিছু একটা ভাবছে। কিংবা হয়তো একই কথা ভাবছে।

এই সময় কন্ডাকটার টিকিট কাটাতে আসে। দুজনেই অতি দ্রুত পয়সা বার করতে যায়। অমিতা এপাশের দিকে বসেছে বলেই সে আগে-ভাগে একটা নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দুটো। ছন্দা, তুই কোথায় যাবি?

ছন্দা বলে, না না, আমি টিকিট কাটছি।

আরে না। আমি দিয়ে দিয়েছি তো!

এই তো আমি দিচ্ছি, এই যে শুনুন—

অমিতা এবার বেশ জোর দিয়ে কন্ডাকটারকে বলে, না, ওর কাছ থেকে আপনি পয়সা নেবেন না। আপনি দুটো কাটুন তো—

কন্ডাকটার টিকিট ও পয়সা দিয়ে চলে যাবার পর অমিতা একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলে, তুই ও রকম করছিলি কেন? আমি একদিন তোর টিকিটটা কাটতে পারি না?

ছন্দা বলল, না, সেজন্য নয়। তুই টাকা ভাঙাচ্ছিলি, আমার কাছে একগাদা খুচরো রয়েছে কিনা।

থাক, খুচরোও অনেক সময় খুব কাজে লাগে।

ছন্দা তার ব্যাগে পয়সাগুলো ভরল।

অমিতা বলল, তোর মনে আছে, কলেজে যাবার সময় তুই প্রায় দিনই আমার টিকিট কাটতিস। আমাকে চান্সই দিতিস না!

ছন্দা কোন কথা না বলে অমিতার দিকে তাকাল। একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল অমিতা। সে ভুল করেছে, সে পুরোনো দিনের কথা তুলে ফেলেছে। এখনও কি রাগ পুষে রেখেছে ছন্দা?

ছন্দা বলল, মাত্র ন-বছর আগেই তো কলেজে পড়তাম, অথচ মনে হয় যেন সেই কতকাল আগের কথা! তোর টি-কে-বিকে মনে আছে! যিনি আমাদের ফিলোজফি পড়াতেন?

অমিতা বলল, তরুণকান্তি ব্যানার্জি তো? খুব ভাল মনে আছে। দারুণ হ্যান্ডসাম ছিলেন।

তিনি এখন আমাদেরই বাড়ির অন্য ফ্ল্যাটে থাকেন। খুব ভাব হয়ে গেছে আমাদের সঙ্গে।

চেহারাটা সেই রকমই আছে?

প্রায়। একটু বয়েস হয়েছে, তাও বেশ ডিগনিটি আছে।

এক সময় আমরা কি রকম পাগল হয়েছিলাম ওর জন্য? উনি একটু ডেকে কথা বললে ধন্য হয়ে যেতাম।

আমরা মানে কি, তুই একাই পাগল হয়েছিলি। তুই তো কতজনকে দেখেই পাগল হতিস?

ছন্দা আর একটা খোঁচা মারল অমিতাকে। অমিতা বিনা প্রতিবাদে হজম করে গেল। ছন্দাকে সে উল্টে কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছে না।

তাছাড়া ছন্দার যেন একটা খোঁচা দেবার অধিকারই আছে। সেই রকমই তার মুখের ভাব। অমিতা মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে একটু একটু হাসে। সেই হাসিতে দুঃখ কিংবা অবজ্ঞা, ঠিক যে কোন্‌টা মিশে আছে, তা বলা যায় না।

এরা দুজনে আগে এক পাড়ায় থাকত, একই কলেজে পড়ত, কি দারুণ ভাব ছিল ওদের। আজ ওরা কি কথা বলবে এখন খুঁজে পাচ্ছে না। একটি মাত্র ঘটনায় সব কিছু বদলে গেছে।

অমিতাই আড়ষ্ট বোধ করছে বেশি। ছন্দার দিকে সে ঠিক মতন তাকাতে পারছে না। ছন্দার দৃষ্টি যেন অত্যন্ত তীব্র। যেন সে অমিতাকে বিদ্ধ করতে চাইছে।

অমিতা আবার বলল, তোর মা, মানে, মাসীমা কেমন আছেন?

ছন্দা খুব সংক্ষিপ্তভাবে বললে, মা মারা গেছেন!

তাই নাকি? কবে?

গত বছর।

তাই নাকি? ইস—

অমিতার মুখ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ইস, আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিসনি!' কিন্তু ঠিক সময় সামলে নিয়েছে। সে তো নিজে থেকে একবারও ছন্দার মায়ের খোঁজ নেয়নি! এই আট বছরে একবারও যায়নি ছন্দাদের আগেকার বাড়িতে। অথচ কলেজ জীবনে ছন্দার মা কত ভালবাসতেন অমিতাকে. ঠিক নিজের মেয়ের মতন ভালবাসতেন। অমিতা খুব কম বয়সেই মাকে হারিয়েছে, তাই ছন্দার মাকেই ঠিক মায়ের মতন দেখত।

অমিতার ইচ্ছে করতে লাগল, ছন্দার গলা জড়িয়ে ধরে আগেকার দিনের মতন আবার গল্প করে। কিন্তু তার আর উপায় নেই। একটা ঘটনাতেই বদলে গেছে সব কিছু। তখন কলেজে ছিল, এতসব কিছু খেয়াল ছিল না।

ছন্দা জিজ্ঞেস করলে, তোর ছোট বোন অমলু কেমন আছে?

ভাল।

কোথায় থাকে এখন?

ও তো বিয়ের পর জাপানে চলে গেল। গত বছর একবার বেড়াতে এসেছিল। তোর খোঁজও করেছিল। আমি ভাবলাম, তোরা তখন কলকাতায় আছিস কি না।

ভাবাভাবির তো দরকার ছিল না। ছন্দার বাড়ি খুব ভালই চেনে অমিতা, একবার সেখানে গিয়ে খোঁজ করলেই পারত! সেখানে যাবার মুখ নেই অমিতার। নিশ্চয়ই সে তার বোন মিনুকে আজেবাজে কথা বলে ভুলিয়েছে।

এই রকমভাবে দুজনে নিরাসক্তভাবে এর ওর খবর জিজ্ঞেস করল। কিন্তু কেউ ভুলেও একবার কারুর স্বামীর কথা উচ্চারণ করল না। অথচ সেটাই ছিল সবচেয়ে স্বাভাবিক।

ছন্দার মেয়ের স্কুল এসে গেছে, তাকে এবার নামতে হবে। সে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে জিজ্ঞেস করল, অমিতা, তুই ভাল আছিস তো?

একটু চমকে উঠল অমিতা। তারপর বেশ জোরে বলল, হ্যাঁ, ভালই আছি। ভাল থাকব না কেন?

ছন্দা বলল, আমি সব সময় তোর ভালই চাই, তুই কি বিশ্বাস করবি? ওসব পুরোনো কথা আর মনে রেখে লাভ নেই। আমার আর মনে পড়ে না। আমি চাই তোরা ভাল থাকিস।

তুই কেমন আছিস?

আমিও ভালো আছি।

সত্যি রে, ওসব পুরোনো কথা মনে রেখে লাভ নেই। এখন জীবন অন্যরকম হয়ে গেছে।

চলি—এবার নামতে হবে আমাকে।

তুই তোর ছেলেমেয়েদের নিয়ে আয় না একদিন আমাদের বাড়িতে। আমাদের বাড়িতে তো বাচ্চা-টাচ্চা নেই, ওরা এলে ভাল লাগবে।

আচ্ছা আসব এখন।

বাস থামল। নেমে গেল ছন্দা। নিচে নেমে কিন্তু আর তাকাল না অমিতার দিকে। হাঁটতে লাগল মন্থর পায়ে। মুখখানা চিন্তাক্লিষ্ট।

অমিতাকে আরও কিছু দূর যেতে হবে। সে বেশ ভালই বুঝতে পেরেছে যে ছন্দা তার ছেলেমেয়েকে নিয়ে কোনদিনই আসবে না তার বাড়িতে। ও একটা কথার কথা বলে গেল। ছন্দার ছেলেমেয়েকে অমিতা এখনো দেখেইনি। ইচ্ছে করলে কি আজই দেখে যেতে পারত না? ছন্দার সঙ্গে সে কি নামতে পারত না ওর মেয়ের স্কুলে? তার তো হাতে কোন কাজ নেই বিশেষ। এই সময় ছন্দার সঙ্গে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছে, আজ ছন্দা বাস থেকে নেমে একবার ফিরেও তাকাল না। ছন্দা যদি একবার ডাকত, তাহলে অমিতা ঠিকই নেমে পড়ত ওর সঙ্গে।

কিন্তু আর কোনদিন ছন্দা ওকে ডাকবে না। অমিতাও সত্যিই চায় না ছন্দা কোন-দিন তার বাড়িতে আসুক। যদি তাপসের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়?

তাপস ছিল ছন্দার বন্ধু। ছন্দার বাড়িতেই অমিতার সঙ্গে তার প্রথম আলাপ। লম্বা, চওড়া, সুপুরুষ, সদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে। খুবই প্রাণবন্ত ছেলে। সকলেই জানত, ছন্দার সঙ্গে তাপসের বিয়ে হবে। ছন্দার বি. এ. পরীক্ষার আর তিন মাস বাকি, তার পরেই।

হঠাৎ একদিন কি সব ওলোটপালোট হয়ে গেল। এক বৃষ্টি ভেজা সন্ধেবেলা হঠাৎ তাপস এল অমিতার বাড়িতে। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। কঠোর স্বরে বলল, একটা কথা চেপে রেখে আমি কয়েক দিন ধরে খুব ছটফট করছি। কিন্তু আর চেপে রাখতে পারছি না। সে কথাটা কি আপনাকে বলতে পারি?

অমিতা চমকে গিয়েছিল। তাপসের এ রকম কি কথা থাকতে পারে তার সঙ্গে? তবু সে ক্ষীণ গলায় বলেছিল, বলুন!

তাপস আর ভূমিকা করে নি। সোজাসুজি দৃঢ়ভাবে বলেছিল, আমি ছন্দাকে ভাল-বাসি না। আমি আপনাকেই ভালবাসি! আমি ছন্দাকে ছোট করছি না। সে খুব ভাল, তাকে আমি শ্রদ্ধাও করি। কিন্তু আমি আপনাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারব না। আপনাকে দেখার পর দিন থেকেই—

এটা একটা অসম্ভব কথা। অমিতার প্রাণের বন্ধু ছন্দা, তার কাছ থেকে কি সে তাপসকে কেড়ে নিতে পারে? সে প্রবলভাবে আপত্তি জানিয়েছে, কান্নাকাটি করেছে, তাপসের সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করেছে, কিন্তু কিছুতেই তাপস হার মানে নি।

তাপসের প্রবল পৌরুষ উড়িয়ে দিয়েছে সবকিছু। সে বলেছে দয়া মায়া স্নেহের সঙ্গে ভালবাসার কোন সম্পর্ক নেই। ভালবাসার কি কোন যুক্তি আছে? সে ছন্দাকে ভালবাসতে পারে নি। অমিতাকে ভালবেসেছে—এর মধ্যে অন্যায়টা কি আছে?

আস্তে আস্তে অমিতার মন বদলে গিয়েছিল। এর আগে তার কাছে এমনভাবে কেউ তো ভালবাসার কথা বলে নি। তাপসের মতন এ রকম একজন পুরুষ এমন কিছু দেখেছে তার মধ্যে যা অন্য কোন মেয়ের মধ্যে নেই। এই পুরুষকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সারা জীবন সে কি নিয়ে থাকবে। অমিতা সাতদিনের মধ্যে বিয়ে করে ফেলল তাপসকে। তার যুক্তি ছিল, সে তো তাপসকে একটুও প্রলুব্ধ করে নি, তাপস নিজে থেকে এসেছে তার কাছে।

অমিতা বাস থেকে নেমে এক সময় পৌঁছে গেল নিজের বাড়িতে। তালা খুলতে গিয়ে হঠাৎ তার চোখে জল এসে গেল। প্রত্যেকদিন বাড়িতে ঢোকার সময় তার এ রকম হয়। ছন্দা কোনদিন এ বাড়িতে আসুক কিংবা তাপসকে দেখুক, তা সে চায় না। ছন্দা যেন জানতে না পারে, তাপস আসলে কি! তার ভালবাসা এক মাস সতেরো দিন পরই শেষ হয়ে যায়। কোন মেয়েকেই সে বেশীদিন ভালবাসতে পারে না। ছন্দার কথা সে বেশীদিন ভালবাসতে পারে না। ছন্দার কথা সে কোনদিনও আর উচ্চারণ করে নি—কিন্তু আরও অসংখ্য মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে—কোন কোনটা কেলেংকারি পর্যন্ত গড়িয়েছে। সে তার নিজের স্ত্রীকে একটা সন্তান পর্যন্ত দিতে পারে নি। বাড়ির প্রতি কোন আকর্ষণই তার নেই, মদ খেয়ে আর জুয়া খেলে সব টাকা উড়িয়ে দেয়।

অমিতা তালা খুলে ভেতরে ঢুকলো। ছন্দা আজ তাকে অনেকবার খোঁচা মেরেছে। অমিতা ইচ্ছে করেই তার উত্তর দেয় নি, কারণ, সবচেয়ে বড আঘাতটা সে-ই দিয়ে রেখেছে

ছন্দাকে। ছন্দা কোনদিনই জানতে পারবে না তাপসের আসল স্বরূপ। সে ভাবতে, তাপসকে বিয়ে করে অমিতা খুব সুখে আছে। আর এই ভেবে সে সারা জীবন দুঃখ পাবে।

দক্ষিণের দরজা

বিয়ে করার পর আমি একটা সার সত্য জানলাম। মেয়েদের খুশী করতে গেলে একটা ভাল বাথরুমওয়ালা বাড়িতে থাকা দরকার।

বিয়ের পর মেয়েদের কাছে স্বামীর শরীর যৌবন কিংবা পৌরুষ কিংবা টাকাপয়সা কিংবা খ্যাতি—সবই তুচ্ছ হয়ে যেতে পারে, যদি বাড়ির বাথরুমটা ভাল না হয়। যে বাড়িতে জলের কষ্ট, সে সংসারে শান্তি নেই।

আমার স্ত্রী শান্তার স্নান করতে সময় লাগে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট। স্নানের ঘরটা তার একটা বিলাসিতার জায়গা। সুতরাং আমি যে ফ্ল্যাটই ভাড়া করি, বাথরুমটা কিছুতেই তার মনের মতন হয় না। ফলে, আমার গৃহশান্তি নষ্ট হবার উপক্রম। এই জন্য আমাকে ঘন ঘন বাড়ি বদলাতে হয়।

কলকাতা শহরে পছন্দ ফ্ল্যাট খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। তা ছাড়া প্রত্যেকবার নতুন ফ্ল্যাট নিতে গেলেই ভাড়া বেড়ে যায়। কিন্তু এসব কথা শান্তাকে বোঝানো যাচ্ছে না। বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করার বদলে ফ্ল্যাট খুঁজে বেড়ানো অনেক উত্তম কাজ।

তিন-চারবার বাড়ি বদলাবার পর দক্ষিণ কলকাতায় লেকের ধারে আমরা একটা চমৎকার ফ্ল্যাট পেয়ে গেলাম। ছিমছাম, ছোট্টখাট্টো এবং পরিষ্কার। ঠিক যেন আমাদেব জন্যই তৈরী। ভাড়াও সাধ্যের মধ্যে। দুটি বাথরুম। একটা সাধারণ লোকের হলেও শোবার ঘরের সঙ্গে লাগানো বাথরুমটা এক কথায় অনবদ্য। রীতিমতন চওড়া, সাদা টালি বসানো, ধপধপে চকচকে। বাথরুমের জানালা দিয়ে দূরের মাঠ ও গাছপালা দেখা যায়।

শান্তার দারুণ পছন্দ হয়ে গেল। পরের রবিবারেই আমরা বাড়ি বদল করলাম।

রীতিমতন হৈচৈ আনন্দে কাটলো কয়েকটা দিন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন যারাই এলো বাড়িতে—পছন্দ হলো সকলেরই। শান্তার মেজাজ বেশ ভালো। আমি একটু বেশী রাত করে বাড়ি ফিরলেও রাগ করে না। বুঝতে পারি, সবই ঐ বাথরুমের গুণে।

শান্তা এখন স্নানের সময়টা বাড়িয়ে এক ঘণ্টা করেছে। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে দু'তিনখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়।

প্রথম ঘটনাটি ঘটলো দিন আষ্টেক আগে। আমরা ঘুমোই অনেক রাত করে, প্রায় সারা শহর ঘুমিয়ে পড়ার পর। একবার ঘুমোলে সহজে আমার ঘুম ভাঙে না।

আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম।

হঠাৎ শান্তা আমাকে ঠেলা দিয়ে বললো, এই, এই, শুনছো!

বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর আমার ঘুম ভাঙলো। ঘুমজড়িত গলায় আমি বললাম, কি?

—কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

—এত রাত্রে আবার কে দরজায় ধাক্কা দেবে?

—সত্যি।

—ও কিছু না। ঘুমোও ঘুমোও।

—ঐ তো আওয়াজ হচ্ছে। তুমি শুনতে পাচ্ছো না।

আমি কান পেতে শুনলাম। হাঁ, একটা আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে বটে। খুব জোরে নয়। কেউ যেন খানিকটা দ্বিধা ও সংকোচের সঙ্গে ধাক্কা দিচ্ছে দরজায়, যাতে প্রতিবেশীদের ঘুম না ভাঙে।

আমি শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে?

আওয়াজটা থেমে গেল।

আমি শান্তাকে বললাম, হাওয়ায় ধাক্কা লাগছিল বোধহয়। ও কিছু না। ঘুমোও।

—মোটেই হাওয়ার ধাক্কায় ওরকম শব্দ হয় না।

স্বামী হিসেবে এবার আমার উঠে একবার দেখা উচিত। নইলে শান্তা আমাকে ভীতু ভাববে। কিন্তু শীতের রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠতে কার ইচ্ছে করে?

তবু উঠতে হলো। আলো জ্বাললাম। দরজা খুলে দেখলাম বাইরে কেউ নেই। বাইরে আলো জেলে, সদর দরজা খুলেও দেখলাম, সিঁড়িতে উঁকি দিলাম। কেউ নেই।

কাউকে কোথাও দেখতে না পেয়ে আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতেই হলো যে হাওয়াতেই ধাক্কা লেগেছে কিংবা ইঁদুরে খটখট্ করছিল। ফ্ল্যাটের মধ্যে ইঁদুর থাকা কোন কাজের কথা নয়। শান্তা ইঁদুর দেখলে খাটের ওপরে লাফিয়ে ওঠে। কাল সকালে এর একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

আলোটালো নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। একটু বাদে। সবে মাত্র ঘুমের ঘোর এসেছে, এই সময় আবার দরজায় শব্দ! এবার বেশ জোরে।

শান্তা রীতিমতন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, এই, এই!

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, কাল সকালে ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করবো।

শান্তা আরও ভয় পেয়ে বললো, কে? কাকে?

—ইঁদুর!

—ধ্যাৎ! ইঁদুর কখনো এত জোরে আওয়াজ করে?

ইঁদুররা কি যে পারে আর কি যে পারে না, তা কি আমার পক্ষে জানা সম্ভব? কে না জানে, ইঁদুররা মানুষের চেয়েও বেশী চালাক।

শান্তা বললে, আওয়াজটা দক্ষিণ দিক থেকে আসছে। খুব সম্ভব বাথরুমের দরজা থেকে।

এটা একটা গুরুতর ব্যাপার। শান্তার প্রিয় বাথরুমে যদি ইঁদুর থাকে, তা হলে সেটা তো একটা সাংঘাতিক কথা! আমাকে আবার ফ্ল্যাট খুঁজতে হবে।

আবার উঠতে হলো। আগের বার আলো জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গেই আওয়াজটা থেমে গিয়েছিল। এবার থামলো না।

ঢক্ ঢক্ ঢক্ ঢক্।

আমি ইঁদুর তাড়াবার ভঙ্গিতে বললাম, হুস।

তবু আরেকবার আওয়াজটা হলো।

বাথরুমের দরজা বাইরে থেকে ছিটকিনি বন্ধ। আমি দরজা খুলে দেখতে যাচ্ছি। শান্তা আমার হাত চেপে ধরে বললো, ভেতরে যদি কেউ লুকিয়ে থাকে।

কণ্ঠস্বর মোটা করে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে? ভেতরে কে?

আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

শান্তা বললো, আমার ভয় করছে। আমার ভীষণ ভয় করছে!

ভয় পাওয়া মেয়েদের মানায়। অনেক সময় ভয় পেলে মেয়েদের সুন্দর দেখায়। কিন্তু স্ত্রীর সামনে যে স্বামী সাহস দেখায় না, তার জীবনই ব্যর্থ।

আমি বীর দর্পে শান্তার হাত ছাড়িয়ে দরজাটা খুলে ফেললাম। কেউ ছুটে বেরিয়ে এসে আমাকে আক্রমণ করলো না। একটু অপেক্ষা করে বাথরুমের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম। না, কেউ নেই, কোনো ইঁদুরও না।

ভাল করে সব জায়গাটা পরীক্ষা করবার পর আমি শান্তাকে ভেতরে ডাকলাম।

শান্তাও দেখলো বাথরুমের কোথাও বড় ইঁদুরের লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনাও নেই।

—তা হলে কিসের আওয়াজ হলো বলো তো?

—হাওয়া ছাড়া আর কি হবে।

—হাওয়ায় কখনো এ রকম আওয়াজ হয়?

—ঠিক আছে, কাল সকালে সেটা চিন্তা করা যাবে। ভেতরে তো কেউ নেই দেখলেই। সুতরাং ভয়ের কিছু নেই।

সে রাত্রে আর কিছু ঘটলো না।

পরদিন সকালে উঠে শান্তা আর আমি আবার বাথরুমটা পরীক্ষা করে দেখলাম ভাল করে। সেখানে কোনো রকম সন্দেহজনক চিহ্ন নেই। দিনের আলোয় অনেক কিছুই স্বাভাবিক মনে হয়।

ব্যাপারটা তেমন গুরুত্ব না দিলেও সেদিন আমি বাড়ি ফিরলাম সন্ধের আগেই। শান্তা খুব খুশী হলো। আমরা একসঙ্গে বেরিয়ে একটা সিনেমা দেখে এলাম রাত্রের শো-তে। সারাক্ষণ আমরা গত রাত্রির ঘটনা নিয়ে একটাও কথা বলিনি। শুতে যাবার আগে শান্তা বললো, জানো। ঠিক ঝি বলছিল এই ফ্ল্যাটটায় খুব ঘন ঘন ভাড়াটে বদলায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

—তা জানি না। আগের ভাড়াটেরা নাকি মাত্র পনেরো দিন থেকেই চলে গেছে।

—ভাগ্যিস গেছে। নইলে এমন চমৎকার ফ্ল্যাটটা আমরা পেতাম না।

—কিন্তু এত ভাল ফ্ল্যাট, ভাড়াও বেশী না—তবু লোকে এটাতে থাকে না কেন বলো তো?

—সে চিন্তার দরকার নেই। আবার যদি আজ রাত্রে আওয়াজ হয়, তাহলে কালকেই আমি ইঁদুর মারার ওষুধ কিনে আনবো।

কিছুক্ষণ শান্তাকে আমি হাসি ঠাট্টায় ভুলিয়ে রাখলাম। ও ঘুমিয়ে পড়ার পরও আমি জেগে থেকে বই পড়লাম কিছুক্ষণ। এক একবার দরজাটার দিকে চোখ যাচ্ছে আর মনে হচ্ছে যেন কেউ ওর আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। পরক্ষণেই বুঝতে পারি, মনের ভ্রম। বার বার এক কথা ভাবলে এই রকম হয়।

একবার আমি বিছানা থেকে উঠে দরজাটা খুললাম। ভালো করে দেখলাম একবার। বাইরের দিকের জানালাটাও বন্ধ করে দিলাম—যাতে হাওয়া না আসে। আজ আর কোন আওয়াজ হবে না।

দরজাটা আবার বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি। এমন সময় শান্তা চেঁচিয়ে উঠলো, কে? কে!

—আমি শান্তা, আমি।

—তুমি ওখানে কি করছো?

—আরে, তুমি কি আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছো নাকি।

শান্তা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি দরজাটা বন্ধ করে শান্তাকে বিছানার কাছে নিয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে আবার দরজায় শব্দ হলো ঢক্ ঢক্ ঢক্, শান্তা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো।

আমি বললাম চুপ, শুনতে দাও।

—কি শুনবে?

—দেখি আর কি হয়।

আরও একবার ঢক্ ঢক্ শব্দ হয়ে থেমে গেল। আর কিছুই না। শান্তা চাপা স্বরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

আমি বললাম, একটা রাত জেগে দেখা যাক্ আর কি হয়।

—তুমি ঠিক ঘুমিয়ে পড়বে। তুমি ঠিক ঘুমিয়ে পড়বে।

—না, ঘুমোবো না। আজ একটা কাজ করা যাক। বাথরুমের দরজাটা খুলে রাখি বরং।

উঠে তাই করলাম। কিন্তু শোবার ঘরের পাশের দরজা খুলে রাখা কিংবা সারা রাত জেগে বসে থাকা—কোনোটাই কাজের কথা নয়। আমি শান্তাকে বললাম ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করতে। যত রকম ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব, যেমন বাতাসের ধাক্কা, দূরে রাস্তায় হঠাৎ কোনো গাড়ির ঝাঁকানি কিংবা অন্য কোনো দরজার আওয়াজ--

শান্তা কিছুই বিশ্বাস করলো না। দরজার গায়ে হাত দিয়ে বললো, এতো মোটা কাঠের দরজা কখনও এমনি নড়তে পারে?

সে রাতটা এইভাবেই কাটলো। এরপর পর পর তিন রাত আর কিছুই ঘটল না।

এরপর আমি নিজেই একটা ভুল করে ফেললাম।

সে রাতে বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে আমার বাড়ি আসতে অনেক রাত হয়ে গেল, প্রায় মধ্যরাত। এতক্ষণ শান্তা একা বাড়িতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে খুবই অনুতপ্ত হয়ে পড়লাম। শান্তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

শান্তা দরজা খুললো। আমি কিছু বলার আগেই শান্তা খুব গম্ভীর গলায় বললো, আমি বেঁচে থাকি কিংবা মরে যাই তাতে, তোমার কিছু যায় আসে না?

আমি শান্তার হাত জড়িয়ে ধরে প্রভূত ক্ষমা চাইতে লাগলাম। শান্তা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, থাক। তুমি খেয়ে নাও।

আমার খাবার সময় শান্তা আর একটাও কথা বললো না। আমি অনেক পরে ওর মান ভাঙাবার চেষ্টা করলাম। শান্তা অটল। এর আগে, আমি কোনো দোষ করলে শান্তা রাগারাগি বা চ্যাঁচামেচি করেছে। এ রকম চুপ করে থাকে নি।

আমি শান্তার মাথায় হাত দিয়ে বললাম, তুমি কি আজকে আবার ভয়টয় পেয়েছো?

—না।

—দরজাটায় আওয়াজ হয়েছিল?

—না।

—তবে?

শান্তা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। শান্তার চোখ অন্যরকম হয়ে গেছে। খুব আস্তে আস্তে বললো। শোবার আগে আমাকে একবার বাথরুমে যেতে হবে। কিন্তু আমার ভয় করছে।

—ভয় কি! যাও না। আমি তো দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছি।

—তোমাকেই আমার ভয়।

—তার মানে? শান্তা! কি হয়েছে কি?

—আমি বাথরুমে গেলে তুমি বাইরে থেকে ছিটকিনি বন্ধ করে দেবে না তো?

—কি বলছো কি।

সত্যি করে বলো, দরজা বন্ধ করে দেবে না তো? আমাকে আটকে রাখবে না? বলতে বলতেই শান্তা হুহু করে কেঁদে উঠলো। আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম।

—শান্তা, শান্তা, তোমার কি হয়েছে বলো! তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না।

শান্তা অনেকক্ষণ কেঁদে নিজেকে একটু সামলে নিল। তারপর আস্তে আস্তে বললো সেই মেয়েটির স্বামী তাকে বাথরুমে আটকে রেখেছিল। আর বেরুতে দেয় নি। সে বেচারী দরজা ধাক্কিয়েছে কেউ খোলে নি। কেউ খোলে নি।

—কে? কোন মেয়েটি?

—গত বছর যারা এখানে ভাড়া থাকতো।

—কি হয়েছে তার?

—সে মরে গেছে। তার স্বামী তাকে বাথরুমে আটকে রেখেছিল। সেই মেয়েটি রোজ এসে দরজায় ধাক্কা দেয়।

—যত সব কুসংস্কার!

—আমি জানি, সেই মেয়েটি রোজ দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দরজা বন্ধ থাকলেই সে ভয় পায়।

আমি দরজাটার দিকে তাকালাম। আমার ভূতের ভয় নেই। তবু একটু গা ছমছম করতে লাগলো। দরজাটা কি রকম ভয়ঙ্কর রকমের গম্ভীর। এক্ষুণি যেন কেঁপে উঠবে।

সারারাত আমি দরজাটার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। একবার ধাক্কা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে খুলে আমি মেয়েটিকে দেখবো। সেই দুঃখিনী মেয়েটিকে আমি সান্ত্বনা দিতে চাই। কিন্তু সে আমাকে দেখা দিল না।

পরদিন সকালবেলা আমি মিস্তিরী ডাকিয়ে দরজার বাইরের ছিটকিনিটা খুলিয়ে ফেললাম। তারপর থেকে কোনোদিন দরজার আওয়াজ হয় নি। শান্তাও ভয় পায় না।

যে রকম পথে ঘাটে হিপিদের দেখা যায়, লম্বা লম্বা চুলওয়ালা ছেলে ও মেয়ে অনেক সময় খালি পা, নোংরা পোশাক,—সেই রকমই একজোড়া যুবক-যুবতীকে আমি দেখেছিলাম। কিছুই অবাক হইনি।

ওরা পার্ক স্ট্রীটে চৌরঙ্গির মোড়ে দাঁড়িয়েছিল, দু'জনেরই পোশাক এক রকম, প্যাণ্ট ও শার্ট, সোনালী রঙের চুল, তা হালকা নীল চোখের মণি, দুধে-আলতা রং। অন্য হিপিদের মতন এরা তেমন নোংরা নয়, যদিও পোশাক ছেঁড়াখোঁড়া।

ওরা চুপ করে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মধ্যে নীচু গলায় কথা বলছিল। আমি দু'এক পলক ওদের দিকে তাকিয়েছিলাম, ওরা এতই রূপবান যে না তাকিয়ে পারা যায় না। দুজনেরই মুখে অপরূপ সারল্য মাখানো।

আমি ভাবলাম, ওরা তো বেশ ভালই আছে। চাকরিবাকরি কিংবা টাকাপয়সা উপার্জন কিংবা ঘরসংসার নিয়ে থাকাই এই পৃথিবীর নিয়ম। এ নিয়ম বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে। ওরা যদি সে নিয়ম না মানে, তাহলে বুঝতে হবে ওরা অন্যরকম সুখ চাইছে।

অধিকাংশ হিপিই একরকম চেহারার হয়, এবং সাহেব-মেমেদের মুখ একবার মাত্র দেখে মনে রাখাও যায় না। সুতরাং ওদেরও মনে রাখার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু আমি ঘাম মুছবার জন্য যেই পকেট থেকে রুমাল বার করতে গেছি অমনি ঝনঝন করে কয়েকটা খুচরো পয়সা রাস্তায় পড়ে গেল। কয়েকটা গড়িয়ে গেল ওদের পায়ের কাছে।

আমি নীচু হয়ে পয়সা তুলতে গেলাম। ছেলেমেয়ে দুটিও পয়সা কুড়িয়ে আমার হাতে দিল। আমি হেসে বললাম থ্যাঙ্ক য়ু!

ওরা দুজনে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর কি বলল আমি বুঝতে পারলাম না! বোধ হয় ওদের ভাষা ইংরেজী নয়। জার্মান, ফরাসী, ডাচ ছেলেমেয়েরাও তো হিপি হয়!

আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না। হাঁটতে লাগলাম ধর্মতলার দিকে। ওরা সেখানেই রইলো দাঁড়িয়ে। মেয়েটির হাসি আমার এতই সুন্দর লেগেছিল যে আমি দু'একবার ওদের দিকে ফিরে না তাকিয়ে পারি নি। বেশীবার তাকানো আবার অভদ্রতা।

এটা একটা সামান্য ঘটনা। মনে রাখবার মতন কিছু নয়। আমি মনেও রাখি নি।

এর কয়েকদিন পর আমি বেনারস গিয়েছিলাম। বেনারস তো একেবারে হিপিদের রাজত্ব। রাস্তায় বিশেষত গঙ্গার ধারে শতশত হিপিদের যখন তখন দেখা যায়। এদের মধ্যে যদিও সেই দু'জন হিপিকে হঠাৎ একদিন দেখি, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি কিন্তু ওদের দু'জনকে অত ভিড়ের মধ্যেও চিনতে পেরেছিলাম। সেই মেয়েটির হাসি দেখেই চিনলাম। হাসিটা আমার চোখে লেগেছিল। মেয়েটির শরীরটা এত সুন্দর এবং মুখখানা এত লাবণ্যময় যে সিনেমায় নামলে দারুণ নাম করতে পারতো। তার বদলে একটা পাতলা জামা ও প্যাণ্ট পরে গঙ্গার ধারে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

এর দু'দিন পরে বেনারসে একটা ছোটখাটো দাঙ্গা লাগার উপক্রম হলো। একদল লোক লাঠিসোটা এমন কি খোলা তলোয়ার হাতে রাস্তায় নেমে পড়লো। তারা সব হিপিদের তাড়াবে। কয়েকজন হিপিকে মারধোরও করলো খুব। তবে ঠিক সময় পুলিশ এসে পড়ায় বেশীদূর গড়াল না। অনেক গ্রেপ্তার হলো, লোকগুলো নাকি অধিকাংশই গুণ্ডা শ্রেণীর।

হিপিদের ওপর ওদের অত রাগের কারণটা পরে জানতে পারলাম।

বেনারসে আমি উঠেছিলাম আমার বন্ধু প্রশান্তর বাড়িতে। আমার বন্ধুর স্ত্রী গীতি যাকে বলে সরকারী গেজেট। রোজ সকালবেলা বাজার করতে গিয়ে গীতি যাবতীয় খবর সংগ্রহ করে আনে।

গীতি আমাদের একটি লোমহর্ষক কাহিনী শোনালো।

বেনারসের আশেপাশে এখনো অনেক ছোটখাটো রাজা ও জমিদার রয়ে গেছে, যারা প্রায় মধ্যযুগীয় কায়দায় জীবন কাটায়। তারা নিজস্ব গুণ্ডা পোষে, অনেক সময় লোক-জনকে খুন করে মৃতদেহ গায়েব করে দেয়, নানা জায়গা থেকে স্ত্রীলোকও ধরে আনে।

হিপিদের মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে আছে বলে অনেক সময় এই সব রাজা ও জমিদাররা গুণ্ডা দিয়ে হিপি মেয়েও লুঠ করে। আগেকার দিনে কোনো মেমসাহেবকে ভোগ করার কথা তারা ভাবতেও পারতো না। এখন অনেক সুযোগ। বেনারসে এত হিপি মেয়ে গিসগিস করছে। তার মধ্যে দু'একজন হারিয়ে গেল কি না গেল কে খোঁজ রাখে।

সেই রকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল গতকাল। এক জোড়া হিপি ছেলেমেয়ে রাত্তির বেলা একটা সরু গলি দিয়ে যাচ্ছিল, এই সময় তিনজন গুণ্ডা তাদের অনুসরণ করে। গুণ্ডাদের সঙ্গে লাঠি ও ছুরি ছিল।

গলিটা ছিল কানাগলি। এক জায়গায় শেষ হয়ে গেছে, তা সামনে দেয়াল। হিপি ছেলে ও মেয়েটি বুঝতে পেরেছিল, তাদের পেছনে গুণ্ডা লেগেছে। কিন্তু রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, তা তাদের আর পালাবার উপায় নেই, তাই পেছনে ফিরলো।

সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডা তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়েটির ওপর। মেয়েটি কিন্তু একটুও ভয় পায় নি। সে চিৎকার করে কি যেন বলল ছেলেটিকে।

ছেলেটি একজন গুণ্ডাকে টেনে তুললো। তারপর সে গুণ্ডাটির দুটি হাত ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলে। ছিঁড়ে ফেলে মানে শরীর থেকে একেবারে ছিঁড়ে আলাদা করে মাটিতে ফেলে দেয়। এরপরে গুণ্ডাটার চোখ দুটো খুবলে নেয়।

গল্পের মাঝখানে বাধা দিয়ে আমি বললুম, গীতি বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে না।

গীতি তার সুন্দর মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলল, আপনি বিশ্বাস করছেন না? সবাই একথা শুনেছে!

—তারা কি করে জানলো। ওখানে কি আর কেউ উপস্থিত ছিল। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি যেন পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখেছিলে!

—এসব কথা ঠিক জানা যায়, বুঝলেন। পরে সেই ডেডবডিটা অনেকে দেখেছে!

—বাকি গুণ্ডা দুজন কি করলো?

তারা সে বীভৎস দৃশ্য দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল।

মানুষের হাত টেনে ছিঁড়ে ফেলা একটা অমানুষিক কাজ। হিপিরা সাধারণত নিরীহ হয়। ওদের কাছে অস্ত্র থাকে না। আছাড়া গাঁজা ভাঙ খেয়ে খেয়ে শরীরের জোর থাকে না বিশেষ। তবে, জুডো আর ক্যারাটি নামে কয়েক রকম জুজুৎসু আছে, যাতে একজন ছোটখাটো মানুষও একজন বিশাল চেহারার লোককে ফ্ল্যাট করে দিতে পারে। কিন্তু হাত ছিঁড়ে ফেলা অসম্ভব।

আমরা এই বিষয় নিয়েই আলোচনা করছিলুম এমন সময় প্রশান্তর বন্ধু তুষার এল।

তুষার সব শুনে নিলো, গল্পটার অনেকখানি অংশ সত্যি। গতকাল রাত্রে কাশীর একটা সরু গলিতে একজন কুখ্যাত গুণ্ডার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তার একটা হাত কাটা অবস্থায় পড়েছিল পাশে। চোখ দুটোও গেলে দেওয়া হয়েছে।

তুষারের মামা এখানকার পুলিশের একজন হোমরাচোমরা অফিসার। তিনি দিয়েছেন এ খবর। ব্যাপারটার মধ্যে বেশ রহস্য আছে।

মারা গেছে একজন কুখ্যাত গুণ্ডা—সে একটা মেয়েকে চুরি করতে গিয়েছিল—সুতরাং সে যোগ্য শাস্তিই পেয়েছে বলা যায়। কিন্তু দেখা গেল, বেনারসে অধিকাংশ লোকই হঠাৎ ক্ষেপে গেল হিপিদের ওপর। দাবি উঠলো সব হিপিকে তাড়িয়ে দেওয়ার। থাইল্যান্ড কিংবা শ্রীলঙ্কায় যে রকম করা হয়েছে। গুণ্ডারা বেনারসে চিরকালই ছিল এবং থাকবে, তাদের ঘাঁটাবার কোন মানে হয় না।

শিক্ষিত লোকেরা বলতে লাগলো, হিপিদের মধ্যে সি আই-এর দালাল এবং নানা-রকম স্পাই মিশে থাকে। ওদের এরকম যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। কথাটার মধ্যে হয়ত কিছু সত্যি থাকতেও পারে। তবে, হিপিদের মধ্যে যে অন্য অনেক কিছু মিশে থাকে, তার প্রমাণ আমি পেলাম কয়েকদিন পরে।

বেনারসে ঐ ঘটনা শুনে আমার বারবার মনে হচ্ছিল আমি যে হিপি যুগলকে চিনি এই ব্যাপারটা বোধহয় তাদের নিয়েই। অবশ্য এর কোনো ভিত্তি নেই। হাজার হিপি রয়েছে। তবে হিপিদের মধ্যে অনেক সুন্দর মেয়ে থাকলেও ঐ মেয়েটির মতন অত সুন্দর আমি আর কারুকে দেখিনি।

শুনলাম অনেক হিপি বেনারস ছেড়ে চলে গেছে। নিশ্চয়ই ওদের স্বর্গস্থান নেপালে আরও ভিড় বাড়বে।

প্রশান্তর ফিয়াট গাড়িটা গ্যারেজ থেকে মেরামত হয়ে আসবার পরই ও বললো চলো কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে ঘুরে আসি।

বেনারসে আমি বেশ কয়েকবার এসেছি, অনেক কিছুই দেখা। শুধু চুনারে আমার যাওয়া হয়নি। তাই ঠিক হলো চুনারে যাওয়া হবে।

কথা ছিল, সকালে গিয়ে সন্ধের আগে ফিরে আসা। কিন্তু চুনারের দুর্গের ওপরের গেস্ট হাউসটি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি ভারতের বহু জায়গায় গেস্ট হাউসে থেকেছি, কিন্তু এমন সুন্দর জায়গা দেখিনিই প্রায় বলতে গেলে।

পাহাড় কেটে বসানো হয়েছে দুর্গ, সেই দুর্গে এক সময় যেটা ছিল দরবার এখন সেটাই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। বিশাল বিশাল সুসজ্জিত ঘর। সামনে সুন্দর সাজানো চাতাল, অনেক নিচে গঙ্গা। গঙ্গা এখানে একটা বাঁক নিয়েছে। সন্ধের আধো অন্ধকারে মনে হলো ঠিক যেন বাঁকা চাঁদ।

আমি গীতি আর প্রশান্তকে বললাম, এসো আজ রাতটা এখানেই থেকে যাই।

গীতি বললো, দারুণ জায়গা। আমারও থাকতে ইচ্ছে করছে কিন্তু সঙ্গে জিনিসপত্র যে কিছু আনিনি।

প্রশান্তরও থাকার খুব ইচ্ছে, কিন্তু কাল সকালেই ওর অফিসের ব্যাপারে একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

তখন ঠিক হলো, আমি একাই ওখানে থেকে যাবো। প্রশান্ত আর গীতি আজ অফিসে যাবে আবার ফিরে আসবে কাল বিকালে। তারপর তিন চার দিন থাকা হবে।

গেস্ট হাউসের ঘর দুটোই ফাঁকা ছিল, সুতরাং রিজার্ভেশন পেতে কোনো অসুবিধে হলো না।

যাবার সময় গীতি আমায় বললো, সুনীলদা, আপনার একা একা এখানে ভয় করবে না তো!

আমি বললাম, যাঃ ভয় আবার কি!

প্রশান্ত হাসতে হাসতে বললো, এখানে রাজা মহারাজাদের আমলে এত যুদ্ধ চলেছে, কত খুন জখম হয়েছে, তাদের ভূত-টুত থাকতে পারে।

আমি বললাম, ভূতেরাও মিলিটারিদের ভয় পায়।

দুর্গটার এক অংশ এখন মিলিটারিদের দখলে। একদিকে একটা মন্দির আছে আর এই গেস্ট হাউস শুধু জনসাধারণের জন্য।

আমি এক জামাকাপড়ে রয়ে গেলাম সেখানে। প্রশান্ত আর গীতি চলে যাবার পর আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সামনের চত্বরটায় বসে গঙ্গা দেখতে লাগলাম। সন্ধের পর তার বাইরের লোকদের এখানে আসতে দেওয়া হয় না। জায়গাটা এখন খুবই নির্জন। অনেকদিন এমন নির্জনতা উপভোগ করার সুযোগ পাইনি।

—সাব!

আমি চমকে উঠেছিলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, ডাকবাংলোর চৌকিদার। সে জিজ্ঞেস করলো রাত্তিরে আমার জন্য খাবার বানাতে হবে কিনা!

তাইতো নির্জনতা নিয়ে কবিত্ব করতে গিয়ে আমি খাবার কথাই ভুলে গিয়েছিলাম। কথাটা ভাবতেই আমার খিদে পেয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম খাবার কি পাওয়া যাবে?

সবচেয়ে সুখাদ্য এবং সহজে রান্না করা যায়, অর্থাৎ ভাত আর মুরগীর মাংস তারও ব্যবস্থা আছে। আমি সেটারই অর্ডার দিলাম। এবং বললাম, খুব জলদি বানাতে।

আপসোস হতে লাগলো কেন একটা হুইস্কি বা ব্র্যান্ডির বোতল সঙ্গে আনিনি,

তাহলে এই নির্জনতা আরও ভালভাবে উপভোগ করা যেতো।

চৌকিদারকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করছিল। তারপর লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম। সে বললো, এনে দিতে পারে তবে অনেকটা সময় লাগবে। পাহাড়ের নিচে বাজারে যেতে হবে কিনা।

আমি তাকে পাঁচ টাকা বকশিশ দিয়ে বললাম, যাও তাই নিয়ে এসো।

চৌকিদার চলে যাবার পর জায়গাটা আরও বেশী নির্জন মনে হতে লাগলো।

একটা জিনিস লক্ষ্য করে আমি অবাক হয়ে গেলাম। চারপাশে এত সৌন্দর্য, মাথার ওপরে বিশাল আকাশ নিচেও বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়, গঙ্গার রূপও এখানে অসামান্য, চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে—তবু একা থাকার জন্য আমি এসব তেমনভাবে উপভোগ করতে পারছি না। আমার একটু ভয় ভয় করছে।

ঠিক ভূতের ভয় নয় বরং চোর ডাকাতের ভয়ই বেশী। চৌকিদারকে না পাঠালেই হতো। আমাকে এখানে একা পেয়ে কেউ যদি খুন করে টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়ে যায়? আমার কাছে মাত্র শ' দেড়েক টাকা রয়েছে যদিও। কিন্তু এদেশে পাঁচ দশ টাকার জন্যও অনেক সময় মানুষ খুন হয়।

হঠাৎ মনে হলো, ঠান্ডা হাওয়ার জন্য আমার একটু শীত শীত করছে। আসলে এটা একটা অজুহাত। বাইরে একা বসে থাকতে আমার গা ছমছম করছিল।

ঘরের মধ্যে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বেশ নরম গদি। খুব আরামের।

একটুক্ষণ বাদেই আমি বাইরে কার যেন গলার আওয়াজ শুনলাম। দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি চত্বরের একেবারে শেষ প্রান্তে গঙ্গার দিকে দুজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিজেদের মধ্যে গল্প করছে মনে হয়।

সিগারেট ধরিয়ে আমি বাইরে এলাম। অল্প চাঁদের আলোয় দেখলাম একজন সাহেব ও মেম। রাত্রে সাধারণত কাউকে আসতে দেওয়া হয় না। তবে সাহেব ও মেমদের জন্য সব সময়েই অনেক বেশী সুযোগ সুবিধে থাকে। কিংবা হয়তো ওদের আগে থেকে ঘর রিজার্ভ করা ছিল।

একটু এগিয়ে এসে আমি দারুণ চমকে উঠলাম। সেই দু'জন হিপি যুবক যুবতী। এদের একবার আমি দেখেছি কলকাতায় পার্ক স্ট্রীটে, একবার কাশীতে আবার এখন চুনারে। আমি যেখানে যাচ্ছি এরা কি সেখানেই যাচ্ছে?

নিজের মনকে বোঝালাম হয়তো ব্যাপারটা কাকতালীয় যোগাযোগ। হঠাৎ এরকম মিলে যেতেই পারে। বেনারস থেকে হিপিরা বিতাড়িত হচ্ছে বলেই বোধ হয় ওরা দু'জন চুনারে এসেছে। অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ওরা যখন আমার প্রতিবেশী, তখন ওদের সঙ্গে আলাপ করা যেতে পারে। এগিয়ে গিয়ে বললাম, হ্যালো।

ওরা একটু চমকে ঘুরে দাঁড়ালো। ওরা নিজেদের মধ্যে গল্পে মশগুল হয়েছিল।

মেয়েটির দিকেই আমার প্রথম চোখ পড়েছিল। মেয়েটির মুখে সেই রকম হাসি নেই। বরং একটা রাগের ভাব। আমাকে কিছু না বলে দুর্বোধ্য কি একটা ভাষায় কিছু বললো ছেলেটিকে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম ওরা ইংরেজি জানে না।

আমি ছেলেটির দিকে তাকালাম। ভারতবর্ষে যখন ঘুরছে তখন কিছু একটা সুবোধ্য ভাষা তো জানবে। বোধহয় হিন্দী জানে। তাই আমি বললাম আপলোগ...

ছেলেটি আমায় কিছু বলতে দিল না। দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে আমার দিকে তাকালে। আমার শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেলো। ছেলেটির দু'চোখ দিয়ে সবুজ রঙের আলো বেরুচ্ছে। দুটো সবুজ আলোর রেখা এসে ভেদ করলো আমার মুখ। সে রকম ভয়ংকর দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি।

ছেলেটি এগিয়ে এসে আমার একটা হাত ধরলো। কি অসম্ভব গরম তার হাত। একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর হলেও মানুষের দেহে অতখানি উত্তাপ থাকে না।

স্বীকার করতে একটুও লজ্জা নেই, আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেও পারলাম না। সমস্ত শরীর দিয়ে বুঝতে পারলাম এরা সাধারণ

মানুষ নয়।

আমার মনে পড়ে গেল কাশীর সেই গুণ্ডাটার হাত ছিঁড়ে যাওয়ার এবং চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। আমি এক হাতে চোখ ঢেকে চিৎকার করে বললাম আমায় ছেড়ে দিন! দয়া করে ছেড়ে দিন। আমার কোন খারাপ মতলব নেই।

আমি সেখানে অজ্ঞান হয়ে অনেকক্ষণ পড়েছিলাম। চৌকিদারটা ফিরে এসে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেয়ে মাথায় জলের ছিটে দেয়। চোখ মেলেও প্রথমে আমার মনে হয়েছিল আমি মরেই গেছি। তারপর দেখলাম নিজের দুটো হাত ও দুটো চোখ অক্ষত আছে কিনা। সবই ঠিক আছে। সেই ছেলেটি ও মেয়েটি সেখানে নেই। তাদের কেউ দেখেনি। চৌকিদার জোর দিয়ে বললো রাত্তিরে এখানে কারুর আসার হুকুম নেই।

আমি আজ ভূত বিশ্বাস করি না। আমার দৃঢ় ধারণা ওরা ভূত-টুত নয়—অন্য কিছু। আমাদের জানা জগতের বাইরের কোন অস্তিত্ব। বন্ধুরা অবশ্য সব শুনে বলে, পুরো ব্যাপারটাই আমার চোখের ভুল। নির্জন জায়গায় সম্পূর্ণ একলা থাকলে ঐ রকম নাকি হয়।

দুইনারী

আমার বয়েস তখন একত্রিশ, আমার চুলের বয়স আঠেরো। তেরো বছর বয়েসে আমার পৈতের সময় শেষবার ন্যাড়া হয়েছিলাম।

ভদ্রলোকের চুলের দিকে আমি আর একবার তাকালাম। চমৎকার কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ওর ফর্সা রঙের সঙ্গে খুব মানিয়েছে। সাধারণ ফিলম স্টারদের মুখে যেমন মেয়েলি ধরনের হয়, তাপসবাবুর সে রকম নয়—ওঁর মুখে সব সময় একটা পুরুষোচিত বিষণ্ণতা।

আমি বললুম, আপনার চুল দেখেই নিশ্চয়ই মেয়েরা আপনার ভক্ত হয়ে যায়?

—হতো একসময়!

উনি একটা দীর্ঘশ্বাস লুকোবার চেষ্টা করলেন। চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ।

তাপস রায়ের সঙ্গে আমার আলাপ ঘাটশিলায়। বাড়ির সকলে মিলে বেড়াতে গেছি সেবার। একদিন বিকেলে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটি সুদর্শন যুবককে পায়চারি করতে দেখে আমার বোন বললো—ছোটমাসী দেখো, দেখো, ঐ ভদ্রলোককে ঠিক তাপসকুমারের মতন দেখতে, অবিকল।

ছোটমাসী বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো। বোধহয় সত্যিই তাপসকুমার।

মেয়েদের আলোচনা শুনে বুঝলুম, ওদের আলোচ্য জনৈক সিনেমার তাপসকুমার, যিনি পাঁচ বছর আগেও 'দারুণ' পার্ট করতেন, কি 'ভীষণ' নাম ছিল ওঁর, উত্তমকুমারকে কম্পিট করতো, কিন্তু হঠাৎ 'বই'তে নামা বন্ধ ক'র দিয়েছেন, কেন কে জানে' এবং আপাতত প্ল্যাটফর্মে পায়চারিরত ঐ যুবকটিই তিনি না হয়ে যান না'

আমার ছোট বোন বললো, দাদা, তুমি আলাপ করে এসো না!

আমি বললাম, ধ্যাৎ!

পরদিন বাজারে মুর্গীর ডিম খুঁজে পেলাম না। কেউ কেউ সন্ধান দিল যে রায়-বাবুর পোলট্রিতে পাওয়া যেতে পারে। খুঁজে খুঁজে সেখানে গিয়ে দেখলাম, পোলট্রির মালিক রায়বাবুই গতকাল সন্ধেবেলা দেখা সেই যুবক, অর্থাৎ সত্যিই তাপসকুমার।

সিনেমায় দু'একজন নায়কের নাম কয়েক বছর খুব শোনা যায়। তারপর হঠাৎ তারা অদৃশ্য হয়ে যায়, এমন দেখেছি বটে। তারা কোথায় চলে যায় এতদিন বুঝিনি। কিন্তু তারা ঘাটশীলায় গিয়ে মুর্গীর ব্যবসা করে, এটা বিশ্বাস করা সত্যিই শক্ত।

ভদ্রলোকের বয়স সাঁইত্রিশ, স্বাস্থ্য চমৎকার। তবে গলার আওয়াজটা ঘ্যাসঘেসে ধরনের আর ভাঙাভাঙা। এই গলা দিয়ে অভিনয় করা চলে না, আগে নিশ্চয়ই গলার আওয়াজ ভালো ছিল।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেল বেশ। আমি ভদ্রতা বশে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি অভিনয় ছেড়ে দিলেন কেন?

এর উত্তরে তিনি আমাকে একটা ভূতের গল্প শোনালেন। জানি না। কতদূর সত্যি মিথ্যে।

তাপসকুমার মোট পাঁচখানা ছবিতে নেমেছিলেন। বেশ নাম হয়েছিল। একবার একটা ছবিতে অভিনয়ের জন্য পুরস্কারও পেয়েছিলেন। হঠাৎ আরও তিনখানা ছবির কন্ট্রাক্ট ক্যানসেল করে বিদায় নিলেন চিত্রজগৎ থেকে।

—কেন? সাধারণত কোন নায়িকা হঠাৎ বিয়ে করে ফিলম্ ছেড়ে দেয়। নায়করা তো বুড়ো হয়েও কাকা-জ্যাঠার পার্ট করে, আপনি অসময়ে ছাড়লেন কেন?

—দু'জন নারীর জন্য। ফিলমে নামার আগে থেকেই আমি এদের দু'জনকে খুব ভালোবাসতুম। একজন আমার মা, আর একজনের নাম ছিল গায়ত্রী। দু'জনকেই আমি হারিয়েছি।

--মানে, ওঁরা কি... ?

—হ্যাঁ, মারা গেছেন। মা ছিলেন আমার ফিলমে নামার ঘোরতর বিরোধী, আর গায়ত্রীর জন্যই আমি প্রথম ফিলমে নায়ক হবার সুযোগ পাই। এ'রা দু'জনে দু'জনকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। আমি পাড়ার থিয়েটারে পার্ট করতুম। আর গায়ত্রী রেডিওতে নাটক করতো, দু' একটা ফিলমেও নেমেছে—অনেক লোকের সঙ্গে চেনাশোনা ছিল। আমি আমাদের পাড়ায় যে-বার 'পথের দাবী' নাটকে সব্যসাচীর পার্ট করি, সে-বার গায়ত্রী ফিলমের অনেক লোককে ডেকে এনে দেখিয়েছিল আমার অভিনয়। ওদের মধ্যে ছিলেন সাত্যকি বসু। তিনিই আমাকে ডেকে নিলেন তাঁর পরের ছবির জন্য তা একেবারে হীরোর ভূমিকায়।

—এরকম সুযোগ অনেকেই পায় না।

—তা হলে বুঝতেই পারছেন, গায়ত্রীর প্রতি আমার কতখানি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আর আমি ও'কে ভালোবাসতুম সত্যি। কিন্তু মা ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। মায়ের ধারণা ছিল এই নষ্ট মেয়েটা আমাকে কুপথে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ছিলাম মায়ের এক ছেলে। মাকে কোন দুঃখ দেবার কথা ভাবতেই পারতাম না। অথচ গায়ত্রী আমার জীবনটা দখল করে নিচ্ছিল।

—এটা একটা সমস্যা বটে।

—সমস্যার সমাধান মা নিজেই করে দিলেন। আমার প্রথম ছবি রিলিজ করার এক মাসের মধ্যেই মা মারা গেলেন। চারিদিকে আমার তখন নাম ছড়াচ্ছে, তার মধ্যে এই দুঃসংবাদ। ইতিমধ্যেই আমি আরও দুটো ছবির কন্ট্রাক্ট পেয়েছি। সাত্যকি বসুর পরের ছবির শুটিং শুরু হবে পনের দিনের মধ্যে।

গণ্ডগোল বাধলো, শ্রাদ্ধের সময় মাথা ন্যাড়া করার ব্যাপারে। গায়ত্রী বললো, খবরদার তুমি মাথার চুল কামিও না। তোমার এমন সুন্দর চুল। স্কুল কলেজের ছেলেরা এর মধ্যেই তোমার মতন চুল ছাঁটতে শুরু করেছে, এখন ন্যাড়া হলে তোমার ইমেজ নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি বামুনকে মূল্য ধরে দাও।

সবদিক ভেবে-চিন্তে আমি গায়ত্রীর কথাই মেনে নিলাম। শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেল। তার বছরখানেকের মধ্যে আমি রীতিমত বিখ্যাত! গায়ত্রীকে বিয়ে করেছি। বাগবাজার থেকে উঠে গেছি নিউ আলিপুরে। চোখে কালো চশমা পরে ঘুরি।

মায়ের মৃত্যু বার্ষিকীর ঠিক আগের দিন মাকে স্বপ্নে দেখলাম। স্বপ্নই বলতে হবে, ঠিক যেন মা আমার শিয়রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। খুব দুঃখিতভাবে বললেন, খোকা, তুই ওরকম একটা অনাচার করলি? আমাদের বংশে কেউ এরকম করে নি। তুই বার্ষিকীর দিনে মাথাটা এবার ন্যাড়া করে ফ্যাল। নইলে অশৌচ সম্পূর্ণ হয় না।

ঘুম ভেঙে উঠে আমার মনটা খুব দমে গেল। মায়ের জন্য কষ্ট হতে লাগলো খুব। গায়ত্রী বাপের বাড়ি গিয়েছিল, সকালেই ওকে টেলিফোন করলাম, আমি আজ মাথা কামাবো।

গায়ত্রী সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো এ বাড়িতে। তুলকালাম কাণ্ড করলো চেঁচিয়ে। আমার কুসংস্কার নিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা বলতে লাগলো। সেবারও ন্যাড়া হওয়া হলো না।

তার কয়েকদিন বাদেই আমার সামনের দিকের একগাদা চুল পেকে উঠলো।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, তাপসবাবুর একটিও চুল পাকা নয়। যাকে বলে ভ্রমরকৃষ্ণ। কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

তাপসবাবু আবার বললেন, একত্রিশ বছর বয়সে কি কারুর চুল পাকে না? হয়তো পাকে। কিন্তু সাতদিনের মধ্যে কারুর মাথায় সমস্ত চুল একেবারে পেকে যেতে দেখেছেন? আমার তাই হলো। তারপরে শীতকালের গাছের পাতার মতন রোজ ঝরঝর করে খসে পড়তে লাগলো আমার চুল। গায়ত্রী একদম বিশ্বাস করলো না ব্যাপারটা, ওর ধারণা আমি কোনো ওষুধ-টষুধ মাখিয়ে এরকম করেছি। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি সম্পূর্ণ ন্যাড়া হয়ে গেলুম। আমার আর চুল ওঠে নি মাথায়।

—কিন্তু, আপনার...?

ভদ্রলোক মাথার চুলগুলো সব তুলে ফেললেন। নিখুঁত পরচুলা। কিন্তু কি বীভৎস ওর মাথাটা।

—ওখানেই থামে নি। বছরখানেক বাদে হাসপাতালে বাচ্চা হতে গিয়ে গায়ত্রী মারা যায়। তার আগেই আমার ভুরু পাকতে শুরু করে। এখন ভুরু দুটোও নকল।

আমি বললাম, এ তো এক ধরনের অসুখ। চামড়ার অসুখ। আপনি চিকিৎসা করান নি?

—চূড়ান্ত করেছি। যতদূর চিকিৎসা সম্ভব। শুনুন না, এরপর শুরু হলো আরেক জনের প্রতিশোধ। মরে যাবার অল্প কয়েকদিন পরেই স্বপ্নে দেখা দিল গায়ত্রী। দারুণ ক্রুদ্ধ চেহারা। কি বললো জানেন?

—আমি কি করে জানবো?

—বললে, মায়ের জন্য তুমি অমন সুন্দর চুল নষ্ট করলে, আমার জন্য কিছু ত্যাগ করবে না? আমি বুঝি তোমার কেউ নই? আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি দেব তোমাকে? গায়ত্রী আমার গলার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো। মনে পড়লো, গায়ত্রী আমার গলার আওয়াজ সবচেয়ে বেশী পছন্দ করতো। নিজের গলার আওয়াজ আমি কি করে ত্যাগ করি, বলুন? কিন্তু গায়ত্রী রোজ স্বপ্নে ভয় দেখাতে লাগলো। ওর জন্য ফিলম থিয়েটারে অভিনয় বন্ধ করলাম। তবু নিষ্কৃতি নেই।

ভদ্রলোক হঠাৎ খুব কাশতে লাগলেন। গলার মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ হতে লাগলো।

আমি বললাম, এ তো নিশ্চয়ই মানসিক অসুখ। আপনাকে মানতেই হবে, অ্যানালিসিস করলে...

—মানসিক। শুধু মানসিক? গায়ত্রী জোর করে আমার গলা বন্ধ করতে চেয়েছিল। এই দেখুন।

তাপসবাবু মাফলার খুললেন। তাঁর গলায় তিনটে লাল দাগ। স্বপ্নের মধ্যে নিজেই নিজের গলা টিপে ধরেন নি তো? ভদ্রলোক নিজে যথেষ্ট বুদ্ধিমান, সুতরাং আমার কোনো উপদেশ দেওয়া মানায় না। আমি চুপ করে রইলাম।

তাপসবাবু এমন কাশতে শুরু করলেন যে এরপর কথা বলাই মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো। কোনরকমে ফ্যাসফ্যাস করে বললেন, সবটা গলার আওয়াজ নিয়ে নেবে। সবটা! তার আগে থামবে না।

তাপসবাবুকে বিশ্রাম নিতে বলে আমি উঠে চলে এলাম।

পরের বছর খবর পেয়েছিলাম, উনি গলার ক্যানসার অসুখে মারা গেছেন।

নীরার অসুখ

ডালহাউসি স্কোয়ারে ট্রাম থেকে নেমে সবেমাত্র একটা সিগারেট ধরিয়েছি, হঠাৎ মনে হল, পৃথিবীতে কোথাও কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেছে। কিসের যেন একটা শোরগোল শুনতে পাচ্ছিলাম। তাকিয়ে দেখলাম দূরাগত একটা মিছিল। এ পাড়া থেকে কি একশো চুয়াল্লিশ ধারা উঠে গেছে। সারাবছরই তো থাকে। উঠে যায় নি। অবিলম্বে পুলিশ এসে মিছিলের গতিরোধ করল। উত্তেজনা ও গোলমাল বাড়ল। তারপরই হুড়োহুড়ি। লোকজন ছুটোছুটি করছে চারিদিকে। ঠিক যেন ভিড়ের মধ্যে একটা পাগলা ষাঁড়কে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ধাবমান লোকগুলির কোন নির্দিষ্ট দিক নেই।

আমি গড্ডলিকা প্রবাহে গা না মিশিয়ে প্রাক্তন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। কলেজজীবন থেকেই পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার-গ্যাস চালানো এত বেশী-বার দেখেছি যে এইসব গোলমালের চরিত্র বুঝতে আমার ভুল হয় না। লাঠি টিয়ার-গ্যাসের অবস্থায় এখনো আসে নি।

লোকজনের ছুটোছুটি ক্রমশ বাড়ছিল। তার ফলে লেগে গেল একটা বিশ্রী ট্র্যাফিক জ্যাম। কতক্ষণে এর জট ছাড়বে কে জানে। এর ওপর আবার আকস্মিকভাবে আরম্ভ হয়ে গেল বৃষ্টি। রীতিমতন জোরে।

বৃষ্টি আসার ফলে লোকজনের ছুটোছুটি, মিছিল ও পুলিশের তাণ্ডব সবই অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল। বর্ষার তেজী বৃষ্টি অন্য কিছু সহ্য করে না। কয়েক মিনিট পরে আর সব কিছুই শান্ত, বৃষ্টিরই প্রবল প্রতাপ দেখা গেল।

আমি তখন আমার আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। যতদূর সম্ভব অন্যান্য গাড়ি-বারান্দাগুলোর তলা দিয়ে যাওয়া যায়। পুরোটা রাস্তায় সেরকম সুযোগ নেই, বেশ ভিজতে হল আমাকে। বুক পকেটটা শুধু চেপে রইলাম সিগারেট দেশলাই আর সামান্য যা টাকা-পয়সা আছে তা যেন না ভেজে।

বেশীদূর নয়, আমার যাবার কথা রাজভবনের পশ্চিমদিকের গেটের সামনে। নীরা ওখানে আসবে, ঠিক সাড়ে চারটের সময়। আমার মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছে।

সিংহ মূর্তির কাছেই একটা গাছতলায় দাঁড়ালাম। নীরা এখনো আসে নি। নীরা কোনদিন দেরি করে না।

কিন্তু সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বিরাট গাড়ির লাইন পড়েছে। ট্র্যাফিক জ্যাম ছড়িয়ে পড়েছে এদিকেও। এর মধ্যে নীরা আসবে কি করে? ট্রাম বাস সব অচল। নীরা যদি ট্যাক্সি নিয়েও থাকে, তবু এই জ্যাম ভেদ করে ট্যাক্সি আসতে পারবে না। ওরা আসতেও চায় না।

ভীষণ রাগ হল আমার। ঠিক এই সময়েই কি ট্রাফিক জ্যাম না হলো চলছিল না ; এদিকে বৃষ্টিরও বিরাম নেই।

বৃষ্টির সময় গাছতলায় আশ্রয় নেওয়া খুব সুবিধের ব্যাপার নয়। প্রথম প্রথম জলের হাত থেকে বাঁচা যায়। তারপর গাছ নিজেই মাথা ঝাঁকিয়ে জল ঝরাতে থাকে।

আর একটা সিগারেট ধরাবার জন্য পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করলাম। সিগারেট ভেজে নি কিন্তু দেশলাইটা নেতিয়ে গেছে। কয়েকটা কাঠি নিয়ে জ্বালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম বার বার। ছাল চামড়া শুধু উঠে আসে!

আমার পাশে আরও কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। একজনের মাথায় ছাতা। তবু তিনি আশ্রয় নিয়েছেন গাছের নিচে। তাঁর মুখে জ্বলন্ত সিগারেট।

খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলুম, আপনার কাছে দেশলাই আছে?

লোকটি আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। নিজের মুখ থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

হয় ওঁর কাছে দেশলাই নেই অথবা উনি কাঠি খরচ করতে চান না।

সাবধানে ওঁর সিগারেটটা ধরে আমি আমারটা জ্বালিয়ে নিলুম। তারপর ওঁরটা ফেরত দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে আমি বললাম, ধন্যবাদ।

আমার ধন্যবাদের উত্তরে উনি বললেন, ফেলে দিন।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ওঁর সিগারেটটা মাত্র আধখানা পুড়েছে. উনি ফেরত নিতে চাইছেন না কেন? আমরা তো আরও অনেক দূর পর্যন্ত টানি।

আমি আবার বললাম, এই নিন।

উনি একই রকম গলায় বললেন, দরকার নেই ফেলে দিন। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। আমার মুখখানা অপমানে কাল হয়ে গেল। এর মানে কি? আমি কি অচ্ছুৎ? আমার ছোঁয়া সিগারেট উনি স্পর্শ করবেন না? তা হলে দিতে গেলেন কেন? আমি তো সিগারেটের আগুন চাই নি। আর যদি ফেলতেই হয়, আমার কাছ থেকে নিয়েও তো নিজে ফেলতে পারতেন।

অথচ এই নিয়ে তর্ক করাও যায় না। অভদ্র লোকদের এই একটা সুবিধে, ভদ্রলোকেরা তাদের চ্যালেঞ্জ করে না। তারা নিজেরাই সহ্য করে যায়। আমি মনে মনে গজরাতে লাগলুম।

পাঁচটা বেজে গেল, নীরা এখনো এল না। ট্রাফিক জ্যামের জট ছেড়ে গেছে, বৃষ্টির তেজ একটু কম। নীরা তো কোনদিন এত দেরি করে না।

সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। আর কোন সন্দেহ নেই যে নীরা আজ আর আসতে পারবে না। নিশ্চয়ই আকস্মিক অনিবার্য কারণে আটকে গেছে। আর অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না।

বৃষ্টি থেমে গেছে। আমি গাছতলা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। আর একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু আমি কারুর কাছে দেশলাই চাইব না।

সবে মাত্র পা বাড়িয়েছি, এই সময় পটাং করে আমার একটা চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল। চামড়ার চটি জলে ভিজে থ্যাসথেসে হয়ে গিয়েছিল।

এখন এই ছেঁড়া-চটি নিয়ে আমি কি করি। রাজভবনের সামনে মুচি খুঁজে পাওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার। অথচ ছেঁড়া-চটি ঘষটে ঘষটে হাঁটাও একটা অসম্ভব ব্যাপার। চটি জোড়া পুরনো, ফেলে দিলেও ক্ষতি নেই—কিন্তু খালি পায়ে হাঁটার মতন মনের জোর নেই।

অগত্যা সেই চটি টেনে টেনেই হাঁটতে লাগলুম! অত্যন্ত বিশ্রী লাগছে। চটি ছিঁড়ে গেলে মানুষের সমস্ত ব্যক্তিত্ব চলে যায়।

খানিকটা এগোতেই কার্জন পার্কের মোড়ের কাছে দড়াম করে জোর একটা শব্দ হল। চোখ তুলে সেদিকে তাকালাম। না তাকালেই ভালো হত। একটা লরি ধাক্কা মেরেছে একটা টেম্পোকে। টেম্পো থেকে একটা লোক ছিটকে পড়েছে রাস্তায়। গল-গল করে রক্ত বেরুচ্ছে।

এতকাল কলকাতায় আছি, কিন্তু আমি নিজের চোখে কখনো কোন দুর্ঘটনা দেখিনি। আজই প্রথম। আজ বিকেল থেকে পর পর একটার পর একটা খারাপ ঘটনা ঘটছে কেন? পৃথিবীর যন্ত্রপাতিতে কি কোথাও কোন গণ্ডগোল হয়েছে?

হঠাৎ আমার মনে হল, নীরার নিশ্চয়ই কোন অসুখ হয়েছে। সেই জন্যই আসতে পারে নি। কালকেও নীরাকে পরিপূর্ণ সুস্থ দেখেছি, আজ তার অসুখ হবার কোন কারণই নেই। তবু আমার ঐ কথাই মনে হল—সেই জন্যই আজ আমি একটার পর একটা কুচিহ্ন দেখছি। এইসব ঘটনার সঙ্গে নীরার অসুখের নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে। এই জগৎ তো মায়ার প্রতিভাস, আমার মনের অবস্থা অনুযায়ীই সব কিছু ঘটে থাকে।

নীরার অসুখ কতটা গুরুত্বপূর্ণ, আমার এক্ষুনি জানা দরকার। ওদের বাড়িতে সাধারণত আমি টেলিফোন করি না, আজ করতে হবে।

কোথায় টেলিফোন? ট্রাম গুমটিতে। ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়েই ছুটলাম সেই দিকে।

তিন চারজন আগে থেকেই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে। মেয়েরা টেলিফোন করতে অনেক সময় লাগায়। আমার ইচ্ছে হল, এদের কাছে হাত জোড় করে মিনতি করে বলি, আমাকে একটু আগে সুযোগ দিন, পৃথিবীর সমস্ত কাজের চেয়েও আমার কাজটা বেশী জরুরী।

কিন্তু এ-কথা মুখে বলা যায় না। নীরস মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম সবার পেছনে। মেয়েটি যথারীতি বহুক্ষণ সময় লাগাল। ও যেন কার সঙ্গে ঝগড়া করছে। তাতো করবেই। আজ এই মুহূর্তে, পৃথিবীতে কেউ সুখে নেই।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে আমার সুযোগ এল। ঠিক-ঠাক খুচরো পয়সা পকেটে আছে, আগেই দেখে নিয়েছিলাম। কানেকশান হবার পর এনগেজড টোন পেলাম। তবু ফোন ছাড়লাম না। পর পর তিনবার চেষ্টা করলাম। একই অবস্থা। তখন টেলিফোন অফিসে লাইন ধরে জিজ্ঞেস করলাম, এই নাম্বারটার কি অবস্থা দেখুন তো।

দূরভাষিণী জানালেন, ঐ নাম্বার এখন আউট অফ অর্ডার হয়ে আছে।

খুব একটা আশ্চর্য হবার মতন ব্যাপার কিছু নয়। আজ বিকেল থেকে পর পর যা ঘটছে, তার সঙ্গে বেশ মিল আছে।

এরপর আমি একটা কাজই করতে পারি। পা ঘষতে ঘষতে চলে এলাম ধর্মতলার মোড়ে। সন্ধের পর কলকাতার রাস্তায় মুচি পাওয়া অসম্ভব—ঈশ্বর এ-রকম নিয়ম করেছেন। সুতরাং আমি আমার পুরনো চটি-জোড়া ফেলে দিয়ে ফুটপাথ থেকে এক-জোড়া রবারের চটি কিনে নিলাম। তারপর মিনিবাস ধরে দ্রুত নীরার বাড়িতে।

দরজা খুলল চাকর। কোন দ্বিধা না করে জিজ্ঞেস করলাম, দিদিমণি আছে?

অন্যদিন হলে নীরার বাবার সঙ্গে প্রথমে কথা বলতাম, একটা কোন জরুরী প্রসঙ্গ বানিয়ে নিতে হত। আজ আর ওরকম অছিলা খোঁজার কোনো মানে হয় না।

চাকরটি বলল, দিদিমণি ওপরে শুয়ে আছেন।

—অসুখ করেছে?

—না, এমনিই শুয়ে আছেন।

—খবর দাও, বলো, সুনীলবাবু দেখা করতে এসেছেন। চাকরটি ওপরে চলে গেল আমি বসবার ঘরে দাঁড়িয়ে ছটফট করতে লাগলাম। বসতেও ইচ্ছে করল না। টেবিলে অনেক পত্র-পত্রিকা পড়ে আছে, ছুঁয়েও দেখলাম না।

চাকর একটু পরে এসে বলল, দিদিমণির জ্বর হয়েছে।

আমার প্রচণ্ড চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, আমি আগেই বলেছিলাম না?

খুব শান্তভাবে বললাম, আমি একবার ওপরে যাব। দিদিমণির বাবা কিংবা মাকে একটু বলে এসো আমার কথা।

—বলেছি, আপনি আসুন।

চাকরটির আগে আগেই আমি সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে এলাম। নীরার ঘর আমি চিনি। তিনতলায় সিঁড়ির পাশেই।

নীরা শুয়ে আছে চিৎ হয়ে, গায়ে একটা পাতলা নীল চাদর, চোখ বোজা। ওর মা শিয়রের কাছে বসে কপালে জলপটি দিচ্ছেন।

নীরার মা আমাকে দেখে সামান্য একটু অবাক হলেন, কথায় তা প্রকাশ করলেন না অবশ্য। বললেন, ঐ চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসো।

আমাকে বলতেই হল যে নীরার বিশেষ বন্ধু স্নিগ্ধা, যে আমার মাসতুতো বোন, সে নীরাকে একটা খবর দিতে বলেছিল, আমি এ পাড়ায় এসেছিলাম অন্য কাজে, এসে শুনলাম, নীরার অসুখ।

ওর মা বললেন, দ্যাখো দেখি, হঠাৎ কি রকম জ্বর। দুপুরেও ভাল ছিল।

—কি হয়েছে?

—বুঝতে পারছি না তো। টেম্পারেচার একশো ডিগ্রি।

—ডাক্তার এসেছিলেন?

—রথীনকে তো খবর পাঠিয়েছি। ন'টার সময় আসবে বলেছে। টেলিফোনটা আবার আজকে খারাপ। ওর বাবাও এখনো অফিস থেকে ফেরেন নি।

কথাবার্তা শুনে নীরা চোখ মেলে একবার তাকাল। ঘোলাটে দৃষ্টি। আমাকে চিনতে পারল কি না কে জানে।

আমি চেয়ারে বসে নীরার মাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন ওষুধটষুধ আনতে হবে?

আমি এনে দিতে পারি?

—না। রথীন এসে দেখুক।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। উনি কি একবারও ঘর ছেড়ে উঠে যাবেন না?

আজকালকার মায়েরা তেমন অবুঝ নন্। একটুবাদেই উনি বললেন, তুমি একটু বসো। আমি একটু গরম দুধ নিয়ে আসি, যদি খায়।

উনি ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া মাত্রই আমি উঠে গিয়ে দরজার কাছে উঁকি মেরে দেখলাম, উনি একতলায় রান্নাঘরেই যাচ্ছেন কিনা। উনি তাই-ই গেলেন। তা হলে ফিরতে অন্তত দু' মিনিট তো লাগবেই।

নীরার শিয়রের কাছে এসে আমি ওর কপালে হাত দিলাম। কপালটা যেন পুড়ে যাচ্ছে একেবারে।

নীরা চোখ মেলে তাকাল আবার। তারপর অস্পষ্ট গলায় বলল, আমি আজ যেতে পারি নি।

—ও কথা এখন থাক। তোমার কষ্ট হচ্ছে?

—আমার মন খারাপ লাগছে খুব।

—ছিঃ এখন মন খারাপ করে না। হঠাৎ অসুখ বাধালে কি করে?

—আমার তো অসুখ হয় নি, আমার মন খারাপ।

—লক্ষ্মীটি এখন মন খারাপ করো না।

নীরা আমার হাতটা টেনে নিজের চোখের ওপর রাখল। আমি ভালো লাগায় বিধুর হয়ে গেলাম। আবার ভয়ও করতে লাগল। ওর মা এক্ষুনি এসে পড়বেন না তো?

নীরা বলল, তুমি যেও না।

আমি হাত সরিয়ে নিয়ে চেয়ারে এসে বসলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওর মা এসে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। উত্তেজনায় আমি কাঁপছি।

ডাক্তার না আসা পর্যন্ত আমি বসেই রইলাম সেই ঘরে। এর আগেই নীরার বাবা এলেন, দু চারটে কথা বললেন আমার সঙ্গে। আমি জানি, ওঁরা তো আমাকে জোর করে চলে যেতে বলবেন না।

ডাক্তার এল সাড়ে নটায়। ওদেরই কি রকম আত্মীয়। নীরার সঙ্গে তুই তুই বলে কথা বলেন। নীরার জ্বর তখনও একটুও কমে নি। বরং বেড়েছে মনে হয়।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, কি রে তোর হঠাৎ কি হল?

নীরা বলল, আমার কিছু ভালো লাগছে না।

—কোথায় ব্যথা?

নীরার সেই একই উত্তর, আমার কিছু ভালো লাগছে না।

ওরা কেউ জানে না, শুধু আমি জানি, নীরা কখনো অসুখের কথা আলোচনা করতে ভালবাসে না। কোনদিন ও শরীরের কোন ব্যাপার নিয়েই অভিযোগ করে নি। কিংবা আমার সামনে করে নি।

ডাক্তার নীরার বুক-পিঠ পরীক্ষা করে গম্ভীর হয়ে গেলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, জ্বর তো একশো পাঁচের কম নয় মনে হচ্ছে। কোন রকম ভাইরাস ইনফেকশান মনে হচ্ছে। রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। আজ তো হবে না! কাল সকালেই পাঠিয়ে দেব।

তার পরদিন থেকে কলকাতা শহরে কি তুলকালাম কাণ্ড। আগের দিনের ঘটনার জেরে ছাত্র ধর্মঘট। পুলিশের সঙ্গে আবার মারামারি। ট্রাম বাস পুড়ল। কলকাতা শহরটা বিকল হয়ে গেল।

আমি বিকেলে দৌড়তে দৌড়তে গেলাম নীরার কাছে। নীরার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। কোন কথা বলতে পারছে না, প্রায় অজ্ঞানের মতন অবস্থা। এদিকে রক্ত পরীক্ষার কোন ফলাফল তখনও আসে নি।

বিষণ্ণ মনে বেরিয়ে এলাম নীরাদের বাড়ি থেকে। রাস্তাঘাট ফাঁকা, থমথমে। যে-কয়েকজন লোককে দেখা গেল, সকলের মুখ থমথমে। মাঝে মাঝে হিংস্র চেহারায় পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে।

আমি তো জানি, কলকাতার এই অবস্থা তো শুধু নীরার জন্যই। নীরার অসুখ ঠিক না করলে এই শহর রসাতলে যাবে।

পরদিনও নীরার ঠিক সেই একই রকম অবস্থা। ডাক্তাররা কিছু বলতে পারছেন না। আমি তীব্রভাবে মনে মনে বলতে লাগলুম, আপনারা করেছেন কি? আপনারা কি কলকাতা শহরটাকে ভালোবাসেন না? ওকে সারিয়ে না তুললে যে এই শহরটা ধ্বংস হয়ে যাবে। হঠাৎ ভূমিকম্পে সব কিছু ভেঙে পড়তেও পারে। সেদিন কলকাতার সাত জায়গায় ট্রামে বাসে আগুন লেগেছে, পুলিশের সঙ্গে খন্ড যুদ্ধ হয়েছে অনেক জায়গায়। আমি একটু ফাঁকা ঘর পেয়ে অচেতন নীরার কপালে হাত দিয়ে বললাম, নীরা, ভাল হয়ে ওঠ। তোমাকে ভালো হয়ে উঠতেই হবে। তুমি এতগুলো মানুষের কথা ভাব।

পরদিন কলকাতায় কারফিউ জারি হবে কিনা এরকম জল্পনা-কল্পনা চলছিল, কেউ কেউ বলছে, আর্মিকে ডেকে আনা হবে। কিন্তু সেদিনই রক্ত পরীক্ষার ফল পাওয়া গেল, জানা গেল ভাইরাস। ঠিক ইঞ্জেকশন দেবার পরই নীরাব জ্ঞান ফিরে এল। এক ঘণ্টা বাদে ওর মুখের রংটা দেখাল অনেক স্বাভাবিক।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, নীরা, এখন কেমন আছ?

নীরা সামান্য হেসে বলল, আমার মন ভালো হয়ে গেছে।

সেদিন বাইরে এসে দেখলাম, চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া বইছে। রাস্তায় অনেক বেশী লোকজন। কয়েকজন পুলিশের মুখেও হাসি।

পরদিন সকাল থেকে কলকাতা একেবারে স্বাভাবিক।

ভিতরের চোখ

অফিসের কাজে বোম্বে গিয়েছিলাম, ভাবলাম, চট করে একবার গোয়া থেকে ঘুরে আসা যাক। হাতে তিনদিন সময় আছে। পাঞ্জিমে একদিন কাটাবার পর চলে গেলাম কালাংগুটের সমুদ্রতীর দেখতে।

তখন বিকেল শেষ হয়ে এসেছে, চতুর্দিকে অপরূপ নরম আলো। দূরে সমুদ্রে সূর্য অস্ত যাচ্ছেন। দৃশ্যের সৌন্দর্য এখানে একটা বিশাল মহিমা বিস্তার করেছে। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এখানে বেশ ভিড়। হিপিদের বড় একটা দল তো রয়েছেই, তা ছাড়া এখন ভ্রমণকারী-দের মাস এবং ভ্রমণকারীদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা যথেষ্ট।

প্রায় বীচের ওপরেই একটা ছোট রেস্তোরাঁ। সেখানে বসবার জায়গা নেই। বালির ওপরে হুটোপুটি করছে অনেকে। কেউ কেউ এগিয়ে যাচ্ছে জলের দিকে। জল বেশ খানিকটা দূরে।

একটি পুরুষ ও একটি রমণীকে আমি পাশাপাশি জলের দিকে এগিয়ে যেতে দেখলাম। আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি তাদের পিঠের দিক। সূর্যাস্তের দিকে এগোচ্ছে বলে, বিপরীত দিক থেকে আসা আলোয় তাদের শরীরদুটি কালো রেখায় আঁকা। হাওয়ায় উড়ছে মেয়েটির আঁচল, ছেলেটির হাতে সিগারেট। মন্থর তাদের চলার ভঙ্গি।

হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগলো। মনে হলো ঐ মেয়েটির হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গি আমার পরিচিত।

আর একবার তাকিয়ে আমি নিশ্চিত হলাম। রূপাকে আমি এতদিন ধরে এতভাবে দেখেছি যে আমার ভুল হবার কথা নয়। শুধুমাত্র পেছন দিকটা দেখে, তাও প্রায় একশো গজ দূর থেকে এবং গোধূলিকালীন ম্লান আলোয় কোনো মেয়েকে চিনতে পারার কথা নয়, কিন্তু আমার মনে কোনো দ্বিধা রইলো না।

আমি অপেক্ষা করলাম না। পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলাম। রূপা জলের ধার থেকে এক্ষুনি ফিরে আসবে, আজ যেন আমাকে দেখতে না পায়। আমার অভিমান বড় তীব্র।

তা ছাড়া, রূপা হয়তো ভেবে বসতে পারে, ও এখানে ওর স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে আসবে জেনেই আমি এখানে এসেছি। মেয়েদের মন বড় বিচিত্র। আমি এখনো রূপার জন্য কাতর হয়ে আছি কিংবা ওদের সুখে বিঘ্ন ঘটাতে এসেছি—এরকম ভেবে বসাও বিচিত্র নয়।

আমার ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। ফিরে এসে বললাম, চলো।

ট্যাক্সিওয়ালা অবাক। মাত্র পনেরো মিনিটের জন্য কেউ এত টাকা খরচ ক'রে ট্যাক্সি-ভাড়া নিয়ে কালাংগুটের বেলাভূমি দেখতে আসে না। কিন্তু প্রকৃত আমার জন্য বিস্বাদ হয়ে গেছে।

পাঞ্জিমে ফিরে ঠিক করলাম, তার পরের দিন ভোরেই বাস ধরে ফিরে যাবো বোম্বে। রূপাও নিশ্চয়ই পাঞ্জিমে আসবে, তখন আমার সঙ্গে দেখা হোক, আমি চাই না।

একবার শুধু মনে হয়েছিল, যদি রূপা না হয়! আমার দিকে পিছন ফিরে থাকা একটি নারী মূর্তি, উড়ন্ত শাড়ির আঁচল শুধু এইটুকু দেখেছি। পরক্ষণেই মনে হলো, ঐ মেয়েটা রূপা ছাড়া আর কেউ নয়। আমি নিজের সঙ্গেই নিজে একটা বাজি ধরে ফেললাম। এবং ফিরে গেলাম পরদিন ভোরে।

রূপার সঙ্গে দ্বিতীয়বার আমার দেখা কলকাতার রবীন্দ্রসদনে। দেখা মানে, এবারও এক পক্ষের ব্যাপার, অর্থাৎ আমিই শুধু দেখেছি, রূপা দেখেনি।

একটা বিখ্যাত নাটক দেখতে এসেছিলাম। টিকিট হাতে নিয়ে রবীন্দ্রসদনের কাঁচের দরজাগুলোর সামনে এসে সবেমাত্র দাঁড়িয়েছি, দেখলাম, ভেতরের লবিতে আরও দু-তিন-জন নারী-পুরুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে রূপা। এবারও আমার দিকে পেছন ফেরা। নতুন ডিজাইনের খোঁপা, একটা ময়ূরকণ্ঠী রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে, হাতে একটা অনুষ্ঠান-পত্র, খুব গল্পে মত্ত।

দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। আজ চিনতে ভুল হবার কোনো প্রশ্নই নেই। বিয়ের পর সামান্য একটু শারীরিক পরিবর্তন হয়েছে, আগের মতন ছিপছিপে ভাবটা আর নেই। তবু ওর হাতের একটা আঙুল শুধু দেখলেও বোধ হয় আমি চিনতে পারবো।

এখন ভেতরে ঢুকলে রূপার চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই। ঠিক করলাম, একটু পরে ঢোকা যাবে। এখন গিয়ে দরকার নেই।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে চলে গেলাম ময়দানে। একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। খানিকটা বাদে ঘড়ি দেখে বুঝলাম, এতক্ষণে নাটক আরম্ভ হয়ে গেছে, এখন সকলেই ভেতরে ঢুকে গেছে। এখন যাওয়া যেতে পারে।

তবু আমার যেতে ইচ্ছে করলো না। মনে মনে একটা যুক্তি খাড়া করলাম, নাটক শুরু হবার পরে ভেতরে ঢোকা অভদ্রতা। অন্য দর্শকদের ব্যাঘাত হয়। আসলে, একই হলঘরের মধ্যে, এক ছাদের নিচে, যেখানকার হাওয়ায় রূপার নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমার নিঃশ্বাস মিলবে--আমি থাকতে চাইছিলাম না। আমার জীবনে রূপা নামে কেউ নেই।

অনেকক্ষণ একলা একলা ঘুরলাম ময়দানের অন্ধকারে। তারপর হঠাৎ একসময় আমি ভাবলাম আমার কি মন খারাপ। আমি একা অন্ধকারে ঘুরছি কেন?

কথাটা ভেবেই আমার হাসি পেল। আড়াই বছর আগে বিয়ে হয়ে গেছে রূপার। এখনও সেইজন্য মন খারাপ ক'রে ঘুরে বেড়াবার মতন নরম প্রেমিক তো আমি নই। এমন কি এই জন্য একটা থিয়েটারের টিকিট নষ্ট করারও কোনো মানে হয় না। অথচ রূপাকে দেখলেই আমার মনে একটা দুরন্ত অভিমানবোধ জেগে ওঠে। যুক্তিহীন এই অভিমান। রূপার বিয়ের আগে আমি তো জোর করে কিছু বলিনি। রূপাকে শুধু বলেছিলাম, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে। রূপা আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারে নি। আমি তো নিজেই জানি, ওর অনেক অসুবিধা ছিল। যাই হোক সেসব এখন চুকে-বুকে গেছে।

কিন্তু কলকাতা শহরটা আসলে খুব ছোট। কোথাও না কোথাও দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকেই। আমাকে অবশ্য চাকরির জন্য প্রায়ই কলকাতার বাইরে থাকতে হয়। রূপার স্বামীও বদলির চাকরি করে শুনেছি।

কিছুদিন পরেই রূপাকে আর একবার দেখলাম। এবার রূপাও হয়তো আমাকে দেখেছে তাও দু-এক পলকের জন্য মাত্র।

আমার এক বন্ধুকে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিলাম হাওড়া স্টেশনে। প্ল্যাটফর্মে প্রচুর ভিড়, কিন্তু ব্যস্ততার কিছু ছিল না আমাদের। সিট রিজার্ভ করাই ছিল। আমি আর অসিত পাশাপাশি হাঁটছিলাম। অসিতের সঙ্গে একটা ছোট সুটকেশ, কুলি নেওয়ারও দরকার ছিল না।

হঠাৎ একটি কামরার জানালার দিকে চোখ পড়লো। রূপা বসে আছে জানালার ঠিক পাশটিতেই। একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল।

চোখের পলক পড়াতে বোধ হয় একটু দেরি হয়েছিল। কিন্তু আমি থামিনি। এগিয়ে গেলাম। রূপা কি আমাকে চিনতে পেরেছে? যদি অন্যমনস্ক থাকে তা হলে লক্ষ্য না করতেও পারে।

হঠাৎ রূপার দিকে আমার চোখ গেল কেন? অসিতের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত ছিলাম, কোনোদিকে তো আগে তাকাই নি। অবশ্য, মেয়েদের দিকে চোখ আপনি চলে যায়। কিন্তু রেলের এতগুলো কামরায় আর কোনো জানালার পাশে আর কোনো মেয়ে কি বসে নেই।

অসিত জিজ্ঞেস করলো মেয়েটিকে চেনা চেনা মনে হলো না?

আমি কথা ফেরাবার জন্য বললাম, কে? ঐ সামনে যিনি যাচ্ছেন লম্বা মতন?

অসিত বললো, না, ঐ যে জানালায় যাকে দেখলাম।

কারুর চোখের দিকে ঠিক তাকিয়ে আমি মিথ্যে কথা বলতে পারি না। তাই সিগারেট ধরাবার ছলে মুখ নিচু করে বললাম, আমি ঠিক লক্ষ্য করিনি।

অসিতের সংরক্ষিত আসন সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। আমরা দু'জনে কামরায় উঠে বসলাম। ট্রেন ছাড়তে এখনো মিনিট পনেরো দেরি আছে।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর আমি লক্ষ্য করলাম, প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে রূপা। হাতে একটা জলের ফ্লাস্ক। চোখে কিছু একটা খোঁজার দৃষ্টি। কি আর খুঁজবে, জলের কল নিশ্চয়ই।

একটু পরে যখন ট্রেন ছাড়লো আমি প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়ালাম। ট্রেনটা চলতে লাগলো আমার সামনে দিয়ে। অসিতের উদ্দেশে আমি রুমাল ওড়াতে লাগলাম। আর একবার রূপার দিকে চোখ তো পড়বেই। কিন্তু সঠিক সময়ে আমি চোখ ফিরিয়ে নিতে পেরেছি, এবং রুমালটা ভরে নিয়েছি পকেটে। ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাবার পর আমার মনে হলো, আমি এবার সত্যিই রূপাকে আমার জীবন থেকে বিদায় দিয়ে দিলাম।

এরপর সত্যিই আর বছর তিনেকের মধ্যে রূপার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। সময়ে অনেক কিছু ম্লান হয়ে যায়। কত গাছের পাতা ঝরে পড়ে। এই চোখে পুরোনো হয়ে যায় পৃথিবী। অনেক গুরুতর মান-অভিমানও হয় অতি সামান্য।

অফিসের কাজেই গিয়েছিলাম দিল্লীতে। উঠেছি হোটেলে। সারাদিন বহু কর্কিপিংকের লোকের সঙ্গে দেখা করার কাজ। অকারণ ভদ্রতার হাসি দিতে দিতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়।

পরদিন খুব ভোরে উঠে হোটেলের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, কি যেন একটা পুজোর প্যাণ্ডেল সেখানে। এর মধ্যেই পরিচ্ছন্ন পোশাকের অনেক নারী-পুরুষের ভিড়। দুম করে মনে পড়ে গেল আজ সরস্বতী পুজো। আমার খেয়ালই ছিল না।

খুব ছেলেবেলা থেকেই আমি সরস্বতী পুজোর দিন অঞ্জলি দিয়ে থাকি। সেই ছেলেবেলায় যখন নিজেরাই পুজো করতাম, তখন এটা আমরা মেনে চলতাম খুব। ছেলেবেলার অনেক কিছুই আর নেই, শুধু এই অভ্যেসটা রয়ে গেছে। চা খেলাম না। ভাবলাম, এত কাছেই যখন পুজো তখন অঞ্জলিটা দিলেই তো হয়। সরস্বতীর সঙ্গে এখন আর কোনো সম্পর্ক নেই। খবরের কাগজ আর ইংরেজী গোয়েন্দা কাহিনী ছাড়া কিছু পড়ি না—তবু পুরোনো অভ্যেসটা খোঁচা মারতে লাগলো।

ধুতিটুতি নেই। প্যান্ট-শার্ট পরেই চলে গেলাম পুজো প্যাণ্ডেলে। এখানে

কারুকেই চিনি না। তবু বাঙালীদের ব্যাপার, নিজেকে খুব একটা বহিরাগত মনে হয় না।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি দিচ্ছিলাম। পাশ থেকে একটা সুগন্ধ পেলাম। ফুলের নয়; কারুর চুলের অনেক কালের চেনা গন্ধ। লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে রুপা। হাতের ফুলগুলি ছুঁড়ে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো?

পুরোনো অভিমান-টভিমান সব মরে গেছে। আমি হাসিমুখে বললাম, ভালো। তুমি কেমন?

রুপা বললো, চা খাওনি নিশ্চয়ই? তুমি তো অঞ্জলি দেবার আগে কিছু খেতে না।

—মনে আছে!

—সব মনে আছে। আমার বাড়ি কাছেই। আসবে?

এর আগে রুপাকে দেখলেই এগিয়ে চলে গেছি। আজ এই সকালবেলার প্রসন্ন আলোয় আমার বাল্যকালের বান্ধবীকে দেখে মনের মধ্যে আর কোনো রাগ দুঃখ অনুভব করলাম না। মনে হলো, এই রোদ হাওয়া ও শিশুদের কলরবের মতন সবকিছুই স্বাভাবিক।

পুজো-প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে এলাম দুজনে। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার স্বামী আসেন নি?

—না, এখনো ঘুম ভাঙে নি।

কয়েক পা নিঃশব্দে চলার পর কিছু একটা বলার জনাই আমি বললাম, কতদিন পর দেখা। প্রায় ছ-বছর তো হবেই। কি বলো?

রুপা বলল, কেন? এর আগে তো আরও দেখা হয়েছে।

রুপার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে আমি অবাক হবার ভান করে বললাম, কোথায়?

রুপা হাসলো। বললো, কেন? আমার বিয়ের কয়েক মাস পরেই, গোয়ার কালাংগুট বীচে তুমি ছিলে না?

চমকে উঠলাম। শুধু মাত্র পেছন দিক থেকে দেখে আমি সেই মেয়েটিই রুপা কিনা এসম্পর্কে একটু দ্বিধা করেছিলাম। আর রুপা আমাকে কখন দেখলো?

রুপা বলল, আমি ফিরে এসে তোমাকে আর খুঁজে পেলাম না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম তোমার জন্য।

—আমার হাতে বেশী সময় ছিল না। ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল।

—আমি ভেবেছিলাম পাঞ্জিমে ফিরে এসে অন্তত দেখা হবেই। ছোট জায়গা তো। তোমাকে কয়েকটা কথা বলার ছিল।

—আমি পরদিন ভোরেই...

—তারপর রবীন্দ্রসদনে—তুমি গেট দিয়ে ঢুকছিলে।

—সেদিন তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে?

—কেন পাবো না?

—তুমি তো অন্যদিকে ফিরে ছিলে।

—মেয়েদের ভেতরে একটা আলাদা চোখ থাকে জানো না? সেই চোখ দিয়ে দেখেছিলাম। তুমি গেট ঠেলে ঢুকতে গিয়েও ঢুকলে না। আমি ভাবলাম, কিছু একটা বোধ হয় ফেলে এসেছো। আমি তোমার জন্য বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ। নাটক শুরু হয়ে গেল, তবু আমি ভেতরে ঢুকিনি, কিন্তু তুমি এলে না আর।

কোনো মিথ্যে অজুহাত দিতে ইচ্ছে করলো না আর। তাই চুপ করে রইলাম।

রুপা আবার বললো, তারপর একদিন হাওড়া স্টেশনে, আমি জানালার ধারে বসে—সেদিন বোধহয় তুমি আমাকে দেখতে পাওনি, না?

মৃদু গলায় বললাম, পেয়েছিলাম।

—তবু তুমি আমার সঙ্গে কোনো কথা বললে না কেন? চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হলে

বুঝি চোখ ফিরিয়ে চলে যেতে হয়?

—না, ঠিক তা নয়।

—তারপর আমি প্ল্যাটফর্মে নেমে তোমাকে খুঁজলাম। গাড়ি ছাড়ার আগে পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলাম।

—কেন দাঁড়িয়েছিলে, রূপা? আমি ভেবেছিলাম, ঐ সব সময়ে তুমি কোনোবার আমাকে দেখতে পাওনি। তাই আমি—

রূপা খুব নরমভাবে বললো, কেন এরকম ভাবলে? আমি তোমায় না দেখে পারি?

আমি রূপার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালাম। সত্যিই আজ কোনো রাগ আর অভিমান নেই। রূপা আজ এই সকালবেলাটার মতনই সুন্দর। আজকের সকাল শুধু আজকেরই সকাল।

রূপা আবার বললো, তুমি এক-সময় আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলে। আমি তখন পারিনি। তারপর, তোমাকে যখনই দেখেছি, গোয়ার সমুদ্রের ধারে, রবীন্দ্রসদনে, হাওড়া স্টেশনে—আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থেকেছি—তোমাকে একটা কথা বলার ছিল, কিন্তু তুমি আসোনি।

আমি বললাম, আজ আর সে কথা বলার দরকার নেই। আমি সব বুঝতে পেরে গেছি।

—সত্যি বুঝতে পেরেছো?

—না হলে মনটা এমন পরিষ্কার লাগছে কেন?

জনবিরল রাস্তায় বিরাট আকাশের নিচে, নরম রৌদ্রে রূপার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে আমার মনে হলো, এই নারী আর আমার নয়, কিন্তু আমি কিছুই হারাইনি। সবই থেকে গেছে। অভিমান আমাকে রিক্ত করে দিয়েছিল, কিন্তু এখন আমি অনুভব করতে পারি—আবার কখনো সমুদ্রবেলায় সূর্যাস্তের মুখোমুখি এই নারীকে হেঁটে যেতে না দেখলেও, সেই দৃশ্য শাশ্বত হয়ে থাকবে।

সমুদ্রের সামনে

অরূপের ইচ্ছে ছিল খুব দামী হোটেলে ওঠার, কিন্তু নন্দিনী গোড়া থেকেই আপত্তি করছে। ট্রেন স্টেশন ছোঁয়ার আগেই নন্দিনী বলল: না, তুমি পাগলামি করবে না কিন্তু! বি. এন. আর. হোটেলে মোটেই দরকার নেই। আমাদের পনেরো দিন চালাতে হবে তো অন্তত! তা ছাড়া কোনারক, ভুবনেশ্বর যাব।

অরূপ হাসতে হাসতে বলল: নাই বা থাকলুম পনেরো দিন, তবু যে'কটা দিন থাকব একটু জমিদারী স্টাইলে।

নন্দিনী ভ্রূভঙ্গি করে বলল: ও, তোমার বুঝি বেশীদিন থাকার ইচ্ছে নেই!

—ইচ্ছে তো করে এই সমুদ্রপারে অনন্তকাল তোমার মুখোমুখি বসে থাকি!

—বাঃ, তা হলে তো হোটেলের খরচই লাগবে না! বালির ওপর মুখোমুখি বসে থাকব, আর হাওয়া খাব।

—শুধু হাওয়া খাব?

সেকেণ্ডক্লাস কম্পার্টমেন্টের অল্প ভিড়ের মধ্যেও নন্দিনীর ভেজা ভেজা ঠোঁট দুটির দিকে লুব্ধভাবে তাকিয়ে অরূপ একটা ইশারা করল। নন্দিনীও ইশারায় বলল: অসভ্য!

ট্রেন থেকে নেমেও আবার হোটেলের প্রসঙ্গ উঠল। অরূপের খুব ইচ্ছে, খুব বড় হোটেলে থাকবে, ঘর থেকে যখন খুশী বেরুবে, যখন খুশী বেরুবে না, বেল টিপলেই বেয়ারা এসে ফরমাশ মতন সবকিছু দিয়ে যাবে, স্নান করার জন্য গরম জল দুটোই পাওয়া যাবে—তাতে যদি দু'একদিন কম থাকতে হয় তাও ভাল। নন্দিনী অত পয়সা ভাড়া দিয়ে থাকতে রাজী নয়। পুরী স্টেশনে পাণ্ডা, হোটেলের দালাল আর গাড়োয়ানদের চেঁচামেচির মধ্যে দাঁড়িয়েও ওরা তর্ক করতে লাগল।

বিয়ে হয়েছে সাত মাস আগে, কিন্তু এ পর্যন্ত একবারও একসঙ্গে বাইরে বেড়াতে আসা হয় নি। নতুন বউকে নিয়ে হনিমুনে যাবার ইচ্ছা অরূপের ছিল বিয়ের আগে থেকেই, কিন্তু শেষপর্যন্ত যখন আসা হল, তখন আর বউ তেমন নতুন নেই। বিয়ের একমাস পরেই নন্দিনীর মায়ের হাঁপানির টান বাড়ল, তারপরই অরূপের বৌদির বাচ্চা হতে গিয়ে অপারেশান, জীবন সংশয়। ইচ্ছে ছিল কাশ্মীরে যাবার, কিন্তু অরূপের জমা টাকা ফুরোতে ফুরোতে শেষ পর্যন্ত পুরীর চেয়ে বেশী দূর আর কুললো না। তবু, একান্নবর্তী বাড়িতে কখনো নন্দিনীকে সব সময়ের জন্য কাছে পেতে পারে নি, অরূপের শখ, কয়েকটা দিন ভাল কোন হোটেলে কাটানো—যেখানে তাদের কেউ ব্যাঘাত ঘটাবে না।

নন্দিনীই জিতলো। বলাই বাহুল্য বিয়ের অন্তত বছরখানেকের মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে তর্কে কোন্ স্বামীই বা জিততে পারে? নন্দিনী কিছুতেই হোটেলের জন্য গুচ্ছের টাকা খরচ করতে রাজি নয়। অগত্যা অরূপ বলল : ঠিক আছে, মাঝারি ধরনের হোটেলেই যাব, কিন্তু এমন হোটেল চাই যেখানে দোতলায় ঠিক সমুদ্রের দিকে ঘর খালি থাকবে, সামনে থাকবে বারান্দা আর খাবার খেতে নিচে যেতে হবে না।

—ইস্, পুরীতে হোটেলে ঘর পাওয়া অত সহজ কিনা! আগে থেকে ব্যবস্থা করনি, দ্যাখো সব ভর্তি কিনা! চল, স্বর্গদ্বারের দিকে যাই।

—তুমি আগে পুরীতে এসেছ বুঝি?

নন্দিনী দু'বার এসেছে পুরীতে এর আগে, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে। কিন্তু সে কথা অরূপকে বলে নি। সাধারণত হনিমুনের সময় সবাই নতুন কোনো জায়গাতে যায়। অরূপ আগে কখনো পুরীতে আসে নি, সে আসাম গেছে, দার্জিলিং গেছে, পাহাড়ী জায়গাতেই ঘুরেছে বেশী, টাইগার হিল থেকে এভারেস্টের চূড়ার এক টুকরো ও দেখেছে, কিন্তু কখনো সমুদ্র দেখেনি। সে-ই পুরীতে আসার কথা বলেছিল, নন্দিনী আপত্তি করে নি তখন।

একটার পর একটা হোটেল ঘুরেছে, কোনটাই ঠিক পছন্দ হয় না। অনেক হোটেলেই জায়গা নেই, যদিও জুন মাস তবুও বেশ ভিড়। শেষ পর্যন্ত একটা হোটেল মোটামুটি পছন্দ হল, সমুদ্রের দিকে ঘর আছে দোতলায়, বারান্দাও আছে কিন্তু বাথরুম নেই—বাথরুম সেই একতলায়। নন্দিনী তাতেই রাজী।

সাইকেল-রিকশাওয়ালাকে বিদায় করে, মালপত্র উঠিয়েই দরজা বন্ধ করল অরূপ, নন্দিনীকে জড়িয়ে ধরে বলল : আঃ, ছুটি, ছুটি, এখন সম্পূর্ণ ছুটি। শুধু তোমাতে আমাতে...আমার মিণ্টু সোনা, উ-ম্-ম্-ম্

—এই ছাড়ো, ছাড়ো! বাইরে থেকে দেখা যায়!

—ড্যাট্! কে দেখবে?

—দ্যাখো না জানালা দিয়ে—সমুদ্রে যারা স্নান করছে, তারা দেখতে পাবে।

—ওদের ওখানেই অনেক কিছু দেখার আছে। ওরা এদিকে তাকাবে না।

দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ হতেই অরূপ বিরক্তভাবে বলল : এক্ষুনি আবার কে জ্বালাতে এল?

বুড়ো ম্যানেজার। একটা লম্বা খাতা বাড়িয়ে দিয়ে বলল : নাম সই করাতে ভুলে গেছেন স্যার!

—এক্ষুনি করতে হবে বুঝি?

—তাই তো নিয়ম।

বুড়ো ম্যানেজার এবার অরূপের মুখের দিকে পূর্ণভাবে তাকিয়ে বলল : নমস্কার, নমস্কার। খবর-টবর সব ভালো তো? রতনবাবু কেমন আছেন!

অরূপ খানিকটা হকচকিয়ে বলল : রতনবাবু কে?

—সেই যে আপনার সঙ্গে এসেছিলেন, লাস্ট ইয়ারের আগের ইয়ারে। রতনবাবু আর সঙ্গে ওনার ইয়ে, ওয়াইফ ছিল—ভারী হাসি-খুশী মানুষটি।

এই ঘরটাতেই তো ছিলেন সেবার।

—আমি তো রতনবাবু বলে কারুকে চিনি না।

—তা হলে কি আমার নামটা ভুল হচ্ছে? আপনারা একই অফিসে কাজ করেন বলেছিলেন—আপনি এখনও মাহিন্দ্র অ্যান্ড মাহিন্দ্রতেই আছেন তো?

—আপনার ভুল হয়েছে। আমি কখনো আগে পুরীতে আসিই নি! মাহিন্দ্র অ্যান্ড মাহিন্দ্রতে আমি কখনো কাজও করিনি।

নন্দিনী সকৌতুকে তাকিয়ে ছিল অরূপের দিকে। বুড়ো ম্যানেজারের মুখে সারা জীবনের বিস্ময়। অস্ফুটভাবে বলল : আমারই ভুল হল তা হলে। আশ্চর্য মিল কিন্তু! তারপরই মুখের ভাব পাল্টে একমুখ হেসে উঠল : আচ্ছা, যখন যা দরকার হয় বলবেন। অবশ্য বাঙালীরা একবার কেউ এ হোটেলে এলে, তারপর যতবারই আসবে আমার হোটেল ছাড়া...

লোকটি চলে যেতেই দরজা ভেজিয়ে অরূপ বলল : লোকটা চমকে দিয়েছিল আমাকে। এমনভাবে তাকাচ্ছিল, যেন আমি মিথ্যা কথা বলছি। নন্দিনী বলল : আমার তো মনে হল, লোকটা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছে। যদি লেগে যায়!

—আগে আমাকে জিজ্ঞেস করবে তো! তা না, প্রথম থেকেই—দু'বছরে কত কত লোক এসেছে-গেছে। সবার নাম বুঝি ওদের মনে থাকে? চালাকি নাকি?

—তা কিন্তু অনেক সময় থাকে, জান! ছোটমামার সঙ্গে আমরা যে-বার এসেছিলাম, সেবার কিন্তু ছোটমামাকে দেখেই হোটেলের মালিক চিনতে পেরেছিল। দ্যাখো, হয়তো রতন নামে কেউ ওকে টাকা ফাঁকি দিয়ে গেছে, তার সঙ্গে তোমার চেহারা গুলিয়ে ফেলেছে।

—না, লোকটা তো আমাকে রতন বলে নি। বলেছে, রতন আর বউ ছিল সঙ্গে আর একজন লোক—সে-ই হচ্ছি আমি। যেমন বুদ্ধি, বউয়ের সঙ্গে এলে আবার সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ থাকে নাকি?

—যাক্ গে, আমার সুটকেসের চাবি দাও। আজ কোথায় স্নান করব।

—সমুদ্রে। সমুদ্রের কাছে এসে কেউ বাথরুমে চান করে। আমার এখনই সমুদ্রে নামতে ইচ্ছে করছে।

খুব ভাল সাঁতার জানে অরূপ। প্রথমবার সমুদ্রে নেমেও সে সমুদ্রকে ভয় পায় না। নুলিয়ার সাহায্য না নিয়েই সে বড় বড় ঢেউয়ের মাথায় সাবলীলভাবে লাফিয়ে ওঠে। ব্রেকারগুলো পেরিয়ে দূরে চলে যায়। নন্দিনী যদিও সাঁতার জানে, এর আগে দু'বার নেমেছে পুরীর সমুদ্রে, তবু তার ভয় কাটে নি। অরূপ তাকে বেশী দূরে নিয়ে যাবার জন্য হাত ধরে টানাটানি করলে সে ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—অরূপ তবু ছাড়তে চায় না—নন্দিনীর প্রবল বাধা সত্ত্বেও বড় ঢেউয়ের সামনে তাকে জোর করে জড়িয়ে ধরে থাকে। আশেপাশে কারা দেখছে, কি ভাবছে তা ওরা গ্রাহ্যও করে না। বিয়ের সাত মাস পরে, আজ প্রথম ওরা খোলা আকাশ ও বিশাল সমুদ্রের সামনে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে গেছে।

এতকলার ডাইনিং রুমে সবার সঙ্গে বসে খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না অরূপের। এ হোটেলটা নেবার সময় সেরকমই শর্ত করে নিয়েছিল যে, দোতলায় তাদের ঘরে খাবার পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু এই ধরনের হোটেলে কিছুতেই মনের মতন ব্যবহার পাওয়া যাবে না। ঘণ্টা দুই আড়াই সমুদ্রে স্নান করার পর দারুণ খিদে পায়, তারপর ঘরের মধ্যে খাবারের প্রতীক্ষায় বসে থাকতে অসহ্য লাগে। চাকরগুলো ডাকতে আসে না। অর্ডার নেবার অনেকক্ষণ পরে খাবার নিয়ে আসে, তাও সব ঠাণ্ডা। প্রথম দু'দিন এরকম হবার পর অরূপ রেগে উঠে বলে : এই জন্যই বলেছিলুম, কোন ভাল হোটেলে উঠব! চল, এখনই বদলে ফেলি!

নন্দিনী বলে : আহা, তার চেয়ে নিচে গিয়েই খেয়ে আসব। কি আর এমন কষ্ট। এখন আবার মালপত্র টানাটানি করে হোটেল বদলাতে হবে না। ঘরখানা তো ভাল।

এই দু'দিন ওরা বাইরের কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলে নি। সকাল থেকেই সমুদ্রে নেমেছে স্নান করতে। সারা দুপুর দরজা বন্ধ রেখেছে। বিকেলে একেবারে জলের ধার ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে অনেকখানি—সূর্য ডোবা দেখার পর আবার ফিরে এসেছে ঠিক এই পথে। সন্ধের পর থেকে বারান্দায় বসেছে শতরঞ্জি পেতে, তখন অরূপের

বুকে নন্দিনীর মাথা হেলানো, অরূপ হালকা আঙুলে বিলি কেটেছে ওর চুলে, আঙুল-গুলো কখনে নেমে এসেছে নিচে। একবারও মনে পড়ে নি কলকাতার কথা, কিংবা কলকাতায় যে ফিরতে হবে—সে কথা।

একতলার খাবার ঘরে খান ছয়েক টেবিল পাতা, ভিজে ভিজে আঁষটে গন্ধ। একটু বেশী বেলা করেই ওরা খেতে নামল, যখন বেশী লোক থাকবে না - তবু পাঁচ-ছ' জন লোক ছিল। লোকগুলো মাছমাংস থেকে মনোযোগ সরিয়ে প্যাট-প্যাট করে তাকাল নন্দিনীর দিকে। অরূপের এখনও এসব ব্যাপার গা-সহা হয় নি। তার গা-জ্বালা করে।

বুড়ো ম্যানেজার নিজের টেবিল ছেড়ে উঠে এসে অভ্যর্থনা করল ওদের : আসুন পরিতোষবাবু, আসুন, আজ বিরিয়ানি-মাংস হয়েছে স্পেশাল—

অরূপ নীরসভাবে বলল : আমার নাম পরিতোষ নয়। আমার নাম অরূপ সান্যাল, আপনার রেজিস্টারে নম লিখলাম সেদিন—

—সেবারে আপনারা আমার হোটেলের রান্নার খুব সুখ্যাতি করেছিলেন। রতনবাবু তো...

—আপনাকে তো আমি সেদিন বলেছি, রতনবাবু বলে কারুকে আমি চিনি না, আপনার হোটেলেও আমি আগে আসি নি।

—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেদিন বলেছিলেন। ঠিক, আমারই ভুল হয়েছে, আমি বোধহয়...

—আপনি দু'দিন আগের কথাই মনে রাখতে পারেন না আর দুবছর আগে কে এসে-ছিল না এসেছিল মনে রাখবেন কি করে?

অরূপের বিদ্রূপ গায়েই মাখল না ম্যানেজার। রেখাবহুল মুখখানাকে সামান্য বিনীত করে তুলে বলল : বুড়ো মানুষ ভুল হয়ে যায়। বসুন, মা জননী, আজ দই আনিয়েছি খুব ভাল, বর্ধমান থেকে আনানো।

অরূপ খেতে খুব ভালবাসে, কৃপণও নয় কিন্তু ম্যানেজারটিকে গোড়া থেকেই অপছন্দ করায় সে আজ বিরিয়ানি কিংবা দই—কোনটারই অর্ডার দিল না। বলল : ওসব কলকাতায় অনেক পাওয়া যায়, তার থেকে আর ভাল কি হবে? এখানে মাছ সস্তা, আমি শুধু আজ মাছের ঝোল আর ভাত খাব। নন্দিনী, তুমি কি নেবে?

নন্দিনী বলল : সমুদ্রের মাছ আমার বেশী সহ্য হয় না। আমি দই দিয়েই খাব ভাবছি।

বুড়ো ম্যানেজার নানান আদিখ্যেতার সঙ্গে নিজের হাতে পরিবেশন করল দই। নন্দিনীকে স্বীকার করতেই হল, দইটা সত্যি ভাল। এমন কি, এ হোটেলের সব রান্নাই ভাল। অরূপ মুখ গোঁজ করে খেয়ে গেল। খাওয়া শেষ হয়ে গেছে নন্দিনীর, তবু এঁটো হাতে গল্প শুনেতে হচ্ছে ম্যানেজারের - তার অবিরাম কথায় একবারও ছেদ পড়ে নি।

আজকাল অনেক হোটেলের ম্যানেজারই বেশ ভদ্র, ইংরেজি কায়দা-কানুনও জানে, জানে কখন নিজেকে উহ্য রাখতে হয়। এই হোটেলটি কিন্তু মোটামুটি বেশ বড় হলেও ম্যানেজারটি সেকালে ধরনের, কপালে ফোঁটা-তিলক, গলায় কণ্ঠী।

অরূপের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ম্যানেজার নন্দিনীকে বলল : আপনার কর্তাটি মনে হচ্ছে চটেছেন আমার ওপর। আমারই চোখের ভুল। এমন এক রকমের চেহারাও মানুষের হয়। সেবার রতনবাবুর সঙ্গে যিনি এসেছিলেন, তাঁর চেহারাটি অবিকল ওনার মতন। ওনারা তিনজনে মিলে এমন জমিয়ে দিয়েছেন যে সারা হোটেল একেবারে..

নন্দিনী জিজ্ঞেস করল : রতনবাবুও বুঝি নতুন বিয়ে করে এসেছিলেন?

ম্যানেজার আবার আড়চোখে তাকাল অরূপের দিকে। আমতা আমতা করে বলল : তা ইয়ে, নতুন বিয়ে কিনা জানি না, তবে তিনজনেই বড় আমুদে, একদিন তো হোটেলের সবাইকে নিয়ে গানের ফাংশান করলে। দশদিনের জন্য এসেছিল, থেকে গেল সতের দিন।

অরূপ মুখ তুলে বলল : রতনবাবু কি আপনার কাছে ধারটার রেখে গিয়েছিলেন নাকি? এত মনে আছে যখন...

ম্যানেজার স্থির চোখে তাকাল অরূপের দিকে। সামান্য একটু হাসল! তারপর বলল : আপনি ঠিক ধরেছেন। সে কিছু নয় অবশ্য, সামান্য টাকা যাবার সময় শর্ট পড়ে গেল, বলেছিলেন পাঠিয়ে দেবেন—তা ভুলে গেছেন বোধহয়। কতবড় অফিসার—

দোতলায় উঠে দরজা বন্ধ করে নন্দিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল অরূপের বুকে। অরূপ তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এল বিছানায়। পুরো দু-মিনিট ঠোঁট থেকে ঠোঁট উঠল না। তারপর নন্দিনীর ব্লাউজের বোতামে আঙুল রেখে বলল : বাবা, বুড়োটা বক্‌বক্‌ করতে করতে একেবারে মাথা ধরিয়ে দিয়েছিল। তোমারও ভদ্রতা এত বেশী—

—কি করব, উঠতে পারছিলুম না। তুমি কিন্তু ঠিক ধরেছ যে রতনের কাছে ওর টাকা পাওনা আছে। তুমি কি করে বুঝলে?

—না হলে আর অত মনে রাখে। কত লোক আসছে—

—তারাই বা কি রকম লোক। হোটেলে ধার রেখে গেছে, শোধ দেয় নি। বউয়ের সঙ্গে আবার একজন বন্ধু নিয়ে এসেছিল।

—যাক্‌ গে, বাদ দাও তাদের কথা।

—তোমার মতন অবিকল চেহারার একজন লোক আছে তা হলে। ভদ্রলোক অতবার বলছেন যখন—ধর, সেই লোকটার সঙ্গে যদি আমার কখনো দেখা হয়ে যায়? মনে কর, রাস্তায় দেখা হল, আমি তার দিকে চাইলুম—আর আমি ভাবব...

নন্দিনী খিলখিল করে হেসে উঠল। অরূপ বলল : ধুৎ! অবিকল এক রকম চেহারার আবার দুটো লোক হয় নাকি? ওসব সিনেমাটিনেমায়—বুড়োটা কি দেখতে কি দেখেছে।

—আচ্ছা, দ্যাখো তো, ঐ যে একটা দরজা রয়েছে। পাশের ঘরে যাবার, ওটা খোলা না বন্ধ?

অরূপ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে খাট ছেড়ে চলে গেল সেই দরজার কাছে। ঠেলে দেখল, সেটা বন্ধ ঠিকই কিন্তু ওপাশ থেকে। এপাশ থেকে বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা নেই।

অরূপ বিরক্তভাবে বলল : কোন মানে হয়? ও দরজা তো পাশের ঘর থেকে যে-কোন সময় খুলতে পারে। এরকম দরজা কেউ রাখে!

—কি কাণ্ড বল তো? আমাদের জিনিসপত্র চুরি যায় নি তো কিছু?

—জিনিসপত্র চুরি যাওয়া ছাড়াও যে-কোন সময় যে কেউ দরজা খুলে যা খুশী দেখতে পারে। আমি প্রথমেই বুঝেছি, এই ম্যানেজারটা দারুণ বদমাস। তুমিই তো ওর সঙ্গে গল্প করছিলে বসে বসে...

—বাঃ, গল্প করাটা দোষের নাকি? বলছিল, তোমার মতন চেহারার একজন লোকের কথা—সেইজন্য...

—দাঁড়াও, এক্ষুনি ডাকছি ম্যানেজারকে।

পাশের ঘরের লোকেরা সেদিন সকালেই চলে গেছে। ম্যানেজার এসে সব শুনে জিভ কেটে বলল : সেকি, স্বামী-স্ত্রীকে কখনো আমি আলগা ঘরে রাখতে পারি? আসুন, দেখবেন আসুন, যদি বিশ্বাস না হয়। ওটা আগে ছিল—যদি একসঙ্গে কেউ এসে পাশা-পাশি দুটো ঘর চায়—নিজে'দর মধ্যে। যাতায়াতের সুবিধের জন্য, রতনবাবুরা যেমন ছিলেন..

—ড্যাম ইওর রতনবাবু, পাশের ঘরের তালা খুলুন, দেখব। পাশের ঘর খুলে দেখা গেল, দরজাটা সত্যিই দৃঢ়ভাবে বন্ধ। আড়া-আড়ি লোহার পাটি দিয়ে ভালভাবে বন্ধ করা, মাকড়সার জাল দেখে মনে হয় অনেকদিন খোলা হয় নি।

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে নন্দিনী বলল : কোনারক যাবার কি ব্যবস্থা আছে, খোঁজ নেবে না? চল আজ খোঁজ নিয়ে আসি।

—বাস-ডিপোতে খোঁজ নিতে হবে। সে কি আর এখন বিকেলে খোলা থাকবে? কাল সকালে বরং...

—চলই না, বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে দেখে আসি, যদি খোলা থাকে।

—কিন্তু বাস-ডিপো তো এদিকে নয়, উল্টো দিকে।

—তুমি জান বুঝি কোথায়? কি করে জানলে?

—আসবার সময় আমাদের কলেজের মহীতোষবাবু সব বলে দিয়েছেন। উনি তো প্রত্যেক বছর পুরীতে আসেন—এখানে বাড়ি আছে। তুমিও তো আগে পুরীতে এসেছ,

তুমি চেন না? আগেরবার কোনারক যাও নি?

—না, প্রথমবার খুব ছোট ছিলাম, আমার তখন ন' বছর বয়েস—তখন কোনারক যাওয়া এত সহজ ছিল না। আর তিন বছর আগে যেবার এলাম—সেবার মামাবাড়ির সঙ্গে—আমাকে কোনারক নিয়ে যায় নি।

—ইস্ কি দুঃখের কথা! অবশ্য মামাদের সঙ্গে কোনারক দেখলে তেমন এনজয় করতেও পারতে না।

লজ্জায় নন্দিনীর মুখ ঈষৎ অরুণবর্ণ হয়ে গেল। নম্র গলায় বলল: ভাগ্যিস তখন দেখিনি! এবার আমরা দু'জনেই প্রথমবার একসঙ্গে দেখব। তুমি পুরীতে আসোনি, কিন্তু পুরীর অনেক কিছুই তুমি চেনো।

—পুরী সম্পর্কে কোন বাঙালীর কিছু জানতে বাকি আছে?

রাত্রে সিগারেট ফুরিয়ে গেছে অরূপের, কোন চাকরকে ডেকে পায় নি, নিজেই নিচে নেমে এসেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের জলে রূপোলি জ্যোৎস্নার খেলা দেখার সময় সিগারেট না থাকলে চলে না। নন্দিনীকে বারান্দাতেই দাঁড় করিয়ে নিচে এসেছিল অরূপ, আবার সে ম্যানেজারের খপ্পরে পড়ল। সিঁড়ির কাছাকাছি ম্যানেজার তার মুখোমুখি এসে বলল: আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল স্যার। আপনাকে একলা ঠিক পাওয়া যায় না।

—কি ব্যাপার, বলুন?

—মানে, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, আপনার ওয়াইফের সামনে ওভাবে কথাটা বলা।

—কোন্ কথা?

—আমার এখানে কত লোক আসে, খাতায় নামও সই করে—কিন্তু কার কোনটা আসল নাম কি নকল নাম—তা তো আমি জানতে যাচ্ছি না। আমার দরকারও নেই। আমার হোটেল চালানো নিয়ে কথা। সেবার যে আপনারা এসেছিলেন...

—আপনি আবার ভুল করছেন। আমি আগে কখনো আপনার হোটেলে আসি নি।

—আ-হা-হা! ও রকম একটু-আধটু হয়েই থাকে, অনেকেই ওরকম, আমি আপনার স্ত্রীর কাছে আর মুখ খুলছি না। কিন্তু বলছিলাম কি, রতনবাবু যে আমাকে...

—কি মুশকিল, বলছি যে আপনি অন্য কারুর সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলছেন! আমি রতনবাবু বলে সত্যিই কারুকে চিনি না, জীবনে কখনো...

—আমার অত ভুল হয় না।

—আপনার মতলবটা কি বলুন তো?

সিঁড়ির পাশে ঈষৎ অন্ধকারে দু'জন দু'জনের চোখের দিকে তীব্রভাবে তাকাল। ম্যানেজার চিবিয়ে চিবিয়ে বলল: আমার অত সহজে ভুল হয় না। সেবার আপনারা দু'জনে একটা বাজারের মেয়েছেলেকে এনেছিলেন, ক'দিন খুব ফুর্তি-ফার্তা করলেন, যাবার সময় আটত্রিশ টাকা কম—আপনি এই আংটি আমাকে দিয়ে যান নি?

—আংটি? আমি?

ম্যানেজার তার ফতুয়ার পকেট থেকে একটা আংটি বার করেছে। তুলে দিয়েছে অরূপের হাতে। সাধারণ একটা সোনার আংটি, সাধারণ একটা পাথর বসানো। অরূপ বিস্ময়ে একেবারে বিমূঢ়, তবু শক্ত হবার চেষ্টা করে বলল: আচ্ছা মুশকিল তে! কোনোদিন আমি আংটি পরি না! বলছি, আপনার ভুল হয়েছে—

—কেন গরীবের সঙ্গে নয়-ছয় করছেন! আমি কারুর ব্যাপারে মাথা গলাই না। ও আংটির দাম আপনার আটত্রিশ টাকার চেয়ে হয়তো বেশীই হবে—কিন্তু পরের দ্রব্য বিক্রি করতে আমার বাধে। নিজের হাতে ধারণ করেছিলুম, কিন্তু ও আপনার কি পাথর রয়েছে—আমার ভাগ্যে ঠিক সয় না।

—ও আংটি আমার নয়। আপনার যা খুশি করতে পারেন।

—আপনি আপনার আংটি ফেরত নিন। টাকা না হয় না-ই দেবেন। ও অপয়া আংটি আমি রাখব না।

—পরের আংটি আমি নেবো কেন? পুরুষের আংটি না হয়ে মেয়েদের আংটি হলেও

না হয় কিনে নিতাম।

—আপনি আংটি পরেন না বললেন স্যার, কিন্তু ঐ তো আপনার হাতে আর একটা আংটি রয়েছে।

—এটা আমার বিয়ের আংটি। কিন্তু তার আগে...

—সেবারও আপনিই বলেছিলেন, সেই মেয়েছেলেটি আপনার বউ—আমি রতনবাবুর নামে চাপিয়েছি—কিন্তু রতনবাবু ছিলেন আপনার শাগরেদ।

—কতবার বলব, আমি নয়, অন্য কেউ! এই নিন্ আপনার আংটি—

নন্দিনী তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বলল : এত দেরি করছ কেন তুমি আমাকে একা রেখে?

ম্যানেজারের হাতে দ্রুত আংটিটা গুঁজে দিয়ে অরূপ বলল : চল, যাচ্ছি। তারপর ম্যানেজারের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল : আপনি যা খুশী করতে পারেন। কাল সকালেই আমরা এ হোটেল ছেড়ে দেব!

ওপরে উঠে আসার পর নন্দিনী বলল . তুমি অত রেগে গিয়েছিলে কেন? আবার কি বলছিল?

—লোকটা যে কতবড় জোচ্চোর, এখন বুঝতে পারলুম। একটা পেতলের আংটি, তাতে দুটো পাথর বসানো, সেটা আমাকে জোর করে বিক্রি করার তালে ছিল। সেইজন্যই রতনবাবু আর বউ আর বন্ধুর গল্প ফেঁদেছে! রতনবাবুর বন্ধু নাকি ঐ আংটি জমা রেখে গিয়েছিল।

—লোকটা তো সত্যিই খুব পাজী!

—আমি তো গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছি। তুমিই শুধু পারো নি।

—আংটিটা তুমি হাতে নিয়ে দেখলে নকল?

—মনে তো তাই হল। শোন, কাল সকালেই আমরা ঐ হোটেল ছেড়ে যাব। এক কাজ করি, চল, আমরা কাল সকাল সাতটার বাসে কোনারক চলে যাই।

—সকাল সাতটায় বাস আছে বুঝি?

—হ্যাঁ। বাক্স-টাক্স সঙ্গেই নিয়ে যাব। কোনারকে যদি ভাল থাকার জায়গা পাই, সেখানেই থেকে যাব—নয়তো চলে যাব ভুবনেশ্বর। পুরী আমার আর ভাল লাগছে না।

নন্দিনী অরূপের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে বলল : সে-ই ভাল!

—তোমার সত্যিই আপত্তি নেই?

—না, তোমার যখন ভাল লাগল না—আমার তো পুরনো হয়ে গেছেই—

—আর একটু বারান্দায় বসবে না শোবে?

—এক কাজ করলে হয় না? কাল সকালে যখন চলে যাবই তখন আজ রাত্রে আর একবার সমুদ্রে বেড়াতে যাবে? অনেকেই তো বেড়ায় বেশী রাত পর্যন্ত।

—চল, তাই চল।

এখন বেলাভূমিতে আর মানুষ দেখা যায় না, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্জনও নয়। এখানে ওখানে বসে আছে কয়েকজন হাল্কা আলো-ছায়ার মধ্যে। দু'একজন ঘুরেও বেড়াচ্ছে দূরে দূরে। মাঝে মাঝে নিশ্চুপ বৃক্ষের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি পুলিস। পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন একটা তিথি—চাঁদ বেশ চকচকে, মাঝে মাঝে পাতলা মেঘ এসে তাকে ঢেকে দিয়েও একেবারে ম্লান করতে পারছে না।

ওরা দুজন নিঃশব্দে হাঁটছে সমুদ্রের পাড় ধরে। হু-হু করে বইছে জোলো হাওয়া, সমুদ্রের অনবরত শোঁ-শোঁ শব্দ, মাঝে মাঝে দেখা যায় দূরে ঢেউয়ের মাথায় জ্বলছে ফসফরাস। নন্দিনীর কোমর জড়িয়ে ধরে আছে অরূপ, একসময় ওর গালে গাল ঠেকিয়ে বলল : কি, ভাল লাগছে না?

নন্দিনী মৃদু স্বরে বলল : তুমি আমার কাছে একটা কথা গোপন করেছিলে কেন?

—কি গোপন করেছিলাম?

—তুমি কেন বলেছিলে, তুমি আগে সমুদ্র দেখ নি?

—সত্যিই তো দেখিনি। এই প্রথম।

—না, তুমি এখনও গোপন করছ। তুমি সমুদ্রে যে-ভাবে সাঁতার কাটো, বেশ অভ্যাস না থাকলে সে-রকম কেউ পারে না।

—আরে, আমরা হচ্ছি পূর্ব-বাঙলার ছেলে, জলের পোকা। মায়ের পেট থেকে পড়ে সবাই সাঁতার শেখে।

—পুকুর কিংবা নদীতে সাঁতার কাটা আর সমুদ্রে সাঁতার কাটা এক নয়। তুমি পুরীতেই এসেছ আগে, তুমি পুরীর সব কিছু চেনো। কেন, আমার কাছে লুকিয়েছিলে? আমি তো কিছু মনে করতুম না! ঐ ম্যানেজার যা বলছিল...

—আমি এখানে কোনদিন আসিনি, আসিনি, আসিনি! আমি কি করে বিশ্বাস করাব? তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী ভাবছ?

অরূপের গলাটা হাহাকারের মতন শোনাল। নন্দিনী তবু ঠান্ডাভাবে তাকিয়ে রইল। অরূপ নন্দিনীকে ছেড়ে দূরে সরে গেছে। একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল : আচ্ছা বেশ! তোমার কাছে গোপন কিছু থাকবে না। এই সমুদ্রের সামনে আর আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আমি শপথ নিয়ে বলছি, তোমার কাছে শুধু একটি কথা গোপন করেছিলাম। আমি নীলিমা বলে একটি মেয়েকে ভালবাসতুম আজ থেকে পাঁচবছর আগে, আমি তাকে বিয়ে করব বলেও কথা দিয়েছিলুম, কিন্তু শেষপর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছিলাম কাপুরুষের মতন। নীলিমার বিয়ে হয়েছে একটা খুব খারাপ লোকের সঙ্গে। নীলিমা খুব কষ্ট পায় —তার কথা ভেবে আমিও খুব কষ্ট পাই মাঝে মাঝে। এইটুকুই আমার গোপন। কিন্তু আমি সত্যিই কখনো সমুদ্র দেখিনি। কখনো পুরীতে আসিনি—আমি কখনো কোন বন্ধুর সঙ্গে মিলে অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে অসৎ কাজ করিনি। এটা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে। ঐ ম্যানেজারটা হয় ভুল করছে অথবা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে—নন্দিনী, তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে না? করবে না?

—থাক, আর বোল না। অনেক আগেই তোমাকে বিশ্বাস করেছি। অনেক আগে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অরূপ বলল : নন্দিনী, তোমার কোন গোপন কথা নেই? তুমি আমার কাছে লুকোও নি?

নন্দিনী সমুদ্রের দিকে চেয়ে অস্ফুটভাবে বলল : হ্যাঁ লুকিয়েছি। তোমাকে বলেছিলাম, তুমিই আমার জীবনে প্রথম পুরুষ। কিন্তু তা নয়, এই পুরীতেই তিন বৎসর আগে—একটি ছেলে, তার নাম মনে আছে হেমকান্তি—কিন্তু মুখ বেশ ভাল মনে পড়ে না—আমার ছোটমামার সঙ্গে কিরকম চেনা ছিল—তার সঙ্গে গোপনে দেখা করতাম—একদিন গিয়েছিলাম ঝাউবনে...তখন মনে হয়েছিল তাকে না পেলে আমি মরে যাব—কিন্তু কলকাতায় গিয়ে সে আর দেখা করে নি—হয়তো তাকে ভালবাসা বলে না—কিন্তু একটা অপরাধ বোধ...

জানি, আর বলতে হবে না। বিয়ের আগে সবারই ওরকম একটু-আধটু হয়—ওটা এমন কিছু না।

—তুমি সত্যি আমায় ক্ষমা করবে?

অরূপ দুটো পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে নিল। একটা নন্দিনীর হাতে দিয়ে বলল : এস, এই দুটো সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলি। এই সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা আগেকার সব স্মৃতি বিসর্জন দিয়ে দিই।

দুজনেই নুড়ি দুটো ছুঁড়ে দিল জলে। একটু পরই একটা বড় ঢেউ ওদের পায়ের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে নুড়ি দুটো ফেরত দিয়ে গেল।

ঈর্ষা

বিনয়েন্দ্র বললেন ঃ সব ঠিক হয়ে গেল। আজ অ্যাডভান্স জমা দিয়ে এলুম। বুঝলে!

অনিমা ড্রেসিং টেবিলের আয়না মুছছিলেন. বললেন ঃ জানালাগুলো রং করে দেবে তো? বারান্দার কোলাপসিবল গেটটাও ঢকঢক করে নড়ছিল!

—সব ঠিক করে দেবে। বাড়িওলা লোকটি ভালো। একতিরিশ তারিখে রোববার আছে, সেদিনই সিফট করবো। যতীনকে বলেছি দুটো লরি পাঠাতে।

বাবলু আর অদিতি দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওরা কৌতূহলে ছটফট করছে। বাবলু বললো : বাবা, ওখানে ফুটবল খেলার মাঠ আছে?

বিনয়েন্দ্র হাসলেন। বললেন : অত বড় মাঠ নেই, তবে ছোট একটা লন আছে। ইচ্ছে করলে ব্যাডমিন্টনের নেট ফেলতে পারবি।

—রাস্তার নাম কি বাবা?

—রত্নাকর সেন রোড। সিক্স রত্নাকর সেন রোড, মুখস্থ করে রাখো! পোস্ট অফিসে একটা চিঠি লিখে দিতে হবে।

বাবলু তাড়াতাড়ি ছুটে গেল পাশের ফ্ল্যাটে ওর বন্ধু সুজিতকে খবরটা জানাতে। অদিতি এসে দাঁড়ালো মায়ের পাশ ঘেঁষে। অনিমা বললেন : হ্যাঁ গো, ভাড়া সেই সাড়ে পাঁচশোই রইলো? এত টাকা ভাড়া দিয়ে কুলোতে পারবে তো? কমালো না?

—নাঃ! ভাড়া কি আজকাল কেউ কমায়? তবে পাড়াটা ভালো, ওদের ইস্কুল কাছে হলো। সামনের বছর অদিতি পাস করলে ওকে ব্রেবোনে ভর্তি করবো—তাও খুব দূরে হবে না।

—যাক, ভালোই হলো। এবাড়িটা আর আমার একটুও পছন্দ হচ্ছিল না। আশেপাশে যা হৈ-হট্টগোল দিনরাত!

অদিতি অনুযোগের সুরে বললো : বাড়ি ঠিক হয়ে গেল, আমরা এখনো দেখলুম না! যদি এর থেকে ভালো না হয়!

—এর চেয়ে ঢের ভালো। বাইরে থেকেও কত সুন্দর দেখতে, গোলাপি গোলাপি রঙ, সামনের লনে একটা ছোট ইউক্যালিপটাস গাছ আছে—কলকাতা শহরে কোন্ বাড়িতে তুই ইউক্যালিপটাস গাছ পাবি? ওটা একেবারে ঠিক আমাদের জানালার পাশে। একটা ছোট ঘর আছে—ওটা আমি ভেবে রেখেছি তোর জন্য একেবারে আলাদা। পড়াশুনোর সুবিধে হবে—সঙ্গে ছোট ব্যালকনি, অ্যাটাচড্ বাথরুম।

—বাথরুমে শাওয়ার আছে?

—হ্যাঁ, খুব মোটা জল পড়ে দেখে এলুম।

—কলিং বেল আছে?

—কলিং বেল কি বাড়িওলা দেয়। ওটা আমাদেরই গিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে। আজ বা কাল তোরা গিয়ে বাড়িটা দেখে আয় না। দেখিস, তোদের ঠিক পছন্দ হবে।

বাবলু গিয়ে সুজিতকে বললো : জানিস, আমরা সামনের মাস থেকে চলে যাচ্ছি। সব ঠিক হয়ে গেছে।

—কোথায় রে? অনেক দূরে?

—উহুঁ, বহুৎ দূর, বালিগঞ্জে যাচ্ছি।

—বালিগঞ্জ আবার দূর নাকি? এই তো পরশুদিন টুবলুমামার গাড়িতে ঘুরে এলুম বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ—একটা দোকানে আইসক্রীম খাওয়ালেন, দোকানটা কি ঠাণ্ডা। তোরা রোজ রোজ ঐ দোকানে আইসক্রীম খেতে পারবি।

—বাবা বলেছেন, আমাদের নতুন বাড়ির ঠিক পাশেই একটা আইসক্রীমের দোকান আছে। জানিস, আমি এই ইস্কুল ছেড়ে দেবো।

—ইস্কুল ছেড়ে দিবি? তারপর কী করবি?

—ওখানে ইংরিজি ইস্কুলে পড়বো। সেই ইস্কুলের বাস আছে। রোজ আমাদের বাড়ির সামনে বাস থামবে।

সুজিত একটুক্ষণ চিন্তা করলো, তারপর বললো : যাবার সময় তোরা ছাদ থেকে রেডিও'র এরিয়ালটা খুলে নিয়ে যাবি?

—হ্যাঁ,। এরিয়াল নিয়ে যাবো, জানালার পর্দা, নিয়ন লাইট সব নিয়ে যাবো।

সুজিত বললো : ভসোই হলো। তোদের এরিয়ালটার জন্য ছাদে ভালো করে ঘুড়ি ওড়াতে পারতুম না। এখন পুরো ছাদটা ফাঁকা পাবো। তোদের ফ্ল্যাটে যতদিন না অন্য

ভাড়াটে আসে ততদিন তো দোতলাটাই আমাদের—কী মজা হবে তখন! শান্তু, পিন্টু, শুভাদের ডেকে রোজ চোরচোর খেলবো।

বাবলু গম্ভীরভাবে জানালো : আমাদের নতুন বাড়িতে ব্যাডমিন্টন খেলা হবে।

সুজিতের দাদা ইন্দ্রজিৎ বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। সদ্য কলেজে ভর্তি হয়েছে ইন্দ্রজিৎ, এই কিছুদিন আগেও সে সিঁথি কেটে চুল আঁচড়াতো—এখন উল্টে আঁচড়ায় বলে মুখখানা একটু বদলে গেছে। স্বভাবও একটু বদলেছে তার—আগে সে যখন তখন বাবলুদের সঙ্গে ক্যারাম খেলতে বসতো—এখন আর খেলতে চায় না। সে গম্ভীরভাবে বললো : তোমাদের বাড়ি বদলানো ঠিক হয়ে গেল বাবলু?

—হ্যাঁ ইন্দ্রদা, খুব চমৎকার বাড়ি। বাবা বলেছেন...

—তোমাদের তো বদলানো দরকারই। তোমার বাবার কাছে কত লোক আসেন কিন্তু এখানে তোমাদের ভালো বসবার ঘর নেই...

—ওখানে আমাদের ছ'খানা ঘর, তার মধ্যে দুটো বসবার ঘর, বাবার একটা মা'র একটা।

—কবে যাচ্ছো তোমরা?

—এই তো একত্রিশ তারিখ রোববার—বাবা বলেছেন সকালবেলায় চলে যেতে হবে—চারখানা লরি আসবে—

—চারখানা লরি কিসে লাগবে?

—বাঃ, অ্যাত্ত জিনিস, আমি প্রথম লরিটায় ড্রাইভারের পাশে বসবো।

অনিমা বললেন : বাড়িটা তো ভালোই ঠিক হয়েছে। কিন্তু আপনাদের ছেড়ে চলে যাবো—ভাবতে এত খারাপ লাগছে—

সুজিতের মা রত্নপ্রভা বললেন : এমন কিছু তো দূরে নয়। বাসে চড়লেই দশ মিনিট। যাওয়া-আসা তো থাকবেই।

—আচ্ছা তা তো থাকবেই। তবু এখানে যেমন আপনজনের মতন পাশাপাশি ছিলুম শান্তিতে—কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না, এসব ছেড়ে নতুন জায়গায়—অবশ্য পাড়াটা ভালো—আশেপাশে কোন বস্তি নেই, সবই নতুন বাড়ি।

—আমার এক মাসতুতো ভাইও ঐ সি. আই. টি. রোডে বাড়ি করেছে। বলছিল যে সবই ভালো, শুধু বর্ষাকালে বড্ড জল জমে। আর মশা খুব। আমাদের এদিকটায় কিন্তু মশা নেই। তোমাদের ভাড়া কত পড়বে?

—ভাড়া? ইয়ে, সাড়ে ছ'শো ঠিক হয়েছে, গ্যারেজ নিলে পুরো সাতশো-ই পড়বে। ভাবছি আপিসের গাড়িটা এখন থেকে বাড়িতেই রাখবো।

—আমরাও ভাবছি যাদবপুরের জমিটায় এইবার একটা বাড়ি তোলা শুরু করবো। এখন ব্রীজ হয়ে গেছে তো—ওদিকটা এমন সুন্দর হয়েছে—ভাড়া বাড়িতে আর ভালো লাগে না। অজিত এবার কানপুরের ট্রেনিং শেষ করে ফিরবে—তখন আর কি এইসব বাড়িতে থাকতে চাইবে?

—তা ঠিক। নিজের বাড়ির তুলনায় কী আর ভাড়া বাড়ি! আমাকেও তো মা আর দাদারা বলছেন বাড়ি করো, বাড়ি করো! বাড়ি তো করাই যায়—কিন্তু ওর আপিস থেকে যে এতগুলো টাকা বাড়িভাড়া দেয়—নিজের বাড়ি হলে তো তা আর দেবে না। শুধু শুধু এতগুলো টাকা ছাড়ি কেন বলুন!

—তোমার কি ইয়ে অদিতির বাবার আর ক'বছর চাকরি আছে?

—এখনো সাত বছর। যাই, প্রেসার কুকারে মাংস চাপিয়ে এসেছি। দূরে চলে যাচ্ছি বলে ভুলে যাবেন না আমাদের রত্নাদি। বিপদে আপদে আপনাদের কাছে কত রকম সাহায্য পেয়েছি!

—আহা সাহায্য আবার কি? পাশাপাশি ছিলুম দু'বোনের মতন—দূরে চলে গেলেও তুমিও কি আমাদের ভুলতে পারবে?

ছাদে একটা ছোট্ট ঘর, সেটা ইন্দ্রজিতের দখল। একটা চেয়ার, একটা টেবিল আর একটা ছোট বুকশেলফ—এখানেই সে জানালার ধারে বসে পড়াশুনো করে আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখে পায়রাদের ওড়াউড়ি। আর তার নতুন শেখা সিগারেট খাওয়ার জন্যই সারা

বাড়িতে এই একটি মাত্র জায়গা। যখনই তার মন খারাপ হয়—আজকাল প্রায়ই হয়—সে এসে সেই ছাদের ঘরে জানালার পাশে বসে। এখান থেকে সে বহুদূর পর্যন্ত তাকিয়ে দেখতে পারে—তার আস্তে আস্তে মন ভালো হয়ে যায়। ইন্দ্রজিৎ সেই ঘরে বসে ছিল, পিছন দিক দিয়ে অদিতি এসে টপ করে টেবিলের উপর একটা বাটি রেখে বললো : এই নাও!

ইন্দ্রজিৎ মনোযোগ দিয়ে উপন্যাস পড়ছে, ঘাড় না ফিরিয়ে বললো ঃ কী?

—আচার। যা ঝাল হয়েছে না, আমরা কেউ খেতে পারছি না—তোমার খুব পছন্দ হবে।

—উঁহু, আমি এখন আচার খাবো না।

—কেন?

—আমি এইমাত্র সিগারেট খেয়েছি। এখন আচার খেলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে।

—ইস, এর মধ্যেই পাকা নেশাখোরের মতন কথা! রঞ্জিতদাকে বলে দেবো একদিন, তখন বুঝবে।

—বলতে হয় তো এখুনি বল, পরে তো আর সুযোগ পাবে না!

অদিতির কিশোরী মুখখানি এমন ঝকঝকে স্পষ্ট যে সমস্ত মনোভাবের তৎক্ষণাৎ ছায়া পড়ে। ছাদের সিঁড়িতে ওঠার সময় তার মুখ ছিল ঝাল লেগে বিব্রত, ঘরে ঢোকার পর কৌতুকের, এইমাত্র সে মুখে ম্লান ছায়া পড়লো। সে ইন্দ্রজিতের কাছে সরে এসে বললে : আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তুমি শুনেছো?

—হুঁ!

—তোমার বইটা এখন রাখো তো! আমার এখন মন খারাপ লাগছে—আর উনি বসে বসে বই পড়ছেন!!

—কেন, মন খারাপ লাগছে কেন?

—নতুন বাড়িতে যাবো শুনে বেশ আনন্দও হচ্ছে, আবার মন খারাপও লাগছে।

—মন খারাপ লাগছে কী জন্য?

—তুমি জানো না বুঝি?

—না তো। আমি কেমন করে জানবো—কি জন্য তোমার মন খারাপ!

—ঠিক আছে জানতেও হবে না। জানি তো, আমার কথা কেউ ভাবে না—

অদিতি সত্যিই রাগ করে চলে যাচ্ছিল, ইন্দ্রজিৎ দ্রুত উঠে গিয়ে তার হাত ধরলো। বললো : এই, রাগ করো না। শোনো, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে—

—না, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না—আমার সময় নেই!

ইন্দ্রজিৎ জোর করে ওকে টেনে চিলেকোঠার সিঁড়িতে বসালো। নিজেও বসলো পাশে। অদিতির কাচ হাতের আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে বললো : জানো অদিতি, তোমরা চলে যাবে শুনে প্রথমটায় আমারও মন খারাপ লাগছিল—এখন কিন্তু বেশ ভালো লাগছে।

—কেন, ভালো লাগছে কেন?

—আমি বিকেলবেলা কলেজ থেকে ফেরার পথে প্রত্যেকদিন তোমাদের বাড়িতে যাবো—

—সত্যি যাবে? না, মিথ্যে কথা, বিকেলবেলা তোমার কত বন্ধু-বান্ধব।

—না, না, সত্যিই। শোনো, বিকেলবেলা তো এ বাড়িতে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় না—মায়েরা তখন ছাদে আসেন, তা ছাড়া, দাদা তো আমাকে দেখলেই একটা না একটা কাজে পাঠাবে—তোমাদের বাড়িতে তো আর কোনো কাজ থাকবে না, আমরা তখন—

—আমরা বিকেলে ওখানে ব্যাডমিন্টন খেলবো।

—হ্যাঁ খেলবো, আর বাগানে বসে গল্প করবো। আমার প্রত্যেকটি বিকেলবেলা কেমন যেন মন খারাপ মন খারাপ লাগে, কলেজ থেকে বাড়ি আসতে ইচ্ছা করে না—এখন থেকে আমাদের নতুন বাড়িতে...

অদিতি আলতোভাবে ইন্দ্রজিতের আঙুলে চাপ দেয়। সে মনোভাব লুকোতে জানে না, খুশী ঝলমল চোখে বললো : বাড়ি বদলে তাহলে খুব ভালো হলো না? ভালো কি খারাপ, আমি এতক্ষণ বুঝতে পারছিলুম না।

—খুব ভালো হলো। মাঝে মাঝে আমরা আলাদা বেড়াতে যাবো। কি করে যাবো জানো? তোমার মাকে বলবো : মাসীমা, অদিতিকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি! আসলে কিন্তু আমাদের বাড়িতে আসবো না। আমরা আলাদা বেড়াবো—

—মা জানতে পারবেন না?

—উহুঃ! এমন কায়দা করে ম্যানেজ করবো—আমরা কখনো একসঙ্গে বেড়াইনি, দেখো কী ভালো লাগবে! তুমি লেকে গেছো কখনো? আমি তোমাকে লেক দেখাতে নিয়ে যাবো—

—যদি আমাদের কেউ রাস্তায় দেখে ফেলে?

—কেউ দেখবে না, আমি অনেক অচেনা অচেনা রাস্তা জানি।

আর পাঁচদিন বাদেই একতিরিশের রোববার। জিনিসপত্র গুছোনো, বাঁধাছাদা শুরু হয়ে গেছে। ইন্দ্রজিতের দাদা রঞ্জিত এসব কাজে খুব পাকা, সে ওদের সাহায্য করছে খুব। একটা পায়া ভাঙা টেবিল অনিমা রঞ্জিতকে দানই করে দিলেন। বাবলুর খুব ইচ্ছে আগে একবার গিয়ে নতুন বাড়িটা দেখে আসে। রোজই তাই নিয়ে বায়না ধরছে। বিনয়েন্দ্রের সময় নেই, অনিমা তাই বললেন : আচ্ছা তুই আর দিদি আজ বিকেলবেলা ঘুরে আয়। ইন্দ্রজিৎকে বল না তোদের সঙ্গে নিয়ে যাবে।

বাইরে বেরুবার সময় অদিতি আজকাল ফ্রক পরে না, একটা কালো রঙের সিল্কের শাড়িতে ওকে একটা ফুরফুরে দোয়েল পাখির মতন দেখাচ্ছে। বাবলু কিছুতেই মোজা পরতে চায় না, অদিতি ওকে জোর করে সু এবং মোজা পরিয়েছে। ইন্দ্রজিৎ পরেছে পায়জামা আর মুগার পাঞ্জাবি, তার চটি পরা পা দু'খানি তার মুখের মতনই ঝকঝকে পরিষ্কার। পথে বেরিয়ে অত্যন্ত দায়িত্বসম্পন্ন মানুষের মতন সে বাবলুর হাত ধরে রইলো, বাসে ওঠবার সময় সে সাবধানে বললো : লেডিজ, একদম রোখকে। পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে গম্ভীরভাবে টিকিট কাটলো। মাঝে মাঝে অদিতির সঙ্গে চোখা-চোখি হতে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইলো, বাবলু সঙ্গে আছে—তাই যে-সব কথা বলতে ইচ্ছে করছে তা সে বলতে পারছে না। একবার সে শুধু একটু ফিসফিস করে বলেছিল : তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে অদিতি, সত্যি।

অদিতি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, যাঃ।

ইন্দ্রজিৎকে কেউ বলে দেয়নি, তবু যেন সে মনে মনে কল্পনা করে রেখেছিলো—

অদিতিদের নতুন বাড়ি হবে একটা সুন্দর বাংলো ধরনের একতলা, আলাদা বাড়ি, সামনে থাকবে চমৎকার একটা বাগান, কেন জানি না সে ভেবেছিল, বাড়িটার রং হবে ধবধবে সাদা। বাগান পেরিয়ে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, আর কাছেই থাকবে বৈঠকখানা।

ঠিকানা মিলিয়ে এসে দেখলো, একটা লালচে রঙের দোতলা বাড়ি, সামনে একটু-খানি জমি আছে বটে, তাতে কয়েকটা এলোমেলো গাছ—কোনো বাগান নেই। বাড়ির দোতলায় বাড়িওয়ালা থাকে, একতলাটা শুধু অদিতিদের। দরজায় অন্যলোকের নাম লেখা পাথরের ট্যাবলেট লাগানো। গেটের কাছে এসে দাঁড়াতেই একটা বিশাল কুকুর ঘেউঘেউ করে ছুটে এলো। ইন্দ্রজিৎ কুকুরকে বিষম ভয় পায়, সে সঙ্কুচিত হয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালো।

একটু পরেই ভেতর থেকে একুশ-বাইশ বছরের একটি সুন্দর মতন ছেলে বেরিয়ে এলো, তার পরনে প্যান্ট ও তোয়ালে জামা, মাথায় ঝাঁকড়া—কোঁকড়া চুল। ছেলেটি বললো : কী চাই? ওরা কেউ কিছু বলার আগেই বাবলু বলে উঠলো : আমরা এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছি। আমরা বাড়ি দেখতে এসেছি! ছেলেটি বললো : ও আপনারা মিঃ সেনগুপ্তের ফ্যামিলি থেকে? আসুন!

ছেলেটি শক্ত হাতে কুকুরটার বগলস চেপে ধরে গেট খুললো। মাঠটা পেরুবার সময় বললো : আপনারা তিন ভাই বোন?

ইন্দ্রজিৎ বললো : না, না...
অদিতি বললো : উনি আমার দাদা নন্।
ইন্দ্রজিৎ বললো : ওদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকি! সঙ্গে এসেছি!
ছেলেটি বললো : ও, নমস্কার। আমার নাম সিদ্ধার্থ মজুমদার।
ইন্দ্রজিৎ বললো : নমস্কার। আমার নাম ইন্দ্রজিৎ রায়চৌধুরী। ওর নাম অদিতি, আর এর নাম বাবলু, ভালো নাম দেবকুমার।

একতলায় সাড়ে তিনখানা ঘর অদিতিদের, নতুন বাড়ি—তাই ঘরগুলো বেশ পরিষ্কার, বাথরুমটা বেশ বড়োসড়ো, রান্নাঘরে গ্যাসের কনেকশান আছে। সিদ্ধার্থ ওদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো। সিঁড়ির পাশের ঘরটাও ওরা ভেবেছিল অদিতিদের, কিন্তু সেই ঘরের দরজা খুলে সিদ্ধার্থ বললো : এইটে আমার পড়ার ঘর। আসুন, একটু বসবেন। চা খাবেন তো? আপনি নিশ্চয়ই খাবেন? আর আপনি? দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হলো অদিতিকে, সে উত্তর দেবার আগেই বাবলু বললো : আমিও চা খাবো।

অদিতিকে এর আগে কোনো ছেলে আপনি বলে কথা বলে নি, সে লাজুকভাবে ঘাড় হেলালো শুধু। সিদ্ধার্থ বললো : বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।

বেশ ছিমছাম সাজানো ঘর। রেক্সিন মোড়া বড় টেবিল, বইয়ের র‍্যাকে অনেক বই—বেশীর ভাগই ইংরেজী। দেয়ালে ব্র্যাডম্যান, ফ্র্যাংক ওরেল, ডব্লু জি. গ্রেস ইত্যাদির বাঁধানো ছবি। চাকর এসে চা দিয়ে গেল। ইন্দ্রজিৎ ছবিগুলো দেখছিল তাই সিদ্ধার্থ বললো : আমি কলেজের ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন। আপনার কোন্ কলেজ? আমার সেন্ট জেভিয়ার্স। থার্ড ইয়ার।

ইন্দ্রজিৎ বললো : আমি আশুতোষে পড়ি।
—ও। কোন ইয়ার?
—ফার্স্ট ইয়ার।

দুনিয়ার সমস্ত থার্ড ইয়ারের ছেলে সমস্ত ফার্স্ট ইয়ারের বালকদের দিকে যে রকম কৃপার দৃষ্টিতে তাকায়, সিদ্ধার্থ সেইরকম সুক্ষ্মভাবে তাকিয়ে বললো : আপনাদের আশুতোষে স্পোর্টসের ব্যাপারে বোধহয় তেমন এনকারেজমেন্ট নেই। ওখানে তো ইউনিয়ন নিয়েই সবসময় গণ্ডগোল লেগে আছে—

ইন্দ্রজিৎ বিরতভাবে বললো : আমি ও সবের মধ্যে থাকি না। বাড়ির কাছে বলেই আমি আশুতোষে ভর্তি হয়েছি, ইচ্ছে করলে প্রেসিডেন্সিতেও আমি ভর্তি হতে পারতুম। আমিও ফার্স্ট ডিভিশান পেয়েছিলুম।

কথাটা বলেই ইন্দ্রজিৎ লজ্জা পেল। ছি, ছি, ফার্স্ট ডিভিশনের কথাটা নিজের মুখে বলা তার উচিত হয় নি। অদিতি চকিতে একবার ওর দিকে তাকালো। সিদ্ধার্থ খুব ভদ্র, সে ওর লজ্জা ঢাকা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি বললো : না, সব কলেজেই পড়াশুনো প্রায় এক। বাড়ির কাছে কলেজই ভালো। আননেসেসারিলি বাস জার্নির অরডিয়েল ভোগ করতে হয় না। আর, আপনি কোন্ কলেজে?

এবার অদিতির লজ্জা পাবার পালা, সে টেবিলে আঙুল দিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে বললো : আমি কলেজে পড়ি না। আমার ক্লাস ইলেভেন।

বাবলু বললো : আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি। আচ্ছা এ বাড়ির ছাদ আছে?
—হ্যাঁ আছে, ঐ সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠে যাও। যাও না, কোনো ভয় নেই, আমি কুকুর বেঁধে রেখেছি।

অদিতি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো : কুকুরটার নাম কি?
—জুলি। আপনি কুকুর খুব ভালোবাসেন?
—হ্যাঁ।
—ঐ কুকুরটাকে নিয়েই আমার বেশী সময় কাটে। বাড়ি তো ফাঁকা—মা, বাবা আর আমি। আমার বাবা টেনান্ট নেবার ব্যাপারে খুব সিলেকটিভ। পছন্দ না হলে নেন না, তিনমাস আমাদের ঐ অ্যাপার্টমেন্ট খালি পড়ে আছে। আপনারা এলে আবার বাড়িটা বেশ জমজমাট হবে।

বেশী দেরি করলে বাড়িতে চিন্তা করবেন, তাই ইন্দ্রজিৎ একবার ওঠার কথা বললো। বাবলুকে ডেকে আনা হল। ঢোকার সময় নজর করে নি, এবার ওরা লক্ষ্য করলো সামনের জমিটায় একটা ছিপছিপে সাদা রঙের গাছ। ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞেস করলো : এইটা ইউক্যালিপটাস, না?

—হ্যাঁ। আমাদের মধুপুরের বাড়িতে অনেক ইউক্যালিপটাস আছে। এখানে তিনটে লাগানো হয়েছিল, মাত্র ঐ একটাই বেঁচেছে।

—এর পাতাগুলোর গন্ধ এমন সুন্দর হয়!

বাবলু বললো : ইন্দ্রদা, আমায় দুটো পাতা পেড়ে দাও না।

ইন্দ্রজিৎ বললো : না, এখন না. এ বাড়িতে তো থাকবেই, মাটিতে অনেক শুকনো পাতা পাবে—শুকনো পাতাতেও গন্ধ হয়।

—না, এখন দাও।

নিচে একটাও শুকনো পাতা পড়ে নেই। ইন্দ্রজিৎ এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজছিল। সিঁড়িতে দাঁড়ানো সিদ্ধার্থ বললো : হ্যাঁ, হ্যাঁ নিন না কয়েকটা পাতা। গন্ধটা ভালো লাগবে।

হাতের নাগালে একটাও পাতা নেই। সাদা রঙের গুঁড়িটা সোজা উঠে গেছে। একটু উঁচুতে কচি কচি চিকন পাতা। ইন্দ্রজিৎ গোড়ালির ওপর ভর দিয়েও পাতা ছুঁতে পারলো না। তখন একটু ছোট লাফ দিয়ে ধরার চেষ্টা করলো, তাও হাত যায় না। বাবলু সোৎসাহে বলছে : ইন্দ্রদা. আরও জোরে লাফাও, আর একটু। ইন্দ্রজিৎ আরও জোরে লাফালো, তবু হাত যায় না, আরও জোরে লাফাতেই পকেট থেকে মানিব্যাগ, কলম ছিটকে পড়ে গেল। সে সেগুলো নিচু হয়ে তুলতে যেতেই সিদ্ধার্থ বললো : দাঁড়ান, আমি পেড়ে দিচ্ছি।

সিদ্ধার্থ সাবলীলভাবে একটি মাত্র লাফ দিয়ে একটা ছোট ডাল ধরে ফেললো। কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে এনে, দুটো দিল বাবলুকে, বাকিগুলো হাতের তালুতে মুড়ে কচলাবার পর বললো : এবার দেখুন কী সুন্দর গন্ধ! অদিতি মুখ নিচু করে বড় শ্বাস টেনে বললোঃ আঃ, কি সুন্দর কাঁচ কাঁচ গন্ধ! আঃ—অদিতি নিজের থেকেই নাকটা কাছে এনে সিদ্ধার্থের হাতে ছুঁইয়ে বললো : কী চমৎকার লাগছে না গন্ধটা, ইন্দ্রদা, দেখুন!

ইন্দ্রজিৎ নিজের নাকটা নিয়ে এলো সিদ্ধার্থের হাতের দিকে। কিন্তু দমবন্ধ করে রইলো। নিঃশ্বাসে সে ঘ্রাণ নিলো না।

বাইরে বেরিয়ে বাবলু অবিরাম বকবক করছিলো, আর অদিতি একবার জিজ্ঞেস করলো : ইন্দ্রদা অ্যাপার্টমেন্ট মানে কি?

—ভাড়া দেয়ার ফ্ল্যাটকেই কায়দা করে অ্যাপার্টমেন্ট বলছিল।

—ওঁর ইংরিজি উচ্চারণ ভারী চমৎকার না? কী রকম সুন্দরভাবে বলছিলেন!

কথা ছিল ইন্দ্রজিৎ আর রঞ্জিত মালপত্র নিয়ে ওদের সংগেই যাবে। কিন্তু শনিবার দিন বেশী রাত্রে বাড়ি ফিরে ইন্দ্রজিৎ মা'কে বললো : মা, কাল আমায় খুব ভোরে ডেকে দেবে। আমাদের কলেজের পিকনিক আছে।

রত্নপ্রভা বললেন : সে কি রে? কাল ওরা বাড়ি পাল্টাচ্ছে, তুই ওদের সঙ্গে যাবি না?

—না, উপায় নেই। কলেজের প্রফেসাররা সব যাচ্ছেন—আমাকে যেতেই হবে। ডেকে দিও, ঠিক।

ইন্দ্রজিৎ পাশের ঘরে যেতেই রত্নপ্রভা স্বামীকে বললেন : ও পাশের গিন্নী মিষ্টি কথা বলে ছেলে দুটাকে একেবারে চাকরের মতন খাটাচ্ছে। আমি পরের ছেলেকে ওরকমভাবে খাটাতে পারতুম না।

ইন্দ্রজিৎকে ডাকতেও হয় নি, সারারাত বুঝি সে জেগেই ছিল। খুব ভোরে, তখন আলো ফোটেনি, কারুকে কিছু না বলে হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় বদলে সে বেরিয়ে পড়লো। হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদহ স্টেশনে এসে শুনলো ফার্স্ট ট্রেন ছাড়বে ক্যানিং-এর দিকে। ক্যানিং-এর টিকিট কেটে সে উঠে পড়লো। এই প্রথম সে একা একা ট্রেনে যাচ্ছে,

কিন্তু তার একটুও ভয় করছে না। জানালার ধারে মাথা রেখে সে ভোরের টাটকা হাওয়া বুক ভরে নিতে লাগলো।

খানিকটা বাদেই দেখলো একটা স্টেশনের নাম চম্পাহাটি। হঠাৎ সেখানেই নেমে পড়লো ইন্দ্রজিৎ। প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে চা আর এস বিস্কুট খেল। তারপর স্টেশন ছেড়ে, পুকুরপাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাজারে এসে পৌঁছুলো। বাজার পেরিয়েই সোজা রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে সে দেখলো একটা কচুরিপানা ভরতি খাল। খালের উঁচু পাড় ধরে ইন্দ্রজিৎ আপন মনে হাঁটতে লাগলো। পাশে দু'একখানা নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে—তারপর ফাঁকা মাঠ। একটা ফণিমনসার গাছে দুটো প্রজাপতি ছুঁই ছুঁই খেলার মতন একবার করে বসছে আর উড়ে যাচ্ছে, বসছে আর উড়ে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে ইন্দ্রজিৎ আপন মনে বললো : সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ পড়লেই ভালো ইংরেজি জানা হয় না। আমিও ইংরেজিতে সিক্সটি সিক্স পারসেন্ট নম্বর পেয়েছিলুম। অমন কথায় কথায় কায়দা করে ইংরেজি বলা পছন্দ করি না! বুঝলে?

খালের পাড় ধরেই ইন্দ্রজিৎ হাঁটতে লাগলো। ভোরের ঠান্ডা হাওয়ায় তার এত ভালো লাগছিল যে সে ঠিক করলো সারাদিন ঐ মাঠের মধ্যেই থাকবে। একটু বাদে সে আপন খেয়ালে দৌড়তে লাগলো। যেন সে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঐ খালটা কোথায় শেষ হয়েছে--তাই দেখবে। বেশ কিছুক্ষণ দৌড়বার পর সে হাঁপিয়ে গিয়ে একজায়গায় বসলো। তখনো বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নিচ্ছে। খালের জলে অল্প স্রোতে কচুরিপানাগুলো ভেসে যাচ্ছে। কয়েকটা মাটির ডেলা কুড়িয়ে নিয়ে টুপটুপ করে জলে ছুঁড়তে লাগলো। এবার আমি ঐ ফুলটায় লাগাবো, ঐ যে ঐটা।

ঠিক টিপ মতন একজায়গায় ঢিল লাগাবার পর ইন্দ্রজিৎ মনে মনে বললো : সবাই উঁচু দিকে লাফাতে পারে না। আমি হাইজাম্পে পারবো না। কিন্তু আমার সংগে রানে রেস দিয়ে কেউ পারবে? আসুক দেখি! আমি সামনে ছুটে যাবার প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হবো?

মুখাগ্নি

বাবা বললেন : দ্যাখ্‌তো, কে যেন একজন মেয়েলোক ঘরের মধ্যে দিয়ে ওদিকে চলে গেল! সুবিমল টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ওষুধ ঢালছিল, বললো. কই, কেউ না তো! নিন্, আপনি ওষুধটা খেয়ে নিন্!

এত দুর্বল যে বিছানা থেকে হাতটা পর্যন্ত তুলতে পারছেন না বাবা। তিন চারদিন দাড়ি কামানো হয় নি, কুচো কুচো পাকা দাড়িতে মানুষের মুখ এমনিতেই অসহায় দেখায়, শুধু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। বললেন : হ্যাঁ, তুই দেখ না ঐ বারান্দাটায়। একজন লালপাড় শাড়ি-পরা মেয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। কি যেন বলতে চাইছিল, বোধহয় লজ্জা পেয়ে ওদিকে চলে গেল। দেখে আয় না, কি চায়?

সুবিমল বারান্দায় এসে নিচে উঁকি দিল। বাড়ির রকে গামছা পেতে দুজন মজুর-শ্রেণীর লোক ঘুমোচ্ছে। ডাস্টবিন উপছে-পড়া ময়লার মধ্যে একটা মরা বেড়াল ছানা। হা-হা করছে রোদ। কোথায় মেয়ে? পকেট থেকে দেশলাইটা বার করে দেশলাইয়ের পেছন দিকটায় একটা কাঠি গুঁজে দিল। পকেটে দেশলাইটা বাবার সামনেও খচখচে আওয়াজ করছিল। ঘরে ঢুকে বললো : হ্যাঁ, তপনের মা জানতে এসেছেন যে, বার্লি-টার্লি তৈরী করে দিতে হবে কিনা।

—তপনের মা, দেখলুম যে অল্প বয়েসী মেয়ে!

—ভুল দেখেছেন। তপনের মা এখনো দাঁড়িয়ে আছেন। কি বলবো?

—বার্লি-টার্লি আমি খাবো না! একটু মাগুর মাছের ঝোল যদি...বেশ কাঁচকলা আর জিরে বাটা দিয়ে...

—মাগুর মাছ এখন কোথায় পাবো? আচ্ছা, কাল দেখবো'খন যদি জোগাড় করতে

পারি। আপনি এখন ঘুমোন।

—উনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে! ওঁকে তবে বল—

—আমি আমাদের বারান্দার দরজা খুলে দিচ্ছি। এপাশ দিয়েই ওঁদের ছাদে চলে যাবেন। চাবিটা কোথায়? ড্রয়ারে আছে?

ড্রয়ার থেকে চাবিটা বার করে ফের বারান্দায় এসে সশব্দে দরজাটা খুললো সুবিমল। এ দরজা দিয়ে পাশের পাঁচ নম্বর বাড়ির ছাদে যাওয়া যায়। কোনো একসময় এ দুটো বাড়িই বোধহয় একই লোকের ছিল। সুবিমল শূন্য দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বললো : না মাসীমা, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। কিছু দরকার হলে আমি নিজেই চাইবো, তা ছাড়া দিদি এসে পড়বে আজ-কালের মধ্যেই।

পাঁচ নম্বর বাড়ির ছাদে অনেকগুলি ফুলের টব। তার ভর্তি সায়া আর ব্লাউজ শুকোচ্ছে। চোরের মত টপ করে ও বাড়ির ছাদে এসে সুবিমল দুটো কাঁচ গোলাপ ফুল ছিঁড়ে নিলো। ছেঁড়া মাত্রই তার অনুতাপ হলো একটু, কি হবে ফুল দিয়ে! শুধু পরের জিনিস নষ্ট করা। ফুল দুটো টবের ওপরেই ফেলে দিল। একবার সতর্কভাবে ছাদের দরজার দিকে তাকিয়ে সুবিমল আলতোভাবে তারে শুকোতে দেওয়া জিনিসগুলোর ওপর হাত বুলোতে লাগলো। এই লাল রঙের সায়াটা কার? এত টকটকে রঙের সায়া নিশ্চয়ই মা-মাসীর বয়েসীরা পরে না। এটা নীলা বৌদির হতে পারে। সায়াটা চেপে ধরে মাঝখানের জায়গায় একটা চুমু খেয়ে সুবিমল ফিরে এলো বারান্দায়। দরজায় তালা এঁটে দিল। কতদিন নীলা বৌদির সঙ্গে দেখা হয় না!

দরজার দিকেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে ছিলেন বাবা। চোখ ভর্তি ত্রাস। প্রায় ফিস-ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন : এতক্ষণ কি করছিলি ওখানে? সত্যি কে এসেছিল বলতো?

—বললুম তো, তপনের মা।

—কিন্তু আমি যে স্পষ্ট দেখলুম একজন কমবয়েসী মেয়ে। লাল পাড় শাড়ি পরা—

সুবিমল একটু একটু অধৈর্য হয়ে উঠছিল। ইচ্ছে করছিল 'দূর ছাই!' বলে উঠতে। তবু সামলে নিয়ে গলার স্বর নরম করে বললো : তপনের মারই তো লাল পাড় শাড়ি পরা ছিল। আপনি তো মুখ দেখেন নি!

—এলো কি করে এ ঘরে?

—উনি তো নিচের নতুন ভাড়াটেদের ঘরে প্রায়ই আসেন। ওখান থেকেই বোধহয় খবর শুনে একবার দেখতে এসেছিলেন।

বাবার চোখ দুটো এবার সজল। বললেন : তপনের মা-কে খুব ভালোবাসতেন।

—আপনি এবার ঘুমিয়ে পড়ুন।

—আমার আর ঘুম আসবে না এ জন্মে—আঃ।

হঠাৎ বাবা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন বাচ্চা ছেলের মতন। সুবিমল দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে তারপর কাছে এসে বললো : এ কি, কি হলো! এরকম করলে অসুখ—আরো—

বাবা কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলেন না। তারপর আপন মনেই বললেন : তোকে কষ্ট দিচ্ছি! কিছুই করে যেতে পারলাম না তোদের জন্যে—

—আমার আর কি কষ্ট! আপনি এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন না। অন্তত চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে থাকলেও ভালো।

—করুণাকে আসতে লিখেছিস বুঝি?

—হ্যাঁ, জামাইবাবুকে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। ছুটি পেলে আজ বা কালই আসবে।

—কেন আসতে লিখলি? আমার কি এমন হয়েছে?

—তা নয়। তবু বাড়িতে কোনো মেয়েছেলে না থাকলে—অসুখের সময়, আমি কি একা সব পারি?

—নগেন ছুটি পায় না। গত মাসেও একবার এসেছিল, এখন আবার কি করে আসবে?

—সুবিধে হলে তবেই আসবে, জোর করে তো আসতে বলিনি। দিদিকে একাও পাঠিয়ে দিতে পারে। দিদি কাছে থাকলে আপনারও ভালো লাগবে!

—আমার আর কিছুতে ভালো লাগবে না।

ছোটভাই ঝন্টু ইস্কুল থেকে ফিরলে ওকে বাবার ঘরে বসিয়ে সুবিমল বেরিয়ে পড়ে। বাড়ির সামনে রাস্তায় ছেলেরা তিন নম্বর বল নিয়ে পেটাপিটি করছে, ঝন্টু বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। ওর বেরুবার উপায় নেই। ঝন্টুর ওপর এখন অনেক দায়িত্ব, ঠিকে ঝি এসে বাসন মেজে দিয়ে যাবে—তার একটু চুরির স্বভাব আছে, ঝন্টুকে নজর রাখতে হবে, দরকার হলে বাবার বিছানায় ও বেড প্যান এনে দেবে, এমন কি খুব বুক ধড়ফড় করলে কোরামিন দিতেও জানে ঝন্টু। সারা দুপুর সে যখন ইস্কুলে, তখন দাদাকে বাড়িতে থাকতে হয়, দাদার কষ্ট সে বোঝে। সুতরাং খেলাধুলো ছেড়েও ঘরে বসে থাকতে সে আপত্তি করে না।

হাঁটতে হাঁটতে সুবিমল ডাক্তারখানায় এলো। ডাক্তারকে সুবিমল কল্যাণদা বলে, ইস্কুলে দু'ক্লাস উঁচুতে পড়তেন কল্যাণদা, তা ছাড়া বাবার ছাত্র ছিলেন। এক সময় বাবা কল্যাণদার প্রাইভেট টিউটরও ছিলেন। অল্প বয়সেই বেশ পসার হয়েছে কল্যাণ মজুমদারের, ওঁর বাবাও ডাক্তার ছিলেন তো। ঘর ভর্তি লোক, এর মধ্যে দু' একজন রোগী নয়, তারা কাগজ পড়তে এসেছে। এত লোকের মধ্যেও সুবিমলকে দেখতে পেয়ে ব্যগ্র হয়ে কল্যাণদা জিজ্ঞেস করলেন: কী, স্যার কেমন আছেন আজ?

একজন বুড়ো মতন লোকও জিজ্ঞেস করলো: ধীরেনবাবুর অসুখ বুঝি? তাই মাসখানেক ধরে বাজার করার সময় ওঁর সঙ্গে দেখা হয় না। কী অসুখ?

কল্যাণদা সুবিমলকে চোখের ইশারা করে বসতে বলেন। বসতে অর্থাৎ অপেক্ষা করতে। পসার জমে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেশ মোটা হতে শুরু করেছেন কল্যাণ মজুমদার। মাথার সামনে সামান্য টাক পড়েছে। তবু, জামার হাতা গোটালে বেশ স্মার্ট দেখায়। কয়েকজন রোগীকে বিদায় করে হাঁপ ছাড়ার ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালেন, সুবিমলকেও একটা দিলেন। তারপর বললেন: আমার মনে হয় কোনো স্পেশালিস্ট দেখানো উচিত এবার। আমার যতটুকু বিদ্যে, তা দিয়ে যদ্দুর সম্ভব চেষ্টা করে তো দেখলাম!

সুবিমল বললো: এমনিতে তো ভালোই আছেন। ট্রাবলটা কোথায়?

—হার্টটা অসম্ভব দুর্বল। পেচ্ছাব অত কম হওয়াও ভালো লক্ষণ নয়। আমি ভয় পাচ্ছি, সুবিমল।

—ভয় পাচ্ছেন? সে রকম কিছু কি—

—হার্টের যা অবস্থা, যে-কোনো দিনই একটা কিছু হয়ে যেতে পারে। একজন স্পেশালিস্টকেই দেখাও। পি, জি'র ডাঃ আর, এন, বাসু আছেন—আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

—স্পেশালিস্ট ডাকবো, তার টাকা কোথায়?

—তা বললে কি চলে? বাঁচবার সব রকম চেষ্টা তো করতে হবে!

—দু'মাস ধরে বেকার। বাড়িতে কারুর একটি পয়সা রোজগার নেই! কল্যাণদা, আপনি এ সব কথা বুঝবেন না—

—স্যার রিটায়ার করবার পর ইস্কুল থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা-পয়সা কিছু পান নি?

—কি জানি। পেয়েছিলেন বোধ হয়, বাড়িতে তো এখন কোনো টাকাকড়ি দেখছি না!

—আমার কি মনে হয় জানো! কোনো একটা ব্যাপারের জন্য তোমার বাবা সব সময় কষ্ট পাচ্ছেন। অসুখের কষ্ট ছাড়াও, এইটাতেই বেশী ক্ষতি হচ্ছে। সেদিন আমায় বলছিলেন, আমি এমন অন্যায় করেছি যে শুনলে আমায় সবাই ঘেন্না করবে! আমার মরাই ভালো!—কী ব্যাপার, তুমি জানো কিছু?

উঁহু! এখন আবার একটা অন্য উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ভূত দেখছেন যখন তখন। আজ দুপুরেই তো—

টাইটা আলগা করে গলায় হাত বুলোতে বুলোতে কল্যাণদাকে খুবই চিন্তিত মনে

হয়। ভূতপূর্ব শিক্ষকের জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা বেশ আন্তরিক! সুবিমলকে কিন্তু তেমন চিন্তিত দেখায় না। বেশ গাঢ় করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মনে হয় একটা তামাকের টুকরো তার জিভের সঙ্গে চলে গিয়ে পুরো মুখটাই তেতো হয়ে গেছে। অনুমতি না নিয়েই সে ডাক্তারের প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট নিয়ে ধরায়। তারপর বলে : আমার আর ভালো লাগছে না!

কল্যাণদা একটু অসহিষ্ণু মুখ করে বললেন : পরেশবাবুকে আমি তোমার চাকরির জন্য বলে রেখেছি। সামনের মাসেই হয়ে যাবে বোধ হয়। এবার আর ইউনিয়ন-টিউনিয়ন করো না! করুণাদি আসছেন নাকি?

—হ্যাঁ, দিদি কালকের মধ্যেই এসে যাবে বোধ হয়।

—বাড়িতে কোনো মেয়ে না থাকলে কি আর অসুখের সেবা হয়? তুমি আর একলা কতদূর করবে? তুমি এই গ্লুকোজের ফাইলগুলো নিয়ে যাও—আমি স্যাম্পল হিসাবে পেয়েছিলুম, এর দাম লাগে নি। ওষুধ-টষুধ সব আছে তো?

সুবিমল উঠে দাঁড়ায়। অন্য অনেক শাঁসালো রুগী বসে আছে, বিনা পয়সার খদ্দের সুবিমলের সঙ্গে আরও বেশীক্ষণ কথা বললে কল্যাণদার মুখে এরপর তেলতেলে ধবনের দাগ ফুটে উঠবে। দরজার কাছে গিয়েও আবার ফিরে এসে অদরকারী কথার মতন সুবিমল জিজ্ঞেস করে : একটা কথা সত্যি বলুন তো বাবার এবারের অসুখ সারবে?

—না সারার কিছু নেই। তবে প্রগ্নোসিসের কথা যদি জিজ্ঞেস করো, তাহলে কিছু বলা যায় না। আমার একটু ভয় ঢুকেছে।

বাড়ি গিয়ে রান্না করতে হবে ভেবেই সুবিমলের গা জ্বলে যায়। রান্নার কাজটা বাবাই করতেন, অসুখ হবার পর পাশের বস্তি থেকে একজন উড়ে ঠাকুর আনা হয়েছিল, দু'দিন ধরে তারও জ্বর। মায়ের কথা ভেবে রাগ হয় সুবিমলের। অত সাত তাড়াতাড়ি মরার দরকারটা কি ছিল! এখন আমার ওপর যত ঝামেলা! সারা শরীরটা ঘামে ভিজে থাকার মতন বিশ্রী লাগে।

দেড় বছর আগে যে দোকান থেকে ঘড়িটা কিনেছিল, সেই দোকানেই গিয়ে সুবিমল হাত থেকে ঘড়িটা খুলে বললো : কিনবেন? দোকানদার বললো : ও আমরা পুরনো ঘড়ি কিনি না।

সুবিমল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে : পুরনো ঘড়ি কি বলছেন? মাত্র এক বছর আগে, আপনারই দোকান থেকে—

দোকানদারের একজন বন্ধু পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে বললো : দেখি, দেখি, কতোয় বেচবেন?

আশিটা টাকা পকেটে আসতে সুবিমল বেশ খুশী হয়ে ওঠে। বেশ লাভ করতে পেরেছে বলেই মনে হয়। রেস্টুরেন্টে বসে বেশ মেজাজের সঙ্গে প্রশ্ন করলো : তোমাদের সুপ নেই?

মোগলাই পরোটা ও মুর্গির মাংস শেষ করার পর সুবিমল পর পর দু'কাপ চা খায় আরাম করে। তারপর খুরিতে করে আরও খানিকটা মাংস কিনে নেয় বেরিয়ে আসার সময়। ঝন্টুর আবার তাড়াতাড়ি ঘুম পায়।

বাবার চিৎকার শুনে ধড়ফড় করে ছুটে আসে সুবিমল। অসম্ভব ভয় পাওয়া চিৎকার। দিদি এসে পড়ায় একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিল এ রাত্রটা, কিন্তু ও রকম চিৎকারে কার না ঘুম ভাঙে?

বাবার খাটের কাছেই মাটিতে বিছানা করে বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে শুয়েছিল করুণা। হাঁটু গেড়ে বসে বাবার পা ছুঁয়ে বললো : কি হলো বাবা?

ঝন্টুও ঘুম ভেঙে উদ্‌ভ্রান্তের মতন তাকিয়ে ছিল, পাশের ঘর থেকে প্রায় লাফিয়ে চলে এলো সুবিমল। বাবা খাটের ওপর উঠে বসেছেন, তিনদিন পর এই প্রথম উঠে বসা, গালটা এই তিনদিনেই এমন চুপসে গেছে! চোখ দেখলে মনে হয় দৃষ্টি নেই! করুণা তখনও ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে : কি হলো? কি হলো? বাবা, এই যে আমি—

বাবা আস্তে আস্তে বললেন : আর কেউ নেই? আর কেউ নেই?
—আর কে থাকবে?
—আমি সেই মেয়েটাকে দেখলাম। স্পষ্ট আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো।
—কোন্ মেয়েটা?
—দুপুরে যে মেয়েটা এসেছিল।
সুবিমল বললো : দুপুরে তো কেউ আসে নি। শুধু তপনের মা।
—না, না, সেই মেয়েটাই এসেছিল। ওঃ, ওঃ, ওঃ।
—ঝন্টু, কোরামিন কোথায় রেখেছিস? চামচেটা?

বড় মাসীমার ননদের বিয়ের সময়, বিয়ে বাড়ির নানান গণ্ডগোল ও হৈ-চৈ-এর মধ্যে সুবিমল বড় মাসীর মেয়ে তপতীকে চুমু খেয়ে ফেলেছিল সিঁড়ির তলায়। আসলে চুমু পাবার জন্য তপতীই নিজের ঠোঁট ও হৃদয় ব্যাকুল করে রেখেছিল, কিন্তু সে যাই হোক, ঘটনাটা মেসোমশাইর চোখে পড়ে যায়। সাক্ষাৎ মাসতুতো বোনকে চুমু খাওয়ায় বেশ একটা কেলেঙ্কারীর আবহাওয়া জমে ওঠে। বাবা সকলের সামনে চটি জুতো খুলে মেরেছিলেন সুবিমলকে। সেই থেকে সুবিমল আর বড় মাসীমার বাড়ি যায় না। কিন্তু বড় মেসোমশাই নাম করা ডাক্তার, তাঁর সাহায্য এখন খুবই দরকার। করুণা নিজে থেকেই সকালবেলা বললো : খোকন, তুই একটু বাড়িতে থাক, আমি কালীঘাট থেকে ঘুরে আসি। থাকবি তো?

যেন দিদি আসার আগে এই একমাস সুবিমল বাড়িতে থাকে নি! চাকরি যখন নেই তখন তো রুগ্ন বাবাকে ফেলে রেখে বাড়ি ছেড়ে যাবার কোনো যুক্তিও নেই তার। সুবিমল খবরের কাগজটা নিচের ভাড়াটেদের কাছ থেকে চেয়ে এনে বাবার খাটের সামনে এসে বসে থাকে। বাবার মুখে কোনো কথা নেই, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন শুধু। করুণা যতক্ষণ শাড়ি জামা পরে তৈরি হয়ে নিল, ততক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে সেইদিকে চেয়ে রইলেন। করুণা বেরিয়ে যেতেই বললেন : বাবার গলার আওয়াজ বসে গেছে, কি রকম যেন ফ্যাসফেসে। কাল রাত্রে সত্যি এ ঘরে কেউ আসে নি?

—কে আর আসবে? দিদি তো ছিলই—

—একটু কাছে সরে আয়। সত্যি কি ভুল দেখলুম? স্পষ্ট দেখতে পেলুম, মেয়েটা, আমার মাথার কাছে এসে—আঃ, ঝন্টু অত জোরে জোরে পড়ছে কেন, জোরে পড়লেই বুঝি বেশী পড়া হয়? বারণ কর না?

—কাল কি দেখলেন?

—মেয়েটি এসে আমায় বললো : দিন, আমার গয়না দিন!

—কিসের গয়না?

—তোর মায়ের গয়না।

সুবিমল বাবার চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই দেখতে পায় বাবার দু'চোখ জলে ভরে এলো। সব মানুষের চোখের জলের রং একরকম হয় না, বাবার চোখের জল কেমন যেন ময়লা। বাবার চোখের জল দেখা তো দূরের কথা, বছর দশেকের মধ্যে সে বাবার মুখের দিকে এ রকম একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখেছে কিনা, তাই সন্দেহ। সুবিমল গামছা দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললো : থাক্, থাক্। আপনি স্বপ্ন দেখেছিলেন।

—আমি এক বিন্দু ঘুমোই নি। স্বপ্ন না।

—থাক না ও কথা! এখন ঘুমোন। আমি দেখি আজ মাগুর মাছ পাই কি না।

—একটু জল দে।

এই সুযোগে জলের মধ্যে খানিকটা গ্লুকোজ গুলে দিল সুবিমল।

পাশের পাঁচ নম্বর বাড়ির ছাদে কি যেন একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছে। মোড়ের চায়ের দোকানে বন্ধুরা এখন খুব আড্ডা জমিয়েছে—সেখানে যাবার জন্য একবার তার মন ছটফট

করে ওঠে। বাবা আবার ফিসফিস করে বললেন : বারবার একটাই মেয়ে আসে, এসে হাত পেতে দাঁড়ায়। বলে, দাও, আমার জিনিস দাও, আমার গয়না।

—আঃ, থাক না ও কথা। কেউ আসেনি।

—এসেছিল। তুই মেয়েটাকে চিনিস। কে রে?

—আমি কি করে চিনবো! আমি দেখেছি নাকি?

—তোরই চেনার কথা। তোর জন্য তো—কি নাম মেয়েটার?

—কি মুশকিল! আমি কি করে নাম জানবো?

—জানিস না? মিথ্যে কথা বলছিস! জানি, আমাকে তোর সহ্য হয় না! আসলে বিরক্তি ও রাগই হয়েছিল সুবিমলের কিন্তু অনুনয়ে কাতর হয়ে বললো : বাবা, কেন এসব কথা বলছেন? শুধু শুধু আরও শরীর খারাপ করছেন। কে এসে গয়না চাইছে, আমি তা কি করে জানবো?

—তোর জন্যই রেখেছিলাম। করুণাকেও দিইনি। তোর মায়ের সোনার রুলি এক-জোড়া, তার ছেলের বউয়ের জন্য রাখা ছিল, তোর মা দিতে বলে গিয়েছিল—

—বেশ তো দেবেন! যখন সময় হবে।

—আর সময় হবে না কোনোদিন।

—কেন এসব ভাবছেন। কল্যাণদা বললেন : আপনার এ অসুখ সারতে আর সাত-দিনও লাগবে না। এই ইনজেকশানগুলোর রি-অ্যাকসান শুরু হলেই—

—সেরে উঠে লাভ কি? সে রুলি দু'গাছা নেই।

—নেই: কোথায় গেল? চুরি গেছে?

—আমি খেয়ে ফেলেছি।

অনেকদিন থেকেই সুবিমলের সন্দেহ ছিল, সামান্য দু'একটা কথা জেনে নিতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। সুবিমলের বন্ধু নিরঞ্জন একদিন বলেছিল : তোর বাবাকে দেখেছি ডালিমতলায় গুপীদের আড্ডায় ঘোরাঘুরি করতে। ও জায়গাটা ভালো নয়, বুড়ো মানুষ —একটা বিপদে পড়বেন। সুবিমল হাসতে হাসতে বলেছিল : আমার বাবাকে আমি শাসন করব নাকি? যেখানে ইচ্ছে যাবেন!

ডালিমতলার মোড়ের কাছে একদল বখা ছোঁড়া জটলা পাকিয়ে আড্ডা দেয়। বাজার করে একদিন ফিরছেন ধীরেনবাবু, একটা ছেলে এসে একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললো : স্যার, আমায় চিনতে পারেন? আমি ফর্টি এইটের ব্যাচে ছিলুম!—সব ছাত্রের মুখ মনে থাকে না, সেইজন্য যে কোনো যুবককেই চেনা চেনা লাগে। বললেন : হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার নামটা কি যেন?

—আমার নাম যতীন, আমার কাকারাও আপনার ছাত্র ছিল। স্যার, আপনি নাকি ঘর ভাড়া খুঁজছেন?

—হ্যাঁ, তোমার সন্ধানে আছে নাকি? যেখানে থাকি, ছাদ দিয়ে বড্ড জল পড়ে।

—স্যার, আপনি একটা বাড়ি কিনবেন?

কলকাতা শহরের বুকের ওপর একটা ছোট্ট একতলা বাড়ি, মাত্র তেরো হাজার টাকা দাম। তালা খুলে যতীন ওঁকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলো। এখন খালিই পড়ে আছে, চারখানা বড় বড় ঘর, ছোট উঠোন, রান্নাঘর, বাথরুম—বাথরুমের চৌবাচ্চাটা কি বিরাট! একটা ঘরে একটা ময়লা শতরঞ্চি পাতা, এখানে ওখানে ঝোলের দাগ আর মাংসের হাড়, কয়েক প্যাকেট তাস। ঘরভর্তি ছড়ানো। পনেরো বৎসর আগে মাত্র সাড়ে চারশো টাকা কাঠায় টালিগঞ্জে দু'কাঠা জমি কিনে রাখতে বলেছিলেন অ্যাসিস্টেন্ট হেড মাস্টার। তখন কেনা হয় নি। আজ একটা গোটা বাড়ি! ধীরেনবাবু হেসে বলেছিলেন : এ বাড়ির দাম তো অনেক বেশী হে!—সঙ্কুচিতভাবে যতীন বলে : তাতো অনেক বেশী হবেই কিন্তু আপনি আমাদের মাস্টার মশাই, আপনি তো এই বয়সেও অনেক বেশী কষ্ট করে আছেন, তা আমাদের ভালো লাগে না। আপনাকে আমি ঐ দামেই দিতে চাই।

শুনে ধীরেনবাবুর লোভ হয়। লোভ তো আর হিসেব করে আসে না। গল্পেও তো শোনা যায়, গুরু-দক্ষিণা হিসেবে কোনো মহৎ ছাত্র বাড়ি বা জমি দানও করে!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন : তুমি যে এইটুকু বললে, তা-ই যথেষ্ট। তোমাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করি। ও বাড়ি কেনার সামর্থ্য আমার নেই। তেরো হাজার টাকাই বা আমি পাবো কোথায়?

—আপনি রিটায়ার করেছেন শুনলাম। আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নেই?

—সে সামান্য টাকা। অনেক ধার-টার ছিল, স্ত্রীর শ্রাদ্ধেও খরচ হলো, মেয়ের বিয়েতে গেছে, এখন হাজার চারেক টাকা পড়ে আছে পোস্টাফিসে—বাড়ি কেনা আমাদের পক্ষে স্বপ্ন। তুমি যদি বরং ভাড়া দাও—

দুদিন বাদে ধীরেনবাবু আবার সেখানে ঘুরে এল সন্ধ্যাবেলা। ভেতরে তুমুল তাস খেলা চলছে। হাতের সিগারেট ফেলে উঠে এসে যতীন বললো : স্যার কিছু ঠিক করলেন? ধীরেনবাবু উত্তর দিলেন : না, জানতে এলাম তুমি ভাড়া দিতে রাজী আছো কিনা। কেনার সামর্থ্য আমার নেই। আদর করার মতন, সারা বাড়িটার গায়ে চোখ বুলোতে লাগলেন। ছোটোর ওপর বেশ ছিমছাম বাড়িটা।

ওঁকে বাইরে নিয়ে এসে যতীন বললো : আমার কিছু ক্যাশ টাকা দরকার, সেইজন্যই বিক্রি করতে চাইছি। একটা বিজনেস করছি, কিছু ক্যাপিটাল দরকার। আপনি আমার পার্টনার হবেন?

মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেটা ফ্যাক্টরির ইউনিয়ন নিয়ে মেতে থাকে। সারাদিন কাজের মধ্যে ছোট ছেলেটাকে সকালে পড়ানো, বাজার আর রান্না, সন্ধেবেলা একটা টিউশানি। পোস্টাফিসের টাকাগুলো আস্তে আস্তে কমে আসছে। সুবিমলটা যদি মানুষ হতো। ভালো করে দাঁড়াতে পারতো, তাহলে কি আর আজ কোনো দুঃখ থাকতো। জিজ্ঞেস করলেন : কিসের বিজনেস?

—কাস্টমসে যে সব স্মাগল করা জিনিসপত্র ধরা পড়ে, সেগুলোর নিলাম হয়। কাস্টমসে আমাদের চেনা লোক আছে। ওগুলো সস্তায় নিলামে কিনে বাজারে দুনো দামে বিক্রি করবো। একটু বেশী ক্যাপিটাল চাই, কিন্তু লাভ সেণ্ট পারসেণ্ট।

প্রথম এক হাজার টাকা নিয়ে যতীন স্ট্যাম্পে সই করা রসিদ দিয়েছিল। ধীরেনবাবুই বলেছিলেন : রসিদের কি দরকার! নিজের ছাত্রকে কেউ অবিশ্বাস করে? যতীন বলেছিল : না স্যার, কাগজপত্রে ঠিক রাখা ভালো, টাকা-পয়সার ব্যাপার তো!

পাঁচদিন বাদে সেই খালি বাড়ির কোণের ঘরে সাত আটটা ছেলে। গুপী নামে ষণ্ডা ছেলেটা হাত ব্যাগ থেকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা বার করতে লাগলো। ধীরেনবাবু সেদিন সতেরো শো টাকা পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। মাত্র পাঁচদিনে সাতশো টাকা লাভ? মাত্র দশ বছর আগেও তাঁর মাইনে ছিল পঁচাশি টাকা, বছরে সাতশো টাকা হতো কিনা সন্দেহ। টাকাটা পেয়েই তিনি ভাবলেন, আর না, এই যথেষ্ট। কিন্তু বাড়ি? বাড়িটা কিনে দুখানা ঘর ভাড়া দিলে, সারা জীবনে আর চিন্তা থাকে না। আজ সাতাশ বছর ধরে কলকাতায় এগারোখানা ভাড়া-বাড়ি বদলানো হয়েছে। এখন ইচ্ছে হয় না কোথাও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে? যতীনকে বললেন : এ বাড়ি কিন্তু তুমি আমাকে না-বলে অন্য কারুকে বিক্রি করতে পারবে না! বাড়ির টাইট্‌ল ঠিক আছে তো?

মাস দেড়েক বাদে গুপী ঠোঁট উল্টে বললো : ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি তো আছেই। তা না জেনেই ব্যবসা করতে এসেছিলেন? স্যার আপনি তো আর কচি খোকা নন্। আবার টাকা জোগাড় করুন।

ধীরেনবাবু যতীনের হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন : বাবা, আমার টাকা চাই না। আমার গয়নাগুলো অন্তত ফেরত দে। আমার স্বর্গতা স্ত্রীর গয়না!

যতীন সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল : আপনি ভাববেন না স্যার, ওগুলো নষ্ট করিনি। বাঁধা দেওয়া আছে, আর একটা দাঁও মারলেই ছাড়িয়ে নিয়ে আসবো।

যতীন আজ আর সিগারেট ফেলে নি। গুপী আর তার বন্ধুরা গ্লাসে করে মদ খাচ্ছে। মাংসের ঝোলের মধ্যে একটা মাছি আটকে আছে। এতদিন পর এই প্রথম যেন এসব চোখে পড়লো, কি বিশ্রী পরিবেশ, কি বিশ্রী এদের ব্যবহার আর ভাষা। মাস্টারমশাই বলে আর সম্মান করে না, ব্যবসার পার্টনারের মতন দেখছে। লোভে তাঁকে কোথায়

নিয়ে এসেছে? এই বাড়ি, এই বাড়িটার জন্যেই তো, সামান্য একটা একতলা বাড়ি, খুব বেশী লোভ কি? ধীরেনবাবু কেঁদে ফেললেন। গুপী যতীনকে ধমকে বললো : এইজন্য তোকে বলি, বুড়োফুড়োকে এর মধ্যে ঢোকাস নি। রিস্ক নিতে জানে না, তবু ব্যবসার সখ আছে। মাস্টারমশাই আপনি এবার কেটে পড়ুন, আর একটা লট্ ধরতে পারলে আপনার টাকা ফেরত দিয়ে দেবো।

ধীরেনবাবুর আর তো উপায় নেই। প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা এখানে এসে বসে থাকেন। ওরা নির্বিকারভাবে সব ভুলে খিস্তি-খেউড়, তাস, মদ নিয়ে বসে আছে। একদিন কোথা থেকে দুটো মেয়েছেলেকে নিয়ে এলো। গা ঘিন-ঘিন করে। লোকে তাঁকে এখানে দেখলে কি বলবে? কিন্তু উপায় তো নেই। কাকে গিয়ে একথা বলবেন : এইসব বদছেলের সঙ্গে তিনি চোরাই জিনিসের ব্যবসার অংশীদার হয়েছিলেন! এদের ছেড়ে দিলেও তো সর্বস্ব গেল। এখন এদের হাতে-পায়ে ধরেও যদি কিছু ফেরত পাওয়া যায়! হাত জোড় করে ওদের কাছে বলেন : আমার গয়নাগুলো ফেরত দে বাবা টাকা আমার নিজের -তা গেছে গেছে, গয়নাগুলো আমার স্ত্রীর, ওতে তোদের মহাপাপ হবে'

পুলিশরাও অবাক হয়ে গিয়েছিল। সাত-আট জন গুণ্ডা শ্রেণীর ছোকরা, দুটো বেশ্যা, তার মধ্যে একজন ছাতা হাতে নিরীহ চেহারার বুড়ো। ইন্সপেক্টরের পায়ে আছড়ে পড়ে ধীরেনবাবু বলসেন : আমায় ছেড়ে দিন! আমার যথাসর্বস্ব গেছে, আমার সম্মান-টুকুও নষ্ট করবেন না। আমি একজন শিক্ষক!

ইন্সপেক্টর বাঁকাভাবে বলেছিল : শিক্ষক! চোরাই ব্যবসা করতে সম্মানে বাধে নি, এখন ধরা পড়েই যত সম্মানের কথা! চলুন থানায়!

থানার বড়বাবু বললেন : আপনি অমুক ইস্কুলে অঙ্ক পড়াতেন না? আমিও আপনার ছাত্র ছিলাম। ছি, ছি, এসব কি করেছেন? এদের সঙ্গে—

হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ধীরেনবাবু বলেছেন : ভুল করে ফেলেছি। মানুষের কি একটাও ভুল হয় না? আমার ছেলেমেয়ে আছে, আমায় এ কলঙ্ক থেকে বাঁচাও!

—মাস্টার মানুষ, সমাজের পাঁচজন আপনাদের ভক্তি শ্রদ্ধা করবে তা না, হঠাৎ বড়লোক হবার জন্য এসব জঘন্য কাজ যদি আপনারাও করেন—

—আমার ভুল হয়ে গেছে। ছাত্র বলেই ওদের বিশ্বাস করেছিলুম।

—ছাত্র হলেই কি ধোয়া তুলসী হয়! ছাত্র বলে না হয় বিশ্বাস করেছিলেন কিন্তু কাজটাও যে অতি জঘন্য তা বোঝেন নি? নাকি ভেবেছিলেন সবাই যখন জোচ্চুরি করছে, আপনিও এই ফাঁকতালে বড়লোক হয়ে যাবেন!

—বড়লোক হতে চাই নি, শুধু একটা বাড়ি চেয়েছিলুম।

—চুপ করুন! ফ্যাচফ্যাচ করে কাঁদবেন না।

মাস আষ্টেক আগে, সুবিমল তখন ইউনিয়ন নিয়ে মত্ত, নাওয়া-খাওয়া নেই, প্রায়ই রাত্তিরে বাড়ি ফেরে না, ফ্যাক্টরীতে তখন লক-আউট চলছে, একদিন সকালবেলা বাড়ির সামনে পুলিশ ইন্সপেক্টরকে দেখে সে আঁৎকে উঠেছিল। কিন্তু পুলিশটি এসে তার বাবাকে খোঁজ করে এবং হৃদ্যতার সঙ্গে কিছু কথা বলে চলে যায়। সুবিমল ভেবেছিল পুলিশের লোকেরাও তো তাদের ছেলেদের পাস করাবার জন্য মাস্টারদের ঘুষ দেয়। সুতরাং ভয়ের কিছু নেই। ওর বন্ধু নিরঞ্জন বলেছিল : তোর বাবা গুপীদের আড্ডায় কেন যে যান বুঝি না। ওরা ডেঞ্জারাস! শুনলুম গুপীদের সবাইকে অ্যারেস্ট করেছে। দেখিস, তোর বাবাও বিপদে না জড়িয়ে পড়েন।

সুবিমল হাসতে হাসতে বলেছিল : কি মুশকিল, বাবাকেও কি আমি চালচলন শেখাবো নাকি? বাবার যা ইচ্ছে তাই করবেন। আমি কি ওঁকে উপদেশ দিতে পারি! ছেলেমানুষ তো নন্!

বড় মেসোমশাই বাবার নাড়ী ধরে আছেন, সুবিমল বড় মেসোমশাইয়ের চোখের দিকে তাকাতে পারে না বলে অস্বস্তি বোধ করছিল। ঘর ভর্তি লোক, পাড়াসুদ্ধ লোক রুগী দেখতে এসেছে। এতদিন বাড়িতে মেয়েমানুষ ছিল না বলে, অন্য মেয়েরাও আসে নি। এখন করুণা এসেছে, দুপুরের ঘুম নষ্ট করে পাড়ার যাবতীয় মেয়ে আজ এ ঘরে।

বাড়িওয়ালা বললো : মাস্টারমশাইয়ের এ-রকম অসুখ কিন্তু আমার ছেলের যে সামনেই পরীক্ষা। তুমিই একটু পড়িয়ে দাও না এ কদিন?

সুবিমল উত্তর দিল : আপনার ছেলেকে আমি খুব ভালো চিনি। ওর লেখাপড়া হবে না, ওকে আপনি ব্যবসায়ে ঢুকিয়ে দিন?

পাশের ঘরে এসে সুবিমল জামাকাপড় বদলাচ্ছিল। নীলা বৌদি এসে একেবারে কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় বললো : ভেঙে পড়ছো কেন? পুরুষমানুষ কি চেহারা হয়েছে এ কদিনে?

সুবিমল অবাক হয়ে ঘুরে তাকালো। যাচ্চলে! তার ভেঙে পড়ার খবর নীলা বৌদি কি-রকম করে জানে? নীলা বৌদি নীল-রঙা শাড়ি পরতে ভালোবাসেন সব সময়। সেই লাল সায়াটাও পরেছে নাকি আজ? কোনো কথা না বলে সুবিমল নীলা বৌদির দুই স্তনের ওপর মুখ ও হাত চেপে দিতেই ঝটকা মেরে সরে গিয়ে নীলা বৌদি বললো : ছিঃ, এ সময়ে—

সন্ধেবেলা নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো : তোর বাবা কেমন আছে রে?

সুবিমল উৎফুল্লভাবে বললে : খুব ভালো। সেরে গেছেন প্রায় বলা যায়। এখন ওঁকে দেখার অনেক লোক। নিরঞ্জন বললো : চল্, তাহলে আজ কোথাও গিয়ে বসা যাক্।

দোকান থেকে বেরুবার পর সুবিমল বুঝলে, ওর বেশী নেশা হয়ে গেছে। নিরঞ্জন বললো : তুই ওদের সঙ্গে পারবি না। ওরা কথায় কথায় ছোরা-ছুরি চালাতেও পারে। এ শহরে ওরাই তো দলে ভারী। সুবিমল হাত নাড়তে নাড়তে বললো : তুই আমার পেছনে পেছনে আসছিস্ ফের? তুই বাড়ি যা না—

জুয়া খেলতে এসেছিস্ টাকা আছে? আগে বার কর্—

সুবিমল গুপীর চোখের দিকে তীব্রভাবে চেয়ে আছে। ওর পকেটে তখনো ষাট টাকা। বললো : আয় না, দেখি তোর কত মুরোদ!

—এ ছেলেটা মদ খেতে খেতে আজ মরে যাবে নাকি?

—তিনশো টাকা জিতেছি আজ। দে শালা, আমার মায়ের গয়না দে!

—কে নিয়েছে তোর মায়ের গয়না?

—দে আমার মায়ের গয়না দে! আমার মায়ের গয়না নইলে তোর (ছাপার অযোগ্য, অশ্লীল, অশ্লীল, অশ্লীল)—

—মুখ খারাপ করবি না শালা! জান্ নিকলে দেবো—

—আমার মায়ের গয়না দে। নইলে সব্বাইকে বার করে দেবো বাড়ি থেকে। বেরো! এটা আমার বাবার বাড়ি!

—তোর কোন্ বাপের? তোর অনেকগুলো বাপ্—

—মুখ ভেঙে দেবো। ভাগ্—

—এই গুপী ডাণ্ডা দিয়ে মারিস্ নি খুন হয়ে যাবে—

—আমার মায়ের গয়না দে। আমার জেতা টাকা, ওঃ ওঃ—

শাড়ি দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবার পর করুণা বললো : তুই এই চেহারা নিয়ে আর বাবার সামনে যাস না, বাবা তাহলে এমনিতেই হার্টফেল করবে।

দুপুর থেকেই অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল, রাত নটা বেজে আট মিনিটে সবাই বললো : আহা, লোকটা সারা জীবন শুধু কষ্টই পেয়ে গেল! রিটায়ার করার পর কোথায় এখন ছেলের বিয়ে দিয়ে একটু সুখের মুখ দেখবে, তা ভগবান আর—

করুণা ছাড়া চেঁচিয়ে কাঁদার আর কেউ নেই। আর সব বোবার মতন বসে আছে। কল্যাণদা বললেন : ডেথ সার্টিফিকেট আমি লিখতে পারবো না। আমার কলম দিয়ে

মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যুর কথা লেখা অসম্ভব। তুমি অন্য ডাক্তার আনো। তপনের মা ঝন্টুকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন। নীলা বৌদি করুণাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। আধঘণ্টার মধ্যেই মেসোমশাই এসে সার্টিফিকেট লিখলেন। মাসীমার এখন ন'মাস চলছে, তিনি আসতে পারেন নি।

—বসে থেকে কী হবে, তোমার বন্ধুবান্ধবদের খবর দাও!

বন্ধুবান্ধব? নিরঞ্জনের আজ নাইট-ডিউটি। অবিনাশ আর শেখর শিলং বেড়াতে গেছে। রাত্তির বেশী হয় নি, মাত্র সাড়ে এগারোটা। ডালিমতলা বেশী দূর নয়!

দড়াম করে দরজা খুলে সুবিমল বললো : আমার বাবা মারা গেছেন।

ঘরের কেউ কোনো কথা বললো না, চুপ করে চেয়ে রইলো। সুবিমল চিৎকার করে বললো : দে, আমার টাকা ফেরত দে! সেদিন তিনশো টাকা জিতেছিলুম, দে আমার টাকা!

কেউ কোনো কথা বললো না। গুপী চুমুক শেষ করে গেলাসটা নামিয়ে রাখলো। ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে সুবিমল, ভয়ংকর চেহারা মুখের। যতীন বললো : স্যারের অসুখ হয়েছে শুনি নি তো। আহা, এমন ভালো লোক ছিলেন।

—গয়না চাই না, দে, আমার টাকা দে! শ্মশানে পোড়াবার খরচ নেই আমার!

যতীন নিচু হয়ে শতরঞ্চি থেকে নোট ও খুচরাগুলো জড়ো করে উঠে দাঁড়ালো, তারপর বললো : নিয়ে যাবার লোকও তো লাগবে? চল্ আমরা যাচ্ছি। আয় গুপী!

—ইস্, শরীরটা এমন চুপসে গেছে? একমাস আগেও তো দেখেছিলুম—

—মুখটা অতখানি হাঁ করা, বুজিয়ে দে না—

—চোখ দুটোও খোলা, পাতা দুটো টেনে নামিয়ে দে!

—মরা মানুষের মুখ বন্ধ করা যায় না!

নীলা বৌদিদের ছাদের টবের ফুল ছিঁড়ে আনা হয়েছে সাজাবার জন্য। করুণা বাবার পায়ে আলতা মাখিয়ে ছাপ তুলে নিল। করুণা, মরার আগে তোমার বাবা কি কথা বলেছেন?

কী আর বলবেন, গোটা দিনটাই আজ কোনো জ্ঞান ছিল না। কাল রাত্তিরে শুধু বিড়বিড় করেছেন বাড়ি, বাড়ি—

মেসোমশাই নিজের ছোট ছেলেকে বললেন : উঁহু, ঘাটের ধারে যেও না, এখন জোয়ার, নদী একেবারে ভরা। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, গলার বোতামটা আটকে দাও।

বাবার খুড়তুতো ভাই হীরেনকাকা বললেন : আমি আর থাকতে পারছি নারে সুবিমল। আমার কাল অফিসে বেরুতেই হবে। এক্সটেনশনের চাকরি—

রোগা পুরুত বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছে। ডোমেরা কাঠ সাজিয়ে বললো : হাল্কা লাশ আছে, পুড়তে বেশী সময় লাগবে না, ঘণ্টাচারেক বড় জোর—

একগোছা প্যাঁকাটিতে আগুন জ্বালিয়ে পুরুত বললো : নিন্, আপনি জ্যেষ্ঠ সন্তান তো? আপনি প্রথম মুখাগ্নি করুন!

মুখটা তো হাঁ করা আছেই, কি ক্ষুধার্ত আর লোভীর মতন দেখাচ্ছে। জ্বলন্ত প্যাঁকাটির গোছা হাতে নিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুবিমল। তারপর গুপী জতীনের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বললো : তোরাই মুখে আগুন দে। বাবা বলতেন, ছাত্ররা সবাই আমার সন্তানের মতন।

পটভূমি

দুই পুরনো বন্ধুতে অনেকদিন পর দেখা হল পার্ক স্ট্রীটের মুখে। চৌরঙ্গী দিয়ে হেঁটে আসছিল অমলাংশু, রাত নটার কাছাকাছি দেখতে পেল পুরনো বন্ধুকে। পিছন থেকে গিয়ে আস্তে কাঁধে হাত রাখল, 'কি রে, নিখিল?'

চমকে ফিরল নিখিল। আরে তুই কোথা থেকে, কী আশ্চর্য! কবে এলি কলকাতা?"

এক সঙ্গে অনেক কথা বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল নিখিল। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে।

অমলাংশু ভালো করে তাকিয়ে দেখতে লাগল পুরনো বন্ধুকে। অনেক বদলেছে। ইঁটচাঁপা ঘাসের মত গায়ের রঙ, মুখ থেকে সেই ছেলেমানুষী সরলতাটুকু কোথায় মিলিয়ে গেছে। পরনে একটা দোমড়ানো ভাঁজ নষ্ট কর্ডুরয়ের প্যান্ট, সিল্কের শার্ট, হাতে সিগারেটের টিন, চোখ দুটো একটু লাল।

অমলাংশু চোখের কোণে চিকচিকে হাসি ফুটিয়ে বললে, 'কেমন আছিস? কী করছিস আজকাল?'

'অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করছি। কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি একটা ট্যাক্সির জন্য, যেতে হবে এক পার্টির কাছে। তারপর তোর খবর-টবর বল। চেহারা ত তোর একটুও বদলায় নি। বিয়ে-থিয়ে করেছিস নাকি? বংশধর কটি?'

বন্ধুর গলার আওয়াজ যেন কেমন মনে হল অমলাংশুর। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

হঠাৎ কথা থামিয়ে চুপ করল নিখিল। একটু বোকার মত হাসল। অমলাংশুর কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'ডোন্ট মাইন্ড, আমি আজ একটু ড্রিঙ্ক করেছি। মানে বড় বড় পার্টির সঙ্গে কাজ করতে হয়ত। আশা করি এ-সব ব্যাপারে তোর কোনো প্রেজুডিস নেই। তা ছাড়া এ-সব হচ্ছে এ-যুগের অমৃত, এ-সব না হলে কি চলে? হাঃ হাঃ।' আবার বোকার মত হাসল। এ-কথার পর যা বলা উচিত অমলাংশু তাই বলল, লীলা কেমন আছে?'

'ভালই আছে। খারাপ থাকবার তো কোনো কারণ নেই। মাসে মাসে মোটা রোজগার করছি, জায়গা দেখেছি ঢাকুরিয়ায় বাড়ি করব, গাড়িও কিনতে হবে একটা। এই ট্যাক্সির ঝামেলা আর ভালো লাগে না। কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, নবাব-পুত্তুরদের দেখাই নেই।'

'সেই মসজিদবাড়ি স্ট্রীটেই আছিস তো?'

'পাগল! সে-বাড়ি ছেড়েছি কবে। এখন পার্ক সার্কাসে ফ্ল্যাট নিয়েছি। দাঁড়া ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, যাবি একদিন! কালকেই আয় না সকালে, আমি ফ্রি আছি। এখন একটু ব্যস্ত, ডোন্ট মাইন্ড!'

পকেট হাতড়ে একটা কার্ড বার করে অমলাংশুর হাতে দিল। তারপর হঠাৎ 'ট্যাক্সি' বলে চিৎকার করে অপসৃয়মাণ একটি গাড়ির পিছনে ছুটল নিখিল।

তারপরের মুহূর্তেই অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা ঘটে গেল। নিখিল ছুটতেই বিপরীত দিক থেকে প্রচণ্ড একটা সিংহের মত একটা ডবল ডেকার বাস এসে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ব্রেক কসার বিশ্রী শব্দ আর একটি মানুষের ক্ষীণ চিৎকার।

অমলাংশু কিছুক্ষণ নির্বোধের মত দাঁড়িয়ে রইল। তার হাতে সেই ঠিকানা লেখা কার্ড, তাতে তখনও নিখিলের স্পর্শের উত্তাপ লেগে আছে। কেমন যেন একটা ভয়ে অমলাংশুর সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠলো। তার প্রচণ্ড ইচ্ছে হল সে ছুটে সেখান থেকে চলে যায়। কিন্তু আর সময় নেই।

নানা মানুষের ভিড় ভেঙে পড়ল সেখানে। তার মধ্যে পড়ে অমলাংশুকেও মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যেতে হল। আস্তে, খুব সন্তর্পণে একবার উঁকি দিয়ে দেখল। নিখিলকে আর চেনার উপায় নেই।

অমলাংশুর পেটের মধ্যে থেকে কী যেন একটা ভারী জিনিস পাকিয়ে পাকিয়ে গলার দিকে উঠতে লাগল। সমস্ত শরীরটা ঝিমঝিম করতে লাগল তার। তাড়াতাড়ি ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে ময়দানের দিকের খোলা হাওয়ায় দাঁড়াল।

ক্লান্তিতে চোখ বুজল অমলাংশু। শেষ! এক এক করে অনেকগুলো ছবি পর পর চকিতে মনে আসতে লাগল। কলেজ-জীবনের সেই অফুরন্ত প্রাণখোলা আনন্দ, কতদিন হোস্টেলের এক বিছানায় দুজনে। একবার ওরা দুজনে মিলে সিগারেটের ব্যবসা করবে ঠিক করেছিল। দু দিনেই কোম্পানি ফেল পড়ল। রাশি রাশি সিগারেট বন্ধুদের বিলিয়ে নিজেরা খেয়ে শেষ করা যায় না। ও যখন লীলাকে বিয়ে করে তখন কত সাহায্য করেছিল অমলাংশু ও-কে। সব শেষ এখন সেই নিখিল রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে।

একটু পরে শরীর সুস্থ হল অমলাংশুর, এখন সে কী করবে? অসাধারণ মনের জোর তার। নিজেকে সামলে নিয়ে, মাথা ঠিক করে সব দিক ভাবতে লাগল। নিখিলকে নিয়ে এখন আর কিছুই করার নেই। যা কিছু তা পুলিশ আর হাসপাতালই করবে।

অমলাংশুর হাতে তখনও সেই ঠিকানা-লেখা কার্ড। একটা বড় কাজ নিখিলের বাড়িতে খবর দেওয়া। তাছাড়া লীলাকে সে চেনে—এই বিপদে তাকে সাহায্য করা উচিত।

সিঁড়ি ভেঙে তিন তলায় উঠে ফ্ল্যাটের দরজায় ধাক্কা মারল সে। পথ খুঁজে আসতে বিশেষ দেরি হয় নি। দরজাটা একটু ফাঁক করে লীলা মুখ বাড়াল।

'আরে আপনি হঠাৎ, আসুন, আসুন।' দরজা অবারিত করে অমলাংশুকে ভিতরে নিয়ে এল লীলা। অকৃত্রিম আনন্দে ঝলসে উঠল সে, অমলাংশুকে একটুও সময় দিল না।

'সত্যি খুব চমকে গেছি আপনাকে দেখে, চিঠিপত্রও তো একটা লিখতে হয়। সেই যে কবে গিয়েছেন। এ বাড়ির ঠিকানা জানলেন কী করে? ওঁর সংগে দেখা হয়েছে বুঝি?'

অমলাংশু প্রথম ধাক্কায় প্রশ্নের উত্তর থেকে সরে গেল। 'এই বুঝি ছেলে তোমার? একটিই নাকি? কী নাম তোমার খোকন?'

'হ্যাঁ, এই একটি নিয়েই অস্থির। নাম বলো বুবুল। আপনি কলকাতায় কবে এলেন? চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গেছে কিন্তু।'

মুখোমুখি বসল দুজনে। জব্বলপুরে কলেজে প্রফেসরি নিয়ে অমলাংশু কলকাতা ছেড়েছিল। দীর্ঘদিন পরে আজই কলকাতায় ফিরেছে। ফিরেই কিসের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল সে, নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করতে লাগল অমলাংশু। বেশী দেরি করে ফেললে আর বলা হবে না। অমলাংশু তাকায় লীলার দিকে।

আগের মতই সুন্দর আছে লীলা। পরিষ্কার টানাটানা দুটি চোখ। সাতাশ-আটাশ বছর বয়েস হবে তবু এখনও একমাথা চুল, ঠোঁটে স্নিগ্ধ এক টুকরো হাসি। তবু ভালো করে তাকিয়ে দেখল অমলাংশু চোখের কোণে, চিবুকে, হাসিতে একটা কথা কিছুতেই লুকোতে পারছে না লীলা—তার জীবনে সুখ নেই।

বসবার ঘরটা বেশ সুন্দরভাবে সাজিয়েছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা ফুলদানি, ক'খানা বেতের চেয়ার, এক কোণে একটা অর্গান, দেওয়ালে বাছাই করা খানকয়েক ছবি। অমলাংশু চেয়ে চেয়ে সেই সব দেখছে, আর বুকের মধ্যে গুরু গুরু করে কাঁপছে তার। লীলা অনেক কথা বলে যাচ্ছে, আনমনে শুনছে কিংবা শুনছে না সব। কলেজে একসংগে পড়ত লীলা। তখন নিখিলের মত ওর সংগেও ঘনিষ্ঠতা ছিল।

অন্য কথা থেকে ঘুরে এসে লীলা এবার পারিবারিক কথায় চলে এল। সে বিয়ে করল কবে, বউ কেমন দেখতে, ছেলেমেয়ে কটি এইসব।

চেষ্টা করে একটু হাসল অমলাংশু। 'বিয়ে করবার সময় পেলাম কোথায়? করলে নিশ্চয় খবর পেতে। তোমার ছেলেটি খুব সুন্দর হয়েছে লীলা। বাবার চেয়ে মায়ের মুখের আদল এসেছে বেশী।'

লীলা বললে, 'বুবুল, নমস্কার করনি তো! কাকা হন তোমার, অমলকাকা।'

সাত-আট বছরের ছেলে। বেশ স্মার্ট সপ্রতিভ। অমলাংশু ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে আদর করতে লাগল। আর দেরি করা যায় না। ঘরের আবহাওয়া ক্রমেই ভারী হয়ে আসছে, কথাবার্তা আর জমছে না।

'আপনার বন্ধুর কীর্তি দেখেছেন? এখনো আসবার নাম নেই! এখন এলে আপনাকে দেখে কত খুশী হত, তিনজনে মিলে কত গল্প করা যেত। কি যে হয়েছে ওর! কতটুকু সময়ই বা বাড়িতে থাকে। ভালো লাগে বলুন তো একা একা সময় কাটাতে? আমি তো বলি, কী দরকার এত খাটবার, শুধু দিনরাত টাকা টাকা করা!'

এই ঠিক সময়। এ সময় নষ্ট করলে আর বলা হবে না। অমলাংশুও মুখ তুলল, লীলা বার বার তাকাচ্ছে দরজার দিকে। না, বলা যাবে না। ও-কথা শুনে লীলার সুন্দর মুখ যন্ত্রণায় কেমন কুৎসিত হয়ে যাবে অমলাংশুও তা কল্পনা করল। বলতে গেলে

লীলা হয়ত চিৎকার করবে অথবা অজ্ঞান হবে। অমলাংশু তা সইতে পারবে না। না হয় দুর্মুখের ভূমিকায় সে অভিনয় নাই করল। খবর লীলা পাবে ঠিকই।

'আচ্ছা, আজ উঠি। আবার আসব লীলা।' উঠে দাঁড়াল অমলাংশু।

'যাচ্ছেন? উনি এলে বলব। আপনি আবার আসবেন তো—না ওঁকে বলব, আপনাকে ধরে আনতে?'

দরজার পাল্লাটা খুলে ফিরে দাঁড়াল অমলাংশু। সমস্ত শরীরটা তার পাথরের মতো ভারী হয়ে গিয়েছে। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন বরফের মত ঠান্ডা হয়ে জমে আসছে। অতিকষ্টে হেসে বললে, 'না, তার দরকার নেই, আমি নিজেই আসব। চলি বুবুল!'

—'কাকা, তুমি আবার কবে আসবে?'

বুবুল ছুটে এল ওর দিকে। হঠাৎ তার ধাক্কা লেগে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। আর দুই কপাটের মধ্যে পড়ে অমলাংশুর একটা আঙুল চেপ্টে গেল। অতি কষ্টে মুখ বিকৃত করে চিৎকার সামলাল সে। ঝরঝর করে রক্তের ফোঁটা পড়ল ঘরে। লীলা প্রায় ছুটে তার কাছে এল।

'কী হল দেখি, দেখি। ইস্। ও মাগো! দাঁড়ান এখন যাবেন না। জলে ধুয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দি।'

তারপর বুবুলের দিকে ফিরে বলল, 'কী সর্বনেশে ছেলে, যাও শিগ্গীর, ও-ঘরে গিয়ে চুপটি করে শুয়ে থাক।'

—'আহা-হা, ওকে বোকো না, ও কী করেছে। তুমি ব্যস্ত হয়ো না. কিছুই হয় নি আমার। সামান্য একটু ছড়ে গেছে শুধু, বাড়িতে গিয়ে ধুয়ে ফেললেই হবে।' সে তখন পালাতে পারলে বাঁচে।

'না, তা কিছুতেই হতে পারে না। একটুখানি হাতটা বেঁধে দিতে কী আর এমন সময় নষ্ট হবে? ইস্ কত রক্ত। মাগো।'

দেখা গেল লীলা রক্ত দেখে খুব বিচলিত হয়ে পড়ছে। রক্তের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তাড়াতাড়ি গেল জল আনতে। অমলাংশুকে বসতে হল। আঙুলের যন্ত্রণা কিছুই না। মনের মধ্যে যন্ত্রণায় টনটন করছে। নিখিলের মৃত্যুর দুঃখটা যেন ভালো করে অনুভব করতে পারল সে। সুন্দরী স্ত্রী, সাজানো সংসার ছেড়ে এক মুহূর্তের মধ্যে কোথায় চলে গেল সে। কোথায় রেখে গেল লীলাকে।

অমলাংশু ভাবল, তার হাত কেটেছে, সেই সামান্য রক্তটুকু সইতে পারছে না লীলা, আর তাকে কী করে রক্তাপ্লুত স্বামীর মৃত্যু সংবাদ দেবে।

'দেখি, হাত দেখি!' জল নিয়ে এসে অমলাংশুর হাতটা টেনে নিল লীলা। তুলো ভিজিয়ে, যত্ন করে রক্ত মুছতে মুছতে নিচু গলায় বললে, 'এবার একটা বিয়ে করুন। কতদিন আর বাউণ্ডুলে হয়ে থাকবেন?' বুক কেঁপে উঠল অমলাংশুর। একটা কথা বলতে পারল না। টেবিলের উপর নিখিলের ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। নিখিল তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বুকের মধ্যে হুহু করে উঠল অমলাংশুর।

লীলা পরিপাটি করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলে। এবার ওঠা উচিত। অনেক রাত হল, লীলা হয়ত এখন কিছু ভাবতে পারে। কিন্তু অমলাংশু যেতে পাচ্ছে না বাড়িতে আর অন্য লোক নেই, যখন খবর পাবে তখন ওকে কে দেখবে? ও যদি অজ্ঞান হয়ে যায়, যদি আত্মহত্যার চেষ্টা করে? একজনের প্রাণের মূল্যে কি আর একজনের প্রাণ ফিরে পাওয়া যাবে? এই বিপদের মধ্যে তাকে একা ফেলে যায় কী করে অমলাংশু! কে তাকে সান্ত্বনা দেবে, কে তার মৃত্যুর পটভূমিকা আড়াল করে দাঁড়াবে? কিছুই ভেবে পাচ্ছে না সে। বুক থেকে প্রতিটি নিঃশ্বাস ক্লান্ত ভারী হয়ে যেন অনেক পথ পেরিয়ে এসে বার হচ্ছে।

—'লীলা, তোমাকে আমার একটা কথা বলবার ছিল।' উঠে দাঁড়াল সে। লীলা সপ্রশ্ন চোখে তাকাল। আর একটা কথাও বলতে পারল না অমলাংশু। সমস্ত মুখটা কেমন যেন রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

লীলা সচকিত হয়ে উঠল। 'ও কী, আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন? শরীর হঠাৎ খুব খারাপ লাগছে নাকি? বসুন আর একটু বসুন।'

'লীলা তোমাকে আমার একটা কথা বলার ছিল।' অমলাংশু আবার বলল। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে ফোন বেজে উঠল পাশের ঘর থেকে। অমলাংশুর সর্বশরীর কেঁপে উঠল। সে নিশ্চিত জানে কোথা থেকে ফোন এসেছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সে লীলার হাতটা চেপে ধরল।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লীলা। কিছুই সে বুঝতে পারছে না। আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে শান্ত গলায় বললে, 'ফোনটা বাজছে, শুনে আসতে দিন।'

—লীলা, তুমি যা শুনবে তাই বলতেই আমি এসেছিলুম। কিন্তু তাছাড়াও আমি একটা কথা বলতে চাই।' গলা কেঁপে যাচ্ছে অমলাংশুর, ফোন বেজে চলেছে।

—'লীলা, যখন তুমি আমার সঙ্গে কলেজে পড়তে তখন থেকে তোমাকে আমি জানি। লীলা, আমি তোমার বন্ধু, হয়তো পৃথিবীর একমাত্র বন্ধু। আমাকে তুমি বিশ্বাস করো।'

লীলার সমস্ত শরীরটা ঝড়ের মুখে চারাগাছের মতই কেঁপে উঠল। বিদ্যুৎ ঝলকের মত সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পাশের ঘরের ফোন তুলে নিল সে। একটু বাদেই একটা আর্তস্বর শুনল অমলাংশু।

অমলাংশু অনেকক্ষণ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নিখিলের ছবির দিকে। চোখটা জ্বালা করে এক ফোঁটা জল এল। তারপর পর্দা সরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল। ফোনের পাশে টেবিলের উপর আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে লীলা। মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছে। বিনা দ্বিধায় অমলাংশু আস্তে আস্তে ওর চুলের উপর হাত রাখলো। বলল, 'চলো লীলা, শেষবার দেখে আসি নিখিলকে।'

বিশ্বাসঘাতক

আসানসোল বাজারের সামনে বড় রাস্তার ওপর একটা জীপ অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে-আছে। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের ধার ঘেঁষে, রোদ তেরছা হয়ে পড়েছে সেখানে, জীপের আরোহী তিনজন এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল, রোদ্দুর এড়াবার জন্য দু'জনে আবার ভেতরে উঠে বসলো। একজন উল্টো দিকে গিয়ে ড্রাইভারের সিটটার কাছে একটা পা তুলে তাকিয়ে রইলো স্টেশনের দিকের রাস্তায়। দুপুর সাড়ে বারোটা।

জি. টি. রোড ধরে ট্রাকের আনাগোনার বিরাম নেই, ভিড়-ভর্তি বাস এসে থামছে আটওয়ালের দোকানের সামনে, বস্তা থেকে গড়িয়ে পড়া আলুর মতন হুড়হুড় করে নেমে আসছে মানুষ, উঠছে তার দ্বিগুণ, আধমিনিটের জন্য রাস্তার গণ্ডগোলের সঙ্গে যোগ হচ্ছে বাসের অতিরিক্ত চেঁচামেচি। কালিপাহাড়ীর কয়লা খনিগুলো থেকে সমস্বরে বেজে উঠলো দুপুরের ভোঁ।

জীপের ভেতরের লোক দু'জনের মধ্যে একজন হাতের ঘড়ি দেখে কর্কশ গলায় বললো : এ হাবোল, পঁয়ত্রিশ তো হয়ে গেল। হাবোল তীক্ষ্ণচোখে একবার রাস্তাটায় দৃষ্টি বুলিয়ে উত্তর দিল : আসবে, যাবে কোথায়!

বাইরে যে দাঁড়িয়েছিল সে দু'ভাঁড় চা এনে দিল ওদের হাতে, নিজেও এক ভাঁড় এনে চুমুক দিতে দিতে বললো : যা গলগলিয়ে ঘাম দিচ্ছে, আজ শালা নির্ঘাত বৃষ্টি আসবে। এই জামির, পেন্টুলের বোতাম আটকা, শালা ওরকম কেলিয়ে বসে আছিস কেন?

হাবুল একটু চাপা উত্তেজনার সঙ্গে বললো : কানুদা, ও শালাকে কি গাড়িতে তুলে আনবো, না—

কানুর মুখে উত্তেজনার আভাস নেই, নির্বিকারভাবে বললো : না, গাড়ি নোঙরা করতে চাই না। রাস্তায় চিৎ করে ফেলে আসবি!

—ক'জন থাকবে?

—যে ক'জনই থাক না। 'খোকা'টা বাইরে রেখেছিস তো? জামির তার পাশে, সিটের ওপর চট দিয়ে ঢেকে রাখা একটা কঠিন ধাতব বস্তুর ওপর হাত রেখে বললো : ও ঠিক

আছে!

কথা বলতে বলতে তিনজনেই দূরের রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল, ভাঁড়ের চা তখনও শেষ হয় নি. কানুর চোখ দূরের একটা কালো গাড়ির দিকে আটকে গেল। ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে বললো : ঐ তো টু নাইন ফাইভ থ্রি! রেডি।

কানু দ্রুত তিন লাফে গিয়ে বসলো স্টিয়ারিংএ, পথের ভিড় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সোজা একটা ইউটার্ন নিয়ে জীপটাকে নিয়ে গেল কালো গাড়িটার মুখোমুখি, তীব্রভাবে বললো : চার্জ!

হাবুল তড়াক করে লাফিয়ে নেমে এসে রাস্তার ঠিক মাঝখানে পরপর দুটো হাতবোমা ফাটালো। প্রচন্ড শব্দ ও ধোঁয়ার মধ্যেই রাস্তায় একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, হকাররা মালপত্র রেখেই ছুটলো, কালো গাড়িটা একবার ব্রেক কষেই সঙ্গে সঙ্গে আবার স্টার্ট দিয়ে স্পীড নেবার চেষ্টা করছিল, চটের ঢাকনা সরিয়ে জামির ততক্ষণে ছোট স্টেনগানটা বার করে ফেলেছে, সেটা বুকের ওপর ঠেসে ধরে গুলি চালালো, কট্ কট্ কট্—। গাড়িটা তবু পালাবার চেষ্টা করেছিল, জামির এক ঝাঁক গুলি গুঁজে দিল সেটার ইঞ্জিনে, পাগলের মতন এঁকেবেঁকে, বিকট শব্দ করে সেটা থেমে গেল খানিকটা দূরে, সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোক দরজা খুলে লাফিয়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে আরও এক ঝাঁক গুলি ছুটে গেল সেদিকে। কয়েকটা গুলি উল্টো দিকের দোকানঘরের বন্ধ লোহার পাল্লায় লেগে দড়াম দড়াম করে শব্দ হলো।

কিছুক্ষণ তারপর চুপচাপ। কানু ইঞ্জিন চালু রেখে স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে উল্টো দিকে চেয়েছিল অবিচলিত মুখে। গোলা গুলির সময় একবারও সে পেছনে তাকায় নি। আসলে সে আয়নায় দেখছিল। এবার আয়নার দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললো. এই হেবো, ছুটে যা না শালা!

হাবুল তবুও রাস্তার দুপাশে সতর্কভাবে তাকিয়ে ইতস্তত করছে। কানু সাইড-বোর্ড থেকে রিভলবারটা তুলে নিয়ে রাস্তায় লাফিয়ে পড়লো। মাথার ওপর একটা হাত তুলে ছুটে গেল ও কালো গাড়িটার দিকে। হাবুল চাপা গলায় বললো : কানুদা, সামলে, দানুর হাতে অস্তর আছে নিশ্চয়!

অন্যলোক যাতে মাথা গলাতে না আসে সেইজন্য সাবধানতা হিসেবে সিটের তলা থেকে আর একটা হাতবোমা নিয়ে ছুঁড়ে দিল রাস্তার মাঝখানে। জামির স্টেনগানটা বাগিয়ে বিড়ালের মতন সতর্ক হয়ে রইলো।

কালো মোটরগাড়িটার পেছন দিক দিয়ে না গিয়ে, ইঞ্জিনের সামনে দিয়েই ওপাশে ঘুরে এলো কানু। নতুন টেরিলিনের প্যান্ট শার্ট-পরা একজন সুসজ্জিত ছোকরা ওপাশে টায়রের পাশে শুয়ে কাতরাচ্ছে, তার শরীরে দুটো গুলি লেগেছে—তার রক্তাক্ত কাঁধের পাশে পড়ে আছে একটা পিস্তল। কানু তার কাছে এসে নিজের ভয়ংকর মুখখানা আরও ভয়ংকর করে বললো : দানু কোথায়? এই খানকীর বাচ্চা—দানু কোথায়?

সে লোকটা কাতরাতে কাতরাতে বললো : মরে গেলুম বাঁচাও, কানুদা, তোমার পায়ের ধুলো খাবো, মেরে ফেলো না—

—দানু কোথায় আগে বল?

—এ দিকেই তো লাফিয়ে পড়লো! এবারের মতন বাঁচিয়ে দাও কানুদা।

হিংস্র নেকড়ের মতন কানু ছুটে গেল গাড়ির অন্য প্রান্তে, যাবার আগে পড়ে থাকা পিস্তলটাও হাতে তুলে নিল, খুব সাবধানে উঁকি মারলো গাড়ির পেছনে। সেখানে কেউ নেই। সারা রাস্তায় আর একটাও লোক নেই, কলকাতার দিক থেকে একটা ট্রাক আসছিল, হাবুলের ছোঁড়া বোমার আওয়াজে ভয় পেয়ে সেটা বেশ খানিকটা দূরে ব্রেক কষেছে। কানু মোটরগাড়িটার চারপাশ চক্কর দিয়েও দানুকে খুঁজে পেল না. গাড়ির নিচে উঁকি দিয়ে দেখলো—সেখানেও নেই। আবার সেই আহত লোকটার কাছে ফিরে এসে গর্জন করে বললো : শিগ্গীর বল্ শালা, দানু কোথায়?

লোকটা তখন হাঁপাচ্ছে, হাপরের মতন প্রবলভাবে উঠছে নামছে বুকটা—অতিকষ্টে থেমে থেমে বললো : জানি না, এখানেই ছিল, তোমার পায়ে পড়ছি—একটু জল, তোমার

পায়ে ধরছি—অন্ধের মতন লোকটা মাটিতে একটা হাত হাতড়ে কানুর পা খুঁজতে লাগলো।

দাঁতে দাঁত চেপে কানু বললো : জল খাওয়াবো না তোমাকে ইয়ে খাওয়াবো, কুত্তার বাচ্চা! কানু ভারী বুট জুতোসুদ্ধ পা লোকটার মুখের উপর তুলে দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে একবার চাপ দিল। লোকটার নাক ফেটে গল্‌গল্‌ করে বেরিয়ে এলো রক্ত, মৃত্যু যন্ত্রণায় বুনো শুয়োরের মতন সে চেঁচাতে লাগলো। সেদিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করে কানু ছুটে গেল নিজের জীপের দিকে!

ব্যগ্র জামির আর হাবুলের দিকে তাকিয়ে বললো : দানু কোথায় গেল?

—নেই?

—না। গাড়িতে ছিল তো?

ওরা দুজনেই একসঙ্গে বললো : নিজের চোখে দেখেছি! গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লো! জামির বললো : একটা গুলি নির্ঘাত লেগেছে!

—কিন্তু হাওয়া হয়ে গেল?

—আমরা চোখ রেখেছি, এদিকে তো আসে নি! কিন্তু আর সময় নেই। আর অপেক্ষা করা যায় না। ব্যর্থ আক্রোশে চোখ জ্বালিয়ে কানু বলল : ঠিক আছে, শালা যাবে কোথায়? ওর জান্‌ যদি না নিই, আমি তবে—হেবো ব্যাকটা দ্যাখ—

কানু আবার স্টিয়ারিং-এ বসে হুস্‌ করে গাড়ি ছেড়ে দিল। তিনজনেই চিরুনির মত চোখে তন্নতন্ন করে দেখে নিল রাস্তাটা—দানু কোথাও নেই, রাস্তায় একটা জনপ্রাণীও নেই, নিরুদ্ধ ক্রোধে হাবুলে নিছক অকারণেই একটা বোমা ছুঁড়ে দিল কালো গাড়িটার দিকে। মিনিট খানেকের মধ্যেই জীপটা বরাকরের দিকে মিলিয়ে গেল।

রাত এগারোটার সময় গলিটার সব কটা বাড়ির আলো নিভলে মোড়ের ঝাঁপ ফেলা পানের দোকানটার ঝাঁপ ঠেলে বেরিয়ে এলো দানু। একটা পা টেনে টেনে হাঁটছে। বাঁ বাঁ পায়ের উরুর কাছে প্যান্টটা ছেঁড়া—একটা গামছা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা। ধীরে সুস্থে হেঁটে একটা ছাই রঙের দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়ালো, বাড়িটার দরজা বন্ধ—দরজাটার গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দানু মনস্থির করে ফেললো। দরজার কাছ থেকে সরে এসে পাশের পাঁচিলের কাছে প্যান্টের পকেট থেকে বাকি হাতটা বার করলো। তার কাঁধ সমান উঁচু পাঁচিল, হাতের পাঞ্জা দুটো তার উপর রেখে দু'এক মুহূর্তের জন্য শরীরটা ঠিক করে নিল—তারপর হনুমানের মতন অনায়াস ক্ষিপ্রতায় লাফিয়ে উঠলো পাঁচিলের ওপর, ও-পাশটা অন্ধকারেই ভালো করে নজর করে দেখে ঝুপ করে নেমে পড়লো।

ছোট বাগানের মতন, এক পাশে গোয়ালঘর—সেখান থেকে পচা গোবরের গন্ধ আর দুটো গরুর ফরুর ফরুর নিঃশ্বাসের শব্দ আসছে। দু' এক মিনিট দাঁড়িয়ে উরুর যন্ত্রণাটা একটু সহ্য করে নিল দানু, তারপর পা ঘষড়াতে ঘষড়াতে বাগান পেরিয়ে বারান্দা দিয়ে সোজা চলে এলো সদর দরজার কাছে। দরজায় তালা নেই, ভেতর থেকে খিল আর ছিটকিনি দেওয়া—সে দুটোই খুলে ফেললো! দরজাটা ভেজানোই রইলো। বোঝাই যায় হঠাৎ যদি পালাতে হয়—তাহলে দরজার খিল আর ছিটকিনি খোলার সময়টুকু সে আগে থেকেই বাঁচিয়ে রাখছে।

সবই যেন আগে থেকে তার হিসেব করা—এমনই নিশ্চিন্ত ভঙ্গি। হাতড়ে হাতড়ে সে মিটার বক্সটা খুঁজে পেল, তখন পকেট থেকে লাইটার বার করে খট্‌ করে জেলে দেখলো। সেই সুইচটা অফ করে ইঁদুরের মতন নিঃশব্দে উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে।

লাইটারের সামান্য আলোয় দানুর মুখ দেখা গিয়েছিল। দানুর সঙ্গে কানুর মুখের মিল আছে যথেষ্ট। শুধু তার বয়েস কিছুটা কম, চেহারা আরও বলিষ্ঠ, মুখে সরু করে ছাঁটা দাড়ি। দানু কানুরই আপন ছোট ভাই। ওদের লাইনে দুর্ধর্ষ এবং নিষ্ঠুর হিসেবে দানুর খ্যাতি সাংঘাতিক, পাথরচড়ি কোলিয়ারির অফিস লুট করার সময় তার অসমসাহসের পরিচয় পেয়ে সবাই থ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া কানুর ভাই বলেও সবাই তাকে সমীহ করে। সেই কানুই তার ছোট ভাইকে খুন করতে চায়। দানুকে খুন না

করে সে আর কোনো কাজে হাত দেবে না প্রতিজ্ঞা করেছে।

দানু তার মনে দারুণ দাগা দিয়েছে। কানুর প্রিয় শাগরেদ ভেলুয়া সিং-এর হাত ভেঙে দিয়েছে দানু, আফিং চালানের পুরো ছাব্বিশ হাজার টাকা সে একা মেরে দিয়েছে এবং তার চেয়েও সাংঘাতিক কানুর রক্ষিতা পারুলের ঘরে এক বিছানায় দানুকে সে দেখেছে। মেয়েছেলের ব্যাপারে দানুর বরাবরই বেশী দুর্বলতা, কোথাও ডাকাতি করতে গিয়েও ভালো মেয়েছেলে দেখলে জরুরী কাজ ফেলে দানু সেই মেয়েছেলেকে খানিকটা ভোগ করে নিয়েছে—এসব নিয়ে কানু কখনো তেমন আপত্তি করে নি।

কিন্তু দেশে কি মেয়ের অভাব—যে শেষপর্যন্ত পারুলের সঙ্গেও! পারুলের দোষ ছিল না—না তার মুখ বেঁধে রেখেছিল দানু, যাতে চেঁচাতে না পারে—জোর করে অত্যাচার করেছে। সেদিনই দানুকে শেষ করে ফেলতো কানু, মারার জন্য ছুরিও তুলেছিল কিন্তু অসাধারণ তৎপরতায় বিছানা থেকেই লাফিয়ে উঠে সেই ছুরিসমেত হাত ধরে ফেলেছিল দানু, তারপর পর পর দুটো প্রচণ্ড ঘুষিতে দাদাকে অজ্ঞান করে সরে পড়েছে।

সেই থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে দানু, আজ চারমাসের মধ্যে তার টিকিটিও ছোঁয়া যায় নি। কখনো কলকাতায়, কখনো চন্দননগরে তার নতুন আস্তানায় থেকেছে। আসানসোলের উপর দিয়েও ঘুরে গেছে কিন্তু কিছুতেই তাকে ধরা যায় নি।

প্রথমে গুজব উঠেছিল দানু নিজেই নতুন দল করছে কিন্তু চার মাসের মধ্যেও কোনো নতুন 'কেস' না হওয়ায় ওরা একটু অবাক হয়েছিল—এতদিন তো চুপচাপ বসে থাকার ছেলে নয় দানু—ওরা দানুর মতিগতি বুঝতে পারে নি। কানু রাগে জ্বলেছে, দেখা হলেই দানুকে সাবাড় করে দেবে—এই কথা বলেছে সবাইকে, চ্যালারাই বরং কানুকে বুঝিয়েছে যে আর একবার না হয় ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলা যাক, হাজার হোক মায়ের পেটের ভাই!

কানু রাজী হয়েছিল, ভেলুয়া সিংকে পাঠিয়েছিল কথা বলতে যে, যদি সে বিনা শর্তে ক্ষমা চায় এবং দাদার পা জড়িয়ে ধরে—তবে সকলেই তাকে ক্ষমা করবে। ভেলুয়া সিং মুঙ্গেরে দেখা পেয়েছিল দানুর—আচমকা তার হাতদুটো মুচড়ে ভেঙে দুটো হাতই জখম করে দিয়েছে। তারপরই ওরা ঠিক করেছে, দানু পাগল হয়ে গেছে, পৃথিবী থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

দোতলার একটা ঘরের সামনে দাঁড়ালো দানু। বন্ধ দরজায় সাঙ্কেতিকভাবে টোকা মারলো, টক্ টক্ টক্ টক্ টক্—। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলো। ভেতরে মানুষের নড়াচড়ার শব্দ হলো, সুইচ টেপার আওয়াজ হলো খটাখট। এসব অঞ্চলে প্রায়ই আলো নিভে থাকে—আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মোমবাতি তৈরিই থাকে। মোম জ্বেলে একজন স্ত্রীলোক দরজা খুলতেই দানু তাকে জোর করে ঠেলে ঘরে ঢুকে, বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো।

স্ত্রীলোকটি অসম্ভব ভয় পাওয়া মুখে আর্তকণ্ঠে বললো : তুমি? সাদা দাঁতে ঝকঝকিয়ে হেসে দানু বললো : হ্যাঁ, আমি গো! এখনও ভূত হই নি। মাইরি বলছি, গা ছুঁয়ে দ্যাখো—

হাত দিয়ে নিজের মুখ চাপা দিয়েছিল পারুল। স্তম্ভিতভাবে চেয়ে রইলো দানুর দিকে। পারুলের গড়নটা একটু ভারী কিন্তু কোমরে মেদ জমে নি, টানাটানা চোখে মুখখানা ঢলঢলে। সদ্য কাঁচা ঘুম ভেঙে ওঠায় তার বিস্ময়ের ছাপ দ্বিগুণ হয়ে ফুটে উঠেছে। ধীরে সুস্থে কোমরের বেল্টটা খুলে প্যান্টটা টেনে নামাতে গিয়ে মনে পড়লো গামছার বাঁধনটার কথা, সেটার ফাঁস খুলে প্যান্টটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল একপাশে। আদর করার ভঙ্গিতে নিজের ক্ষতস্থানে নরমভাবে হাত বুলিয়ে বললো, লাও, ডেটল-ফেটল কি আছে—বার করো!

পারুল ফিসফিস করে বললো, তুই এখানে এসচিস্! মরবি যে ড্যাকরা!

দানু মুখ না তুলেই খুশী মেজাজে বললো, তোমার বাবুকে বলো, আমাকে মারতে হলে তাকে আরও সাত জন্ম ঘুরে আসতে হবে!

দানু কোনোদিনই কানুকে দাদা বলে ডাকে নি। অন্যদের সামনে বলে ওস্তাদ কিন্তু পারুলের সামনে বরাবরই বলেছে, তোমার বাবু। এমন অনেকদিন গেছে, কানুর সঙ্গে ওরা তিন চারজন এসে এই একই ঘরে থেকেছে সারারাত, কানু পারুলকে জড়িয়ে নিয়ে শুয়েছে খাটের ওপর—ওরা শুয়েছে মাটিতে। তার রক্ষিতার দিকে কেউ লোভ করবে—একথা, কানু কখনো কল্পনাই করে নি।

দানু আবার ধমকে উঠলো, কই আলোটা এদিকে নিয়ে এসো না, দেখি! দানুর নিশ্চিন্ত ভঙ্গি দেখে পারুল আরও অবাক হয়ে যায়। শুধু জাঙ্গিয়া পরা দানুর সবল নিখুঁত গড়নের উরুর জমাট রক্তমাখা ক্ষত'র সামনে সে মোমটা এগিয়ে আনে। কাদায় মোটরগাড়ির চাকা বসে গেলে যে-রকম দাগ হয়, দানুর উরুতে সেরকম খোবলানো ক্ষত, সেটা ভালো করে দেখে দানু প্রায় আনন্দে শিস্ দেবার ভঙ্গিতে বললো, ওঃ এই! আমি ভেবেছিলাম কি না কি! গুলি-ফুলি কিচ্ছু নেই, ছড়ে গেছে একটু! দাও, ডেটল দাও!

তুলো আর ডেটল নিয়ে এসে পারুল দানুর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। খাটের ওপর বসেছে দানু। পারুল ধরেই নিয়েছে, দানু আজ আবার তার ওপর অত্যাচার করবে। বাধা দিয়ে কোনো লাভ নেই। তার অভিজ্ঞতায় দেখেছে, এই লোকগুলো যখন একটু আহত হয়—তখনই সাংঘাতিক হিংস্র হয়ে ওঠে। আর দানু তো বেপরোয়া। এই চার মাসে কানু তাকে শিকারী কুকুরের মতন খুঁজেছে, আর তারই ফাঁকে দানু দু'বার লুকিয়ে দেখা করে গেছে তার সঙ্গে। শেষবার নিয়ে গেছে তার যথাসর্বস্ব। অনাসক্তভাবে পারুল জিজ্ঞেস করলো, সে কোথায়?

ডেটলে তুলো ভিজিয়ে ক্ষতস্থানে তুলোটা চেপে ধরে দানু বললো, সে আজ দুপুরে বড় রাস্তায় খুব ক্যারদানি দেখাবার চেষ্টা করছিল! গুলি যেন সস্তা! কত গুলির এস্টক—তা আমার ঢের জানা আছে!

—তাহলে তো এক্ষুনি আসবে রে মুখপড়া!

—অত আর আসতে হয় না! লোকজনের সামনে...এখন দু'মাস আর আসানসোল-মুখো হবে না! এই দু'মাসে তোমার গা-গতর সরিয়ে নাও!

—তুই চুপ মার তো! চেঁচাবিনি! পাশের ঘরে লোক আছে।

—আজ দিতুম তোমার বাবুর গলাটা মুরগির নলীর মতন দু'টুকরো করে, নেহাত ওসব এখন বারণ হয়ে গেছে।

—কোথায়, গেল কোথায়?

—সে কি আমার শ্বশুর যে আমাকে বলে যাবে! যাও, ন্যাকড়া আনো!

আলনা থেকে একটা কাপড় ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে খানিকটা ন্যাকড়া এনে দিল পারুল। বললো, দে আমি বেঁধে দিচ্ছি!

বাঁধা হয়ে গেলে পারুল হাই তুললো একটা। তারপর ব্লাউজটা খুলে আলনায় সেটা ছুঁড়ে দিয়ে খাটের দিকে এসে বললো, নে সর্, এখন জ্বালাবে সারা রাত। বেশ ঘুমটা এসেছিল!

যেন খুব কৌতুকের ব্যাপার—এইভাবে দানু দেখছিল পারুলকে। আফসোস মেশানো হাসির সঙ্গে হাতের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে দানু বললো, ওসব এখন বন্ধ, সেই সব বন্ধ!

প্রথমবার দেখার চেয়েও বেশী বিস্ময়ে পারুল তাকিয়ে রইলো দানুর দিকে। দানু ঝুঁকে এসে পারুলের থুতনিটা ধরে নকল দুঃখের সঙ্গে বললো, সব বন্ধ! ইচ্ছে মতন যে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবো তারও উপায় নেই মাইরি!

—নে, নে আর ঢ্যামনাগিরি করতে হবে না। একটু ঘুমুবো।

—মাইরি বলছি, সব বন্ধ, এসব বারণ হয়ে গেছে।

—বারণ হয়ে গেছে? কে বারণ করেছে?

—সেই মাগীটা!

—কোন্ মাগী? চম্পা?

—আর বলো কেন? কোত্থেকে যে ঘাড়ে চাপলো! একেবারে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে, আমি এ লাইন ছেড়ে দিয়েছি।

—তোর কি হয়েছে রে! তুই ওমনি করছিস কেন?

—কি বলবো তোমাকে। শালী আমাকে এমন ফাঁসিয়েছে—এক এক সময় ইচ্ছে করে ঘুমের মধ্যে ওর ঘাড়টা মুচকে ভেঙে দিই, তাহলে সব চুকে যায়!

পারুল এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে দানুকে। দানুর মাথাটা নিজের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করে বলে, ঢং না করে কি হয়েছে ব্যাপারটা খুলে বল্‌তো!

দানুর মুখে এখন সত্যিকারের কষ্টের চিহ্ন। ভিতরের কোনো একটা কষ্টে মুখখানা বিকৃত করেও সে আস্তে আস্তে পারুলের বাহুবন্ধন খুলে দিয়ে একটু সরে বসে। তারপর বলে, মাইরি, মাতাল ছিলুম, না কি ছিলুম গা ছুঁইয়ে পোতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে যে আর কোনোদিন চুরি ডাকাতি করতে পারবো না, ছোরা-ছুরি ছোঁবো না—বলো তো তুমি—এসব পোষায় এখন?

পারুল তীক্ষ্ণভাবে হেসে উঠে বলে, পোতিজ্ঞা করেছিস্! তবে আর কি! তাহলে যা এবার মাগের আঁচল ধরে বসে থাক্ গে!

—মাগী এমন জেদী, কিছুতেই বুঝবে না! সোনাদানা দিয়ে মুড়ে রাখবো বলেছি, তাও শোনে না! আমার অস্তরগুলো সব কেড়ে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। মাথার দিব্যি দিয়েছে, নইলে তোমার বাবু আর ঐ জামির আর হেবোটাকে রাস্তায় ফুঁড়ে ফেলতুম আজ। চেনে না আমাকে! তোমার বাবুকে ব'লো—ফের যদি আমার সঙ্গে লাগতে আসে তাহলে এই খালি হাতেই তার ঘাড়টা মটকে দেবো!

দানুর অক্ষত উরুটায় হাত রেখে আকর্ষণ করে পারুল বললো, ঢের হয়েছে! তুই আয় তো! বুকটা শুষছে আমার! মাগীকে একবার পেলে চোখ দুটো তুলে নিতাম! আর তুইও তেমনি! পোতিজ্ঞা! আজ বাদে কাল রস ফুরোবে—তোদের চিনি না আমি!

—না মাইরি, আমি পারবো না। ও বড্ড রাগ করে! তাহলে আর আমার সঙ্গে কথাই বলবে না!

—না বলুক! এ দেশে আর মেয়ে নেই? দানু এ কথার উত্তর দিল না। খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আহত পা'টা আলতোভাবে মেঝেতে ছোঁওয়ালো। তারপর মুখ ফিরিয়ে অসহিষ্ণু ঝাঁঝালো গলায় বললো, তাইতো বলছি! অমন মেয়ে ঢের ঢের গড়াগড়ি যাচ্ছে! ঐ তো দুটো রোগা হাত আর এইটুকুনি মাথা—তবু ওর জন্যই আমার মাথার ঠিক নেই, মাথায় ভূত চেপেছে আমার! শালা, এত মেয়েছেলে ঘাঁটলুম! শেষকালে এখন আমাকে ফ্যাক্টারিতে চাকরি নিতে হবে, ওফ্! কিন্তু পারি না যে, ওর রাগ দেখলে এমন ভয় পাই, ...রোজ বেরুবার সময় বলে, যা কথা দিয়েচো মনে থাকে যেন—

পারুল হাঁ করে চেয়ে থাকে দানুর দিকে। যন্ত্রণামাথা মুখ দানুর। ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, সবাইকে সব ফেরত দিতে হবে! কি পাল্লায় যে পড়েছি শালা! সবাই এই বলে হাসবে যে দানু সরকার একটা মেয়ের কথায় ভেড়ুয়া হয়ে গেছে! হাসুক শালারা, যে যত পারে হাসুক। আমার সামনে যেন না আসে—

নিচু হয়ে প্যান্টটা তুলে নেয় দানু। পেছনের পকেট থেকে গোছা গোছা দশ আর একশো টাকার নোট বার করে। ভেতরের দিকে সেলাই করা পকেট থেকে টেনে আনে এক ছড়া সোনার হার। হারটা খাটের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বলে, এই নাও তোমার হার—সেদিন যেটা ঝেঁপেছিলুম, আর কত টাকা যেন ছিল? একশো সাতান্ন? এই নাও। পটলা পাবে—নব্বই, এই নাও, বাসু পাবে—একশো দশ, এই নাও! জামির পায় দেড় হাজার—এই, এই, কই নাও! তোমার বাবু আমার কাছে কিছু পায় না—আমিই তার কাছে পাই, ছেড়ে দিলুম সে সব। আফিং বিক্রির টাকা আমার নিজের রোজগার—আমি নিজে নেপালের বর্ডারে মাল বেচছি—তোমার বাবু যদি তাতে লোভ করে—তাহলে বলে দিও, জান্ নিকলে দেবো, হ্যাঁ, খালি হাতেই—দানু এখনও মরে নি—

দানুর বিশাল চেহারা ও নিষ্ঠুর কঠিন মুখখানা অত্যন্ত অসহায় দেখায়। ভেতরে ভেতরে একটা যুদ্ধে সে সম্পূর্ণ হেরে যাচ্ছে বোঝা যায়। একটা নাগপাশে যেন তার

হাত পা বাঁধা। আপন মনেই বিড়বিড় করে বলে, একটা মাগীই আমাকে ফাঁসালো! হাসবে সবাই, হাসুক শালারা! মাথার দিব্যি দিয়েছে! মাথাটাই যদি মুচড়ে ভেঙে দিতে পারতাম, না শালা, আমি একবারে ভেড়োর ভেড়ো হয়ে গেছি। ফ্যাক্টরিতে চাকরি, ঠিক আছে দেখি শালা, কদ্দিন চলে!

ছেঁড়া প্যান্টটাই আবার গলিয়ে নিয়ে দানু একবার পারুলের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে হাসে, তারপর কথা না বলে দরজা খুলে অন্ধকারে বেরিয়ে যায়। অমন একটা তেজী ছেলে লাইন ছেড়ে যাচ্ছে বলে ছড়ানো টাকা-পয়সার মধ্যে বসে থেকে পারুলের কাঁদতে ইচ্ছে করে। এর থেকে আপদটা মরলেও ভালো ছিল, তার মনে হয়!

বিজন তুমি কি

বিজন, তুমি কি কোনো অন্যায় করেছো?

—না, করিনি!

বিজন, তুমি অত জোর দিয়ে বলছো কেন? তোমার মনে কি কোনো দ্বিধা আছে? ভালো করে ভেবে দ্যাখো!

—না, কোনো দ্বিধা নেই। খুব ভালো করে ভেবে দেখেছি। আমি আদর্শের জন্য লড়াই করছি।

—তা হলে তুমি এরকমভাবে একজন হীন অপরাধীর মতন লুকিয়ে রয়েছো কেন? যে আদর্শবাদী, তাকে কি এরকম মানায়?

—নিশ্চয়ই মানায়। এটা একটা স্ট্র্যাটেজি। আমি এখন বাইরে বেরুলেই পাগলা কুকুরগুলো আমায় ছিঁড়ে খাবে। যতদিন সব কটা কুকুরকে পিটিয়ে না মারা হচ্ছে—

অন্ধকার ঘরটার দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে বিজন। প্রচণ্ড গরমকালের দুপুর, আশেপাশে কোথাও কোনো মানুষজন নেই, বাইরে অশ্রান্তভাবে ঝিঁঝি ডাকছে, ঘুম এসে যাচ্ছে বিজনের। গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে চপচপে হয়ে গেছে, গত তিনদিন ধরে পরে আছে এই গেঞ্জিটা। জামাটা খুলে রেখে দিয়েছে মেঝের ওপর, তার নিচে ঢাকা পড়েছে বড় ছুরিটা।

ছুরিটায় এখন রক্ত লেগে নেই। বিজনের হাতেও রক্ত নেই—সে তো তিনদিন আগেকার ঘটনা। কাল রাত্তিরবেলা স্নান করেছিল পুকুরে, এখন আবার স্নান করতে ইচ্ছে করছে কিন্তু বেরুবার উপায় নেই দিনের বেলা। রতনটা জোর করে গোঁয়ারের মতন বেরোলো। এখনো আসছে না কেন রতন? বিজন মনে মনে বুঝতে পারছে এরকমভাবে নির্জন পোড়ো বাড়িতে লুকিয়ে থাকবার মানে হয় না। এখানেই ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশী। লোকজনের মধ্যে ফিরে যেতে হবে, ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকাই নিরাপদ।

রতন গেছে খাবার জোগাড় করে আনতে। তিন দিন ধরেই তো তাকে বাজে খাবার খেয়ে কাটাতে হচ্ছে। গরম গরম ভাত, ডাল আর আলুসিদ্ধ যদি পাওয়া যেত এখন, ঠিক অমৃতের মতন লাগতো। উঃ, কতদিন যেন ওসব খাওয়া হয় নি। হিরন্ময় যে কোনদিকে ছিটকে চলে গেল কে জানে। ধরা পড়ে নি, খবরের কাগজে নাম নেই কিন্তু একা একা গেল কোথায়? ও তো জানতোই যে—এখানে এসে ..

বাঁ পা'টা মচকে গেছে বিজনের, ব্যথায় অসাড়। খিদে তেষ্টা গরমে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। রতনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই এখন। রতন না আসা পর্যন্ত ঘুমোলেও চলবে না, যদি কোনো উটকো লোক হঠাৎ এসে পড়ে—

বিজন, তুমি কি কোনো অন্যায় করেছো?

—না, করিনি।

আবার ভেবে দ্যাখো। এখন তো তুমি একা, নিজের কাছে লুকোবার দরকার নেই।

—না, অন্যায় করিনি।

অন্যায়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, দলের নির্দেশ ছিল হেম চৌধুরীকে শেষ করে

দেবার। হেম চৌধুরী ছিল প্রগতিশীল দলের শত্রু। মুক্তির লড়াই চালাবার জন্যই তাকে সরিয়ে দেবার দরকার হয়েছে, সেখানে ব্যক্তিগত অন্যায়ের কোনো প্রশ্নই উঠে না।

তিনদিন আগে ভোরবেলা বিজন, হিরন্ময় আর রতন দাঁড়িয়ে ছিল, হেম চৌধুরীর বাড়ির সামনের রাস্তার মোড়ে। হেম চৌধুরী রোজ ভোরবেলা বেড়াতে বেরুতেন। রতন আগে থেকেই খবর এনেছিল—উনি রোজ ঠিক সাড়ে ছ'টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়েন। আশ্চর্য, সেদিন কিন্তু সাড়ে ছ'টা বেজে গেলেও উনি বেরোন নি। ওরা তিনজনে দাঁড়িয়ে ছিল। একটু দূরে দূরে, যেন কেউ কারুকে চেনে না। প্ল্যান সব ঠিক করাই ছিল আগে থেকে। অথচ সেই দিনই হেম চৌধুরীর বাড়ি থেকে না বেরুবার কারণ কী—খবর পেয়ে গেছে আগে থেকে! অসম্ভব ওদের দলের কেউ বিশ্বাসঘাতক নয়।

হিরন্ময় কাছে এসে বলেছিল, আজ বোধ হয় আর মক্কেল বেরুবে না। চল, আবার কাল এসে অ্যাটেম্‌ট্ করে যাবো। রতন জিজ্ঞেস করেছিল, কেন, বেরুলো না কেন?

—ঘুম ভাঙে নি বোধ হয়!

—মর্নিং ওয়াক করা যাদের স্বভাব, তাদের ঠিকই ঘুম ভাঙে।

—সর্দি জ্বর-টর হয়েছে বোধ হয়!

—বোধহয় টোধহয় নয়। ডেফিনিটলি জেনে যেতে হবে।

—আজ আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, খবর-টবর নিয়ে কাল আবার আসা যাবে।

—এরকম সামান্য কারণে প্ল্যান করা যায় না।

বিজন চুপ করে শুনছিল ওদের কথা। এবার সেও বলেছিল, হ্যাঁ, আমারও তাই মত। ফট করে প্লান বদলানো উচিত নয়। মোটে তো পৌনে সাতটা বাজে। তারপর অন্তত আধঘণ্টা ওয়েট করে যাবো। হিরন্ময় বলেছিল, এরপর বেশী রোদ উঠে গেলে কি আর কেউ মর্নিংওয়াকে যায়! রাস্তাতেও লোকজন বেড়ে যাবে অনেক।

—বাড়ুক।

—বড্ড চা খেতে ইচ্ছে করছে। চল, ঝট করে এক রাউন্ড চা মেরে আসি।

—পজিশন ছেড়ে এক পাও নড়বি না, হিরন্ময়। পরে চা খাবার ঢের সময় পাবি। আমরা সোলজার, আমাদের প্রাথমিক স্টেপে ডিসিপ্লিন মানতে হবে।

রতন খুব জোর দিয়ে বলেছিল কথাগুলো। রতনের উপর সে কোনো কাজের ভার দিয়ে নির্ভর করা যায়। রতন এখনো আসছে না কেন! খাবার পায়নি? না পেলেও ফিরে আসা উচিত ছিল। এখানে কেউ ওকে চেনে না। যাই হোক রতন পুলিশের হাতে ধরা পড়বে না কিছুতেই—ও ঠিক বেরিয়ে আসবে। তবে দালাল পার্টির লোকেরা যদি—

আবার ঘুম এসে যাচ্ছে বিজনের। জোর করেও চোখ খুলে রাখতে পারছে না। আর কিছু না, যদি এক কাপ চা-ও পাওয়া যেত এখন! রতন বলেছিল, পরে চা খাওয়ার অনেক সময় পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, সময় আসবে, সমাজের শত্রুগুলো যেদিন সব কটা খতম হবে। হিরন্ময়ের মনটা একটু দুর্বল ছিল—যদি বেশী নার্ভাস হয়ে যায়...

ঘুম আসছে, দারুণ ঘুম—এদিকে তো কোনো লোকজন নেই। বিজন কি একটু ঘুমিয়ে নিতে পারে না? একটুখানি ঘুম, অন্তত পাঁচ মিনিট...

—দাদু! দাদু!

একটা কচি গলায় ভয়ার্ত চিৎকার শুনে বিজন ধড়মড় করে জেগে উঠলো; সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কে চ্যাঁচাচ্ছে? একটুক্ষণ কান পেতে শুনলো। কোনো শব্দ নেই। মচকানো পা-টা ঘষতে ঘষতে বিজন উঁকি মারলো বাইরে! কেউ কোথাও নেই। অথচ সে স্পষ্ট শুনলো, একটা বাচ্চা মেয়ের চিৎকার। তাহলে কি সে স্বপ্নের মধ্যে শুনেছে? সেই মেয়েটা—

বিজন, তুমি কি কোনো অন্যায় করেছো?

—না, কোনো অন্যায় করি নি।

হেম চৌধুরী বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিট। বিজন, হিরন্ময় আর রতন একটু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে। রতনের কাঁধে একটা ব্যাগ ঝোলানো। তিনজনেরই পকেটে হাত। তিনজন একবার চোখাচোখি করলো। হেম চৌধুরী গলির মোড় পর্যন্ত

এগিয়ে আসতেই—

না, বিজন সে দৃশ্যটা আর ভাবতে চায় না। কেন বারবার মনে আসছে। অতীতের দিকে তাকানোর কোনো মানে হয় না। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন তাকে বাঁচতে হবে। আবার কাজে নামতে হবে। সামনে কত কাজ, এখনো মানুষের সমাজে দুশমনরা গিজগিজ করছে। বাঁচতে হবে, এরকমভাবে পোড়ো বাড়িতে লুকিয়ে থাকলে আর চলবে না। আজ রাত্তিরেই এখান থেকে বেরিয়ে—বাঁ পা-টায় কিছু ওষুধ-টষুধ না লাগলে যদি বেড়ে যায়—

হেম চৌধুরীকে চিনতোই না বিজন। আগে কোনোদিনও দেখে নি। সুতরাং তাকে খতম করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত কোনো কারণের প্রশ্নই আসে না। রতন তাকে বলেছিল হেম চৌধুরী একজন শ্রেণী শত্রু, তাকে সরিয়ে দেওয়ার প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। দলের নির্দেশে কাজ করেছে বিজন। শুধু সেই মেয়েটা—। আশ্চর্য! একজন মানুষ সম্পর্কে যখন ভাবা হয়, তখন কথাটা মনেই পড়ে না যে সে কারুর সন্তান বা কারুর ভাই বা কারুর বাবা, তার জীবনের সঙ্গে অনেক কিছু জড়িত।

বিজন, তুমি কি অন্যায় করেছো?

—না, আমি কোনো অন্যায় করি নি।

প্রথম ছুরির আঘাত করেছিল রতন। তারপর ওরা তিনজনেই, ওরা তিনজনেই একসঙ্গে এত জোরে দৌড়ে গিয়ে হেম চৌধুরীর গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছিল যে তিনি আত্মরক্ষা করার সামান্য সুযোগও পান নি। হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, চোখ ভর্তি বিস্ময় নিয়েই মারা গেলেন। প্রথম আঘাত খেয়েই চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, ওরে বাবারে, একি একি। মেরো না, আমাকে মেরো না—। সেই সঙ্গে একটা শিশুর চিৎকার।

খবর রাখা হয়েছিল যে হেম চৌধুরী রোজ সকালে বেড়াতে বেরোন। কিন্তু একথা কেউ বলেনি যে ওর সঙ্গে ওর নাতনীও থাকে। পাঁচ ছ বছর বয়েস, টুকটুকে সুন্দর চেহারা, জাপানী পুতুলের মতন দেখতে। মাথার চুলগুলো রেশমের মতন।

আগে ঐ বাচ্চা মেয়েটিকে ওরা লক্ষ্যই করে নি। বিজন প্রথম ছুরি তুলেই ওকে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু তখন আর ফেরার পথ নেই। তখন রতন পর পর দু'বার ছুরি মেরেছে হেম চৌধুরীর ঘাড়ে। কথা ছিল প্রত্যেককেই করতে হবে, প্রত্যেকেরই হাতে যেন লাগে রক্ত, কেউ যেন দায়িত্ব এড়াতে না পারে।

তখন আর ফেরার পথ নেই বিজনের। হেম চৌধুরী পড়ে গেছেন মাটিতে। রতন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে—বিজনও ছুরিটা তুলে মারলো, আর একদিক হিরন্ময়—হেম চৌধুরী পড়ে চিনতে পেরেছেন, রতনের হাত জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে বলছেন, একি, রতন বাঁচাও, মেরো না আমাকে। সুতরাং তখন আর হেম চৌধুরীকে একটুও বাঁচিয়ে রাখা চলে না—একবারে শেষ করে দিয়ে যেতে হবে—।

অনেক সময়, এই রকম পরিস্থিতিতে বয়স্ক সঙ্গীরা ভয়ে পালিয়ে যায়, হেম চৌধুরীর সঙ্গেও যদি বয়স্ক কেউ থাকতো, ওদের বাধা দেবার বদলে নিজের প্রাণ সামলাতো। কিন্তু শিশুর তো ওরকম ভয় বোধ নেই সে বোধহয় প্রথমে বুঝতেই পারে নি কি হয়ে যাচ্ছে। সে দাদু দাদু বলে চিৎকার করে জড়িয়ে ধরলো হেম চৌধুরীকে। তখনও হেম চৌধুরীর শরীরে প্রাণ আছে—এ অবস্থায় ফেলে যাওয়া যায় না, যেটুকু সময় বেঁচে থাকবে, তার মধ্যেই রতনের নাম বলে দেবে। কিন্তু আবার মারতে গেলে মেয়েটার গায়ে লাগবে।

রতন চাপা গর্জন করে বিজনের দিকে তাকিয়ে বলে দিল, মেয়েটাকে সরা। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে বোমা বার করেছে রতন, পালাবার সময় ব্যবহার করতে হবে। বিজন টেনে হিঁচড়ে দূরে সরিয়ে দিল মেয়েটাকে, তার হাতের রক্ত লাগলো মেয়েটার বাহুতে। রতন ততক্ষণ বোমা ছুঁড়েছে হেম চৌধুরীর গায়ে—। শেষবারের মতন দেখছিল বিজন, সেই মেয়েটার মুখখানা যেন নীল হয়ে গেছে, বিস্ফারিত দুটি চোখ—

বিজন, তুমি কি অন্যায় করেছো?

—না, করি নি। আগে জানতাম না, সঙ্গে ঐ বাচ্চা মেয়েটা থাকবে।

একটা নিষ্পাপ শিশু! তার চোখের সামনে এই বীভৎস কাণ্ড হয়ে গেল—ওকি সারাজীবনে আর সুস্থ হতে পারবে? ওতো কোনো দোষ করে নি—ওর জীবনটা যদি নষ্ট হয়ে যায়—

আমি দায়ী নই। সেজন্য আমি দায়ী নই। এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট. ঐ মেয়েটার দাদু তো গাড়ি চাপা পড়েও মারা যেতে পারতো।

কিন্তু মানুষের হাতে মানুষের মরাই পৃথিবীর সবচেয়ে বীভৎস দৃশ্য। ঐ মেয়েটির চোখের সামনে--

—ভুলে যাবে। সব ভুলে যাবে।

যদি না ভোলে? বিজন তোমার মনে কি কোথাও কোনো দাগ কাটে নি?

—না, আমি যা করেছি আদর্শের জন্যে, ও রকম একটা বাচ্চা মেয়ে এসে ভিকটিমের দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এটা তো আগে ভাবি নি।

সন্ধে হয়ে গেল, তখনও রতন ফিরলো না। খিদে আর পায়ের যন্ত্রণা—মিলিয়ে অসহ্য হয়ে দাঁড়ালো বিজনের কাছে। কিছুই যখন করার নেই, বিজন আবার ঘুমিয়ে পড়লো। সারা অঙ্গে, সারা রাত মড়ার মতন পড়ে পড়ে ঘুমোলো বিজন। ভোরবেলা বেরিয়ে পড়লো সেই লুকোনো আশ্রয় থেকে। এখন আর তার কোনো ভয় নেই, এখন তার সে আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক নয়, তাকে মানুষের মধ্যে ফিরে যেতেই হবে।

দিন সাতেকের মধ্যে বিজন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলো। ফিরে এলো বাড়িতে। তাকে কেউ সন্দেহ করে নি, পুলিশ তাকে খোঁজ করে না। সে এখন পরিষ্কার জামা পরে, রোজ দাড়ি কামায়--রাস্তায় যখন বেরোয়--সমস্ত মানুষের মধ্যে সে মিশে যায়, তাকে আলাদা করে চেনা যায় না। কেউ বুঝতেই পারবে না, মাত্র দিন দশেক আগে তার হাত মানুষের রক্তে লাল হয়েছিল।

মাঝে মাঝেই বিজন নিজেকে প্রশ্ন করে, আমি কি অন্যায় করেছি? সঙ্গে সঙ্গেই সে দৃঢ়ভাবে উত্তর দেয়, না অন্যায় করি নি। কোনো অন্যায় করি নি। আদর্শের জন্য--

হঠাৎ হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে বিজন হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে হেম চৌধুরীর বাড়ির রাস্তায়। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে বাড়িটার দিকে। কি একটা দুর্বোধ্য কারণে তার ইচ্ছে হয় ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকতে। ইচ্ছেটা এমনই তীব্র যে এক একদিন সে একেবারে ঐ বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। যেন এক্ষুনি সে কলিংবেলে হাত দেবে।

বাড়িটাতে কিংবা সামনের রাস্তায় সেদিনের কোনো চিহ্নই নেই। বাড়িটার দরজা জানালা বন্ধ, নিস্তব্ধ; কিন্তু রাস্তা দিয়ে ঠিক আগের মতই লোক চলাচল করে, পানের দোকানের সামনে ভিড়, বাড়িতে বাড়িতে রেডিও বাজে। ঠিক যে জায়গায় হেম চৌধুরী পড়ে গিয়েছিলেন বিজন সেখানে দাঁড়ায়। আজ তার হাতে রক্ত নেই, কেউ তাকে চেনে না।

পর পর কয়েকদিন ও পাড়ায় এসে ঘোরাঘুরি করার পর বিজন নিজেই আবার সচেতন হয়ে গেল। এ রকমভাবে সে আসছে কেন? এটা কি বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? তার মধ্যে কি বিবেক যন্ত্রণা জেগেছে? না, মোটেই না। সে তো কোনো অন্যায় করে নি।

তবু যুক্তিহীনভাবে তার প্রাণপণ ইচ্ছে হয় হেম চৌধুরীর বাড়িতে একবার ঢুকতে, একবার সে দেখে আসতে চায়—। একজন মানুষ শুধু একজন আলাদা মানুষ নয়—সে কারুর ভাই। কারুর স্বামী...।

বাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারে না বিজন কিন্তু ও পাড়ার পানের দোকানের সামনে অনাবশ্যকভাবে অনেকক্ষণই দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর কিছু না ভেবেই সে পানওয়ালাটাকে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা হেম চৌধুরী কোন্ বাড়িতে থাকেন?

পানওয়ালা সন্ত্রস্তভাবে তাকায়। তারপর দ্রুত উত্তর দেয়, উনি তো মারা গেছেন।

এ কথা শুনে চমকাবার ভান করা উচিত ছিল বিজনের। কিন্তু সে ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আবার আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, একটা ছোট মেয়ে, ঐ বাড়িতে থাকে, পাঁচ দশ বছর বয়েস, তার কোনো খবর জানো?

পানওয়ালা চোখ নিচু করে, দ্রুত রাস্তার দিকে তাকায়, তারপর নিঃস্ব মানুষের

মতন বললো, তার কথা আর বলবেন না বাবু, রোজ আমার দোকান থেকে টাফি কিনে নিয়ে যেত—আজ দশদিন ধরে তার জ্ঞান ফেরেনি—অনবরত ভুল বকছে...ওরই তো চোখের সামনে...বোধ হয় বাঁচবে না, এরপর আর না বাঁচাই ভালো—

বিজন হনহন করে চলে গেল দোকানটার সামনে থেকে। আর, কোনো দিকে তাকালো না। হাঁটতে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে—হাঁপিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। তারপর একটা পার্কের রেলিং ধরে যেই দাঁড়িয়েছে অমনি তার মনের মধ্যে আবার সেই প্রশ্ন :

বিজন তুমি কি অন্যায় করেছ?

বিজন জোর দিয়ে বললো, না। সেই সঙ্গে সঙ্গেই সে সেই অন্ধকারে একা পার্কের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

মন খারাপ

অন্ধকার রাস্তায় আগাগোড়াই হেড লাইট জেলে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। সেই আলোয় বেশ দূর থেকেই দেখা গেল, ঠিক মাঝ রাস্তায় একটা লোক উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

চক্রধরপুর থেকে রাঁচি যাবার পাহাড়ী রাস্তা। ঘন ঘন বাঁক—এই ঘাট পেরুবার সময় তাই সাবধানে গাড়ি চালাতে হয়। মাঝে মাঝেই ডাকাতির খবর শোনা যায়—তাই স্পীড কম করলেও চলে না—ট্রাক ড্রাইভারেরা ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালায়—সামনে কিছু পড়লে বাধা মানে না। —পিষে, গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। নির্জন পাহাড়ী জঙ্গলে দেখার কেউ নেই।

এইরকম পথের মাঝখানে একটা লোক শুয়ে আছে—সন্দেহ কি বেশ কয়েকটা লরি তার ওপর দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু সুবিমল তা পারবে না। গাড়ির গতি আস্তে করে দিয়ে সুবিমল জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার?

চঞ্চলের একটু তন্দ্রা এসেছিল, বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিল। বরুণা রীতিমত ঘুমিয়ে পড়েছে। চঞ্চলের ছড়ানো ডান হাতের ওপর তার হেলানো মাথা, প্রবল হাওয়ায় তার চুল এলোমেলো। চঞ্চল সুবিমলের কথা শুনে জেগে উঠে প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলো না। তারপর রাস্তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে চমকে উঠে বললো আরে! ওটা কি?

—একটা লোক বলেই তো মনে হচ্ছে।

—মরে গেছে?

—বুঝতে পারছি না। গাড়ি থামবো?

—এই রাস্তায়? গত মাসেই একটা স্টেশন ওয়াগন থামিয়ে লুঠ করেছে।

—তাহলে কি ওর ওপর দিয়েই চালিয়ে দেবে?

—পাশ দিয়ে যাওয়া যায় না?

—চেষ্টা করতে পারি, গাড়ি একবারে ধারে নেমে যাবে—রিস্ক।

—স্পীড তো স্লো করতেই হবে তা হলে।

মাথার নিচ থেকে হাত সরিয়ে নেওয়ায় বরুণাও হঠাৎ জেগে উঠলো। গাড়ি তখন লোকটার খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে, সেদিকে চোখ পড়তেই বরুণা চেঁচিয়ে উঠলো। একটা লোক, চাপা পড়বে, চাপা পড়বে—শিগ্‌গির থামাও—

বরুণার চিৎকার শুনেই হ্যাঁচকা ব্রেক কষে গাড়িটা থামালো। লোকটার থেকে মাত্র হাত তিনেক দূরে। সুবিমল আর চঞ্চল লোকটাকে দেখার আগে প্রথমেই রাস্তার দু'দিকে তাকিয়ে দেখে নিল দ্রুত। বলা যায় না ফাঁদও হতে পারে। এরকমভাবে গাড়ি থামিয়ে তারপর দুপাশ থেকে ছুটে আসবে। কিন্তু কেউ নেই, জমাট অন্ধকারের মধ্যে গাছগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে—তাদেরও অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় হাওয়ার শব্দে। রাস্তার পাশেই একটা কালভার্ট, কাছাকাছি জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

বরুণা তাড়া দিয়ে বললো, দেখছো কি! নামো।

সুবিমল উদাসীনভাবে বললো, নেমে কি করবো? যদি মরে গিয়ে থাকে—আমি

ডেড বডি ছুঁতে পারবো না।

—রক্ত কই, রক্ত তো দেখছি না! চেহারা দেখে ভদ্রলোক মনে হচ্ছে।

—মড়া আবার ভদ্রলোক আর ছোটলোক! খানিকটা আগে পরপর তিনটে ট্রাক আমাদের ওভার টেক করে যায় নি?

—তা বলে নেমে দেখবে না তোমরা?

সাইড বোর্ড থেকে বড় টর্চটা বার করে চঞ্চল ততক্ষণে গাড়ির দরজা খুলেছে। সুবিমলকে বললে, চল, একবার দেখা যাক। যদি মরে গিয়ে থাকে—পা ধরে টেনে রাস্তার একদিকে সরিয়ে দেবো এখন! বরুণা তুমি গাড়িতে থাকো!

লোকটা শুয়ে আছে হাত-পা ছড়িয়ে। কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ। প্যান্ট শার্ট পরা যুবক—এত রাত্রে এরকম চেহারার কারুকে এ রাস্তায় দেখতে পাবার কথা নয়। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। হতে পারে কেউ চলন্ত গাড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তা হলেও তো রাস্তার এক ধারে থাকার কথা। কিন্তু হাতে পায়ে সত্যিই রক্তের চিহ্ন নেই। সুবিমলের এসব ব্যাপারে কুসংস্কার আছে—অপরিচিত মরা সে ছোঁয় না। চঞ্চল পা দিয়ে ঠোক্কর মেরে দেহটা ওল্টাবার চেষ্টা করলো। পারলো না। সুবিমল দূরে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ব্র্যান্ডির বোতল বার করে চুমুক দিয়ে নিল একটা। চঞ্চল নিচু হয়ে হাত দিয়েই ঠেলে দেহটাকে এবার উল্টে দিল। শরীরে কোথাও কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই। লোকটার একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখলো চঞ্চল। জীবন্ত। চোখের পাতা টেনে দেখতে যেতেই লোকটা চোখ মেললো। সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, উঃ, আপনারা এত দেরি করছিলেন যে আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল!

লোকটা উঠে বসার সময় সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভয় পেয়ে দু'পা পেছিয়ে এসেছিল চঞ্চল। চেঁচিয়ে উঠেছিল বরুণা। ব্র্যান্ডির বোতলের ছিপিটা টাইট করার ব্যাপারে সামান্য অন্যমনস্ক ছিল বলে সুবিমল ভয় পাওয়ার সুযোগ পায়নি। এবার সে দারুণ চটে উঠলো। বললো, এসব কি ব্যাপার?

আগে দেখে যা মনে হয়েছিল, বয়েস তার চেয়েও কম, ছাব্বিশ-সাতাশের বেশী নয়। ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে তখন ধুলো ঝাড়ছে পোশাক থেকে! বেশ সপ্রতিভভাবেই বললো, আপনারা তো রাঁচি যাচ্ছেন, আমাকে একটু পৌঁছে দেবেন?

—এখানে আপনি কি করছিলেন?

—সেই সন্ধ্যে থেকে হাত দেখাচ্ছি—একটা গাড়িও থামছে না, লাস্ট বাস চলে গেছে বিকেল পাঁচটায়—সেটা মিস্ করেছি, কোনো ট্রাক বা গাড়িই লিফ্‌ট দিচ্ছে না, তাই শেষপর্যন্ত মরীয়া হয়ে..

—এখানে আপনি কোথা থেকে এলেন?

—হেসাডি'র ডাকবাংলোয় ছিলাম। হঠাৎ সেটা ছাড়তে হলো—ভেবেছিলুম পায়ে হেঁটেই চলে যাবো—

কিন্তু এই রাত্তিরে—পাহাড়ী রাস্তা কি রকম সাংঘাতিক আপনি কিছুই জানেন না! আমাদের সবাইকেই মারতে বসেছিলেন।

—না, না, এ রাস্তা তেমন খারাপ নয়। আমি তো অনেকক্ষণ থেকেই এখানে বসে আছি—ভয়ের কিছু নেই।

—আপনার কোনো কথা আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না।

—সেকি? কেন? অবিশ্বাসের কি আছে?

দূরে থেকে ট্রাকের আওয়াজ শোনা গেল। সুবিমল ব্যস্ত হয়ে উঠে বললো, আবার ট্রাক আসছে—মাঝ রাস্তায় আমাদের গাড়ি একেবারে ছাতু করে দেবে। চঞ্চল, কুইক! কুইক! ব্যাক টু দি কার—

চঞ্চল আর সুবিমল ছুটে এসে দুধার থেকে উঠে পড়লো। ছেলেটিও এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমি পিছনের সীটে বসবো?

চঞ্চল রুক্ষভাবে বললো, আপনার পুরো ব্যাপারটাই কিরকম ফিসি মনে হচ্ছে। অজানা-অচেনা লোককে আমরা গাড়িতে তুলতে পারবো না!

চঞ্চলের উরুতে হাত রেখেছে বরুণা। সামান্য চাপ দিয়ে ফিসফিস করে বললো, ওকি. তুমি এখানে ওকে ফেলে রেখে যাবে নাকি?

সুবিমল স্টার্ট দিয়েছে গাড়িতে। অসহিষ্ণুভাবে বললো, যা করবার তাড়াতাড়ি করো। নিন্ নিন্ উঠে পড়ুন মশাই পেছন দিকে। এ ভাবে মাঝ রাস্তায় ইয়ার্কি করে গাড়ি থামানো অন্যায়। যে-কোনো মুহূর্তে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারতো!

ইয়ার্কি নয়, বিশ্বাস করুন! শেষপর্যন্ত মরীয়া হয়েই—

ছেলেটির নাম জানা গেল, দীপক সরকার। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ফিফথ ইয়ারে পড়ে। একটু পাগলাটে ধরনের, একটু বেশী কথা বলে, নিজেই গড়গড় করে নিজের সব কথা বলে যেতে লাগলো। একা একা বেড়াতে বেরিয়েছে। কোথায় কখন থাকবে ঠিক নেই। দুদিন ছিল হেসাডির ডাকবাংলোয়। আজ সন্ধেবেলা সেখানে বিহারের এক উপমন্ত্রী সদলবলে এসে উপস্থিত। বাংলোর দু'খানা ঘরই তাঁর লাগবে। প্রথমে সে ঠিক করেছিল বাংলোর বারান্দায় শুয়েই রাত কাটিয়ে দেবে—যদিও এখানে হায়েনা আর ভাল্লুকের উপদ্রব আছে—তবুও সে রাজী ছিল—কিন্তু উপমন্ত্রীর চ্যালারা তার সঙ্গে অপমানজনকভাবে কথা বলায় সে রাগ করে বেরিয়ে পড়েছিল। ঠিক করেছিল সারারাত হেঁটেই রাঁচি চলে যাবে। ওর গল্প শুনতে শুনতে চঞ্চল ভাবলো, পাগল ছাড়া কেউ এখান থেকে রাঁচি পর্যন্ত হেঁটে যাবার কথা ভাবে? রাঁচিই এ লোকের যোগ্য জায়গা!

চড়াই উৎরাইয়ের রাস্তায় চার-পাঁচ মাইল হেঁটেই হাঁপিয়ে পড়েছিল, বুঝতে পেরেছিল সারারাত এই জঙ্গলে কাটানো অসম্ভব। তারপর থেকে একটার পর একটা গাড়ি থামাতে চেষ্টা করেছে। ডাকাতের ভয়ে কোনো গাড়িই থামে নি। শেষপর্যন্ত গাড়ি থামাবার এই অভিনব উপায়টি সে নিজেই মাথা থেকে বার করেছে।

একটা ট্রাক তীব্র হর্ন বাজাতে বাজাতে পাশ দিয়ে ঝড়ের গতিতে চলে গেল। সেই দিকে ইঙ্গিত করে কঠিন হেসে সুবিমল বললো, আমরা বলেই গাড়ি থামিয়েছি। ঐ রকম একটা ট্রাকের সামনে পড়লে ওরা কোনো দয়া মায়া করতো না—এতক্ষণে তালগোল পাকিয়ে ভূত হয়ে যেতেন।

সরলভাবে হাসতে হাসতে ছেলেটি বললো, তা আর জানিনা। দু'দিন এখানে আছি—ট্রাকের দৌরাত্ম্য খুব দেখেছি। আমি কালভার্টের ওপর বসেছিলুম—ট্রাক দেখে আর এগোইনি। আপনাদের গাড়ির আলো দেখেই বুঝেছিলাম প্রাইভেট কার—তখনই মাঝ রাস্তায় এসে...

বরুণা প্রায় সম্পূর্ণ ঘুরে বসে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছেলেটির কথা শুনছিল। এখন আর চঞ্চলের উরুতে তার হাত নেই বরং চঞ্চলের হাত তার উরুর ওপর। বরুণার উরুতে চঞ্চলের হাত দুষ্টুমির খেলা খেলছে। বরুণা মাঝে মাঝে টেনে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে সেই হাত।

বরুণা এবার জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোন্ সাহসে ওখানে শুয়ে ছিলেন? যদি সত্যিই আমরা আপনাকে চাপা দিয়ে চলে যেতুম?

দীপক এতক্ষণ অনেকটা আপন মনেই কথা বলছিল!

ঠিক কারুর মুখের দিকে তাকায় নি। কখনও সে বাইরের চলন্ত অন্ধকার দেখছিল কখনও নিজের হাতের পাঞ্জা। এবার সে বরুণার মুখের দিকে তাকালো। গাড়ির মধ্যেকার চাপা অন্ধকারে বরুণার ফর্সা মুখখানি গন্ধরাজ ফুলের মতন ফুটে আছে। দীপক কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে আলতোভাবে বললো, যাঃ, তা কি হয় নাকি? একটা মানুষ দেখেও কেউ কখনও চাপা দেয়?

—যদি দেখতে না পেতুম?

—ঐ জন্যেই তো রাস্তার ঠিক মাঝখানে শুয়েছিলুম—গাড়ির স্পীড কমালে সেই আওয়াজ শুনেই বোঝা যায়। বেগতিক্ দেখলে গড়িয়ে রাস্তার পাশে চলে যেতুম!

যেন একটা খেলা, দীপকের কথার ভঙ্গী এই রকম। বরুণা উৎকণ্ঠিতভাবে তাকিয়ে রইলো। তার জীবনে সে রকম দেখে নি কখনো। নিঝুম মাঝ রাত্তিরে এই রকম

ভয়ংকর রাস্তার মাঝখানে সে শুয়েছিল গাড়ি থামাবার জন্য। আবার নাকি গড়াতে গড়াতে রাস্তার পাশে চলে যেত। একটুও প্রাণের ভয় নেই ছেলেটার। বরুণা জোর করে নিজের উরু থেকে চঞ্চলের হাতটা সরিয়ে দিল। চঞ্চলের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই একটা বিরক্ত ভঙ্গি করলো বরুণা।

সুবিমল ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ মশাই, আপনি কি কবিতা-টবিতা লেখেন নাকি?

সামান্য বিব্রতভাবে দীপক বললো, কেন বলুন তো?

—নইলে এই জঙ্গলে একা একা বেড়াতে এসেছেন! এরকম উৎকট শখ আর কার হবে?

—বাঃ, মানুষ বেড়াতে যায় না!

—তা যাবে না কেন কিন্তু বেড়াবার জায়গা-অজায়গা বলে তো একটা ব্যাপার আছে!

বরুণা অপলকভাবে ছেলেটিকে দেখছিল, তার মুখ থেকে একবারও চোখ সরায় নি। এবার আবার জিজ্ঞেস করলো, রাঁচিতে আপনার চেনা কেউ আছে। কোথায় থাকবেন?

—কোনো ঠিক নেই। দেখি কোনো একটা জায়গা খুঁজে নেবো। ধর্মশালা আছে নিশ্চয়ই।

—ধর্মশালা কেন? আপনার জন্য খুব ভালো একটা জায়গা আমরা ব্যবস্থা করে দেবো। আপনাকে সেখানে খুব মানাবে।

সুবিমল জোরে হেসে বললো, ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো বরুণা। কাঁকের সুপারিনটেণ্ডেন্ট-এর সঙ্গে আমার চেনা আছে। একে সোজা সেখানেই ভর্তি করে দিতে হবে!

যতক্ষণ বরুণা কথা বলছিল, দীপক মুখ টিপে হাসছিল। সুবিমলের কথা শুনে কিন্তু বললো, দেখুন, রাঁচি যাবার কথা শুনলে কিন্তু সবই ঐ এক রসিকতা করে! এতদিনেও এটা পুরোনো হয়ে যায় নি!

—না, পুরোনো হবে কেন? পাগলের কি অভাব আছে?

রাঁচি পৌঁছতে ভোর হয়ে গেল। চঞ্চল অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বরুণা আর ঘুমোয় নি, সুবিমলকে জাগিয়ে রাখার জন্য সারাক্ষণ জেগে গল্প করেছে। সবচেয়ে আরামে ঘুমিয়েছে দীপক—পিছনের সিটটা সম্পূর্ণ তার একার—দিব্যি আরাম করে পা ছড়িয়ে ঘুমিয়েছে। শহরে ঢোকার মুখে সুবিমল বলেছিল, আহা যাক্ না, বাড়ি পর্যন্ত চলুক। চা-টা খেয়ে না হয় যাবে।

কম্পাউণ্ডে ঢোকার পর বরুণা চঞ্চলকে জাগালো, দীপক তখনও ঘুমিয়ে। চঞ্চল যেন ওর কথা ভুলেই গিয়েছিল, জিনিসপত্র নামাতে গিয়ে ওর প্রতি চোখ পড়ায় বললো, একি ছোঁড়াটা এখনও রয়েছে দেখছি! মহানন্দে ঘুমোচ্ছে! সুবিমল একে এখনো বিদায় করিস্ নি? বরুণা বললো, ওকি ও কিরকম বিশ্রী ধরনের কথা। ভদ্রলোকের ছেলে—এক কাপ চা না খাইয়েই বিদায় করবে?

ঘুম থেকে উঠেই দীপক মহা আরামে আড়মোড়া ভাঙলো। তারপর বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললো, এইটা আপনাদের বাড়ি? বাঃ, চমৎকার বাড়িটা তো! তাকে আমন্ত্রণ জানাবার কোনো সুযোগ না দিয়ে সে নিজেই ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে গট গট করে হেঁটে বারান্দায় উঠলো। বেতের চেয়ারে ঝপ করে বসে আরেকবার বললো, ভারী সুন্দর বাড়িটা, ফার্স্ট ক্লাস!

সুবিমল আর চঞ্চল চোখাচোখি করলো, দু'জনেই তারপর বরুণার দিকে, বরুণা হেসে ফেলতেই ওরাও হাসতে বাধ্য হলো। চাকর মালপত্র তুলছে—বরুণা বারান্দায় উঠে এসে দীপকের দিকে তাকিয়ে বললো, বসুন, চা খেয়ে তারপর যাবেন।

দীপক ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সারা বাড়িটা পর্যবেক্ষণ করছিল। এক তলা বাড়ি, খানচারেক ঘর, পাশ দিয়ে টানা বারান্দা, মাঝখানে ছোট্ট বাগান। সদ্য রং লাগানো হয়েছে দেয়ালে, সেই টাটকা গন্ধও পাওয়া যায়।

দীপক বললো, বেশ বড় বাড়ি তো আপনাদের—এখানেই থেকে যাই না দু'একদিন।

এরপর পালামৌ যাবো। আপনাদের ঘর খালি নেই?

ছেলেটার হাবভাবে বরুণা তখনো হাসছে, উত্তর দিল, এ বাড়ি আমাদের নয়। ঐ যে ওর!

চোখের ইশারায় সুবিমলকে দেখিয়ে দিল বরুণা।

দীপক তখুনি উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল সুবিমলের দিকে। সরাসরি বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করলো, আপনার বাড়িতে দু'একদিনের জন্য থাকতে দেবেন আমাকে? খুব উপকার হয় তা হলে।

চঞ্চলের সঙ্গে কি ব্যাপারে যেন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছিল সুবিমল। বাধা পড়ায় ভুরু তুলে তাকালো। দীপক কথাটা আবার বললো, দু'একদিনের জন্য আপনার বাড়িতে একটু থাকতে দেবেন? খুব ভালো হয় তা হলে। আমার হোটেলে থাকার পয়সা নেই।

—না। মাপ করবেন, আমার অসুবিধা আছে।

—আমি কিছু অসুবিধে করবো না। চুপচাপ এক কোণে থাকবো। সারাদিনের বেশীর ভাগ সময় বাড়িই থাকবো না, শুধু রাত্রিরটা, কোনো অসুবিধে হবে না।

—আমি আপনার অসুবিধের কথা বলি নি। আমি বলেছি, আমার অসুবিধে আছে।

—কি অসুবিধে? আপনার বাড়িতে এতোগুলো ঘর রয়েছে, লোকজন বিশেষ কেউ নেই—

—ঘর থাকলেই যে আপনাকে থাকতে দিতে হবে তার কোনো মানে আছে?

—কেন থাকবে না? আপনি ভেবে দেখুন, আপনার ঘর শুধু শুধু খালি থাকবে, আর আমি ওদিকে—

মাঝ পথে বাধা দিয়ে চঞ্চল রুক্ষভাবে বললো, এসব কি এঁড়ে তর্ক হচ্ছে? এই যে ভাই, শোনো, তুমি বিপদে পড়েছিলে, এতটা রাস্তা তোমাকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে—এবার কেটে পড়ো!,

—আপনি ওরকমভাবে কথা বলছেন কেন? আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন বলে কি আমার সঙ্গে 'তুমি' বলে কথা বলবেন? আপনাদের গাড়িতে জায়গা ছিল, তাই আমাকে এনেছেন —এমন কিছু বড় ব্যাপার নয় এটা।

চঞ্চল আহতভাবে তাকালো—সুবিমলের দিকে। জিভ দিয়ে আপসোস-সূচক শব্দ করে বললো, একটু কৃতজ্ঞতা বোধও নেই আজকালকার ছেলেদের। ঐ জন্যই বলেছিলুম, না আনলেই হতো। এরা বসতে পেলে শুতে চায়! এখন ঠেলা সামলাও!

—আমি এমন কিছু অন্যায় কথা বলি নি আপনাকে। আপনাদের বাড়িতে শুধু শুধু খালি ঘর পড়ে আছে—আমি দু'একদিন থাকবো—কোনো অসুবিধে করবো না।

হঠাৎ ধৈর্য হারিয়ে ফেললো চঞ্চল। দীর্ঘ চেহারা নিয়ে দীপকের কাছে চলে এসে প্রচণ্ড চিৎকার করে বললো, তুমি যাবে? না তোমাকে ঘাড় ধরে তাড়াতে হবে?

সেই চীৎকারে দীপক কেঁপে উঠল না। স্থির চোখে চঞ্চলের দিকে তাকিয়ে বললো, অত চ্যাঁচাবার দরকার ছিল না! থাকতে না দিলে আমি এমনিই চলে যেতুম!

—তোমাদের টাইপের ছেলেদের আমি খুব চিনি। ভ্যাগাবণ্ড লুচ্চা—

—আপনি বাজে বাজে কথা বলবেন না! আপনি আপনার কথা উইথ ড্র করুন!

—ফের ত্যাঁদড়ামি।

—আমার গায়ে হাত দেবেন না বলছি। ভালো হবে না।

—কি করবে কি? অ্যাঁ? বেশী তেল হয়েছে...

—আমার পকেটে ছুরি আছে, আপনার ঘাড়ে বসিয়ে দেবো। রাগাবেন না আমাকে—ভেবেছেন একা পেয়ে—

ছেলেটি সত্যিই পকেট থেকে একটা পেনসিল কাটা ছুরি বার করলো। সুবিমল ওদের মাঝখানে এসে চঞ্চলকে সরিয়ে দিয়ে তিক্ত গলায় বললো, ঠিক আছে ভাই, আপনাকে গাড়ি করে এনে আমরাই ধন্য হয়েছি—এখন আর আপনাকে বাড়িতে থাকতে

দিয়ে কৃতার্থ হতে পারবো না। এবার হাত জোড় করে বলছি, আপনি যান।

দীপক আর কোনো কথা বললো না। ছুরিটা পকেটে ঢুকিয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে এসে তার ঝোলাটা তুলে নিল। বরুণা মূর্তির মতন নিঃশব্দে আগাগোড়া বারান্দাতেই দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। এবার মৃদুস্বরে বললো, আপনাকে চা খেতে বলেছিলাম! একটু বসে চা খেয়ে যান্।

ঘাড় ঘুরিয়ে বরুণার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসলো দীপক। মৃদু গলাতেই বললো, আমি সব বাড়িতে চা খাই না।

তারপর সোজা হেঁটে গেট পেরিয়ে চলে গেল সে। গেটের বাইরে গিয়ে ডানদিকে যাবে না বাঁ দিকে যাবে ঠিক করতে পারল না যেন—রাস্তা পেরিয়ে ডানদিকেই চলে গেল।

যতদূর দেখা গেল—সেইদিকে চেয়ে রইলো বরুণা।

চায়ের টেবিলে কিছুক্ষণ ঐ ছেলেটির কথাই হলো। চঞ্চল খুবই রেগে গেছে। আবার পুঁচকে ছুরি তুলে তাকে ভয় দেখায়। উচিত ছিল হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দেওয়া। বিনা পয়সায় এতখানি পথ গাড়ি চেপে আসতে পেলো তার জন্য এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই! ওর পেটের ওপর গাড়ির চাকাগুলো চালিয়ে দিলে তখন কে দেখতো! তাছাড়া চোর-ছ্যাঁচোড় কিনা ঠিক নেই! বাড়িতে থাকতে দিলে নির্ঘাত কিছু চুরি করে পালাতো! সেই মতলবেই এসেছিল নিশ্চয়!

বেশীর ভাগ সুবিমল আর চঞ্চলই বলছিল। বরুণা শুনছিল চুপচাপ। একটু পরেই শাড়ি বদলাতে এলো নিজের ঘরে, চঞ্চলও এলো তার পিছু পিছু। ঘরে ঢুকেই দরজা ভেজিয়ে চঞ্চল তাকে জড়িয়ে ধরলো। যখন তখন আদর করাই চঞ্চলের খেয়াল। বরুণা বললে, এই, ছি, ছি, কি হচ্ছে, সুবিমলবাবু এক্ষুনি এসে পড়বেন!

কিন্তু মিনিট পাঁচেকের আগে চঞ্চল ছাড়ে না। নিস্পৃহভাবে ব্লাউজের বোতাম আঁটিতে আঁটতে বরুণা চলে যায় আলমারির দিকে. সেখান থেকেই ফিরে তাকিয়ে বলে, তুমি ছেলেটাকে ওরকমভাবে তাড়িয়ে দিলে কেন?

চঞ্চল অবাক হয়ে বললো তাড়াবো না?

—তোমার তো বাড়ি নয়, সুবিমলবাবুর বাড়ি—তাড়াবার হলে উনি তাড়াবেন—তুমি বেশী বেশী করে বলতে গেলে কেন?

—সুবিমল একটু ভীতু ধরনের। ও মিনমিন করতো জানো না। ঐ সব ছেলেদের লাই দিলে মাথায় ওঠে। নিশ্চয় কিছু চুরি করতে এসেছিল। আমি আর সুবিমল দু'জনেই ব্যস্ত থাকব সারাদিন।

—ছিঁচকে চোর হলে কি ঐ রকম দুঃসাহসীর মতন মাঝ রাত্রে গাড়ির রাস্তায় শুয়ে থাকে?

—ভদ্দরলোকের ছেলেরাও রাস্তায় শোয় না। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার কথা সব ডাহা গুল!

—আমার তা মনে হয় না। আমি চা খেয়ে যেতে বলেছিলাম, তোমরা তাও দিলে না! যাবার সময় কি ঘৃণার চোখে তাকিয়েছিল আমাদের দিকে।

—একটা লোফার, তার জন্য তোমাকে অত ভাবতে হবে না!

তারপর সারাদিন সুবিমল আর চঞ্চল দু'জনই খুব ব্যস্ত রইলো। সুবিমল যে অফিসের অফিসার সেই অফিসে শিগগিরই একটা বড় সাপ্লাইয়ের কন্ট্রাক্ট দেওয়া হবে। এমন জরুরী ব্যাপার যে টেনডার কল করারও সময় নেই। সুবিমল ভেতরের কথা জানে —এই কন্ট্রাক্টটা চঞ্চলকে দিয়ে ধরাতে পারলে দেড় লক্ষ টাকার বিল—অন্তত তিরিশ হাজার টাকা নীট লাভ থাকবে। শনিবার দুপুরেই সে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে জামসেদপুর থেকে চঞ্চলকে নিয়ে ফিরেছে রাতারাতি। সারাদিন বার বার সঙ্গে দেখা করার সেরে এল দু'জনে। সন্ধেবেলা কর্তাদের খুশী করার জন্য পার্টি হবে। তার জন্য বাজারও সারতে হচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে।

সারাদিন বরুণা প্রায় একাই বাড়িতে রইলো। ওরা দু'জনে যখন ফাঁকে ফাঁকে বাড়ি আসছে—তখনও তারা নিজেদের মধ্যে সেই কন্ট্রাক্ট, ওয়াগন রিজার্ভেশান, ঘুষ, ট্যাক্স—এইসব কথাতেই মত্ত হয়ে রইলো। বরুণা তার স্বামীর এই ব্যস্ততা আগেও দেখেছে। আগে কখনও তার খারাপ লাগে নি। কোনো ব্যাপারেই সময় নষ্ট করতে চায় না চঞ্চল। এমন কি স্ত্রীকে আদর করার ব্যাপারেও—দুটো শব্দের মাঝখানে দশ পনেরো মিনিট সময় হাতে থাকলে সেই সময় টুকুতেই আদর করে যায়—কিন্তু কখনও বরুণার জন্যই গোটা এক সপ্তাহ বা একটা দিন—সে কল্পনা করতেই পারে না। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়েস, এই বয়সেই কত উন্নতি করেছে চঞ্চল।

সন্ধেবেলা পার্টিও খুব জমে গেল। পার্টিতে কোন্ কোন্ লোকের সঙ্গে একটু বেশী মিষ্টি হেসে কথা বলবে বরুণা—চঞ্চল এক ফাঁকে দেখিয়েছিল। একটু মিষ্টি হেসে কথা বললে দোষ কি, একথা মিষ্টি হেসেই বলেছিল চঞ্চল। বহু বোতল মদ খোলা হয়েছে, দেখতে দেখতে উড়ে গেল দেড় ঘন্টার মধ্যে।

উৎসবের শেষে নিজের ঘরে এসে চুপ করে শুয়ে আছে বরুণা। সব চুকিয়ে দিয়ে চঞ্চলও ফিরে এলো। বেশ নেশা হয়েছে তার বরুণাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজলো। উত্তাপহীনভাবে বরুণা বললো, ছাড়ো, আজ ভালো লাগছে না।

—ভালো লাগছে না? কি বলছো বরুণা! আজ দারুণ লাকি ডে একটা, কত সহজে কন্ট্রাক্টটা হয়ে গেল। অবশ্য সুবিমল হেলপ করেছে—ওকে দেবো থার্টি পারসেন্ট—আরও অনেক কণ্ট্রাক্ট বাগাবার স্কোপ আছে। ভাবছি রাঁচিতে একটা অফিস খুলবো। জামসেদপুর আর রাঁচি—দু'জায়গায় যদি চালাতে পারি—একটু বেশী ঘোরাঘুরি করতে হবে—আর, এত শক্ত করে গিঁট বেঁধেছো কেন?

কাঠের মতন শক্ত হয়ে শুয়ে রইলো বরুণা। তার বারবার মনে পড়তে লাগলো সেই বাউন্ডুলে ছেলেটার কথা—যে অকারণে জঙ্গলে ঘুরছে, কোথায় কখন থাকবে ঠিক নেই—রাস্তায় শুয়ে পড়তে পারে অনায়াসে, কি সরলভাবে বলেছিল, আপনার বাড়িতে বেশী জায়গা আছে—আমাকে থাকতে দেবেন না কেন? এরা অন্য কোন্ জগতের মানুষ।

—তুমি সেই ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিলে—সারাদিন আমার মন খারাপ লাগছে।

—আবার সেই চোর ছোঁড়াটার কথা : তোমার কি হয়েছে বলো তো?

—সেই ছেলেটাকে দেখার পর থেকে মনে হচ্ছে, তোমাকে বিয়ে করে আমি ভুল করেছি।

অপরেশ রমলা ও আমি

আমি প্রথমটা দেখতে পাইনি। বাসে উঠতে যাচ্ছি, একজন মহিলা নামছেন দেখে পথ ছেড়ে দাঁড়িয়েছি। এক পায়ে চটি, ভদ্রমহিলার পায়ের দিকে তাকিয়েই আমার বুকটা একটু শিরশির করে উঠল। মনে হল, এই পা দুটি আমার হাতের মতন, বহুদিন আমি এই দুটি পা আমার হাতের মুঠোয় ধরেছি। চোখ তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রমহিলাকে পুরোপুরি দেখে বললুম, তুমি?

রমলা তখন বাস থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। আমার সে বাসে ওঠা হল না। জিজ্ঞেস করলুম, কেমন আছ?

রমলা হেসে সামান্য ডানদিকে ঘাড় হেলিয়ে বলল, আপনি কেমন আছেন?

'আপনি' শুনেই বুঝলুম, রমলার পিছন পিছন যে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ লোকটি নেমেছে, সেই রমলার স্বামী। রমলা কোনোদিনই আমাকে অন্য লোকের সামনে তুমি বলত না। অন্য লোকের সামনে আমি ছিলাম ওর দাদার একজন বন্ধুই।

রমলার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললুম, ভাল আছেন?

অপরেশ রায় মুখে কিছু না বলে ঘাড় হেলালেন। কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। অপরেশ রায়কেও আমি আগে চিনতাম কিন্তু বছর সাতেক দেখি নি, মুখ মনে ছিল

না অথচ রমলার পা দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলুম ঠিকই। এই সাত বছরে রমলার পা নিশ্চয়ই খানিকটা বদলেছে, আমারও চোখ বদলেছে নিশ্চিত, তবু মুখের দিকে না তাকিয়ে চিনতে পেরেছিলুম।

হঠাৎ চৌরিঙ্গিতে এই শেষ বিকেলবেলায় ওদের সঙ্গে দেখা হতে আমার ভালই লাগল। শেষ যখন দেখেছিলুম, তখন ওর চোখের দুধার বড় শুকনো ছিল, এখন পুরো মুখটাই মসৃণ হয়েছে। কি জানি এই ছয় সাত বছব রমলা কলকাতাতেই ছিল কিনা, আমি ছিলাম না মাঝে দু এক বছর—তবু, এর মধ্যে কোথাও একদিনের জন্যেও দেখা হয় নি। গত তিন চার বছর একবারও ওর কথা মনেও পড়ে নি বোধহয়। কিন্তু এই মুহূর্তে হঠাৎ মনে হল, রমলা আমার থেকে খুব দূরে সরে যায় নি। চোখের কোণে চিক্-চিকে হাসি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বেশ সরল হাস্যে বললুম—বাঃ, বেশ সুন্দর চেহারা হয়েছে তোমার! অপরেশবাবু, আপনারা কোথায় আছেন এখন?

অপরেশ কোনো কথা না বলে তেমনি হাসিমুখেই দাঁড়িয়ে রইলেন। রমলাই উত্তর দিল, আমরা এখন গড়িয়াহাটায় থাকি। ওর অফিস থেকে কোয়ার্টার দিয়েছে। আপনি এখন কি করছেন?

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই অপরেশ বললেন, এক সেকেন্ড' তারপর স্ত্রীকে ডেকে নিচু গলায় কি যেন বলতে লাগলেন।

আমি ওদের দিকে—সস্নেহে বললে খুব ভারিক্কী শোনাবে কিন্তু বেশ সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। অপরেশের পাশে রমলাকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে। রমলা আগে ছিল রোগা-পটকা! এখন অপরেশের সবল চেহারার পাশে ওকেও খানিকটা স্বাস্থ্যবতী হতে হয়েছে। আমি যে রমলাকে একসময় সত্যি ভালবাসতুম তা এই মুহূর্তে আবার বুঝতে পারলুম কারণ ওদের একসঙ্গে দেখে আমার একটুও ঈর্ষা হচ্ছে না। গ্রীষ্মকালে এক গ্লাস ঠান্ডা জল পাওয়ার মত, ওদের দেখার পর থেকেও আমার বুকের মধ্যে যেন আস্তে আস্তে খুশী গড়িয়ে আসছে। অপরেশকে বিয়ে করে খুবই বুদ্ধিমতীর কাজ করেছিল রমলা—তার বদলে আমাকে বিয়ে করলে বেচারার দুর্ভোগের সীমা থাকত না। স্বাস্থ্য কি এমন নিটোল হতে পারত? না, তার বদলে এতদিনে মুখে পড়ত ক্লান্তির ছাপ—আমিই আমার নিজের জীবন নিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছি, সেই জীবনকে আশ্রয় করে কতদিন শান্তিতে থাকতে পারত রমলা? তাছাড়া গড়িয়াহাটায় অফিস থেকে পাওয়া কোয়ার্টার--তা যোগাড় করা কোনোদিন আমার পক্ষে সম্ভব হত না। সত্যি রমলা, তুমি যে সুখে আছ, এ দেখে আমারও খুব ভাল লাগছে।

অপরেশ বললেন, আপনারা একটু দাঁড়িয়ে কথা বলুন। আমি এক মিনিট আসছি।

আমি রমলাকে জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় গেল তোমার স্বামী?

—চুরুটের বাক্স কিনতে।

—খুব চুরুট খান বুঝি?

—হুঁ! আর কোনো বিশেষ নেশা নেই—কিন্তু চুরুট না হলে চলে না। সব সময় হাতে চুরুট থাকা চাই। এক এক দিন চায়ের মধ্যে চুরুটের ছাই পড়ে যায়! মশারির মধ্যে ঢুকেও—

আমি হাসতে লাগলুম। রমলা বলল, ওর বাবাও এমন চুরুট খান—

আমার মনে হল, অপরেশ বোধহয় আমাদের দুজনকে নিরালায় দু' একটা কথা বলার সুযোগ দেবার জন্যই ছুতো ধরে চলে গেল। কিন্তু আমরা—অপরেশ ফিরে না আসা পর্যন্ত অপরেশ আর তার বাবার চুরুট খাওয়ার নেশা নিয়েই কথা বলতে লাগলুম।

তা ছাড়া আর কিই বা বলতে পারতুম! বলা যায় কি, রমলা আমাকে তোমার মনে পড়ে? নাঃ! আমারই ওকে মনে পড়ে না—ওরই বা পড়'ব কেন? কিংবা, একথাও কি বলা যায়, তোমার মনে আছে তোমার সেই প্রতিজ্ঞা? তোমাদের ছাদের, চিলেকোঠায়, সরস্বতী পুজোর রাত্রে তুমি বলেছিলে, তোমার বুকের বাঁ দিকটা আমার। আমি যখন

খুশী দাবি করতে পারি—বুকের ওপরটা বা ভিতর—যা ইচ্ছে। না, এরকম দাবি জানাবার ইচ্ছেও আর আমার মনে পড়ে নি!

—কোনোদিন যদি চুরুট একেবারে ফুরিয়ে যায় তখন কি করে জান? সাদা কাগজ মোটা করে পাকিয়ে—হাতে ধরে থাকে। মাঝে মাঝে কাগজটা মুখে টানার ভান করে, অন্যমনস্কভাবে অবিকল চুরুটের ছাই ঝাড়ার মত আঙুল দিয়ে টোকা দেয়। নেশাটা মুখের না হাতের...আমার...

রমলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও হাসছিলুম। অপরেশ ফিরে এলেন এর মধ্যে। অপরেশের মুখের হাসিটা আর দেখা যায় না। আমি বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলুম, কোনো বিশেষ কাজে যাচ্ছিলেন নাকি? নইলে, আসুন না, একটু বসে চা খাওয়া যাক্। অপরেশ বললেন, না, আমার একটু তাড়া আছে।

—কত আর সময় লাগবে! একটু চা খেয়ে যাওয়া—

অপরেশ ভ্রুকুটি করে বলল, বাঃ, আমি থাকব কি করে? অলি মাসীর বাড়ি আমি যাব বলে কথা দিয়েছি! তুমি একা গেলে কি ভাববেন ওঁরা!

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, আজ চলি! একদিন আসুন না বাড়িতে!

আমি আর জোর করলুম না। রমলার দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে পরে ঘাড় ঘুরিয়ে অপরেশকে নমস্কার জানালুম। অপরেশ ততক্ষণে এগুতে শুরু করেছে।

রমলা ওর বাড়িতে যাওয়ার কথা বলল, অথচ ঠিকানা দিয়ে গেল না। তার মানে ওটা কথার কথা। অথবা ধরেই নিয়েছে আমি যাব না, বা যাবার দরকার নেই আমার।

কিন্তু সেই পড়ন্ত বিকেলে ওদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ায় আমার বেশ ভাল লাগছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের সঙ্গে বসে একটু গল্প করি, প্রচুর হাসাহাসি হোক্, অপরেশের সামনে রমলাকে দু'একটা পুরানো কথা তুলে লজ্জা দিই—যাতে অপরেশও প্রচুর মজা পেয়ে হাসতে পারে।

ছ-সাত বছর ওদের কথা একেবারেই ভাবি নি কিন্তু সেই দেখা হওয়ার পর, একদিন আমি এক বন্ধুকে টেলিফোন করার জন্য গাইডের পাতা ওলটাতে অন্যমনস্কভাবে অপরেশ রায়ের নাম খুঁজতে লাগলুম। অফিস থেকে কোয়ার্টার দিয়েছে যখন, তখন বাড়িতে ফোন থাকা খুবই স্বাভাবিক। গাইডে তিনজন অপরেশ রায়—গড়িয়াহাটের ঠিকানা যার—আমি তার নম্বর ঘোরাতে লাগলুম। এখন দুপুরবেলা—অপরেশের বাড়িতে থাকার কথা নয় যদিও।

রমলা আমাকে কখনও টেলিফোন করে নি কিন্তু গলা শুনেই আমি চিনতে পারলুম। আমি বললুম, রমলা, আমি।

ওপাশে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। তারপর শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল, এতদিন পর তুমি হঠাৎ ফোন করলে যে?

—আমায় চিনতে পারছ ত?

—হ্যাঁ। কিন্তু এতদিন পর!

—এতদিন পর হঠাৎ সেদিন দেখা হল কিনা। তুমি কেমন আছ?

—আমি ভাল আছি। কিন্তু তুমি আর কোনোদিন ফোন কর না।

—সে কি! রমলা, আমার ত কোনো খারাপ মতলব নেই। এমনিই ত শুধু—

—না, লক্ষ্মীটি। ও তোমার জন্য এখনও কষ্ট পায়।

—কে? অপরেশ? আমার জন্য? কেন?

—কেন তুমি জান না?

—আমি কি করে জানব? আমি ওর মনের কথা কি করে বুঝব?

—ও ভাবে, তোমার সঙ্গে এখনও আমার লুকিয়ে দেখা হয়।

—যাঃ। সাত বছরেও...

—অথবা...

—অথবা কি?

—ও ভাবে, আমি তোমার জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে কখনও কাঁদি।

—সত্যি কাঁদ নাকি?

আমি টেলিফোনে অনেকখানি হাসি পাঠিয়ে দিলুম রমলার কাছে। বললুম, যতসব পাগলের কাণ্ড। অপরেশকে দেখে মনে হল বেশ বুদ্ধিমান, সপ্রতিভ লোক। সে সাত বছরেও নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারল না? সাত বছর আগে যা চুকে গেছে—

—হ্যাঁ, চুকেই ত গেছে। কিন্তু, তুমি তার কোনোদিন ফোন কর না লক্ষ্মীটি। আমরা ত দুজনে আর কেউ কারোর নই—তবে কেন আর—

—আচ্ছা, ফোন করব না আর কখনো। কিন্তু রমলা, আমার ইচ্ছে ছিল, অপরেশের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হোক—তা হলে হয়ত ওর ভুল ভেঙে যাবে। ও ত আগে সবই জানত। জানত—তুমি ইচ্ছে করেই ওকে বিয়ে করেছ—কেউ তোমাকে জোর করে নি। আমার সাধ্য ছিল না তোমাকে আঁকড়ে রাখি।

—প্লীজ, নীলুদা, ওসব কথা থাক্। তুমি আমাকে ভুলে যাও। আর কোনোদিন—

লাইন ছেড়ে দিল। আমি দুঃখিত হাতে কিছুক্ষণ রিসিভারটা ধরে রইলুম তবু। কড়-র-র শব্দ হতে লাগল। আমি রিসিভারটা একবার রেখেই আবার তুলে নিয়ে সেই একই নম্বর আবার ডায়াল করলুম। ওপাশ থেকে তুলতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, রমলা, আবার আমি—

—নীলুদা। তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে চাও?

—না, রমলা। আমায় বিশ্বাস কর। আমি তোমাকে সুখী করতে চাই। আমি আর কোনোদিন তোমাকে ফোন করব না। পথে দেখা হলেও এড়িয়ে যাব। সত্যি রমলা তোমাদের জীবনে একটুও ব্যাঘাত করার ইচ্ছা নেই আমার। ভেবেছিলুম বন্ধুর মত একটু দেখাশুনা করে গল্প-গুজব করব। তাও দরকার নেই। কিন্তু অপরেশের কথা শুনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল, সে বুদ্ধিমান ছেলে, লেখাপড়া শিখেছে—কিন্তু এ কিরকম মন তার। সাত বছর আগেকার ব্যাপার সে মনে পুষে রেখেছে? সেদিন ত দেখে কিছু বুঝতে পারে নি।

—ঐ যে সেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর, ইচ্ছা করে একটুক্ষণ আড়ালে চলে গেল। ধরেই নিয়েছিল, তোমার সঙ্গে আমি গোপন দুঃখের কথা বলব।

—গোপন দুঃখ? তা নিয়ে আবার মুখের কথা বলা যায় নাকি? কি সর্বনাশ। অপরেশ কি তোমাকে কষ্ট দেয়?

—মোটেই না। নিজেই মন খারাপ করে। প্রায়ই বলে, আমি ওকে ভালবাসি না। কারণ আমি নাকি তোমাকে ভুলতে পারিনি।

—ইস্, ছি ছি! আচ্ছা, আমি আর এর মধ্যে থাকতে চাই না। আমি আর কোনোদিন তোমাদের মধ্যে আসব না। অপরেশ কোন্ অফিসে চাকরি করে?

—কেন? তুমি জানতে চাইছ কেন?

—কোনো ভয় নেই তোমার, রমলা। আমি তোমাকে আমার পুরোনো গলায় বলছি, কোনো ভয় নেই। আমাকে প্রায়ই নানা কাজে অনেক অফিসে যেতে হয়, অপরেশের অফিসের নামটা জেনে রাখি—সেখানে কোনোদিন যাব না। যাতে কোনোদিন ওর সঙ্গে হঠাৎও আর দেখা না হয়।

—অল্ফা এক্সপোর্ট। স্টিফেন হাউসে অফিস।

—আচ্ছা রমলা, ছেড়ে দিচ্ছি এবার। রমলা আমরা অনেক দূরে সরে গেছি—এতদূর থেকে কেউ কারুর দিকে হাত বাড়াতে পারি না? আমার দিক থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। যাই—আর কোনোদিন হয়ত দেখা হবে না।

—নীলুদা, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ ত?

—ক্ষমার কথা উঠছে কিসে? রমলা, ছেলেবেলাতে আমি যা করেছি—তার জন্য আমি কোনোরূপ অনুতাপও করি না, আবার অতৃপ্তির হাহাকারও নেই। ছেলেবেলায় যা করেছি, তা ছেলেবেলাতেই মানায়, এখন যেমন মানায়—সেই রকমভাবেই বেঁচে আছি। কোথাও কোনো দুঃখ নেই। তুমি ভাল থেকো রমলা। আচ্ছা!

এর পরদিন আমি যা করলুম, তার ঠিক যুক্তি হয়ত দেখতে পারব না। আমি

লোকটা তেমন খারাপ নই—স্বাভাবিক মানুষ যেমন হয়—সেই রকম। তবে, নিজের কয়েকটি ইচ্ছার আমি নিজেই যুক্তি খুঁজে পাই না। যেমন, একদিন আমি পার্কে আলুকাবলি খেয়ে বেরিয়েছি, খুব ঝালে ঠোঁট উস্ উস্ করছি—দু হাতে লংকার গুঁড়ো, নুন আর ঝোল লেগে আছে—হাত মোছা হয় নি। কোথায় হাত মুছব ভাবছিলুম—পকেট থেকে রুমাল বের করে মোছা যায় কিন্তু সেই রুমাল দিয়ে ভুল করে যদি কখনও মুখ মুছতে যাই—তবে চোখের সর্বনাশ হয়ে যাবে। কি করব ভাবছিলুম, সেই সময় একটি সুবেশ যুবকের দিকে আমার চোখ পড়ে। চমৎকার চেহারা, খুব দামী পোশাক পরা—পরিচ্ছন্ন চেহারার যুবকটি পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। হঠাৎ আমার ইচ্ছা হল, সেই যুবকটির গায়ের জামায় হাত দুটি মুছে দিই! ভাবতেই আমার হাসি পেল, এখন সোজা গিয়ে যদি ওর ফর্সা জামায় আমার হাত দুটি ঘষে দিই—কি অবস্থা হবে? যুবকটি হয়ত কোনো নারীর জন্যে অপেক্ষা করছে—তাহলে...আমার ইচ্ছাটা এমন প্রবল হল যে আমি ওর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু সামনা-সামনি হাতে ঘষে দেব তত সাহস আমার নেই। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা হতে লাগল। ছেলেটির চোখে কালো গগল্‌স—সেই দেখেই কিনা, হঠাৎ আমার মনে হল, ছেলেটি আমার শত্রু, এর ওপর প্রতিশোধ নিতেই হবে—অথচ ওকে আমি কোনোদিন দেখি নি।

যুবকটি হাঁটতে শুরু করতেই আমি ওকে অনুসরণ করলুম। দশ মিনিট হাঁটল সে—আমিও ওর পিছনে পিছনে যাচ্ছি। তখন আর আমার ফেরার উপায় নেই, তাহলে আমি ওর কাছে হেরে যাব। আমার হাতের পাঞ্জা দুটি খোলা—তখনও লঙ্কা তেঁতুলের টক লেগে আছে। হাজরার মোড় থেকে ছেলেটি একটি বাসে উঠল। সেই আমার সুযোগ—আমিও বাসে উঠে পড়লুম—খুব ভিড় ছিল, ভিড় ঠেলে আমি ওর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছি এবং এক সুযোগে ওর পিঠে এঁকে দিয়েছি আমার দু হাতের ছাপ। তারপরেই জয়ের গর্বে মন ভরে যেতে—আমি নেমে পড়েছি বাস থেকে।

বোধহয় সেইরকমই কোনো যুক্তিতে, আমার বার বার মনে হতে লাগল, অপরেশের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব করা দরকার। সে আমায় শত্রু ভাবছে, অথচ আমি ত সত্যই তার বন্ধু। রমলাকে সে বিয়ে করে সুখী করেছে—সে আমার বন্ধু হবে না? আমি রমলাকে এক সময় পাগলের মত ভালবাসতুম—এখনও বাসি নিশ্চয়ই। যদি দেখতুম রমলার স্বামী একজন কুৎসিত গরীব লোক কিংবা মাতাল লম্পট জুয়াড়ী—তার ওপর আমি নিশ্চিত রেগে যেতুম, সে হত আমার শত্রু। কিন্তু অপরেশ অমন দৃপ্ত স্বাস্থ্যবান—সে রমলাকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে—সে আমার শত্রু হবে কেন?

এতসব ভাববার আগেই কিন্তু আমি আলফা এক্সপোর্ট কোম্পানির অফিসে ঢুকে পড়েছি। আলাদা ঘরের সামনে অপরেশের নাম লেখা—বেশ বড় অফিসারই মনে হল। বাইরের কোনো বেয়ারার হাত দিয়ে স্লিপ পাঠালে যদি অভিমানী অপরেশ আমার সঙ্গে দেখা করতে না চায়, এই ভেবে আমি দরজা খুলে সোজা ঘরে ঢুকে পড়লুম।

আমাকে দেখে অপরেশ নিশ্চিত খুবই অবাক হয়েছেন--কিন্তু অফিসাররা মুখের বিস্ময় লুকোতে জানে। ফাইলে মুখ গোঁজা ছিল, মুখ তুলে নির্বিকারভাবে বললেন, কি ব্যাপার?

আমি বললুম, পাশের অফিসে আমার এক বন্ধু কাজ করে, তার ওখানেই আপনার নাম শুনে ভাবলুম একবার দেখা করে যাই। খুব বেশী ব্যস্ত ছিলেন নাকি।

—না। খুব নয়।

অপরেশ তখনও আমাকে বসতে বলে নি। সে অভিমান করে আছে। কিন্তু আমার এসব ছোটখাটো ব্যাপারে কিছু মনে করলে চলে না। আমি নিজেই চেয়ার টেনে বসলুম। বললুম, সেদিন পথে দেখা হল কিন্তু আপনার সঙ্গে ভাল করে কথাই হল না।

—হুঁ।

—এ অফিসে কতদিন আছেন?

—একটা কথা আগে জিজ্ঞেস করে রাখি। আপনি নিশ্চই আপনার ভাইপো বা বন্ধুর ভাইয়ের জন্য চাকরির উমেদারি করতে আসেন নি? এখন লোক নেওয়া হচ্ছে যদিও কিন্তু

আমাদের অফিসে ওসব চলে না।

এ যে স্পষ্ট অপমান। এ কথায় আমার খুব রেগে ওঠাই উচিত ছিল বোধহয়। তবু হেসে বললুম, না আমি কারুর চাকরির জন্য আসি নি। আমার নিজের জন্যও নয়। আমি আন্তরিকভাবেই দু'একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

—আমার কাছে? হঠাৎ!

—আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করছেন না। তার কারণ হয়ত—

—কোনোই কারণ নেই। আপনার সঙ্গে আমার কোনোদিনই ভাল করে পরিচয় ছিল না—হঠাৎ অর্ধপরিচিত লোকদের সঙ্গে আন্তরিক আলোচনা করা আমার স্বভাব নয়। আমার স্ত্রীর মাকে আমি মা বলে ডাকি, তা বলে আমার স্ত্রীর সব বন্ধুদেরও আমি বন্ধু ভাবব, তার কি মানে আছে?

—'স্ত্রীর বন্ধু' বলতে আপনি ঠিক কি ভাবছেন?

ঢং ঢং করে বেল টিপে অপরেশ বেয়ারাকে ডাকলেন। তারপর রুক্ষ গলায় বললেন, নন্ ফেরাস মেটালের ফাইলটা এখনও পেলুম না কেন?

অপরেশের সঙ্গে ওর অফিসে এসে দেখা না করলেই ভাল হত—অফিসের বাইরে ছুটির পর দাঁড়িয়ে থাকাই উচিত ছিল আমার। এই সব অফিসারদের ব্যবহার এমন হাস্যকর হয়—যতক্ষণ নিজের কামরায় বসে থাকে! বাইরে বেরুলেই এরা সাধারণ মানুষ কিন্তু নিজের এই পার্টিশন করা ঘরের মধ্যে টেবিলের উল্টোদিকে নিজের ঘুরানো চেয়ারে বসলেই আর কিছুতে মুখের ভাব সরল করতে পারে না। কার্টুনের মত মুখভঙ্গি করে থাকে। অপরেশ আমার দিকে ফিরে আবার বললেন, বলুন!

আমি চেয়ারটাকে টেবিলের আরও কাছে টেনে আনলুম। আমার মুখে হাসি। বললুম, আপনার সময় জরুরী। সুতরাং অল্প সময়ে স্পষ্ট করে কথা বলে যাই। সেদিন আমনাদের দেখে একটা কথা মনে হল। আপনি আমাকে পছন্দ করছেন না। না করুন, কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু মনে কোনো জ্বালা রাখবেন না। রমলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল—একথা জেনেও আপনি ওকে বিয়ে করেছেন। কিন্তু তারপর আর ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ছেলেবেলায় এরকম বন্ধুত্ব অনেকেরই থাকে—আপনারও হয়ত কোনো মেয়ের সঙ্গে ছিল। বিয়ের পর আর ওসব কে মনে রাখে? রমলাকে আমার মনেও পড়ে না।

—আপনি এসব কথা আমাকে বলতে এসেছেন কেন দয়া করে সেটা জানাবেন কি রমলাকে আপনি মনে রেখেছেন কি রাখেন নি এটা শুনে সে দুঃখিত বা খুশী হতে পারে—কিন্তু আমার কি করার আছে? আমার স্ত্রীর সব ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাব --এরকম হীন আমি নই। আপনার সঙ্গে যদি তার গোপনে সেন্টিমেন্টাল অ্যাফেয়ার থেকেই থাকে--তাতেই বা—

আমি হঠাৎ টেবিলে দুম করে একটা ঘুষি মেরে চেঁচিয়ে বললুম, যদি বলছেন কেন? বলছি না নেই! কিছু নেই! আমার মুখ দেখে বুঝতে পারছেন না?

অপরেশের মুখ আরও কঠিন হয়ে উঠল। অহংকারী গলায় বললেন, এটা একটা অফিস, দয়া করে মনে রাখবেন। নাটক করার জায়গা নয়—

--এখনও মনে হচ্ছে বুঝি নাটক করছি?

—আপনি আমার কাছে মহত্ত্ব দেখাতে এসেছেন, আপনি প্রেমিক আর আমি স্বামী। অর্থাৎ আপনি হলেন নায়ক, আমি ভিলেন। আপনার আত্মত্যাগ কি অসামান্য—রমলাকে আপনি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। এখন আবার এসেছেন উদারতা দেখাতে--আপনি ব্যর্থ প্রেমিক—আপনি এসেছেন নায়িকাকে সুখী করতে! আমার কিছু যায় আসে না, আপনি রমলার সঙ্গে ব্যভিচার করুন কি মনের দুঃখে আত্মহত্যা করুন, আমার কিছু যায় আসে না। দয়া করে শুধু আপনার ঐ ফিলুপি ফেস আমাকে আর দেখাবেন না।

--অপরেশবাবু, শুনুন—

--আপনি যদি এখন চলে না যান, আমাকে ইংরাজীতে গেট আউট বলতে হবে। সেটা খুবই কর্কশ শোনাবে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে ভর দিয়ে অপরেশের দিকে তাকিয়ে হাসলুম। সেই হাসি দিয়ে আমি ওকে বললুম, তুমি একটা বিষম বোকা লোক।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমি সোজা চলে এলাম গড়িয়াহাটায়। ঠিকানা খুঁজে পেতে দেরি হল না। তেতলায় তিনটে ঘরের ফ্ল্যাট। রমলা দরজা খুলতেই আমি জোর করে ঢুকে পড়লুম।

বিবর্ণ মুখে রমলা বলল, নীলুদা, একি সর্বনাশ করতে এসেছ আমার?

আমি দুহাতে জড়িয়ে ওকে বললুম, মিলু, আমাকে দয়া কর, দয়া কর। সাত বছর তোমাকে দেখি নি, আমি তো বেশ ছিলুম। কিন্তু সেদিন তোমাকে একবার দেখে আমার বুকের মধ্যে আবার সব ওলট-পালট-পালট হয়ে গেছে। আমি আর থাকতে পারছি না। এখন বুঝতে পারছি, মিলু, এই সাত বছর আমি তোমার কথাই ভেবেছি। তোমাকে ছাড়া আমি কি করে বাঁচব মিলু?

—না, না, নীলুদা। ও যে কোনো সময়ে এসে পড়বে, এখন যাও, তোমার পায়ে পড়ি—

—না, আসবে না। অফিস ছুটি হতে অনেক দেরি। তার আগে আমি তোমার সামনে বসে একটু কথা বলতে চাই।

—সাড়ে চারটের সময় আমার ছেলেকে আনতে যেতে হবে স্কুল থেকে। নীলুদা, তুমি যাও।

—সাড়ে চারটেরও একঘণ্টা দেরি। মিলু, আমাদের আগেকার সবই কি মিথ্যে হয়ে গেল?

—নীলুদা, তুমি কেন বিয়ে কর নি? কেন আমাকে ভুলে যাও নি। এ আমি সহ্য করতে পারব না।

—আমি আর অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে পারি না। আমি আজ তোমার কাছে আমার দাবি জানাতে এসেছি। তোমার বুকের বাঁ দিক আমার ছিল। আমি আমার জমি আবার উদ্ধার করে নিতে চাই।

রমলার মসৃণ, সৌরভময় শরীর আমার বাহুর মধ্যে। আমি বুঝতে পারলুম ওর শরীর কাঁপছে। হয়ত আমার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চায়—কিন্তু ওর একটা হাত আমার পিঠে। আমি ওর মুখ উঁচু করে কপালে ও ঠোঁটে চুমু খেলুম। মনে হল, ওর একটা ঠোঁট ঠাণ্ডা, একটা ঠোঁট উষ্ণ। আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলুম।

রমলা ঠোঁটে হাত চেপে আর্তকণ্ঠে বলল, না, না, আমি পারব না, আমার ঘর সংসার সব ভেসে যাবে। আমি পারব না। তাহলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। কিন্তু আমার ছেলে আছে—

রমলার পায়ের কাছে বসে বললুম, মিলু, একবার তোমার পা দুটো আমার বুকের ওপর রাখি। বিশ্বাস কর, আমি সাত বছরে একটুকুও বদলাই নি। আমি দুর্বৃত্ত ডাকাত হয়ে যায় নি, কিছুই কেড়ে নেব না জোর করে।...আমি নিজেকে বুঝতে পারি না...কাল পর্যন্ত জানতুম, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছি, তোমার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই—কিন্তু আজ অপরেশের সঙ্গে দেখা করার পর—

—তুমি ওর সঙ্গে দেখা করেছিলে? কেন? তবে যে আমাকে কথা দিয়েছিলে—

—জানি না। কেন যে দেখা করতে গেলাম জানি না। কিন্তু অপরেশ আমাকে অপমান করল—

রমলা আমার বুকের ওপর এসে হুহু করে কাঁদতে লাগল। ফিসফিস করে বলল, আমিও তোমাকে ভুলতে চেয়েছিলাম, ভুলতে পারি নি, অনেক চেষ্টা করেছি—ও আমার মুখ দেখে ঠিকই বুঝতে পারত—কিন্তু তুমি আবার কেন এলে? কেন?

—জানি না। এক ঘণ্টা আগেও ভাবি নি, তোমার কাছে কখনও আবার আসব। কিন্তু দেখলুম অপরেশ নির্বোধ।

—সাত বছর আগে তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলে কেন?

—সে কথা সাত বছর আগে জানতুম। এখন ভুলে গেছি। এই সাত বছরে তুমি আরও সুন্দর হয়েছ। কিন্তু তোমার শরীর এখনও আমার কাছে ঠিক সেই রকম চেনা।

—তোমার চেহারা এমন রুক্ষ হয়ে গেছে কেন?

—যদি বলি তোমার জন্য, তাহলে কি খুশী হবে? কিন্তু তা বোধ হয় সত্যি নয়। মিলু, এখনু যদি অপরেশ এসে পড়ে?

—তাহলে আমাকে বিষ খেয়ে মরতে হবে—

—না, না, তুমি মরবে কেন। কিন্তু আমাকেও যেন জানালা দিয়ে লাফাতে বল না। তিনতলা থেকে আমি লাফাতে পারব না। বাথরুমেও লুকোতে পারব না—বাথরুমের মধ্যে আমি ধরা পড়তে চাই না। খাটের তলায়ও ঢুকে থাকা অসম্ভব—ওখানে নিশ্চয়ই আরশোলা আছে।

—নীলুদা, তুমি আমার কাছে কেন এসেছ, সত্যি করে বল?

আমি রমলার চুলের মধ্যে হাত বুলতে বুলতে বললুম, অপরেশ আমাকে আসতে বলল।

—কি।

—আমি অপরেশের কাছে গিয়েছিলাম। দেখলুম, ও একটা বোকা অহংকারী। ও আমার মুখ দেখে বুঝতে পারল না যে আমি সত্যি কথা বলেছি! ও আমাকে অপমান করে সুখী হতে চায়। যেমন, ও তোমাকে চিরকাল সন্দেহ করেই সুখে থাকবে। ও তোমার ওপর অত্যাচার করবে না কোনোদিন। তোমাকে সন্তান দেবে, সম্পদ দেবে—তোমাকে ভালবাসবে—কিন্তু সন্দেহ করে যাবে বহুদিন, সারাজীবন। আমার কাছ থেকে তোমাকে জয় করে নিয়েছে—এই যেমন ওর গর্ব, তেমনি স্বামী হিসাবে তোমাকে সন্দেহ না করলে ওকে মানায় না—একথাও জানে। অর্থাৎ তোমার গোপন প্রেমের দুঃখ সত্ত্বেও—সবল সুস্থ স্বামী হিসেবে ও তোমাকে অধিকার করে আছে—এই হবে ওর সারাজীবনের অহংকার!

...নীলুদা, তুমি কি বলছ।

—ঠিক বলছি। ওর কাছ থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ আমার মনে হল, তাহলে আমিই বা কেন ক্ষতি স্বীকার করব। আমি চাই তোমাকে দেখতে, আমি চাই তোমাকে ছুঁতে, তোমার বুকের গন্ধ শুঁকতে। সন্দেহ যখন ও করবেই—তখন আমি কেন ফিরে আসব না? শুধু গোপনতা রক্ষা করাই যথেষ্ট। অপরেশ এমন দুর্বল নয় যে দুপুরে হঠাৎ অফিস থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর ওপর গোয়েন্দাগিরি করবে।

রমলা আমার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে ব্লাউজের বোতাম আঁটতে আঁটতে বলল, কিন্তু আমি পারব না! এরকম আমি কিছুতেই পারব না। তুমি ওর দিকটাই ভেবে দেখছ, আমার কথা ভাবছ না? আমি কেউ নই, আমি একটা খেলনা? এতদিন আমি মনে মনে জানতাম, আমি বিয়ের পর থেকে ওর সঙ্গে কোনো ছলনা করি নি। মনে মনে তোমাকে ভুলতেই চেয়েছি। কিন্তু এখন ওর সঙ্গে অভিনয় করতে হবে নিয়মিত—সে গ্লানি আমি সইব কি করে?

—তবে কি তুমি আমার সঙ্গে চলে আসবে?

—কোথায়? সেদিন কাপুরুষের মত দূরে সরে গিয়েছিলে, আজ আর কোথায় যাব! আজ তোমার সঙ্গে যেতে আমাকে যত মূল্য দিতে হবে—ভালবাসার জন্য ততটা কি মূল্য দেওয়া যায়? না, যায় না!

—ঠিক। শুধু ভালবাসার জন্য কে আর আজকাল দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে চায়। অপরেশ জানে না, প্রেমিকরা আজকাল আর নায়ক নয়, স্বামীরাই নায়ক। নাটক নভেলে সেই পুরাতন ব্যাপার দেখা গেলেও জীবন এখন বদলে গেছে। প্রেমের জন্য কে আর আত্মত্যাগ করতে চায়। সব প্রেমিকই এখন ব্যর্থ প্রেমিক।

আমি আর একটা চুমু খেয়ে মিলুর চোখের জল মুছে নেব ভেবেছিলুম—এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়ল। মিলু ঝট করে দূরে সরে দাঁড়িয়ে বলল, এবার? এবার আমার কি হবে?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, অপরেশ নাকি?
—নিশ্চয়ই।
—যাঃ, তা হতেই পারে না। প্রতিবেশী হতে পারে, কোনো সেল্সম্যান বা তোমার ঝি নেই।
হিংস্র চোখে রমলা বলল, আমি ঐ আওয়াজ চিনি। শেষে তুমি আমার সর্বনাশ করে গেলে।
সর্বনাশ কি মিলু। আমি ত তোমার পাশেই আছি।
রমলার চেহারা কি রকম হিংস্র হয়ে উঠেছে। বিস্রস্ত চুল, অল্প অল্প কান্নায় ফুঁসছে। দরজায় আবার ধাক্কা পড়তেই আমি দরজাটা খুলতে এগিয়ে গেলুম। রমলা বলল, চুপ।
আমি বললুম, তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দেওয়াই ত সবচেয়ে স্বাভাবিক।
রমলা অল্প অল্প কান্নার আওয়াজ করতে করতে বলল, তুমি আমার কেউ ন-শুধু শুধু তুমি আমার সঙ্গে খেলা করতে এসে সর্বনাশ করে গেলে। আমি তোম- কোনোদিনও ভালবাসি নি।
—কিন্তু আমি এ ঘরে প্রথম ঢোকার পরই তুমি আমার আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছিলে।
—চুপ। বলেই পাগলাটে ধরনের রাগে রমলা কি একটা পেপারওয়েট না অন্য কোনো ভারী জিনিস ছুঁড়ে মারল আমার দিকে। ওর ব্যবহার এমনই অস্বাভাবিক যে আমি মুখটা সরিয়ে নিই নি। সোজা এসে সেটা আমার কপাল ও নাকে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝিমঝিম করে উঠলেও মনে হল, ভাগ্যিস চোখে লাগে নি! আমার সাধারণ শরীর, তাই নাক দিয়ে বেশ রক্ত বেরিয়ে এল। আমি রুমাল দিয়ে নাকটা চেপে ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম। রমলা আরও কি একটা যেন ছুঁড়ে মেরেছে আমাকে। কিন্তু ততক্ষণে আমি দরজা খুলে দিয়েছি।
একটা ফুটফুটে ছ বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে, অপরেশ নয়। রমলার ছেলে—একাই বা কারুর সঙ্গে ফিরে এসেছে। ভারী সুন্দর দেখতে হয়েছে তো ছেলেটাকে। মায়ের মুখ পেয়েছে।
ছেলেটা ঘরে ঢুকতেই, ঘরের কোণ থেকে এগিয়ে এল রমলা। রমলার কপালের টিপটা ধেবড়ে গেছে, চোখের পাশে শুকনো কান্না। কিন্তু এতটুকু ছেলের চোখে কি এসব ধরা পড়বে?
রমলার মুখের চেহারা আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। জিজ্ঞেস করল, তুই কার সঙ্গে এলি?
—বিল্টুদের গাড়িতে। তুমি এলে না।
—নীলুদা, তুমি একটু বোরোলিন লাগাবে?
আমি হেসে বললুম, না, এমন কিছু লাগে নি। আমি যাই। আমি ছেলেটার চুলে হাত দিয়ে একটু আদর করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম—রমলা পিছন থেকে তাকিয়ে আছে কিনা তা দেখারও ইচ্ছে হল না একবার।

স্বর্গের বারান্দায়

আমি প্রায়ই স্বর্গের স্বপ্ন দেখি। আমি এমনিতেই স্বপ্ন দেখি একটু বেশী, বলা যায় স্বপ্ন দেখা আমার রোগ বিশেষ। আমার পেট ও মাথা দুই-ই গরম, কোনো রাত্রেই ভালভাবে ঘুম হয় না, তাই সিনেমার মত অজস্র স্বপ্ন আমার চোখের সামনে ভেসে যায় এবং অধিকাংশ স্বপ্নই তার পরের সকালবেলাতেও আমার মনে থাকে। সেই সব স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে দিলে ফ্রয়েড কিংবা ইয়ুং সাহেবরাও হিমসিম খেয়ে যেতেন।
অন্যান্য লক্ষ লক্ষ স্বপ্নের মধ্যে স্বর্গের স্বপ্নটাই ঘুরে ফিরে আসে। এই স্বপ্নটাতে আমি অত্যধিক উল্লসিত হয়েও উঠি না কিংবা ভয়ও পাই না। স্বর্গ আমার চেনা হয়ে

গেছে। এই স্বর্গের সঙ্গে কিন্তু পুরাণে-ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত স্বর্গের দৃশ্যের কোনো যোগ নাই। আমার স্বপ্নে দেখা স্বর্গে কখনো দেবদেবীদের দেখি নি, অপ্সরা-উর্বশীদেরও দেখি নি—একবার মাত্র কয়েক পলকের জন্য রম্ভা নামের নর্তকীকে দেখেছিলাম—যমরাজ বা চিত্রগুপ্তকেও দেখিনি।

আমার দেখা স্বর্গ অনেকটা সুন্দরভাবে সাজানো কোনো ডাকবাংলোর মতন। পাহাড়ী জায়গায় ডাকবাংলোর মতন বেশ খানিকটা উঁচু ভিতের ওপর একটা ধপধপে সাদা রঙের বাড়ি, অনেকগুলি কাঁচের দরজা ও জানালা। সামনে বেশ বড় একটি পরিচ্ছন্ন বাগান, বাড়িটার পিছনে অরণ্য। তবে স্বর্গে মাত্র ঐ একটাই মোটে বাড়ি তো হতে পারে না, তাই আমার মনে হয়, ঐ অরণ্যের মধ্যে আরও অনেক বাড়ি আছে—সেগুলো আমি দেখি নি। সামনের ঐ বাড়িটা স্বর্গের বিশ্রাম-গৃহ, তাই ডাকবাংলোর মতন চেহারা। বহুদূরের পথ পেরিয়েই তো মানুষ স্বর্গে পৌঁছবার পর ঐ বাড়িতে প্রথমে একটু বিশ্রাম নেয়।

ঐ দৃশ্যটাই যে স্বর্গের দৃশ্য, তা আমি চিনলাম কি করে?

কোথাও তো কোনো সাইন-বোর্ড লেখা নেই! তবু আমি ঠিকই চিনেছিলাম। আমি জীবনে বহু ডাকবাংলোতে থেকেছি কিন্তু ঐ বাড়িটা দেখামাত্রই বুঝতে পেরেছিলাম, এটা সব কিছুর থেকে আলাদা। তাকিয়ে থাকলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয়, যদি ওখানে আশ্রয় পাওয়া যেত তাহলে জীবনে আর কিছু চাই না।

সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, সামনের বাগানটুকু। অসংখ্য ফুল ফুটে আছে। অথচ একটাও চেনা ফুল নয়। সবুজ, কালো কিংবা বেগুনি রঙের ফুল কি পৃথিবীতে তেমন দেখা যায়; স্বর্গের বাগানে বেগুনি রঙের প্রাধান্য। রামধনুর প্রথম রঙ বেগুনি বলেই বোধ হয় এরকম। পৃথিবীতে একধরনের লাল শাক আছে, ইট চাপা ঘাসের রং হয় হলদে, এ ছাড়া সব গাছই সবুজ। ঐ বাগানের সব গাছই বেগুনি এবং সেই গাছগুলোর ভেতর থেকে আলো বেরোয় ঠিক যেন ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প দিয়ে তৈরী করা হয়েছে অথচ তৈরী নয়, সজীব।

প্রথমবার এই দৃশ্যটাই দেখে ঠিক চিনতে পারি নি অবশ্য গাছগুলো দেখেই বিস্মিত হয়েছিলাম। আমি যেন বেড়াতে বেড়াতে সেই বাগানের কাছে গেছি, ফুলগাছগুলো দেখে অবাক। ভাবছি এগিয়ে গিয়ে ফুল ছিঁড়ে নেব কিন্তু পরের বাগানের ফুল কাউকে না জিজ্ঞেস করে নেওয়া উচিত নয়। খানিক পরে এক ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেলাম। তিনি নিচু হয়ে ফুলের গন্ধ শুঁকছেন। মেমসাহেবরা সাঁতার কাটার সময় যেটুকু পোশাক পরে, মহিলার শরীরে সেইটুকু পোশাক। কিন্তু সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহিলার উরু দুটি। কলাগাছের মতন সুডৌল এবং এত মসৃণ ও ঝকঝকে যে মনে হয় ভেতর থেকে আলো বেরুচ্ছে, কলাগাছেরই মতন সবুজ ও হলদে মেশা আলোর আভা। পরে জেনেছিলাম ঐ মহিলারই নাম রম্ভা। লোকে কথায় কথায় রম্ভোরু বলে না?

আমি বাগানের বাইরে থেকে ভদ্রমহিলাকে বললাম, ফুলগুলো আশ্চর্য সুন্দর তো! এই জায়গটার নাম কি?

মহিলা উত্তর দিলেন, আপনি জানেন না? লোকে এই জায়গাটাকে স্বর্গ বলে।

শুনে একটুও চমকে উঠলাম না। বরং আমার মনে হল, তা তো হবেই। স্বর্গ না হলে এ রকম হয়!

আমি ওঁকে অনুরোধ করলাম, শুনুন আপনি আমাকে ফুলগাছের একটা চারা দেবেন? মায়ের জন্য নিয়ে যাব। আমার মায়ের ফুল গাছের খুব শখ।

মহিলা খুব স্বাভাবিকভাবে বললেন, ভিতরে আসুন না। ঐ যে আপনার ডানদিকেই গেট আছে। একটু ঠেলা দিলেই খুলে যাবে।

বুক সমান উঁচু কাঁচের তৈরি গেট। বাগানের ধারেও মেহেদী গাছের বেড়া, কাঁটা তার বা দেয়াল-টেয়াল নেই। একটু জোর করলে গেটটা ভেঙে ফেলা যায়, কিংবা লাফিয়ে ওপারে যাওয়া যায়। আমি সে-রকম কিছু করলাম না। আস্তে গেটে ঠেলা দিলাম। খুলল না। আমার খুব দুঃখ হল। ঘুম ভাঙার পরেও অনেকক্ষণ আমার বুকের মধ্যে

সেই দুঃখবোধ চাপ বেঁধে ছিল। আমার জন্য স্বর্গের দরজা খুলল না, আমি কি পাপী? খানিকটা বাদে মনে পড়ল, আমি তো এখনও মরিইনি। আমার তো স্বর্গে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তখন মনটা হালকা হয়ে গেল।

এরপর মাঝে মাঝেই আমি স্বর্গের স্বপ্ন দেখছি। যে দিন আমি কোনো জায়গা থেকে বড় রকমের মানসিক আঘাত পাই, সেই রাত্রেই স্বর্গের স্বপ্ন আমার চোখে আসে। কখনো আর ঢোকার চেষ্টা করি নি ভিতরে। দাঁড়িয়ে থেকেছি বাগানের পাশে। দেখতাম মাঝে মাঝেই অনেক নারী পুরুষ বাইরে থেকে এসে দাঁড়াচ্ছে ঐ গেটের সামনে। কেউ কেউ হাত দিয়ে ঠেললেই আপনি খুলে যাচ্ছে গেট—তখন তারা বাগানের মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়ে উঠছে সেই সাদা বাড়িটার বারান্দায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের চেহারাগুলো ভারী সুন্দর হয়ে যাচ্ছে। আবার কোনো কোনো মানুষ গেট ঠেললেও খুলছে না। তখন তাদের চোখে জল আসে। সেই জলের ফোঁটা মাটিতে পড়ার আগেই তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি এ পর্যন্ত আমার পরিচিত কোনো মানুষকে স্বর্গের গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতে দেখি নি। একবার শুধু......

তার আগে দুটি মৃত্যুর কথা বলা দরকার। আমার যখন আঠাশ বছর বয়স সেই সময় আমি পশ্চিম দিনাজপুর থেকে একটি প্রেমপত্র পাই। বন্দনা সরকার নামে একটি মেয়ে আমার লেখা-টেখা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছে। আমাকে তার ভীষণ ভাল লাগে ইত্যাদি। চিঠির শেষে সে আমার উদ্দেশে দু'লাইন কবিতাও লিখেছে। যেহেতু সেই চিঠিতে তিনটি বানান ভুল ছিল, তাই সে চিঠির উত্তর আমি দিই নি।

মাস দু'এক পরে সেই মেয়েটিই আমাকে চিঠি লিখল ডায়মণ্ডহারবার থেকে। এবং তার তিন মাস পরে আবার মেদিনীপুর থেকে। ব্যাপারটা একটু রহস্যময় লাগতে শুরু করেছিল। কিন্তু রহস্যভেদের কোনো উদ্যোগ করি নি, কারণ মেয়েটির চিঠিতে বানান ভুলের সংখ্যা কমে নি। তারপর মেয়েটি নিজেই একদিন আমার বাড়িতে এসে হাজির হল।

বন্দনা বলেছিল ওর বয়স তখন পঁচিশ, কারণ ও জানত আমার বয়েস তখন আঠাশ। আসলে বন্দনা তখন তিরিশ ছুঁয়েছে এবং দেখলেই বোঝা যায়। বন্দনা স্কুল মাস্টারী করে এবং এক জায়গায় তার মন টেকে না বলে ঘন ঘন চাকরি বদলায়। আমি তাকে বলেছিলাম, স্কুল শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে এ রকম বানান ভুল করা উচিত নয়—তার উত্তরে সে জানিয়েছিল যে সে অঙ্কের টিচার, বাংলা বানান তার ভাল না জানলেও চলে। তা হয়তো ঠিক কিন্তু বানান ভাল না জেনে যে প্রেমপত্র লেখা চলে না এটা কে তাকে বোঝাবে!

আমার সেই বয়সে কত বন্ধু-বান্ধব, কত হৈ-হুল্লোড় আড্ডা, সারা শহর তোলপাড় করে ছোটছুটি, জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। কখনো অসম্ভব নেশা করে গুণ্ডাদের সঙ্গে জুয়া খেলতে যাই. কখনো শ্মশানে গিয়ে কোরাস গান করি। মেয়েদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা ছিল তখন আমার প্রিয় বিলাসিতা। বিশেষত একটি মফস্বলের মেয়েকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকার কোনো সময়ই আমার ছিল না।

বন্দনার চিঠির বানান ভুল অনায়াসে ক্ষমা করা যেত, যদি তার শরীরে রূপ থাকত। অবশ্য কোনো রূপসী মেয়ে আমাকে প্রেমপত্র পাঠাবেই বা কেন? বন্দনাকে ঠিক কুৎসিতও বলা যায় না—সাধারণ ধরনের চেহারা, গায়ের রং মাজা মাজা, নাক চোখও ঠিকঠাক। তবু তার চেহারায় এমন একটা কিছু ছিল, যে জন্য তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না। বন্দনার প্রধান দোষ ছিল চোখ পিটপিট করা। কোনো মেয়ের এই রোগ আমি আগে দেখি নি বন্দনা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে আর অনবরত চোখ পিটপিট করছে, দেখলেই কি রকম অস্বস্তি লাগে। শুকনো ভদ্রতা দেখিয়ে বন্দনাকে আমি বিদায় করলাম। তবু বন্দনা নিয়মিত চিঠি লেখে। আমি উত্তর দিচ্ছি না অথচ একজন আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখে যাচ্ছে এও তো এক দারুণ যন্ত্রণা। বন্দনার পর পর আটখানা চিঠি পাবার পর আমি সংক্ষিপ্ত ভদ্রতায় একবার উত্তর দিলাম। তাতে বন্দনা এত বেশী উৎসাহিত হয়ে উঠল যে দু'দিন পরেই স্কুল কামাই করে দেখা করতে এল আমার সঙ্গে। আমাদের বাড়ির

বসবার ঘরে সে বসে রইল দু'ঘণ্টা, আমি ব্যস্ততার ইঙ্গিত করাতেও উঠল না। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা আমার হাতের আঙুল নিয়ে সে খেলা করতে চায়। তখন তার চোখ পিটপিট করাও বেড়ে যায় খুব।

এই অবস্থায় আমার করণীয় কি ছিল? আমার দোষ এই, আমি আমার কর্তব্য ঠিক করতে পারি না চট করে। বিশেষত এই রকম অদ্ভুত সমস্যায় পড়লে। বন্দনা আমার প্রেমে পড়তে চায়। বস্তুত আমার প্রেমে পড়ার জন্য সে বদ্ধপরিকর। আমি আমার কোনো লেখায় লিখেছিলুম, এ পর্যন্ত কোনো মেয়ে আমাকে ভালবাসে নি। সেটা পড়েই বন্দনা ধরে নিয়েছিল, আমি খুব দুঃখী মানুষ এবং সে এসেছিল আমার উদ্ধারকর্তা হিসাবে। সে দেখিয়ে দিতে চায়, মেয়েরাও ভালবাসতে জানে।

ভদ্রতাসম্মতভাবে বন্দনাকে প্রত্যাখ্যান করার যতগুলি উপায় আছে সবগুলিই আমি ব্যবহার করেছি। বন্দনা কিছুতেই বুঝবে না। ওর ধারণা, এসব আমার অভিমানের কথা। কি যে মুশকিলে পড়া গেল।

মোট কথা, বন্দনা তারপর থেকে অতিষ্ঠ করে তুলল আমার জীবন। স্কুলের ছুটি হলেই সে ঘন ঘন কলকাতায় চলে আসে এবং ছায়ার মত আমায় অনুসরণ করে। ছোট-খাটো অপমান সে গায়েই মাখে না। বন্ধুরা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি শুরু করেছে।

একদিন বন্দনা চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটিয়ে আমার কাছে এসে বলল, তার বাবা মা তার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছে।

আমি উৎফুল্ল হয়ে বললাম, এ তো চমৎকার কথা। পাত্রটি কি করে?

বন্দনা বলল, পাত্র একটি কলেজে পড়ায়। কিন্তু মরে গেলেও সে তাকে বিয়ে করবে না। আমি কি বন্দনাকে সাহায্য করব না?

আমি কিঞ্চিৎ কঠোর ভাষাতেই জানালাম যে আমার কাছ থেকে কোনো কিছু যেন সে প্রত্যাশা না করে।

বন্দনার আসল ইচ্ছাটি আস্তে আস্তে জানা গেল। ছেলেবেলা থেকেই তার প্রতিজ্ঞা সে কখনো বাপ-মায়ের পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে করবে না। সে কারুকে ভালবাসবে, তারপর তার সঙ্গে যদি বিয়ে হয়—কিংবা তাকে যদি কেউ ভালবেসে বিয়ে করতে চায়—। দীর্ঘ তিরিশ বছরের মধ্যে বন্দনার প্রেমে কেউ পড়ে নি। এইজন্যই লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। বন্দনার চেয়ে ঢের খারাপ চেহারার মেয়ের প্রেমেও অনেক লোক পড়ে—কিন্তু বন্দনার কোনো প্রেমিক জোটে নি। এতদিন পর বাবা মা জোর করে বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত। তখন বন্দনা আমাকেই তার প্রেমিক হিসাবে বেছে নিয়েছে—তার কারণ আমার সেই লেখা, যার মধ্যে লিখেছিলাম, আমি কখনো ভালবাসা পাই নি। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে! আমি তিন চারটি মেয়ের নাম বলেছি আমার প্রেমিকা হিসেবে—দুজনের সঙ্গে বন্দনার আলাপও করে দিয়েছি, তাও বন্দনা নিবৃত্ত হয় না।

বাবা মায়ের ঠিক করা পাত্রের সঙ্গে বন্দনার বিয়ের কথা যত পাকা হতে লাগল বন্দনা মরিয়া হয়ে উঠল। একদিন আমার কাছে এসে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিল। বন্দনা বেশ কয়েক বছর মাস্টারী করে সাতশো টাকা জমিয়েছে, সেই টাকা নিয়ে সে আমার সঙ্গে ছুটিতে বাইরে কোনো হোটেলে স্বামী স্ত্রী হিসেবে কাটিয়ে আসতে চায়। বিয়ে না হয় না-ই হল, তবু তো সাতটা দিন তার জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সেই প্রস্তাব শুনে আমি নিষ্ঠুরের মত বলেছিলাম, সাতশো টাকার বদলে তুমি যদি হাজার টাকা আনতে তাহলে না হয় চিন্তা করে দেখা যেত। তুমি বরং অন্য কোনো ছেলেকে খুঁজে নাও। অন্য অনেকে রাজী হতে পারে। যদি চাও তো আমিই অন্য ছেলে যোগাড় করে দিচ্ছি!

বন্দনা সেদিন কেঁদে ফেলেছিল। আমারও অসহ্য লেগেছিল তখন।

দিন দশেক বাদে পি. জি. হাসপাতাল থেকে একটা চিঠি পেলাম। পেন্সিলে লেখা খামটাও খুব ময়লা। বন্দনার চিঠি। লিখেছে যে হঠাৎ তার পেটে খুব ব্যথা হওয়ায় ও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আমি যেন অবশ্যই ওর সঙ্গে দেখা করি। চিঠি লেখার সরঞ্জাম অতি কষ্টে জোগাড় করতে হয়েছে।

হাসপাতালের ত্রিসীমানায় আমি পারতপক্ষে যাই না। বন্দনার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার তো কথাই ওঠে না। পেটে ব্যথা হয়েছে তো আমি দেখতে গিয়ে কি করব!

দু'দিন বাদে বন্দনার আর একটা চিঠি এল। সেই চিঠিখানা আমার কাছে এখনো আছে। তাতে লিখেছে, আমি বুঝতে পারছি আমি আর দু'তিন দিনের বেশী বাঁচব না। তুমিই আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী। আমি একটু ভালবাসার জন্য কাঙাল ছিলাম। তুমি এত কৃপণ, যে আমাকে একটু ভালোবাসতে পারলে না! একবার আসবে? তুমি যদি এসে একবার আমাকে একটা চুমু দাও, শান্তিতে মরতে পারব তা হলে। কোনো ক্ষোভ থাকবে না।

এ চিঠিখানাও আমার অসহ্য ন্যাকামি বলে মনে হয়েছিল। দু'তিন দিন বাদে যে মারা যাবে, তার চিঠি লেখার ক্ষমতা থাকে না। পেটে ব্যথা হলে কেউ মরে না। তা ছাড়া হাসপাতালে গিয়ে চুমু দেব—এ কি ইয়ার্কি নাকি? বাচ্চা মেয়ে হলেও কথা ছিল, অত বড় ধিঙ্গি মেয়েকে হাসপাতালে চুমু! ভেবেছিলাম, সময় পেলে হাসপাতালে গিয়ে বন্দনাকে আর একবার ধমকে দিয়ে আসব। সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে তিন দিনের দিন বন্দনা মারা গেল।

আসলে তার লিউকোমিয়া ছিল, সে জানত না। অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের ব্যথার জন্য অপারেশন করতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

বন্দনার মৃত্যুর খবর শুনে আমি বেশ রেগে গিয়েছিলাম। এ রকম দুম করে মরে যাবার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া তার মৃত্যুর জন্য আমাকে দায়ী করা কেন? পি. জি. হাসপাতালের শ্রেষ্ঠ ডাক্তাররা তার চিকিৎসা করেছে। আমার পক্ষে কি জোর করে ভালোবাসা সম্ভব? আমি ওর সঙ্গে বেলেল্লা করিনি, সেটা কি আমার অপরাধ?

অতৃপ্ত ভালোবাসা নিয়ে বন্দনা মরে গেল তিরিশ বছর বয়সে?

বন্দনাকে হাসপাতালে দেখতে যাইনি কিন্তু নির্মলকে দেখতে গিয়েছিলাম। খবর পেয়েই বুঝেছিলাম নির্মল বাঁচবে না। আমরা গিয়েছিলাম ওকে সান্ত্বনা দিতে, ওর কপালে হাত রেখে বলেছি, ভয় নেই দুদিনেই সেরে উঠবি।

নির্মল ছিল ওর বাবা মায়ের এক ছেলে। আসলে ওরা ছিল পাঁচ ভাই-বোন। কিন্তু আশ্চর্য নিয়তির খেলায় ওর অন্য সব ভাই-বোনই অল্প বয়সে মারা যায়। সেইজন্যই নির্মলের মা ওকে সব সময় চোখে চোখে রাখতেন, কয়েক ঘণ্টা না দেখলে উতলা হয়ে উঠতেন। আমরা সন্ধ্যাবেলায় যখন তুমুল আড্ডা দিচ্ছি, তখন নির্মলকে নিরস মুখে বাড়ি ফিরে যেতে হত। কেউ ঠাট্টা করলে নির্মল বলত, জানিস না তো আমার মাকে, একটু দেরি হলেই মা আবার ফিট হয়ে যাবেন। আমি ভাই মাকে কষ্ট দিতে পারি না। শেষ পর্যন্ত নির্মলের মা-ই তার মৃত্যুর কারণ হন।

নির্মলরা থাকত দমদমে—ওদের বাড়ির পাশেই ইস্কুল বা কলেজ। বাড়ির পাশে কলেজ না থাকলে নির্মলের পড়াশুনা করাই হত না। তা-ও তো দু'তিন পিরিয়ড পর পর নির্মলকে একবার বাড়ি এসে দেখা দিয়ে যেতে হত। নির্মল যখন দিল্লী কিংবা বেনারসে বেড়াতে গেছে, ওর মাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়েছে। মাকে কষ্ট দেবার কোনো উপায়ই ছিল না নির্মলের—ওর মা তাহলে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যেতেন—তখন ডাক্তার ডাকা, ছুটোছুটি।

এইরকম ভাবে মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় থাকতে থাকতে নির্মলের স্বভাবটাও একটু অদ্ভুতরকমের হয়ে গিয়েছিল। বাইরের লোকের সঙ্গে মিশতে পারত না, কথা বলতে পারত না। বেশীর ভাগ সময়েই বাড়িতে কাটাত, আমরা আড্ডা দিতে ওদের বাড়িতেই যেতাম, ওর মা অবশ্য যত্ন করতেন খুব।

বাবা মারা যাবার পর নির্মল আরও একা হয়ে পড়ে। বাড়িতে শুধু মা আর ছেলে. বাড়িখানা ওদের নিজস্ব। আত্মীয় স্বজনেরা, পরামর্শ দিলেন নির্মলের বিয়ে দেবার জন্য। নির্মল জীবনে কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে মেশে নি। নির্মলের মা চতুর্দিকে পাত্রী দেখে বেড়াতে লাগলেন। কিছুতেই আর পছন্দ হয় না—উনি ডানা কাটা পরী খুঁজছেন। আমরা গেলে নির্মল একগাদা মেয়ের ছবি তাসের মত মেলে জিজ্ঞেস করত,

বল তো, কাকে পছন্দ করা যায়?

নির্মলের বাড়ির পাশের মাঠে প্রতি বছর সরস্বতী পুজো হয়। সকালবেলা নির্মলের পরনে ধুতি আর গেঞ্জি। নির্মল নিজেদের পাঁচিল দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে—পুজো শেষ হয়েছে কি না। অঞ্জলি না দিয়ে নির্মল চা খেতে পারছে না। পাঁচিলের পাশেই একটা তোলা উনুন ধরতে দেওয়া ছিল, নির্মল সেটা দেখতে পায় না। সেই উনুন থেকে লকলকে শিখা উঠে নির্মলের ধুতিতে লাগল। নির্মল যখন খেয়াল করল, তখন তার ধুতি দাউদাউ করে জ্বলছে।

সবচেয়ে সহজ উপায় ছিল ধুতিটা কোনোক্রমে খুলে ফেলা কিংবা মাটিতে গড়াগড়ি দিলেও আগুন নিভে যেত। এ সব তো সবাই জানে। নির্মলও কি জানত না! তবু ওর মাথায় গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল আগুন দেখে। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে মা মা চিৎকার করে ছুটে গেল নির্মল। মা তখন দোতলায়। সেই ছুটে যাওয়ায় আগুন জ্বলতে লাগল আরও বেশী। দোতলার বাথরুম থেকে সেই আর্ত চিৎকার শুনে বেরিয়েই মা দেখলেন তার জ্বলন্ত সন্তানকে। একটা কম্বল এনে চেপে ধরার বদলে মা তাড়াতাড়ি এক বালতি জল এনে ঢেলে দিলেন নির্মলের গায়ে! তারপর আরও এক বালতি। নির্মলের যদিও বা বাঁচার আশা ছিল কিন্তু ঐ জল ঢালার ফলে সেই সম্ভাবনাও ঘুচে গেল।

তিনদিনের মধ্যে নির্মলের জ্ঞান ফেরে নি। ডাক্তাররা বিমর্ষভাবে ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন, বাঁচার আশা নেই। যদি বা কোনোক্রমে বাঁচে, পা দুটো আর ব্যবহার করতে পারবে না—সে আর পুরুষ থাকবে না।

তিনদিন পর নির্মলের জ্ঞান ফিরল। তখন আমরা গেলাম ওকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিতে। নির্মল মানুষ চিনতে পারছে, কথাও বলছে। লোকজনের ভিড় করা একেবারে নিষেধ। নির্মল তার ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত আমার হাতে রেখে জিজ্ঞেস করল, সুনীল, আমি সত্যিই বাঁচব তো? বল, সত্যি করে বল, বাঁচব?

নির্মলের দুচোখে জল। আমি অম্লান বদনে বললাম, কি বলছিস পাগলের মতন। এক সপ্তাহের মধ্যেই তোকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে।

—নারে, আমি বাঁচব না। আমি জানি! আমি জানি! দু' চোখে অনর্গল জল, নির্মল আস্তে আস্তে বলল, অতগুলো ছবি, যদি যে-কোনো একজনকে আগেই পছন্দ করে ফেলতাম আমি এ পর্যন্ত কোনো মেয়েকে ছুঁয়ে দেখিনি। মেয়ের ভালোবাসা পাওয়া যে কি জিনিস জানি না, আমার ভাগ্যে নেই..

কয়েক ঘন্টা বাদেই নির্মল মারা যায়। ওর শবদেহ দাহ করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভোর হয়ে গেল। পরপর দু'রাত্তির আমারও ঘুম হয়নি। বাড়ি ফিরে স্নান করে চা খেয়েই শুয়ে পড়লাম, সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

সেদিন আবার দেখলাম স্বর্গের দৃশ্য। বাগানটা আজ ফাঁকা, বাড়িটাতেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না—আলোর মতন জ্বলন্ত ফুলগাছগুলো হাওয়ায় দুলছে। চারপাশে একটা অস্পষ্ট নীল আলোর আভা।

বাগানের বাইরে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নির্মল! অর্ধদগ্ধ বিকৃত শরীর। দগদগে ঘা-গুলো দেখা যাচ্ছে। দরজার ওপর হাত রেখে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, ঠ্যালা দিতে সাহস পাচ্ছে না—যদি ঢুকতে না পায়। ঝলসানো মুখে বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তো দাঁড়িয়েই রইলো।

হঠাৎ তার হাতের ওপর আর একখানি হাত এসে পড়ল। নারীর হাত। দূর থেকে আমি দেখলাম, বন্দনা এসে দাঁড়িয়েছে গেটের সামনে। নির্মল চমকে তাকাল বন্দনার দিকে। এই প্রথম তার শরীরে মা ছাড়া অন্য নারীর স্পর্শ। চমকে উঠেছে নির্মল। বন্দনা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল নির্মলের দিকে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, বন্দনা আর চোখ পিটপিট করছে না।

বন্দনা চাপ দিতেই গেট খুলে গেল। নির্মলের দিকে ফিরে ডাকল আসুন।

আমি জানতাম, নির্মলের জন্য দরজা বন্ধ থাকবে না। ওরা দুজনেই ভালোবাসার অতৃপ্তি নিয়ে পৃথিবী ছেড়েছে।

বাগানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই নির্মলের শরীরের পরিবর্তন দেখা দিল, আবার সে সজীব স্বাস্থ্যবান শরীর ফিরে পেয়েছে। বন্দনার মুখে এসেছে আশ্চর্য কমনীয়তা। পরস্পর হাত ধরাধরি করে ওরা বাগান পেরিয়ে উঠল সেই সাদা বাড়িটার সিঁড়িতে।

অল্পক্ষণের জন্য ওরা আমার চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিল। আবার ফিরে এল সেই সাদা বাড়ির বারান্দায়। হাস্য-উজ্জ্বল মুখ দুজনেরই। কি যেন একটা রসিকতায় ওরা হঠাৎ একসঙ্গে হেসে উঠল—তারপর বালক-বালিকার মতন আনন্দে লঘু পায়ে ছোটাছুটি করতে লাগল বারান্দায়। একটু পরেই সুখী পায়রার মতন ওরা পরস্পরের মুখ চুম্বন করল। যেন একজনের ঠোঁট থেকে আর একজন সত্যিকারের মিষ্টি কিছু পান করছে।

আমার বুকখানা আনন্দে ভরে গেল। মনে হল এমন সুন্দর কোনো দৃশ্য আমি সারা জীবনে কখনো দেখিনি। আমি চিৎকার করে ডাকলাম, নির্মল! বন্দনা! ওরা দুজনেই শুনতে পেয়েছে ঠিক। উজ্জ্বল রেলিং ধরে শিশুর মতন ঝুঁকে হাত নাড়তে লাগল আমার দিকে! আমার প্রতি খানিকটা দয়া কিংবা অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠেছে ওদের মুখে। যেন ওরা বলতে চাইছে, তুমি আসতে পারবে না, তুমি কোনোদিন এখানে আসতে পারবে না!

সোনালি দিন

ও মশাই, উঠুন, উঠুন!

পিনাকী চোখ মেলে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না। সে কোথায়? কে তাকে ডাকছে? এত নীচু মতন একটা লম্বা ঘর। খাকি পোশাকপরা লোকটি আবার বললো, কী মশাই, বাড়ি যাবেন না?

তখন পিনাকী ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। সে বাসের দোতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন পিনাকী বাসে উঠেছিল তখন ভিড়ে গিসগিস করছিল। দোতলাতেও দাঁড়িয়েছিল অনেকে; প্রায় অর্ধেকেরও বেশী রাস্তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসে হঠাৎ সে একটা সীট পেয়েছিল। এখন বাসটা একদম ফাঁকা, গ্যারাজের মধ্যে ঢুকে আছে।

লজ্জিত মুখ করে, কণ্ডাকটরকে কিছুই না বলে সে অতিরিক্ত দ্রুততার সঙ্গে নেমে গেল। পাদানির ঠিক নীচেই ছিল খানিকটা মাটি খোঁড়া। সেখানে জল জমা, পিনাকী না দেখে সেখানে ডান পা ফেলতেই তার প্যান্টে অনেকখানি জল কাদা লেগে গেল। যাক, এমন কিছু ক্ষতি হয়নি।

বেশী রাত হয়নি, মাত্র পৌনে এগারোটা। এর মধ্যেই বাস গ্যারাজে ঢুকে যায়? জেগে থাকলে পিনাকীর সাড়ে ন'টার মধ্যেই বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে তো! জায়গাটা কোথায়? বেলঘরিয়া নাকি?

বাইরে এসে পিনাকী দেখলো, না পাইকপাড়া। তা হলে বেশী দূর নয়। এখন কি আর উল্টোদিকের বাস পাওয়া যাবে? এটুকু রাস্তা হেঁটেই যেতে হবে মনে হচ্ছে।

সিগারেট খোঁজার জন্য পিনাকী পকেটে হাত দিলো। তার পকেটে সিগারেট দেশলাই, খুচরো পয়সা, একটা দু'টাকার নোট, কয়েকটা ঠিকানা লেখা টুকরো কাগজপত্র —কিছু নেই। প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট মিলিয়ে মোট তিনটি পকেট একেবারে শূন্য। এতক্ষণ সে ঘুমিয়েছিল বাসের মধ্যে, কেউ না কেউ তুলে নিয়ে গেছে। চোর কি সিগারেট দেশলাইও নেয়? কিংবা পকেট থেকে পড়ে গেছে? যাক, আবার ফিরে গিয়ে খুঁজে দেখার কোনো মানে হয় না।

পিনাকী আপন মনে একটু হাসলো। সে যে বাসের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে পারে, একথা কেউ বিশ্বাস করবে? তার তো এখন খুবই চিন্তা-ভাবনায় দুঃখিত মুখ করে থাকার কথা!

ফুটপাথ ধরে কয়েক পা এগিয়েই পিনাকী দেখলো সামনে একটা কলম পড়ে আছে।

কলম নয়, ডট পেন। কোনোরকম দ্বিধা না করে সে সেটা তুলে নিলো। তার নিজের জিনিস হারিয়ে গেছে বা চুরি হয়েছে সুতরাং রাস্তায় অন্যের হারানো জিনিস সে নেবে না কেন? পিনাকীর চোখ খুব তীক্ষ্ণ। সে পৌনে এগারোটার অন্ধকার রাস্তাতেও একটা ডট পেন দেখতে পায়।

সীসটা ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্যে এক টুকরো কাগজ পেলে ভালো হতো। তার পকেটে তো কিছুই নেই! একটা কাগজের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকালো। কিছুই চোখে পড়লো না। তখন সে সীসটা নিজের বাঁ হাতের তালুতে ঘষলো কয়েকবার, বেশ জোরে। তবু কোনো দাগ পড়ে না। শুধু তাই নয়, ডট পেনটার একটা পাশ ফাটা। এটা হারায়নি, কেউ ইচ্ছে করে ফেলে দিয়ে গেছে। ঠিক এইখানেই কেন? পিনাকীকে ঠকাবার জন্য? তাছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে? সেই জন্যই অন্য কেউও এটা আগে তোলে নি। সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেছে পিনাকীকে ঠকাবার জন্য। কিন্তু পিনাকীকে ঠকিয়ে অন্যদের কি লাভ?

আর যাতে কেউ না ঠকে, সেইজন্য পিনাকী রাস্তার পাশের একটা ড্রেন খুঁজে তার মধ্যে খুব যত্ন করে ফেলে দিলো জিনিসটা। পিনাকী কারুকে ঠকাতে চায় না।

তখন তার মনে পড়ে গেল একটা জ্যামিতির বাক্সর কথা! তার ছোটভাই পল্টু ক্লাস সেভেনে পড়ে, তার জ্যামিতির ইন্সট্রুমেন্ট বক্স নেই বলে ক্লাসে বকুনি খায়। তাকে সেটা কিনে দেওয়া হয়নি। পল্টুর পড়ার বইগুলো কেনা হয়েছে কলেজ স্ট্রীটের পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে। জ্যামিতির বাক্সের দাম বারো টাকা। কে যেন বলেছিল জ্যামিতির বাক্সও কোথায় যেন পুরোনো কিনতে পাওয়া যায়। সেই আশাতেই নতুন কেনা হয়নি। পুরোনোও পাওয়া যায়নি।

অন্ধকার রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে পিনাকী একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেললো। সে অনুচ্চ স্বরে বললো, পল্টু, তোকে আমি সামনের মাসেই ঠিক জ্যামিতির বাক্স কিনে দেবো, দেবোই দেবো। নতুন হলদে রঙের সুন্দর বাক্স, ভেতরের জিনিসগুলো ঝকঝকে।

প্রতিজ্ঞাটা করার পরেই সে মনশ্চক্ষে দেখতে পেলো পল্টুর বইপত্তরের ওপরে শোভা পাচ্ছে সেই বাক্সটা। পল্টু পড়াশোনায় ভালো, সে খুশী হবে। পিনাকীও আগে থেকে খুশী হয়ে গেল এবং জোরে পা চালালো।

পিনাকীকে যেতে হবে দত্তবাগানের দিকে। তখন শ্যামবাজার পর্যন্ত হেঁটে গেলে ওদিকের বাস পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পিনাকীর পকেটে তো একটাও পয়সা নেই। সুতরাং পাইকপাড়ার ভেতর দিয়ে কোনাকুনি পায়ে হেঁটে যাওয়াই সহজ উপায়।

কিন্তু পিনাকী ঠিক সহজ পথটাতে গেল না। রাণী হর্ষমুখী রোড থেকে সে একবার বাঁয়ে বেঁকলো। এদিকের গলিঘুঁজি ধরে ঘুরে ঘুরে আবার বড় রাস্তায় পড়া যায়। এ পাড়ার কুকুরগুলো বড্ড বেশী চ্যাঁচায়। গলির মোড়ে পানের দোকানটা এখনও খোলা আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে গুলতানি করছে চার-পাঁচটি ছেলে। প্রত্যেকের হাতে সিগারেট। সেটা দেখেই সিগারেটের জন্য মনটা আবার আনচান করে উঠলো পিনাকীর। কিন্তু কোনো উপায় তো নেই। ওদের কাছে একটা সিগারেট ধার চাইবে? অচেনা লোকের কাছেও নস্যি চাওয়া যায়, কিন্তু সিগারেট চাওয়া যায় না। পকেটে একটাও পয়সা নেই বলে কিন্তু পিনাকীর তেমন বেশী দুঃখ হচ্ছে না। মোটে তো দুটো টাকা আর কিছু খুচরো! যদি থাকতো দু হাজার টাকা...অবশ্য অত টাকা থাকলে পিনাকী বাসে না চেপে ট্যাক্সিতেই আসতো। বছর দু-একের মধ্যে পিনাকী ট্যাক্সিতে চাপেনি। প্রথম গলির পর আবার ডানদিকে বেঁকলে সাতখানা বাড়ির পর রত্নাদের বাড়ি। গলিটা ফাঁকা একদম। রত্নাদের বাড়ির সবগুলো ঘরই অন্ধকার। এ তো বাড়ি নয়, পাখির বাসা। ঐটুকু একটা তিনতলা বাড়িতে সাতটি পরিবার থাকে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এতক্ষণ জেগে থেকে কীই-বা করবে? পাখিদের মতনই সাধারণ মানুষও বেশীক্ষণ জেগে থাকে না। যদি না তাদের বাড়ির কোনো ছেলে পিনাকীর মতন এখনো বাড়ি না ফিরে থাকে।

রত্না তো ঘুমোবেই, কারণ তাকে খুব ভোরে উঠতে হয়। সে একটা সকালের ইস্কুলে পড়ায়, তাও যেতে হয় বৌবাজারে। প্রথম প্রথম পিনাকী রত্নাকে পেঁৗছে দেবার জন্য

শ্যামবাজার বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকতো খুব সকালে এসে। আজকাল আর হয়ে ওঠে না। তাছাড়া রোজ এক জায়গায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে দাঁড়ালে কাছাকাছি লোকজনেরা চিনে যায়, তাতে বড় অস্বস্তি লাগে।

রত্না তিনতলায় কোন ঘরটাতে থাকে তা পিনাকী জানে। যদিও সে কোনোদিন রত্নাদের বাড়ির তিনতলায় ওঠেনি। রত্নাদের মাত্র দুটো ঘরের ফ্লাট। দুজন লোক।

একদিন ভোরবেলায় পিনাকী দেখেছিল রত্না বৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ ভিজে গিয়ে বাসস্টপের দিকে হেঁটে আসছে। পিনাকী তখন পাশের দোকানের ছাউনির মধ্যে দাঁড়িয়ে।

রত্না সেই বৃষ্টির মধ্যে বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাসের দেখা নেই। পিনাকী ছাউনি ছেড়ে ছুটে এলো রত্নার কাছে। একটু বকুনি দিয়ে বললো, শুধু শুধু ভিজছো কেন? রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াও।

রত্না বললো, আর কি হবে? একদম ভিজেই তো গেছি।

—কেন ভিজলে? একটু অপেক্ষা করতে পারলে না?

—এ বৃষ্টি কি থামবে? কাল রাত থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

—একটা ছাতা নাও নি কেন?

—থাকলে তো নেবো।

—নেই?

—ছিল একটা বাবার...গোল বাঁকানো হাতল। ঐ রকম ছাতা নিয়ে মেয়েরা বেরোয় না।

—এসব তোমাদের বাড়াবাড়ি। কাজ চললেই হলো। শুধু শুধু ফ্যাশন করতে গিয়ে বৃষ্টি ভেজার কোনো মানে হয়?

রত্না তার ভেজা মুখ তুলে সম্পূর্ণভাবে তাকিয়েছিল পিনাকীর দিকে। পিনাকীর গলার বকুনির সুর শুনেও সে হেসেছিল। রত্না সহজে রাগে না। বরং পিনাকীকেই সে রাগতে ভালোবাসে।

সে বলেছিল, সেই ছাতার কাপড়ে আবার অনেকগুলো তাপ্পিমারা। সেই রকম ছাতা নিয়ে যদি আমি বেরোতুম তুমি খুশী হ'তে?

পিনাকী তবু জেদ ধরে বসলো, হ্যাঁ। বৃষ্টি ভিজে অসুখ বাধানোর চেয়ে সেরকম ছাতা নিয়ে বেরুনোও ভালো। লোকে যা বলে বলুক।

রত্না বললো, সেটা নিয়েই বেরুতে যাচ্ছিলাম কিন্তু খুলতে যেতেই শিকটিকগুলো সব ছটকে গেল। আর একটু হলে আমার চোখে লাগছিল আর কি। ওটা আর সারানোও যাবে না। বাবা বললেন ছাতাটা ছাব্বিশ বছরের পুরোনো। তার মধ্যে গত তিন বছর সেলাই হয়নি।

পিনাকী তবু হার মানলো না। বললো, একদিন স্কুলে না গেলে কি হতো? বৃষ্টি ভিজেও যেতে হবে?

—ক'দিন ধরে প্রায়ই তো ভোরের দিকে বৃষ্টি হচ্ছে! ক'দিন আর স্কুল কামাই করবো?

কেন ঠিক ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়? পিনাকী ক্রুদ্ধভাবে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। সকাল ছ'টার সময় বৃষ্টি নামতে পারে না? রত্নার স্কুলে যাবার সময়টা বাদ দিয়ে? রত্নার একবার প্লুরিসি হয়েছিল। বৃষ্টিভেজা তার পক্ষে খুব খারাপ।

রত্না বললো, তা ছাড়া একটু থেমে গেল। আঙুল দিয়ে ভুরুর ওপরের জল মুছলো। তারপর আবার বললো, তাছাড়া তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে জানতাম তবু আমার বাড়িতে বসে থাকতে ভালো লাগবে?

—আজ আর স্কুলে যেও না!

—কিন্তু বাড়িতেও ফিরবো না।

—কেন?

—বাবা খিটখিট করবে! বাবার ধারণা একদিন স্কুলে না গেলেই চাকরি চলে যায়।

—ঠিক আছে আমাদের বাড়িতে চলো।

—যাচ্ছি। আমার চাকরি গেলে তুমি দায়ী থাকবে কিন্তু...

এটা দেড়মাস আগেকার কথা। পিনাকী আকাশের দিকে তাকালো। মেঘের গায়ে লাল লাল আভা। সারারাত গুমোট গরমে সবাইকে ভুগিয়ে ঠিক ভোরের দিকে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে।

রত্না এখনো ছাতা কেনেনি। বেসরকারী ছোট ইস্কুলটাতে রত্না মাইনে পায় একশো পনেরো টাকা। এর মধ্যে বাসভাড়া আছে টিফিনেও কিছু খেতে হয়। রত্নার বাবার এখন এক পয়সা রোজগার নেই। রত্না একটু ভালো মাইনে—এই সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি একটা মাস্টারির কাজ পেয়েছিল আসানসোলে। পিনাকী সেখানে রত্নাকে যেতে দেয়নি। রত্না অতদূরে চলে গেলে সে কি নিয়ে থাকবে? তাছাড়া সেখানেও রত্নার বাবা ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে যেতে হবে—মাত্র সাড়ে তিনশো টাকায়.. তার চেয়ে কলকাতায় টিউশনি আছে, আরও যদি কিছু পাওয়া যায়...

রত্নাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পিনাকীর ডান পায়ের জুতো ও প্যাণ্ট কাদায় মাখামাখি, পকেটে একটাও পয়সা নেই। তবু সে আর একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেললো। সে খুব আস্তে আস্তে বললো, রত্না খুব শীগগিরই তোমাকে একটা ছাতা কিনে দেবো। রঙীন ফুলকাটা ছাতা। সেই যেগুলো বোতাম টিপলেই খোলে আর গুটিয়ে ছোট্ট করে ফেলা যায়, হাত ব্যাগের মধ্যে ঢোকানো যায়—ঠিক সেইরকম, রত্না খুব শীগগিরই তোমার জন্য...

রত্নাকে যেদিন ছাতাটা উপহার দেবে সেদিন নিশ্চয় রত্না একটু বকবে তাকে বাজে খরচ করার জন্য। পিনাকী উদার হেসে বলবে এ আর এমন কি? এই তো তোমাকে রাজছত্র দিলাম। এর পর তোমাকে রাজপ্রাসাদ উপহার দেবো...। মহারাণী হর্ষকুমারীর বদলে এই রাস্তার নাম হবে মহারাণী রত্নাকুমারীর নামে—কারুর বাপের সাধ্য নেই যে আটকায়।

পিনাকী এরপর পা চালালো বেশ জোরে। রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে। তাদের পাড়ার কাছাকাছি পানের দোকানটা তখন ঝাঁপ ফেলতে শুরু করেছে। পিনাকী এক দৌড় লাগালো। কোনোক্রমে শেষ মুহূর্তে পেঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, দীনুদা এক প্যাকেট সিগারেট আর দেশলাই।

দীনুদা নিজের জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে একবারটি আড়চোখে দেখলো পিনাকীকে। সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়ালো না।

—দীনুদা এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা দেশলাই।

—কই পয়সা দিন।

—হ্যাঁ দেবো আজ নয়...মানে আমার কত যেন হয়েছে।

—পনেরো টাকা! আপনি নিজেই তো কাল বলে গেলেন যে ওটা শোধ দেবার আগে আর ধার নেবেন না। এখন থেকে নগদা পয়সায়।

—দিতাম, আজই দিতাম। কুড়ি টাকা পকেটমার হয়ে গেল কিনা। বৌবাজারে বাসে এত ভিড়.. লোকটাকে আগেই সন্দেহ করেছিলাম।

এ গল্প শোনার ব্যাপারে দীনুদার কোনো উৎসাহ নেই। এক প্যাকেট সিগারেট আর দেশলাই ছুঁড়ে দিয়ে বললো, পনেরো টাকা তিরাশি পয়সা হলো! সরুন, দোকান বন্ধ করবো।

পিনাকী বললো, দিয়ে দেবো তোমাকে, সব শোধ করে দেবো দীনুদা। আর কোনো চিন্তা নেই।

পিনাকী এমন সুরে বললো কথাটা—যেন সে নতুন চাকরি কিংবা লটারির পুরস্কার পেয়েছে। দীনুদা একবার মুখ ঘুরিয়ে পিনাকীকে না দেখে পারলো না। পিনাকী আর দাঁড়ালো না সেখানে।

এ পাড়ার কুকুররা পিনাকীকে চেনে। পাশের বড় ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর দু-একটা ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। পিনাকী গলির মধ্যে ঢুকলো।

তাদের বাড়ির দরজাটা বন্ধ। সন্ধে থেকেই বন্ধ থাকে না হলে ছিঁচকে চোর ঢুকে পড়ে। দরজার গায়ে স্ক্রু দিয়ে লাগানো পিনাকীর বাবার আমলের লেটার বক্স। রং আর লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ভেতরে উঁকি মেরে দেখলো, কোনো চিঠি আছে কি নেই।

পিনাকী মনে মনে ঠিক করলো লেটার বক্সটায় রং করাতে হবে। সুন্দর ঝকঝকে লেটার বক্স না হলে কী আর ভালো ভালো চিঠি আসে? বাবা বেঁচে থাকতে তাঁর নামে কত চিঠি আসতো, পিনাকীর নামে কোনো চিঠি আসে না। একদিন আসবে ঠিকই।

দরজার কড়া নাড়লে একতলার ভাড়াটেরা বিরক্ত হয়। তাদের ঘুম ভেঙে যায়। দরজায় একটা কলিং বেল লাগালে এ সমস্যা মিটে যায়। সাউথ ক্যালকাটার সব বাড়িতেই কলিং বেল থাকে। সেখানে কড়া নেড়ে ডাকে না পিনাকী দেখেছে। এবার তাদের বাড়িতেও একটা কলিং বেল লাগাতে হবে। নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি।

কড়া নাড়তে হলো না। তার আগেই দরজা খুলে গেল। মা।

তাদের বাড়িতে বারান্দা নেই। পিনাকী তো দোতলার জানলাতেও কারুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেনি। তবু মা কি করে টের পেলো!

—কী রে, এত দেরি করলি?

পিনাকী অস্পষ্টভাবে বললো, এই একটু হয়ে গেল দেরি...। দোতলায় এসে পিনাকী আগে পায়ের কাদা ধুলো। তার পর জুতো জামা খুলতে লাগলো একটা একটা করে। মা সর্বক্ষণ তাকিয়ে আছেন পিনাকীর দিকে, চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা।

—দেখা হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—তারপর কী হলো? কিছু বলছিস না কেন?

—দাঁড়াও বলছি বলছি প্যান্টটা ছেড়ে আসি।

নিজের ঘরে গিয়ে পিনাকী আলো জ্বাললো না। তার ছোট ভাইটা ঘুমিয়ে আছে যদি জেগে যায়। অন্ধকারে নগ্ন হয়ে সে পোশাক বদলালো। বেরিয়ে এসে বললো, মা খাবার দাও!

মেঝের ওপর আসন পাতা, তার সামনে খাবার ঢাকাই রয়েছে। রুটি ডাল আর ঢ্যাঁড়শের তরকারি। ক্ষিদেয় পেট চড়চড় করছিল, এতক্ষণ পিনাকী টের পায়নি। সে বেশ উপভোগ করে খেতে লাগলো।

—উনি তোকে চিনতে পেরেছিলেন?

—হ্যাঁ। তোমার কথাও জিজ্ঞেস করলে মিঃ ব্যানার্জি।

—আসল কথাটা কী হলো তাই বল না।

পিনাকী হাসিমুখে মায়ের দিকে তাকালো। তারপর খুব সহজভাবে বললো, চাকরিটা হয়নি মা!

মা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। রক্তশূন্য মুখ। তারপর তিনি ফ্যাকাশেভাবে হাসবার চেষ্টা করে বললেন, তুই আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছিস। তোর তো সবতাতেই ইয়ার্কি করা স্বভাব।

পিনাকী মায়ের সঙ্গে একটু ইয়ার্কি করবেই ঠিক করেছিল। যদি চাকরিটা হয়ে যেতো তাহলে মায়ের কাছে সহজে সে কথাটা ভাঙতো না। শেষমুহূর্তে মা কান্নাকাটি শুরু করলে খবরটা দিয়ে মাকে চমকে দিতো। কিন্তু যে চাকরি হয়নি তা নিয়ে আবার ইয়ার্কি কি? এ ইয়ার্কির শেষে তো কোনো চমক নেই।

সে বললে, মিঃ ব্যানার্জি খুব দুঃখ করলেন। ওঁর কোনো হাত নেই এখন। ওঁর হাত থাকলে উনি নিশ্চয়ই কিছু ব্যবস্থা করতেন আমার জন্য। ঐ পোস্টে আগেই লোক নেওয়া হয়ে গেছে।

মা শুধু বললেন, যাঃ!

—ভালোই হয়েছে চাকরিটা পেলে দুর্গাপুর চলে যেতে হতো!

—কিন্তু মাইনে তো ছিল সাতশো টাকা।

—তা ছিল।

—ওটা পেলে আমরাও দুর্গাপুরে গিয়ে থাকতাম—পিনাকী দেখলো, মা ছেঁড়া শাড়ী পরে আছেন। বিধবার থানের কতই বা দাম, তাও ছেঁড়া? বাবা মারা গেছেন দুবছর আগে। অবস্থা এতটা খারাপ হতো না. যদি না বৌদির সঙ্গে মায়ের দারুণ ঝগড়া হওয়ার ফলে দাদা আট মাস আগে আলাদা হয়ে না যেতো! দাদা ভালোই চাকরি করে। মাসে দেড়শো টাকা করে এখনো এ বাড়িতে দেয়। দাদার পাঠানো টাকা মা ছোঁন না। পিনাকী অবশ্য টাকাটা ফেরত দিতে পারে নি, নিজে চাকরি পেলে দাদাকে সব টাকা শোধ করে দেবে ঠিক করেছে। দাদার টাকায় মা কাপড় কিনবেন না।

পিনাকীই মায়ের জন্য একজোড়া ভালো শাড়ী কিনে দেবে। তার কোনো বন্ধু-বান্ধবের মা ছেঁড়া শাড়ী পরেন না। শুধু তার মা একা কেন ছেঁড়া শাড়ী পরবেন? চালাকি নাকি? পিনাকী এটা কিছুতেই সহ্য করবে না!

সে বললো, মা চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে!

মা নিঃশব্দে কাঁদছেন। মায়ের কান্নাটা যে এখন ঠিক কি কারণে, তা পিনাকী বুঝতে পারলো না। মা কী প্রফুল্ল ব্যানার্জির কথা ভাবছেন?

মা-ই পিনাকীকে পাঠিয়েছিলেন প্রফুল্ল ব্যানার্জির কাছে। পিনাকী নিজের চেষ্টায় এতোদিন চাকরি জোগাড় করতে পারে নি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে মা পিনাকীকে বলেছিলেন, তুই ওঁর সঙ্গে গিয়ে সরাসরি দেখা কর, আমার নাম বলবি, বলবি বেহালার চৌধুরীদের বাড়ির মেয়ে, উনি ঠিক চিনবেন, ঠিক ব্যবস্থা করে দেবেন।

পিনাকী পরে জেনেছিল ঐ প্রফুল্ল ব্যানার্জির সঙ্গে আটত্রিশ বছর আগে তার মায়ের বিয়ে হবার কথা ছিল। তখন মায়ের বয়স একুশ। বেণী ঝুলিয়ে দুপুরে সিনেমা দেখতে যেতেন। প্রফুল্ল ব্যানার্জি মাকে বিয়ে করার জন্য খুব পাগল হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত দু-বাড়ির ঘোর আপত্তিতে হয়নি।

প্রফুল্ল ব্যানার্জির বাড়িতে গিয়ে পিনাকীর বেশ মজা লেগেছিল। এই লোকটি তার বাবা হলেও হতে পারতো। তা হলে সে এই কেয়াতলা রোডের বাড়িতে থাকতো, কুকুরের গলায় চেন বেঁধে বেড়াতে যেতো বিকেলে।

আটত্রিশ বছর আগেকার দুর্বলতার কথা মিঃ ব্যানার্জি বিশেষ মনে রাখেন নি। তিনি মায়ের এই নাম শুনে চিনতে পেরেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর এই হলেও হতে পারতো ছেলেটির প্রতি আলাদা কোনো আগ্রহ দেখান নি। শুকনো ভদ্রতার সঙ্গে আপনি আপনি সম্বোধনে কথা বলেছেন পিনাকীর সঙ্গে। চাকরিটা পেয়েছে তাঁরই বর্তমান শালা।

তিনতলা-চারতলায় অত ভাড়াটে আছে কিন্তু ছাদের দরজাটা খোলাই থাকে। খেয়ে উঠে পিনাকী সিগারেট-দেশলাই নিয়ে ছাদে উঠে গেল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসে এই সময় গোটা দুই সিগারেট টানতে চমৎকার আরাম।

তিনতলার ভাড়াটেদের রেডিওর এরিয়েলের তারটা বেশ উঁচু। আগে পিনাকী লাফিয়ে সেটা ছুঁতে পারতো। এখন কি পারে? তিনবার লাফিয়ে সেটা ছুঁয়ে দিলো। এখনো পারে। তার গায়ে জোর আছে, শরীরে কোনো অসুখ নেই, একটা কমার্স ডিগ্রি আছে, সে কেন হেরে যাবে?

ইদানীং পিনাকী বড্ড বেশী হেরে যাচ্ছিলো। সব সময় তার মুখে একটা তেতো স্বাদ। সতেরো জায়গার চাকরির চেষ্টা করেও ব্যর্থ হবার পর, ও ভেবেছিল আর কিছুই হবে না তার দ্বারা। ছোট ভাইটা পড়াশুনোর ব্যাপার নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করতে এলে, দুদিন আগে পিনাকী তাকে ধমক দিয়েছে কুৎসিত ভাষায়। পরপর কয়েকদিন রত্নাকেও সে এড়িয়ে গেছে। দূর থেকে রত্নাকে দেখেও কাছে যায় নি। সিগারেট কেনেনি পাড়ার দোকান থেকে। মায়ের মুখের দিকে তাকায় নি। সে হেরে গিয়ে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। দারিদ্র্য শুধু তাকে বিপদে ফেলে নি, তার মনটাকেও ছোট করে দিচ্ছিলো। সে ছোট ভাইয়ের জ্যামিতির বাক্সও পুরোনো কেনার কথা ভাবে।

সিগারেটের শেষ টুকরোটা মাটিতে জোরে ছুঁড়ে ফেলে সে দাঁতে দাঁত চেপে বললো, আমি পিনাকী সরকার, আমাকে আটকাবে কোন শালা!

এবার নীচে ফিরে যেতে হবে। সে না গেলে মা ঘুমোবে না। মা কি এখনো কাঁদছে ?

পিনাকী ফিসফিস করে বললো, মা, চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমি তোমার জন্য দুটো নতুন শাড়ী...আমি পল্টুর জন্য নতুন চকচকে জ্যামিতির বাক্স... আমাদের দরজা, কলিং বেল......রত্নার জন্যে ফুলকাটা ছাতা...রত্না তার সবচেয়ে প্রিয় শাড়ীটা পরে আসবে সেদিন, ঝকঝকে রোদের মধ্যে ওর মাথায় রঙীন ছাতা—ওর মুখে একটা অন্যরকম আলো পড়বে—রত্না আসবে এ বাড়িতে...

পল্টু ছুটে যাবে মোড়ের থেকে সন্দেশ কিনে আনতে, মা, তুমি হাসবে, কতদিন পরে তোমার মুখে এরকম হাসি...মা, আমি দিতে পারি এইসব! বিশ্বাস করো, আর সবাই কত কি পারে, আর আমি এই সামান্য ক'টা জিনিস...কেন পারবো না? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই...মা আমি তোমাদের জন্য সবকিছু...আমি পারি। আমি পারি, আমি কেন পারবো না? আমি অন্যদের থেকে কম কিসে।

কিন্তু সবচেয়ে আগে চিঠির বাক্সটা রং করা দরকার। কাল সে নিজের হাতে ওটা রং করবে। রঙীন ঝলমলে ডাক বাক্সটাতে একদিন একটা সুন্দর চিঠি আসবে। যে চিঠিটা তাকে বলবে, পিনাকী, তুমি পারো, তুমি পারো, তুমি সব পারো!

সিঁড়িতে

—তুমি কেমন আছো ?

—ভালো আছি।

উত্তরটা দেওয়ার সময় মনীষা মাথাটা সামান্য একটু ঝুঁকিয়েছিল, ঠোঁটে লেগেছিল পাতলা কুয়াশার মতন হাসি। দশবছর পর দেখা হলো মনীষার সঙ্গে। নেমন্তন্ন বাড়িতে। শুনেছি ওর স্বামী তার স্ত্রীর অন্য কারুর সঙ্গে মেলামেশা করা পছন্দ করেন না। মনীষার স্বামী নামকরা ডাক্তার, নিজে তিনি কতক্ষণ স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পান জানি না।

আমি উঠছিলাম, সিঁড়ি দিয়ে নামছিল মনীষা, এক মুহূর্তের জন্য স্থির চোখা-চোখি। আমার বুক কাঁপছিল। পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসেও আমার বুক কাঁপে। তবে গত দশ বছর কাঁপেনি। একটু আগে সিঁড়ির নিচে আমি পঞ্চাশজনের সঙ্গে পঞ্চাশ রকমভাবে হেসে ও কণ্ঠস্বর বদলে কথা বলেছি। মাঝখানে মনীষার সঙ্গে চোখাচোখিতে আমার গলা শুকিয়ে এলো। এই সব মুহূর্তে নিজের হৃদস্পন্দনের শব্দও শুনতে পায়।

—তুমি কেমন আছো ?

—ভালো আছি।

মনীষার স্বামী সিঁড়ির দু-তিন ধাপ নেমে গেছেন, মনীষা আর দাঁড়ালো না, নেমে গেল, আমি ওপরে উঠে এলাম। উঠছি তো উঠছি। সিঁড়ির কি আর শেষ নেই? এটা কি কুতুব মিনারের ঘোরানো সিঁড়ি?

একটু বাদে খেয়াল হলো, আমি তো সিঁড়ির সেই ধাপেই দাঁড়িয়ে আছি। একবার মনে হলো, সমস্ত সিঁড়িটা ফাঁকা, খাঁ-খাঁ করছে। আলো নেবানো, আমি সেখানে একা।

পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলুম, ভিড়ের মেনন্তন্ন বাড়িতে অনবরত নারীপুরুষ আমাকে ঠেলে ঠেলে উঠছে নামছে। আমি শুনতে পাচ্ছি, পুরুষদের রাজনীতি আলোচনা, মেয়েদের সিল্কের শাড়ির সপ্‌সপ্ শব্দ। মনীষা নেই।

দশ বছর বাদে মাত্র দুটি শব্দ, ভালো আছি, এর মানে কি? মনীষার ঠোঁটে ঐ পাতলা কুয়াশার মতন হাসিটুকু লেগেছিল কেন? এর মানে জানতে না পারলে সারা জীবনে আর কি কখনো আমি কোনো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারবো?

দুদ্দাড় করে লোকজন ঠেলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। মনীষা কোথায়? নেই। দশ বছর পর মাত্র দুটি শব্দ, ভালো আছি-এর মধ্যে অনেক কথা লুকিয়ে আছে। আমাকে জানতে হবে। মনীষা তো জিজ্ঞেস করলো না, আমি কেমন আছি?

একজন চেনা লোক, জিজ্ঞেস করলাম, অমুক ডাক্তার আর স্ত্রীকে দেখেছেন? এইমাত্র তো বেরিয়ে গেল, বাইরে সাদা গাড়ি...। সাদা গাড়ি, সাদা গাড়ি কোথায় তুমি? সদ্য স্টার্ট নিয়েছে, জানালার কাছে মনীষার মুখ। দাড়াও, একটু দাঁড়াও। গাড়ি দাঁড়ালো না আমি ছুটতে লাগলাম, পঁয়ত্রিশ বছরেও অন্তত একবার চক্ষুলজ্জাহীন হয়ে ছুটতে দ্বিধা লাগে না।

সাদা গাড়ি মিশে গেল অনেক কালো গাড়ির মধ্যে। বৃষ্টি নামলো। আমি কত রাস্তায় ঘুরেছি জানি না, নিঃশব্দে চিৎকার করলাম বহুবার—, মনীষা, তুমি জিজ্ঞেস করলে না, আমি কেমন আছি?

হঠাৎ নিঃসঙ্গ গানের মতন বেজে উঠলো গীর্জার ঘণ্টা। সেই শব্দ যেন সমস্ত শহরের সব কিছু ঢেকে দিল। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমি শুনতে পেলাম, গীর্জার সেই মন খারাপ ধ্বনির মধ্যে মনীষার গলা : আমি ভালো নেই, আমি ভালো নেই, আমি ভালো নেই......

আমাদের মনোরমা

আমাদের এই খেপুতে জগুদার চায়ের দোকান ছিল খুব বিখ্যাত। এই খেপুতে আরও দুটো চায়ের দোকান আছে, কিন্তু সেগুলো হলো রেস্টুরেন্ট। সে দুটোই বাজারের মধ্যে, একটা জুতোর দোকানের পাশে আর একটা বনশ্রী সিনেমা হলের গায়ে। সেখানে চায়ের সঙ্গে চপ-কাটলেটও পাওয়া যায়। সেই রেস্টুরেন্টে পেঁয়াজ আর বাসি মাছের আঁশের গন্ধে কেমন যেন গা গুলিয়ে ওঠে। টেবিলে ভন্‌ভন্‌ করে নীল রঙের ডুমো ডুমো মাছি, সেগুলো উঠে আসে কাঁচা নর্দমা থেকে। পয়সা খরচ করে মানুষ অমন নরকেও খেতে চায়!

আমাদের জগুদার চায়ের দোকান ছিল একদম আলাদা। এ দোকানের কোনো ছিরি-ছাঁদ নেই। বাজার থেকে অনেকটা দূরে, একটা ছোট টিনের ঘর, সেখানে চারটে নড়বড়ে কাঠের টেবিলের সঙ্গে আটখানা চেয়ার। তার আগে দু'খানা বেঞ্চি, দরজার কাছে আড়াআড়ি করে পাতা—বেশী ভিড় হলে খদ্দেররা সেখানে বসে। অবশ্য তেমন বেশী ভিড় হয় কালেভদ্রে।

জগুদার দোকানে শুধু চা আর নোনতা বিস্কুট ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না বেশীর ভাগ সময়। আর কেউ যদি সন্ধে ছ'টা থেকে আটটার মধ্যে গিয়ে পড়তে পারে জগুদার দোকানে, তাহলে সে পেতে পারে তিরিশ পয়সার এক প্লেট মাংসের ঘুগনি। আহা, তার যা সোয়াদ, বহুক্ষণ জিভে লেগে থাকে। আমরা বাজি রেখে বলতে পারি অমন ঘুগনি বর্ধমান বা কলকেতার কোনো দোকানেও কেউ পাবে না। তা আমাদের যখন ইভিনিং ডিউটি থাকে, তখন আর ঐ ঘুগনি আমাদের ভাগ্যে জোটে না। ডিউটি শেষ করে বেরুতে বেরুতে রাত দশটা বাজে, ততক্ষণে ঐ ঘুগনি ফিনিশ। কত করে আমরা বলেছি, জগুদা, তোমরা ঐ ঘুগনি একটু বেশী করে বানালেই পারো।

জগুদা ঘাড় নেড়ে বলেছে, না ভাই, তা হয় না। ওসব মাল একসঙ্গে বেশী রান্না করলে ঠিক সোয়াদটা আসে না। সে ম্যাড়মেড়ে বারোয়ারি তারের জিনিস হয়। তা ছাড়া খদ্দেরের মর্জির ওপর কী বিশ্বাস আছে? আজ তোমরা রাত দশটায় ঘুগনি খেতে এলে, কাল যদি না আসো? দোকানের মাল তাড়াতাড়ি ফিনিশ হয়ে যাওয়াই বিজনেসের লক্ষ্মী!

জগুদার মাংসের ঘুগনির নাম ছিল প্যাঁটার ঘুগনি। শুধু খেপুতে কেন, আশপাশের সাত-আটখানা গাঁয়ের কোন মানুষটা অন্তত একবার জগুদার দোকানের বিখ্যাত প্যাঁটার ঘুগনি খায় নি?

ইভিনিং ডিউটির পর আমরা অনেক সময় জগুদার দোকানে শুধু চা খেতেও আসতাম। বারো নয়া পয়সায় এক কাপ গুড়ের চা। জগুদা সবাইকে বলে দিতো, এই মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে সে চিনি দিতে পারবে না। তবে সেই গুড়ের সঙ্গে আদা-টাদা

মিশিয়ে এমন চা বানাতো যে একদিন খেলে রোজ না খেয়ে উপায় নেই।

আমরা জিজ্ঞেস করতাম, কী জগাদা, তুমি কি চায়ে আফিং মেশাও নাকি? নইলে এত টানে কেন?

জগ্‌দা হেসে বলতো, হ্যাঁ ভাই, আপিং বুঝি মাগ্‌না পাওয়া যায়? বারো নয়ার চায়ে আমি কি আপিং মিশিয়ে ফোঁত হবো?

জগ্‌দার দোকানে ধারের কারবার নেই। কোনো খদ্দের এক কাপ চা নিয়ে বেশীক্ষণ বসে থাকলেই জগ্‌দা হাঁক দিতেন, এই মনো, টেবিল মুছে দে!

ঐটাই খদ্দেরকে উঠে যাওয়ার ইঙ্গিত।

পথ-চলতি মানুষ অবশ্য জগ্‌দার দোকানে বিশেষ আসে না। শনি মঙ্গলবারের হাটের দিনে তবু কিছু ভিড় হয়। আর বাদবাকি দিন আমাদের এই দেশলাই কারখানার ওয়ার্কাররাই আসে। কারখানার দরজা থেকে বিশ পা গেলেই জগ্‌দার দোকান। তাও রাস্তা ছেড়ে খানিকটা দূরে মাঠের মধ্যে। দোকানের পেছনে দশ কাঠা জমি জগ্‌দারই, সেখানে সে মটর ডাল আলুর চাষ করে। ঐ দোকানেরই লাগোয়া একখানা ঘরে জগ্‌দার শোয়ার জায়গা।

এই দোকান আমরা দেখে আসছি, আজ বিশ বছর ধরে। দোকানের অবস্থা একই রকম আছে, ক্ষতিও হয় নি, বৃদ্ধিও হয় নি।

বিয়ে-থা করে নি জগ্‌দা। নিজের বলতে কেউ নেই। তবে বছর সাতেক আগে তার এক বিধবা মাসী এসে হাজির। সঙ্গে আবার বারো-তেরো বছরের একটি মেয়ে। অবস্থার বিপাকে মাসীর ভিটেমাটি উচ্ছন্নে গেছে, দুমুঠো অন্ন জোটে না। তাই জগ্‌দার কাছে এসে কেঁদে পড়েছিল।

জগ্‌দা তাদের ফেলে দেয় নি একেবারে। দোকানের কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। মাসীর মেয়েটি হয়ে গেল দোকানের বয়। এর আগে জগ্‌দা নিজেই খদ্দেরের টেবিলে চা এনে দিতো, তখন থেকে সেই মেয়েটা এনে দেয়। আর মাসী বাসন-পত্তর মাজে, ঘর মোছে, খেতের কাজ দেখে। অনেকদিন বাদে জগ্‌দার ভাগ্যে খানিকটা আরাম জুটলো। মাঝে-মাঝে জগ্‌দা নিজেও এক কাপ চা নিয়ে খদ্দেরের সঙ্গে গল্প করতে বসতো।

আড়াই বছর বাদে সেই মাসী মারা গেল ওলাওঠায়। আমরাই কাঁধ দিয়ে মাসীকে পুড়িয়ে এসেছিলাম নদীর ধারে।

মাসীর মেয়ের নাম মনোরমা। এর মধ্যেই সে দোকানের কাজ বেশ শিখে নিয়েছে। ঠিক জগ্‌দার মতনই চা বানায়। তার হাতের প্যাঁটার ঘুগনি বুঝি জগ্‌দার থেকেও বেশী স্বাদের। আর পয়সা-কড়ির হিসাবেও বেশ পাকা। জগ্‌দা তার ওপরে দোকানের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি।

মনোরমার বয়েস আর কতই বা, বড় জোর পনেরো-ষোল, কিন্তু দেখে মনে হয় যেন পঁচিশ-ছাব্বিশ। বেশ লম্বা, বড়-সড় চেহারা। একটু মোটার দিকে ধাত। রংটা তো বেশ কালোই, তার ওপর আবার ছেলেবেলায় পান বসন্ত হয়েছিল বলে মুখে একটা পোড়া পোড়া ভাব। মনোরমার গলার আওয়াজটা অনেকটা ছেলেদের মতন। লোকের মুখে মুখে চটাস্ চটাস্ করে কথা বলে সে।

জগ্‌দা আর মনোরমা তখন থেকে সেই দোকানঘরেই একসঙ্গে থাকতো বলে কেউ কেউ অকথা-কুকথা বলতে শুরু করেছিল। লোকের তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। সব সময় জিভ সুড়সুড় করে, একটা কিছু পেলেই হলো। মনোরমার মতন সোমত্ত মেয়ে রাত্তির বেলায় জগ্‌দার মতন একটা পুরুষমানুষের কাছাকাছি শোয়—নিশ্চয়ই এর মধ্যে মন্দ কিছু থাকবে। হোক না মাসীর মেয়ে—কী রকম মাসী তাই বা কে জানে!

এসব কথা জগ্‌দার কানে আসার পর সে দুঃখ পেয়েছিল। আমরা যারা পুরনো খদ্দের আমাদের কাছে আপসোস করে বলেছিল, আচ্ছা তোমরাই বলো দিকিনি, এমন পাপ কথাও লোকের মনে আসে? মেয়েমানুষে আমার অরুচি, নইলে এতগুলো বছর গেল একটা কি বিয়ে-থা করতে পারতুম না? ছি ছি ছি, ঘেন্না—নিজের মাসতুতো ভগ্নী, তাকে নিয়ে এমন কথা! মেয়েটা এখানে শোবে না তো কোথায় শোবে? ও মেয়েকে যদি কেউ বিয়ে

করতে চায়, আমি এক্ষুনি বিয়ে দিতে রাজি আছি। ধার দেনা করেও বিয়ে দেবো। তোমরা দ্যাখো না? কোনো পাত্তর আছে?

না, মনোরমার বিয়ে দেওয়া সহজ কথা নয়। তার পোড়া পোড়া মুখে বসন্তের দাগ —তাকে কে বিয়ে করবে? তা ছাড়া, মনোরমার অমন দশাসই চেহারা, তার সঙ্গে মানাবে এমন জোয়ান মন্দই বা কোথায়?

আমি, রতন, পরাণ আর জিতেন—আমরা ডিউটি সেরে রোজই একবার জগুদার চায়ের দোকানে যাই। আমরা জানি, জগুদা মানুষটা মন্দ না। মেয়েমানুষের দিকে তার টান নেই সত্যিই, নইলে এতগুলো বছরের মধ্যে একদিনও তো অন্তত একটা খিস্তি-খেউড় শুনতে পেতুম না ওর মুখে।

তা, জগুদা আর মনোরমাকে নিয়ে বদনামটা রটবার পর কিন্তু জগুদার দোকানে ভিড় বেশ বেড়ে গেল! এক একসময় এসে আমরাই জায়গা পাই না। মনোরমার মুখখানা নাই বা সুন্দর হলো তার জামা উপছোন বুক আর ভারী পাছার দিকে নতুন খদ্দেররা হ্যাংলার মতন তাকিয়ে থাকে। তারা দু'কাপ-তিন-কাপ করে চা খায়। বাজারের দুটো রেস্টুরেন্টের কোনোটাতেই তো কোনো মেয়ে এসে চা দেয় না।

এত খদ্দের বেড়ে যাওয়ায় জগুদা কিন্তু খুশি হয় নি। তার নিরিবিলি দোকানের বাঁধা খদ্দেরই পছন্দ। অচেনা খদ্দেররা কখনো একটু বেশী চেঁচিয়ে কথা বললে জগুদা হাঁক দেয়, আস্তে আস্তে, এটা হাটবাজার নয়।

যাই হোক, তবু তো বেশ চলছিল! এর মধ্যে জগুদা একটা মহা নির্বুদ্ধিতার কাজ করল। গত বছর প্রথম বর্ষার শুরুতে জগুদা একদিন হুট্‌ করে মরে গেল। মেয়েরা কি দশা হবে, সেটা একবার ভাবলো না পর্যন্ত।

সেদিন আমাদের নাইট ডিউটি ছিল। নাইট ডিউটি শেষ হয় ভোর সাড়ে পাঁচটায়—ডিউটি সেরে আমরা ক'জন, না, সেদিন পরাণ ছিল না, তার বদলে আমাদের সঙ্গে ছিল পঞ্চু—গুটি গুটি এলাম জগুদার দোকানে। এমন অনেকবার হয়েছে, আজ ভোরে জগুদার দোকানের ঝাঁপ ওঠেনি, আমরাই ডেকে তুলে উনুনে আঁচ দিয়েছি। অসময়ে জ্বললেও জগুদা অসন্তুষ্ট হতো না।

সেদিন এসে দেখি মনোরমা মড়াকান্না কাঁদতে বসেছে: ও দাদা, দাদাগো—বলে সুর টেনে চলেছে মনোরমা। তাকে এর আগে আমরা তো কখনো কাঁদতে শুনিনি, তার মায়ের মৃত্যুর সময়েও সে চেঁচিয়ে কাঁদে নি—সেইজন্যই তার ভাঙা ভাঙা গলা শুনে আমরা একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।

ওপাশের ঘরটায় উঁকি দিয়ে দেখি মেঝের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে আছে জগুদা! চোখ দুটো খোলা, ওরে বাবারে, সে রকম চোখ দেখলেই ভয় করে! পঞ্চু নিচু হয়ে জগুদার গায়ে হাত ছুঁয়ে বললো, এ তো একেবারে ঠান্ডা কাঠ। অনেকক্ষণ আগে মারা গেছে।

পাশাপাশি দুটো বালিশ। জগুদা আর মনোরমা পাশাপাশি শুতো তাহলে। সেমিজের ওপরে একটা আলুথালু শাড়ি জড়িয়ে মনোরমা হাপুস হয়ে কাঁদছে। আমি অন্যদের অলক্ষ্যে মনোরমার বালিশটা পা দিয়ে ঠেলে ঘরের কোণের দিকে সরিয়ে দিলাম। এরপর পাঁচটা লোক আসবে, তারা ও নিয়ে আবার পাঁচ কথা বলবে, কী দরকার।

শরীরে কোনো রোগ ব্যাধি ছিল না জগুদার। তবু এমন করে মরে গেল কেন? সবাই বললো, সন্ন্যাস রোগ। ও রোগে মানুষ এমনিই রাত্তিরবেলা নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে হঠাৎ চলে যায়। আমাদের পঞ্চু বললো, জগুদার নিশ্চয়ই হার্ট উইক হয়ে গেছলে। হোমিওপ্যাথিতে এর ভাল চিকিচ্ছে আছে। আহা, আগে জানলে—

যাই হোক, আমরা সবাই মিলে তো জগুদাকে পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে এলুম। কিন্তু এবার মেয়েটার কী গতি হবে? সেই কথা বলেই মনোরমা কাঁদছিল। ও মা গো, আমি এখন কোথায় যাবো গো! আমি কার কাছে যাবো!

দু'তিন দিন তো এই ভাবে কাটালো। আমরা রোজই আসি। চা বন্ধ, কিন্তু এই দোকান-টাতে আসাটাই যে আমাদের নেশা। গত কুড়ি বছর ধরে আসছি, হঠাৎ কি না এসে পারা

যায়?

শেষে আমরাই মনোরমাকে পরামর্শ দিলাম, তুই আবার দোকান খোল দিদি। তোকে তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে, এই দোকানই তোর ভরসা। তা ছাড়া এই দোকানটাই ছিল জগ্‌দার প্রাণ, এটাকে বাঁচিয়ে না রাখলে যে জগ্‌দার আত্মা তৃপ্তি পাবে না!

ছ'দিনের মাথায় মনোরমা চোখের জল মুছে আবার দোকানের ঝাঁপ তুললো। আবার খদ্দের আসতে লাগলো। জগতে কেউ কারুর জন্যে বসে থাকে না। অমন যে জবরদস্ত হাসি-খুশি মানুষটা ছিল জগ্‌দা, সে চলে যাওয়ায় কিছুই ঘাটতি পড়লো না, কিছুই থেমে থাকলো না।

তবে ধন্য সাহস বটে মনোরমার। ঐ মাঠের মধ্যে দোকানঘরে সে একলা থাকে। যে ঘরে জগ্‌দা মরেছে, সেই ঘরেই সে এখন একলা শোয়, একটুও ভয় ডর নেই তার। আমরা বলেছিলুম কোনো একটা বুড়ি মেয়েমানুষকে ওর কাছে রাখতে। কাজকম্মেও সাহায্য হবে, রাত্তিরেও কাছে থাকবে। মনোরমা বলেছে, তার কোনো দরকার নেই। একটা লোক রাখা মানেই তো বাড়তি খরচ।

এক বছর কেটে গেছে, এর মধ্যে একদিনের জন্যেও একটা চোর পর্যন্ত ঢোকে নি ঐ দোকানঘরে। আমাদের এদিকে চোরছ্যাঁচোড়গুলোও সব রোগা প্যাংলা, তাদের এমন সাহস নেই যে মনোরমার মতন অমন খাণ্ডারনী মেয়েমানুষের ঘরে ঢোকে। মনোরমার এখন ভারভাত্তিক চেহারা, দেখে কেউ ওর বয়স বুঝবে না। আমরা জানি, ওর বয়েস বাইশ, কিন্তু লোকে ভাববে বত্রিশ।

অ্যাদ্দিন কোনো সাইনবোর্ড ছিল না, এখন মনোরমা দোকানের সামনে এক সাইন-বোর্ড লাগিয়েছে। 'জগ্‌দার চায়ের দোকান'। জগ্‌দা এখন নেই, তবু দোকানের সঙ্গে তার নামটা টিকে গেল।

দোকান বেশ ভালই চালাচ্ছে মনোরমা। আমরা ক'জন হলুম গে তার গার্জেন। আমরা সবচেয়ে পুরোনো খদ্দের, আর বলতে গেলে জগ্‌দার বন্ধুই ছিলাম, তাই আমাদের সে অধিকার আছে। মনোরমাও আমাদের তেমনভাবেই মান্য করে। আমাদের পরামর্শ-টরামর্শ মন দিয়ে শোনে। রোজ একবার করে আমরা খবর নিতে আসি। আমি, তরুণ, পরাণ আর জিতেন, মাঝে মাঝে পঞ্চুও এসে আমাদের সঙ্গে জোটে।

আমাদের দেশলাই কারখানায় তিনরকমের ডিউটি। ডে, ইভিনিং আর নাইট। আমাদের কোন সপ্তায় কখন ডিউটি থাকবে, তা পর্যন্ত মনোরমার মুখস্থ। সেই অনুযায়ী সে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে। কখনো যদি আমাদের চারজনের এক শিফ্‌টে ডিউটি না পড়ে, তাহলে হয় গণ্ডগোল। তখন আর একসঙ্গে আসা হয় না। তবু একবার করে ঘুরে যাই সবাই।

একহাতে দোকান চালাবার ক্ষমতা রাখে বটে মনোরমা। সে-ই চা বানাচ্ছে, সে-ই ঘুগনি রাঁধছে, সে-ই টেবিল পরিষ্কার করছে। আজকাল আবার সে মামলেটও বানায়। নোনতা বিস্কুট ছাড়া, সে একটা কাচের বোয়ামে কেকও এনে রেখেছে।

এক এক সময় আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখি তার কেরামতি। কোনো একটা খদ্দের একটা অচল আধুলি দিয়েছিল। এক পেলেট ঘুগনি আর এক কাপ চা খেয়ে সে খুচরো আট নয়া পয়সা ফেরত চাইলো না। বাবুগিরির কায়দায় সে মনোরমার সামনে আধুলিটা রেখে বললো, খুচরোটা তুমিই নিও!

সে খদ্দের দোকানের দরজার কাছে পৌঁছবার আগেই মনোরমা ছুটে গিয়ে তার কাছা ধরেছে। কড়কড়ে গলায় মনোরমা চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, ওরে আমার ভালমানুষের ছেলে! আমি কি তোমাকে কেল খাবার দিয়েছি যে তুমি আমাকে নকল পয়সা চালাচ্ছ?

খদ্দের যেন কিছুই জানে না ; আমসিপানা মুখটি করে বসলো, নকল পয়সা! কে বলেছে? এই তো আমি সিগ্রেটের দোকান থেকে একটু আগে ভাঙিয়ে আনলুম!

মনোরমা আধুলিটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, সে তুমি সিগ্রেটের দোকান-দারের সঙ্গে বোঝ গে। আমার খাঁটি জিনিসের খাঁটি পয়সা দিয়ে যাও!

পয়সাটা মাটিতে পড়ে ঠং করে শব্দ পর্যন্ত হলো না।

খদ্দের পকেট উল্টে বললো, আর তো পয়সা নেই!

—খাবার বেলা সে কথা মনে ছিল না?

আমরা চারজন কোণের টেবিলে বসে মিটিমিটি হাসছি। আমরা তো জানিই, ও খদ্দের ব্যাটা বেশী ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করলে তক্ষুনি গিয়ে ওর টুঁটি টিপে ধরবো। আমরা মনোরমার গার্জেনরা এখানে বসে আছি। ও ভেবেছে মনোরমা অবলা মেয়েছেলে!

আমাদের সে রকম কিছু করবার দরকার হলো না। মনোরমা নিজেই দোকানের বাকি খদ্দেরের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো, আপনারাই পাঁচজনে বলুন, আমি খেটেখুটে দোকান চালাচ্ছি, কোনো দিন কারুকে খারাপ জিনিস দিইনি—কাল দুটো পচা ডিম বেরুলো, তাও আমি প্রাণে ধরে ফেলে দিলুম—আর আমাকে এরকমভাবে লোকে ঠকাবে: এই কি ধর্ম?

যে-সব নতুন খদ্দেররা মনোরমার গতর দেখতে আসে, তারা সংগে সংগে বললে, খুব অন্যায়! নিশ্চয়ই ওর ট্যাঁকে আরও পয়সা আছে।

মনোরমা তখনো লোকটার কাছা টেনে ধরে আছে। লোকটার তখন কাঁদো কাঁদো অবস্থা। মনে হয় কোনো সাধারণ হাটুরে লোক। তা বলে ওকে ছেড়ে দেবার কোনো কথাই ওঠে না।

পরাণ হাঁক দিয়ে বললে, ওর জামা খুলে নে, মনো!

লোকটা হাতজোড় করে বললে, আমাকে আজ ছেড়ে দিন। আমাকে একটা শ্রাদ্ধবাড়িতে যেতে হবে। আমি কাল ঠিক এসে পয়সা দিয়ে যাবো!

শ্রাদ্ধবাড়ির কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। রতন বললে, ব্যাটা শ্রাদ্ধবাড়িতে যাবি তো জুতো পরে যাবার দরকার কি? জুতো জোড়া খুলে রেখে যা!

লোকটার পায়ে প্রায় নতুন এক জোড়া রবারের পাম্পশু। জামার বদলে শেষ পর্যন্ত জুতো জোড়া খুলে রেখে লোকটা নিস্তার পেলো। সে লোকটা আর জুতো নিতে আসে নি। জুতো জোড়া পড়েই ছিল দোকানে, শেষ পর্যন্ত আমাদের কারখানার দারোয়ান দেড় টাকা দিয়ে সে দুটো কিনে নিলো।

আর একবার একটা লোক নাকি দুপুর দুপুর এসে ইচ্ছে করে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল একেবারে মনোরমার বুকের ওপর। ঘটনাটি আমি নিজের চোখে দেখিনি, রতনের মুখে শুনেছি। আমাদের মধ্যে শুধু রতন ছিল দোকানে।

রতন লাফিয়ে উঠে গিয়ে লোকটার ঘাড় চেপে ধরেছিল। তাকে ঠেলতে ঠেলতে দোকানের বার করে দিচ্ছিলো, সেই সময়ে মনোরমা এসে বলেছিল, দাঁড়াও রতনদা, এ লোকটার বেশী রস উথলে উঠেছে, একটু শিক্ষা দিয়ে দিই! এই বলে মনোরমা লোকটার নাকে এমন ঘুষি মারলো যে রক্ত বেরিয়ে গেল। মনোরমার ঐ গোদা হাতের মার সহ্য করার ক্ষমতা আছে কার?

মনোরমা লোকটাকে সেই অবস্থায় দোকানের বাইরে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলেছিল, ফের যদি এদিক আসিস তোর একটা হাড়ও আস্ত রাখবো না। গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিয়ে দেবো মুখে, বুঝলি।

এর পর থেকে রসিক ছোকরারা শুধু চাউনি দিয়ে মনোরমার গা চেটেই যা সুখ পায়, ধারে কাছে ঘেঁষতে আর সাহস করবে না কেউ।

জগুদার সংগে মনোরমার একটা ব্যাপারে মিল আছে। বেশী খদ্দের টেনে এনে বেশী লাভ করার দিকে তারও লোভ নেই। বাছাই করা খদ্দের নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট দোকান চালাতেই সে চায়। সে খাঁটি জিনিস দেবে। তার বদলে ভেজাল খদ্দের তার দরকার নেই।

যে যে হপ্তায় ইভিনিং ডিউটি থাকে, সেই সব সময়েই জগুদার দোকানে আমরা বেশীক্ষণ কাটাই। ডিউটি শেষ হয় রাত ন'টায়—কোনো কোনোদিন সাড়ে আটটার মধ্যেই বেরিয়ে আসি। আধ ঘণ্টা ডিউটির পর আমাদের শরীর ক্লান্ত থাকে, তবু তখুনি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে হয় কোথাও নিরিবিলিতে বসে একটু সুখদুঃখের গল্প করি।

তা রাত ন'টার পর জগুদার দোকান একেবারে নিরিবিলিই হয়ে যায়। লাস্ট বাস চলে যায় ন'টা দশে, তারপর এ রাস্তায় তো আর মানুষজন থাকেই না বলতে গেলে। মনোরমা আমাদের ডিউটির সময় জানে; আমরা দোকানে ঢুকে বসবার সংগে সংগে সে

চা এনে দেয়। অ্যাসট্রের ছাই ফেলে পরিষ্কার করে আনে। তারপর সে ক্যাশের সামনে বসে সারাদিনের হিসেব করতে বসে। সেই সময় সে আপন মনে গান গায়।

মনোরমার গান ভারি অদ্ভুত। তার গলা ভাল না। কথা বলার সময় তার গলাটা পুরুষমানুষের মতন হেঁড়ে মনে হয়। কিন্তু গান গাইবার সময় সে একটা অদ্ভুত সরু গলা বার করে, অনেকটা কুকুরের কুঁইকুঁই-এর মতন। যে কুকুর ঘেউঘেউ করে সেই কুকুরই তো আবার কুঁইকুঁই করে এক সময়। মনোরমাও সেই রকম। আর রোজ সে একই গান গায় :

যে জ্বরে জ্বরেছে মা, তোর কানাই
মা, তোমায় কেমনে জানাই
এমন ছেলের এমন রোগ দেখি নাই—

শুধু ঐটুকুই আর বেশী না! ঐ ক'টা লাইনই বারবার ঘুরে ফিরে গায়। এই অদ্ভুত গান। এই অদ্ভুত গান কোথা থেকে সে শিখল তাও জানি না।

রতন জিজ্ঞেস করে, আজ কত বিক্কিরি হলো, মনোদির?

মনোরমা উত্তর দেয়, সাতাশ টাকা তিরিশ নয়া। তা ভালই হয়েছে।

যেদিন বিক্কিরি অনেক কম হয়, সেদিন সে কোনো আফসোস করে না। রোজই পয়সা গোনার সময় সে এ রকম সন্তুষ্টভাবে গান গায়।

এক একদিন সে আমাদের জন্য ঘুগনি বাঁচিয়ে রাখে। বিশেষ করে শনিবার। মনোরমা জানে: রবিবার আমাদের অফ ডে, তাই শনিবার রাত্রে স্ফূর্তি করি। চায়ের কাপ নিয়ে আমরা চুপচাপ বসে থাকি এক কোণের টেবিলে। কোনো কথাও বলি নি। শেষ খদ্দেরটি চলে যাবার পর আমরা আড়মোড়া ভাঙি। তখন রতন বলে, মনো দিদি, চারটে গেলাস দিবি?

মনোরমা আমাদের সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে জাঁদরেল ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। তারপর চোখ পাকিয়ে বলে, এখন বুঝি ঐ সব ছাই-ভস্ম খাওয়া হবে আবার?

আমাদের একজনের পকেট থেকে একটা বাংলার পাঁইট বেরোয়। আমরা বলি, এই তো এইটুকুনি, এতো এক চুমুকেই শেষ হয়ে যাবে!

মনোরমা বলে, ঠিক? আর বেশী খাবে না?

—না, দিদি আর পাবো কোথায়?

আমরা মনোরমার গার্জেন। কিন্তু এই সময় সে-ই আমাদের ওপর গার্জেনি করে। আমাদের প্রত্যেকের পকেটেই যে একটা করে পাঁইট আছে, সে কথা জানতে দিই নি ওকে।

মনোরমা চারটে গেলাস নিয়ে আসে। নাক সিঁটকে বলে, ইঃ কী বিচ্ছিরি গন্ধ! তোমরা এসব খেয়ে যে কী আনন্দ পাও!

—তুই একটু খাবি নাকি? তাহলে তুইও আনন্দ পাবি!

—রক্ষে করো! আমার আর আনন্দ পেয়ে দরকার নেই। আমি বেশ আনন্দে আছি!

প্রত্যেক শনিবার ঠিক এই একই কথা হয়। প্রত্যেকবারেই আমরা এতে আনন্দ পাই। মনোরমা আমাদের জন্য চার প্লেট ঘুগনি নিয়ে আসে। তখনো গরম। আমাদের জন্য যত্ন করে ঘুগনিটা আবার গরম করেছে, এই জেনে বেশ সুখ হয়।

মনোরমা কিচেনে গেলেই আমরা পকেট থেকে বোতল বার করে আবার গেলাসে ঢেলে নিই। ক্রমে ক্রমে নেশা ধরে, আমাদের চোখ চকচকে হয়ে আসে, কপালে বিনবিন করে ঘাম। পরাণ একটু গান ধরতে গেলেই জিতেন তাকে ধমকে ওঠে, চোপ! তুই গান গাইবি না। এখন আমরা মনোরমার গান শুনবো।

রতন বলে, মনো, আমাদের কাছে একটু আয় না দিদি!

মনোরমা মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, তোমরা আর কত দেরি করবে?

—এই তো হয়ে এলো, আর একটু বাদেই চলে যাবো। আয় না, আমাদের কাছে এসে একটু বোস, দুটো কথা বলি!

মনোরমা একটা চেয়ার টেনে এনে বসে। একটু দূরে, যাতে বাংলার গন্ধটা তার নাকে না যায়।

জিতেন বলে, ধর তো মা তোর ঐ গানটা!

মনোরমা অমনি তার সেই গান ধরে, এমন ছেলের এমন রোগ দেখি নাই—

বারবার শুনতে শুনতে আমাদের ঘোর লেগে যায়। মনে হয়, আহা কী অপূর্ব গান! এমনি কখনো শুনিনি! পরাণ টেবিল চাপড়ে তাল দেয়। রতন আহা আহা বলতে বলতে কে'দে ফেলে।

—মনো, তুই নাচ জানিস না দিদি?

মনো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, দেখবে? আমার নাচ দেখবে?

অমনি সে দু হাত দুপাশে ছড়িয়ে চোখ বুজে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে। ঠিক আনি মানি জানি না খেলার মতন। এই রকম বোঁ বোঁ করে ঘোরাকে যে কেন ও নাচ বলে, তা আমরা বুঝি না। তবু প্রত্যেক শনিবার আমরা মনোরমাকে নাচতে বললেই সে এ রকম ঘোরে।

তখন মনোরমাকে বড় সুন্দর লাগে আমাদের। হোক না সে কালো, বসন্তের দাগ-ওয়ালা পোড়া পোড়া মুখ, হাত-পাগুলো মুগুরের মতো, আর বিরাট বিরাট দুই বুক আর পাছা—তবু সুন্দর দেখায় তাকে।

মনোরমার নাচের সময় আমরা চারজন উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ি। ওর নাচটা আমাদের খেল। আমরা বয়স্ক চারজন লোক সেই সময় খেলায় মেতে উঠি। আমরা দূর থেকে বলি, মনো, আমাদের ধর দেখি!

মনোরমা ঘুরতে ঘুরতে এসে আমাদের একজনের গায়ের উপর পড়ে! সে তখন টুঁ শব্দটি করে না। তখন মনোকে বলতে হবে, সে কাকে ছুঁয়েছে।

মনোরমা চোখ না খুলেই তার গায়ে হাত বুলোয়। থুতনি ধরে নাড়ে, দুষ্টুমি করে কান দুটো টানে, তারপর চে'চিয়ে বলে ওঠে, ও এ তো বঙ্কুদা!

মনোরমা যখন আমাকে ধরে এ রকম গায়ে মুখে হাত বুলোয় আমার শরীরটা একে-বারে জুড়িয়ে যায়। ইচ্ছে হয়, মনোরমা অনেকক্ষণ ধরে আমাকে চিনতে না পারুক!

অন্যরা তখন হিংসে হিংসে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে দূরে। এক রাত্তিরে এই খেলা দু'বার খেলে না মনোরমা। সুতরাং একজনেরই ভাগ্যে শুধু মনোরমা আসে এক এক শনিবারে।

আমাদের বাড়িতে বউ ছেলেপুলে আছে। বুড়ি মা আছে, অভাব আছে, ফুটো টিনের চাল আছে। পোকা লাগা বেগুন আছে। আর অনেক কিছুই নেই। বাড়িতে গেলেই তো শুনতে পাই হ্যানো নেই, ত্যানো নেই। কিন্তু শনিবার রাত্তিরে এ সময়টা আমরা সেসব কিছু ভুলে যাই। তখন শুধু আমরা চারজন আছি, আর মনোরমা।

ছেলে ছোকরারা হাতে পয়সা পেলেই বাজারের সিনেমা হলে ছোটে। সেখানে ধর্মেন্দর আর হেমা মালিনীর জাপটা-জাপটি দেখে তারা কী সুখ পায় কে জানে। আমাদের সিনেমা হলটাও হয়েছে এমন, হপ্তায় দু'বার করে বই পাল্টায়। আমরা ওসব দেখতে যাই না কখনো। আমাদের মনোরমা আছে।

রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা বেজে যায়। মনোরমা বলে, ওগো, তোমরা বাড়ি যাবে না? এর পর বাড়ি গেলে যে বউ তোমাদের প্যাঁদাবে।

আমরা হা-হা করে হেসে উঠি। মনো এমন মজার কথা বলে। আমরা জানি, মনোরমা এর পরই একটা গল্প বলবে। প্রত্যেক শনিবারই বলে। বর্ধমানে ওরা কিছুদিন এক কাকার বাড়িতে ছিল। সে বাড়ির ওপরতলায় থাকতো এক ভদ্রলোক আর তার বাঁজা বউ। ভদ্র-লোকটি রোজ রাত্তিরে মাল টেনে আসতো আর বাড়ির দরজায় ঢুকেই বলতো, আর করবো না, আর কোনোদিন করবো না! কিন্তু তার বউ তখুনি ছুটে এসে তাকে দুমদাম করে মারতো। সে কি মার! অনেক দূর থেকে সেই শব্দ শোনা যায়। লোকে শুনে ভাবে, ছাদ পেটাই হচ্ছে?

গল্প শুনে আমরা হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ি। প্রত্যেক শনিবার। জিতেন পেট চেপে ধরে বলে, থাম, মনো থাম, আর বলিস না! ওসব ভদ্রলোকদের কথা আর বলিস না! টাকা রোজগার করে যে বউকে খাওয়াবে আবার সেই বউয়ের হাতে মারও খাবে এসব

ভদ্রলোকেরাই পারে!

পরাণ বলে, মনো, আমাদের মতো কেউ যদি তোকে বিয়ে করতো, তুই তাকে মারতিস!

মনোরমা বলে, মারতাম না আবার! মেরে একেবারে পাট করে দিতাম!

রতন বলে, ভাগ্যিস আমি তোকে বিয়ে করিনি! তোর হাতের মার খেলে আমি মরেই যেতাম!

রতন এক-এক দিন নানারকম দুষ্টু বুদ্ধি বার করে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে হঠাৎ উ-হু-হু করে ওঠে। তারপর বলে, ইস্ পায়ে খিল ধরে গেল। মনো, একটু টেনে তোল তো আমাকে!

মনোরমা এসে তাকে টেনে তুলতেই সে মনোরমার গলা জড়িয়ে ধরে। ঠিক যেন বাতের রুগী। কিন্তু ওসব চালাকি কি আর আমরা বুঝি না!

পরাণ আজ বলে, আমাদেরও পায়ে খিল ধরেছে। কি রে বঙ্কা, তোর ধরে নি? জিতেন?

আমরা বলে উঠি, হ্যাঁ, আমাদেরও পায়ে খিল ধরেছে। আমরা তো একসঙ্গে বসে আছি।

জিতেন বলে, রতনকে মনো টেনে তুলেছে। আমাদেরও টেনে তুলবে!

মনো হেসে ফেলে বলে, তোমরা সব বুড়ো খোকা! তোমাদের নিয়ে আর পারি না! এবার যাও, নইলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবো বলছি!

ব্যস, ঐ পর্যন্ত। ওর বেশী আর আমরা এগোই না। এবার আমাদের বাড়ি ফেরার পালা। আমাদের তো ঘরসংসার আছে। একটা করে বাড়ি আছে। সে বাড়িতে কত কিছুই নেই। আমরা বেরিয়ে আসার পর মনোরমা ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। আমরা চারজন পাশা-পাশি হাঁটি।

এক সময় রতন বলে, আমাদের মনো বড় ভালো মেয়ে!

আমরা বাকি তিনজন তখন ঐ এক কথাই ভাবছিলাম।

রতন বলে, এমন ভালো মেয়ে, অথচ তার একটা বিয়ে হলো না! মেয়েটা সারাজীবন এ রকম কষ্ট পাবে?

আমরা আমাদের মনের মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখি। মনোরমার সঙ্গে বিয়ে দেবার মতো কোনো পাত্রের কথা আমাদের মনে পড়ে না।

রতন কাঁদতে আরম্ভ করে। একটু নেশা হলেই কান্নাকাটি করা রতনের স্বভাব। ফোঁপাতে ফোঁপাতে এক সময় সে বলে, আমি যদি আগে বিয়ে না করে ফেলতাম, তাহলে আমিই মনোকে বিয়ে করতাম। এ কথা নিশ্চয় করে বলছি। আহা মনোরমার হাতে মার খেয়েও আমার সুখ হতো—।

বলতে বলতে রতন হঠাৎ থেমে যায়। আমাদের চোখের দিকে তাকায়। আমরা ওর দিকে কটমট করে চেয়ে আছি। রতনটা স্বার্থপরের মতো কথা বলছে। আমরাও তো ভুল করে ফেলেছি আগে। আমাদেরও বাড়িতে প্যানপেনে, রোগা-পটকা, অসুখে-ভোগা, হাড়-জ্বালানি বউ আছে। তার বদলে মনোরমাকে বিয়ে করলে অনেক বেশী সুখ হতো। কিন্তু, একজন কেউ বিয়ে করলেই তো মনোরমা শুধু তার হয়ে যেতো। বঞ্চিত করা হতো আর তিনজনকে। তখন কি আর অন্য কেউ পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে বলে মনোরমার গলা জড়িয়ে ধরতে পারতো?

না! আমরা আগে বিয়ে করেছি, ভালোই হয়েছে। আমরা কেউ আর মনোরমাকে বিয়ে করতে পারবো না। সেই জন্যেই, মনোরমা আমাদের চারজনের হয়ে থাকবে। তাই তো আমাদের আড্ডায় পঞ্চুকেও সঙ্গে আনি না!

আমাদের দেশলাই কারখানায় দুম করে পাঁচজন লোক ছাঁটাই হয়ে গেল। তার মধ্যে আমরা কেউ পড়িনি বটে কিন্তু শুনছি আরও ছাঁটাই হবে। কখন কার ওপর কোপ পড়বে তার ঠিক নেই। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকি। বাজার খুব মন্দা! ম্যাড্রাস থেকে সস্তা দামের দেশলাই এসে বাজার ছেয়ে ফেলেছে।

ডিউটি শেষ করে বেরুবার সময় মুখটা তেতো তেতো লাগে। প্রত্যেকদিন ভয় হয়, কাল এসে কী নুটিস ঝুলতে দেখবো কে জানে। আবার কেউ কেউ বলছে লক আউট হবে!

ব্যাজার মুখ করে জগুদার চায়ের দোকানে আসি। মনোরমা দোকানটাকে বেশ দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। প্রায়ই সে বলে, দোকানের জন্যে এবার সে ফার্নিচার করবে। চেয়ার টেবিলগুলো নড়বড়ে হয়ে গেছে, কয়েকখানা না বদলালেই নয়।

আমরা মনোরমাকে ঠাণ্ডা মাথায় উপদেশ দিই। এক্ষুনি হুট্ করে কিছু করে ফেলিস না দিদি! দিন কাল ভালো নয়। হাতে পয়সা থাকা ভালো।

মনোরমা বলে, তোমরা আজকাল এত গোমড়া মুখে থাকো কেন গো? আর বুঝি এ দোকানের চায়ে স্বাদ নেই?

আমরা হাহা করে উঠি। সে কি কথা! মনোরমার চায়ের হাত দিন দিন মিষ্টি হচ্ছে। গুড় দিতে ভুলে গেলেই মিষ্টি।

আমরা মনোরমার দোকানে কখনো ধার রাখি না। এ নিয়ম সেই জগুদার আমল থেকে চলে আসছে। ধার রাখলেই ধার জমে যায়—পরে আর শোধ করা হয় না। ধার রাখলেই দোকানের মালিকের সঙ্গে ভাব নষ্ট হয়। আমরা চারজন এখন মনোরমার গার্জেন, কিন্তু কেউ বলুক দেখি কোনো একদিনও ওর দোকানে মিনিমাগনায় খেয়েছি! হাতে পয়সা না থাকলে সেদিনটা আর দোকানেই আসি না। তবে, আমরা সকলেই জানি।। আমাদের একজন না গেলেও অন্য তিনজন যাবে, মনোরমার দেখাশোনা করে আসবে।

তবে, শনিবারের আড্ডায় কেউ বাদ পড়ে না। কারখানার ফোরম্যানকে ঘুষ দিয়ে হাত করা আছে, কোনো রবিবার আমাদের নাইট ডিউটি দেবে না!

শনিবার দিন পকেট থেকে আমরা মালের বোতল বার করলে প্রত্যেকবার মনোরমা বকাঝকা করে। কিন্তু আমরা জানি, শনিবারের এই মজাটুকু মনোরমাও পছন্দ করে খুব, সারা হপ্তা মনোরমাও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটে, ওর তো জীবনে আর কোনো আনন্দ নেই। আমাদের সঙ্গে ঐটুকু খেলাধুলোই ওর ফুর্তি।

তা এক শনিবার আমরা অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছি, শেষ লোকটা আর কিছুতেই ওঠে না। লোকটা একটা টেবিলে একা বসে আছে, একটা হাত থুতনিতে, কী যেন ভেবেই চলেছে। রোগা লম্বাটে চেহারা লোকটার, জামাকাপড় বেশ ফর্সা। একে আগে কখনো দেখিনি। প্রথমে ভেবেছিলাম, লোকটা বুঝি মনোরমার দিকে হ্যাংলা দৃষ্টি দিচ্ছে তারপর বুঝলাম, তা না, লোকটার চোখ শুধু দেয়ালের দিকে--সে অন্য কিছুই দেখছে না।

আমাদের এ দোকান থেকে বিনা দোষে কোনো খদ্দেরকে কখনো তাড়িয়ে দিই না। কেউ যদি একটু বেশীক্ষণ বসতে চায় বসুক না! কিন্তু লোকটা এক কাপ মাত্র চা নিয়ে বসে আছে তো বসেই আছে।

রতন গলা খাঁকারি দিয়ে বললো, ক'টা বাজলো!

পরাণ বললো, ন'টা বেজে গেছে!

জিতেন বললো, লাস্ট বাস এক্ষুনি চলে যাবে বোধহয়!

আমরা ভাবলাম, যদি এসব কথা শুনে লোকটা উঠে পড়ে। ভিন্‌দেশী লোক, লাস্ট বাস চলে গেলে ফিরবে কী করে?

লোকটা এসব কথা শুনেও উঠলো না। বরং টেবিলের ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লো।

আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকালাম। এ আবার কী ব্যাপার!

আমরা মনোরমাকে চোখের ইশারা করলাম। মনোরমা লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে তার সেই ক্যারকেরে গলায় বললে, আপনি চা খাবেন না? এ তো অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!

লোকটা কোনো কথা না বলে শুধু মুখ তুলে মনোরমার দিকে তাকালো।

মনোরমা আবার বললে, আমি এবার দোকান বন্ধ করবো।

লোকটা আস্তে আস্তে বললো, আমি এই টেবিলের ওপর শুয়ে থাকবো—শুধু আজকের রাতটা—

এ আবার কেমনধারা কথা! সুবিধে মনে হচ্ছে না তো! গলার আওয়াজ শুনে মনে হলো লোকটা নেশাখোর। ওসব ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই এখানে চলবে না। ও তো জানে না, আমরা মনোরমার গার্জেন এখানে উপস্থিত আছি!

রতন উঠে গিয়ে বললে, এই যে মশাই, উঠুন! এটা ঘুমোবার জায়গা নয়!

লোকটা বললে, শুধু রাতটা...এখানে থাকবো...তার জন্যে পয়সা দেবো...

রতন এবার লোকটার প্রায় ঘাড়ের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বললো, ঘুমোতে হয় তো হোটেলে যান না, এখানে কেন?

—হোটেল আছে এখানে?

—বাজারের কাছে আছে অন্নপূর্ণা হোটেল, সোজা সেখানে চলে যান।

—তাই যাবো, আমাকে একটু ধরে তুলুন তো, উঠতে পারছি না।

রতন লোকটার গায়ে হাত দিয়েই চমকে বলে উঠলো, ওরে বাবা, এ কি!

তারপর আমাকে ডেকে বলল, বংকু, একবার এদিকে আয় তো।

আমি উঠে যেতেই রতন বললো, লোকটার কী হয়েছে, দ্যাখ তো?

লোকটা আবার ঘাড় গুঁজে শুয়ে পড়েছে। আমি তার একটা হাত ছুঁয়ে রতনের মতনই চমকে উঠলাম। লোকটার গা অসম্ভব গরম।

আমি বললাম, এ লোকটার তো জ্বর হয়েছে দেখছি।

লোকটি আবার মুখ তুললো, চোখ দুটো অসম্ভব লাল! সে বললো, আমাকে একটু তুলে ধরুন, আমি ঠিক যেতে পারবো।

লোকটির কথাবার্তা আমাদের মতন নয়। বোঝাই যায়, শহুরে ভদ্দরলোক। টিকোলো নাক, টানা টানা চোখ, ফর্সা রং—সিনেমায় এমন চেহারা দেখা যায়। এমন লোক হঠাৎ আমাদের এখানে এসেছে কেন?

আমি আর রতন লোকটিকে দু'দিক থেকে ধরে তুললাম। লোকটি মাতালের মতন টলতে লাগলো। রতন জিজ্ঞেস করলো, আপনার কী হয়েছে?

লোকটি বললে, আমায় অসহ্য ব্যথা!

জিতেন চেঁচিয়ে বললো, বোধহয় ম্যালেরিয়া ধরেছে।

আমি বললাম, আপনি এই অবস্থায় যাবেন কি করে? মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন যে! আপনার বাড়ি কোথায়?

—অনেক দূরে।

—এখানে কোথা থেকে এসেছেন?

সে কথার উত্তর না দিয়ে লোকটা বললো, আমাকে দয়া করে একটু রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিন!

মনোরমা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিল। এবার সে জিজ্ঞেস করলো, জ্বর হয়েছে, না নেশাভাঙ করেছে?

আমি বললাম, নেশা করলে গা এত গরম হয় না।

—রাস্তা দিয়ে কি হাঁটতে পারবে?

—বোধহয় পারবে না!

—তাহলে ঐ টেবিলের ওপরেই শুইয়ে রাখ!

এই কথাটা আমিও ভাবছিলাম। একটা অসুখে পড়া অসহায় লোককে রাস্তায় ফেলে রেখে আসার কোনো মানে হয় না। চেহারা দেখেই বোঝা যায় ভদ্রলোক, পয়সাওয়ালা বাড়ির ছেলে। সে এখানে মরতে এলো কেন?

লোকটাকে আমরা টেবিলের ওপরেই শুইয়ে দিলাম। একটা ডাক্তার এনে দেখালে ভালো হতো। কিন্তু অত রাত্তিরে ডাক্তারই বা কোথায় পাওয়া যাবে?

আমি বললাম, আপনি কিছু ওষুধ-টষুধ খাবেন না!

লোকটা বললো, না, দরকার নেই, কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

মনোরমা বললো, একটু জল দিয়ে মাথাটা ধুইয়ে দেবো?

—তা দাও না!

মনোরমা ঘর মোছার বালতিতে করে নিয়ে এলো এক বালতি জল আর মগ। মগে করে মাথায় জল ঢালতে গিয়ে বললো, ও মা, এর মধ্যে দেখছি অজ্ঞান হয়ে গেছে। ডান পায়ের গোড়ালিটা দ্যাখো রতনদা, কতখানি ফুলে আছে ; নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে পায়ে। সাপে-টাপে কামড়ায় নি তো?

রতন বললো, দূর! সাপে কামড়ালে কী এতক্ষণ কেউ কথা বলতে পারে? এমনি জ্বর-জারি হয় না মানুষের! সত্যি কি অজ্ঞান হয়ে গেছে? দেখি—রতন দু'চারবার নাড়াচাড়া দিয়ে দেখলো, তবু লোকটার আর সাড়া নেই। সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গেছে। মনোরমা তবু জল দিয়ে তার মাথাটা ধুইয়ে দিলো।

এত হাঙ্গামার মধ্যে আর আমরা পকেট থেকে বাংলার বোতল বার করতেই পারিনি। রাত বাড়ছে, বাড়িতেও তো যেতে হবে।

পরাণ অধৈর্য হয়ে বললো, ও মনো, চারটে গেলাস দে ভাই, আর দেরি করতে পারছিনি।

সেদিন খাওয়া হলো বটে, কিন্তু জমলো না। মনোরমা গান গাইলো না। আমরা তাকে নাচতে বলতেও পারলাম না। ঘরের মধ্যে আর একটা অচেনা লোক হাত পা চিতিয়ে পড়ে আছে। এর মধ্যে কী আমরা আনি মানি জানি না খেলতে পারি! প্রতি শনিবার রাত্রে মনোরমার সঙ্গে আমাদের এই যে খেলাটা—সেটা তো সারা পৃথিবীর অজ্ঞান্তে। তখন আর বাইরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না—আজ শুধু আমরা চারজন আর মনোরমা। এর মধ্যে আবার এই উট্‌কো উৎপাত এলো কেন? এর বদলে একটা ডাকাত এলেও আমরা প্রাণপণে লড়াই করে তাকে মনোরমার কাছে ঘেঁষতে দিতাম না। কিন্তু এ যে একজন অসুস্থ লোক, একে রাস্তায় ফেলে দেওয়া যায় কী করে? মনোরমা এর মাথা ধুইয়ে দিলেও আমরা আপত্তি করতে পারি না।

অনেকটা ঝিম মেরে বসে থেকেই আমরা সময় কাটিয়ে দিলাম। এবার যেতে হবে। উঠে এসে আমরা প্রত্যেকে আবার লোকটার কপাল ছুঁয়ে দেখলাম। আমরা সঠিক জেনে নিতে চাই লোকটা সত্যিই অসুস্থ কিনা। যদি অসুখের ভান করে ঘাপটি মেরে থাকে, তাহলে এই দণ্ডেই আমরা ওকে লাথি মেরে বার করে দেবো।

না। গা এখনো গরম আগুন। এখনও জ্ঞান নেই। নিজের গা কেউ ইচ্ছে করে গরম করতে পারে না!

আমরা বিদায় নেবার জন্যে তৈরি হচ্ছি দেখে মনোরমা জিজ্ঞেস করলো, এ এমনিই শুয়ে থাকবে? রাত্তিরে খাবে-টাবে না কিছু?

রতন বললো, খাওয়ার আর ক্ষমতা নেই।

—ও রতনদা, যদি লোকটা মরে-টরে যায়?

—আরে না। মরা অত সহজ নাকি? জ্বর হলে কেউ মরে না। লোকটা থাক এ রকম শুয়ে। সকাল হলে বিদায় করে দিবি।

আমরা বেরিয়ে এলাম। মনোরমা ঝাঁপ বন্ধ করে খিল লাগালো। আমাদের চারজনেরই মনের মধ্যে অস্বস্তি। আমরা মনোরমার গার্জেন ; আর রাত্তিবেলা তার কাছে আমরা অচেনা লোককে রেখে এলাম। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কী?

একটুকু বাদে জিতেন বললো, লোকটা কে? চোর ছ্যাঁচোড় না তো?

পরাণ বললো, দেখে তো তা মনে হয় না।

—আরে রাখ রাখ! চেহারা দেখে কী আর মানুষ চেনা যায়? বড় বড় শহরের চোর-দের চেহারা ওরকম ভদ্দরলোকের মতনই হয়!

—তা শহরের চোর জগুদার চায়ের দোকানে কী চুরি করতে আসবে?

—রাজবন্দী নয় তো? জেল-টেল থেকে পালাতে পারে!

—লোকটা নাম বলে নি, ধাম বলে নি! কোথা থেকে এলো!

—পুলিস-টুলিসের হাঙ্গামা হবে না তো!

রতন থমকে দাঁড়ালো। চিন্তিত ভাব করে বললো, আমাদের কারো আজ রাতে মনোরমার কাছে থাকা উচিত ছিল। যদি কোনো বিপদ-টিপদ হয়—

আমরা বাকি তিনজন তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে ওকে বি'ধলাম। রতনটা স্বার্থপরের মতন কথা বলছে। আমাদের প্রত্যেকেরও কি সেই ইচ্ছে হচ্ছে না? মনোর বিপদের সময় তার পাশে বুক পেতে দাঁড়াতে কী আমরা চাই না? কিন্তু এ কথাও জানি. আমাদের মধ্যে একলা কেউ মনোর সংগে সারারাত থাকলে সে একলা একলা আনি মানি জানি না খেলা খেলবে। তাতে আমাদের বাকি তিনজনের বুক জ্বলে যাবে না।
জানি না খেলা খেলবে। তাতে আমাদের বাকি তিনজনের বুক জ্বলে যাবে না।

রতন আমাদের তীক্ষ্ণ চোখ দেখে থতমত খেয়ে গেল। আবার চলা শুরু করে সে বললো, বাড়ি না ফিরলে বউ কি আমাকে ছাড়বে? নিজেই ছুটে আসবে হয়তো! জানে শনিবার এই সময়টা কোথায় থাকি!

আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমাদেরও ঘরে বউ ছেলে-পুলে আছে। অশান্তি এত বেশী আছে যে আর বেশী অশান্তি ডেকে এনে কোনো কাজ নেই। মনোরমার কাছে যদি রাত্রে থেকে যাই. তাহলেই বাড়িতে অশান্তি। মনোর কাছে কেউ একা এলো কিনা. সেটা দেখবার জন্যে আমরা বাকি তিনজন তক্কেতক্কে থাকি! মনোরমা আমাদের চারজনের একা কারুর না।

রোববারটা আমাদের চারজনেরই ছুটি। সকালবেলা বাজারের থলি নিয়ে বেরিয়ে আমি চলে এলাম জগুদার দোকানে। আর তিনজনও এসে গেল অল্পক্ষণের মধ্যে। যেন আগে থেকে ঠিক করাই ছিল।

চায়ের জন্যে তখন আর কোনো খদ্দের আসে নি। শুধু আমরাই চারজন। সেই লোকটা টেবিলের ওপর নেই।

--ও মনো, মনোদিদি!

কোনো সাড়াশব্দ নেই। পিছনের রান্নাঘর। অন্যদিন তো উনুনে আঁচ পড়ে যায় এই সময়। সেখানে উঁকি দিয়ে দেখি, রান্নাঘরের মেঝেতেই আঁচল পেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে মনোরমা। আবার আমাদের ডাক শুনে সে ব্যস্ত হয়ে উঠে বসলো। চোখ মুছে বললে, তোমরা এসে গেছ!

—তুই এখনো ঘুমোচ্ছিস কেন?

—ঘুমুচ্ছিলাম কোথায়, শুয়ে ছিলাম! সারা রাত একটু ঘুমুতে পারিনি। আমার এত ভয় করছিল!

আমরা অবাক! মনোরমার ভয়? তাকে আমরা কোনোদিন এ রকম কথা বলতে শুনিনি। বলি, কেন মনোদিদি, ভয় করছিল কেন? কী হয়েছে?

মনোরমা আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে বললো, সারারাত লোকটার বুকের মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছিলো, আর মাঝে মাঝে মা মা বলে ডেকে উঠছিল। আমি ভাবছিলাম, ও বুঝি যে-কোনো সময় মরে যাবে। এই রকম একটা লোককে তোমরা এখানে রেখে গেলে কী আক্কেলে। আমার কথাটা ভাবলে না?

ভেবেছিলাম মনো, আমরা তো সারারাতই তোর কথা ভেবেছি। পাশে শোয়া রোগা বউ, ছেলেমেয়েগুলোর চ্যাঁ ভ্যাঁ কান্না, এর মধ্যেও তো আমরা তোর কথাই ভাবি। তুই ছাড়া আমাদের কী আর আছে! কিন্তু আমাদের উপায় ছিল না। ইচ্ছে থাকলেও আমরা একলা কেউ তো এখানে থাকতে পারি না। তা লোকটা গেল কোথায়? চলে গেল?

—কোথায় যাবে? দেখো গে শুয়ে আছে আমার ঘরে।

—তোর ঘরে? নিজে নিজে উঠে গেল? তাহলে তো মানুষটা ভতি বদ।

—নিজে নিজে যাবে কেন! সে শক্তি কি আছে? রাত্তিরবেলা অমন ঘড়ড় ঘড়ড় করছিল, আমার ভয় হলো যদি টেবিল থেকে উল্টে পড়ে যায়? তাহলে তো সেই অবস্থাতেই মরবে—তখন আমারই তো হাতে দড়ি পড়বে।

আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে উঁকি দিলাম মনোরমার ঘরে। যে-বিছানায় জগুদাকে মরে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম, সেইখানে. ঠিক সেই রকম হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে লোকটা। আমাদের বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলো একবার। সত্যি মরে গেছে নাকি?

পরেই বুঝলাম, না। নিঃশ্বাসে বুক উঁচু নিচু হচ্ছে। লোকটার কপালে জলপটি।

মনোরমা যত্ন করে তার গায়ে একটা চাদর টেনে দিয়েছে।

মনোরমা নিজেই একে পাঁজাকোলা করে তুলে এনেছে টেবিল থেকে। মনোরমার সে শক্তি আছে। লোকটিকে কিন্তু এখানে মানায় না। ঠিক যেন মনে হয় গরীবের ঘরে এসে ঘুমিয়ে আছে কোনো রাজপুত্তুর।

কিন্তু এ কতক্ষণ এখানে আরাম করে ঘুমোবে। একটু পরেই লোকজন আসবে। ব্যাপারটা জানাজানি হলে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে পারে। যা হোক একটু কিছু বলে দিতে তো মানুষের জিভে আটকায় না--

আমরা চারজন দরজার কাছে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছি। কে আগে লোকটিকে ডাকবে ঠিক করতে পারছি না। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি। এমন সময় লোকটি নিজেই চোখ মেললো।

আমাদের চারজনকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যেন ভয় পেয়ে গেল। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললো, আমি কোথায়?

রতন বললে, আপনার অসুখ করেছে।

—আপনারা কারা!

পরাণ বললে, কাল আমরাই তো আপনাকে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিয়ে গেলাম, মনে নেই?

—ও। কিন্তু এটা তো বিছানা!

হ্যাঁ, বিছানা। এটা চায়ের দোকানের মালিকানির বিছানা।

রতন লোকটির কপালে হাত রেখে বললে, এখনো তো বেশ জ্বর আছে দেখছি। তাহলে তো ডাক্তার ডাকতে হয়। আপনি হাসপাতালে যেতে পারবেন?

লোকটি বললে, কোনো দরকার নেই। আমি খানিকটা বাদে ঠিক হলে আপনা আপনি চলে যাবো। আমি যে এখানে আছি, সে কথা কারুকে বলার দরকার নেই।

—কেন?, আপনি কে?

লোকটি হাত জোড় করে বললে, বিশ্বাস করুন। আমি কোনো খারাপ লোক নই। আমার পরিচয় এখন জানাবার অসুবিধে আছে।

কোনো ভদ্রলোকের ছেলে আমাদের সঙ্গে হাত জোড় করে কথা বললে আমাদের গা চিড়চিড় করে। এ রকম ন্যাকাপনা আমার একদম সহ্য হয় না। দরকারের সময় হাত জোড় আবার অন্য সময় চোখ রাঙানো, এসব আমরা ঢের দেখেছি। কিন্তু লোকটির মুখের ওপর কোনো কথা বলতে পারলুম না। লোকটি এমনভাবে কথা বলছে, যাতে মনে হয়, ওর খুব কষ্ট হচ্ছে; বেশ ভোগাবে মনে হচ্ছে।

বাড়িতে বাজার করে নিয়ে যাবার কথা। আর তো বেশী দেরিও করা যায় না। হপ্তায় এই একটা দিনই তো নিজের হাতে বাজার করা।

বেরিয়ে এসে দেখি, মনোরমা রান্নাঘরে উনুনে ধরিয়ে ফেলেছে। দুধ জ্বাল দিচ্ছে। আমাদের দেখে বললো, তোমরা একটু বসো গে। চায়ের জল এবার চাপাবো। কেমন দেখলে?

—এখন তো বেশ জ্বর!

—কাল কিছু খায় নি। এখন একটু গরম দুধ খাইয়ে দিই, কি বল?

—দে, তাই দে!

চা-টা খেয়েই আমরা দৌড় লাগালুম। সেদিন সারাদিনে আর চায়ের দোকানে যাওয়া হলো না। কারখানা বন্ধ থাকলে আর এত দূর বারবার আসা হয় না। রবিবারে এই জন্যই এ দোকানে খদ্দের খুব কম থাকে।

এরপর দিন তিনেকের মধ্যেও লোকটি গেল না। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় বুকে অসহ্য ব্যথা। রতনের ধারণা ওর নিমোনিয়া হয়েছে। জিতেনের ধারণা, ক্ষয়কাশ। এসব ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে মনোরমার কী থাকা উচিত। কিন্তু মনোরমা দিনরাত সেবা করছে লোকটাকে। এমন কি দোকান চালাবার দিকেও তার মন নেই, খদ্দেররা চায়ের জন্যে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে করে চলে যায়। এমন কি আমরা যে মনোরমার গার্জেন,

আমাদের দিকেও তার নজর নেই আর। আমরা কিছু বলতে গেলেই ও বলে, তা বলে কী লোকটাকে মরে যেতে দেবো। একটা ভদ্রলোকের ছেলে, সে কি আমার হাতে জল খেয়ে মরতে এসেছে? তোমাদের মায়া হয় না!

রতন এক কবিরাজের কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ওষুধ এনে দিয়েছে। কথাটা সে আমাদের কাছ থেকে গোপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের নজর এড়াবার উপায় নেই। ধরা পড়ে গিয়ে সে বললো, বুঝলি না, ওকে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলে বিদায় করতে পারলে তো আমাদেরই সুবিধে। নইলে, মনো যেমন নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেছে, তাতে দোকানটাই না উঠে যায়।

জিতেন বললো, আজ বটতলায় শুনলাম, দুটো লোক বলাবলি করছিল যে জগুদার চায়ের দোকানে কে একটা লোক নাকি লুকিয়ে আছে। এখন এ কথাটা চাউর হয়ে গেলেই তো বিপদ!

আমরা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লাম। সত্যি তো বিপদের কথা। লোকটা নিজের পরিচয় জানাতে চায় না। আমরা মনোরমার বিপদে-আপদে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু মনোরমাকে এই বিপদ থেকে কী করে বাঁচাবো?

পাঁচদিনের মাথায় লোকটা অনেকটা সুস্থ হয়ে বিছানায় উঠে বসলো। এর মধ্যে গত দু'দিন মনোরমা চায়ের দোকান বন্ধই রেখেছিল। সবাই জানে, মনোরমার অসুখ। শুধু আমরা আসল ঘটনা জানি। আমরা চুপিচুপি সন্ধের দিকে একবার এসে খবর নিয়ে যাই। সে সময় মনোরমা আমাদের চা খাওয়াতেও ভুলে যায়।

লোকটা বিছানায় উঠে বসেছে, আমরা দরজা দিয়ে উঁকি মারলাম। মনোরমা ঘরের কোণে বসে একদৃষ্টে চেয়ে আছে লোকটার মুখের দিকে।

লোকটা আমাদের দেখে বললো, আসুন, এ যাত্রা বেঁচেই গেলাম মনে হচ্ছে।

আমরা চারজন ঘরে ঢুকে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। আমাদের বুকের ভেতরে একটা চাপা আনন্দ। লোকটা তাহলে এবার বিদায় হবে। আবার শনিবার এসে গেছে আবার আমরা মনোরমাকে নিজেদের করে পাবো।

লোকটা মনোরমার দিকে তাকিয়ে বললো, এঁর সেবাতেই বেঁচে গেলাম। এঁর শরীরে খুব দয়া-মায়া আছে। নইলে, আমি অচেনা-অজানা লোক।

মনোরমার শরীরে যে দয়া-মায়া আছে, এ কথা আমরা প্রথম অন্য কারুর মুখে শুনলাম। সবাই জানে, সে দুর্দান্ত রাগী আর জাঁদরেল। অবশ্য মনোরমা কী রকম সে কথা আর আমাদের বলতে হবে না। দয়া না থাকলে সে আমাদের কারুর পায়ে ঝিঁঝি ধরলে হাত ধরে টেনে তোলে?

লোকটি বললো, এর ঋণ কী করে শোধ করে যাবো, জানি না। আমার কাছে টাকা পয়সা কিছুই নেই—

মনোরমা ঝংকার দিয়ে বললো, থাক আপনাকে আর ঋণ শোধের কথা চিন্তা করতে হবে না : এখনো হাঁটতে গেলে পা টলটল করে—

লোকটি বললো, তবে, আমি উপকার ভুলি না। একদিন ঠিক আবার ফিরে আসবো যদি বেঁচে থাকি—

—সে তো পরের কথা। এখন আপনাকে যেতে দিচ্ছে কে? আগে খেয়ে-দেয়ে গায়ে জোর করুন।

লোকটি বললো, তা মন্দ না। বেশ খেয়ে-দেয়ে গায়ে জোর করে তারপর আমি এই রেস্টুরেন্টে বয়ের কাজও করতে পারি। লোককে চা দেবো, কাপ ডিশ ধুয়ে দেবো—

পরদিন আমরা গিয়ে দেখি, দোকান খোলা, কিন্তু একজনও খদ্দের নেই। ক্যাশ কাউন্টারে মনোরমা একা বিমুখ হয়ে বসে আছে। আমাদের দেখেও একটা কথা বললে না।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গেল? সেই লোকটা কোথায় গেল?

মনোরমা ডান হাতখানা হাওয়ায় ফেরালো শুধু?

—কী হয়েছে, মনো দিদি? হলোটা কী?

মনোরমা চেঁচিয়ে ধমকিয়ে বললো, চলে গেছে। সে চলে গেছে।

আমাদের আনন্দে নৃত্য করতে ইচ্ছে করছিল। চলে গেছে তো আপদ গেছে!

—আবার চায়ের দোকানের বয় হবার কথা বলছিল! রাজপুত্তুরের মত চেহারা নিয়ে চায়ের দোকানে বয়গিরি, যতসব ন্যাকাপনা কথা?

—কখন গেল? কী করে গেল?

—সে কি আমাকে বলেছে? একবার ঘুণাক্ষরে জানতেও দিলে না। আমি তাকে একলা রেখে একটু খালপাড়ে চান করতে গেছি—ফিরে এসে দেখি সে নেই। যে মানুষটা ভালো করে হাঁটতে পারে না, সে এমনি এমনি চলে গেল!

—নিশ্চয়ই ওর মতলব ভালো ছিল না। কিছু নিয়ে-টিয়ে যায় নি তো?

—ও মনোদিদি, সে কিছু চুরি করেনি তো?

মনোরমা বললে, আঃ তোমরা চুপ করবে, আমার ভালো লাগছে না। কী এমন হাতি ঘোড়া আছে আমার, যে সে নেবে!

ধমক খেয়ে আমরা চুপ করে গেলুম।

তারপর শনিবার এলো, কিন্তু মনোরমা আর গাইলো না। নাচলো না। আমাদের আনি মানি জানি না খেলা হলো না। মনোরমা আর সেই মনোরমা নেই, সে আর আমাদের গ্রাহ্য করে না। ঠায় চুপচাপ বসে থাকে। এমনি করেই দিনের পর দিন যায়। আমরা বুঝতে পারি, সেই লোকটা অন্য কিছু চুরি না করলেও, সম্পূর্ণ চুরি করে নিয়ে গেছে মনোরমার মন। সেই মনটার চেহারা কী রকম তা আর কখনো বুঝিনি।

রতন একবার সাহস করে বলেছিল, ও মনো, সে লোকটা চলে গেল বলে তুই কতদিন আর এমনি করে থাকবি? দোকানটা যে যায়।

মনোরমার চোখের কোণে জল আসে। সে আস্তে আস্তে বলে, কিন্তু সে যে আবার ফিরে আসবে বলেছে!

ওসব শহুরে লোকের ন্যাকাপনা কথা। এর কি কোনো দাম আছে? এ কথা আমরা মনোরমাকে বোঝাই কি করে?

যদি সম্ভব হতো, আমরা লোকটাকে ঘাড় ধরে নিয়ে আসতাম এখানে। কিন্তু কোথায় তাকে খুঁজতে যাবো? আমাদের কারখানায় যে-কোনোদিন লক আউট হতে পারে, এখন একটি দিনও কাজ কামাই করতে ভরসা হয় না।

তবু রাগে আমাদের গা জ্বলে যায়। আমাদের আর কিছু নেই। সংসারেও শুধু নেই, নেই, নেই। আমাদের ধর্মেন্দর হেমা মালিনী নেই, বাকী পৃথিবীর কিছুই জানার দরকার নেই। শুধু আমাদের মনোরমা ছিল কিন্তু সেই লোকটা, রাজপুত্তুরের মতন চেহারা, শহুরে মানুষ—ওদের তো কত কিছু আছে, কত রকম আমোদ আর রঙ্গ রস। তবু সে কেন আমাদের মনোরমার মনটা কেড়ে নিয়ে গেল?

কথা বলতে বলতে হঠাৎ এক সময় সবাই চুপ করে গেল। তখন একটা আলপিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। এরকম হয় মাঝে মাঝে। এর নাম নাকি গর্ভবতী নিস্তব্ধতা।

বাচকুন ঘড়িতে দেখলো, ঠিক আটটা চল্লিশ বাজে।

কালকেও ঠিক এই সময়। সকলেই যখন কথা বলছিল, সকলেই গল্প, সামনে চায়ের কাপ, অনেক রকম হাসি, তারই মধ্যে একবার থেমে গিয়েছিল সবাই। তখন এমনিই আপন মনে ঘড়ির সাদা ব্যান্ডটা ঠিক করতে করতে বাচকুন সময় দেখেছিল। আটটা চল্লিশ। তার মনে আছে।

বাচকুনের একটু খটকা লাগলো। পর-পর দু-দিন। ঠিক একই সময়। অথচ কেউ আগে থেকে ঠিক করে নি কিছুই। বাচকুন সকলের মুখের দিকে তাকালো। দেবকুমার, সোহিনী, ছোটকুদা, রোজমেরি, অশোক। কেউ কারুর দিকে তাকিয়ে নেই, সকলেরই নত মুখ। যেন একটা শোকসভা। সকলে মিলে এক সংগে কেন চুপ করে আছে? সাতচল্লিশ...আটচল্লিশ...ঊনপঞ্চাশ...বাচকুন গুনছে। ঠিক পুরো এক মিনিট।

তারপরই ছোটকুদা বললেন, গত সোমবারে একটা থিয়েটার দেখতে যাবো ভেবে রেখেছিলাম, শেষ পর্যন্ত যাওয়া হলো না, গেলাম একটা সিনেমায়। তবু সিনেমা দেখতে দেখতে সর্বক্ষণ আমার মনে হচ্ছিল থিয়েটারই দেখছি।

এমন কিছু হাসির কথা নয়, তবু সবাই হেসে উঠলো। ছোটকুদার কথা শুনলেই হাসি পায়। ছোটকুদা তারপরই বললো, গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল, ভাবলাম বেরিয়ে এসে একটা আইসক্রিম খাবো। ওমা, একটাও আইসক্রিমওয়ালা নেই! যত রাজ্যের বাদাম আর ঝাল-মুড়ি আর চানাচুর' যখন যেটা চাইবো কিছুতেই সেটা...

দেবকুমার বললো, ছোটকুদা, তুমি বুঝি আজকাল গলা শুকিয়ে গেলে শুধু আইসক্রিম খাচ্ছো?

অশোক বললো, যখন তোমার ট্যাক্সির দরকার নেই, তখন চোখের সামনে দিয়ে অনবরত খালি ট্যাক্সি.. কিন্তু যখন তোমার সত্যিই খুব দরকার...

দেবকুমার বললো, ধানবাদে দেখেছিলে? বারোজন...ট্যাক্সিতে?

সোহিনী বললো, অনেক ছোটবেলায় আমরা একবার ঝরিয়া গিয়েছিলাম......

বাচকুন কোনো কথারই কোনো মানে বুঝতে পারছে না যেন। কথাগুলো কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে? যেন সকলের আলাদা আলাদা কথা। সে একটাও কথা বললো না। নীরবে ঊরুর ওপরে শাড়ির আঁচলটা প্লেস করতে লাগলো অন্যমনস্কভাবে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি একটু আসছি।

বসবার ঘরের পেছনে একটা সরু বারান্দা। সেটা পেরিয়ে গেলে খাবার ঘর। সেখানে এখন কেউ নেই, তবু দুটো আলো জ্বলছে। টেবিলের ওপরে স্বচ্ছ কাচের জারে কানায় কানায় ভর্তি জল। ওপরে লেসের ঢাকনা। সাজানো টেবল্ ম্যাটের ওপর উপুড় করা কাচের গেলাস। একটা গেলাস তুলে নিয়ে বাচকুন খুব সাবধানে জল নিল। তারপর ঠোঁটে লাগিয়ে একটু চুমুক দেবার পর তার মনে হলো, ঠিক আটটা চল্লিশে কেন কথা থেমে যায়? ঠিক এক মিনিটের জন্য? এটা কার নির্দেশ?

গেলাসটা নামিয়ে রেখে সে আবার ভাবলো,. ধুৎ, ওসব কিছুই নয়! একেই বলে কাকতালীয়।

বাচকুন জানলার ধারে আসে। আজ সামান্য জ্যোৎস্না আছে। কাল মেঘলা মেঘলা দিন ছিল, শেষ রাতে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। জ্যোৎস্না রাত বাচকুনের সবচেয়ে প্রিয়। বিশেষত এইরকম বাইরের খোলা জায়গায়। পেছন দিকের এই জানলাটা দিয়ে চোখের সামনে অনেকখানি—অনেকখানি পৃথিবী। এদিকে আর কোনো বাড়ি নেই। বেশ দূরে, ডান দিকে পাহাড়ের আভাস। আবছা নীল রঙের জ্যোৎস্না। বড় দেবদারু গাছটা এখন যেন খুব গর্বিত হয়ে।

ওই দেবদারু গাছটার পরেই একটু ঢালুতে নেমে, একটা যা অপূর্ব সুন্দর জায়গা।

ওখানে আজ রাত্রেই একবার গেলে...আজ রাত্রেই, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য।

জ্যোৎস্না খুব ফ্যাকাসে, যেন যখন তখন চলে যাবে। দূরে ভাল্লুকের দঙ্গলের মতন মেঘ। এত অল্প আলোয় এখান থেকে সেই সুন্দর জায়গাটা দেখাই যায় না। বাচকুনের একটু মন কেমন করলো। কেন দেখা যাচ্ছে না! ধুৎ, ভালো লাগে না!

বাচকুন আবার ফিরে এলো বসবার ঘরে। ছোটকুদা দারুণ জমিয়েছে। বাচকুন নিজের চেয়ারে বসে, ডান দিকের হাতলে কনুই ঠেকিয়ে থুতনিটা রাখলো তালুতে। গল্পে মন দেবার জন্য দু' চোখের মাঝখানে মনটাকে নিয়ে এলো।

ছোটকুদা বললো, দোকানটায় আমাকে তো দারুণ ঠকিয়ে দিল। সস্তার লোভে বিলিতি আফটার শেভ বলে যেটা কিনলাম, হোটেলে ফিরে দেখি সেটার মধ্যে স্রেফ ডেটল্। পরদিন ভোরবেলাই আমার বাঙ্গালোর থেকে ফেরার কথা ছিল। ফ্লাইট ক্যানসেল্ড হয়ে গেল। থাকতে হলো আর একদিন। পরদিন আমি সেই দোকানে আবার গেলাম। কেন গেলাম, বল্‌তো? কোনো দরদাম না করে ঠিক সেই জিনিসই আর একটা কিনলাম। দোকানের লোকটা আমাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিল। ও ভেবেছে আমি কিছুই বুঝতে পারি নি, তাই মনের আনন্দে ঠকাচ্ছে। কিন্তু আমি যে সবই বুঝে গেছি তা তো ও জানে না! কাজেই আমিও ওকে ঠকালাম! এঃ হেঃ হেঃ হেঃ।

সোহিনী বললো, ওঃ ছুটকুদা, তুমি সত্যি অদ্ভুত? ভেজাল জেনেও তুমি দুবার একই জিনিস কিনলে?

ছোটকুদা বললো, বাঃ, আমার মত আর কেউ ওকে কখনো ঠকিয়েছে? জেনেশুনেও কেউ ভেজাল জিনিস ওর দোকান থেকে আগে কিনেছে? আমি পর পর দুদিন গিয়ে, দুটো কিনেছি বলেই ও আমার ব্যাপারটা একদিন না একদিন ঠিক বুঝতে পারবে! আমি দোকান থেকে বেরিয়ে আসার সময় লক্ষ করেছিলুম, লোকটা খুব যেন চিন্তায় পড়ে গেছে। এঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ..

অশোক বললো, ছুটকুদা, তুমি সেই বেম্মের গল্পটা বলো! সেই যে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে...বউদি, হ্যাভ ইউ হর্ড দ্যাট ওয়ান? অ্যাবাউট দ্যাট স্ট্রীট আরচিন?

ছোটকুদার স্ত্রী রোজমেরি সব বাংলা বোঝে। তবু অশোক তার সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলবেই। রোজমেরি উত্তর দেয় বাংলায়।

রোজমেরি বললো, আমার বর কক্ষনো এক গল্প দু'বার বলে না।

ছোটকুদা হেসে বললো, দেখলি তো! আচ্ছা, শোন, তোদের একটা আর্মেনিয়ান বুড়ীর গল্প বলি, পার্ক সার্কাসে একটা বাড়িতে আলাপ হয়েছিল।

সোহিনী বললো, বাচকুন আজ এত চুপচাপ আর অন্যমনস্ক কেন?

বাচকুন ঘোর ভেঙে সজাগ হয়ে বললো, অ্যাঁ? কই না তো?

দেবকুমার বললো, অন্যমনস্ক থাকলেই বাচকুনকে বেশী সুন্দর দেখায়।

দেবকুমারের এই হালকা কথায় বাচকুন কোনো গুরুত্বই দিল না। তার মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়লো। তারপর বললো, আমি তো গল্প শুনছিলাম। কিংবা আমার বোধহয় খিদে পেয়েছে।

কেউ একজন বললো, বোধ হয় মানে কি? খিদে পেলে টের পাওয়া যায় না।

সোহিনী বললো, বাচকুনটা ওই রকম উল্টোপাল্টা কথা বলে। খিদে তো পাবেই, বেশ রাত হয়েছে। চলো--

ছোটকু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, ঠাকুর! ঠাকুর!

খাবার ঘরে এসে টেবিলের ডানদিকে দ্বিতীয় চেয়ারটাতে বসলো বাচকুন। কাল দুপুরে, এখানে প্রথম এসে ওই চেয়ারটাতেই সে বসেছিল। তারপর থেকে প্রত্যেকবারই ওইখানে বসছে। অন্যরাও সবাই ঠিক যে-যার একই চেয়ারে। কেউ তো কিছু ঠিক করে দেয় নি কাকে কোন চেয়ারে বসতে হবে, তবু প্রত্যেকের জন্য একটি চেয়ার নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। বাচকুনের চেয়ার থেকে খোলা জানলা দিয়ে দেবদারু গাছটাকে দেখা যায়। দেবদারু গাছটাও বাচকুনকে দেখতে পায়।

সোহিনী বললো, বাচকুন, তোর কথাতেই এখানে এলাম। তবু এই মনমরা হয়ে

আছিস কেন?

—না তো।

—কাল থেকেই তো দেখছি।

—কাল এসেই দেখলাম কিনা, মেঘলা মেঘলা, তারপর বৃষ্টি, তাই কি রকম খারাপ লাগলো।

—বৃষ্টি হয়েছে তো কি হয়েছে?

—এই সময় বৃষ্টি...ভালো লাগে? এরকম কথা ছিল না।

রোজমেরি অশোককে বললো, ডালটা এগিয়ে দাও তো।

তারপর খুব মন দিয়ে ডাল ঢালতে ঢালতে বললো, বাচকুন খুব চমৎকার কথা বলে. একটু ইনকোহেরেন্ট, সেই জন্যই। তোমার সঙ্গে কার কথা ছিল না, বাচকুন?

পুরুষরা খুকখুক করে হাসলো। অশোক বললো, তুমি ঠিক ধরতে পারলে না বউদি। বাচকুন বলতে চাইছে, শীতকালে সাধারণত বৃষ্টি হয় না, সেই জন্যই, কথা ছিল না।

রোজমেরি জোর দিয়ে বললো, সেটা আমি জানি, শীতকালে বৃষ্টি হয় না জানি, তবু যেন ও আর একটু বেশী কিছু বলেছে। তাই না বাচকুন?

—না তো!

—দেখলে বউদি দেখলে।

রোজমেরি বাচকুনের দিকে হাসিভরা চোখে তাকালো। সে বেশ উপভোগ করছে বাচকুনের অন্যমনস্কতা।

দেবকুমার বললো, আজ আর বৃষ্টি পড়বে না।

বাচকুন জানলা দিয়ে তাকালো। একটু আগের জ্যোৎস্না এখন মুছে গেছে। আকাশ ময়লা। দেবদারু গাছটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

সে বললো, খেয়ে উঠে একটু বাইরে বেড়াতে যাবে?

—এখন, এত রাতে? বেশ শীত..

—খুব বেশী না...

ছোটকু বললো, চলো, একটু ঘুরে আসা যাবে। মাছের ঝোলটা বেশ ভালো হয়েছে, না?

—ছোটকুদা তুমি আর একটু নেবে? নাও না!

—না। ভালো লাগলেই বুঝি বেশী খেতে হয়?

হাত ধোওয়ার জন্য জল গরম করা আছে। শীতের রাত্রে এই একটা বেশ চমৎকার বিলাসিতা। খুব আরাম। হাত ধুতে ধুতে বাচকুনের মনে হলো, এই যে একটু আগে ছোটকুদা মাছের ঝোলের প্রশংসা করলো, সোহিনী তখন তাকে আর একটু নিতে বললো, তার উত্তরে ছোটকুদা বললো, ভালো লাগলেই বুঝি বেশী খেতে হয়—ঠিক এই কথাগুলোই সে যেন আগে কোথায় শুনেছে। কোথায় ঠিক মনে করতে পারছে না। ঠিক এইরকমই একটা খাওয়ার টেবিল। এইরকম লোকজন, এই সব কথাবার্তা নিয়ে যে ঘটনা তা আগে একবার ঘটে গেছে। স্পষ্ট মনে হয়।

আবার বসবার ঘরে এসে সিগারেট ধরাবার পর পুরুষদের আর বেড়াতে যাবার বিশেষ ইচ্ছে দেখা গেল না। খাওয়ার পরে বেশী শীত করে। ছোটকু পা গুটিয়ে বসেছে।

—কই যাবে না বাইরে?

—আজ ছেড়ে দে। কাল সকালে খুব বেড়ানো যাবে।

সোহিনী বললো, তোমরা বড্ড কুঁড়ে হয়ে গেছ। বেচারার একটু ইচ্ছে হয়েছে, চলরে আমরাই যাই। বউদি এস।

ভালো করে শাল জড়িয়ে তিনটে মেয়ে বেরিয়ে পড়লো। প্রথম কাচের দরজা খুলে গাড়ি বারান্দায়, তারপর একটু এগিয়ে লোহার গেট খুলে সুরকি বেছানো রাস্তায়।

তেসরা ডিসেম্বর সকালে, কলকাতার বাড়িতে, বিছানায় ঘুম ভেঙেই বাচকুনের প্রথম মনে পড়েছিল হাজারিবাগ। কেন মনে পড়েছিল তার কোনো কারণ নেই। দু'একটা

শব্দ দু'একটা গানের লাইন যেমন হঠাৎ হঠাৎই মনে পড়ে। তেমনি মনের মধ্যে একটা নাম ঘুরতে লাগলো হাজারিবাগ। সকালের কথা অনেক সময়ই বিকেলে আর মনে থাকে না। কিন্তু সন্ধেবেলাতেও মনে রইলো। পরের দিনও। পরের দিন বাচকুন সোহিনীকে বলেছিল, দিদি এবার হাজারিবাগ বেড়াতে যাবি?

—হাজারিবাগ? হাজারিবাগ কেন?

—এমনিই।

—হাজারিবাগ কি এমন জায়গা?

সত্যিই, হাজারিবাগ এমন কিছু আহা মরি জায়গা নয়। বাচকুনও তা জানে। বেশ কয়েকবছর আগে সে একবার হাজারিবাগে গিয়েছিলও। তবু নামটা মনে এসেছে বলে কথার কথা হিসেবে বলেছিল মাত্র।

শীতকালে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়। ছোটকুদের বাড়ি আছে রাঁচীতে। সোহিনীর ইচ্ছে ছিল রাজগীর। তবু ঠিক মনস্থির হয় না। তারপর দেবকুমার জানতে পারে হাজারিবাগে তার এক বন্ধুর লোভনীয় বাড়ির কথা। তা হলে হাজারিবাগেই। যদি এখানে ভালো না লাগে তাহলে রাঁচী তো বেশী দূর নয়। এখানে এসে বাড়িটা সকলেরই পছন্দ হয়ে গেছে। বেশ গাম্ভীর্যময় প্রাচীন বাড়ি। চার পাশটা ফাঁকা। আসলে যে-কোনো জায়গায় গিয়ে ছুটির আড্ডাটা জমালেই হলো।

রাত দশটায় হাজারিবাগের রাস্তা একেবারেই নির্জন। এদিকটা আরও। তিন নারী সুরকির পথ ধরে লঘু পায়ে এগোচ্ছে। একটু বাদেই বাচকুন রাস্তা ছেড়ে ডান পাশে নামলো।

সোহিনী বললো, তুই মাঠের মধ্যে কোথায় যাচ্ছিস?

—চলো না। দেবদারু গাছটার পেছন দিকটায় একটা ঢালু জায়গা আছে।

—সেখানে কি?

—কিছুই না। এমনিই।

—রাত্তিরবেলা মাঠের মধ্যে আর যেতে হবে না।

রোজমেরি বাচকুনকে সমর্থন করে বললো, চলো, চলো মাঠে বেড়াতেই ভালো। কয়েক পা গিয়ে অবশ্য রোজমেরিই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। চোখ বড় বড় করে বললো, যদি সাপ থাকে? আমার সাপের বড় ভয়।

সোহিনী হেসে বললো, সাপের ভয় সকলেরই আছে। কিন্তু শীতকালে সাপ থাকে না।

—ঠিক, তাহলে তো ভয় নেই।

বাচকুন অনেকটা এগিয়ে গেছে। জায়গাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে বলে তাকে আর দেখা যায় না। মেঘলা আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া আলো। সোহিনী রোজমেরিও ঢালু জায়গাটা দিয়ে নামতে লাগলো।

এখানে একটা ছোট্ট ঝরনা আছে। কিংবা নালা। কিন্তু জল বেশ পরিষ্কার, যদিও ছিরছিরে।

রোজমেরি বললো, এখন আমি সারারাত বেড়াতে পারি।

সোহিনী বললো, তুমিও তো বাচকুনের মতন একটু পাগল।

বাচকুন নালাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে। যেন সে একটা কিছু গভীরভাবে দেখছে। যদিও দেখবার মতন বিশেষ কিছুই নেই। তার পেছনে দেবদারু গাছটা অন্ধকারে জয়স্তম্ভের মতন উঁচু হয়ে আছে।

সোহিনী নালাটা পার হবার জন্য পা বাড়িয়েছে, বাচকুন তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরলো। বললো, দিদি, ওদিকে যাস নি।

—কেন?

—ওদিকটা খুব সুন্দর না?

—সুন্দর বলে...যাবো না?

—আমি সকালে এখানে একবার এসেছিলাম, কী অপূর্ব সুন্দর জায়গাটা, ছোট্ট

ছোট পাথর, ঝকঝকে তকতকে, কী রকম যেন পবিত্র পবিত্র একটা ভাব—মনে হয় যেন আমাদের জন্য নয়।

—তুই কী যে বলিস, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না।

—কোনো কোনো জায়গা, কিংবা কোনো সুন্দর জিনিস দেখে তোর মনে হয় না, এটা আমাদের জন্য নয়?

রোজমেরি হাত ব্যাগ থেকে সিগারেট বার করলো। ফটাস করে লাইটার জ্বালাবার শব্দটা কর্কশ শোনালো একটু। প্রথম ধোঁয়াটুকু উপভোগ করে সে বললো, এদিকের থেকে ওদিকের জায়গাটা বেশী সুন্দর কি-না তা আমি জানি না। শুধু বাচকুনই এসব দেখতে পায়। বাচকুন সব সময় শুধু সুন্দর জিনিস দেখে।

বাচকুন তীক্ষ্ণ গলায় বললো, না!

রোজমেরি বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করলো, কি?

না, আমি সব সময় সুন্দর জিনিস দেখি না!

বাচকুনের ভুরু কুঁচকে গেছে। সোহিনী সেদিকে তাকিয়েই বুঝলো। সে বললো, চল্ এবার ফিরি।

—আমি শুধু সুন্দর জিনিস দেখি না। আমি অনেক অনেক খারাপ জিনিসও দেখি।

সোহিনী একটু ধমক দিয়ে বললো, থাক আর বলতে হবে না। ওরকম সবাইকেই দেখতে হয়। রাস্তাঘাটে ঘুরতে গেলে।

তিনজনেই বাড়ির দিকে ঘুরেছে। তবু রোজমেরি একটু কৌতূহলের সঙ্গে নালার উল্টো দিকটা আর একবার দেখলো।

বাচকুন রোজমেরির ওপর যেন একটু রেগে গেছে। যে কবারই সে রোজমেরির দিকে তাকাচ্ছে তার দৃষ্টিতে বেশ ধার।

রোজমেরি জিজ্ঞেস করলো, নার্ভ, নার্ভের বাংলা কী?

—স্নায়ু।

রোজমেরি বাচকুনের বাহুতে সস্নেহে হাত রেখে বললো,, তোমার স্নায়ু কি একটু চঞ্চল হয়ে আছে?

—না তো।

—জানো বাচকুন, লণ্ডনে যখন দারুণ ভারী ভারী বোমা পড়ছে, নাইন্টিন ফরটি থ্রি, সেই সময় আমার জন্ম...সেই জন্যই, আমার স্নায়ু দুর্বল...

বাচকুন কিছু শুনছে না। সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে।

সেটা হয়েছিল মাইথন থেকে ফেরার পথে। মাস দুএক আগে। কী একটা ছোট্ট স্টেশনে ট্রেন থেমেছিল, সেখানে থামার কথা নয়, লাইনের দু'পাশে অনেক লোক সকলেরই মুখ অন্যলোকের মুখের মতন। ট্রেনের কামরার লোকেরা কৌতূহলী ছিল ট্রেন থামবার জন্য। বাচকুন বসেছিল কামরার বাঁ পাশের জানলার পাশে, ডান পাশের জানলা থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, ইস, দেখো দেখো! তার চিৎকারের মধ্যে এমন একটা আকস্মিকতার জোর ছিল যে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। সকলেই সেই দিকে দৌড়ে গেল, বাচকুনও গিয়েছিল, কিছু না বুঝেই। অন্যরাও দেখছে বলে সেও মুখ বাড়িয়েছিল। সেই সময় কেউ যেন তার বুকে একটা ধাক্কা মারলো। কেউ মারে নি, একটা দৃশ্য।

স্টেশনের উল্টো দিকে একটা থেমে থাকা ট্রেনের ছাদে একটি মানুষের দেহ পুড়ছে। একটি চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলে, পাশে দুটো চালের বস্তা, হুমড়ি খেয়ে আছে ইলেকট্রিক তারের ওপর। বোধহয় লাফাতে গিয়েছিল, হাত দুটো ঠিক সেই অবস্থায় বাড়ানো, শক্ত—মাথার চুলগুলো পুড়ে গেছে, শরীরটা প্রায় সাদা, পেটের কাছে তখনও চিড়িক চিড়িক করে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ...। বাচকুন দু'এক মুহূর্তের জন্য দেখেই মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিল, তারপর কিছু না ভেবেই আবার ওদিকে ফিরলো এবং আর এক পলক দেখেই সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এলো!

তার মুখখানা বিবর্ণ, চোখে আর পলক পড়ছে না। কেন সে দেখতে গেল। কেন দ্বিতীয়বার তাকালো। ওরকম বীভৎস দৃশ্য দেখেও সে কেন দ্বিতীয়বার আবার মুখটা

ফিরিয়ে নিল। বাচকুন ফিরে এসে বসেছিল নিজের জায়গায়, কিন্তু সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, ওই দৃশ্যটা ছাড়া।

কামরায় সবাই নিচু গলায় তখন ওই বিষয়েই আলোচনা করছিল। কে কোথায় আর কত বীভৎস রকমের...বাচকুনের মনে হচ্ছিল সব শব্দই ক্রমশ আস্তে হয়ে যাচ্ছে।

কেউ একজন বলেছিল, চালের বস্তাগুলো কিন্তু ঠিকই আছে।

আর একজন কেউ বলেছিল, ওই চাল হয়তো আবার মানুষে খাবে।

—একেবারে পুড়ে যাবে, পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যাবে, কেউ নামাতে পারবে না...

ওই ছেলেটার বাড়ির লোকজন...ইস্ !

বাচকুনের এক বান্ধবী জয়া তখন বাথরুমে ছিল। সে দেখে নি। সে ফিরে এসে বাচকুনকে জিজ্ঞেস করেছিল, এই শর্মিলা, কি হয়েছে তোর? কি হয়েছে এখানে?

বাচকুন শূন্য চোখে তাকিয়েছিল বান্ধবীর দিকে। তার মনে হয়েছিল, জয়া তার চেয়ে কত সুখী!

এর একমাস পরেও যখন ছেলে, চাল কিংবা ট্রেন এই শব্দগুলো শুনলেই তার মনে পড়তো ওই দৃশ্যটা, তখন বাচকুন একদিন কাতরভাবে বলেছিল, কেন আমি শুধু শুধু এত কষ্ট পাবো? আমার কি দোষ? তবু কেন আমার এই শাস্তি? কেন আমার চোখের সামনে যখন তখন ওই ছবিটাই...। একথা বাচকুন কাকে বলেছিল? কারুকে না। এতো অন্য কারুকে বলার নয়। ঈশ্বরকেও না। শুধু নিজের মনে মনেই বারবার বারবার..।

রাস্তার ওপরে এসে ওরা দেখলো পুরুষ তিনজন গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ছোটকু বললো, আমরা ভাবলাম, তোমরা আবার হারিয়ে টারিয়ে গেলে নাকি।

সোহিনী বললো, আমরা কতক্ষণ আর গেছি, বেশিক্ষণ তো বেড়াই নি।

রোজমেরি বললো, আমরা একটা খুব সুন্দর জায়গা দেখে এলাম।

বাচকুন আবার ধারালোভাবে রোজমেরির দিকে তাকালো।

রোজমেরি বললো, আমার সত্যি খুব সুন্দর লেগেছে!

দেবকুমার বললো, তাহলে আমাদের ডেকে নিয়ে গেলে না কেন?

রোজমেরি বললো, তোমরা যাও নি ভালই হয়েছে। তোমরা পুরুষরা গেলে বড় গোলমাল করতে। তোমরা সব জায়গায় জোরে জোরে কথা বলো।

অনেকক্ষণ বাদে বাচকুন রোজমেরির সঙ্গে একমত হলো।

দেবকুমার বললো, চলো বাচকুন, তোমাতে আমাতে আর একবার ঘুরে আসি!

বাচকুন বললো, না।

মনে মনে সে বললো তোমার সঙ্গে আমি ওই জায়গাটায় কখনো যাব না। যদি তোমার মনে হয় জায়গাটা এমন কিছুই নয়। যদি তুমি হাসো!

দেবকুমার তবু বাচকুনের বাহু ছুঁয়ে বললো, চলো না।

বাচকুন কাতরভাবে বললো, আমার খুব শীত করছে।

সে আকাশের দিকে তাকালো। জ্যোৎস্না নেই।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে টানা লম্বা, পুরনো আমলের শ্বেতপাথরের ঢাকা বারান্দা। ঝাড়লণ্ঠন লাগানো আছে, কিন্তু জ্বলে না। তার বদলে নিয়ন। বারান্দায় এক পাশে তিনটি শোবার ঘর। ঘরের মধ্যে ভিক্টোরিয়ার আমলের নকশাকাটা জাঁদরেল পালঙ্ক।

ছোটকু বারান্দার কোলাপসিবল গেট টেনে বন্ধ করলো। তারপর বললো, কী, এক্ষুনি শুয়ে পড়া হবে?

—সাড়ে দশটা প্রায় বাজে।

—কিছুই না।

—তবু মনে হচ্ছে যেন মাঝ রাত। একটু শব্দ নেই।

বাইরের দিকে উঁকি মেরে দেবকুমার বললো, আবার মেঘ জমেছে। আজ রাত্তিরেও বোধ হয় বৃষ্টি হবে! ঠাণ্ডাটা আরও পড়বে।

সোহিনী বললো, না আর বৃষ্টি হবে না।

যেন বিশ্বের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের ভার তার ওপর, এইভাবে সোহিনী একটা হুকুম

দিল। তারপর বললো, আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি বাবা শুতে যাই। তুই আসবি, বাচকুন?

সোহিনী আর বাচকুন এক ঘরে। দুই বোন বাইরের শাড়ি ছেড়ে রাত-পোশাক পরে নিল। মুখে ক্রিম ঘষলো। চুলে লম্বা করে চিরুনি চালালো। সোহিনীরই তো সব কিছু শেষ হয়ে গেল আগে। মুখ দিয়ে শীতের উঃ হু হু হু হু শব্দ করতে করতে লেপের মধ্যে ঢুকে পড়ে সে বললো, তুই কি বই পড়বি নাকি?

—এই খানিকক্ষণ।

—মনে করে আলো নিবিয়ে দিস।

এক পাশের ঘরে ছোটকু আর রোজমেরি অন্য পাশের ঘরে বাঁকি ছেলেরা। ছেলেদের ঘর থেকে এখনো কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

দরজার ছিটকিনিতে হাত দিয়ে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো বাচকুন। সে এখন না ঘুমোতেও পারে। ইচ্ছে করলে গল্প করতে যেতে পারে পাশের ঘরে ছেলেদের সঙ্গে। কিন্তু কী গল্প? হয়তো ছেলেরা এখন ছেলেদের গল্প করছে। ছেলে? একটি চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলে হুমড়ি খেয়ে আছে ট্রেনের ছাদে...হাত দুটো বেঁকে শক্ত হয়ে গেছে...পাশে দুটো চালের বস্তা, সেই চাল অন্য কেউ খাবে। কেন রোজমেরি বললো।

সব কটা জানলাই বন্ধ। এত শীতে জানলা খুলে শোওয়া যায় না। তবু বাচকুন একটা জানলার পাশে এসে খড়খড়ি তুলে একটু দেখলো। আকাশে বিশ্রী খসখসে কালো রঙের মেঘ। এরকম কথা ছিল না।

খড়খড়ি দিয়ে শাণিত হাওয়া এসে লাগছে বাচকুনের গালে। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে জায়গাটা! বাচকুন গালে হাত রাখলো। যেন নিজের নয়, অন্য কারুর।

বাচকুন একটা বই নিয়ে ইজিচেয়ারটায় বসলো। কিন্তু একটু বাদেই সে বুঝলো তার একটুও মন বসছে না। শীতের রাতে, সামনে বিছানা থাকলে কিছুতেই একটু দূরে চেয়ারে বসে থাকা যায় না। তার শুতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়তে গেলে হঠাৎ এক সময় ঘুম এসে যায়। উঠে আর আলো নেবানো হয় না। সারা রাত আলো জ্বলে।

বাচকুন বই মুড়ে রেখে আলো নিবিয়ে দিল। লেপের তলাটা সোহিনী আগেই গরম করে রেখেছে। মস্তবড় লেপ, দু'জনের বদলে চারজনকেও ঢাকা দিতে পারে।

চোখ বুজে সে একটু অপেক্ষা করলো, কিছু দেখতে পাচ্ছে কিনা। সে দেখলো শুধু অন্ধকার। কলকাতার থেকে এদিককার অন্ধকার বেশী গাঢ়। সে নিশ্চিন্ত হয়ে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেললো।

তারপর খুব আস্তে আস্তে ঘুম আসতে লাগলো। নরম আদরের মতন, সারা গায়ে ছড়িয়ে যায় ঘুম, ঘুমের ওজনে শরীরটা একটু ভারী হয়ে যায়। তারপর ঠিক যেন অতল জলে ডুবে যাওয়ার মতন.. কী সুন্দর আরাম!

বুকের ওপর একটা হাত রেখে ঘুমিয়ে রইলো বাচকুনের তেইশ বছরের শরীর। তার চোখের পাতা একটু-একটু কাঁপছে। ঠোঁটে খুব পাতলা একটা দুঃখ দুঃখভাব।

মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল বাচকুনের। কেন? কোনো শব্দ হয় নি, গা থেকে লেপ সরে যায় নি, তবু। পুরো চোখ মেলে তাকাবার মতন ঘুম ভাঙা। এবং মনে হয়, সহজে আর ঘুম আসবে না। কেন এরকম হলো? তার কি জলতেষ্টা কিংবা বাথরুম পেয়েছে? কোনোটাই তো পায় নি।

তবু খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকার পর বাচকুন উঠে পড়ে জল খেল। এবং শালটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাথরুমে গেল। না হলে আর ঘুম আসবে না। অন্য দু'ঘরের সবাই গভীর ঘুমে। সে কেন একা জেগে থাকবে?

বাথরুম থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে একগাদা সরু সুতো দিয়ে কে যেন বেঁধে ফেললো বাচকুনকে। সে থমকে দাঁড়ালো। সুতো নয়, মাকড়সার জাল! এত মাকড়সার জাল এলো কোথা থেকে? বোধ হয় বাথরুমের মধ্যেই ছিল।

কিন্তু মুখ তুলে সে দেখলো, বারান্দায় লম্বা লম্বা মাকড়সার জাল উড়ে বেড়াচ্ছে। অতি সূক্ষ্ম হলেও স্পষ্ট দেখা যায়। হয়তো বারান্দার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত টানা কোনো জাল ছিল, কোনো কারণে একটু আগেই ছিঁড়ে গেছে।

তারপরেই বাচকুন টের পেল, সে বারান্দার আলো জ্বালে নি, তবু মাকড়সার জাল দেখতে পাচ্ছে। ঘর থেকে যখন বেরিয়েছিল, অন্ধকার ছিল, এখন কোথা থেকে যেন আলো আসছে। কোথা থেকে আবার, আকাশ থেকে!

মেঘের মধ্যে ফাটল ধরেছে, তার ভেতর থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন ছলাৎ ছলাৎ করে উঠে আসছে জ্যোৎস্না, শীতকালের জ্যোৎস্নার সবটুকু তীব্রতা নিয়ে।

মাকড়সার জালটা যেদিকে উড়ছে, সেদিকে এগিয়ে গেল বাচকুন। বারান্দাটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে ছোট্ট একটা ব্যালকনি। সেখান থেকে বাড়ির পেছন দিকটা দেখা যায়। সেখানে এসে দাঁড়াতেই তার যেন প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলো। তার চোখের সামনে হঠাৎ উদ্ভাসনের মতন একটা কিছু ঘটে গেল যেন।

নিবিড় নীল রঙের জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। বিরাট দেবদারু গাছটা সহাস্য-মুখে চেয়ে আছে তার দিকে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নালার ওপাশের সেই সুন্দর পবিত্র জায়গাটা। সত্যি ও জায়গাটা যেন কারুর জন্য নয়। ভাগ্যিস তার ঘুম ভেঙে ছিল।

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বাচকুন। তার চোখ দুটি স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। দিদিকে কিংবা দেবকুমারকে ডেকে তুলে এনে দেখাবে? না থাক, ওদের যদি ভালো না লাগে!

বাচকুনের শরীরটা কাঁপলো। তার শীত করছে খুব। পাতলা রাত-পোশাকের ওপর শুধু শাল জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছিল, পা দুটি হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন। তবু সে ঘরে ফিরে যেতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে, যেন আরও কিছু আছে। সে নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে আছে দেবদারু গাছটার দিকে।

তারপর একটি পাখি ডেকে উঠলো। প্রথমে আস্তে, তারপর ক্রমশ বেশ জোরে! টিট্টিউ! টিট্টিউ!

বাচকুন অবাক হয়ে গেল। রাত্রে কি পাখি ডাকে? সে তো আগে কোনোদিন শোনে নি! কে যেন বলেছিল, অনেক সময় সাপ গাছ বেয়ে উঠে, পাখির বাসায় ছানা চুরি করতে গেলে পাখিরা ভয় পেয়ে ডেকে ওঠে। কিন্তু শীতে তো সাপ বেরোয় না। কে যেন খানিকক্ষণ আগেই বললো কথাটা। তাছাড়া এ তো ভয় পাওয়া ডাক নয়। এ তো একলা আপন মনে ডেকে ওঠা। ওর মিষ্টি সুরের ঝাপটা ছড়িয়ে যাচ্ছে দূরে, অনেক দূরে। পাখিটা যেন বাচকুনকে শোনাবার জন্যই—

হঠাৎ বাচকুনের শরীরে একটা শিহরণ এসে গেল। প্রতিটি রোমকূপে সে টের পেল এমন একটা কিছুর, যার ঠিক মানে সে জানে না। যেন সব কিছুই আগে থেকে ঠিক করা ছিল। এই রকম মাঝরাতে সে বারান্দায় এসে জ্যোৎস্নার মধ্যে দেবদারু গাছটার দিকে তাকাবে। দেবদারু গাছটা তাকে একটা পাখির ডাক উপহার দেবে। সেই জন্যই তেসরা ডিসেম্বর সকালে তার মনে পড়েছিল হাজারিবাগের কথা। সেইজন্যই মাঝরাত্তিরে তার ঘুম ভেঙে যাওয়া, সেইজন্যই মেঘ সরে গেল। এই সব কিছুর মধ্যেই যেন অদৃশ্য পরিকল্পনা আছে, এমনকি মাকড়সার জালও তার মধ্যে আছে। সে পাছে ভুলে যায় তাই মাকড়সার জাল তাকে মনে করিয়ে দিল। এই পাখির ডাক শুধু একা তার জন্য।

সে একদিন হঠাৎ একটা সাংঘাতিক, ভয়াল, দম বন্ধ করা কষ্টের দৃশ্য দেখেছিল পাশের ট্রেনের ছাদে। সেই দৃশ্যটি কি তার প্রাপ্য ছিল? এই কথা ভেবে ভেবে সে যন্ত্রণা পেয়েছে। সেই জন্যই যেন তার বদলে, তাকে কলকাতা থেকে ডেকে এনে, মাঝরাত্তিরে ঘুম ভাঙিয়ে এই অনির্বচনীয় রূপময় ছবিটি দেখানো হলো।

বাচকুনের চোখে সামান্য জল এসে গেল। এত শীতেও চোখের জল কী গরম। এক আঙুল দিয়ে সে চোখ মুছলো! কেউ বুঝবে না এই চোখের জলের মানে।

এটা কোন্ পাখির ডাক?

মহেন্দ্র পর্বতের চূড়ায় এসে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠির। মাথার ওপরে শুধু আকাশ। এতবড় আকাশের নিচে মানুষের নিঃসঙ্গতা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। পথে পড়ে আছে তাঁর চার ভাই ও স্ত্রীর মৃতদেহ। যুধিষ্ঠির আর পেছন ফিরে তাকালেন না। সঙ্গের কুকুরটি একটু ছটফট করছে। তিনি তাঁর কাঁধের ঝুলি থেকে এক টুকরো পিষ্টকখণ্ড তাকে দিয়ে বললেন, দাঁড়া, আর একটু অপেক্ষা কর।

একটু বাদেই আকাশ থেকে অগ্নিময় শকট নেমে এল। তার থেকে একজন নভোচারী বেরিয়ে আসতেই যুধিষ্ঠির হাঁটু মুড়ে অভিবাদন জানালেন। নভোচারী বললেন, বৎস যুধিষ্ঠির, তুমি পৃথিবীর সামান্য মানুষ হলেও তোমার ধৈর্য ও শুভবোধের জন্য তোমাকে আমরা সশরীরে নক্ষত্রলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্বাচিত করেছি। এসো—!

যুধিষ্ঠির বললেন, আগে এই কুকুরটিকে ভেতরে নিয়ে যান।

নভোচারী একটু অবাক হলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, এই সারমেয়টিকে? কেন?

যুধিষ্ঠির নম্র অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, সেটাই আমার অভিপ্রায়।

একটুক্ষণ চিন্তা করে নভোচারী হাসলেন। তারপর বললেন, বুঝেছি। যুধিষ্ঠির, তুমি প্রকৃতই বুদ্ধিমান। তুমি আগে পরীক্ষা করে দেখতে চাও যে আমাদের এই নক্ষত্রযান পৃথিবীর প্রাণীদের উপযোগী কিনা। তোমার আগে জীবিত অবস্থায় কেউ এই যানে চড়ে নি। সেইজন্যই এত দূরের পথ কুকুরটাকে সঙ্গে করে এনেছ?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি মিথ্যা কথা বলি না। আমার সন্দেহ নিরসনের জন্যই ওকে এনেছি। ও যাতে মাঝপথ থেকে চলে না যায়, সেইজন্য মাঝে মাঝে ওকে এক টুকরো করে পিষ্টকখণ্ড ছুঁড়ে দিতে হয়েছে।

নভোচারী আর বাক্যব্যয় না করে কুকুরটিকে নিয়ে যানে চড়লেন এবং মহাশূন্যে উড়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে।

একদণ্ড পর যানটি ফিরে এল, কুকুরটি তার থেকে বেরিয়ে এল লেজ নাড়তে নাড়তে। যুধিষ্ঠির তাঁর ঝুলির বাকি পিষ্টকখণ্ডগুলি সবই কুকুরটিকে দিয়ে বললেন, যাঃ! তুই অনেক উপকার করেছিস আমার। আমি বর দিলাম, এখন থেকে কুকুর মানুষের পোষ্য হবে।

নভোচারী যুধিষ্ঠিরের মাথায় স্বচ্ছ হেলমেট পরিয়ে দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে?

যুধিষ্ঠির বললেন, না।

—তাহলে এস!

যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে স্বর্গীয় রথ উড়ে চলল। যুধিষ্ঠির শেষবারের মতন তাকালেন পৃথিবীর দিকে। তাঁর বুক একটু টনটন করতে লাগল। যদিও আত্মীয়পরিজন আর কেউই প্রায় বেঁচে নেই, তবু এই পৃথিবী বড় প্রিয় জায়গা ছিল!

নভোচারী বললেন, তুমি একটু ঘুমিয়ে নিতে পার। আমাদের পৌঁছতে দেরি হবে।

যুধিষ্ঠির বললেন, বাইরের এই শোভা তো আর দেখতে পাব না। শুধু শুধু ঘুমিয়ে নিজেকে বঞ্চিত করি কেন?

—তা ঠিক। বৎস, তুমিই এই পৃথিবীর প্রথম নভোচারী। তোমার আগে কারুকে আমরা এই সুযোগ দিই নি। তোমার কীর্তির জন্যই আমরা আর তোমাকে মৃত্যুরূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে দিই নি। তোমার ভয় করছে না?

—ভয়? কেন, ভয় করবে কেন?

—হাজার হোক, আমাদের স্বর্গ নামক গ্রহটি তোমার অচেনা।

—অচেনা হবে কেন? আমাদের পূর্বপুরুষরা সবাই সেখানে গেছেন, তাঁরা স্বর্গের গুণকীর্তন করেছেন। আমি সারাজীবন নিজেকে বহুভাবে বঞ্চিত করেও ধর্মপালন করে গেছি স্বর্গে আসবার জন্য। সেখানে যেতে ভয় পাব কেন?

—ভাল কথা! দেখা যাক্!

—আপনি আমাকে প্রথম নভোচারীর সম্মান দিলেন বটে, কিন্তু আমি আপনাকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমাদের পূর্বপুরুষ রাজা পুরুরবাও স্বর্গে গিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন। এরকম আরও কারুর কারুর কথা জানি।

—অনেকে ওরকম মিথ্যে গল্প করে। তোমাকে ছাড়া আর কারুকে আগে আনা হয় নি। তোমাকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটি বিশেষ পরীক্ষার জন্য।

—পরীক্ষা?

—হ্যাঁ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। প্রশ্নটা অতি জটিল, তুমি সব বুঝবে না। তবু সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলি। শরীরটা হচ্ছে একটা বস্তু আর প্রাণ হচ্ছে শক্তি। বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা কিংবা শক্তিকে বস্তুতে—এ কৌশল আমরা জানি, পৃথিবীর মানুষ এখনও জানে না। আমরা পৃথিবীর কিছু কিছু মানুষকে বেছে নিয়ে তাদের মৃত্যুর পর প্রাণগুলো ওপরে নিয়ে আসি। আবার বস্তুতে রূপান্তর করলেই তারা শরীর ফিরে পায়। তার আগে আমরা তাদের লোভ, মোহ, হিংসা ইত্যাদি পৃথিবীর বাজে স্বভাবগুলো মুছে দিই। এখন চেষ্টা হচ্ছে, মৃত্যু-টৃত্যুর ঝামেলা না করে যদি তোমার মতন এরকম সশরীরেই নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলেও ওই লোভ, মোহ ও হিংসা-টিংসাগুলো মুছে ফেলা যায় কিনা।

যুধিষ্ঠির একটু দুঃখিত হলেন। তারপর হঠাৎ অহঙ্কারের সঙ্গে বললেন, হে দেব, পৃথিবীতে থাকার সময়েও আমার চরিত্রে কেউ কখনও লোভ, মোহ, মাৎসর্যের চিহ্নমাত্র দেখে নি।

—সেইজন্যই তো তোমাকে বাছা হয়েছে। তবে তুমি যতটা নিজেকে দোষশূন্য ভাবছ, ততটা নয়। পৃথিবী গ্রহটারই কিছু দোষ আছে, তা তোমাকে স্পর্শ করবেই! আমি তো পারতপক্ষে এখানে বেড়াতে আসতেই চাই না। বিষ্ণু মাঝে মাঝে আসেন বটে। পৃথিবীর খর্বকায় মেয়েদের তাঁর খুব পছন্দ। বেছে বেছে প্রত্যেকবার কি রকম খর্বকায় সুন্দরীদের বিয়ে করেছেন, দেখেছ?

দেবতাদের লীলা বিষয়ে যুধিষ্ঠির কোনো মন্তব্য করলেন না। মুখ নিচু করে রইলেন।

মহাশূন্যযানের গতি কমে এসেছে। নভোচারী বললেন, শীগগিরই আমরা নবক নামে একটা উপগ্রহে থামব একটুক্ষণের জন্যে। দেখো, ওখানেই যেন নেমে যেতে চেও না। অনেকে আবার ওই জায়গাটাই বেশী পছন্দ করে।

যুধিষ্ঠির সেখানে যান থেকে নামলেনই না, এবং চোখ বুজে রইলেন। তবু অসংখ্য মানুষের চিৎকার ও ডাকে তাঁর কানে প্রায় তালা লাগবার উপক্রম। তিনি দু'হাত দিয়ে কানও চেপে রইলেন। তবু যেন কিছু চেনা কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এসে লাগলো।

নরক থেকে স্বর্গ অতি অল্পক্ষণের পথ। স্বর্গে পৌঁছবার পর নভোচারী বললেন, আমার কর্তব্য এখানেই শেষ। এরপর অন্য বিশেষজ্ঞরা তোমার ভার নেবেন, তা আজ আর কিছু হবে না বোধহয়। এখন তুমি যেখানে ইচ্ছে যেতে পার। আর এও শুনে রাখ, এখানে যে কোনো গৃহই তোমার বাসগৃহ, প্রত্যেক জায়গাতেই খাদ্য আছে, কোনো খাদ্য বা পানীয়ই অপরের নয়, যে কোনো নারীকেও তুমি তোমার বল্লভা হবার জন্য আবেদন জানাতে পার।

যুধিষ্ঠির নেমে রকেট স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। যখন নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই, তখন রাস্তা হারাবারও কোনো ভয় নেই। এখানে সব ক'টি পথই সোজা, জটিল গলি-ঘুঁজির অস্তিত্ব নেই, দুপাশে সারি সারি গাছ, তবে তাদের পাতা সবুজ নয়, নীল। তিনি বুঝতে পারলেন, কেন নীল রং দেবতার এত প্রিয়। চতুর্দিকেই নীলের সমারোহ। যুধিষ্ঠিরের চোখ সবুজ দেখা অভ্যেস বলে একটু একটু পীড়িত বোধ করছিল।

আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করার জন্যই যুধিষ্ঠির বেশি ব্যগ্র হয়েছিলেন। বিশেষত তিনি দেখা করতে চান পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে। যে-কোনো সংকটে তিনি পিতামহের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। স্বর্গের হাল-চালও পিতামহের কাছ থেকেই জেনে নেওয়া ভাল।

কিন্তু অদূরেই তিনি দেখতে পেলেন, একটি বিশাল গাছের নিচে পাথরের লম্বা আসনে বসে আছে দুর্যোধন এবং কর্ণ। যুধিষ্ঠির একটু চমকে উঠলেন। সামান্য বিষাদও অনুভব করলেন। এরা আগে থেকেই এসে স্বর্গসুখ ভোগ করছে? তাঁর আপন ভাইরা এবং পরম আদরণীয়া দ্রৌপদী এখনও এসে পৌঁছয় নি।

ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হয় নি। যুধিষ্ঠির ভাবলেন ওদের এড়িয়ে রাস্তার অন্যপাশ দিয়ে চলে যাবেন। তারপরই চমকে উঠলেন। তিনি কি ওদের ভয় পাচ্ছেন? না ঈর্ষা? কেউ টের পায় নি তো?

তাড়াতাড়ি তিনি এগিয়ে এসে কর্ণকে প্রণাম করলেন এবং দুর্যোধনকে স্নেহ সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই তোমার উরুর ব্যথা সেরেছে তো?

ওরা দু'জনেই একটু চমকে উঠেছিলেন প্রথমে। তারপর দুর্যোধন বললেন, কে ধর্মরাজ, এসে গেছ? বাঃ বাঃ। না, ব্যথা-টাথা আর কিছু নেই। এখানে ওসব কিছু থাকে না। খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা।

কর্ণ নীরব। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন যুধিষ্ঠিরের দিকে। যুধিষ্ঠিরের বুক দুরু দুরু করছে। যদিও কর্ণ তাঁর আপন সহোদর দাদা, তবু এ পর্যন্ত তিনি কখনো ওঁর সঙ্গে সামনা-সামনি কথা বলেন নি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণ একবার তাঁকে হাতের মুঠোয় পেয়েও হত্যা না করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন অবশ্য যুধিষ্ঠির জানতেন না যে কর্ণ তাঁর দাদা হন। অনেক কটুভাষ্য করেছেন কর্ণের উদ্দেশে তখন।

তিনি হাঁটু গেড়ে বসে কর্ণের পাদবন্দনা করে বললেন, হে জ্যেষ্ঠ, আপনার কুশল তো?

কর্ণ দুর্বিনীত এবং কর্কশভাষী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর কণ্ঠস্বর আশ্চর্য কোমল। তিনি যুধিষ্ঠিরের মস্তকের ঘ্রাণ নিয়ে বললেন, হে অনুজ, তোমাকে দেখে আমি যৎপরোনাস্তি খুশি হয়েছি। তুমি পৃথিবীর গৌরব ছিলে এবং এই স্বর্গভূমি তোমাকে পেয়ে গৌরবান্বিত হল।

দুর্যোধন জিজ্ঞেস করলেন, ধর্মরাজ, তুমি খেয়েছ-টেয়েছ তো? বেরিয়েছ তো সেই কবে! তার ওপর আবার পাহাড় ভেঙে এসেছ। আমরা টেলিভিশনে তোমাদের পাহাড় চড়া দেখছিলাম।

কর্ণ ডান দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, ওই দিকে পান্থশালা আছে, তুমি ভোজন সেরে নিতে পার।

দুর্যোধন উৎসাহের সঙ্গে বললেন, যা খুশি খেতে পার। এমন রান্না কখনও খাও নি। দাম-টাম কিছু দিতে হবে না।

কর্ণ বললেন, ভাই, পাহাড়-ভাঙার পরিশ্রমে তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত। যে-কোনো ভবনে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পার।

দুর্যোধন বললেন, পা টিপে দেবার জন্য কিংবা সম্ভোগের জন্য যদি কোনো নারী চাও, দূরভাষণীতে শুধু কার্যালয়ে জানিয়ে দিও। যাকে ইচ্ছে, তাকেই পাবে।

কর্ণ মৃদুহাস্যে বললেন, শুধু উর্বশীকে চেও না। যদিও তিনি চিরযৌবনা এবং সুন্দরীশ্রেষ্ঠা—কিন্তু সূর্যবংশের কেউ ওঁকে পাবে না। উনি দাবি করেন, উনি আমাদের সকলের দিদিমা। কারণ সূর্যবংশের পূর্বপুরুষ পুরূরবার উনি বউ ছিলেন কিছুদিন।

যুধিষ্ঠির ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর নন। নারী-সঙ্গের জন্যও উন্মুখ নন। তিনি চান আত্মীয়-বন্ধুদের দেখা পেতে।

তিনি বললেন, আপনারা বসুন, আমি আগে একবার পিতামহের সঙ্গে দেখা করে আসি।

দুর্যোধন বললেন, তা যাও! পিতামহ বেশ বহাল তবিয়তে আছেন। এখানে আর তাঁকে জিতেন্দ্রিয় থাকতে হবে না। এখানে তো বিয়ে-টিয়ের ব্যাপার নেই, বাচ্চা-টাচ্চাও হয় না, তাই ওনাকে আর প্রতিজ্ঞা মানতে হবে না।

—পিতামহকে কোথায় পাব?

—খুঁজে দেখ, পেয়ে যাবে। আমরা এখানে বসে আছি, কারণ শুনেছি আজই যাজ্ঞসেনী আসবেন। তাঁকে দেখব বলেই তো।

যুধিষ্ঠির চমকে উঠলেন। দ্রৌপদী আসবেন! তা তো ঠিকই। মধুরহাসিনী দ্রুপদ-তনয় নিশ্চয়ই স্বর্গে আসবার অধিকারিণী!

দুর্যোধন বললেন, অন্য কেউ দ্রৌপদীকে প্রার্থনা করার আগেই আমার আবেদনটা জানিয়ে রাখব। দ্রৌপদীকে পাওয়ার সাধ আমার বহুদিনের। জুয়া খেলায় ওকে তো জিতেই নিয়েছিলাম, তবু বাবার বকুনি খেয়ে তোমাদের হাতে ফেরত দিতে হল। ওর জন্য এতবড় যুদ্ধটা করলাম। এখন আর মনে কোনো রাগ নেই। পরম রমণীয়া দ্রৌপদীকে আমি সপ্রেমে কোলে বসাব।

যুধিষ্ঠিরের মনে হল, তাঁর সর্বাঙ্গে যেন ক্ষত, সেখানে কেউ নুনের ছিটে দিচ্ছে! তাঁর ইচ্ছে হল ছুটে এখান থেকে চলে যান। চাই না স্বর্গ। দ্রৌপদীকেও তিনি পথে আটকাবেন।

দুর্যোধন আপন মনে অনেক কথাই বলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কর্ণের দিকে চোখ পড়ায় থেমে গেলেন। লজ্জা পেয়ে জিভ কাটলেন এবং কান মুললেন। তারপর বললেন, না, না, আমি প্রথম না, আমি দ্বিতীয়। দ্রৌপদীর ওপর সর্বাগ্রে অধিকার মহাত্মা কর্ণের। দ্রুপদ রাজার স্বয়ংবর সভায় আমরা কেউ লক্ষ্যভেদ করতে পারি নি বটে, কিন্তু মহাধনুর্ধর কর্ণের কাছে ও তো ছেলেখেলা! অর্জুনের অনেক আগেই কর্ণ লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে নিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে সেই সুযোগ দেওয়া হল না। ইনি স্বয়ং সূর্যের পুত্র, রাজমাতা কুন্তী এঁর জননী, অর্থাৎ মহাক্ষত্রিয়, অথচ এঁকেই সূতপুত্র বলে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেদিন। সেই মিথ্যের আজ অবসান হবে। স্বর্গে মিথ্যের কোনো স্থান নেই।

কর্ণ কোনো কথা না বলে মৃদু হাসছেন। যুধিষ্ঠির স্তম্ভিত, নির্বাক। তাঁর মস্তিষ্ক মোহাচ্ছন্ন হয়ে যাবার মতন অবস্থা। যে দ্রৌপদীর জন্য তাঁরা পাঁচ ভাই এত কষ্ট সহ্য করেছেন, সেই দ্রৌপদী আজ দুরাত্মা দুর্যোধনের অঙ্কশায়িনী হবে! এবং কর্ণ? দাদা হয়েও তিনি ছোটভাইদের স্ত্রীকে কামনা করবেন!

যুধিষ্ঠির আর সেখানে দাঁড়ালেন না। দু'একটি শুকনো ভদ্রতার কথা বলে বিদায় নিলেন তাড়াতাড়ি। আর একটু হলে তাঁর ক্রোধের প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছিল। কিংবা তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, কৃষ্ণা আজ আসবে না, সে এখনও মরে নি। মিথ্যে কথা! কিংবা পুরো মিথ্যে নয়, দ্রৌপদীর আর এক নাম কৃষ্ণা হলেও ওই নামে আরও অনেক নারী আছে পৃথিবীতে। রথচালক বাহুক-এর স্ত্রীর নামই তো কৃষ্ণা, সে এখনও বেঁচে। অর্থাৎ ইতি গজের মতন ব্যাপার। কিন্তু স্বর্গে এসেও মিথ্যের ছলনা!

যুধিষ্ঠির বেশী দূর যেতে পারলেন না। পিছন দিকটা তাঁকে চুম্বকের মতন টানছে। পিতামহ কিংবা অন্য আত্মীয়দের সঙ্গে পরে দেখা করলেও হবে। তিনি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালেন। দ্রৌপদীকে যদি আগে থেকেই কোনোক্রমে সতর্ক করে দেওয়া যায়!

তাঁর খুব আশা হল, দ্রৌপদীর আগেই ভীম বা অর্জুন এসে পড়তে পারে। তখন দেখা যাবে! ভীমার্জুনের কাছ থেকে দ্রৌপদীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া দুর্যোধন-কর্ণের সাধ্য নয়! কিন্তু যদি ওরা আগে না আসে! অর্জুনটা তো আবার অতি ভদ্র কিনা! নরক থেকে স্বর্গে যখন রথ আসবে, তখন অর্জুন হয়তো বলবে, মহিলারই অগ্রাধিকার, দ্রৌপদীই আগে যাক।

যুধিষ্ঠির বুঝতে পারছেন, এটা তাঁর ঈর্ষা। প্রথমেই এরকম কঠিন পরীক্ষায় পড়বেন, তিনি ভাবতেই পারেন নি। শুধু ঈর্ষা নয়, স্বর্গে এসে তিনি যুদ্ধেরও চিন্তা করছেন। তিনি ভাবছেন দ্রৌপদীকে উপলক্ষ্য করে আবার ভীমার্জুন আর দুর্যোধন-কর্ণের একটা লড়াই বাধাবেন। ছিঃ ছিঃ! আত্মগ্লানিতে যুধিষ্ঠিরের মন ভরে গেল। তিনি গাছতলায় বসে চোখ বুজে চিত্তশুদ্ধি করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারছেন না। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে দ্রৌপদীর মুখ। পাহাড়ী পথে চলতে চলতে দ্রৌপদী যখন ঢলে পড়েছিলেন, তখন তিনি তাকে তোলার চেষ্টা করেন নি। পাথরের ওপর সেই রাজনন্দিনীর কোমল তনু না জানি কত ব্যথা পেয়েছে! মৃত্যুর আগে দ্রৌপদী জিজ্ঞেস করেছিলেন, মহারাজ, কোন্ পাপে আমি এইভাবে মৃত্যুবরণ করছি? তিনি বলেছিলেন, তোমার কাছে তোমার পাঁচ স্বামীই সমান,

তবু তুমি অর্জুনকে বেশী ভালবাসতে!

এই কথাটা বলার সময় তার কণ্ঠে কি একটু শ্লেষ ফুটে উঠেছিল? তিনি বহুদিন ধরেই জানতেন যে দ্রৌপদী অর্জুনকেই বেশী ভালবাসে—তবু কোনো দিন মুখ ফুটে বলেন নি। এই জন্য তাঁর মনের মধ্যে একটা কাঁটা ছিল। তিনি কি এজন্য অর্জুনকেও হিংসে করতেন? না, না, না, তা হতেই পারে না! অর্জুন তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। সবচেয়ে? না, দ্রৌপদীর চেয়ে বেশী নয়। দ্রৌপদীর মন পাবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গায়ের জোর বা বীরত্বের দিকেই দ্রৌপদীর ঝোঁক বেশী। মেয়েদের এই এক দোষ! তাঁর যে এত শাস্ত্রজ্ঞান, এত ধর্মবোধ—এসব দ্রৌপদী বেশী পাত্তাই দেয় নি কখনও। ব্যাসদেব যখন এসে বলেছিলেন, এক বউকে নিয়ে পাঁচ ভাইয়ের যাতে মনোমালিন্য না হয় সেই জন্য তোমরা প্রত্যেকে একটা করে দিন ঠিক করে নাও, সেইদিন অন্য কেউ আর তার কাছে যাবে না—তখন যুধিষ্ঠির নিজের জন্য রবিবারটা ঠিক করে নিয়েছিলেন আগেই। রবিবারে কোনো রাজকার্য থাকে না, সারাদিন অখণ্ড অবসর। সারাদিন ধরে তিনি দ্রৌপদীকে পেতেন। অন্য ভাইদের অন্যান্য দিন শাসনকার্যের জন্য বেশ কিছুক্ষণ বাইরে ঘোরাঘুরি করতেই হত। একবার তিনি যখন দ্রৌপদীর সঙ্গে রতিক্রীড়া করছিলেন, তখন অর্জুন হঠাৎ সেই ঘরে ঢুকে পড়ে। এজন্য অর্জুনকে এক বছরের জন্য বনবাসে যেতে হয়েছিল। তিনি তখন মুখে অনেকবার তাকে নিষেধ করলেও মনে মনে খুশী হয়েছিলেন একটু। সেই বছরটা দ্রৌপদীকে বেশী করে পাওয়া গিয়েছিল।

হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের ঘোর ভেঙে গেল। পরিচিত কণ্ঠস্বর। তাকিয়ে দেখলেন দূরে দ্রৌপদী আসছেন, একা। দুর্যোধন আর কর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্ভাষণ করছেন। যুধিষ্ঠির হাত নেড়ে দ্রৌপদীকে ইশারা করতে লাগলেন, যাতে তাড়াতাড়ি এইদিকে চলে আসে। কিন্তু দ্রৌপদী দেখতেই পেলেন না। দ্রৌপদী যেন আরও বেশী রূপসী হয়েছেন। বয়সের কোনো ছাপ নেই। চিক্কণ মসৃণ ত্বক। কোমর পর্যন্ত ছড়ানো চুল। সুগোল বর্তুল দুই স্তন। সিংহের মতন সরু কোমর। গুরু নিতম্ব। দ্রৌপদীর দাঁত এত সুন্দর যে হাসলেই মনে হয় যেন চারদিকটা আলো হয়ে গেল। তাঁর ওষ্ঠ ও অধর পাকা আঙুর ফলের মতন।

যুধিষ্ঠির দেখলেন, কর্ণ ও দুর্যোধন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন দ্রৌপদীর দিকে। তিনি শুনতে পেলেন, কর্ণ বলছেন, হে বরবর্ণিনী, তোমার আগমনে সুরলোক ধন্য হল। আমরা তোমার প্রতীক্ষায় বসে ছিলাম। হে সুন্দরী, তোমার রূপের ছটায় আমি বিমোহিত। তোমার তুল্য মোহময়ী নারী আমি দুই জীবনে দেখি নি!

দ্রৌপদী মধুর হাস্যে বললেন হে বীরশ্রেষ্ঠ, আপনার কথা আমার কানে সুধাবর্ষণ করছে। আপনার মতন তেজোদ্দীপ্ত পুরুষের সামনে দাঁড়ালেই শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

দুর্যোধন বললেন, হে যাজ্ঞসেনী, আমাকে দেখতে পাচ্ছ না নাকি? আমিও তোমার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি যে—

দ্রৌপদী বললেন, হে সখা, তোমাকে দেখব না কেন? তোমার ওই সহাস্য সুন্দর মুখ কোনো নারী কি না দেখে থাকতে পারে?

যুধিষ্ঠির বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেলেন। জন্ম-শত্রুদের সঙ্গে দ্রৌপদী এরকম আদুরে আদুরে ভাবে কথা বলছে কেন? সে কি ঘৃণাভরে ওদের এড়িয়ে চলে আসতে পারত না?

তারপরেই সেই নভোচারী দেবতার কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। দুর্যোধন, কর্ণ, দ্রৌপদী—ওরা তিনজনেই মৃত্যুর পর স্বর্গে এসেছে। তাই শরীর থেকে রাগ, হিংসা, শ্লেষ সব মুছে দেওয়া হয়েছে। চিরকালের আনন্দ ও সম্ভোগসুখেই ওরা নিমজ্জিত থাকবে শুধু।

দুর্যোধন বললেন, হে দ্রুপদ-নন্দিনী, তোমাকে দেখে আমরা অধীর হয়েছি। রাজসভায় তোমাকে একদিন আমার ঊরু প্রদর্শন করে বলেছিলাম, তোমাকে এইখানে এসে বসতে হবে। কিন্তু তখন সে কার্যে সক্ষম হই নি। কিন্তু তখন থেকেই আমার সেই বাসনা রয়ে গেছে। এবার কি তুমি একবার সেখানে এসে বসবে?

দ্রৌপদী বললেন, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। এখনি!

দুর্যোধন বললেন, এখনি নয়। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ

কর্ণও তোমার প্রার্থী। এবং একথা কে না জানে, তোমার প্রতি কর্ণের প্রণয় ও আকাঙ্ক্ষা বহুদিনের। তুমি যতকাল ইচ্ছা কর্ণের সঙ্গে সুখ-সম্ভোগ কর—আমি প্রতীক্ষায় থাকব। স্বর্গে কোনো নারীই উচ্ছিষ্টা নয়। এখানে অমৃত এবং নারী সমতুল্য।

দ্রৌপদী কর্ণের দিকে ফিরে প্রগাঢ় আবেগের সঙ্গে বললেন, হে সূর্যপুত্র, এই দেখুন, আপনার সন্দর্শনেই আমার শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে। আমি বহুকাল ধরেই মনে মনে আপনাকে কামনা করেছি। আপনি আমাকে ধন্য করুন।

দ্রৌপদী নিজেই কর্ণের প্রশস্ত বক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নিজের বক্ষদ্বয় কর্ণের শরীরে নিবিড়ভাবে মিশিয়ে দিয়ে ব্যগ্র মুখখানি তুললেন ওপরের দিকে। তারপর তাঁর পাকা আঙুরের মতন অধর ডুবে গেল কর্ণের ওষ্ঠের মধ্যে।

যুধিষ্ঠির আর দেখতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি চোখ ঢাকলেন। স্বর্গে এসে তাঁর এ-কি বিরাট পরাজয় হল! তিনি পারলেন না। ক্রোধে কম্পিত হচ্ছে তাঁর শরীর, বুকের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলছে হিংসা। দেবতারা কি এই অবস্থায় তাঁকে দেখে ফেলেছেন? দেখুক!

নিতান্ত পৃথিবীর মানুষের মতন যুধিষ্ঠিরের চোখ দিয়ে টপটপ করে কান্না ঝরে পড়তে লাগল।

ছদ্মবেশে

নদীটা এমন সুন্দর যে দেখলেই প্রেমে পড়ে যেতে ইচ্ছে করে। খুবই ছোট নদী, এক হাঁটু বা এক কোমরের বেশী জল হবে না। তবে অনেক বড় নদীতে যেমন অনেকখানি জায়গা খালি পড়ে থাকে, মাঝখান দিয়ে জল যায়, এ নদীটা সে রকম নয়। মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরের চাঙাড় পড়ে আছে। প্যান্ট ভিজিয়েই আমি নদীর মধ্য দিয়ে খানিকটা গিয়ে একটা পাথরের ওপর উঠে বসলাম।

দু'পাশে হালকা জঙ্গল। ডাকবাংলো প্রায় দু'মাইল দূরে। সকালবেলা সেখান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে যে এমন চমৎকার একটা নদী পেয়ে যাব, ভাবি নি। নদীটা যেন বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে, আমিই যেন একে প্রথম আবিষ্কার করলাম।

এই জঙ্গলে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার নেই। ডাকবাংলোর চৌকিদারকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি। আমাদের পাশের ঘরে যে চারটি যুবক এসেছে, তাদেরও খুব আগ্রহ। তাদের সঙ্গে বন্দুক আছে। কিন্তু চৌকিদার নিরাশ করে দিয়েছে একেবারে। অনেককাল আগে নাকি এখানে কিছু হরিণ আর ভাল্লুক দেখা যেত, এখন সব উজাড় হয়ে গেছে। কয়েকটা শেয়ালের ডাক শুধু শোনা যায়।

পাথরটার ওপর বসে আমার মনে হল, এই সময় কোনো জন্তু যদি জল খেতে আসত এই নদীতে, তাহলে দৃশ্যটা আরও কত সুন্দর হতে পারত। একটা দুটো শেয়াল এলেও চলত। কিন্তু শেয়ালরা দারুণ ভীতু হয়।

মেঘলা মেঘলা দিন। মোলায়েম হাওয়া দিচ্ছে। এই সময় আরও কেউ থাকলে ভাল হত। ডাকবাংলো থেকে আমাকে প্রায় পালিয়ে আসতে হয়েছে। পাশের ঘরের চারটি ছেলের মধ্যে একজন আমাকে চিনে ফেলেছে। তার বোধহয় কবিতা লেখার বাতিক আছে, অনবরত আমার সঙ্গে সেই কথা বলতে চায়। সকালবেলা সাহিত্য-আলোচনা আমার একটুও ভাল লাগত না।

জঙ্গলের মধ্যে খচমচ শব্দ শুনে আমি চমকে তাকালাম। না। কোনো জন্তু-জানোয়ার নয়। দুটো বাচ্চা ছেলে। তাদের পেছনে পেছনে একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক।

কালো চেহারার ছেলে দুটো এসেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর দাপাদাপি করতে লাগল মনের আনন্দে। কাছেই নিশ্চয়ই বাড়ি-ঘর আছে। তা তো থাকবেই, কিন্তু জন্তু-জানোয়ার নেই এখন। কিংবা মানুষরা এসেই জন্তু-জানোয়ারদের মেরে শেষ করেছে। কত জঙ্গল ঘুরে বেড়ালাম, আজ পর্যন্ত একটা ভাল্লুক কিংবা বাঘকে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম

না। হাতি দেখেছি অবশ্য, অনেক, তবে উত্তর বাংলায়, বিহারে দেখি নি।

ছেলেগুলোকে দেখে আমার হিংসে হয়। বাড়ির কাছেই নদী, এই সুযোগ তো আমার ছেলেবেলায় পাই নি। জল বেশী নেই, সুতরাং ডুবে যাবারও ভয় নেই। সামান্য স্রোত আছে। টলটলে পরিষ্কার জল।

স্ত্রীলোকটি কাপড় কাচতে এসেছে। আমার দিকে কয়েকবার তাকাল বিস্মিতভাবে। আমি ঠিক নদীর মাঝখানে বসে আছি, একজন প্যান্ট-শার্ট পরা বাবু, এরকম বোধহয় সহজে দেখা যায় না।

এমন সুন্দর নদীর জলে জামাকাপড় কেচে নোংরা করার ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয় না। অবশ্য ওরা তো বুঝবে না। ওরা তো সৌন্দর্যের কথা ভাবে না, ওদের কাছে নদী একটা প্রয়োজনের জিনিস।

চটিজোড়া খুলে রেখে আমি জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে দিলাম। বেশ ঠান্ডা জল। নদীর গায়ে পা দিয়েছি বলে নদী কি রাগ করবে? স্নান করার সময়ও তো পা ডোবাতে হয়। নদীটিকে সত্যিই যেন একটি যুবতী মেয়ের মতন মনে হচ্ছে, এর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা যায় না। আমি পা তুলে নিলাম।

খানিকটা বাদে স্ত্রীলোকটি কাপড় কাচা শেষ হতেই বাচ্চা দুটোকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। ছেলে দুটো স্রোতের মধ্যে খেলা করতে করতে অনেক দূরে চলে গেছে। আবার ফিরে এল। তারপর নদী থেকে উঠে গায়ের জল না মুছে দৌড় দিল জঙ্গলের মধ্যে।

আবার নদীটা ফাঁকা। আমি ছাড়া কেউ নেই। একটা কাঠঠোকরা পাখি কোথায় যেন ঠকঠক শব্দ করে যাচ্ছে। অনেক দূরে একটা ট্রেনের হুইসল শোনা গেল। এই জঙ্গলের মধ্য দিয়েই রেললাইন গেছে।

আমি বসেই রইলাম। বেশ নেশার মত ভাব লাগল বসে থাকতে থাকতে। খুব খিদে না পেলে এখান থেকে ওঠা হবে না।

একটু বাদে আমার মনে হল, কাছেই যখন বাড়ি আছে, তখন একটি মেয়ে একা এখানে আসতে পারে না? তা হলে বেশ হত। জঙ্গলের মধ্যে এরকম নিরিবিলি নদীর পাশে একটি যুবতী মেয়ে না থাকলে যেন মানায় না। কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি সব পাওয়া যায়। আমার দেখতে ইচ্ছে করছে বলেই কি আকাশ থেকে কোনো মেয়ে নেমে আসবে!

আসতেও তো পারে! পরী কিংবা অপ্সরারা কি সব শেষ হয়ে গেছে? তারা এই পৃথিবীতে আর আসে না? এরকম নির্জন নদীতীরেই তো তাদের দেখতে পাওয়ার কথা। যদি খুব মন দিয়ে ডাকি!

সত্যিই, ধ্যান করার মতন আমি একটি মেয়ের কথা খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলাম। কোনো চেনা মেয়ের মুখ আমার মনে এল না, আমি একটা সম্পূর্ণ নতুন মেয়ে তৈরি করে নিলাম। নদীর মাঝখানে পাথরের চাঁইয়ের ওপর আমি ধ্যানী হয়ে বসে রইলাম অনেকক্ষণ।

তারপর আমার ধ্যানের সাড়া মিলল। বনপথ দিয়ে হেঁটে সত্যি মেয়ে এল, তবে একজন না, একসঙ্গে তিনজন।

তিনটি আদিবাসী মেয়ে কলকল করে কথা বলতে বলতে এগিয়ে এল নদীর ধারে। তাদের কাঁখে কলসী। আমাকে তারা লক্ষ্যই করে নি, নদীর তীরে কলসী নামিয়ে বসল। এরাও তো অপ্সরা হতে পারে! অপ্সরা কি কালো রঙের হতে পারে না?

নদীর মাঝখানে পাথরের ওপর কোনো লোক বসে থাকবে, এটা তাদের মাথাতেই আসে নি। তাই নিশ্চিন্তে তারা জামা খুলতে লাগল।

আমি লজ্জায় পড়লাম। ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না। একটা শব্দ করলাম মুখ দিয়ে।

মেয়ে তিনটি চমকে তাকাল আমার দিকে। দু'জন তখন জলে নেমেছে, একজন পাড়ে দাঁড়িয়ে—তিনজনেই তাড়াতাড়ি একসঙ্গে ফিরে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করল একটু, একটু যেন বিরক্তির সুর তাদের গলায়। তারপর তারা একটুখানি সরে গেল জঙ্গলের দিকে, যদিও কলসীগুলো পড়ে রইল সেখানেই।

আমার অস্বস্তি হতে লাগল। মেয়েগুলি নিরিবিলিতে এখানে স্নান করতে

এসেছিল, রোজই বোধহয় আসে—আমাকে দেখে ওরা বিরক্ত হয়েছে। আমিই বা কেন ওদের বাধার সৃষ্টি করব?

আমি চেঁচিয়ে বললাম, আমি চলে যাচ্ছি। এই যে, শোন, আমি চলে যাচ্ছি। ওরা কোনো উত্তর দিল না। আমি পাথর থেকে নামলাম। জল ভেঙে ভেঙে এগোলাম পারের দিকে। প্যান্টটা পুরোটাই ভিজে গেল। আমিও এখানে স্নান করে নিতে পারতাম। ভিজে প্যান্ট-শার্ট নিয়েই ফিরে যেতাম ডাকবাংলোয়। ইস্, কেন যে আগে স্নান করে নিই নি! মেয়েগুলোর সামনে এখন আমার স্নান করতে লজ্জা করবে।

আমার নিয়তি তখন আমার সঙ্গে একটু কৌতুক করতে চাইল। পরক্ষণেই একটা আলগা পাথরের ওপর পা ফেলে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম জলের মধ্যে। চশমাটাও খসে পড়ল।

খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়ে তিনটি! আমার তখন, যাকে বলে, নাকানি-চোবানি খাওয়ার মতন অবস্থা। জলের তলায় হাতড়ে চশমাটা খুঁজতে লাগলাম। মেয়ে তিনটি হেসে চলেছে।

চশমাটা পেয়ে আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। এরকম পরিস্থিতিতে রেগে যাওয়া আরও বোকামির কাজ, আমি মুখটাকে হাসি হাসি করে রেখে উঠে এলাম। সারা গা দিয়ে জল পড়ছে। মাথাটাও ভিজে গেছে।

হাস্যমুখী তরুণী তিনটির দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমরা তো আগে আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছিলে, এখন হাসছ যে বড়?

একটি মেয়ে বলল, তুমি ওখানে কি করছিলে?

—এমনিই বসে ছিলাম।

—কেন? বসেছিলে কেন?

—আমার তো পৃথিবীতে কেউ নেই! কোথায় আর যাব! তাই ওখানে বসেছিলাম।

একটা সুবিধে এই, এদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের জন্য কোনো ভূমিকার দরকার হয় না। প্রথম আলাপেই এরা 'তুমি' বলে।

—তাহলে চলে যাচ্ছ কেন?

আমি মাথা থেকে খানিকটা জল নিংড়ে বললাম, আমার জন্য তোমাদের অসুবিধে হচ্ছিল তো!

ওরা একটু অবাকভাবে তাকাল। বোধহয় 'অসুবিধে' কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না। একজন তার হাতের গামছাটা এগিয়ে দিয়ে বলল, মাথা মুছে নাও না!

অন্য কারুর গামছা এভাবে ব্যবহার করার কথা আগে কখনো চিন্তাও করি নি। এখন আর দ্বিধা করলাম না। গামছাটা নিয়ে মাথা মুছে ফেললাম।

সেই মেয়েটি আবার নরমভাবে জিজ্ঞেস করল, তোমার কেউ নেই কেন?

—কি জানি! আমার মা নেই, বাবা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, বউ নেই, কেউ নেই!

—তুমি কি কর?

—কিছুই করি না। গান গাই, ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

ওরা তিনজনেই বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমিও যে কেন এই সব কথা বানাচ্ছি, তাও জানি না তবে বেশ ভাল লাগছে। কারুকে অবাক করে দিতে ভাল লাগে না!

ওরা আমার দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করলে। প্যান্ট-শার্ট পরা কোনো বাবুর মুখে এরকম কথা আশা করে নি। ওদের ধারণা বাবুদের সব থাকে, এমন কি তাদের মা-বাবারাও বেশীদিন বেঁচে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ ওরা আর কথা বলছে না দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই নদীটার নাম কি?

ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল, অর্থাৎ নদীর নাম জানে না। এরকম আগেও দেখেছি, স্থানীয় লোকেরা নদীর নাম নিয়ে মাথা ঘামায় না। ম্যাপেও এইসব নদীর নাম থাকে না।

—তোমাদের নাম কি?

ওরা এ ওর ঘাড়ে ঢলে পড়ে ফিকফিকিয়ে হাসতে লাগল। নাম বলতে লজ্জা।

—কি গো, তোমাদের নাম নেই?

আবার সেই রকম হাসি। তিন-চারবার প্রশ্ন করেও ওদের নাম উদ্ধার করা গেল না। এ ওকে ঠ্যালা মারে, কেউ প্রথমে বলবে না।

অপ্সরাদের কি নাম থাকে? এদেরও সেই রকম নেই বোধহয়। আমি মনে মনে ওদের নাম দিলাম প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া।

আমি ঘাড় হেলিয়ে বললাম, চলি!

তৃতীয়া বলল, গান শুনালে না?

যেন অনেক আগে থেকেই ওদের কাছে আমার গান শোনানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। এমন মজার সুরে কথা বলে।

—কেন? গান শোনাব কেন?

—তুমি যে বললে গান গাও।

—তা গাই। কিন্তু গান শোনালে তোমরা পয়সা দেবে?

ওদের মুখ শুকিয়ে গেল। প্রথমা বেশ রাগের সঙ্গেই বলল, পয়সা আমরা কোথায় পাব? বাবুদের কি আমরা পয়সা দিতে পারি? বাবুরাই তো পয়সা দেয়।

—আমি তো সেই রকম বাবু নই। গরীব বাবু। আমি ভিখিরী।

—মিছে কথা।

—না, মিছে কথা না। সত্যি। আচ্ছা পয়সা দিতে হবে না। গান শোনালে খেতে দেবে? তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে?

—আমাদের বাড়িতে তোমরা কি খাবে?

—যা দেবে। মুড়ি কলা, চিঁড়ে, পেয়ারা, আতা পান্তাভাত।

—মুড়ি খাবে? তো মুড়ি দেব।

—খুব ভাল। সঙ্গে দুটো কাঁচালঙ্কা দিও। এখন গান শুনবে? না বাড়িতে গিয়ে?

—এখন।

আমি একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। এদের সামনে গান গাইবার জন্য লজ্জা পাবার দরকার নেই। গানের ওস্তাদ না হলেও চলে। ছেলেবেলায় শুনেছিলাম, 'আগডালে বসো কোকিল, মাঝ ডালে বাসা রে' গানটা অনেকটা সাঁওতালি গানের ধরনের। সেইটাই গাইতে শুরু করলাম। ওরা চুপ করে শুনে গেল, মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। বুঝতেও পারলাম না, খারাপ লাগল না ভাল লাগল।

গান শেষ করার পরেও ওরা চুপ। আমি বললাম, কি এই গানের জন্য কি মুড়ি খেতে পাব?

ওরা কোনো উত্তর দিল না।

—আর একটা গান গাইব?

আমার এ প্রশ্ন শুনে তিনজনেই মাথা হেলাল। আমি নিজেই যেচে যেচে গান শোনাতে চাইছি। এমন শ্রোতা কোথায় পাব? নিরালা নদীর ধারে তিনজন যুবতীকে গান শোনাবার সুযোগ ক'জনে পায়? কলকাতায় আমি বাথরুমেও বেশী জোরে গলা খোলার সাহস পাই না।

এবার ধরলাম, 'ওগো সুন্দরী, তুমি কার কথায় করেছ মন ভারী—'। এটা শুনে ওরা বেশ হাসতে লাগল। এ গানটা বেশ পছন্দ হয়েছে। ওগো সুন্দরী, বলে এক একজনের মুখের দিকে তাকাই, অমনি সে মুখ লুকোয়। এমন সরল লাজুকতা কখনো দেখি নি আগে।

আরও চার-পাঁচটা গান গাইলাম। তারপর বললাম, আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে।

ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম, তোমরা স্নান সেরে নাও—আমি একটু অপেক্ষা করছি।

আমি খানিকটা দূরে গিয়ে জঙ্গলের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে রইলাম। পকেটের সিগারেট-দেশলাই সব ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং সময় কাটাবার জন্য গাছের পাতায় নখ দিয়ে

ছবি আঁকতে লাগলাম।

মেয়ে তিনটি স্নান সেরে কলসীতে জল নিয়ে ফিরে এল। ওদের তিনজনেরই ভিজে কাপড়। আমারও ভিজে প্যান্ট-শার্ট। আমি বললাম, আর থাকতে পারছি না এত খিদে পেয়েছে।

আমরা প্রায় দৌড়তে লাগলাম।

ওদিকে ডাকবাংলোতে এতক্ষণে ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়ে গেছে। ছেলেগুলো নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজছে। এদিকে আমি ভিজে গায়ে তিনটি অচেনা মেয়ের সঙ্গে মুড়ি খাওয়ার লোভে দৌড়চ্ছি। এখানে আমার নাম সুনীল নয়, আমি লেখক নই, আমি এখন এই পৃথিবীতে একজন অনাথ সঙ্গীহীন মানুষ। পরিচয় বদলাবার এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ আমাকে ঘিরে থাকে।

একবার আমার মনে হয়, এই মেয়ে তিনটি সত্যিই অপ্সরা নয় তো? হঠাৎ কি অদৃশ্য হয়ে যাবে? তা হলে সে দুঃখ আমি রাখব কোথায়? ওদের বাড়ির মাটির দাওয়ায় বসে পেতলের বাটিতে মুড়ি খাওয়ার জন্য আমার ভেতরটা ছটফট করে। আমি আর ধৈর্য রাখতে পারি না। দৌড়তে দৌড়তে আমি বলি, আরও জোরে। আরও জোরে। ওদের কলসী থেকে জল ছলাৎ ছলাৎ করে পড়ে, সেই রকম শব্দেই ওরা হাসে। অরণ্যের মধ্যে সমস্ত দৃশ্যটা স্বপ্নের মতই হয়ে যায়।

নদীর দু'তীর

তখন থেকে ডাকা হচ্ছে স্বপ্নাকে, কোনো সাড়া নেই। সে তখন আয়নার সামনে বিভোর। কাল রাত্তিরে কিনে আনা হয়েছে আকাশী নীল রঙের অরগানজা শাড়িটা, রাত্তিরেই সেটা একবার পরেছিল স্বপ্না। সকালে উঠে আবার শাড়িটা নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে। আটপৌরে শাড়ির ওপরেই সেটা কোনোক্রমে জড়িয়ে আঁচলটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে। তার সতেরো বছরের শরীর যেন এখন অনেক হালকা হয়ে গেছে। এখন সে অনায়াসেই উড়ে যেতে পারে।

বন্দনা দরজার কাছে উঁকি দিয়ে মেয়েকে দেখে রাগ করার বদলে হেসে ফেলল। তবু মৃদু ধমক দেবার সুরে বলল, এই, তখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছিস না?

স্বপ্না ঘুরিয়ে তাকিয়ে বলল. কি?

তুই চান করতে যাবি না? সাড়ে ন'টা বেজে গেল।

শাড়িটা পাট করতে করতে স্বপ্না বলল, মা, আজ এটা পরে কলেজে যাব?

বন্দনা বললে, না না, আজ পরিস না। পরশুদিন তোর জন্মদিন। সেইদিন নতুন শাড়ি পরতে হবে না! আজই পুরনো করে ফেলবি নাকি?

বড্ড ইচ্ছে করছে যে।

আজ আমার মেরুন শাড়িটা পরে যা। ওতেও তোকে ভাল মানায়। চটপট চান করে নে।

আমি এক ঘণ্টা পরে বেরুব। আমার তো আজ বারোটায় ক্লাস।

একটু বাদে বন্দনা যখন স্নান সেরে এল তখনও স্বপ্না আয়নার কাছে। কিছুদিন ধরে এই হয়েছে মেয়ের এক রোগ আয়নার কাছে থেকে আর নড়ে না। দরজা বন্ধ করে এসে বন্দনা বলল, এবার সর. আমি কি চুল-টুল আঁচড়াব না?

বন্দনার মুখে এখনও বিন্দু বিন্দু জল লেগে আছে। বাথরুম থেকে শুধু ব্রা পরে এসেছে। এখন আলনা থেকে লাল ব্লাউজটা নিয়ে পরতে লাগল। আঁচল খসে গেল পিঠ থেকে। মেয়ের থেকে বন্দনা বেশী ফর্সা। তার চওড়া পিঠ, কোমর এখনো সরু। একটু সরে দাঁড়িয়েছে স্বপ্না। মায়ের দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, তোমার ফিগারটা এখনো কী সুন্দর!

বুড়ী হয়ে গেছি, এখন আবার ফিগার।

মোটেই তুমি বুড়ী হও নি! কে তোমাকে বুড়ী বলে!

বুড়ী হব না? এখন থেকেই তো মেয়ের বিয়ের চিন্তা করতে হবে।

আহা, তোমার যেন ঘুম হচ্ছে না!

বন্দনা আর পরিতোষ একসঙ্গে অফিসে যায়। পরিতোষ এর মধ্যে খেতে বসে গেছে। বন্দনা তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়ে, মুখে ক্রিম ঘষে চলে এল খাওয়ার ঘরে। ঠাকুরই খাবার পরিবেশন করে, তবে বড় বড় মাছের টুকরোগুলো বন্দনাই জোর করে পরিতোষকে খাওয়ায়। পেটের গন্ডগোলটা শুরু হবার পর পরিতোষের চেহারাটা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। বয়সের তুলনায় তাকে বয়স্ক দেখায়।

পরিতোষ জিজ্ঞেস করল, স্বপ্নার এখনো হল না।

ওর আজ দেরিতে ক্লাস।

খেয়ে-দেয়ে স্বামী-স্ত্রী যখন বেরুচ্ছে, তখনও স্বপ্না বাথরুমে গান গাইছে গুনগুন করে। ছোট ছেলের ইস্কুল অনেক সকালেই। যাবার সময় বন্দনা চেঁচিয়ে বলে গেল, স্বপ্না তুই চারটের মধ্যে ফিরবি তো? দেখিস খোকন যেন খেয়ে নেয়।

বাড়ি থেকে বড় রাস্তা পর্যন্ত তিন মিনিটের পথ। ঠিক মোড়ের মাথায় এক দঙ্গল ছেলে রোজই দাঁড়িয়ে থাকে। এরা বেকার। যদিও জামা-কাপড় ফিটফাট, সব সময় হাতে সিগারেট। বন্দনা এই জায়গাটুকু মুখ নিচু করে থাকে। ছেলেগুলো একেবারে রাক্ষসের মতন তাকায়। মাঝে মাঝে বাঁকা বাঁকা মন্তব্যও করে। কত অনায়াসে উচ্চারণ করে অসভ্য কথা। পরিতোষ আজকাল সব সময় চিন্তিত থাকে, সে এসব কিছু লক্ষ্য করে না। যতক্ষণ না মিনিবাস আসে, ততক্ষণ অস্বস্তি হয় বন্দনার।

যদিও অফিস যায় একসঙ্গে। কিন্তু একসঙ্গে ফেরা হয় না। পরিতোষকে অনেক বেশীক্ষণ থাকতে হয়। তাছাড়া বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আছে। বন্দনা অফিস থেকে বেরোয় কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায়।

বাবা মা বেরুবার একটু বাদে স্বপ্না বেরুল। মোড়ের মাথায় তখনো সেই ছেলে-গুলো দাঁড়িয়ে আছে। স্বপ্না কিন্তু মুখ নিচু করে না। সোজা গটগটিয়ে হেঁটে এসে দাঁড়ায় ট্রামের জন্যে। সেই ট্রামেই দু'স্টপ পরে লাফিয়ে ওঠে আর একটি ছেলে। এর নাম গৌতম। সে স্বপ্নার পাশে এসে দাঁড়ায়। এবং কন্ডাকটারকে দেখে স্বপ্না পয়সা বার করতে গেলেই গৌতম তার আগেই একটা এক টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দুখানা।

স্বপ্না ভুরু কুঁচকে বলে, আপনি আবার আজ আমার টিকিট কাটছেন!

অফিসে বন্দনার কাজের চাপ খুব বেশী নয়। কাজে ফাঁকি না দিয়ে গল্প করার সময় পাওয়া যায়। আরও চারটে মেয়ে আছে অফিসে। তাদের মধ্যে দু'জন বন্দনাকে খুব হিংসে করে। এমনিতে কোনো কারণ নেই হিংসে করার, চারজনের একই পোস্ট, একই মাইনে, কিন্তু বন্দনা কেন বেশী সুন্দরী! কেন তার বয়েস বোঝা যায় না? কেন সে সাজে, কেন হাত কাটা ব্লাউজ পরে?

মাঝে মাঝে পাশের অফিস থেকে বিদ্যুৎ আসে আড্ডা মারতে। বিদ্যুৎ পরিতোষের বন্ধু। বিরাট লম্বা লম্বা চুল রেখেছে, মাঝে মাঝেই আঙুল দিয়ে চিরুনির মতন আঁচড়ায়। বন্দনার ঘরে এসে টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারটায় ঝপাং করে বসে পড়ে বলে, তোমাদের এখানটায় বেশ হাওয়া আছে। জানলা দিয়ে বাইরের মাঠ দেখা যায়।

বিদ্যুতের অফিসের ঘর এয়ার-কন্ডিশান্ড, সেইজন্যেই বোধহয় সে মাঝে মাঝে এখানে হাওয়া খেতে আসে। এবং নির্লজ্জ চোখে বন্দনার যৌবনের তারিফ করে।

বিদ্যুৎ এমন একটি দুর্জন, যাকে ভাল না লেগেও উপায় নেই। বিয়ে করে নি, বহু মহিলার সঙ্গে তার সংসর্গ বহুবিদিত। সে খুব সুন্দর কথা বলতে পারে, সাধারণভাবে মহিলাদের স্তাবকতা নয়, তার কথার মধ্যে গভীরতা আছে। সে সত্যিকারের জ্ঞানী লোক, কিন্তু লোকে যাকে 'চরিত্র' বলে, সেটা বেশ দুর্বল।

পরিতোষ কেমন আছে? ভুগছে এখনো?

বন্দনা কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, ডাক্তার বললে আলসার হয় নি। তবু সাবধানে থাকতে হবে।

ওকে রোজ রাত্তিরবেলা একটু একটু ব্র্যান্ডি খেতে বল?

ওসব কিছু ওর সহ্য হয় না। আপনি তো অনেকদিন আসেন না আমাদের বাড়ি একদিন আসুন না।

সন্ধ্যের পর আর আমার কোথাও যাওয়া হয় না।

এখন কার সঙ্গে প্রেম চলছে?

বিদ্যুৎ চওড়াভাবে হাসল। তারপর বন্দনার চোখে চোখ চেয়ে বলল, শুধু তোমার সঙ্গেই এখনো কিছু হল না!

বন্দনা শুধু বলল, আহা!

শুধু ওই কথাটারই অনেক মানে হয়। কথাটা বলেই বন্দনা বুকের আঁচল ঠিক করল।

বিদ্যুৎ বলল, তোমার তো কোনো কাজ নেই দেখছি। চল, আমার অফিসে চল।

কেন আপনারও কাজ নেই?

আজ আর কিছু করতে ভাল লাগছে না।

বিদ্যুতের অফিসে স্বপ্না দু'একবার গেছে। পরিতোষকে তার অফিসের কাজেই এদিকে মাঝে মাঝে আসতে হত। তখন কিছুক্ষণের আড্ডা জমত ঘরে। স্ত্রীর অফিসে আসা পরিতোষ পছন্দ করে না। বিদ্যুতের অফিস থেকে টেলিফোনে সেই সময় ডেকে পাঠানো হত বন্দনাকে! তাছাড়া এর পরে একা একাও দু'একবার গেছে বন্দনা। খুব গরমের সময় ওই ঠান্ডা ঘরে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসতে মন্দ লাগে না. বিদ্যুৎ তার ঘরে একলা থাকে, চতুর্দিক বন্ধ ঘর। একদিন বিদ্যুৎ বন্দনার পিঠে হাত দিয়ে তাকে কাছে টানতে চেয়েছিল হঠাৎ।

বন্দনা বলল, না, আজ আর যাব না। আপনার ঘরটা বড় ঠান্ডা।

বিদ্যুৎ উঠে দাঁড়াল। বন্দনার শরীরের দিকে শেষবার দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, বন্দনা তুমি কখনও কোথাও হেরে গেছ?

তার মানে?

তোমার মুখে সব সময় বেশ একটা ঝলমলে ভাব থাকে। কিন্তু বয়েস হচ্ছে তো এবার থেকে নানা জায়গায় হারতে শুরু করবে।

বয়েসের খোঁটা দিচ্ছেন! না হয় চল্লিশ পেরিয়েই গেছে—

চল্লিশ হয়ে গেছে নাকি? তা এ রকম চল্লিশ, মন্দ না—

অফিসের দু-একজন লোক এখনো বন্দনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করে। বন্দনা সব সময় এড়িয়ে চলে এসব ব্যাপার। কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না, তার হাসি মুখ কেউ কখনও ম্লান হতে দেখে নি। কিন্তু সে কখনও অফিসের কারুর সঙ্গে একা সিনেমা দেখতে যায় নি, একা কারুর গাড়িতে চাপে নি। ডালহাউসি থেকে বেরিয়ে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত বন্দনা হেঁটেই যায়, তারপর সেখান থেকে লেডিজ ট্রাম ধরে। এতে অফিসের অন্য লোকদের সঙ্গে একসঙ্গে বাড়ি ফেরা এড়ানো যায়।

মেয়ে বড় হয়ে গেছে, ছেলেকেও পড়াবার জন্যে রোজ সন্ধেবেলা মাস্টারমশাই আসেন. সুতরাং বন্দনার হুড়োহুড়ি করে বাড়ি না ফিরলেও চলে। কিন্তু বন্দনা একদিনও পরিতোষের পরে বাড়ি ফেরে নি। বাড়ি ফিরে পরিতোষ হাতের কাছেই কাচা গেঞ্জি ও পায়জামা না পেলে ছোট ছেলেদের মতন রাগারাগি করে, তাই বন্দনা ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখে।

অবশ্য বন্দনার একটি গোপন ব্যাপার এখনও আছে। মাসে একবার দু'বার অন্তত সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা না করে পারে না। সঞ্জয়ের সঙ্গে সেই কলেজজীবন থেকে সম্পর্ক। ওদের বিয়ে করার খুব অসুবিধে ছিল, দুজনের দিক থেকেই। কিন্তু দুজনে দুজনের প্রতি চুম্বকের টানে বাঁধা।

সঞ্জয়ও পরে বিয়ে করেছে, তিনটি ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু বন্দনা আর সঞ্জয়ের বন্ধুত্ব এখনও ঠিক এক রকমই রয়ে গেছে। ওরা কখনও খুব বেশীদূর এগোয় নি। বিয়ের ঠিক পরের বছরই বন্দনা স্বামীকে লুকিয়ে দু'বার সঞ্জয়ের সঙ্গে শুয়েছিল। এখন আর ওসব দিকে একদম যায় না। কদাচিৎ সঞ্জয় তাকে দু'একটা চুমু খায়, কখনও বুকের

বুকের ওপর মাথা রাখে। আবার এমনও হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে যায় দুজনে, কিন্তু পরস্পরকে স্পর্শও করে না।

হঠাৎ অফিস ছুটি হয়ে গেলে কিংবা কোনো কোনোদিন নিজেই অফিস থেকে একটু আগে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে বন্দনা দেখা করে সঞ্জয়ের সঙ্গে। দুপুর রোদ্দুরে গঙ্গার ধারে খুব একটা নির্জন জায়গা খুঁজে নিয়ে বসে। কিংবা খিদিরপুরের দিকে খুব সাধারণ কোনো চায়ের দোকান, যেখানে বন্দনা বা পরিতোষের চেনাশুনো কেউ কখনও যাবে না। সঞ্জয়কে তার অনেক কিছু বলার থাকে। এমন অনেক ব্যক্তিগত সমস্যা, যা স্বামীকেও বলা যায় না। কিন্তু সঞ্জয়কে বলা যায়। তাছাড়া সঞ্জয় পারিবারিক জীবনে সুখী নয়, বন্দনার কাছে এসে বসলে সে কিছুক্ষণের জন্য সত্যিকারের আনন্দ পায়। তার চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

মাত্র কয়েকমাস ধরে যেন সঞ্জয়ের সঙ্গেও দেখা করতে ভয় ভয় করে বন্দনার। কোনোদিন হয়তো সঞ্জয়ের জন্যে অপেক্ষা করছে সে, সঞ্জয় আসতে দেরি করছে। আগে এ রকম হলে সে খুবই রেগে যেত। একলা একলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগে। আজকাল একটুক্ষণ দাঁড়াবার পরই বন্দনার মনে হয়, সঞ্জয় বোধহয় কোনো কারণে আটকে পড়েছে, সে আসতে পাবরে না। সেজন্যে বন্দনার মন খারাপ হয় না। বরং খানিকটা স্বস্তির সঙ্গে ভাবে, যাক, আজ আর গোপনীয়তার বোঝা বইতে হবে না, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারবে।

নিজেই সে তার এই মনোভাবের জন্যে এক সময় অবাক হয়েছে। সঞ্জয় সম্পর্কে তার আকর্ষণ কি কমে যাচ্ছে? নাকি গোপনীয়তার ভয়টাই বেড়ে উঠছে ক্রমশ? কেন? সে তো কোনো অন্যায় করে নি। বিবাহিতা নারীর কি বন্ধু থাকতে পারে না? কিন্তু কেউ তো এখনও জানতে পারে নি, পরিতোষ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করে না—স্ত্রীর কাছ থেকে সে কিছুই এক বিন্দু কম পায় না। বন্দনার নিজের মনের মধ্যেই আলগা হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। এটাই কি বয়েস বাড়ার লক্ষণ?

শহীদ স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বন্দনা। আজ বোধহয় সত্যিই সঞ্জয় আসবে না। তবু আর পাঁচ মিনিট অন্তত দেখা যাক্।

একটা ট্যাক্সি ঘচ করে থামল একটু দূরে। সেটা থেকে নেমে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল বিদ্যুৎ—তুমি এখানে দাঁড়িয়ে!

বন্দনার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে, যদি হঠাৎ এক্ষুনি সঞ্জয় এসে পড়ে? এমন কি দূর থেকেও যদি সঞ্জয় দেখে যে বন্দনা অন্য একটি পুরুষের সঙ্গে কথা বলছে, তাহলেই সে মন খারাপ করে থাকবে। সঞ্জয় দারুণ স্পর্শকাতর। স্বামীর চেয়েও প্রেমিকরা বেশী ঈর্ষাপরায়ণ হয়।

মুখে হাসি এনে বন্দনা বলল, এমনিই। বাসে যা ভিড়!

চল, আমার সঙ্গে চল।

আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

ডালহৌসির দিকে। কিন্তু তুমি কোথায় যেতে চাও বল, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

না না, তার দরকার নেই। আমি অন্যদিকে যাব।

বিদ্যুৎ একেবারে বন্দনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠভাবে বললে, কেন, আমি পৌঁছে দিলে কোনো দোষ আছে?

বন্দনা জানে, বিদ্যুৎ শুধু পৌঁছে দেবে না, সে আগে কোনো রেস্টুরেণ্টে একটু বসে খাবার জন্যে পেড়াপীড়ি করবে। অন্তত ট্যাক্সির মধ্যে বসে হাত ধরার চেষ্টা করবেই। এ ছাড়া বিদ্যুৎ পারে না। বন্দনা দৃঢ় স্বরে বলল, না, আমার দরকার নেই। শুধু শুধু আপনাকে নিয়ে যাব কেন উল্টো দিকে।

বন্দনা হাঁটতে লাগল। সঞ্জয়ের জন্যে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

বাড়ির মোড়টায় ট্রাম থেকে বন্দনা দেখল স্বপ্না একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। ছেলেটার চেহারা রোগা পাতলা, মাথা ভর্তি বড় বড় চুল, ধুতি পাঞ্জাবি পরা। আজকাল ছেলেদের ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে দেখাই যায় না।

ছেলেটা হাত পা নেড়ে কথা বলছে খুব। একটা শ্যাম্পু কেনার দরকার ছিল, বন্দনা একটা স্টেশনারী দোকানে দাঁড়াল আর আড়চোখে দেখতে লাগল ওদের। সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা হল না বলে তার মনটা ভার হয়ে ছিল এতক্ষণ। এখন কেটে গেল সেটা মেয়েকে দেবে।

ছেলেটা স্বপ্নার হাতব্যাগটা নিয়ে টানাটানি করছে। স্বপ্না কিছুতেই দেবে না। ছেলেটা তবু জোর করে নিল, ব্যাগ খুলে কী যেন নিয়ে নিল।

বন্দনা ভাবল, চুপি চুপি রাস্তা পার হয়ে যাবে। মেয়ে যেন দেখতে না পায়। স্বপ্না এখন তাকে দেখলে লজ্জা পাবে। তবু রাস্তা পার হতে গিয়ে দেখল স্বপ্নাও সেদিকে আসছে। ছেলেটা চলে গেছে।

মাকে দেখতে পেয়ে স্বপ্না কিন্তু চমকাল না কিংবা অবাক হল না। বেশ সপ্রতিভ গলায় বলল, মা তুমি আজ তাড়াতাড়ি ফিরলে যে? বলেছিলে যে দেরি হবে?

বন্দনা বলল, অফিস তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল। সেই শাড়িটাই পরেছিস? কী অসভ্য মেয়ে রে তুই!

স্বপ্না হেসে ফেলে বলল, লোভ সামলাতে পারলাম না।

জন্মদিনের দিন একটা পুরোনো শাড়ি পরিস তা হলে।

এইটাই তো তখনো নতুন থাকবে। দু'দিনে কি কোনো শাড়ি পুরোনো হয়।

বন্দনার খুব ইচ্ছে করছে ওই ছেলেটা কে সেই কথা জানতে। কী নিল সে স্বপ্নার ব্যাগ থেকে। কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা জিজ্ঞেস করতে পারল না। মেয়ে যদি ভাবে মা তার ওপর গোয়েন্দাগিরি করছে!

রাস্তার এপারে এখনো কতকগুলো ছেলে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। সকাল-বিকেল ওরা ঠিক ওই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের কি পায়ে ব্যথাও করে না!

একটা ছেলে শিস দিয়ে উঠল। একজন বিশ্রীভাবে গেয়ে উঠল একটা হিন্দী গানের কলি। বন্দনার মুখটা লাল হয়ে গেল। মেয়ে কী ভাবছে! ছি ছি ছি। এ পাড়ার ছেলেগুলো এত অসভ্য! বন্দনাকে দেখলে দু'বেলাই এ রকম জ্বালাতন করবে। বন্দনা আঁচলটাকে সারা গায়ে চাপা দিল।

এ পাড়ায় মাত্র ময়েক মাস আগে তারা বাড়ি বদল করে এসেছে। এখনো তাদের অনেকেই চেনে না। আগের পাড়ার ছেলেগুলো কক্ষনো এ রকম করত না। বরং বৌদি বলে খুব খাতির করত।

স্বপ্না বলল, এ পাড়াটা একদম ভাল না। আগের পাড়াটা অনেক ভাল ছিল।

বন্দনা বলল, এখানকার বাড়িটা তো ভাল। আগের বাড়ির বাথরুমটা যে এত খারাপ ছিল।

তা হোক, এ পাড়ার ছেলেগুলো বড্ড অসভ্য।

বন্দনা অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকাল। এইটুকু মেয়ে, এর মধ্যেই এসব চিন্তা তার মাথায় ঢুকল কেন?

পরক্ষণেই বন্দনার সারা শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। স্বপ্না তো আর তেমন ছোট নেই। ওর মতন বয়সেই তো বন্দনার সঙ্গে সঞ্জয়ের ভাব হয়েছিল। একটু আগে ছেলেগুলো যে অসভ্য আওয়াজ করে উঠল, সে কি তাহলে স্বপ্নাকে দেখেই! বন্দনা ভেবেছিল...। বন্দনা আর স্বপ্না পাশাপাশি হাঁটলে কিছুতেই মনে হয় না মা আর মেয়ে। মনে হয় দুই বোন। কাল থেকে অফিস যাবার সময় বন্দনা আর হাত কাটা ব্লাউজ পরবে না।

স্বপ্নার জন্মদিনে বিশেষ কারুকে নেমন্তন্ন করা হয় নি। স্বপ্নার পাঁচটি বান্ধবী এসেছিল শুধু। পরিতোষ মেয়ের জন্যে আর একটি নতুন শাড়ি কিনে এনেছে। মেয়ে বাবার বড্ড আদুরে। আগের কেনা শাড়িটা স্বপ্না আগেই পরে ফেলেছে বলে সে বলেছিল, কী দুষ্টু মেয়ে দেখেছ? দুটো শাড়ি আদায় করার মতলব।

বন্দনা বলল, তুমি কিনতে গেলে কেন আর একটা?

পরিতোষ বলল, দ্যাখ না, সামনের বছর ঠিক জন্মদিনের সকালবেলা বেরিয়ে গিয়ে শাড়ি কিনে আনব। তার আগে কিছুতেই আনছি না!

বন্দনা হেসে তবু বলেছিল, আমার জন্মদিনে তো তুমি শাড়ি কিনতেই ভুলে গিয়েছিলে! আর মেয়ের বেলা দু' দুটো!

তোমার কথা আর মেয়ের কথা কি এক হল! ও ছেলেমানুষ, নতুন শাড়ি পরতে শিখেছে, ওর তো শখ বেশি হবেই!

স্বপ্নার বান্ধবীরা চলে গেছে, এবার ওরা নিজেরা খেতে বসবে, এমন সময় বিদ্যুৎ এসে হাজির। যদিও মাথার চুলে সামান্য পাক ধরেছে, তবু একটা জ্বল-জ্বলে হলুদ রঙের শার্ট পরেছে বলে তাকে দেখাচ্ছে খুব সুন্দর।

সে ঢুকেই বলল, পরিতোষ, তোর নাকি শরীরটা খারাপ!

বন্ধুকে দেখে খুশি হয়ে উঠল পরিতোষ! বলল, এসেছিস? তোর তো আজকাল পাত্তাই পাওয়া যায় না। বোস্!

বিদ্যুৎ বন্দনার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, বন্দনার কাছ থেকে তোর খবর পাই মাঝে মাঝে।

বন্দনা বলল, বসুন। এই স্বপ্না তোর বিদ্যুৎকাকাকে প্রণাম কর।

বিদ্যুৎ চমকে উঠে বলল, আরে এ মেয়েটা কে? এই স্বপ্না নাকি! কবে এত বড় হয়ে গেল? এতো দেখছি একেবারে পুরোপুরি একটি লেডি।

স্বপ্না প্রণাম করার জন্যে নিচু হতেই বিদ্যুৎ তার হাত ধরে ফেলে বলল, কেন, প্রণাম করার ঘটা কেন? কি হয়েছে? ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে নাকি?

বন্দনা বললে, আজ ওর জন্মদিন।

পরিতোষ বলল, আজ ও আঠারো বছরে পা দিল।

বিদ্যুৎ বলল, তাই নাকি? তার মানে তোর মেয়ে আজ অ্যাডাল্ট? ইস্, আমার তো কিছু একটা জিনিস নিয়ে আসা উচিত ছিল, জানতাম না।

বন্দনা বলল, আমরা কারুকেই বলি নি। এমনি নিজেদের মধ্যে—

বিদ্যুৎ স্বপ্নার দিকে চেয়ে বলল, ঠিক আছে স্বপ্না, এই উপলক্ষে তোমাকে একদিন আমি ট্রিট করব। তুমি আমার সঙ্গে সিনেমা দেখবে, বাইরে খাবে।

বন্দনা বলল, স্বপ্না, যা তোর কাকাবাবুর জন্যে একটু মিষ্টি নিয়ে আয়।

আমি মিষ্টি-ফিষ্টি খাই না।

একটু পায়েস তো খাবেন!

পায়েস হয়েছে বুঝি! তা খেতে পারি, অনেক দিন খাই নি। ঠাকুর-চাকররা তো পায়েস রান্না করে দেয় না।

পরিতোষ বললে, তুই আর বিয়ে-থা করলিই না তা হলে!

চেয়ারে গ্যাট্ হয়ে বসে বিদ্যুৎ বলল, বেশ আছি ভাই! যাক গে, তোর কী হয়েছে বল্ তো? এত ভুগছিস কেন?

পরিতোষ অসুখের গল্প করতে ভালবাসে। তার পেটের গণ্ডগোলের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে বলল, এ বছরটা এই রকম ভুগতেই হবে, চিকিৎসা করেও লাভ নেই।

কেন ভুগতেই হবে কেন?

কাল একজন খুব ভাল জ্যোতিষীকে আমার কুষ্ঠিটা দেখিয়েছিলাম। শনি এখন বক্রি হয়েছে। বৃহস্পতির ওপর যদি শনি এসে পড়ে—

বিদ্যুৎ হা-হা করে উঁচু গলায় হেসে উঠল।

বন্দনা বলল, আপনি বুঝি এসব বিশ্বাস করেন না?

বিদ্যুৎ বন্দনার কথার উত্তর না দিয়ে পরিতোষের দিকে তাকিয়ে বলল, তুইও শেষে ঠিকুজী কুষ্ঠিতে বিশ্বাস করতে শুরু করলি! এই সব হচ্ছে হেরে যাবার লক্ষণ। বয়েস বাড়লে এ রকম হয়!

পরিতোষ দুর্বলভাবে বলল, আমি ঠিক যে বিশ্বাস করি তা নয়, তবে অনেক সময় এগুলো এমন মিলে যায়।

ওইটাই তো হেরে যাওয়ার লক্ষণ। আজ থেকে অনেক দিন আগে ভেনিসের একজন ডাক্তার বলে দিয়েছিলেন, পেটের ব্যথা-ট্যথা ঠিক পেটের অসুখ নয় মাথার অসুখ। তোর অফিসের গোলমালটা মিটেছে?

কিছুতেই প্রমোশনটা দিল না।

আসলে তো তুই প্রমোশনের ব্যাপারটা জানবার জন্যেই জ্যোতিষের কাছে গিয়েছিলি! মানসিক বার্ধক্যের খাঁটি চিহ্ন।

স্বপ্না পায়েসের থালা এনে বিদ্যুতের পাশে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, সত্যি বাপী, তুমি বড্ড বুড়ো হয়ে যাচ্ছ আজকাল!

বিদ্যুৎ স্বপ্নার কাঁধে হাত রেখে বললে, এই দ্যাখ, ইয়ংগার জেনারেশন—ওসব কিছু বিশ্বাস করে না। ওরা অনেক ফ্রী। বন্দনাকে বলেছিলাম রোজ তোকে একটু করে ব্রান্ডি খাওয়াতে—তাহলে টেনশান অনেক কেটে যেত।

মেয়ের সামনে নিষিদ্ধ পানীয় উল্লেখ করাতে বন্দনা আর পরিতোষ দুজনই অস্বস্তি বোধ করে। দুজনেই মেয়ের দিকে তাকায়।

স্বপ্না বলল, বাপী তাই খাও না! ব্র্যান্ডি তো ডাক্তাররাও খেতে বলে।

চমৎকার মেয়ে? এই কথা বলে বিদ্যুৎ স্বপ্নার কাঁধ ধরে নিজের দিকে একটু টানল। স্বপ্নার পিঠটা ছুঁয়ে রইল বিদ্যুতের বুকে।

বন্দনা সেদিকে আড়চোখে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল।

অফিসের বন্ধ ঘরে বিদ্যুৎ তাকেও ওই রকমভাবে টানতে চেয়েছিল।

তাড়াতাড়ি সে বললে, এই স্বপ্না, পায়েস দিলি, জল দিলি না! যা জল নিয়ে আয়।

স্বপ্না আদুরে গলায় বলল, তুমি একটু এনে দাও!

পরিতোষও প্রশ্রয় দিয়ে বলল, জন্মদিনে তুমি মেয়েটাকে বড্ড খাটাচ্ছ!

বন্দনার হঠাৎ অভিমান হয়ে গেল। সে বুঝি মেয়েকে কম ভালবাসে! পরিতোষ কিছু বোঝে না। সে গজগজ করে বলল, এ সব শিখতে হয়, মিষ্টি দিলে যে সঙ্গে জলও দিতে হয়—

বিদ্যুৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দেখি তুমি কতটা লম্বা হয়েছ?

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে উচ্চতা মাপবার কথা, কিন্তু বিদ্যুৎ স্বপ্নাকে নিয়ে এল নিজের বুকের কাছে। বলল, ইস্, প্রায় আমার চিবুকের সমান, বেশ লম্বা হয়েছ কিন্তু। সেই-দিনও যাকে ফ্রক পরা পুঁচকে মেয়ে দেখেছি আজ সে পুরোপুরি ইয়ং লেডি। পরিতোষ বলল, বিদ্যুৎ তোর যে বয়েস বেড়েছে সেটা কিন্তু বোঝাই যায় না।

বন্দনার কিন্তু পছন্দ হল না এ কথাটা। সে বলল, কেন বোঝা যাবে না, বেশ তো চুল পেকেছে।

চুল পাকলে আর কি হয়! বিদ্যুৎ আমার চেয়ে এক বছরের বড়।

একটু বাদে বিদ্যুৎ স্বপ্নাকে বলল, তাহলে এই কথা রইল, একদিন আমার সঙ্গে সিনেমা ও বাইরে খাওয়া—তোমার জন্মদিন উপলক্ষে তোমার বাবা মাকে নেমন্তন্ন করতে পারি। না-ও পারি।

রাত্তিরবেলা বিছানায় পরিতোষের পাশে শুয়ে বন্দনা বলল, তোমার বন্ধু ওই বিদ্যুৎকে আমার একটুও ভাল লাগে না!

পরিতোষ রীতিমত অবাক হয়ে গেল। কেন, হঠাৎ বিদ্যুৎ কি করল? আগে তো তুমি ওর সঙ্গে খুব গল্প করতে।

আজকাল যেন কেমন কেমন হয়ে গেছে! একটু হালকা ধরনের।

ও একটু ইয়ার্কি ঠাট্টা করতে ভালবাসে। কিন্তু যাই বল, খাঁটি জেন্টলম্যান।

ছাই জেন্টলম্যান! এক একদিন এক একটা মেয়ের সঙ্গে—

তুমি আবার তা দেখলে কী করে?

সবাই তো বলাবলি করে।

এক সময় ওর খুব মেয়েদের সঙ্গে ঝোঁক ছিল বটে। কিন্তু তখনও আমরা জেনেছি ও খাঁটি জেন্টলম্যানের মতন কখনো কোনো মেয়ের ওপর জোর করে নি। কারুকে মিথ্যে কথা বলে ভোলায় নি, অনিচ্ছুক মেয়ের সঙ্গে ও কিছু করে নি।

তুমি দেখছি তোমার বন্ধুর সম্বন্ধে একেবারে গদ্‌গদ।

রাগ করে চুপ করে রইল বন্দনা। পরিতোষ কিছু বোঝে না। বাচ্চা মেয়েদের আবার ইচ্ছে অনিচ্ছে বলে কিছু আছে নাকি? তাদের তো কেউ একবার একটু সুন্দর বললে অমনি গলে যায়।

আদর করার জন্যে পরিতোষ যখন বন্দনার জামার বোতাম খুলতে লাগল তখন বন্দনার মনে পড়ল। কতদিন সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা হয় নি। পরক্ষণেই এজন্য অনুতপ্ত বোধ করল সে। পাশ ফিরে স্বামীকে আবেবের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল।

দিন তিনেক বাদে কলেজ থেকে ফিরে স্বপ্না উত্তেজিতভাবে বলল, মা, আজ বিদ্যুৎ-কাকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল!

বন্দনা সতর্কভাবে বলল, কোথায়? কী করে দেখা হল?

আমরা কলেজ থেকে ডিবেট শুনতে এসেছিলাম, সেখানে গিয়ে দেখি কি, ও মা, বিদ্যুৎকাকা একজন জাজ! উনি নাকি একসময় ভাল ডিবেটার ছিলেন। আচ্ছা মা, বিদ্যুৎ-কাকা খুব ভাল ছাত্র ছিলেন, তাই না?

তা আমি কি করে জানব? তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করিস।

বিদ্যুৎকাকা গাড়িতে করে আমাকে পেঁছে দিলেন, আর পার্ক স্ট্রীটে চাইনীজ খাবার খাওয়ালেন।

বন্দনা ঠিক বুঝেছিল। বিদ্যুৎ শুধু পেঁছে দেয় না কারুকে, মাঝপথে কোন দোকানেও নিয়ে যায়। ও কি স্বপ্নাকেও হাত ধরেছিল? বন্দনা ভাববার চেষ্টা করল, সেই দোকানে কেবিন আছে কিনা। নেই বোধহয়। যাক তবু খানিকটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু গাড়িতে—।

তুই একা ছিলি?

আমাদের ক্লাসের আরও দুটি মেয়ে ছিল।

বন্দনা নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলল। শুধু শুধু বিদ্যুৎকে সে খারাপ ভাবছিল। হাজার হোক মানুষটা দায়িত্বজ্ঞানহীন নয়। একটু আমুদে স্বভাবের এই যা।

মা, বিদ্যুৎকাকার কিন্তু দারুণ ম্যানলি চেহারা।

হুঁ।

কী সুন্দর করে কথা বলতে পারেন। অনেক কিছু জানেন। আমাদের বলছিলেন চার্লস লিন্ডবার্গের কথা। যিনি প্রথম এরোপ্লেনে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন। পরে যখন এরোপ্লেনকে যুদ্ধের কাজে লাগানো হয়, জানো মা, ওই লিন্ডবার্গই তখন তার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন।

আচ্ছা আচ্ছা, যা এখন জামা-কাপড় ছেড়ে নে।

বিদ্যুৎকাকাকে আমি বলেছি, খাওয়াটা তো হল, এখনও কিন্তু সিনেমা দেখানোটা বাকি রইল—

আবার সিনেমায় যাবি?

বাঃ, উনিই তো বলেছিলেন সেদিন। তোমার মনে নেই!

সে তো এমনি কথার কথা।

মোটেই কথার কথা নয়! আমি ছাড়ছি না। বিদ্যুৎকাকা ভুলে গেলেও আমি ঠিক মনে করিয়ে দেব!

বন্দনা একবার ভাবল মেয়েকে ধমক দিয়ে বলে দেবে, না, বিদ্যুৎকাকার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যেতে পাবি না! কিন্তু থেমে গেল। মেয়ে যদি কারণ জিজ্ঞেস করে? সরল মেয়ে, কিছুই বোঝে না। সে কি মেয়ের সামনে বিদ্যুতের নিন্দে করতে পারবে। মেয়ে যদি

আমার পাশের সীটে এসে বসলো একজন বিশাল চেহারার অবাঙালী ভদ্রলোক। ভারী জিনিসের ব্যবসায়ী মনে হয়।

আজ প্লেনটাতে যাত্রী বেশী নেই। কয়েকটি সীট পুরো খালি পড়ে আছে। দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, প্লেনটা দৌড় দেবার আগে দম নিচ্ছে।

দু'জন এয়ার হোস্টেস ঘোরাঘুরি করছে। আমি চোখ দিয়ে ওদের একজনকে অনুসরণ করতে লাগলাম। না, মেয়েটি যে খুকুই তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমার কোনো চেনা মেয়ের পক্ষে এয়ার হোস্টেস হওয়া অসম্ভব কিছু নয়! বস্তুত আমি আরও দু'জন এয়ার হোস্টেসকে চিনি। কিন্তু খুকুকেই যে এখানে এ অবস্থায় দেখবো, তা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। ব্যাপারটা যেন অতি নাটকীয়, বড় বেশী গল্পের মতন—ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।

এখন বুঝতে পারলাম, লাউঞ্জে অপেক্ষা করার সময়, আমি খুকুকে দু' একবার ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। তখন কিছুই মনে হয় নি। এয়ার হোস্টেসদের সাজগোজ আর চাকচিক্যই বেশী চোখে পড়ে। তখন যদি চিনতে পারতাম, তা হলে খুকুর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে পারতাম। বুকের মধ্যে দারুণ কৌতূহল ছটফট করছে। যেন একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী অর্ধেকটা পড়ার পর বইখানা হারিয়ে গিয়েছিল, আজ আবার সেটা ফিরে এসেছে হাতে। কিন্তু খুকু কি আমার সঙ্গে কথা বলার সময় পাবে? বিমানের মধ্যে কি কোনো যাত্রীর সঙ্গে ওদের গল্প করার নিয়ম আছে?

প্লেন আকাশে উড়তেই আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ যে বাড়ি-ঘর মানুষ-জন একটু একটু করে ছোট হয়ে আসে, এই দৃশ্যটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। এই জন্যই জানলার পাশে জায়গা না পেলে রাগ ধরে।

সীট বেল্ট খোলার অনুমতি পেয়ে সিগারেট ধরালাম। খুকু আরও দু'একবার চলে গেল আমার কাছ দিয়ে, আমার দিকে আর তাকাচ্ছেই না। এখন কাজের সময়—এখন তো সব ওদের গল্প করবার কথা নয়।

এবার হোস্টেস' দু'জনই লজেন্সের ট্রে নিয়ে বিলি করছে। আশ্চর্যের ব্যাপার খুকু আমাকে দিতে এল না, এল অন্য মেয়েটি। খুকু কি এখন ইচ্ছে করে আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে? তা হলে হঠাৎ আমার নাম ধরে ডাকলো কেন! ও যদি আমার নাম না বলতো, তা হলে হয়তো আমি ওকে চিনতামই না। বড় জোর আমি মনে করতাম, খুকুর সঙ্গে মেয়েটির চেহারার মিল আছে।

এবার ওরা চা কফি দিচ্ছে। খুকু জানে, আমি চা খেতে কত ভালোবাসি। ছাত্র বয়সে সারা দিনে অন্তত দশ-বারো কাপ চা খেতাম। এখনো সে নেশা যায় নি। খুকুর কি মনে আছে সে কথা? অনেক সময় খুকুই আমার জন্য চা পৌঁছে আনতো তিনতলা থেকে। আমাদের ফ্ল্যাট বাড়ির যে কোনো ফ্ল্যাটে চা হলেই সে জানে আমার জন্যও এক কাপ বেশী জল নেওয়া হতো। একদিন দুপুর দুটোর সময় এক কাপ চা এনে খুকু বলেছিল, 'ভাগ্যিস একতলার ফ্ল্যাটে গেস্ট এসেছে, তাই তুমি এখন চা পেলে সুনীলদা।' খুকুর কি মনে আছে? এবারেও অন্য মেয়েটিই আমাকে জিজ্ঞেস করতে এল, আমি চা না কফি খাবো। আমার পাশের লোকটি চা চাইলেন বলেই আমি ইচ্ছে করেই বললাম, কফি।

পাশের লোকটি চা পেয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। আমার কফি আর আসেই না। আমার আসনটা প্লেনের প্রায় লেজের দিকে। সেই জন্যই বোধহয় আসতে দেরি হচ্ছে।

পাশের লোকটি একবার উঠে গেলেন। বোধহয় বাথরুম! একটু বাদে পেছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সেই লোকটির সঙ্গে খুকু কথা বলছে। খুকু কি এই লোকটিকে চেনে নাকি! কি ব্যাপার রে বাবা!

আমি আবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। এখন আর কিছুই দেখা যায় না। শুধু মেঘের খেলা। মেঘ বলেও ঠিক চেনা যায় না। মনে হয় যেন একটা সাদা বরফের দেশ। তার ওপর এসে পড়েছে শেষ সূর্যের আলো। হঠাৎ চমকে উঠলাম। কে যেন বললো, 'এই নিন, আপনার কফি নিন।'

দেখলাম দুটো কাগজের গেলাসে কফি নিয়ে খুকু দাঁড়িয়ে আছে! কফির গন্ধের চেয়েও

বেশী পাচ্ছি তার গায়ের মিষ্টি সেন্টের গন্ধ।

মুচকি হেসে খুকু জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি বুঝি আজকাল কফি খেতে ভালোবাসেন? চায়ের নেশা চলে গেছে?'

তা হলে মনে আছে খুকুর। একটু আনন্দ হলো। খুবই সামান্য ব্যাপার—তবু কেউ আমার পুরোনো দিনের কোনো কথা মনে রেখেছে, এটা জানলেই এ রকম আনন্দ হয়। কারণ আমি তো অন্য কারুরই পুরনো দিনের কথা ভুলি না। আমার দুঃখই এই, আমি কিছুই ভুলি না। এমন অনেক কিছুই থাকে যা ভুলে যাওয়াই ভালো! খুকুর পুরনো দিনের কথা যদি ভুলতে পারতাম, তা হলে ওর সঙ্গে কথা অনেক সহজ হতো।

আমার হাতে একটি গেলাস দিয়ে খুকু বললো, 'সুনীলদা, আপনার পাশে বসবো?'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বসে পড়লো ঝপাৎ করে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে যে ভদ্রলোক ছিলেন—'

দুষ্টু হেসে খুকু উত্তর দিল, 'তাকে আর একটা জায়গায় বসিয়ে দিয়েছি জানলার ধারে।'

আমি কফিতে চুমুক দিলাম। পরের কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা খুঁজে পেলাম না।

খুকু জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি আমাকে দেখে একটু অবাক হয়ে যান নি।'

—'একটু নয়, খুব!'

—'আগরতলা কেন যাচ্ছেন?'

—'একটা কাজে!'

—'ক'দিন থাকবেন?'

—'চার পাঁচদিন।'

—'আমিও থাকবো, এক সপ্তাহ।'

—'তোমাদের পরের ফ্লাইটেই ফিরে আসতে হয় না?'

—'আমি ছুটি নিয়েছি।'

—'খুকু, তুমি কতদিন এই চাকরিতে ঢুকেছো?'

খুকু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললো, 'চুপ, আমাকে খুকু খুকু বলবেন না। আমার নাম বাসবী চৌধুরী।'

—'এরকম সিনেমা অ্যাকট্রেসের মতন নাম আবার তোমার কবে থেকে হলো?'

—'সত্যিই আমার ভালো নাম বাসবী। অনেকে অবশ্য আমাকে জয়শ্রী বলেও ডাকতো!'

আমি ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস লুকোলাম। ওর জয়শ্রী নামটা আমি আগে শুনেছি। অবনীও ওকে ডাকতো ওই নামেই। আমরা অবশ্য খুকুই বলতাম।

যখন ওকে প্রথম দেখি, তখন ও ফ্রক পরতো, ক্লাস নাইনের ছাত্রী। থাকতো আমাদেরই পাড়ায়। বয়েসের তুলনায় চেহারাটা বেশ বড়, তখন থেকেই পাড়ার ছেলেদের নজরে পড়ে গেছে।

অত্যন্ত একটা টাইট ফ্রক, কাঁধের কাছটা ছেঁড়া জায়গাটা ডান হাতে চেপে ধরে খুকু আমাদের বাড়ির সামনের মাঠটা দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে আসছে—এই দৃশ্যটা আমার চোখে ভাসে।

খুকুরা থাকতো অন্য বাড়িতে। ওদের অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। আমাদের বিশাল ফ্ল্যাট বাড়িতে অনেক লোকজন। এরই একটা ফ্ল্যাটে এক সময় খুকুর এক দূর সম্পর্কের কাকা থাকতেন। সেই সূত্রে খুকু আসতো। তারপর খুকুর কাকারা উঠে চলে গেলেন, কিন্তু ততদিনে প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটের লোকজনের সঙ্গে খুকুর চেনা হয়ে গেছে—এবং সকলের সঙ্গে সে দাদা-কাকা, মাসীপিসীর সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। সব ঘরের দরজাই তার জন্য অবারিত।

পাশ ফিরে খুকুর দিকে ভালো করে তাকালাম। সেই খুকু এখন বাসবী চৌধুরী। ফিটফাট সেজেগুজে আছে। ঝরঝর করে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। মাত্র ছ' সাত বছরের ব্যবধান। এর মধ্যেই কত রকম কান্ড ঘটে গেছে এই মেয়েটিকে নিয়ে।

...খুকু বললো, 'এক বছর দু'মাস হলো এই চাকরিতে ঢুকেছি—এবার ছেড়ে দেবো ভেবেছি।'
ঘটনা—'সে কি? কেন?'
—'আর ভাল লাগছে না। এর মধ্যেই একঘেয়ে হয়ে গেছে।'
...—'এরপর কি করবে?'
...—'কি জানি!'
...বলেই খুকু আবার সরলভাবে বসলো। এটাই খুকুর খাঁটি স্বভাব। পরের দিন যে ও কি করবে, তা ও নিজেই জানে না!

খুকু ছিল যাকে বলে পাড়া-বেড়ানি মেয়ে। সব সময় এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়াতো। আমাদের বাড়ির কেউ খুকুকে বিশেষ পছন্দ করতো না। খুকু কখনো আমার ঘরে ঢুকে আমার সঙ্গে গল্প করতে বসলে গুরুজনরা ওকে ডেকে সরিয়ে নিতেন।

খুকু অনেক সময় দুমদাম কথা বলে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দিত অনেককে। আমাদের রান্নাঘরে দেশলাই ফুরিয়ে গেছে, উনুন ধরানো যাচ্ছে না, খুকু অমনি ফস্ করে বলে ফেলতো, 'মাসীমা, সুনীলদার কাছেই তো দেশলাই আছে।' তখন আমি লুকিয়ে চুরিয়ে সিগারেট খাই, বাড়ির লোক কেউ জানে না, সেই সময়ে পকেটে দেশলাই থাকার কথা কেউ বলে দেয়! আমি খুকুকে পরে এজন্য বকুনি দিতে যেতেই ও বলেছিল, 'বাঃ মাসীমা তো আগেই একদিন দেখে ফেলেছেন যে আপনি সিগারেট খান। তা হলে আর দোষ কি!'

পাড়ার মধ্যে কার সঙ্গে কার ভাব, কার সঙ্গে ঝগড়া, কে কার সঙ্গে গোপনে সিনেমায় যায়—এ সবও খুকু জানতো। তাই সবাই ভয়ে ভয়ে থাকতো, খুকু কখন কার সামনে কি বলে ফেলে! খুকু কিন্তু কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে কারুর গোপন কথা কখনো ফাঁস করে দেয় নি। অন্যদের তুলনায় ওর সরলতা ছিল বেশী। ভালো মন্দের ব্যবধানটাও ঠিক বুঝতো না। গুরুজনেরা যারা এক সময় খুকুকে ভালবাসতেন, বড় হয়ে ওঠার পর তাঁরাও খুকুকে অপছন্দ করতে শুরু করলেন।

খুকুর উদ্ধত স্বাস্থ্য, সেটা ওর দোষ। তা ছাড়া ও পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারতে শুরু করেছে। তা ছাড়া ও নাকি চোর। প্রায়ই একখানা দুখানা বই না বলে নিয়ে চলে যায়। আমার দু'একটা বই কখনো কখনো অদৃশ্য হয়ে গেলেও আমি ওকে কখনো সন্দেহ করি নি।

খুকুর স্বভাবটা ছটফটে হলেও বুদ্ধিটা খুব তীক্ষ্ণ। স্কুলে পড়াশুনোয় ভালো ছিল। ওদের পরিবারটা সম্মানিত হলেও হঠাৎ ভাঙন ধরেছিল। ওর বাবা মারা যান সামান্য অসুখে, এক দাদা আমেরিকায়—বাড়ির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখে না—দিদি চাকরি করে আর খুব প্রেম করছে একজনের সঙ্গে। শিগগিরই বিয়ে হবে—একটি ছোট ভাই অনেকটা জড়ভরত ধরনের।

ক্লাস টেনে উঠে খুকুও রীতিমত প্রেম করে বেড়াতে লাগলো। তার নিন্দেয় কান পাতা যায় না। অথচ, মাঝে মধ্যে যখন আমাদের বাড়িতে আসে তখনও সেই রকম সরল মুখ, বই পড়ার দারুণ আগ্রহ। কথা বলতে ভালো লাগে মেয়েটির সঙ্গে।

অন্যরা যাকে প্রেম কিংবা অসভ্যতা ভাবে, সেটা খুকুর ক্ষেত্রে ছিল সহজ মেলামেশা। গলির মোড়ে সদ্য-যুবারা আড্ডা মারে। মেয়েরা যখন সেখান দিয়ে যায়, মুখ নিচু করে থাকে, কারুর সঙ্গে একটিও কথা বলে না,—যেন কোনাক্রমে সেই জায়গাটা পার হয়ে যেতে পারলেই হলো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের কথা বলার নিয়ম নেই। একমাত্র খুকুই সেখানে দাঁড়িয়ে পড়তো। ছেলেদের নাম ধরে ডেকে কথা বলতো। অনেক ছেলেই তার বাল্যকালের খেলার সাথী, তারা বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই খুকু তাদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে নি। তাদের সঙ্গে সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করেছে। ক্লাব ঘরে গিয়ে ক্যারাম খেলেছে। কি জানি, সিনেমাতেও যেত কিনা ওদের সঙ্গে! মেয়ে হয়েও সে ছেলেদের সঙ্গে সমান সমানভাবে মিশতে চেয়েছিল। গুরুজনদের চোখে সেটাই অন্যায়।

আমাদের বাড়িতেই ছাদের একখানা ঘর নিয়ে থাকতো দুই ভাই, অবনী আর সুবীর। মফঃস্বলের গরীব ঘরের ছেলে, কলকাতায় থেকে পড়াশুনো করছে। খুব কষ্ট করে থাকতো

ওরা। দুটি ছেলেই চমৎকার খানিকটা আদর্শবাদী ধরনের। অবনী সদ্য বি এস পরীক্ষা দিয়েছে, তখনও রেজাল্ট বেরোয় নি, এরই মধ্যে নিজে কি একটা ছোটখা ব্যবসা শুরু করেছে। ছোটভাই সুবীর তখনো কলেজে পড়ছে। ওরা দু' ভাই নিজে রান্না করে খায়।

খুকু কখনো কখনো ওদের ঘরেও যেত গল্প করতে। ওদের চা বানিয়ে দিত কি রান্নায় সাহায্য করতো। শুধু ব্যাচিলরের ঘরে কোনো মেয়ের যাওয়া আসায় পাড়ার লোকদের আরও চোখ টাটায়। সুনীতি রক্ষার নামে আসলে সেটা হিংসে।

একদিন শুনলাম, পাড়ার কয়েকটা ছেলের সঙ্গে অবনী খুব ঝগড়া করেছে। অবনী ঠান্ডা স্বভাবের ছেলে, পাড়ার মাস্তানদের ঘাঁটাঘাঁটি করা তাকে মানায় না। কিন্তু ব্যাপারটায় নাকি খুকু জড়িত।

দেশের অবস্থা সেই সময় বদলে গিয়েছিল অনেকটা। আগে যাদের বলা হতো পাড়ার ছেলে, তাদেরই নাম হলো পাড়ার মাস্তান। তারা কেউ হাতে লোহার বালা পরে, কেউ দাড়ি রাখে। গলার আওয়াজও হঠাৎ কর্কশ হয়ে গেছে। কিংবা ইচ্ছে করেই কর্কশভাবে কথা বলে। তাদের রীতিমতন সমীহ করে চলতে হয়, তারা কাউকে অপমান করছে দেখলেও প্রতিবাদ করা যায় না। ভদ্রলোকেরা সবাই তখন এই নীতি নিয়েছে যে মাস্তানদের ঘাঁটাতে নেই।

খুকু কিন্তু তখনো মেলামেশা ছাড়ে নি ওদের সঙ্গে। সেই রকমই হেসে হেসে গল্প করে। আবার কখনো ওদের ধমকাতেও দেখেছি। মাস্তানদের সঙ্গে খুকুর এই ভাব বাখাটা অবনী সহ্য করতে পারে নি। খুকুদের বাড়িতে শক্ত কোনো অভিভাবক নেই। তার মা নিরীহ মানুষ—সেখানে অবনীই হয়ে উঠলো অভিভাবকের মতন। মাস্তানরা এই নিয়ে আওয়াজ দেওয়া শুরু করলো অবনীকে।

তার কয়েকদিন বাদে শুনলাম, অবনী আর সুবীর খুকুদের বাড়িতেই খাবার ব্যবস্থা করেছে। বদলে টাকা দেয়। এর ফলে ওদের আর হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেতে হবে না, খুকুদেরও খানিকটা সাহায্য হবে। সেই সঙ্গে অবনী খুকুকে পড়াতে শুরু করেছে—সামনেই স্কুল ফাইন্যাল, সে যাতে ভালো রেজাল্ট করতে পারে—

কফি খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, খুকু আমার হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর বললো, 'আগরতলায় আপনি কোথায় থাকবেন?'

—'সার্কিট হাউসে।'

—'আমি দেখা করবো আপনার সঙ্গে।'

—'নিশ্চয়ই এসো—'

—'আপনি আমাকে দেখে রাগ করেন নি?'

খুকু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো এই কথাটা। আমিও হাসিমুখে বললাম, 'না!'

—'আমি এখন যাচ্ছি। যদি পারি তো আবার আসবো—'

খুকুর চলে যাওয়ার দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। কেন বললাম 'না'। ওর ওপরে দারুণ রাগ করাই তো উচিত!

খুব মনে পড়ছে অবনী আর সুবীরের কথা। একটা সামান্য মেয়ের জন্য ওদের জীবন কী ছন্নছাড়া হয়ে গেল। অথচ খুকুর মুখে সামান্য গ্লানির চিহ্নও নেই।

অবনী দারুণ যত্ন করে পড়াচ্ছিল খুকুকে। তার মনোভাবটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে খুকু যাতে উচ্ছন্নে না যায়, সেদিকে তার ছিল সজাগ দৃষ্টি। খুকুকে সে লেখাপড়া শিখিয়ে তৈরি করে নিচ্ছিল, তারপর সময় মতন বিয়ের প্রস্তাব করবে।

সুবীর ছিল খুবই লাজুক। তার মনের কথা কেউ জানতে পারে নি।

খুকু আমার কাছে আসতো গল্পের বই নিতে। যতক্ষণ থাকতো গলগল করে অনেক কথা বলে যেত। তখন তার বেশীর ভাগ গল্পই অবনী আর সুবীর সম্পর্কে। দুজনকে নিয়েই সে মজা করতো সব সময়—ওদের চায়ে নুন মিশিয়ে দিত, সুবীরের অঙ্কের খাতার মলাট বদলে জব্দ করেছিল। এই সব বলতে বলতে খুকু ঝরঝর করে হাসতো। শুধু সেই

নর্মল হাসিটুকুর জন্যই ওর ওপর রাগ করা যেত না।

পরীক্ষার মাত্র এক মাস আগে খুকু সেই সাংঘাতিক কাণ্ডটা করলো। এখনো সেই ঘটনাটা অবিশ্বাস্য মনে হয়।

তার মাত্র কয়েকদিন আগে আমাদের পাড়ার বিমানদার বিয়ে হয়েছে খুব ধুমধামের সঙ্গে। বিমানদার স্ত্রী আরতি দেখতেও যেমন সুন্দরী, স্বভাবটিও সেই রকম নম্র।

বিয়ে উপলক্ষে খুকু কয়েকদিন সারাক্ষণই প্রায় রয়ে গেল বিমানদার বাড়িতে। সবরকম কাজে সাহায্য করতেও সে ওস্তাদ। আরতি বৌদির সঙ্গেও তার ভাব হয়ে গেল খুব। বিমানদার আর কোনো ভাই বোন ছিল না, খুকুই যেন হয়ে গেল আরতি বৌদির ননদ।

বিমানদা অফিস যাবার পর নতুন বৌ বাড়িতে একা থাকে, তাই খুকুই হয়ে গেল তার প্রত্যেক দিনের সঙ্গী। সকালবেলা অবনীর কাছে পড়াশুনো সেরে নিয়েই খুকু চলে আসতো আরতি বৌদির কাছে। আরতি বৌদি প্রায়ই তাকে খাওয়ান। এমন কি আরতি বৌদি তাঁর বাড়িতেও খুকুকে নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে করে। উনি ওকে খুবই ভালোবেসে ফেলেছিলেন।

একদিন দুপুরবেলা আরতি বৌদি শখ করে খুকুকে তার নতুন একটা বেনারসী শাড়ি পরিয়ে দিয়েছেন। তারপর বললেন, 'তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই! দাঁড়াও একটু স্নো আর পাউডার মাখিয়ে দিই।'

সেজেগুজে ফুটফুটে হয়ে উঠলো খুকু। আরতি বৌদির তাতেও তৃপ্তি হলো না। নিজের গয়নাগুলোও সব পরিয়ে দিলেন খুকুকে। তারপর তাকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'দেখাচ্ছে ঠিক যেন রাজকন্যা—ইস!, তোমার দাদা বাড়িতে থাকলে এই সময় তোমার যদি একটা ছবি তুলে রাখা যেত!'

আয়নার সামনে খুকু অনেকক্ষণ নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। এত ভালো শাড়ি তো বেচারী কখনো পরে নি। এরকম গয়নাও পরে নি। ওর চেহারাটা সুন্দর, ফুটফুটে মুখ—সাজগোজ করলে ওকে তো ভালো দেখাবেই।

খুকু বললো, 'বৌদি, আমার মাকে একটু দেখিয়ে আসবো?'

আরতি বৌদি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বললেন, 'যাও না, দেখিয়ে এসো না—।'

এক পাড়ার মধ্যেই বাড়ি। দুপুরবেলা, ভয়ের কোনো কারণ নেই। খুকু ছুটে বেরিয়ে গেল।

সেই যে গেল, আর ফিরলো না।

আরতি বৌদি বিকেলবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, কারুকে কিছু বললেন না। তারপর বিমানদা বাড়ি ফিরলে শুধু বললেন খুকুদের বাড়িতে একবার খোঁজ নিতে।

খুকুর মা আকাশ থেকে পড়লেন। খুকু দুপুরের পর একবারও বাড়িতে আসে নি। পাড়ার মধ্যেও কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি। চতুর্দিকে খোঁজাখুঁজি হলো। খবর নেওয়া হলো বিভিন্ন হাসপাতালে এবং থানায়। কোথাও নেই, খুকু যেন সম্পূর্ণ উপে গেছে।

ব্যাপারটা প্রথম বিশ্বাসই করা যায় নি। দিন দুপুরে একটা জলজ্যান্ত মেয়ে কি করে উধাও হয়ে যাবে? তার গায়ে অত গয়না ছিল বলে প্রথমেই মনে আসে যে কেউ হয়তো তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু তা-ই বা কি করে হয়? বিমানদার বাড়ি থেকে খুকুদের বাড়ি মাত্র কুড়ি পঁচিশ খানা বাড়ি পরেই। পাড়ার মধ্য দিয়ে সোজা রাস্তা। সেখান থেকে কে তাকে ধরে নিয়ে যাবে?

তখন স্বভাবতই মনে আসে, খুকু সোজা তার মায়ের কাছে না এসে অন্য কোথাও গিয়েছিল। চেয়েছিল তার কাউকে তার শাড়ি গয়না পরা চেহারা দেখাতে। কাকে? অবনীকে? কিন্তু আমাদের ফ্ল্যাট বাড়িতেও সে আসে নি। দুপুরবেলা অবনী বা সুবীর কেউ বাড়িতে থাকে না। তাহলে কি খুকু নিজের ইচ্ছেয় চলে গেছে? আরতি বৌদির গয়না নিয়ে? তখন ওর বয়েস কতই বা, বড় জোর আঠেরো উনিশ। সেই বয়েসের একটি মেয়ের এ রকম ডাকাতে বুদ্ধি হবে, বিশ্বাস করা যায় না, কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না!

সেই সময় দেখেছিলাম আরতি বৌদির মহত্ত্ব। উনি দিনের পর দিন সান্ত্বনা দিতে যেতেন খুকুর মাকে। তিনি বলতেন, 'শাড়ি-গয়না গেছে যাক্, সে এমন কিছু না—শুধু

খুকু ফিরে এলেই হয়।'

খুকুর মায়ের চোখ থেকে অনবরত জলের ধারা গড়াতো। এই দুঃসময়ে বিধবাকে সাহায্য করারও কেউ ছিল না।

দারুণ আঘাত পেয়েছিল অবনী। যেন তার সমস্ত স্বপ্ন তছনছ করে দিয়ে গেছে ওই একটি মেয়ে। অবনীর মুখের চেহারাটাই বদলে গিয়েছিল, সব সময়ে ফ্যাকাসে একটা ভাব। যেন তার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। ছোট ভাই সুবীর এমনিতে চুপচাপ, সে এ ব্যাপারেও কোনো কথা বলে নি, আরও যেন চুপচাপ হয়ে গেল এবং অল্পদিন পরেই অসুখে পড়লো।

খুকুকে ফিরে পাওয়ার আশা যখন সবাই মোটামুটি ছেড়ে দিয়েছে, সেই সময়, প্রায় মাস দেড়েক পরে, খুকুর চিঠি এল কাশী থেকে। খুকু তার মাকে লিখেছে যে গোবিন্দ নামে একটি ছেলে তাকে বিয়ে করতে চায়। গোবিন্দ জাতে তিলি—সেইজন্য এই বিয়েতে তার মায়ের আপত্তি আছে কিনা!

এত কাণ্ডের পর শুধু জাত বিষয়ে মায়ের আপত্তি আছে কিনা এইটাই যেন বড় ব্যাপার! খুকু আরও লিখেছে যে গোবিন্দ খুব ভালো ছেলে এবং সে বলেছে পরে চাকরি করে সে আরতি বৌদির গয়নাগুলো ফিরিয়ে দেবে।

চিঠি পেয়ে খুকুর মা-ই শুধু কাঁদলেন, আর সবাই রাগে ফুঁসে উঠলো। সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন শাস্তি দিতেই হবে। বয়েসের দিক থেকে খুকু তখনও নাবালিকা, সুতরাং পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাকে জোর করে ফিরিয়ে আনা যাবে।

পাড়ায় ছেলেদের কাছ থেকে সন্ধান পাওয়া গেল, গোবিন্দ অন্য পাড়ার একজন মাস্তান। খুকুর সঙ্গে সঙ্গে সেও উধাও হয়ে গেছে ঠিকই, তবে যোগাযোগটা এতদিন বোঝা যায় নি।

একমাত্র আরতি বৌদিই পুলিশে খবর দেবার বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল পুলিশ দিয়ে জোর করে ধরে আনতে গেলে খুকুর জীবনটাই বোধহয় নষ্ট হয়ে যাবে। বিশেষত গয়না-চুরির অপবাদ তিনি কিছুতেই খুকুর নামে দিতে চান না। তিনি সবাইকে বললেন, ওই সব গয়না তিনি ইচ্ছে করে খুকুকে দিয়ে দিয়েছিলেন। খুকু যদি গোবিন্দকে বিয়ে করে সুখী হতে পারে, তবে তাই হোক। তিনি আশীর্বাদ করবেন।

তবু পুলিশে খবর গেল। এবং পুলিশ কিছু করার আগেই অবনী ঠিক করলো সে তক্ষুনি কাশী চলে যাবে। এখন আবার মুখ চোখের চেহারা বদলে গেছে তার; এখন মুখে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, খুকুকে সে ফিরিয়ে আনবেই।

ট্রেন ধরার জন্য একটা সুটকেস হাতে নিয়ে সন্ধেবেলা অবনী বেরুতে যাচ্ছে, সেই সময় আর একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। অসুস্থ অবস্থাতেই সুবীর দাদার পেছনে পেছনে দৌড়ে আসছে আর সুটকেসটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে। পাগলের মত সে চেঁচিয়ে বলছে 'না দাদা, তুমি যাবে না, কিছুতেই যাবে না! ও আমাদের কেউ নয়। ওর জন্য তুমি যাবে না!'

অবনী ধমকে বললো, 'তুই চুপ কর। আমি কি করবো না করবো, তা তুই আমাকে শেখাবি?'

সুবীর বললো, 'তোমার লজ্জা করে না? তুমি একটা নষ্ট মেয়ের জন্য ছুটে যাচ্ছো?'

অবনী এক চড় মারলো তার ভাইকে।

চড় খেয়ে সুবীর একটুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে অবনীর হাত থেকে সুটকেসটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললো, 'না, তুমি যাবে না, কিছুতেই যাবে না—'

অবনী এক একবার ছোট ভাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে খানিকটা এগিয়ে যাচ্ছে আবার সুবীর দৌড়ে গিয়ে তার পথ আটকাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত রাস্তার মোড়ে দুই ভাইয়ে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল—একটা ট্যাক্সি দেখে তাতে এক সময় উঠে পড়লো অবনী।

সেইদিনই ভোর রাত্রে আত্মহত্যা করলো সুবীর।

ছাদের ঘরে একলা একলা শুয়ে থেকে কোন্ যাতনা তার মনে ছিল কেউ জানে না।

দাদার সঙ্গে ঝগড়া করার গ্লানি হয়তো সে সহ্য করতে পারে নি। কিংবা হয়তো গোপনে গোপনে সে খুকুকে তার দাদার চেয়েও বেশী ভালোবাসতো। খুকু ওরকমভাবে চলে যাওয়ায় সে-ই আঘাত পেয়েছিল বেশী। ভোর রাত্রে সে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ে।

খুকুর জন্য অনেকগুলি মানুষের জীবন বদলে গেছে। সেই খুকু এখন সেজেগুজে কি রকম ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিমানের মধ্যে। সম্পূর্ণ অনাবিল মুখ।

অবণী কাশী থেকে ফিরে এসেছিল তিনদিন পরেই। খুকু তার সঙ্গে আসে নি। একদিন একটুক্ষণের জন্য তার সঙ্গে খুকুর দেখা হয়েছিল—তারপরই তারা অন্য কোথাও চলে যায়। অবনী যখন ফিরে এল, তখন সে একটি সম্পূর্ণ পরাজিত মানুষ। তার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ তক্ষুণি তাকে জানাতে কেউ সাহস পায় নি।

এর অল্পদিন পরেই খুকুর মায়েরা চলে যায় আমাদেব পাড়া থেকে। অবনীও ফিরে যায় তার দেশের বাড়িতে। এত কান্ড করাব পরও আরতি বৌদি এবং পাড়ার অন্য দু' একটি মহিলা কখনো বলে ফেলেছেন, যাই বলো মেয়েটা কিন্তু এমনিতে বেশ ভালো ছিল। এত সবল মন, অথচ কেন যে এরকম একটা ব্যাপার করলো!

লোকের মুখে টুকরো টুকরো ভাবে আমি শুনেছিলাম খুকু ঠিক নিজের ইচ্ছেয় পালিয়ে যায় নি। আরতি বৌদির বাড়ি থেকে বেরুবার পর কোনো একটি ছেলে তাকে সিনেমা দেখাবার প্রস্তাব দেয়। খুকু লুকিয়ে লুকিয়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে সিনেমা দেখতো। তার বাড়িতে তো এমন কেউ ছিল না যে তাকে সিনেমা দেখাবে। তার দিদি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতো সব সময়।

আসলে অত দামী দামী শাড়ি-গয়না পরে মাথা ঘুরে গিয়েছিল খুকুর। মেয়েদের এরকম হয়। সে চেয়েছিল যতক্ষণ বেশী সম্ভব ওগুলো পরে থাকতে। সে জানতো, মাকে দেখাতে গেলেই তো মা বলবেন, যা, যা, এক্ষুনি ফেরত দিয়ে আয়। তাই সে চেয়েছিল ওইগুলো পরে কিছুক্ষণ বেড়াবে, রাস্তায় ঘুরবে। সিনেমাতে যাওয়াও তো সেই জন্যই—লোকে তাকে দেখবে।

সিনেমা দেখার 'পর হোটেলে খাওয়াবার নাম করে কয়েকটি ছেলে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। মোট চারটি ছেলে। তারপর গয়না বিক্রি করে নানান জায়গা ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত কাশীতে। প্রথম যে ছেলেটি সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে হটিয়ে দিয়ে খুকুর অধিকার নিয়ে নেয় গোবিন্দ। সেই গোবিন্দর সঙ্গেও খুকুর বিয়ে হয় নি শেষপর্যন্ত—এলাহাবাদের রাস্তায় হঠাৎ সে মারামারি বাধিয়ে দু'তিনটে লোকের মাথা ফাটায় এবং নিজেও আহত হয়। পুলিশ তাকে ধরে চালান করে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। খুকু তখন একা ছিল। বছর খানেক পরে খুকুকে নাকি কলকাতায় দেখা গেছে আবার। আমি আর দেখি নি।

সেখান থেকে খুকু কোথায় গেল তা আমি আব জানি না। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, খুকু ক্রমশই অন্ধকার জগতে চলে যাবে। ওদিকে যারা একবার যায়, তাদের তো ফেরার রাস্তা থাকে না। কিন্তু খুকু আবার একটা পদ্মফুলের মতন ফুটে উঠেছে। চাকরি পেয়েছে যখন, নিশ্চয়ই পড়াশুনো করেছে কিছুটা অন্তত। মুখে কোনো রকম পুরনো গ্লানির চিহ্ন নেই। ও কি ফিরে গেছে ওর মায়ের কাছে? আরতি বৌদির সঙ্গে আর কখনো দেখা করেছে? কিছুই জানি না। কৌতূহল হচ্ছে খুব, কিন্তু এখন তো ডেকে জিজ্ঞেস করা যায় না। বিমানদা আর আরতি বৌদি এখন বোম্বেতে থাকেন। অবনী কোথায় আছে, খবর রাখি না।

আগরতলা এসে গেছে, সীট বেল্ট বেঁধে নেবার সংকেত জ্বলে উঠেছে। খুকু এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। আমি ওর সিঁথির দিকে তাকালাম। সিঁদুরের চিহ্ন থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বিবাহিতা মেয়েরা বোধহয় এয়ার হোস্টেস হতে পারে না।

আমি মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'অবনীকে মনে আছে?'

খুকু হাসতে হাসতে বললো, 'হ্যাঁ, বাঃ মনে থাকবে না কেন? জানেন না, অবনীদা তো বিয়ে করেছেন ওঁরই এক প্রফেসারের মেয়েকে। ইলেকট্রিক্যাল গুড্‌সের ব্যবসা করছেন এখন, বেশ ভালো অবস্থা!'

—'তোমার সঙ্গে আর দেখা হয়েছে?'

—'হ্যাঁ, দু'একবার দেখা হয়েছে। ওঁর বিয়েতে তো নেমন্তন্নও খেতে গিয়েছিলাম!'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাঝখানের ঘটনাগুলো কি তাহলে স্বপ্ন? গয়না চুরি, ইলোপমেন্ট, আত্মহত্যা—এতগুলো রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেছে, অথচ খুকুর মনে তার কোনো দাগই নেই? সে এমনভাবে কথা বলছে যেন তার সুদিনেই ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। সবকিছুই এমন স্বাভাবিক। শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিল, ওর ওপর আমার রাগ আছে কিনা! অবনীকে সেই সময় দেখে মনে হয়েছিল, সে আর জীবনে কখনো উঠে দাঁড়াতে পারবে না। জীবন এরকমভাবে বদলে যায়? বেচারা সুবীর! সে-ই শুধু হেরে গেল।

যাবার আগে খুকু বলে গেল, 'আপনার সঙ্গে সার্কিট হাউসে দেখা করবো কিন্তু!'

আগরতলায় আমি তিন চারদিন ছিলাম। এর মধ্যে খুকু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে নি। নিশ্চয়ই সময় পায় নি। সে যে খুবই ব্যস্ত, আমি তা বুঝেছিলাম। দূর থেকে তাকে একদিন দেখেছিলাম সন্ধেবেলা রাজবাড়ির সামনের রাস্তায়, তার সঙ্গে আরও তিন জন যুবক। খুকু হাসি মুখে হাত-পা নেড়ে তাদের কি যেন বলছে, তারা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। খুব সাজগোজ করে থাকলেও তার মুখখানা সরল ছেলেমানুষীতে ভরা। আর যুবক তিনটির মুখ দেখলে মনে হয়, তারা তিনজনেই খুকুকে যেন দেবীর মতন পুজো করতে প্রস্তুত।

তিনজন কেন একসঙ্গে? কোনো একজন পুরুষকে স্থিরভাবে ভালোবাসার ক্ষমতাই বোধহয় নেই খুকুর। কিংবা ও এখনো ভালোবাসতেই শেখে নি। ওর মনটা ঝরনার জলের মতন, কোনো আবিলতা নেই। কিংবা রাজহংসীর মতন যেকোনো জলের ওপর দিয়ে ভেসে গেলেও ওর পালকে দাগ পড়ে না! আমি দেওঘরে একটা বাগানবাড়ির পুকুরে এই রকম একটি রাজহংসী দেখেছিলাম। পুকুরে অনেকগুলো সাধারণ হাঁসের মধ্যে একটি মাত্র রাজহংসী ছিল। রাজহংসীরা সাধারণত খুব নিষ্ঠুর হয়। অন্য হাঁসগুলো তার চারপাশে ঘিরে থাকে, ঠিক যেন স্তুতি করে। আর রাজহংসীটি মাঝে মাঝে তার অহংকারী গ্রীবা তুলে ঠোক্কর মারে এক একজনকে। তখন রাগ হয় দেখে। কিন্তু আবার কোনো সময়ে, যখন অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে রাজহংসীটি অনেক দূরে চলে যায়—টলটলে জলের মধ্যে তার নিখুঁত শরীর, একটি পালকও ভিজে নয়, তখন মনে হয় ঠিক যেন একটি ছবি। কিংবা শিল্প। রাজহংসীটিও যেন দামী শাড়ি এবং গয়না পরে সেজে অহংকারী হয়েছে। সেই রাজহংসীটি ছিল খুকুর মতন, কিংবা খুকুই সেই রাজহংসীর মতন।

যুবক তিনটির সঙ্গে যখন খুকু কথা বলছিল, তখন তার শরীরে খুশীর হিল্লোল। যেন ও তাদের দয়া বিলোচ্ছে। অথচ সরল নিষ্পাপ মুখ। একসঙ্গে অনেক ছেলের সঙ্গে মিশে ও নিজে আনন্দ পায়—আর সেই ছেলেরাও প্রত্যেকে অসুখী হয়। এই ছেলে তিনটিও মরবে।

হঠাৎ খুকুকে দেখে আমার শেখভের 'ডার্লিং' গল্পের নায়িকার কথাও মনে পড়লো। সেই মেয়েটিও পুরুষের পর পুরুষ বদলে গেছে, অথচ তার সরলতা কখনো নষ্ট হয় নি।

দূর থেকে খুকুকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, এই মেয়েটির ওপর কি আমার রাগ করা উচিত? অথবা ঘৃণা? এর কোনোটাই আমার মনে এল না। আমি আপন মনে একটু হাসলাম।

হঠাৎ একটি নারী

প্রশান্ত দত্ত নিজেকে প্রশ্ন করলেন, আমি কি সৎ লোক না অসৎ লোক?

তিনি শুয়ে আছেন একটি ছোট চৌকিতে। নদীর ধারে ফাঁকা জায়গায় গাছের নিচে। বিশ্রী রকমের গরম—তবু গাছতলায় খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যায়। একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছেন তিনি এবং আড়চোখে বার বার তাকাচ্ছেন পাশের বাড়িটার দিকে।

বাড়ি মানে কুঁড়েঘর, তারও খুব জীর্ণ দশা। এ বাড়িটাতে থাকে স্বামী-স্ত্রী আর একটা ছেলে। স্বামীটি অপদার্থ, দেখলেই বোঝা যায়। অল্প বয়েসে বুড়িয়ে যাওয়া চেহারা। ছেলেটার তেলতেলে মুখ, গোলগাল চেহারা—গ্রাম্য বালক যে রকম হয়। বউটি বয়সে বছর তিরিশ বত্রিশ হবে বোধহয়, সারাক্ষণ কাজ করে—সে একাই যে সংসার সামলায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভারী ভালো মেয়ে। স্বামী-পুত্রের সেবা করাই তার একমাত্র কাজ।

কিন্তু বউটির স্বাস্থ্য একটু খারাপ হলে পারত না? এত সুন্দর শরীরের গড়ন থাকার কি দরকার ছিল? যে রকম দারিদ্র্য এদের—তাতে তো প্রায় ঘাস পাতা খেয়েই দিন কাটায় মনে হয়—তবু এমন স্বাস্থ্য পায় কি করে?

প্রশান্ত দত্ত ওই বউটির শরীরের রেখা বিভঙ্গ থেকে চোখ ফেরাতে পারছেন না। স্ত্রীলোকটিকে ঠিক রূপসী বলা যায় না। গায়ের রংটা পোড়া-পোড়া, চোখ নাক কিছুই নিখুঁত নয়—কিন্তু নিছক স্বাস্থ্যের যে একটা সৌন্দর্য আছে সেটা এর আছে পুরোপুরি। যে কারণে আকাশের একটা চিল সুন্দর, বুনো ঘোড়া সুন্দর, দেবদারু গাছ সুন্দর-সেই কারণেই এই স্ত্রীলোকটিকে সুন্দরী বলা যায়। শরীরে কোথাও কিছু অতিরিক্ত নেই—বুক, কোমর উরু—সবকিছুই মানানসই।

স্ত্রীলোকটির কপালটাও বেশী চওড়া। প্রশান্ত দত্ত হাসলেন। যার কপালে এত দুঃখ-কষ্ট—তার কপাল এত বড় কেন হয়? মেয়েটি পরে আছে একটা অতি ছেঁড়া, ময়লা শাড়ি। এটাও একটা হাসির বিষয় নয়? প্রশান্ত দত্ত দেখছেন শহরে কত বেঢপ চেহারার মেয়ে কত দামী শাড়ি পরে সাজগোজ করে। যার পেটটা গণেশের মতন সে-ও পেট খোলা ব্লাউজ পরতে চায়—মাড়োয়ারী মহিলাদের সাজগোজ দেখলে তো বমি আসে প্রায়। অথচ কয়লাখনি এলাকায় এমন অনেক মজুরনী দেখা যায় যাদের শরীর দেখলে মনে হয় মানবী মূর্তির আদর্শ—সাজগোজ করলে তাদেরই মানাবে—কিন্তু তাদের পরনের কাপড় জোটে না। এটা হাসির ব্যাপার ছাড়া আর কি?

এই যে বাড়ির বউটি, এ একটি সৎ নারী! মুখ দেখলেই বোঝা যায় সৎ কিনা। প্রশান্ত দত্ত বিড়বিড় করে বললেন, শী ইজ আ গুড উয়োম্যান, নো ডাউট!

পৃথিবীতে যা কিছু সৎ তার প্রতি এখনো মানুষের একটা গোপন শ্রদ্ধা আছে। এই স্ত্রীলোকটির প্রতি প্রশান্ত দত্তরও শ্রদ্ধা হচ্ছে। বিশেষত এ এত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও থাকতে পেরেছে। দারিদ্র্য তো শুধু অভাব আনে না, দারিদ্র্য মানুষকে বড় নীচ করে দেয়!

স্ত্রীলোকটির চরিত্রটিকে মনে মনে শ্রদ্ধা করলেও প্রশান্ত দত্ত এর শরীরের দিকে বার বার না তাকিয়ে পারছেন না। এবং সেই দৃষ্টির মধ্যে লোভ আছে।

সেইজন্যই প্রশান্ত দত্ত নিজেকে প্রশ্ন করলেন, আমি নিজে কি? সৎ না অসৎ? আমি এই গেরস্ত ঘরের বউটির দিকে এরকমভাবে তাকাচ্ছি কেন? কেন না-তাকিয়ে পারছি না? আমার মধ্যে কাম প্রবৃত্তি বেশী। এটা কি দোষের ব্যাপার?

প্রশান্ত দত্ত নিজেকে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উঁচু বলে মনে করেন। সে-রকম মনে করার আপাত কারণও কিছু আছে।

প্রশান্ত দত্ত উদার এবং দয়ালু হিসাবে পরিচিত। প্রতিভাবান পুরুষ। পড়াশুনোতে নাম-করা ছাত্র ছিলেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, বি এস সি ও এম এস সি-তে তাঁর সাবজেক্টে ফার্স্ট হয়েছিলেন। তারপর মোটামুটি একটা ভালো ধরনের সরকারী চাকরী। কিছুদিন চাকরি করার পর তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, পড়াশুনোতে তুমি যতই ভালো হও—তোমার চাকরির উন্নতির একটা সীমা আছে। খুব বেশী উঁচুতে যেতে পারবে না। সে সব জায়গায় 'কানেকশান' ব্যাপারটই প্রধান।

নিজের থেকেও অযোগ্য লোকের অধীনে চাকরি করার পাত্র প্রশান্ত দত্ত নন। ফট করে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করলেন। প্রশান্ত দত্ত অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক, ব্যবসা শুরু করার আগে তিনি তিন-চার মাস ধরে মার্কেট স্টাডি করেছেন, খাতা-পত্রে অঙ্ক মিলিয়েছেন। কম মূলধনে এমন ব্যবসা তাঁকে শুরু করতে হবে যাতে লাভ অবধারিত।

শেষ পর্যন্ত তিনি এমন ব্যবসা শুরু করলেন, যার সঙ্গে তাঁর বিদ্যে বুদ্ধি পড়াশুনোর কোনো সম্পর্কই নেই। গ্রাম-গ্রামাঞ্চল থেকে গরু ও শুয়োরের চামড়া সংগ্রহ করে চালান দেওয়া। প্রথমে সবাই তাকে ছি ছি করেছিল। এখন প্রশান্ত দত্ত বেলেঘাটায় মস্তবড় একটা ট্যানিং কারখানার মালিক।

প্রশান্ত দত্তর কারখানাটি সুপরিচালিত। তিনি নিজে সব সময় খাটেন। কর্মচারীরা অন্যান্য কারখানার চেয়ে বেশী মাইনে পায়, সুযোগ-সুবিধেও অনেক। কারুর কোনো অভিযোগ নেই। এই দরিদ্র দেশের বেশ কয়েকটি পরিবার প্রশান্ত দত্তর জন্য ভালোভাবে খেয়ে পরে আছেন। প্রশান্ত দত্ত মাঝে মাঝে ভাবেন, আমি যে এতসব করেছি, এর বিনিময়ে আমি কি পাচ্ছি?

একটি অবাধ্য সাপ্লায়ারকে সিধে করার জন্য প্রশান্ত দত্ত নিজে বেরিয়ে ছিলেন ইন্সপেকশনে। বর্ষার সময় এ দিককার রাস্তাঘাটে মোটর চলে না। গরুর গাড়ি কিংবা নৌকা ছাড়া উপায় নেই, প্রশান্ত দত্ত বড় সাইজের নৌকা নিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই নৌকার তলার কাঠ সরে গেছে—যতক্ষণ না সারানো হয় তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন গাছতলায়।

প্রশান্ত দত্তর সহকারী এই বাড়ি থেকে প্রথমে বাবুর বসার জন্য একটা চেয়ার-টেয়ার চেয়েছিল। ওরা দিতে পারে নি। কারণ ওদের বাড়িতে চেয়ার নেই। অনেক কিছুই নেই ওদের। গোটা বাড়িটা জুড়েই একটা নেই নেই ভাব। শেষ পর্যন্ত একটা ছোট খাট বার করে দিয়েছে—যেটা নিশ্চয়ই ওদের শোওয়ার খাট। একটা পায়া ভাঙা।

তারপর প্রশান্ত দত্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন, এক কাপ চা বানিয়ে দিতে পারবে? ওদের বাড়িতে চায়ের সরঞ্জাম নেই। ওরা চা খায় না।

ওদের বাড়িটা দোকান নয়, সেটা প্রশান্ত দত্ত জানেন। কিন্তু কোনো গেরস্ত বাড়িতে হঠাৎ অতিথি এসে কিছু চাওয়ার রেওয়াজ তো একেবারে উঠে যায় নি।

চা খাওয়াতে না পেরে ওরা লজ্জা বোধ করে—তার বদলে লেবুর শরবত বানিয়ে নিয়ে আসে। প্রশান্ত দত্ত সে শরবত ছুঁয়েও দেখলেন না, কিন্তু এই পরিবারটি সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

স্বামী, স্ত্রী আর একটা দশ-বারো বছরের ছেলে। স্বামীটি অকালবৃদ্ধ, নির্বোধ অপদার্থ। ওর নাম দীনু ভট্টাচার্য। বউটির নাম বাসনা। নামটিতে বেশ মানিয়েছে বউটিকে।

প্রশান্ত দত্ত কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন ওদের সঙ্গে। একটা জিনিস তিনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না—ওদের সংসার চলে কি করে! কোনো জমি-জমা নেই, লোকটির কোনো রোজগার নেই—তবু খেয়ে-পরে আছে তো দেখা যাচ্ছে। কতদিন থাকতে পারবে?

প্রশান্ত দত্ত একবার ভাবলেন, এদের একটু উপকার করবেন, স্বামীটিকে তিনি অনায়াসে একটি চাকরি দিতে পারেন। লোকটির যোগ্যতা যাই হোক, তবু মাসে ওর আড়াই শো তিনশো টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া প্রশান্ত দত্তর পক্ষে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু, দীনু ভট্টাচার্য এ জায়গা ছেড়ে কলকাতায় চাকরি করতে যাবে না—লোকটা কলকাতা শহরকে ভয় পায়। তখন প্রশান্ত দত্ত প্রস্তাব দিলেন তাঁর চামড়া সংগ্রহের ব্যাপারে ও স্থানীয় এজেন্ট হোক। কিন্তু গরু ও শুয়োরের চামড়ার কথা শুনে লোকটি আঁতকে উঠল। প্রশান্ত দত্তর দিকে এমনভাবে তাকাল যেন একটি যমদূত। পেটের ভাত জোটে না অথচ জাত যাবার ভয় আছে।

প্রশান্ত দত্ত তখন বেশ রেগে গিয়েছিলেন। লোকটা যখন এতই অপদার্থ তখন ওর অমন একটা সুন্দরী স্ত্রী পাবার কোনো অধিকার নেই। এই স্ত্রীলোকটি নিজের সংসারের বাইরে কিছুই দেখে নি—সেই জন্য নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও জানে না। কিন্তু ওকে একটি স্ত্রীরত্নই বলা যায়।

আস্তে আস্তে প্রশান্ত দত্তর রাগ পড়ে এল। তিনি ভাবলেন ওদের ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। এ রকম লক্ষ লক্ষ অসহায় পরিবার আছে দেশে—তিনি তার কি করবেন!

কিন্তু নৌকার মেরামত কাজ শেষ হচ্ছে না। একা একা শুয়ে থেকে আর কতক্ষণ ভালো লাগে। নৌকার মধ্যেই তাঁর জন্য রান্না চেপেছে। আরও বেশ কিছুক্ষণ কাটাতে

হবে।

প্রশান্ত দত্ত ছেলেটিকে ডেকে কিছুক্ষণ কথা বললেন। চেহারায় গ্রাম্যতা থাকলেও বেশ চালাক-চতুর ছেলে। ভালো করে লেখাপড়া শিখলে মানুষ হতে পারত। কিন্তু ওর ওই অপদার্থ বাবা কি আর বেশীদূর লেখাপড়া শেখাবে ছেলেকে?

তিনি তখন ভাবলেন, তাঁর কাছে ক্যাশ টাকা আছে শ চারেক। এর মধ্যে শ তিনেক টাকা তিনি ইচ্ছে করলেই এদের দান করতে পারেন! এদের যা অবস্থা—তিনশো টাকা তো প্রায় সাত রাজার ধনের সমান। দিয়ে দেখবেন নাকি কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়?

কিন্তু শুধু প্রতিক্রিয়া দেখার বদলে কি তিনশো টাকা দেওয়া যায়? অনেক পরিশ্রম ও মেধা খরচ করে টাকা রোজগার করতে হয়! এর বিনিময়ে তিনি যদি কিছু চান? কি? প্রশান্ত দত্ত নিজের মনের কাছে স্বীকার করলেন, স্ত্রীলোকটির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। স্ত্রীলোকটিকে ভোগ করতে পারলে মন্দ হত না।

পরক্ষণেই মন থেকে চিন্তটা তাড়িয়ে দিলেন। এটা ঠিক নয়। গরীব হোক যাই হোক—এদের একটা মোটামুটি নিরুপদ্রব সংসার—সেটা তছনছ করে দেওয়া তাঁর উচিত নয়। এতে মানুষের আদিম মূল্যবোধে আঘাত করা হয়। তিনি তো পাষণ্ড নন্!

অথচ তাঁর চোখ ঘুরে ঘুরে চলে যাচ্ছে ওই বাসনা নামের স্ত্রীলোকটির দিকে। তিনি উপভোগ করছেন ওর স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য। একবার ওর সারা শরীরে হাত বুলোতে পারলেও বেশ আরাম হত। কিন্তু তিনি যদি এই ইচ্ছেটা প্রকাশ করে ফেলেন—সবাই কি রকম ছি ছি করবে। গোপনে লুকিয়ে-চুরিয়ে করলে কিছু আসে যায় না অবশ্য।

প্রশান্ত দত্তর স্ত্রী অনেক দিন ধরে হাঁপানির অসুখে ভুগছেন। দুটি ছেলে-মেয়ের জন্ম দেবার পর তার শরীর একেবারেই ভেঙে গেছে। প্রশান্ত দত্ত স্ত্রীর অযত্ন করেন না, চিকিৎসার ত্রুটি নেই—এবং স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালবাসাও আছে। কিন্তু তিনি ভোগী পুরুষ—সারাদিন তিনি কাজে ডুবে থাকলেও মাঝে মাঝে তার মধ্যে ভোগ-বাসনা মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে। লোকে একে লালসা বলবে! তিনি সামাজিক ও সজ্জন, শুধু নিজের পরিবার নয়, তাঁর কারখানার ওপর নির্ভরশীল অনেকগুলি পরিবারের প্রতি তিনি সুবিচার করেন—অথচ এর বিনিময়ে তিনি কিছু চাইতে গেলেই অপযশ হবে। তিনি যদি হোটেলে কোনো মেয়ে-মানুষ রাখেন লোকে তাঁকে বলবে লম্পট। পারা যায় না! আর এই যে এখানে এই স্ত্রী-লোকটির এমন চমৎকার শরীরটা নষ্ট হচ্ছে—সেটা অন্যায় না।

প্রশান্ত দত্ত ছেলেটিকে আবার কাছে ডাকলেন। ব্যাগ থেকে তিনশো টাকা বার করে বিনা ভূমিকায় ছেলেটিকে বললেন, তোমার মাকে দিয়ে এসো!

ছেলেটি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তিনি হুকুমের সুরে বললেন যাও, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তোমার মাকে দিয়ে এসো।

ছেলেটি দৌড়ে বাড়ির মধ্যে চলে যেতেই প্রশান্ত দত্ত উঠে বসে উৎফুল্লভাবে পা দোলাতে লাগলেন। বেশ একটা নতুন ধরনের খেলা পাওয়া গেছে। দীনু ভটচাজ একটু আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে—দেখাই যাক না টাকাটা পেয়ে তার বউ কি করে!

বাসনা ছেলের হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এল। তার চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে, খানিকটা বিস্ময় ও উত্তেজনায়। বাসনা লাজুক নয়। সে বেশ স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনি এতগুলো টাকা পাঠালেন কেন?

প্রশান্ত দত্ত অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, আপনাদের আমার খুব ভাল লেগেছে, তাই সামান্য কিছু দিলাম। এই ছেলেটির যাতে পড়াশুনো হয়—

—এতগুলো টাকা?

—বেশী নয়, সামান্যই—

—না, না, এ কখনো হয়!

বাসনা টাকাটা রাখল খাটের উপর। প্রশান্ত দত্ত মুগ্ধভাবে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তিনি এরকমই আশা করেছিলেন।

টাকাটা ওর স্বামীর হাতে দিলে সে নিশ্চয়ই ফেরত দিত না। খুব হাত কচলাতো। তাতে প্রশান্ত দত্তর কি লাভ হত! তিনি বউটির সঙ্গে একবার কথাও বলতে পারতেন না।

বাসনা চলে যাচ্ছিল। প্রশান্ত দত্ত ডাকলেন, শুনুন!

সে ঘুরে দাঁড়াতেই প্রশান্ত দত্ত নম্র গলায় বললেন, আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারলে আমার খুব ভাল লাগত।

—আপনি তো ওকে চাকরির কথা বলেছিলেন?

—আমি কাঁচা চামড়ার কারবার করি বলে কি এ টাকা নিতে আপনার ঘেন্না হচ্ছে? টাকা কখনো অপবিত্র হয় না।

—না না, সে কথা তো বলি নি। এমনি এমনি কি এতগুলো টাকা কারুর কাছ থেকে নেওয়া যায়!

—তা হলে এর বদলে আমাকে কিছু দিন!

—দেবার মত কি আছে আমাদের বলুন!

প্রশান্ত দত্ত মনে মনে বললেন, তোমার শরীর। কিন্তু মুখে উচ্চারণ করলেন না। এত স্পষ্ট কথা মানুষে সহ্য করতে পারে না। টাকার বিনিময়ে শরীরের কথা বলার মধ্যে একটা সাংঘাতিক রূঢ়তা আছে। তা হলে ভালোবাসা? ভালোবাসা সম্পর্কে প্রশান্ত দত্তর এককালে দুর্বলতা ছিল—এখন কাজে ব্যস্ত থেকে সময় পান না। তিনি যদি একে বলেন, আমি তোমাকে ভালোবাসতে চাই! তুমি তা গ্রহণ করবে?

কিন্তু এরা এত গরীব, শুধু ভালোবাসা নিয়ে মেয়েটি কি করবে?

বাসনা ধীর পায়ে চলে গেল বাড়ির মধ্যে। প্রশান্ত দত্ত সেই দিকে চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে। তাঁর চোখে এখন লোভের চিহ্নমাত্র নেই। বরং বেশ খুশী খুশী ভাব। ঠিক যা যা হবার তাই হচ্ছে। মেয়েটি যদি টাকাগুলো নিয়ে নিত—তা হলে প্রশান্ত দত্ত ওকে অত পছন্দ করতে পারতেন না।

খাটের তক্তাগুলো ফাঁক ফাঁক। এই তক্তার ফাঁকে টাকাগুলো গুঁজে রাখলে কয়েকদিনের মধ্যে ওদের চোখে পড়বেই। তখন তো আর ফেরত দেবার কোনো উপায় থাকবে না। প্রশান্ত দত্ত একবার ফাঁকের মধ্যে টাকাগুলো ঢুকিয়ে পরীক্ষাও করলেন, কিন্তু রাখলেন না। এতটা মহৎ তাঁর পক্ষে সাজা অসম্ভব। তিনি তো সাধারণ মানুষ, দেবদূত তো নন। তাঁর কামনা-বাসনা আছে। সব কিছুরই একটা প্রতিদান পাওয়ার ইচ্ছে আছে।

ওর স্বামী ফিরলে নিশ্চয়ই বলবে টাকার কথা! সে তখন কি করবে? আপসোস করবে, বউকে বকুনি দেবে? মারধোর করবে না তো? এই সব অযোগ্য লোকেরা বউকে পেটাতে খুব ওস্তাদ। অযোগ্য পুরুষেরাই বউয়ের ওপর বেশী হম্বি-তম্বি করে। প্রশান্ত দত্ত ভাবলেন, তিনি কি মেয়েটির ওপর তার স্বামীর অত্যাচারের কারণ হলেন? সেটা খুব বিশ্রী ব্যাপার হবে।

প্রশান্ত দত্তের সঙ্গে সব সময় একজন ঘনিষ্ঠ অনুচর থাকে। এর নাম রত্নেশ হালদার। এ প্রশান্ত দত্তর ছেলেবেলার বন্ধু, লেখাপড়া বেশী দূর শেখে নি—এখন প্রশান্ত দত্তের কর্মচারী, তুই তুই বলে কথা বললেও কাজে সে শরীর-রক্ষী। সে গোঁয়ার ও শক্তিশালী, তার কোনো দুঃখবোধ নেই।

রত্নেশ নৌকার মাঝিদের ওপর চোটপাট করছিল, প্রশান্ত দত্ত তাকে ডেকে বললেন, কি রে, রান্না হল? খিদে পেয়ে গেছে আমার।

—হ্যাঁ, এই যে! হাত মুখ ধুয়ে নিবি না?

—আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। এখানেই নিয়ে আয়।

—খাবার ওইখানেই পাঠাব?

—হ্যাঁ।

—গাছের তলায়—পাখিটাখি যদি ইয়ে করে দেয়!

—কিছু হবে না—বেশ একটা নতুনত্ব হবে।

মুর্গীর ঝোল, ভাত। মুসলমান মাঝিরা ভালই রাঁধে। ঝাল একটু বেশী—প্রশান্ত দত্ত ঠোঁট সরু করে হুস-হাস করতে লাগলেন। খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন ছেলেটি বাড়ির ভেতর থেকে একটা বাটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। বাটিটা প্রশান্ত দত্তর সামনে ধরে সংকুচিতভাবে বলল, মা আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বাটি ভর্তি সাদা রঙের ডাল। মুগ-মুসুরী ছোলা নয়—প্রশান্ত দত্ত এ ডালের নাম জানেন না। একবার তিনি ভাবলেন ফিরিয়ে দেবেন, ডাল-ফাল খাওয়ার কোনো উৎসাহ নেই তাঁর। কিন্তু কেউ খাবার পাঠালে ফেরত দেওয়া বোধ হয় খুবই অভদ্রতা। অযাচিত-ভাবে টাকা পাঠালে ফেরত পাঠাতে হয়—কিন্তু খাবার পাঠালে ফেরত দিতে নেই।

অনিচ্ছার সঙ্গে বাটিটা নিয়ে তিনি চুমুক দিলেন। কিন্তু ভাল লাগল। ডালের মধ্যে উচ্ছে আর লাউর টুকরো দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ প্রশান্ত দত্তর মনে পড়ে গেল তাঁর মায়ের কথা। তাঁর মা এই রকম ডাল রাঁধতেন। মায়ের মৃত্যুর পর কখনো এই রকম রান্না খান নি। এই ডাল খেলে তাঁর মনে হয় যেন শরীরের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বাটির সবটুকু খেলেন চেটে-পুটে। এক অদ্ভুত ধরনের ভাল লাগায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। কৃতজ্ঞতায় তাঁর চোখে জল এসে গেল। নৌকায় কাঠ ফাক না হয়ে গেলে তিনি এখানে নামতেন না। গাছতলায় ঝিরঝিরে হাওয়া, গরম নেই আজ, নদীর জলে রোদ চকচক করছে—একজন দয়াশীল নারী নিজের হাতের রান্না পাঠিয়ে দিয়েছে তাঁকে—এ সবই যেন সৌভাগ্যের মতন।

হাত ধুয়ে এসে সিগারেট ধরিয়ে তিনি ছেলেটিকে বললেন, তোমার মাকে আর একবার ডাকো তো।

বাসনা ইতিমধ্যে স্নান করেছে, তার চুলগুলো ভিজে। লজ্জিতভাবে এসে দাঁড়াল কাছে। প্রশান্ত দত্ত স্থিরচোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন খুব তৃপ্তি পেলাম।

বাসনা মৃদু গলায় বলল, আপনার ভাল লেগেছে তো? আমাদের সাধারণ রান্না... ভাবলাম আপনি খাবেন কিনা?

—বহুদিন এরকম রান্না খাই নি। আপনার অনেক গুণ আছে। আপনাদের খাবার খেলাম, আপনাদের ঘাটটা দখল করে বসে আছি—কিন্তু জানি এর প্রতিদানে কিছু দেওয়া যায় না। দিতে পারলে ভাল লাগত—

প্রশান্ত দত্ত মনে মনে ভাবলেন, এই সব কথা রমণীটার গা ছুঁয়ে, কোমর জড়িয়ে ধরে বলতে পারলে কত বেশী ভাল লাগত। কৃতজ্ঞতা সত্বেও মেয়েটির সুগঠিত শরীরের আকর্ষণ তিনি এড়াতে পারলেন না।

বাসনা বাটিটা তুলে নিয়ে লজ্জিতভাবে বলল, এ তো সামান্য—

প্রশান্ত দত্ত প্রায় যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে ফেললেন- আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?

বাসনা ঠিক বুঝতে না পেরে চমকে মুখ তুলে বলল, কি!

প্রশান্ত দত্ত আবার দৃঢ়ভাবে বললেন, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন? এখানে আপনাকে মানায় না। আমি আপনার খাওয়া থাকার সুব্যবস্থা করে দেব।

বাসনার মুখখানা অদ্ভুত বিবর্ণ হয়ে গেল। সে আর একটা কথাও বলতে পারল না। কয়েক মুহূর্ত বিহ্বলভাবে চেয়ে রইল প্রশান্ত দত্তর দিকে—তারপর প্রায় দৌড়েই চলে গেল বাড়ির মধ্যে। দূরে দেখা গেল দীনু ভটচাজকে আসতে।

প্রশান্ত দত্তর নিজের গালেই ঠাস ঠাস করে চড় মারতে ইচ্ছে হল। কেন তিনি এ কথা বললেন। একটা সুন্দর ব্যবহার, একটা লাজুক দিনের স্মৃতি—এইটুকু নিয়ে চলে গেলেই কি হত না? ওই দীনু ভটচাজ জীবনে কিছুই পায় নি।—তবু একজন সুশীলা স্বাস্থ্যবতী রমণীকে পেয়েছে—সেটুকুও কেড়ে নেবার ইচ্ছে হচ্ছে কেন তার? পৃথিবীতে কি আর নেই? কিন্তু একথা তিনি কোনোমতেই মন থেকে তাড়াতে পারছেন না—এ জায়গায় ওই মেয়েটিকে মানায় না। দীনু ভটচাজের বদলে তাঁরই প্রাপ্য ছিল ওই রকম একটি নারী। তিনি সত্যিই ওর যত্ন করতেন। অন্তত একবার একটু সাহচর্য পেলে কি ক্ষতি ছিল?

এরপর তিনি ভাবলেন, টাকার কথাটা বাসনা তার স্বামীকে নাও জানাতে পারে—কিন্তু একজন অচেনা লোকের কু-প্রস্তাবের কথাও কি স্বামীকে জানাবে না? তারপর কি প্রতিক্রিয়া হবে? সেটা দেখার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন।

খানিকটা বাদে দীনু ভটচাজ বেরিয়ে এসে বিগলিত মুখে প্রশান্ত দত্তর কাছে বসে নানান গল্প করতে লাগলেন। প্রশান্ত দত্ত তীক্ষ্ণচোখে দেখতে লাগলেন, লোকটা

অভিনেতা কি না! সব জেনেশুনেও কি লুকোচ্ছে? না, তা হতে পারে না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে আপনি আমার কাজটা নেবেন না?

—আজ্ঞে বামুনের ছেলে হয়ে গরু শুয়োরের চামড়া ঘেঁটে বেড়াব! দুটো টাকার জন্য কি বাপ পিতামহর ধর্ম ছাড়তে পারি? আপনার তো অনেক দিকে জানাশোনা—যদি আমার ছেলেটার জন্য কিছু।

তিনশো টাকার নোটের বান্ডিল থেকে মাত্র দশটাকার একটা নোট বার করে দীনু ভটচাজের দিকে এগিয়ে তিনি বললেন, এটা রাখুন, আপনার ছেলের জন্য মিষ্টি কিনে দেবেন।

—না, না, এ আবার কেন?

—রাখুন, আপনার ছেলের জন্য।

দীনু ভটচাজ আগ্রহের সঙ্গেই টাকাটা পকেটে গুঁজল। প্রশান্ত দত্ত হাসলেন। তারপর বললেন, আমি চামার মানুষ ভদ্রতা-সভ্যতা তো ঠিক জানি না, ভাবছিলাম, আমার টাকা নিলে যদি আপনার সম্মান যায়—।

প্রশান্ত দত্তর মাথায় আর একটা আইডিয়া এল। এর বউকে যদি কেউ কেড়ে নিয়ে যায়—দু'চারদিন ভোগ করার পর আবার ফেরত পাঠিয়ে দেয়—তা হলে এ কি বউকে আবার গ্রহণ করবে? নাকি তখনও জাত-ধর্ম ধুয়ে খাবে? ওই বউয়ের সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারবে লোকটা?

দীনু ভটচাজ চলে যাবার পর প্রশান্ত দত্ত রত্নেশকে ডেকে বললেন, রত্নেশ এ বাড়ির মেয়েটাকে দেখেছিস?

রত্নেশ একটুও অবাক হল না। বলল, তখন দেখেছিলাম, নদীতে চান করছিল—ফিগারখানা দারুণ।

—সচরাচর দেখা যায় না।

রত্নেশ ইঙ্গিত বুঝে বলল, কাছাকাছি আর কোনো বাড়িঘর নেই। এরা একা একা এখানে থাকে কি করে? চোর-ডাকাতের ভয় নেই?

—কি আছে এদের বাড়িতে যে চুরি-ডাকাতি হবে?

—কেন, মেয়েছেলের জন্য কি ডাকাতি হয় না? এ রকম মেয়েছেলে দেখলে অনেকেই।

প্রশান্ত দত্ত চিন্তিতভাবে বললেন, ঠিক!

সন্ধের অন্ধকার নামতেই নৌকা চালু হল। প্রশান্ত দত্ত নৌকায় বসেছেন।

রত্নেশ হঠাৎ বলল, আমি একটু আসছি।

রত্নেশ ঢুকে গেল বাড়িটার মধ্যে। দীনু ভটচাজকে সামনে দেখে বিনাবাক্যব্যয়ে তার চোখের ওপর একটা ও পেটে একটা ঘুষি বসাল। দীনু ভটচাজ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। একটা বস্তা নিয়ে রত্নেশ নৌকায় উঠেই ঘরের মধ্যে চলে এল—মাঝিদের দাবড়ে বলল—শিগগির চালাও।

প্রশান্ত দত্ত ধড়ফড় করে উঠে বসে বললেন, এ কি করেছিস?

—তোর যখন ইচ্ছে হয়েছে, একটু সাধ মিটিয়ে নে।

—আমি তো আনতে বলি নি।

—আর চক্ষুলজ্জা করে কি হবে। এমন কিছু ব্যাপার নয়, পরে ফিরিয়ে দিয়ে আসব এখন। গোটা তিরিশেক টাকা দিলেই হবে।

বাসনা বিস্ফারিত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে প্রশান্ত দত্তর দিকে। প্রশান্ত দত্ত বললেন, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি আমার সঙ্গে আসবেন কিনা। আপনি কোনো উত্তর দিলেন না তো!

বাসনা পাগলের মতন বলল, আমি বিষ খাব।

—বিষ আছে সঙ্গে? আমি তো আমার কাছে বিষ রাখি না। আমি আবার জিজ্ঞেস করছি—আপনি আমার সঙ্গে যাবেন? ইচ্ছে হলে আপনার ছেলেকেও সঙ্গে নিতে পারেন।

—না!

—আপনাকে দেখে আমার ভাল লেগে ছিল—কিন্তু জোর করে কোনো মেয়েকে ভোগ

করা আমার স্বভাব নয়। রত্নেশ একে ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

রত্নেশ বলল, তোর যদি পছন্দ না হয়, তা হলে আমি একটু জাপটাজাপটি করি। এনেছি যখন—টাকা না হয় আমার পকেট থেকেই যাবে।

বাসনা প্রশান্তর দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলে বলল, আপনি আমার এ সর্বনাশ করলেন কেন?

প্রশান্ত দত্ত অত্যন্ত নীরস গম্ভীরভাবে বললেন, যে রকম ফাঁকা জায়গায় আপনাদের বাড়ি—তাতে যে-কোনো দিন বদমাস লোকেরা আপনাকে হরণ করতে পারে। রত্নেশের স্বভাবটাও ডাকাতের মতন—ধরুন আজকে সেই রকমই একটা ব্যাপার হয়েছে। আপনার স্বামীর ক্ষমতা নেই আপনাকে রক্ষা করবার। আমি তো এখানে দর্শক মাত্র।

—আপনি দয়া করুন।

—দয়ার প্রশ্ন নয়। আপনার প্রতি আমার লোভ হয়েছিল—লোভী মানুষ কি দয়া করতে পারে?

—আমি ভেবেছিলাম, আপনি ভাল লোক।

—আমারও ধারণা আমি ভাল লোক। কিন্তু ভাল লোকেদের কি কামনা-বাসনা থাকতে নেই? আপনাকে যখন আমি টাকাটা দিয়েছিলাম, তখন কিন্তু তার বিনিময়ে কিছু চাই নি। এ চাওয়াটা আলাদা।

প্রশান্ত দত্ত বিমর্ষভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর রত্নেশের দিকে রুক্ষভাবে তাকিয়ে বললেন, এটা বেলেল্লা করবার জায়গা নয়। শিগগির ওকে রেখে আয়—এই মুহূর্তে।

নৌকা থামানো হল। রত্নেশ মেয়েটিকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসতে গেল।

প্রশান্ত দত্ত ঘড়ি দেখে বললেন, দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবি। কোনো রকম বাজে কাজ করবি না।

রত্নেশ ফিরে আসবার পর প্রশান্ত দত্ত কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ওর স্বামী ওকে নেবে?

—কেন নেবে না?

—সাধারণত নেয় না।

—ধুৎ!

—জন্তু-জানোয়ারের চামড়া ছুঁলে যাদের জাত যায়, তারা কি অপর পুরুষের ভোগ করা বউকে ফেরত নেয়?

—ভোগ মানে? কিছুই তো—

—সে কথা কে বিশ্বাস করবে?

—তোকে ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

প্রশান্ত দত্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমাকে একবার দেখে আসতে হবে ওর কি হল।

রত্নেশ আঁতকে উঠল, বার বার বোঝাতে লাগল যে এখন ফিরে যাওয়ার মধ্যে ঝুঁকি আছে, মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্রশান্ত দত্ত গ্রাহ্য করলেন না—নৌকা থেকে নেমে গেলেন। নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালেন সেই কুঁড়ে ঘরের পাশে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখা যায়। কুপীর টিমটিমে আলো—তার পাশে দীনু ভটচাজ বৌকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদছে।

প্রশান্ত দত্ত সরে এলেন সেখান থেকে। একবার নদী ও আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশ ভর্তি তারা, নদীর জলে ছলছল ধ্বনিমাধুর্য! চমৎকার রাত। সেই সৌন্দর্যের দিকে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অপদার্থ!

মেয়ের পদবী চ্যাটার্জি, মায়ের পদবী ধারিওয়াল আর মায়ের ঠাকুর্দার পদবী ছিল সিংহ। বিখ্যাত লোক ছিলেন তিনি। যে-কোনো ইতিহাস বইয়ের পাতায় তাঁর নাম পাওয়া যাবে। বৃটিশ আমলে তিনি ছিলেন নামজাদা ব্যারিস্টার, ভারতীয় হয়েও তিনি বিলেতের কমন্স সভায় জ্বলন্ত ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীকে প্রথমবার কারারুদ্ধ করায় তিনিই দেশব্যাপী আন্দোলন ছড়িয়ে দেন।

সেই মানুষের নাতনীর মেয়েকে আমি পড়াই। দক্ষিণ কলকাতায় মস্ত গেটওয়ালা বাড়ি। গেটের পরে ছোট বাগান, তারপর বারান্দায় বাঁধা বিশাল কুকুর। সেই কুকুরের পাশ দিয়ে আমাকে ভেতরে ঢুকতে হয়। কুকুরটা চুপ করেই থাকে কিন্তু আমার বুক ঢিপঢিপ করে।

বাস থেকে নেমে খানিকটা রাস্তা আমাকে হেঁটে আসতে হয়। রাস্তার পাশের কল থেকে ভাল করে মুখটা ধুয়ে নিই। ঘর্মাক্ত মুখ নিয়ে ও বাড়িতে ঢুকতে লজ্জা করে। চটিতে যাতে কোনোক্রমে কাদা না লাগে সেজন্যও সাবধানে থাকতে হয়। ও বাড়ির প্রতিটি ঘরের সারা মেঝে জোড়া কার্পেট।

ও বাড়িতে বোধহয় তিনখানা বসবার ঘর। কিংবা সব কটা ঘরই বসবার ঘর কিনা জানি না। প্রায় তিন-চারটে ঘর পেরিয়ে আমাকে একটা ঘরে গিয়ে বসতে হত। প্রত্যেক ঘরই একই রকম সোফা কুশান দিয়ে সাজানো। বিরাট দেওয়ালগুলো শূন্য, একটাও ছবি নেই।

মেয়েটির নাম দেবযানী। খাতায় লেখা দেখেছিলাম দেবযানী চ্যাটার্জি। ওদের বাড়ির সামনে নেমপ্লেট লেখা ছিল মিঃ সুরেশ ধারিওয়াল অ্যান্ড মিসেস শোভনা ধারিওয়াল। যিনি আমাকে কাজটা যোগাড় করে দিয়েছিলেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন দেখ অমুক সিনহার ফ্যামিলিতে পড়াতে যাচ্ছ, যদি ওদের একটু নজরে পড়ে যাও, তোমার বরাত খুলে যাবে।

পরে জেনেছিলাম বিখ্যাত অমুক সিনহার নাতনীর প্রথম পক্ষের স্বামী বাঙালী ছিলেন, দ্বিতীয় পক্ষ এক পাঞ্জাবী, বর্তমান রাজস্থানী স্বামীটি তাঁর তৃতীয় পক্ষ। প্রথম পক্ষেই তাঁর একটি সন্তান হয়েছিল, এখনো ওই একমাত্র সন্তান।

মেয়েটির বয়েস ষোল। সিনিয়ার কেম্ব্রিজে একবার ফেল করেছে। বাঙালী পদবী থাকলে আজকাল বাংলায় একটা পরীক্ষা দিতেই হয়। সেইজন্য আমাকে রাখা হয়েছে।

মেয়েটি এতই সুন্দরী যে দেখলে হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে যায়। গোলাপের পাপড়ির মতন গায়ের রং। বড় বড় দুটো চোখে স্থিরভাবে চেয়ে থাকে। হাতের আঙুলগুলো সত্যিই ফুলের কলির মতন। মেয়েটি পরে থাকে একটা প্যান্ট আর গেঞ্জি, গেঞ্জিটার সামনের দিকটা অনেকটা কাটা, সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যায় তার নতুন দ্বীপের মতন স্তন। সেদিকে তাকাব না ভাবলেও বারবার চোখ চলে যায়।

দু' দিনেই বুঝতে পারলুম, মেয়েটির মাথায় কিচ্ছু নেই। ঠিক জড়ভরত বা হাফ উইট নয়। তার শরীরটা বেড়ে উঠলেও মনটা পাঁচ-ছ বছরের শিশুর মতন অপরিণত। বিদ্যেও সেই পর্যন্তই! এ সারাজীবনেও সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাস করতে পারবে না।

এক মাস খুব মন দিয়ে পড়াবার চেষ্টা করলাম। তারপর মনে হল, মেয়েটির মা-বাবার সঙ্গে একটু আলোচনা করা দরকার। কিন্তু মা-বাবার দেখাই পাওয়া যায় না। দেবযানীর সৎ বাবাকে আমি দেখেছি মাত্র একবার। বেশ লম্বা চওড়া, শান্ত-গম্ভীর মাতাল। প্রায়-শেষ একটি হুইস্কির বোতল নিয়ে দু'নম্বর বসবার ঘরে একা একা প্লে-বয় ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। দেবযানীর মা আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দেবার পর তিনি শুধু একটু মাথা নেড়েছিলেন, একটাও কথা বলেন নি! খুব সম্ভবত স্ত্রীর আগের পক্ষের সন্তানের শিক্ষা নিয়ে তাঁর একটু মাথাব্যথা নেই।

দেবযানীর মা-ও কিছু কম মাতাল নন্। প্রথম দিনই মুখে গন্ধ পেয়েছিলাম। তা ছাড়া ঘোর-লাগা মানুষের মতন তিনি সব সময় মাথাটা একটু দোলান। বয়েস প্রায়

পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও স্বাস্থ্যটি এখনও ভাল। এককালে যে খুব রূপসী ছিলেন তার প্রমাণ এখনো শরীরে ধরে রাখতে চান।

প্রথম দিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, মেয়েটি খুব কম বয়েস থেকেই হস্টেলে থেকেছে বলে বাংলাটা ভাল শেখে নি। সে যে কিছুই ভাল শেখে নি, সেটা তিনি জানেন না। কি একটা গোলমালের জন্য মেয়েকে হস্টেল থেকে নিয়ে আসতে হয়েছে।

শোভনা ধারিওয়াল ঈষৎ জড়ানো গলায় সেদিনই আমায় জানিয়েছিলেন, এককালে তিনি নিজে খুব বাংলা বই-টই পড়তেন। শরৎবাবুর শেষের কবিতা বইখানা—আমি মৃদু গলায় জানিয়েছিলাম, রবীন্দ্রনাথের।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, রবিবাবুর শেষ প্রশ্ন, চমৎকার বই, কি যেন নাম মেয়েটার, বিনোদিনী, হাউ নাইস—

এর পর তাঁর আর বিশেষ দেখা পাই নি। কোনো কোনোদিন দেখেছি, আমি থাকতে থাকতেই তিনি এক দঙ্গল লোক নিয়ে বাড়ি ফিরলেন, তারপরই পার্টি শুরু করে দিলেন। দারুণ হৈ-হুল্লোড়, তার মধ্যে মেয়ের লেখাপড়া সংক্রান্ত আলোচনা করা যায় না। আবার দিনের পর দিন তাঁকে বাড়িতে দেখাই যায় না।

দেবযানীকে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে, অনুনয় বিনয় করে পড়তে বলি, সে কিছুতেই পড়বে না। শুধু মিটিমিটি হাসে। এক লাইনও লিখতে চায় না সে। কিছু লিখতে বললেই বলে, আপনি লিখুন না! এমন একটা সুন্দর মেয়েকে বকুনি দেওয়া যায় না।

বোকাদেরও এক ধরনের দুষ্টু বুদ্ধি থাকে। দেবযানীর সে রকম দুষ্টুবুদ্ধি অনেক ছিল। প্রথম প্রথম দেখতাম, ও আমার হাতের ওপর নিজের হাত রাখছে। ভাবতাম সরল বলেই এসব কিছু বোঝে না। আমি হাত সরিয়ে নিতাম।

কয়েকদিন পরে টেবিলের তলায় ওর পা দিয়ে আমার পায়ের সঙ্গে খেলা শুরু করল। প্রথমে আমি চমকে উঠেছিলাম। কয়েকবার এ রকম করার পর আমাকে বলতেই হল, এ কি করছ দেবযানী?

উত্তর না দিয়ে ও ফিকফিক করে হাসে। তখন মৃদু ধমক দিতেই হয়। তাও শোনে না। আমি পা সরিয়ে নিলেও লম্বা করে নিজের পা এগিয়ে দেয়। তখন আমার ভয় ভয় করে।

বাড়িতে ওর মা বাবা কেউ নেই। নির্জন ঘরে একটি সুন্দরী মেয়ে আমার সঙ্গে দুষ্টুমী করছে। আমার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে আওয়াজ হয়। নিজেকে সামলাতে পারব তো? ওর সঙ্গে তখন আমার বয়েসের তফাত সাত আট বছরের। আমার কান গরম হয়ে ওঠে। চোখ মুখ জ্বালা করতে থাকে, তবু নিজেকে সামলে আমি চেয়ারের ওপর পা তুলে নিই।

এক একদিন দেবযানী এমন জামা পরে আসে, যে-জামার কাজ শরীরকে ঢেকে রাখা নয়, বেশী করে দেখানো। হাজার সংযমের চেষ্টা করেও ওর বুকের দিকে না তাকিয়ে পারি না। তাতে ও একটুও লজ্জা পায় না। বরং আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে ও নিজেই নিজের বুক দেখে আর আপন মনে হাসে।

দেবযানীর আরও একটা অদ্ভুত স্বভাব ছিল নিজেই নিজের ডান বাহুতে চুমু খেত। সব জামাই হাত-কাটা। নগ্ন বাহু দুটি কি পেলব আর নরম। হঠাৎ সেই হাতের ওপর ঠোঁট চেপে ধরে দেবযানী। যেন অন্য কাউকে আদর করছে। মেয়েদের ঠোঁটের ওরকম ব্যবহার দেখলেই গা শিরশির করে। নিজের হাতে ওরকম চুমু খেতে আমি আগে কারুকে দেখি নি। সেই সময় আমি ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, ট্রেন দুর্ঘটনা এই সব বিষয়ে চিন্তা করে মনকে অন্যদিকে সরাতে চাইতাম।

ওদের বাড়িতে তিন চার জন ঝি-চাকর। তারা থাকত অনেক দূরে। একজন ঝি এক সময়ে এসে আমাকে এক কাপ চা দিয়ে যেত। আর একজন চাকরকে মাঝে মধ্যে দেখতাম, বেশ গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান মতন, আমারই বয়েসী, কালো চকচকে গায়ের রং। দেবযানী তাকে ডাকত রঘুবীর বলে। রঘুবীর অনেক সময় বিনা কারণেই এ ঘরের মধ্য দিয়ে চলে যেত—আমার ক্ষীণ সন্দেহ হত, ও বোধহয় আমার ওপর নজর রাখছে। পড়ানো শেষ করে

আমি চলে আসবার সময় রঘুবীরই আসত দরজা বন্ধ করে দিতে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। দেবযানীর বাবা-মা কেউ বাড়ি নেই, কখন ফিরবেন ঠিক নেই—সেই সময় নির্বোধ দেবযানীর সঙ্গে থাকবে ওই এক জোয়ান চাকর, কি রকম যেন একটা অস্বস্তি হয়।

প্রথম মাস শেষ হবার পর একদিন দেবযানী আমাকে একটা খাম দিয়ে বলল, মাম্মি দিয়েছে আপনাকে। ছাত্রীর হাত থেকে টাকা নিতে বিষম লজ্জা লাগে। খামটা না খুলেই পকেটে রেখে দিলাম। বাড়িতে এসে খুলে দেখলাম, খামের মধ্যে টাকা নেই, একটা পঁচাত্তর টাকার চেক। মহা ঝামেলায় পড়লাম। আমার কোনো ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট নেই। বন্ধু বান্ধবদের জিজ্ঞেস করে বেড়াতে লাগলাম, কি করে ওই টাকা তোলা যায়। শেষ পর্যন্ত পাঁচ টাকা দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হল।

এর দু'দিন বাদে দেবযানীর মা আবার এক দঙ্গল লোক নিয়ে ফিরলেন। একটা আলমারী খুলতে গিয়ে আমার দিকে চোখ পড়ল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, ওঃ, খুব ভুল হয়ে গেছে, আপনার স্যালারিটা দেওয়া হয় নি—।

হাতব্যাগ খুলে চেকবই বার করে উনি প্রায় লিখতে যাচ্ছিলেন, আমি বললাম, না না, আপনি তো পরশুই আমাকেই দিয়েছেন—

দিয়েছি? সত্যি?

আমি বললাম, দেখুন, দেবযানীর পড়াশুনোর ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার ছিল—

উনি ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন, সে আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।

ভদ্রমহিলা তখন রীতিমত মাতাল। আমার কথা শোনবার সময় নেই। দেবযানী আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে। বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা এবং ভারত বিখ্যাত ব্যক্তির পরিবারের আজ এই অবস্থা।

দু'দিন বাদে ব্যাংক থেকে চেকটা ফেরত এলো। সই মেলে নি কিংবা টাকা নেই, কি যেন একটা ব্যাপার। চেকটা পকেটে নিয়ে এলাম। কিন্তু দেবযানীর মা'র দেখা পেলাম না। ছাত্রীর কাছে টাকা পয়সার কথা বলা চলে না।

পর পর কয়েকদিন চেকটা পকেটে নিয়ে যাই আবার ফেরত নিয়ে আসি। একদিন মাত্র দেবযানীর মায়ের দেখা পেয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে এত লোকজন ছিল যে লজ্জায় কিছুতেই টাকার কথা বলতে পারলাম না। বলা যায় না। বুকের মধ্যে একটা অভিমান জমে থাকে শুধু। টাকাটা ওঁদের কাছে খুবই সামান্য, কিন্তু আমার কাছে অনেক।

পরের দিন আবার গেলাম। মন-মেজাজ ভাল নেই। মনে হচ্ছে, টাকার কথাটা আমি কোনোদিনই বলতে পারব না। তাহলে কি এই রকমই মাসের পর মাস উনি আমাকে চেক দিয়ে যাবেন, আমি তা ভাঙাতে পারবো না? হঠাৎ আলো নিভে গেল। এ রকম হয় মাঝে মাঝে, দশ পনেরো মিনিট বাদে আবার জ্বলে ওঠে। সেই সময়টা চুপচাপ বসে থাকি। সারা বাড়িতে কোনো শব্দ নেই, অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমি আর টেবিলের উল্টো দিকে একটি নির্বোধ রূপসী মেয়ে। মেয়েটি আবার সেই পা দিয়ে আমার পায়ের সঙ্গে খেলা শুরু করে।

আমি বললাম, দেবযানী, এ রকম কর না!

ও শুধু হাসে। অন্ধকারের মধ্যে চেপে ধরে আমার হাত।

মেজাজটা খারাপ ছিল বলেই আমি বললাম, আজ তবে আমি যাই।

দেবযানী চটাস্ চটাস্ শব্দ করে নিজের বাহুতে দুটো চুমু খেল।

এই সময় একটা রুপোর বাতিদানে একটা বড় মোম জ্বালিয়ে নিয়ে এলো রঘুবীর। তাকে দেখেই দেবযানী হাসতে হাসতে বলল, মাস্টার সাব হামকো কিস্ খায়া!

আমি কোনো প্রতিবাদ করার আগেই রঘুবীর ঠক্ করে বাতিদানটা টেবিলের ওপর রেখেই আমার চুলের মুঠি চেপে ধরে বলল, আভি নিকালিয়ে!

আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু লোকটার গায়ে অসম্ভব জোর। তাছাড়া কোনো বাড়ির চাকরের সঙ্গে মারামারি করতে হবে, একথা ভাবলেই ঘেন্না আসে।

আমি দেবযানীর দিকে তাকিয়ে বললাম, কেন এ রকম মিথ্যে কথা বললে?

পাগলের মত দেবযানী হি হি করে হাসতে লাগল। আর রঘুবীরের গায়ের সঙ্গে নিজের শরীরটা লেপ্টে বলতে লাগল, মারো মৎ! মারো মৎ!

রঘুবীর আমাকে ঠেলতে ঠেলতে বাইরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল, আমি তাকিয়ে দেখলাম, আর কেউ আমাকে দেখছে কিনা। যদি কেউ দেখে, যদি কেউ কিছু শোনে, আমার কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না। এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের কথাই সবাই সত্যি বলে মনে নেয়।

হনহন করে এলাম বড় রাস্তায়। তারপর একটা লাথি খাওয়া কুকুরের মতন হাঁপাতে লাগলাম। লজ্জায় ঘৃণায় রাগে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। একবার ভাবছি ছুটে গিয়ে ওই বাড়িটাতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আসি। কিছুই করলাম না। খানিকটা বাদে ফিরে এলাম।

আর কোনোদিন যাই নি। একবার ঠিক করেছিলাম সব কথা জানিয়ে দেবযানীর মাকে একটা চিঠি লিখব। তার পরই আবার একটু ভয় ভয় করেছে। উনি নিশ্চয়ই ওঁর চাকর আর মেয়ের কথাই বিশ্বাস করবেন। আমার চিঠি যদি উনি পুলিশে জমা দিয়ে কোনো-রূমে আমাকে খুঁজে বার করেন!

বহুদিন পর্যন্ত এই অপমানের গ্লানি বুকের মধ্যে পুষে রেখেছি। বাতিল চেকটা পকেটেই রয়ে গেছে। প্রতিকারের কোনো পথ পাই নি। তারপর একদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দেবযানীর মায়ের ঠাকুর্দার একটি জীবনী গ্রন্থ দেখলাম। তাঁর একটা ছবিও রয়েছে। প্রশান্ত ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চেহারা। সেদিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে বললাম, আপনার কাছে আমাদের দেশ অনেকখানি ঋণী। আপনি এ দেশের জন্য অনেক কিছু দান করেছেন। সেইজন্যই, আপনার পরিবারের কিছু ঋণ যদি আমার কাছে থাকে, তাতে কিছু আসে যায় না!

টেলিগ্রাম

ব্যাঙ্কের কাউন্টারে বসে কাজ করছিল সুবিমল, সামনে লম্বা লাইন, এই সময় পিয়ন এসে বললো, স্যার, আপনার টেলিগ্রাম। সই করে নিন।

লাইনের একেবারে সামনের প্রৌঢ়টির মুখে খুব স্পষ্টভাবে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠলো। এখন টেলিগ্রাম পড়ে বাবু হয়তো লাফিয়ে উঠবেন আনন্দে কিংবা কপাল চাপড়াবেন দুঃখে। হয়তো এক্ষুনি ছুটতে হবে বাড়িতে কিংবা স্টেশনে। অন্য লোককে বসাতে হবে কাউন্টারে! নানা ঝামেলা, অন্তত আধঘণ্টা দেরি।

প্রৌঢ় লোকটি মুখ ফিরিয়ে বললেন, ব্যাঙ্কে এসে নিজের টাকা তুলবো, তাও এক ঘণ্টা সময় নষ্ট।

কথাটা সুবিমলের কানে গেল। সে টেলিগ্রামটা সই করে নিয়ে পাশে রেখে দিল। খুলে দেখলো না। প্রৌঢ় লোকটিকে বললো, দিন, আপনার চেক দিন।

এতটা বাড়াবাড়ি সেই প্রৌঢ় লোকটির সহ্য হলো না আবার। তিনি বললেন, আপনি টেলিগ্রামটা দেখে নিন না।

সুবিমল গম্ভীরভাবে বললো, দরকার নেই। দিন, দিন, পেছনে লোক দাঁড়িয়ে আছে।

প্রৌঢ় লোকটি চলে যাবার পর, তাঁর পেছনের লোকটি হাত বাড়াবার আগেই একটি মেয়ে হাত বাড়িয়ে নিজের কাগজটা বাড়িয়ে দিল। মেয়েরা এখানে লাইনে দাঁড়ায় না, পাশ থেকে হাত বাড়ায়।

মেয়েটির ঝলমলে পোশাক, শরীর থেকে একটি মিষ্টি গন্ধ আসছে। সুবিমল মেয়েটির দিকে চোখ তুলতেই মেয়েটি মুখ গম্ভীর করলো। অর্থাৎ সে বুঝিয়ে দিতে চায়, ব্যাঙ্কের সামান্য কোনো কর্মচারীর জন্য সে তার হাসি খরচ করতে চায় না।

সুবিমল দ্রুত হাতে কাজ সারতে লাগলো। তার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে,

কিন্তু কোনো কাজে সামান্য ভুল হলেই বিপদ। মাত্র তিন মাস হলো চাকরিতে ঢুকেছে সুবিমল, এখনো কনফার্মেশান হয় নি।

মাসের প্রথম, এখন ব্যাঙ্কে খুব ভিড়। দুটো পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলার অবসর নেই। টেলিগ্রামটা পড়ে রইলো পাশে। এক সময় হাওয়ায় উড়ে সেটা নিচে গড়িয়ে গেল, সুবিমল লক্ষ্য করলো না।

লাইনের শেষ লোকটিকে বিদায় করতে গিয়ে সুবিমলের দুটো কুড়ি বেজে গেল। তার সহকর্মীরা অনেকেই তখন উঠে পড়েছে। সুবিমল নতুন চাকরিতে ঢুকেছে বলে এখনো বিশেষ কেউ তার বন্ধু হয় নি।

এই সময় অনেকেই টিফিন খেতে বাইরে চলে যায়। কেউ কেউ বাড়ি থেকে টিফিন কৌটো নিয়ে আসে। প্রবীণ জগৎবল্লভবাবু কৌটো থেকে লুচি আর আলুর দম নিয়ে মুখে পুরছিলেন, সেই অবস্থাতেই বললেন, ও মশাই, আপনার পায়ের কাছে কি একটা পড়ে রইলো যে! কাগজ-পত্তর সাবধানে রাখবেন, এখানে ভুলো মন হলে চলে না!

সুবিমল চমকে গিয়ে মুখ নিচু করলো। তার সেই টেলিগ্রামটা। সেটা তুলে নিয়ে বুক পকেটে রেখে অবহেলার সঙ্গে বললো, এটা আমার নিজের কাগজ। দরকারী কিছু না!

ডাক বিভাগের খামের মধ্যে বন্দী আছে কোন সাংঘাতিক খবর, সুবিমল তা জানে না এখনো। সাংঘাতিক খবর ছাড়া, তার নামে টেলিগ্রাম আসবেই বা কেন?

নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে এসেছে। সুবিমলের চেনা-জানা সেরকম আর কেউ নেই, যে তাকে হঠাৎ টেলিগ্রাম পাঠাবে। তা ছাড়া, তার এই ব্যাঙ্কে চাকরি পাবার খবর অনেকে জানেই না এখনো।

টিফিনে সুবিমল পয়সা খরচ করে অত্যন্ত টিপে টিপে। হোটেল রেস্টুরেন্টে ঢোকে না। ফুটপাথ থেকেই খাওয়া সেরে নেয়। ব্যাঙ্ক থেকে একটু দূরে চলে গিয়ে ঝালমুড়ি, বাদাম, বাতাবি লেবু এইসব খায়। সিগারেট খরচ করে গুণে গুণে।

সুবিমল মাইনে পায় সাড়ে চারশো টাকা। এর থেকে আড়াইশো টাকা বাড়িতে পাঠাতেই হয়। বাকি দুশো টাকা—শুনতে অনেক টাকা হলেও, কলকাতা শহরে একজন লোকের পক্ষে চালানো বেশ কষ্টকর। রোজ পরিষ্কার জামাকাপড় পরতেই হয় তাকে। ব্যাঙ্কের চাকরি নিয়ে সে তো আর বস্তিতে থাকতে পারে না। মেসেই লেগে যায় শ দেড়েক। তার ওপর আছে যাতায়াত আর হাত খরচ।

প্রথম চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্টটা পেয়ে সুবিমলের এই সাড়ে চারশো টাকাকেই মনে হয়েছিল দারুণ সৌভাগ্যের মতন। তা তো হবেই, কারণ বর্ধমানে তার দেশের গ্রামের স্কুলে এর আগে মাস্টারী করতো সুবিমল, মাইনে পেত একশো সাতাশ টাকা, তাও প্রতি মাসে জুটতো না। বি কম পাস করে বহুকাল বসে থেকে, বহু চাকরির দরখাস্তের জন্য টাকা খরচ করে, নৈরাশ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে নিতে বাধ্য হয়েছিল, ওই মাস্টারী। এবং এক সময় মনে হয়েছিল, সারা জীবন তাকে এই ভাবেই কাটাতে হবে! পড়াশুনোতে বরাবরই ভালো ছেলে ছিল সে, স্কুলে কখনো ফার্স্ট ছাড়া সেকেন্ড হয় নি। সবাই বলতো, এ ছেলে বড় হয়ে দারুণ কিছু হবে। বি কম পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পেয়েও সে আর এম কম্ পড়ার খরচ যোগাতে পারে নি, ওই মাস্টারীটাই ছিল জীবনের চরম সার্থকতা।

ব্যাঙ্কের চাকরির পরীক্ষাটা দেওয়ার এক বছরের মধ্যেও কোনো খবর না আসায় সে ভুলেই গিয়েছিল ব্যাপারটা। তারপর কোনো এক বর্ষণসিক্ত দুপুরবেলা গ্রামের পিওন ভিজতে ভিজতে এসে এই চমৎকার চিঠিখানা দিয়েছিল।

সুবিমলের হঠাৎ মনে হলো, তার বুকের কাছটা খুব গরম লাগছে। বুক পকেটে রাখা আছে টেলিগ্রামটা। এখনো খোলে নি।

এখন খুলে দেখবে? না, থাক। আড়াইটে বাজে, এক্ষুনি অফিসে ফিরতে হবে। ব্যাঙ্কের পুরনো কর্মীরা অনেকেই টিফিনের পর বেশ দেরি করে ফেরে। কেউ কেউ ফেরেই না। কিন্তু সুবিমল নতুন এসেছে, তার কনফার্মেশন হয় নি, কোনো ছুতোয় যদি তাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়? আরও হাজার হাজার বেকার হাঁ করে আছে।

না, সুবিমল কোনো সুযোগ দেবে না!

বাকি সময়টুকু সুবিমল মুখ বুজে কাজ করে গেল, কোনোরকম ভাবান্তর দেখালো না। কেউ জানে না, তার পকেটে কি দুঃসংবাদ অপেক্ষা করে আছে।

অফিস ছুটির পর সুবিমল হাঁটতে লাগলো মেসের দিকে। এই সময় ট্রাম-বাসে খুব ভিড় থাকে বলে সে রোজ হেঁটেই যায়। পয়সাও বাঁচে। টেলিগ্রামটা মেসে পোঁছেই না হয় পড়া যাবে।

কিন্তু এখন, এক মুহূর্তের জন্যও সে টেলিগ্রামটার কথা ভুলতে পারছে না। এখন অফিসের কাজের ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অন্যমনস্কভাবে রাস্তা পার হবার সময় গাড়ি চাপা পড়তে পারে। না, এরকমভাবে তার মরা চলবে না। সে মরলে, চাকরিটা বাঁচবে কি করে?

খুব তাড়াতাড়ি খবর পাঠাবার জন্যই তো টেলিগ্রাম। নইলে তো চিঠিই লেখা হত। টেলিগ্রাম পাবার পর সঙ্গে সঙ্গে দেখাই নিয়ম। সুবিমল তবু এত দেরি করছে কেন? সুবিমল নিশ্চিত জানে, টেলিগ্রাম মানেই দুঃসংবাদ। যতদূর পারা যায় দুঃসংবাদটাকে দূরে ঠেলে রাখা।

সুবিমল তন্নতন্ন করে ভেবে দেখেছে, কোনোরকম দুঃসংবাদ পাবার সম্ভাবনা তার নেই। তা হলে কি হতে পারে?

তার বাবার অনেক দিনের পুরনো হাঁপানি। হাঁপানি রুগীরা সহজে মরে না। তার মা-ই পুরো সংসারটা চালান। মাকে কোনোদিন অসুখে ভুগতে দেখে নি সুবিমল। চরম দুর্দশার দিনেও মা ছেলেমেয়ের মুখে দুটি ভাত তুলে দিয়েছেন, কোনোদিন বাবার নামে কোনো অভিযোগ করেন নি। মায়ের কি কিছু হয়েছে? হয়তো মায়ের শরীরের মধ্যে অনেক অসুখ ছিল, মা তো কারুকে কিছু বলেন না নিজের সম্বন্ধে। না, না, মায়ের কিছু হতেই পারে না!

তার ছোট ভাই বিল্টু এখনো স্কুলে পড়ে। দু' মাইল দূরে স্কুল, হেঁটে যেতে হয়। বিল্টু দারুণ দুরন্ত। একবার পুরুত মশাই হাত দেখে বলেছিলেন, চোদ্দ বছর বয়েসে বিল্টুর জলের ফাঁড়া আছে। বিল্টুর কত বছর এখন, তের না চোদ্দ? বিল্টু নদীতে সাঁতার কাটতে গিয়ে...। না, না, না—বিল্টুর মতন অমন প্রাণোচ্ছল ছেলে, ভাবাই যায় না!

সুবিমলের দিদির বিয়ে হয়ে গেছে ছ'সাত বছর আগে। আজ ব্যাঙ্কের কাউন্টার যে-মেয়েটির মুখের দিকে সুবিমল কয়েক পলক তাকিয়েছিল, সেই মেয়েটির সঙ্গে তার দিদি রূণুর মিল আছে। টেলিগ্রামটা পেয়ে প্রথমে দিদির কথাই কেন জানি তার মনে পড়েছিল।

অবশ্য, ব্যাঙ্কের ওই মেয়েটির মতন দিদির মুখে আর আগেকার লাবণ্য নেই। দু' বছর আগে বিধবা হবার পর দিদির মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

যথাসাধ্য খরচ করে দিদির বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দিদির ভাগ্যে সুখ নেই। বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে বিধবা হয়ে গেল। দেড় বছরের বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে দিদি ফিরে এসেছিল এ বাড়িতে। তার শ্বশুরবাড়িতে কেউ তাকে আর এখন পছন্দ করে না। সে অলক্ষ্মী, স্বামীকে খেয়ে ফেলেছে।

তখন সুবিমলের দারুণ দুরবস্থা। বাবার রোজগার বন্ধ, সুবিমল বেকার। নিজেদেরই সংসার চলে না। মা জোর করে দিদিকে আবার ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শ্বশুরবাড়িতে। বলেছিলেন, বোকা মেয়ে, নিজের অধিকার তুই ছাড়বি কেন?

ফিরে যাবার সময় দিদি বলেছিল, দেখে, আমি একদিন ঠিক আত্মহত্যা করবো। দিদি ছেলেবেলা থেকেই খুব জেদী। দিদি কি সত্যিই...। না, না, দিদির একটা ছেলে আছে। সেই ছেলের কথা ভেবেও অন্তত...

মেসে ঢুকবার মুখেই সত্যসুন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি সুবিমলকে দেখে এক গাল হেসে বললেন, ও মশাই, আপনি রাঁধতে জানেন?

সুবিমল একটু অবাক হয়ে বললো, না, ঠিক মানে, কেন বলুন তো?

—রান্নার ঠাকুরের খুব অসুখ। আজ নিজেদের মধ্যেই কারুকে রান্নার হাত না

লাগালে আজ আর খাওয়া জুটবে না।

—তাই নাকি? কিন্তু আমি তো রান্নায় কখনো—

—আপনাকে একা রাঁধতে হবে না। সঙ্গে আর একজন কেউ থাকবে।

সুবিমল মিনমিন করে বললো, আচ্ছা তা হলে না হয়—

সত্যসুন্দরবাবু আবার আকস্মিকভাবে প্রশ্ন করলেন, ঠিক আছে। আপনি তাস খেলতে জানেন?

এবার আরও অবাক হয়ে সুবিমল বললো, তা একটু একটু জানি—কেন বলুন তো?

—তাস খেলতে জানলে রাঁধতে হবে না। আমাদের সুখেন্দু দারুণ রাঁধে, সে সব করে দিতে পারে বলেছে। কিন্তু সুখেন্দু রান্নাঘরে ঢুকলে আমাদের তাস খেলার যে একজন লোক কম পড়বে!

সুবিমল বললো, আমি রান্না না তাস খেলা, কোনটা ঠিক ভালো পারবো, বুঝতে পারছি না।

—যান তা হলে, হাত মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে একটু চিন্তা করে নিন। সাতটার মধ্যে মন ঠিক করে ফেলবেন।

সুবিমল নিজের ঘরে এসে দাঁড়ালো। জামাটা খোলার আগে টেলিগ্রামটা পকেট থেকে বের করে নিল হাতে। খামটা খুলতে গেলেও থেমে গেল। সে জানে, টেলিগ্রামটা খুললেই আর তার রান্না কিংবা তাস খেলার কোনো প্রশ্নই থাকবে না। তাকে ছুটতে হবে স্টেশনে। বাড়ির সবাইকে সে ভালবাসে। কোনো একজনের বিপদের খবর পেলেই সে আর কলকাতায় বসে থাকতে পারবে না।

কিন্তু অফিসে ছুটির কি ব্যবস্থা হবে? এখনো সে টেম্পোরারি. এই অবস্থায় কি ছুটি পাওয়া যায়? এই কারণেই কি তার চাকরি যেতে পারে না? সে এখনো পার্মানেন্ট হয় নি। ইউনিয়ন তার হয়ে লড়বে না।

সুবিমল আর চিন্তা করলো না। টেলিগ্রামটা না খুলেই সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো সেটাকে। কাগজের কুচিগুলো উড়িয়ে দিল জানলা দিয়ে। সে জানতে চায় না, সে জানতে চায় না!

পরক্ষণেই বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠলো তার। যেন সে নিজের হাতে কারুকে মেরে ফেললো। কাকে? বাবা, মা, বিল্টু না দিদি? কে?

সুবিমল প্রায় চীৎকার করে, অথচ মনে মনে বললো, কারুকে না। আমি কারুকে মারতে চাই না। আমি বাঁচাতে চাই শুধু আমার চাকরিটাকে। ওটা না থাকলে কেউ বাঁচবে না।

সেই ছেলেটি

ম্যাক্সমুলার ভবনের সভাকক্ষে কবিতা বিষয়ক উত্তপ্ত আলোচনার ঝড় বইছিল। এরই মাঝখানে কারুকে কিছু না বলে অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাইরের প্রশস্ত অলিন্দে কয়েকটি চেয়ার ও সোফা কৌচ পাতা, একটিও মানুষ নেই। তাঁর পরিচিত একজন মহিলাও সেই সময় বেরিয়ে এসেছিলেন সভা থেকে। অরিন্দম সেই দীর্ঘ দীপিতা মহিলার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন কিন্তু মহিলাটি বেশীক্ষণ বসলেন না। তখন একা একটি চেয়ারে বসে অরিন্দম সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানতে লাগলেন। একা থাকলেই তার মুখখানা বিষাদময় হয়ে যায়।

অরিন্দমের বয়েস আটত্রিশ। সুপুরুষ বা সুদর্শন নন, কিছুটা স্থূলত্ব কমাতে পারলে তাঁর চেহারাটিকে চলনসই বলা যেতে পারতো। মেয়েরা এই রকম চেহারার পুরুষদের স্বপ্ন দেখে না। আবার পরিচয় হলে অপছন্দও করে না।

প্রথম যৌবনে অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা লিখে খানিকটা সুনাম ও দুর্নাম অর্জন করেছিলেন, সুনামের চেয়ে দুর্নামের ভাগ বেশি হওয়ায় তাঁর নাম বেশ অনেকদূর ছড়িয়ে

যায়। এখন অবশ্য তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবেই পরিচিত, দু-তিনটে উপন্যাস ফিল্ম হয়েছে, পুজো সংখ্যাগুলির অনেক পাতা তিনিই ভরান, বছরে ছ-সাতখানা করে বই বেরোয়, কলেজের মেয়েরা দল বেঁধে তাঁকে দেখতে আসে। প্রথম প্রথম অলেখক তরুণ সমাজ অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাদের মুখপাত্র মনে করতে লাগলেন, এখনকার যৌবনের কথা তিনিই যেন একমাত্র তুলে ধরছেন—এই রকম একটা ভাব। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা একটা নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম ক'রে যাওয়ায় এরা অনেকেই আবার তাঁর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল। এবং জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্ভুৎ ধরনের কাঁচা গল্প লেখাতেও বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন।

তবু কবিতার পুরনো গন্ধ এখনো গায়ে লেগে আছে ব'লে এই ধরনের কবিতা সভায় তাঁর ডাক পড়ে। আগে অরিন্দম এই সব সভায় খুব হৈচৈ করতে ভালোবাসতেন। এখন কোনো রকম আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন না। এ সবই তাঁর মনে হয় ফাঁকা মানুষদের কোলাহল।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় একা একা ব'সে ব'সে সিগারেট টানছিলেন, এমন সময় একটি একটি কিশোর কিংবা সদ্য যুবা—অর্থাৎ আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছেলে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। প্রথম যৌবনের সমস্ত লাবণ্য ও তেজ তার মুখে মাখা রয়েছে, খুব সরু প্যাণ্ট ও সাদা রঙের শার্ট পরা। সে বললে, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবেছিলেন, ছেলেটি জিজ্ঞেস করবে, এখন কটা বাজে কিংবা মিটিঙটা কোথায় চলছে—এই ধরনের কোনো সাধারণ প্রশ্ন। তিনি নির্লিপ্তভাবে বললেন, হ্যাঁ, বলুন!

—আপনি এত বেশী লেখেন কেন?

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি জনপ্রিয় এবং তাঁর চেহারাও অনেকের কাছে পরিচিত : সেই জন্যই একটু চমকে গিয়ে বললেন, কি?

—আপনি এতো বেশি লেখেন কেন?

—তুমি কি আমাকে চেনো?

—হ্যাঁ, চিনি।

—অচ্ছা, আর লিখবো না।

—আপনি আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন না।

—আমি কি উত্তর দিতে বাধ্য?

—হ্যাঁ।

—বললাম তো, আর লিখবো না। ক্ষমা চাইছি।

—এটা কোনো উত্তর হলো না।

—আমি যদি আর একদম না লিখি, তুমি খুশি হবে?

—সেটা কোনো কথা নয়। আপনার লেখা আমার ভালো লাগতো?

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় চকিতে ভেবে নিলেন, এই বয়েসি ছেলেটি কবে থেকে তাঁর লেখা পড়তে শুরু করলো, কবে ভালো লাগলো এবং কবে থেকেই বা খারাপ লাগতে শুরু করলো? তারপর তাঁর মনে পড়লো, তিনি নিজেই এগারো-বারো বছর বয়েসে 'চরিত্রহীন' এবং 'শেষের কবিতা' পড়েছিলেন—পরে আর ও বই দুটো হাতে নেন নি—কিন্তু এখনো মনে আছে।

এই ছেলেটি ভালো ছেলে। এই ছেলেটির বলার স্বর উত্তপ্ত হ'লেও আসলে লাজুক। এই বয়েসের ছেলেরা লাজুক না হ'লে ভারী বিশ্রী হয়। তিনি বললেন, উনিশ শো তিয়াত্তর সালের এপ্রিল মাস থেকে আমি আবার বদলে যাবো।

ছেলেটি বললো, আপনি এমনিতেই অনেক বদলে গেছেন।

—আমি আবার বদলে যাবো।

—উনিশ শো তিয়াত্তরের এপ্রিল থেকে কেন? ওই বিশেষ সময়টার কোনো মানে আছে কি? কি রকমভাবে বদলাবেন?

—তোমার নাম কি?

—অর্ণবজ্যোতি সেনগুপ্ত

—তুমি কি নিজে লেখো ? আমি তোমার কোনো লেখা পড়ি নি।

—পড়বার সময় কোথায় আপনার ? অবশ্য, আমার তেমন কোনো লেখা ছাপা হয় নি এখনো। সে সম্পর্কে কিছু বলতেও আসি নি। আমি আপনার সম্পর্কেই—

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় দোষশূন্য মানুষ নন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর ব্যবহারে কখনো কখনো গুরুতর ত্রুটি দেখা গেলেও তাঁর একটি গুণ স্বীকার করতেই হবে। সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে তাঁর কোনোদিন কোনো হ্যাংলামি ছিলো না। তিনি নিজের কোনো লেখা সম্পর্কে কোনোদিন নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছেও মতামত জিজ্ঞেস করেন নি। কখনো বয়োজ্যেষ্ঠ লেখকদের কাছে উপদেশ নিতে যান নি। তাঁর প্রশংসা বা নিন্দাসূচক যে সব রচনা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয় সেগুলোর পাতা উল্টেও দেখেন না। মুখোমুখি কেউ কিছু বলতে এলেও তিনি পাশ কাটিয়ে যান। তিনি ভদ্র ও বিনয়ী হিসেবে পরিচিত হ'লেও এক এক সময় অত্যন্ত নিষ্ঠুর হ'তে পারেন।

এই ছেলেটিকে তিনি এক কথায় বিদায় ক'রে দিতে পারতেন, কিন্তু ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর ভালো লাগলো।

—তাহ'লে অনেক কিছু বলতে হয়। আমি ওই সময়-সীমাটা নিয়েছি, কারণ এর মধ্যে আমাকে দু'একটা খুন করতে হবে।

ছেলেটি চমকালো না। বললো, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—আমি এর আগেও কয়েকটা খুন করেছি। আমাকে দেখে বোঝা যায় না? তুমি নিজেই তো বললে, আমি বদলে গেছি। এবার দরকার সেই হত্যাকারীদের খুন করা। তাহলে যদি আবার বদলাতে পারি।

—আপনি পারবেন না।

—তুমি কি আমার কাছে এসে একটু বসবে ? আজ আমার মনটা খারাপ। অর্ণবজ্যোতি তুমি কারুকে ভালোবাসো, নিজেকে ছাড়া ?

—আমি নিজেকে ভালোবাসি, একথা কে বললো ?

তোমার বয়েস বোধ হয় আমার ঠিক অর্ধেক, তাই না ?

—বয়েসের প্রশ্ন তোলার কোনো মানেই হয় না। আপনার কাছে যা জিজ্ঞেস করে-ছিলাম, তার কোনো উত্তর পেলাম না।

এমন সময় দুটি ফুরফুরে চেহারার মেয়ে এসে অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়কে বললো আপনার অটোগ্রাফ দেবেন ?

অটোগ্রাফ দিতে অরিন্দম কখনো এতো লজ্জা পান নি। ওই ছেলেটির উপস্থিতির জন্যই তিনি খুব সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন—নইলে সাধারণত এই সব অল্প বয়েসী মেয়েদের সংসর্গ তিনি বেশ উপভোগ করেন। আজ যতো দূর সম্ভব সংক্ষেপে সেরে নিতে চাইলেন—কিন্তু মেয়ে দুটি সইয়ের সঙ্গে কিছু লিখিয়ে নিতে চায়।

অরিন্দম মুখ তুলে দেখলেন অর্ণবজ্যোতি চলে গেছে। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত বোধ করলেন। বঞ্চিত মানুষের মতন তেতো ঠোঁটে তিনি ধরালেন আর একটা সিগারেট। মনে মনে বললেন, অর্ণবজ্যোতি, অর্ণবজ্যোতি, এরই মধ্যে চলে যাওয়া তোমার উচিত হয় নি। আমার কোনো বন্ধু নেই, এমন কেউ নেই যার কাছে আমার দুঃখের কথা বলতে পারি—তুমি কি আমার বন্ধু হ'তে পারতে না ? যে-আবেগে আমি কোনো নারীর-ওষ্ঠ চুম্বন করি, ঠিক সেই রকম আবেগের সঙ্গে তোমাকে ভালোবাসতাম। আমি যা পারি নি, তুমি কি তা পারবে ?

সেদিন রাত্রে অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় একটি স্বপ্ন দেখলেন। সাহিত্যে বর্ণিত স্বপ্ন সাধারণত খুব জটিল এবং শিল্প-গন্ধী হয়, কিন্তু এই স্বপ্নটি খুব সাধারণ। অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরে গেছেন তাঁর ঊনিশ বছর বয়সে, অনেকটা অর্ণবজ্যোতির মতনই চেহারা, আর একটু হৃষ্টপুষ্ট, মাথার চুল বেশি। সেই অল্প বয়েসী অরিন্দম একলা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, নিঃস্ব। বিশেষত্বহীন এক সদ্যযুবক, মুখ নিচু করে, প্যান্টের পকেটে হাত, ছেঁড়া চটি। হাঁটতে হাঁটতে একটা গাড়ি বারান্দাওয়ালা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো, তাকালো

ওপরের দিকে, রাস্তার চার দিকে দেখলো, তারপর থুঃ ক'রে ঘৃণার সঙ্গে থুতু ছুঁড়ে দিলো সেই বাড়ির দেয়ালে। তারপর বাড়িটার মধ্যেই ঢুকে গেলো?

পরদিন সকালবেলা অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় সেই একই মানুষ রয়ে গেলেন—শুধু সকালবেলাটা তাঁর মন খারাপ রইলো।

গল্পের নায়িকা

আগে থেকে হোটেল ঠিক করা ছিল না, তাই মনে মনে একটু আশঙ্কা ছিল, পুরী পেঁৗছে থাকবার জায়গা পাবো কিনা। কিন্তু উপস্থিত হয়ে দেখলাম, পুরী প্রায় ফাঁকা। আসন্ন রেল ধর্মঘটের আশঙ্কায় বিশেষ কেউ এখন বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে না।

টুরিস্ট লজের দোতলায় একটা চমৎকার ঘর পাওয়া গেল। দোতলায় প্রায় আর কোনো ঘরেই লোক নেই। আমরা অবশ্য এ জন্য খুশীই হলাম। কলকাতার ভিড় থেকে পালাবার জন্যেই তো এ রকম বাইরে বেড়াতে আসা।

আমাদের কাজ হলো শুধু সমুদ্রের ধারে বসে থাকা। সকাল, দুপুর, সন্ধে, এমন কি অনেক রাত পর্যন্ত। নির্জন সমুদ্রতীর। অবিরাম ঢেউয়ের খেলা দেখতে একটু ক্লান্তি আসে না। গরম নেই, বেশ মোলায়েম হাওয়া। কখনো বালির ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকি, তখন মনে হয়, কতদিন আকাশ দেখি নি। 'চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়, উড়ে উড়ে যায় পাখি'।

শান্তা বললো, এখানে একটাও লোক নেই, বিশ্বাসই করা যায় না, তাই না?

আমি বললাম, তোমার কি ফাঁকা ফাঁকা লাগছে নাকি?

শান্তা: মোটেই না। আমার তো মনে হচ্ছে সমুদ্রটা যেন শুধু আমাদের নিজস্ব।

—তোমার ভালো লাগছে তো?

—দারুণ ভালো লাগছে। তোমার?

—আমারও।

আসলে কিন্তু আমরা কেউই সত্যিকথা বলছিলুম না। দিন দুয়েকের মধ্যে আমাদের বেশ একঘেয়ে লাগছিল। জল যেমন জলকে টানে, মানুষও তেমনি মানুষকে চায়। পরিপূর্ণ নির্জনতা পছন্দ করে সন্ন্যাসীরা। আমরা তো সন্ন্যাসী নই।

তৃতীয় দিনেই আমরা একজন প্রতিবেশী পেয়েছিলাম। সমুদ্রস্নান সেরে ফিরে এসে আমি বারান্দার চেয়ারে একটা বই খুলে বসেছি। একটু পরেই নিচেই ডাইনিংহলে খেতে যেতে হবে, তার আগে একটু বই পড়ে নিলে আমার খিদে বাড়ে। এই সময় দোতলার কোণের ঘর থেকে একটি যুবক বেরিয়ে দরজায় তালা বন্ধ করলো, তারপর ধীরপায়ে হেঁটে আসতে লাগালো আমাদের দিকে।

আমি উৎসুকভাবে যুবকটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখের ভাবটা এমন করে রইলাম, যাতে চোখাচোখি হলেই কিছু একটা বলা যেতে পারে। কিন্তু যুবকটি আমার কাছাকাছি এসেই মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল, তারপর উদাসীনভাবে চলে গেল সিঁড়ির দিকে।

আমি রীতিমতন অপমানিত বোধ করলাম। সচরাচর যেচে কারুর সঙ্গে আলাপ করা আমার স্বভাব নয়। ছোকরাটা আমাকে গ্রাহ্যই করলো না? রেগে গেলেই আমার পায়চারি করা স্বভাব। শান্তা ঘরের মধ্যে জামাকাপড় বদলাচ্ছে, আমি লম্বা বারান্দাটায় পায়চারি করতে লাগলাম।

হাঁটতে হাঁটতে বারান্দার শেষপ্রান্তে এসেছি, তখন যেন হঠাৎ শুনতে পেলাম, বন্ধ ঘরটার মধ্য থেকে কাপড়কাচার শব্দ আসছে। আর চুড়ির টুংটাং। শব্দটা খুব আস্তে হলেও আমার কান এড়ালো না। কিন্তু ঘরটা তো বাইরে থেকে তালাবন্ধ। এইমাত্র যুবকটিকে দেখলাম তালা আটকাতে। এ আবার কি ব্যাপার? নিঃসন্দেহ হবার জন্য আমি দরজার আরও কাছে এসে কান পাতলাম। ভেতরে সত্যিই কাপড়কাচার ধুপধাপ শব্দ

আর চুড়ির টুংটাং শব্দ।

বেশ একটা গল্প করার মতন বিষয় পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে শান্তাকে বললাম, কোণের ঘরটায় একটা মেয়ে আছে!

শান্তা আমার কথায় অবাক না হয়ে বললো, তুমি বুঝি ওই দিকে উঁকিঝুঁকি মারতে গিয়েছিল?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, না, না—

শান্তা মুচকি হেসে বললো, তোমাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে। মেয়েটিকে দেখতে কেমন?

আমি বললাম, দেখতেই তো পেলাম না। ঘরটার বাইরে থেকে তালাবন্ধ।

শান্তা বললো, তালাবন্ধ ঘরের মধ্যেও তুমি একটা মেয়ে দেখে ফেললে। তোমার কি এক্সরে আই নাকি!

ব্যাপারটা শান্তাকে বোঝানোই গেল না। তখন আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, দেরি হয়ে যাচ্ছে, চলো খেতে চলো!

খাবারঘরের একপ্রান্তের টেবিলে যুবকটিকে দেখতে পেলাম। দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে আছে। আমরা ছাড়া, খেতে এসেছে আর কয়েকটি সাহেবমেম। ওরা সেদিন সকালেই এসে পৌঁছেছে একটা স্টেশন ওয়াগন নিয়ে। ওরাই হৈচৈ করে সরগরম করে রেখেছে জায়গাটা।

আমাদের খাবারের অর্ডার দেবার পর আমি সেই যুবকটির দিকে ইঙ্গিত করে শান্তাকে চুপিচুপি বললাম, আমি একটু আগে ওই ছেলেটির কথাই বলছিলাম।

শান্তা বললো, ছেলে! তুমি তো একটা মেয়ের কথা বলছিলে।

—ওই ছেলেটা একটা মেয়েকে ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ করে রেখে এসেছে। আর নিজে একলা এখানে বসে খাচ্ছে।

—তুমি পরের ব্যাপারে এত নাক গলাও কেন?

—বাঃ, এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার না?

এরপর থেকে সমুদ্রের বদলে ওই তালাবন্ধ ঘরটাই আমার কাছে বেশী আকর্ষণের কারণ হয়ে উঠলো। শান্তার চোখ এড়িয়ে আমি বিকেলের দিকে আরও দু একবার ঘুরে এলাম বারান্দার ওই দিকটায়। কোনো সন্দেহই নেই যে ওই ঘরে একটি মেয়ে আছে। আমি নির্লজ্জের মতন দরজায় কান লাগিয়ে শুনেছি ভেতরে ফিসফিসানি কথা।

ব্যাপারটাকে বেশ রহস্যময় বলেই মনে হলো। একটি ছেলে যদি একটি মেয়েকে নিয়ে পুরীতে বেড়াতে যায় এবং তারা যদি স্বামী-স্ত্রী না হয়, তাহলে পৃথিবীতে কার কি আসে যায়? কেই বা বুঝতে পারছে? তাহলে এত লুকোচুরি কেন? টুরিস্ট লজের বেয়ারারা এবং ম্যানেজার নিশ্চয়ই জানে। মেয়েটি নিশ্চয়ই না খেয়ে নেই, কোনো এক-সময় তার জন্য খাবার আসে। শুধু অন্য লোকজনের চোখের আড়ালে রাখার উদ্দেশ্য কি?

পরদিন সকালবেলা ছেলেটি যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে, আমি দ্রুত হেঁটে গিয়ে ওকে ধরলাম। পাশ দিয়ে নামবার সময় খুব চেনা ভঙ্গি করে বললাম, আজ কি রকম মেঘ করে এসেছে, দেখেছেন?

ছেলেটি দারুণ চমকে উঠলো। তারপর একটু কঠোর মুখভঙ্গি করে ইংরেজিতে বললো, ইয়েস।

অর্থাৎ ছেলেটি আমাকে বোঝাতে চায় যে ও বাঙালী নয়। যাতে আমি ওর সঙ্গে গায়েপড়ে কথা বলা বন্ধ করি। কিন্তু ছেলেটি যে বাঙালী, তাতে কোনো সন্দহই নেই। চুল আঁচড়াবার ভঙ্গি দেখেই বাঙালী চেনা যায়।

আমি ছেলেটিকে সাহায্য করতেই চাইছিলাম। আমি চাইছিলাম ওর ভয় ভেঙে দিতে। অসামাজিক কোনো কাজ করতে গেলে সাহস থাকা চাই। সাহসী লোকেরাই সমাজের নিয়মকানুন ভাঙে। কিন্তু ছেলেটি আমাকে পাত্তাই দিল না।

দুপুরবেলা শান্তা আমাকে বললো, তুমি সমুদ্রে যাবে না?

আমি তখন একটা বই খুলে বসেছি বারান্দার ইজিচেয়ারে। আকাশে চমৎকার মেঘ।

আমি বললাম, না, আজ আর ইচ্ছে করছে না!

শান্তা শাড়ি ও তোয়ালে নিয়ে রেডি। অবাক হয়ে বললো, সকালেও তো বেরোও নি। সারাদিন এখানে বসে থাকবে না কি? চলো, আমার সঙ্গে চলো—

আমি তখন গোয়েন্দার মতন রহস্য সমাধানের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলাম। বন্দী মেয়েটিকে অন্তত একপলকের জন্যও আমার দেখা দরকার। কোনো না কোনো সময় সে কি বাইরে বেরুবে না? এ কখনো হয়?

শান্তাকে এ সব কথা বলি নি আর। অন্য একটি মেয়ে সম্পর্কে এত উৎসাহের কারণ কি ওকে জানানো যায়?

আমি বললাম, তুমি আজ একাই স্নান করে এসো না!

শান্তা এবার দারুণ রেগে গিয়ে বললো, একা যাবো? আমি পুরীতে এসেছি একা একা স্নান করার জন্য!

রাগ করে শান্তা শাড়ি আর তোয়ালে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, ওকে সামলাতে হলো। বই মুড়ে রেখে ওর সঙ্গে চলে এলাম সমুদ্রের পারে। জলে নামবার পর মনে হলো, এতক্ষণ আমি কি পাগলামি করছিলাম? সমুদ্রে স্নান করার চেয়ে আর ভালো ব্যাপার কি থাকতে পারে?

তাছাড়া, বারান্দায় সর্বক্ষণ বসে থেকে আমি বোধহয় ক্ষতিই করছিলাম ওই বন্দী মেয়েটির। সবাই যখন স্নান করতে আসে, টুরিস্ট লজ ফাঁকা থাকে, তখন ও অন্তত নিঃশ্বাস ফেলার জন্য বাইরে আসতে পারে একবার।

সাহেবমেমরা জলের মধ্যে মাতামাতি শুরু করেছে। এরা হিপি-হিপিনি। এরা অনেকেই বিয়েটিয়ের ধার ধারে না। কত সাবলীল সুন্দরভাবে জীবন কাটাচ্ছে। ওদের পোশাক এতই ছোট এবং জলের মধ্যেই মাঝে মাঝে এমন চুমু খাচ্ছে যে মনে হয় ইংরেজি সিনেমার দৃশ্য দেখছি!

আর আমাদের প্রতিবেশী ওই ছেলেটি একটি মেয়েকে পুরীতে নিয়ে এসেও একবারও সমুদ্রে স্নান করার সুযোগ দিতে পারছে না। কি এমন ভয়? মেয়েটিই বা রাজি হলে, কেন?

টুরিস্ট লজে আরও দু দিনের মধ্যেও আমি মেয়েটিকে একবারও দেখতে পাই নি। অবশ্য বারান্দায় বসে পাহারা দেওয়াও বন্ধ করেছিলাম। এর মধ্যে একদিন কোনারক ঘুরে আসার জন্য সারাদিন কাটলো বাইরে।

এর মধ্যে শান্তাও বিশ্বাস করেছে মেয়েটির অস্তিত্ব। কোনো একসময় আমি যখন ছিলাম না, তখন শান্তা শুনতে পেয়েছিল, ঘরের মধ্যে মেয়েলি গলার কান্না। মেয়েটি কাঁদছিল যখন, তখন ঘরটাতে তালা বন্ধ ছিল না, অথচ ছেলেটিও ভেতরে।

শান্তা এই কথা বলার পর আমি একটু চিন্তা করেছিলাম। ছেলেটি যদি ঘরের মধ্যে একটি মেয়েকে বন্ধ করে রেখে নির্যাতন করে, তা হলে আমার উচিত এর একটা কিছু প্রতিকার করা। পুরুষমানুষ হিসেবে এটা আমার দায়িত্ব।

কিন্তু ছেলেটিকে তো সে রকম অত্যাচারী বলে মনে হয় না! একটু যেন ভীতু ভীতু ভাব সব সময়ে। অবশ্য অনেক লোকই ঘরের মধ্যে আর ঘরের বাইরে এক রকম নয়।

ব্যাপারটা নিয়ে টুরিস্ট লজের ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করার জন্য গেলাম অফিস-ঘরে, সন্ধের দিকে। ম্যানেজার টেবিলের ওপর পা তুলে কাগজ পড়ছিলেন। এখানে কাগজ আসে দুপুরের দিকে। আমাকে দেখেই বললেন, কি কাগজ পড়বেন নাকি?

আমি বললাম, না অন্য একটা কথা। মানে, আঠারো নম্বর ঘরে যারা আছে।—

ম্যানেজার বললেন, আঠেরো নম্বর ঘরে? কেউ নেই তো! ও ঘর তো খালি।

আমি বললাম, না না, খালি না। আমাদের ঘরের থেকে কয়েকখানা ঘর পরেই—

—না, খালি ওই ঘর।

আমি বেশ জোরে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, ম্যানেজার তার আগেই আবার বললেন, এই তো আধঘণ্টা আগেই খালি হয়ে গেল। মিঃ অ্যান্ড মিসেস দত্ত ছিলেন—

আমি চমকে উঠলাম। আধঘণ্টা আগে খালি হয়ে গেছে! দেয়ালের দিকে তাকিয়ে

দেখলাম, আঠেরো নম্বর ঘরের চাবি ঝুলছে। আর কিছু বলা যায় না। এরা স্বামী স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছিল এখানে। তারপর যদি একজন ঘর থেকে না বেরোয় কিংবা চাপা-গলায় কাঁদে, সে ব্যাপারে আমাদের নাক গলাবার কোনো অধিকার নেই।

এর পর শান্তা যখন এই নিয়ে বিছানায় শুয়েছে, আমি 'একটু ঘুরে আসি' বলে বেরিয়ে পড়লাম। যেন একটা চুম্বক আমাকে টেনে নিয়ে গেল রেলস্টেশনে। আমি জানি সারাদিনে একটি মাত্র ট্রেন চলছে, তাও রাত ন'টার আগে ছাড়বে না।

এ আমার কি অশুভ কৌতূহল। কেন আমি ওদের পেছনে পেছনে এ রকম গোয়েন্দা-গিরি করছি। ওরা নিরিবিলিতে থাকতে চেয়েছিল, আমার উচিত ছিল না, ওদের কোনো রকম ব্যাঘাত না করা?

কিন্তু প্রথম থেকেই আমার মনে হচ্ছিল এর মধ্যে একটা গল্প আছে। সাধারণভাবে একটা ছেলে বা মেয়ে যদি বিয়ে না করেও স্বামী স্ত্রী সেজে পুরীতে ফূর্তি করতে আসে, তার মধ্যে কোনো গল্প নেই। কিন্তু এই গোপনীয়তা, ঘরের মধ্যে চাপাগলায় কান্না—এতেই তো রহস্য ঘনিয়ে উঠলো। সেই জন্যই এই গল্পের নায়িকার মুখটা অন্তত একবার দেখবার জন্য ছটফট করছিলাম।

রেলস্টেশনে বিরাট ভিড়। ট্রেন চলবে কিনা ঠিক নেই। তবু বেশ খানিকটা দূরে থেকে আমি ওদের দেখতে পেলাম। একটা বেঞ্চিতে বসে আছে ছেলেটি, তার পাশে, কাঁধে মাথা রেখে একটি কালো শাড়িপরা মেয়ে। মেয়েটির মুখ দেখেই আমি চমকে উঠলাম।

মেয়েটি আমার চেনা!

তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম, এত গোপনীয়তা আর গোপন কান্নার কারণ। আমাকে আর শান্তাকে আগে থেকে দেখতে পেয়েই মেয়েটি আত্মগোপন করেছিল।

লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবার মতন অবস্থা। আমার জন্যই ওদের সব আনন্দ নষ্ট হয়ে গেল। আমি যেন একটি মূর্তিমান ব্যাঘাত। আমি নিজের এ রকম ভূমিকা কখনো কল্পনাও করি নি। ওরা তো জানে না যে আমি জানতে পারলেও ওদের সমর্থনই করতাম।

যাক, ওরা নিশ্চিন্ত যে আমি শেষ পর্যন্ত কিছু জানতে পারি নি। সেই জন্যই, মেয়েটি এখন নিশ্চিন্তে এত লোকজনের মধ্যেও ছেলেটির কাঁধে মাথা হেলান দিয়েছে।

আমি দ্রুত চলে এলাম রেলস্টেশন থেকে। আর কোনো রহস্য বা আকর্ষণ রইলো না, কাল থেকে শুধুই সমুদ্র দেখতে হবে।

আমার ভাই

আমার নিরুদ্দিষ্ট ছোট ভাইয়ের কথা আমি প্রায়ই ভাবি। তার নাম ছিল টোটো, ভালো নাম তিমিরকুমার, মাত্র ছ'বছর বয়সে সে শিয়ালদা স্টেশনে হারিয়ে যায়।

টোটোর ঠিক ছ'বছর বয়সের ছবিও আমার বাড়িতে নেই। তার ছ'মাস বয়েস থেকে সাড়ে চার বছর বয়েস পর্যন্ত অনেক ছবি আছে, তারপরের দেড় বছর কি কারণে তার ছবি তোলা হয় নি। খুব বাচ্চা বয়সে ছবি তোলার ধুম থাকে, একটু বড় হলে সেটা অনেকটা কমে যায়।

টোটো খুব দুরন্ত ছিল। সেবার আমরা সবাই দার্জিলিং থেকে ফিরছিলাম। দার্জিলিং-এ সামলাবার জন্য হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলাম আমরা। টোটো এই আছে, এই নেই। যখন তখন দৌড়ে বাইরে চলে যায়। পাহাড় থেকে যদি পড়ে যায়—এই ভয়ে টোটোকে আমরা এক মিনিট চোখের আড়াল করতাম না। বাড়ির ছোট ছেলে বলে সে ছিল সবার চোখের মণি। দার্জিলিং-এ টোটোর কিছু হয় নি, কিন্তু শিয়ালদা স্টেশনে এসে সে হারিয়ে গেল। আমরা প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়িয়েছিলাম, বাবা কাকারা মালপত্র নামাবার তদারক করছিলেন। টোটো দৌড়াদৌড়ি করছিল—হঠাৎ তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

টোটোকে যে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না এটা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে

পারি নি। একটা জলজ্যান্ত ছেলে কি চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যেতে পারে? সবাই মিলে তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। খুব তাড়াতাড়ি পুলিশকে খবর দেওয়া হলো। দারুণ খোঁজাখুঁজি। আমার ধারণা ছিল, টোটো নিশ্চয়ই কোনো কিছুর আড়ালে লুকিয়ে আছে—আমরা সবাই ক্লান্ত হয়ে যাবার পর বলে উঠবে, টুকি! এই যে আমি!

কিন্তু টোটোকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। শেষ পর্যন্ত পুলিশের থিয়োরি ছিল, নিশ্চয়ই তাকে ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেছে। টোটোকে ধরেই ছেলেধরা কোনো চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়েছে, তাই আর খোঁজ পাওয়া যায় নি। এরপর অবশ্য সারা ভারতবর্ষের পুলিশের কাছে টোটোর ছবি পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু টোটো নিরুদ্দেশই রয়ে গেল।

প্রতিটি দিন, প্রতিটি মাস আমরা ভাবতাম, টোটো আবার ফিরে আসবে। কোনো জায়গা থেকে কেউ তার সন্ধান দিয়ে চিঠি লিখবে। কিন্তু কিছুই হল না।

তারপর কুড়ি বছর কেটে গেছে। সেই থেকে মার হার্টের অসুখ। মা বছরের অধিকাংশ সময়ই বিছানায় শুয়ে থাকেন। বাবা আর কখনো টোটোর নাম উচ্চারণ করেন না—কিন্তু বাবা যে এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেলেন সেটা বোধহয় মনের মধ্যে শোকটা চেপে রাখার জন্যই। আমার জেঠামশাই মারা গেলেন গত বছর। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। মৃত্যুর আগে জেঠামশাইয়ের চোখ থেকে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো, তিনি শুধু বললেন, টোটোকে আর দেখলাম না।"

আমাদের বাড়ি কেউ এলেই টোটোর গল্প শোনে। টোটোর হাজার রকমের দুষ্টুমির গল্প। টোটো এখনো সেই ছ'বছরের শিশুই রয়ে গেছে আমাদের স্মৃতিতে। মা এখনো রাস্তায় কোনো বাচ্চা ছেলে দেখলে ব্যগ্র হয়ে তাকান।

আমি অবশ্য বুঝতে পারি টোটো বেঁচে থাকলে এখন তার বয়স ছাব্বিশ বছর। টোটো বেঁচে নেই একথা বিশ্বাস করতে পারি না। টোটোর অসম্ভব প্রাণশক্তি ছিল। আমি পথে ঘাটে ঘোরবার সময় ছ'বছরের শিশুদের বদলে ছাব্বিশ বছরের যুবকদের মুখে তীক্ষ্ণভাবে তাকাই। কোথাও অচেনা কারুর সঙ্গে চোখাচোখি হলেই বুকের মধ্যে ধড়াস করে ওঠে। এ টোটো নয়ত?

একদিন কলেজ স্ট্রীটের গোলমালের মধ্যে পড়ে গেলাম। দারুণ বোমা ছোঁড়াছুঁড়ি। পুলিশ এসে টিয়ার গ্যাস চার্জ করতেই আমি আর আমার বন্ধু সুবিমল দৌড়ে পালালাম। একটা বাড়ির দরজা ঠেলে ভিতরে দাঁড়িয়েছি. আমাদের ঠেলে একজন যুবক বেরিয়ে গেল রাস্তায়। তার দু হাতে দুটো বোমা। আমার মাথা গুলিয়ে উঠল। দৌড়ে গিয়ে ছেলেটার হাত চেপে ধরে বললাম, এই, কি করছো কি? ছেলেটা রুক্ষভাবে বললো, ছাড়ুন!

—ওদিকে গেলে এখন মরবে। পুলিশ গুলি চালাচ্ছে।

ছেলেটি এক ঝটকায় আমার হাত ছাড়িয়ে ছুটে গেল। আমি আবার ফিরে এলাম।

সুবিমল বিবর্ণ মুখে আমাকে বললো, তোর কি মাথা খারাপ? তুই ওকে আটকাতে গিয়েছিলি? তোকেই যে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় নি, এই তোর ভাগ্য ভালো!

আমার চোখে জল এসে গেল। কোনোক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, তুই জানিস ও না বোধ হয় আমার ভাই।

সুবিমল অবাক হয়ে বললো, তোর ভাই, তার মানে?

আমি আমার যে এক ভাই হারিয়ে গেছে, তার বয়েসও ঠিক এই রকম!

—চেহারায় মিল আছে?

আমি ম্লান হেসে বললাম, তার চেহারা এখন কি রকম আমি জানি না। তবু আমার মনে হলো, ও আমার ভাই তো হতেও পারে? তবু আমরা আর পরস্পরকে চিনতে পারবো না!

সেই দ্বীপে

এক স্বপ্ন সাধারণত মানুষ দু'বার দেখে না। কিন্তু আমি প্রায়ই ঘুরে ফিরে একটা স্বপ্ন দেখি। এই স্বপ্নটিতে আমি এখন এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে জেগে থেকেও দেখতে পাই অনেক সময়।

এটা একটা দ্বীপের স্বপ্ন। তাতে তিনটি মাত্র মানুষ। দুটি পুরুষ একটি নারী। কিংবা সহজ করে বলা যায়, দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে। তিনজনেরই বয়েস একুশ বাইশের বেশী নয়। ছেলে দুটি এবং মেয়েটিও প্যান্ট শার্ট পরা, কিন্তু সেই পোশাক এখন প্রায় ছিন্নভিন্ন, দেখলে মনে হয়, ওরা কোনো নৌকো বা জাহাজ ডুবির ফলে কোনোক্রমে ওই দ্বীপে আশ্রয় পেয়েছে। যদিও ওদের মুখে কোনো বিপদের চিহ্ন নেই।

দ্বীপটি ছোট। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত সহজেই দেখা যায়। উপকূলের কাছটা পাথুরে এবড়ো-খেবড়ো—সমুদ্রের ঢেউ এসে সেখানে ক্রমাগত আছড়ে পড়ে, সব সময় সাদা ফেনা।

কয়েকটা বড় বড় গাছ আছে, গাছগুলোর নাম আমি জানি না। তবে রেনট্রি কিংবা বাওবাব—এই ধরনের চিরল গাছও হতে পারে। দ্বীপের মাঝখানটায় ছোট ছোট আগাছার জঙ্গল, অনেক বুনো ফুল ফুটে আছে—ফুলগুলো সূর্যমুখী ফুলের ধরনের। দ্বীপটিতে বড় জন্তু-জানোয়ার কিছুই নেই—আছে অসংখ্য ফড়িং—তাদের ডানার শব্দ ঢেউয়ের শব্দের মতনই অবিরাম। আর আছে বেশ কিছু খরগোশ। ওই ছেলেমেয়ে তিনটি প্রায় সব সময়ই ধূসর খরগোশগুলোকে তাড়া করছে। দেখে হঠাৎ মনে হয়, খরগোশের পেছনে বাচ্চা ছেলের মতন ছুটোছুটি করা ওদের সারাদিনের খেলা। আসলে খেলা নয়। ওই খরগোশ-গুলোই ওদের খাদ্য। কোনোরকমে একটা দুটো খরগোশ ধরতে পারলেই ওরা সেগুলো আগুনে ঝলসে নিয়ে খেতে বসে যায়। একটা বড় পাথরের আড়ালে আগুন জ্বালা আছে। সব সময়েই জ্বলছে—ওর, একজন এসে মাঝে মাঝেই এক একখানা কাঠ ফেলে দিয়ে যায় সেই আগুনে।

স্বপ্ন সব সময়ই সংক্ষিপ্ত। আমি এক একবার এক একটা ছোট দৃশ্য দেখি।

কখনো দেখি, ওরা তিনজনে ঘুমিয়ে আছে আগুনের পাশে। কখনো দেখি ওরা কয়েকটা পাথরের টুকরো দিয়ে কি যেন হিসেব-নিকেশ করছে। কখনো ওরা এক সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করতে নামে।

সারাদিন ধরে আমি এই টুকরো টুকরো দৃশ্যগুলোকে জুড়ে নিই। একলা থাকলেই এই স্বপ্নটা আমাকে পেয়ে বসে। ওই দ্বীপবাসী ছেলেমেয়ে তিনটির জীবন আমারও জীবনের সঙ্গী হয়ে যায়। আমার মনে হয় সত্যিই কোনো দ্বীপে ওরা আছে।

মাঝে মাঝে আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। কখনো ওই ছেলেমেয়ে তিনটির কারুর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেলে হাতছানি দিয়ে আমাকে ডেকে বলে, এসো, এখানে চলে এসো।

আমি এর মানে বুঝতে পারি না। কি করে যাবো? আমি ওই দ্বীপটার কোনো সন্ধান জানি না। স্বপ্নের মধ্যেও যাওয়া সম্ভব নয়—কারণ, ইচ্ছে মতন স্বপ্ন দেখার কোনো ব্যবস্থা এ পৃথিবীতে একবারও হয় নি। এক সময় জোর করে চোখ বুজে পড়ে থাকি, যদি স্বপ্ন আমাকে ওই দ্বীপে নিয়ে যায়! কিন্তু নিয়ে যায় না।

সারাদিন চাকরি-বাকরি, হাট-বাজার, কত রকম মানুষজন নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। কখনো বিনা কারণে লোকে অপমান করে যায়, অনেক সময় সহ্য করতে হয় অনেক রকম মিথ্যে। মনের গ্লানি মনেই চাপা থাকে—ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তখন ইচ্ছে হয়, সেই দ্বীপটায় চলে যেতে। আমাকে আরও দুঃখ দেবার জন্য তখন স্বপ্নের সেই তিন ছেলেমেয়ে হাতছানি দিয়ে বলে, এসো, এসো।—

ওদের দেশে ঈর্ষা বা লোভ নেই দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। অনেক সময় মেয়েটি একটি ছেলের সঙ্গে নাচে, আর একটি ছেলে হাততালি দিয়ে তাল দেয়। কখনো সে বনহরিণীর মত একা একা ছুটে বেড়ায়, ছেলে দুটি তাকে খোঁজে।

তারপর স্বপ্নের দেবী একদিন আমার ওপর সদয় হলেন। আমি সেই দ্বীপে উপস্থিত হলাম। ছেলেমেয়ে তিনটি আগুনের পাশে ঘুমোচ্ছে। আমি নিঃশব্দে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এমনও হতে পারে, ওরা তিনজনে মিলে তখন আমাকেই স্বপ্ন দেখছে, ওদের স্বপ্নের মধ্যে আমি ওখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

ছেঁড়া ময়লা পোশাক, তবু ওদের শরীরে অপূর্ব রূপলাবণ্য। ঘুমন্ত মুখে লেগে আছে ক্ষীণ হাসি। ঘুমের মধ্যেও মেয়েটির দুই হাত ধরে আছে ছেলে দুটি। যেন ওরা তিনজনে মিলে একটি মানুষ শিকল।

একটু শব্দ করতেই ওরা জেগে উঠলো। অবাক হলো না। চোখ রগড়ে বললো, এই যে এসেছো, বসো।

মেয়েটি কয়েকটি পাথরের টুকরো বার করে বললো, প্রথমে আমরা খেলাটা করে নিই, তারপর অন্য কথা হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি খেলা?

মেয়েটি বললো, পাথরের পাশা খেলা। তুমি যদি জিততে পারো, আমরা তোমার ক্রীতদাস হবো। আর যদি হেরে যাও, তাহলে তুমি হবে আমার ক্রীতদাস। এই ছেলে দুটি যেমন আমার দাস হয়ে আছে।

আমি বললুম, এরকম অদ্ভুত নিয়ম কেন?

মেয়েটি বললো, পৃথিবীর সব জায়গাতেই তো এই রকম নিয়ম। সব জায়গাতেই তো কেউ না কেউ প্রভুত্ব করে, তাই না?

আমি বললুম, যেখানে টাকাপয়সা বা বিষয়সম্পত্তির প্রশ্নই নেই, সেখানে তো এ নিয়ম থাকতে পারে না।

মেয়েটি বললো, আমরা দেখেছি, একজন আর একজনের ওপর প্রভুত্ব না করে বাঁচতে পারে না। তাই আমরা খেলার এই নিয়ম করেছি।

—কিন্তু দূর থেকে তোমাদের দেখে তো এরকম মনে হয় নি।

—দূর থেকে দেখা আর কাছ থেকে দেখা তো এক নয়।

মেয়েটি খেলার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে। এই চ্যালেঞ্জ অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভয়ে আমার বুক দুপদুপ করছে। যদি হেরে যাই, তাহলে সারাজীবন এই দ্বীপে এই মেয়েটির ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে? কিন্তু আমার যে অনেক পিছুটান।

তবু, আমি খেলার নিয়ম জেনে নিয়ে, পাথরের টুকরোগুলো ছুঁড়ে দিলাম। ভয়ে সেদিকে তাকাতে পারি নি।

মেয়েটি বললো, তুমিই জিতেছো।

ছেলে দুটি বললো, আমরা সবাই তোমার ক্রীতদাস।

আমার বুক থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো। আমি মহৎ উদার ভঙ্গিতে বললাম, আমি তোমাদের মুক্তি দিলাম। তোমরা তিনজনেই এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন।

আসলে, এ জীবনে আমি অনেকের কাছেই ক্রীতদাস। শুধু একবার ওই তিনটি যুবক যুবতীকে মুক্তি দিতে পেরে আমার যা আনন্দ হয়েছিল, সে রকম আনন্দ আর কখনো পাই নি।

একটি পুরনো বই

ছেলেটি অনেকক্ষণ বসেছিল এক কোণে। ঘর-ভর্তি লোক। দিবানাথ চৌধুরী এককালে নামজাদা অধ্যাপক ছিলেন, এখন বড় ব্যবসায়ী এবং বিখ্যাত সমাজসেবক। সুতরাং বহু লোক আসে তাঁর কাছে। কেউ কেউ শুভেচ্ছা জানায়, অনেকেই নানারকম চাকরি-বাকরি বা অনুগ্রহ চায়, কেউ কেউ শুধু একবার করে দেখা দিয়ে পুরনো পরিচয় ঝালিয়ে রাখে—কখন কি দরকার পড়বে তার তো ঠিক নেই।

কলকাতায় যে-কদিন থাকেন, দিবানাথ সকালের কয়েক ঘণ্টা এই সব লোকের জন্য

নির্দিষ্ট রাখেন। তাঁর অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব—তবু এদিকটাও উপেক্ষা করা যায় না, জনসংযোগ রক্ষা করাও দরকার।

দিবানাথের বসবার ঘরখানি বেশ প্রশস্ত। অনেকগুলি চেয়ার বেঞ্চি পাতা, হঠাৎ দেখলে কোনো বড় ডাক্তারের চেম্বার বলে মনে হয়। এর পাশেও একটি ছোট ঘর আছে, সেখানে দিবানাথের সেক্রেটারি বসেন। সেক্রেটারিই দর্শনার্থীদের নাম ধাম লিখে ভিতরে পাঠান।

দিবানাথ এক এক করে লোকজনের সংগে কথা বলছিলেন—এক সংগে অনেকের সংগে কথা বলা তাঁর স্বভাব নয়, ঠিক ডাক্তারদেরই মতন। তবে, কারুর সংগে একটু বেশীক্ষণ কথা বললেই বক্তৃতার মতন শোনায়—কলেজে অধ্যাপনা করার সময় থেকেই এই অভ্যাসটা হয়ে গেছে।

এত লোকজনের ভিড়ে দিবানাথ ছেলেটিকে লক্ষ্যই করেন নি।

দিবানাথের বয়েস ষাটের কাছাকাছি, বেশ রাশভারি চেহারা, মুখ দেখে মনে হয়, পৃথিবীর ওপর তাঁর ব্যক্তিগতভাবে কোনো অভিযোগই নেই। তবে, অন্যান্যদের অভাব অভিযোগ দূর করার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর।

চাকরির আবেদন প্রার্থীই বেশী। এদের সংগে একঘেয়েভাবেই কথা বলতে হয়। সবার আবেদনপত্রের ওপর তো তিনি আর সুপারিশ করে দিতে পারেন না। সেটা যুক্তি-সঙ্গতও নয়। তিনি সবাইকে বোঝাতে চান যে, সবাইকেই স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করতে হবে। দেশে শিল্প বাণিজ্য স্থাপনের চেষ্টা তো চলছেই। কিন্তু বাঙালী যদি শুধু চাকরি লোভী হয়েই থাকে—ইত্যাদি।

কেউ কেউ আসেন হাসপাতালের সীট কিংবা সরকারী ফ্ল্যাট যোগাড় করার চেষ্টায়। কারুর কারুর গোপন কথাও থাকে।

ছেলেটি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল। তাকে কেউ ডাকে নি, সামনে যেতেও বলে নি। এক সময় সে নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে দিবানাথের সামনে এগিয়ে বললো, স্যার—।

দিবানাথ মুখ তুলে তাকালেন। ছেলেটির রোগা দোহারা চেহারা, এক মাথা অবিন্যস্ত চুল, আধ ময়লা পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে আছে—বয়স একুশ-বাইশের বেশী না।

দিবানাথ তখন আর একজনের সংগে কথা বলছিলেন, হাত তুলে বললেন, একটু পরে। একে একে আসবে।

ছেলেটি বললো, স্যার, আমি কিছু চাইতে আসি নি। আপনাকে একটি জিনিস দিতে এসেছি।

—কি, দরখাস্ত?

—না, একটা বই।

দিবানাথ ভুরু কুঁচকে তাকালেন, অনেকেই তাঁকে বই-টই উপহার দেয় বটে। এককালে তাঁর বই পড়ার খুবই নেশা ছিল, কিন্তু সে নেশা অনেকদিন ঘুচে গেছে। এখন সময় কোথায়? সব সময়ই তো লোকজন ঘিরে থাকে। গত এক বছরের মধ্যে সরকারী রিপোর্ট আর খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ছাড়া আর কোনো বই উল্টে দেখেছেন কিনা ঠিক নেই।

ছেলেটির হাতে একটি ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেট ছিল—সেটি খুলে একটি বই দিবানাথের টেবিলের ওপর রাখলো। খুব বিনীতভাবে বললো। একবার উল্টে দেখবেন, আপনার নিশ্চয় ভালো লাগবে। হঠাৎ পেয়ে গেলাম। বইখানা বহুদিনের পুরনো। অতি সাধারণ চেহারা, মলাট পর্যন্ত ছেঁড়া। একজন এত বড় বিখ্যাত ব্যক্তিকে আর কেউ কোনো দিন এরকম একটি পুরনো অকিঞ্চিৎকর বই উপহার দেয় নি।

দিবানাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি?

ছেলেটি বললো, কলেজ স্ট্রীটের পুরনো বইয়ের দোকানে পেলাম।

একবার চোখ না বুলিয়ে পারা যায় না। নিয়ম রক্ষার জন্য দিবানাথ একবার বইয়ের পাতা ওল্টালেন। একটি ইংরেজি কবিতার সংকলন, পলগ্রেভের 'গোল্ডেন ট্রেজারি'। এই বই হঠাৎ তাঁকে দেবার মানে কি?

পরের পাতা উল্টে দেখলেন অতি অস্পষ্ট কালিতে লেখা আছে, 'তোমাকে দিলাম'—দিবানাথ চৌধুরী।

দিবানাথ এক দৃষ্টে সেদিকে চেয়ে রইলেন। হাতের লেখাটা তাঁর নিজেরই মনে হচ্ছে। অবশ্য, বহুদিন তার বাংলায় কিছু লেখার প্রয়োজন হয় না। তবু চেনা যায়। কিন্তু সেটা দেখে দিবানাথের কিছু মনে পড়ে না।

আর একটি পাতা উল্টে দেখলেন গোটা গোটা অক্ষরে মেয়েলি হাতে লেখা আছে, 'শ্রীমতী আশা বন্দ্যোপাধ্যায়, দোল পূর্ণিমা'।

দিবানাথের ষাট বছরের বুকটা ধক্ করে উঠলো। একি! এটা তো সত্যিই তিনি একদিন একজনকে উপহার দিয়েছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা!

—তুমি এ বই কোথায় পেলে?

কেউ উত্তর দিল না। দিবানাথ চোখ তুলে দেখলেন, ছেলেটি নেই।

ঘরের অন্য লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গেল ছেলেটি?

—দেখলুম তো স্যার, বেরিয়ে গেল।

—আমাকে কিছু না বলেই বেরিয়ে গেল? রতন, রতন!

পাশের ঘর থেকে দিবানাথের সেক্রেটারি হন্তদন্তভাবে ছুটে এলো। দিবানাথ বললেন, একটি ছেলে এখানে ছিল এই মাত্র, রোগা মতন, সে কোথায় গেল দেখ তো!

রতন জিজ্ঞেস করলো, কি নাম, স্যার?

—নাম তো বলে নি। পাঞ্জাবি পরা, বড় চুল—

সেক্রেটারি ছুটে বেরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'তিনজন। একটু বাদেই ফিরে এসে বললো, নেই তো। চলে গেছে। পুলিশে খবর দেবো?

দিবানাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, না, তার দরকার নেই।

আর কারুর সঙ্গে কথা না বলে দিবানাথ বইটার পাতা ওল্টাতে লাগলেন। এক সময় এইসব কবিতা মুখস্থ ছিল তাঁর। আশাকে এর থেকে কবিতা পড়ে শোনাতেন। অতি কষ্টে দু পয়সা চার পয়সা করে জমিয়ে এই বইটা কিনে উপহার দিয়েছিলেন আশাকে। তখন বইটার দাম ছিল মাত্র দু' টাকা। বইটা পেয়ে আশা খুব খুশী হয়েছিল—দিবানাথ যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আশার হাস্যোজ্জ্বল মুখ—এই চল্লিশ বছর পরেও।

তখন বৃটিশ আমল, দেশ জুড়ে অত্যাচার চলছে, চাকরি-বাকরির অবস্থা খুবই খারাপ। সহায় সম্বলহীন দিবানাথ এই কলকাতায় কতদিন কলের জল খেয়ে কাটিয়েছেন। চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেছেন কত লোকের কাছে। কেউ পাত্তা দেয় নি। সামান্য একটি টিউশনিই ছিল সম্বল। সেই সূত্রেই আশার সঙ্গে আলাপ। প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন আশাকে। কিন্তু আশার মা-বাবা জানতে পেরে দিবানাথকে বাড়িতে আসতে বারণ করে দিয়েছিলেন। পড়াশুনায় ভালো ছিলেন দিবানাথ তবু পাত্র হিসেবে তাঁকে পছন্দ করেন নি তাঁরা। আশার বিয়ে দিয়েছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। আজ ওরকম কত ইঞ্জিনিয়ার দিবানাথের কাছে হাত জোড় করে বসে থাকে। দিবানাথের বুকের মধ্যে কষ্ট হতে লাগলো। আশা কোথায় আছে এখন। বেঁচে আছে কিনা তাও তিনি জানেন না।

কিন্তু এতকাল পরে তাঁর এই দুঃখের কথা মনে করিয়ে দিয়ে লাভ কি? ছেলেটি কে? কেন এসেছিল? এমনও হতে পারে—ছেলেটি হয়তো আগে দু একবার এসেছিল, চাকরি বা কোনো সাহায্য চেয়েছিল, পায় নি, তাই এমনভাবে প্রতিশোধ নিয়ে গেল? একজন বিখ্যাত ব্যক্তির মনে আঘাত দেবার সুখও তো কম নয়।

কিংবা দিবানাথের আর একটা কথাও মনে হলো। হঠাৎ তিনি খেয়াল করলেন, চল্লিশ বছর আগে তাঁর নিজের চেহারাও ওই ছেলেটিরই মতন ছিল। ওই রকম রোগা, এক মাথা চুল, জামা ময়লা। ওই ছেলেটা কি তাঁরই বিবেক? একটা ছেলের ছদ্মবেশ ধরে তাঁর বিবেক এসেছিল তাঁকে সচেতন করে দিতে?

দিবানাথ আপন মনে একটু হাসলেন। তাঁর যে বিবেক আছে বা কোনোদিন ছিল—এ কথাটাই যে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন অনেক দিন।

হর্তেল গাঁয়ের পোস্টমাস্টারের সাত মেয়ে। তার মধ্যে তৃতীয় মেয়েটির বয়স সতেরো কি আঠারো, কিন্তু দেখায় পঁচিশ। এর মধ্যেই দুশ্চরিত্রা হিসেবে তার বেশ নাম ছড়িয়েছে। প্রত্যেক হাটবার এক দোকান থেকে আর এক দোকানে চালাচালি হয়ে যায় পোস্টমাস্টারের তৃতীয় মেয়ে শুষির নতুন নতুন গল্প।

নদীর ধারে কবে একা স্নান করছিল শুষি। একা একাই সে স্নান করতে যায়। কে একজন নৌকোর মাঝি বুঝি তাকিয়েছিল তার দিকে। শুষি নাকি শংখচূড় সাপের মত শিস দিতে পারে। সেই শিসের ডাক শুনলে ফিরে যাওয়ার সাধ্য কারুর নেই। জোয়ান মাঝিটা নৌকো ভেড়ালো পারে, শুষি সেই নৌকোয় উঠে বসলো। নৌকো আবার দুজনকে নিয়ে ভেসে গেল নদীতে।

তামাকের পাতার দোকানে বসে গুলতানি করতে করতে হারাধন সাপুই বললো, এতো আমার স্বচক্ষে দেখা। স্বকর্ণে শোনা। কি বলো গো ইছাইদা?

ইছাইদা ঘাড় নাড়ে। আজ পর্যন্ত সে কারুর কোনো কথায় প্রতিবাদ করে নি।

হারাধন আবার বললো, একদিন বদন শেখ এক চাক নতুন পাটালি দিয়েছিল ওই সোমত্থ মেয়েটাকে। এও আমার স্বচক্ষে দেখা।

ইছাইদা আবার ঘাড় নাড়লো।

হারাধনের পাশে বসে ছিল বগলাচরণ। গোগ্রাসে গিলছিল এইসব গল্প। তামাকের দোকানের সভা ভঙ্গ হলে সে গেল আলু পেঁয়াজের দোকানে। প্রত্যেক হাটেই বগলাচরণের মতন কয়েকটি লোক থাকে, যাদের কোনো কাজ থাকে না, কোনো কেনাকাটি থাকে না শুধু এখানে ওখানে বসে সময় কাটায়। আলু পেঁয়াজের দোকানেও গল্পের অভাব নেই। সেখানে ট্যারা কালু দাবি করলো, সেও স্বচক্ষে দেখেছে যে শুষির বুকে দুধ আছে। শুষি নাকি ভর সন্ধেবেলা বুকের আঁচল সরিয়ে নসু পিসীর কচি ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। অবিবাহিত মেয়ের বুকে দুধ থাকে কেমন করে হে? এই কথা বলে ট্যারা কালু এমন হাসতে থাকে যে শেষ পর্যন্ত তার হেঁচকি উঠে যায়।

হাট থেকে ফেরার পথে বগলাচরণ তার তিনজন সঙ্গীর কাছে এই সমস্ত গল্প উগরে দেয়। সেই সঙ্গে জুড়ে দেয় তার নিজের মন্তব্য, ও মেয়ে, বুঝলি না দাদা, পুরুষমানুষ দেখলেই বুকের রক্ত শুষে নেয়। এমনি এমনি কি আর ভগমান শুষি নাম রেখেছে।

শুষির আসল নাম যে সুশীলা সে কথা কেউ মনে রাখে নি। অনেকে শোনেই নি।

বেড়াচাঁপার মোড়ে এসে বগলাচরণের দু'জন সঙ্গী চলে যায় আকন্দপুর আর বাসুলি-ডাঙার দিকে। তারাও সেখানে গিয়ে তাদের গল্পের শ্রোতা পেয়ে যায়। এইভাবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নাম ছড়িয়ে পড়ে শুষির।

শুষির গল্প বছরখানেক ধরে স্থায়ী ও বিশ্বাসযোগ্য হবার পর তাকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে ওঠে শ্রীপতি রায়। তখন হাটুরে লোকের গল্পে আবার একটা নতুন স্বাদ আসে।

শ্রীপতি রায় মান্যগণ্য লোক। প্রায় দুশো বিঘের চাষ আছে, তাছাড়া তিনখানা পুকুর, একটা পানের বরজ। বাড়িতে দু'বেলা পনেরো বিশজন লোকের পাত পড়ে। মানুষটা খুব হিসেবী, খরা অজন্মার বছরেও কেউ শ্রীপতি রায়কে ধচকে পড়তে দেখে নি। বালা কিংবা তাগা বন্ধক রাখার জন্য যে-যখন শ্রীপতি রায়ের কাছে গেছে, অমনি টাকা পেয়েছে।

শ্রীপতি রায় বেঁটেখাটো লোক, বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও শরীরে শক্তি আছে। গরুর গাড়ির চাকা কাদায় আটকা পড়লে সে এখনো কাঁধ লাগিয়ে ঠেলে তুলতে পারে। গাছ কাটার সময় সে এখনো নিজেই কুড়ুল চালায় এবং সরকারী বাবুদের সঙ্গে সে গুছিয়ে পাঁচকথা বলতে পারে।

শ্রীপতি রায় মোট বিয়ে করেছে আটবার। এর মধ্যে দু'জন গত হলেও বাকি ছ'জনকে নিয়ে তার এক সংসার। কোনোদিন তার বাড়িতে কেউ ঝগড়াঝাটি দেখে নি।

কোনো বউ কখনো একটু ট্যাঁ ফোঁ করলেই তার জন্য শ্রীপতি রায়ের একটি মোক্ষম ওষুধ আছে। কেউ একটু মুখ ঝামটা দিলেই খাওয়া বন্ধ। তিনদিন ভাত বন্ধ রাখলেই সব মেয়ে ঠান্ডা। আর ঠিক ঠিক কাজকর্ম করলেই যত ইচ্ছে পেট ভরে ভাত খাও, সে ব্যাপারে শ্রীপতি রায়ের কোনো কার্পণ্য নেই।

প্রথম বউটি বাঁজা বলেই শ্রীপতিকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে হয়েছিল। তার পরেও বিয়েগুলির মধ্যে রীতিমত হিসেব এবং শৃঙ্খলা আছে। রাজা বাদশাহের মতন নিছক লোভ-রিপুর তাড়নায় শ্রীপতি রায় কক্ষনো বিয়ে করে না।

পানের বরজে পুরুষমানুষের বদলে মেয়েমানুষ দিয়ে কাজ করলে ফলন ভালো হয়। স্নান করে শুদ্ধ হয়ে ঢুকতে হয় পানের বরজে। একটু অযত্ন করলে মিঠে পান ঝাল হয়ে যাবে। তাই পুরুষজনের বদলে দুটি মেয়েকে রাখা হয়েছিল পানের বরজে। দু'টাকা করে রোজ দিতে হয় আর একবেলা পেটচুক্তি ভাত। সেবার বেশী বর্ষার ফলে পানের দাম পড়ে গেল, বছর শেষে হিসেব কষতে বসলো শ্রীপতি রায়। ঠিক পড়তা পোষাচ্ছে না। হঠাৎ তার মাথায় একটা নতুন বুদ্ধি এসে গেল। পানের বরজের মেয়ে দুটিকে বিয়ে করে ফেললেই খরচা অনেক কমে যায়। বিয়ে করলে দু'বেলা ভাত দিলেই যথেষ্ট, নগদ টাকা দেবার কোনো প্রশ্ন নেই।

দুটি মেয়ের মধ্যে একটি রাজি হয় নি। সে ছাঁটাই হয়ে গেল। বদলে অন্য মেয়ে পেতে দেরি হলো না। পুরুত এসে মন্ত্র পড়ে এক সঙ্গে দুটি মেয়ের বিয়ে সাঙ্গ করলো শ্রীপতি রায়ের সঙ্গে।

এই ব্যাপারে একটা নতুন পথ খুলে গেল শ্রীপতি রায়ের সামনে। তার বাড়িতে তিনটি গরু। গরু চরানো ও দুধ দোওয়ানোর জন্য একজন রাখাল রাখতে হয়। একদিন ধরা পড়লো, রাখাল ছোঁড়া রোজই খানিকটা করে দুধ চুরি করে। শ্রীপতি রায় বেদম খড়ম পেটা করলো ছোড়াটাকে। তারপর চিন্তা করতে বসলো। গরুগুলোর দেখাশুনো করার জন্য পুরুষের বদলে একজন মেয়েমানুষ রাখলেও চলে। আর সেই মেয়েমানুষটি যদি এ বাড়িতেই থাকে তাহলে সে আর চুরি করে কোনো জিনিস বাইরে সরাতে পাববে না। সুতরাং শ্রীপতি রায়কে আর একটি বিয়ে করতে হলো।

এইভাবে শ্রীপতি রায়ের প্রত্যেকটি বিয়েই প্রয়োজন ভিত্তিক। প্রত্যেক স্ত্রীর ওপরেই আলাদা আলাদা কাজের ভার দেওয়া আছে। কারুর সঙ্গে কারুর ঝগড়ার সুযোগ নেই।

বাসুলিডাঙার আর সব মানুষ শ্রীপতি রায়ের সুখ ও সমৃদ্ধি দেখে হিংসে করে। লোকটার কোনোদিকে কোনো খুঁত নেই। এতগুলো বউ নিয়েও লোকটা হিমসিম খায় নি।

এ গ্রামে কোনোদিন মোটরগাড়ি বা লরি ঢোকে নি, কারণ পাকা রাস্তা অন্তত এগারো মাইল দূরে। গরুর গাড়ি চলার একটা কাঁচা রাস্তা আছে বটে কিন্তু বর্ষার সময় কোনো রাস্তাই থাকে না। সবচেয়ে কাছাকাছি থানাও অন্তত দশ মাইল দূরে, আর ইলেকট্রিকের আলো দেখতে হলে যেতে হবে গোসাবায়। খবরের কাগজ কেউ কখনো চোখে দেখে নি। দুটি ট্রানজিস্টার রেডিও আছে বটে দু' বাড়িতে, তাতে খবর শুনে এই কয়েকটা গাঁয়ের লোক জানতে পারে যে এইসব গাঁয়ের বাইরেও একটা দেশ আছে। কিন্তু সেই দেশ তাদের মনে রাখে নি।

বিকেলবেলা শ্রীপতি রায় প্রতিদিন তার জমির চৌহদ্দি একবার ঘুরে দেখে আসে। কোন্ নারকোল গাছে কটা নারকোল ফলেছে, তাও তার মুখস্থ। ঝিঙে ক্ষেতে পোকা লেগেছে কিনা নিজে সে পরীক্ষা করে দেখে। তখন আকাশ ঝুঁকে পড়ে নিচের দিকে, মেঘলা মেঘলা আলোয় গাছপালা ঝিম হয়ে থাকে, কোথাও সাপে ব্যাঙ ধরার কট্ কট্ কট্ কট্ আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। বুক ভরে অনেকখানি নিশ্বাস নিয়ে হঠাৎ মন খারাপ হয়ে যায় শ্রীপতি রায়ের! পরপর এরকম কয়েকদিন মন খারাপ থাকলেই বুঝতে পারা যায় আবার তাকে একটা বিয়ে করতে হবে।

মাঝে মাঝে কখনো পুলিশের দারোগা বা বি ডি ও বাবু আসে এ গ্রামে বেড়াতে। আর কোথাও থাকার জায়গা নেই বলে শ্রীপতি রায়ের বাড়িতেই ওঠে। কতরকম বায়নাক্কা তাদের। যা হুকুম করবে তাই দিতে হবে। শুধু শুধু একটা খরচের ধাক্কা। গত দু'তিন

মাস ধরে যেন সরকারী বাবুরা একটু ঘন ঘন আসছে, বোধহয় গাঁয়ের দুধ-পাটালির স্বাদ পেয়ে গেছে। এ ব্যাপারেও শ্রীপতি রায় একটু বিচলিত আছে।

একদিন হাট করতে গিয়ে শ্রীপতি রায় শুখির নানারকম কাহিনী শুনলো। মেয়েটা এখন একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সন্ধে হলেই বাঁধের পাশে তাকে নিত্য নতুন পুরুষমানুষের সঙ্গে দেখা যাবে। সব শুনে, সব দিক বিচার করে শ্রীপতি রায় একেই বিয়ে করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলো।

শ্রীপতি রায় এর আগে যে কটি বিয়ে করেছে, সব কটিই গরিব ঘর থেকে ভালো স্বভাবের মেয়ে বেছে এনেছে। তার কোনো বউয়ের স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে কেউ কোনো দোষ দিতে পারবে না। এবার বুঝি তার একটু মুখ বদলাবার শখ হয়েছে।

শুখির বাবা হিতেন পোস্টমাস্টার একেবারে গরিবের হদ্দ। অতগুলো ছেলেপুলে নিয়ে তার সংসারটা একটা শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতন। হিতেন আবার নেশাভাঙ করে। তার বড় মেয়েটি বিয়ের পরই বিধবা হয়েছে। পরের মেয়েটির বিয়ে দিয়েছে এক বিহারী মাছের পাইকারের সঙ্গে। বাকি মেয়েগুলোর বিয়ে দেওয়ারও সামর্থ্য তার নেই। তার বউ চিররুগ্না। সে নিজেও ও নিয়ে আর মাথা ঘামায় না।

শ্রীপতি রায়ের প্রস্তাব পেয়ে হিতেন সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। তার এক পয়সাও খরচ হবে না। শ্রীপতি রায়ই সব ব্যবস্থা করবে—সুতরাং এতে যদি একটা মেয়ের গতি হয়ে যায়, তার চেয়ে বড় কথা আর কি? শ্রীপতি রায়ের আরও বউ আছে। থাকুক না। সব কটা বউই তো খেতে পায়। সে সামর্থ্য যখন আছে শ্রীপতি রায়ের, তখন সে আরও বিয়ে করবে না কেন?

কিন্তু শুখি রাজি হলো না। সে ওই সাত সতীনের ঘরে যাবে না। কিছুতেই যাবে না। শ্রীপতি রায় বার বার লোক পঠোতে লাগলো। বার বারই সে লোক দুঃসংবাদ নিয়ে ফিরে আসে।

কিন্তু শ্রীপতি যা একবার ধরে, তা কিছুতেই ছাড়ে না। ওইটুকু একটা মেয়ের কাছে হেরে যাবার পাত্র সে নয়!

পর পর ক'দিন শ্রীপতি রায় নিজে সন্ধেবেলা গিয়ে বাঁধের কাছে গিয়ে বসে রইলো। প্রত্যেকদিনই দূর থেকে দেখলো শুখিকে। লোকে যা বলে তা মিথ্যে কথা নয়, রোজই তার সঙ্গে নতুন নতুন লোক থাকে! দেখে বেশ সন্তুষ্ট হলো শ্রীপতি রায়। মেয়েটি বেশ, গড়ন-পেটন ভালো, চালচলন মোটেই গাঁইয়াদের মতন নয়—এই মেয়েকেই তার চাই।

বাঁধটা অনেকটা উঁচু। তার ঢালু পাড় ঘেঁষে কেউ নিচের দিকে নেমে গেলে সন্ধের সময় ওপর থেকে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। ওটাই শুখির লীলাখেলার জায়গা।

একদিন শ্রীপতি রায় মনস্থির করে অপেক্ষা করে রইলো। এক সময় বাঁধের তলা থেকে শুখি একটা ছোকরার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে ওপরে উঠে এলো। এইসব ব্যাপারের পর ছেলেমেয়ে আর এক সঙ্গে থাকে না। ছোকরাটা এক দিকে গেল, শুখি আর এক দিকে।

শ্রীপতি রায় শুখির পথ আটকে গলা খাঁকারি দিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো মেয়েটা। শ্রীপতি রায়কে সে ঠিকই চিনেছে।

শ্রীপতি রায় ভালো করে দেখলো শুখির সর্বাঙ্গ। হাটে গরু-ছাগল কেনার সময় শ্রীপতি রায়ের নজর এরকম তীক্ষ্ণ হয়। মেয়েটির স্বাস্থ্যটি বেশ ভালই। বুকে আর পাছায় প্রচুর মাংস আছে। সরু কোমরটি দেখলে বোঝা যায় কাজকর্মে বেশ চটপটে। পায়ে হাজা নেই, হাতের চামড়া নরম। বেশ পছন্দ হয়ে গেল।

বাড়ির বাইরে কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলার অভ্যেস নেই শ্রীপতি রায়ের। সেই জন্যই সে কোনো ভূমিকা না করে সরাসরি আসল কথায় এসে গেল।

—তুমি এ বিয়েতে আপত্তি করছো কেন মা?

শুখি কোনো উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ঘাড়টা বেঁকানো, পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছে।

—আমার অন্য বউদের যা দিই নি, তোমাকে তাও দেবো! বছরে চারখানা শাড়ি।

শুষি চুপ।

—তোমার নিজের আলাদা ঘর থাকবে। মেঝেতে শুতে হবে না, খাটে শোবে।

শুষি তবু চুপ।

—তোমার যদি ব্যভিচার করতে ভালো লাগে সে সুযোগও পাবে।

এবার শুষি চমকে তাকালো শ্রীপতি রায়ের চোখের দিকে। সেই চোখ যেন বাঘের মতন চকচকে। কিংবা দৃষ্টি থেকে বেরিয়ে আসছে দুটো সাপ। সেই সম্মোহন অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা নেই শুষির।

পরের সপ্তাহেই শুষির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল শ্রীপতি রায়ের। বিয়ের রাত্রে সে শুষিকে স্পর্শও করলো না। তার ঘরে ছ'ছটি সতী-সাধ্বী বউ থাকতে এই কলঙ্কমাখা মেয়েকে সে ছুঁতে যাবে কোন দুঃখে।

জন-মজুরের ভাত রান্না করার মতন একটা হাল্কা কাজ দেওয়া হলো শুষিকে। তাদের সঙ্গে সে যত ইচ্ছে ঢলাঢলি করুক। কিন্তু বাড়ির বাইরে কখনো যেতে পারবে না। বি ডি ও বাবুটি ঘন ঘন গ্রাম বেড়াতে আসে আজকাল। তাকে গাছের ফল, পুকুরের মাছ, ঘরের গাইয়ের দুধ খাইয়েও খুশী করা যায় না। রাত্তিরবেলা মেয়েছেলের জন্য আবদার করে। গত মাসে পীরগঞ্জ থেকে এইজন্য একটি নটী আনতে হয়েছিল শ্রীপতি রায়কে। মোটমাট বেয়াল্লিশ টাকা খরচা পড়েছে। প্রত্যেক মাসে সরকারী বাবুদের আবদার মেটাতে যদি এ রকম খরচ করতে হয় তাহলে তো সে ফতুর হয়ে যাবে!

তার চেয়ে নিজের বাড়িতেই ওরকম একটা মেয়েকে পুষে রাখা ভালো। অনেক সস্তা পড়ে।

অপরা

কতকগুলো ব্যাপার আছে, যেগুলোর কথা আমরা খবরের কাগজে পড়ি কিংবা লোকের মুখে শুনি, কিন্তু স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা হয় না। যেমন জীবনে আমি বেশ কয়েকবার প্লেনে চেপেছি, ট্রেনে চেপেছি অন্তত কয়েক শো বার, কিন্তু কখনো কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি। তেমনি কোনো বড় রকমের দুর্ঘটনা কিংবা ডাকাতিও দেখার সৌভাগ্য হয় নি। সাধারণ মানুষের জীবন শুধু অতি সাধারণ ঘটনাতেই সাজানো থাকে। আবার এক একজন মানুষ থাকে, যাদের জীবনে এ রকম অনেকগুলো ঘটনাই পর পর ঘটে যায়। যাদের কাছে মৃত্যু অনেকবার কাছাকাছি এসে ফিরে যায়। তাদের জীবন নিশ্চয়ই আমাদের থেকে অনেক আলাদা।

সেই রকম একজনকে আমি দেখেছিলাম। বাণীদি। বাণীদিকে চিনতাম অনেকদিন ধরেই, কিন্তু যেদিন থেকে তাঁর জীবন কাহিনী জানতে পারলাম, সেদিন থেকে ওঁকে অন্য চোখে দেখতে লাগলাম। বাণীদি খুব একটা সুন্দরী না হলেও বেশ আকর্ষণীয় চেহারা। সাধারণ মেয়েদের তুলনায় লম্বা, চোখে মুখে ব্যক্তিত্ব আছে এবং রীতিমত বিদুষী। দর্শনশাস্ত্রের ওপর বাণীদির লেখা দু'খানি বই আছে। আমি ইচ্ছে করেই ওর পুরো নাম জানাচ্ছি না। কী যেন এক অদৃশ্য অভিশাপের জন্য বাণীদি কখনো জীবনে সুখ পেলেন না।

গোড়া থেকে বলি। একবার আমরা দলবল নিয়ে ডায়মণ্ডহারবারে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। তখন বাণীদির বয়স বছর তিরিশেক, আমাদের আরও কম। সবাই মিলে শিয়ালদা স্টেশনে এসেছি সকালবেলা। স্টেশনে রীতিমত গোলমাল, কোন ট্রেন আগে যাবে, কোন ট্রেন পরে যাবে, তার ঠিক নেই। আমরা রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম।

কি কারণ যেন বাণীদি এই পিকনিকের ব্যাপারে মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। কিছুতেই আসতে রাজী হন নি। অনেকটা ওঁকে জোর করে ধরে আনা হয়েছিল। ট্রেনের গোলমাল দেখে বাণীদি বললেন, আমি তাহলে ফিরে যাই!

কিন্তু এতদূর এসে কি কেউ ফিরে যায়? আমরা বাণীদিকে জোর করে আটকে রাখলাম।

পাশাপাশি প্ল্যাটফর্মে দুটি ট্রেন দাঁড়িয়ে। কোনটা আগে ছাড়বে কেউ বলতে পারে না। মোটামুটি আন্দাজ করে একটা ট্রেনে উঠে বসলাম। একটু পরেই সুবিমল খবর নিয়ে এল, আমরা ভুল ট্রেনে উঠেছি। অন্যটাই আগে ছাড়বে।

তক্ষুণি আমরা হুড়োহুড়ি করে, লটবহর নামিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে উঠে বসলাম অন্য ট্রেনটিতে। বাণীদি যাতে চলে না যান, সেই জন্য আমি ওঁর হাতটা শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম। কিন্তু আমরা এই ট্রেনে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ট্রেনটা হুইশল বাজিয়ে ছেড়ে দিল। তখন আর আমাদের নামবার উপায় নেই। সকলে মিলে খুব একচোট গালাগাল দিলাম সুবিমলকে। সুবিমল মিনমিন করতে লাগলো।

যাই হোক আধ ঘণ্টা বাদে আমাদের ট্রেনটাও ছাড়লো। আমরা সবাই মিলে গান ধরলাম। আমাদের মধ্যে সুবিমল, মালতী আর অঞ্জনার গানের গলা বেশ ভালো। বাণীদিও এক একবার আমাদের সঙ্গে গলা মেলালেন। এখন বাণীদিকে বেশ হাসিখুশিই মনে হচ্ছে।

আমরা মাঝামাঝি পথ পৌঁছবার পর হঠাৎ মাঠের মাঝখানে থেমে গেল ট্রেনটা। ঘন ঘন হুইশল বাজাতে লাগলো। কি রকম যেন আর্ত চিৎকারের মতন। অনেক কৌতূহলী যাত্রী নেমে পড়লো ট্রেন থেকে। সুবিমলই খবর নিয়ে এলো যে তিন মাইল দূরে একটা ট্রেন অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। আমাদের এই ট্রেন আর চলবে কিনা সন্দেহ আছে।

তখন আমাদের অল্প বয়েস। কোনো ঘটনাকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না। ট্রেন চলবে না শুনেও খুব একটা ঘাবড়ে গেলুম না। আমি অন্যদের কাছে প্রস্তাব দিলাম, 'চল না আমরা হেঁটে গিয়ে অ্যাকসিডেণ্টটা দেখে আসি!'

সকলেই রাজি হলো। শুধু দেখলাম বাণীদি জানলার পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। মুখখানা দারুণ বিষণ্ণ। মনে হলো যেন অ্যাকসিডেণ্টের কথা শুনে মনে খুব আঘাত পেয়েছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি বাণীদি আপনি যাবেন না?'

বাণীদি একটু ম্লান অপলকভাবে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, এই জন্যেই আমি আসতে চাই নি। তোমরা কেন আমাকে নিয়ে এলে? আমার জন্যই তোমাদের সব কিছু নষ্ট হয়ে গেল।'

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, 'আপনার জন্য? আপনি আবার কি করলেন?'

বাণীদি—'তোমাদের পিকনিকে যাওয়া হলো না আর।'

—'তাতে কি হয়েছে? জিনিসপত্র তো সঙ্গেই আছে, আমরা না হয় এই মাঠের মধ্যেই পিকনিক করবো।'

বাণীদি তবু একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আজ সুবিমলের জন্যই তোমরা বেঁচে গেলে। শেষ মুহূর্তে সুবিমলের কথায় আমরা ট্রেন বদলালাম। নইলে আগের যে ট্রেনটা অ্যাকসিডেণ্ট করেছে, আমরা তো সেটাতেই থাকতাম।'

এ কথাটা অবশ্য প্রথমেই আমাদের সবার মনে হয়েছিল। সত্যিই, একটুর জন্য আমরা আগের ট্রেনটায় যাই নি।

সুবিমল বললো, 'আমি তখনই বুঝেছিলাম। আমি বিপদের গন্ধ পাই।'

আমরা সবাই মিলে সুবিমলকে 'যা যা বেশী চালাকি করিস নি। চুপ কর তো, অ্যান অ্যাকসিডেণ্ট ইজ অ্যান অ্যাকসিডেণ্ট'—এই সব বলে চুপ করিয়ে দিচ্ছিলাম, কিন্তু বাণীদি আমাদের বাধা দিয়ে বললেন,

—'সুবিমল কিন্তু ঠিকই বলেছে। ও না থাকলে তোমাদের আজ বিপদ হতো। আমি যেখানেই যাই সেখানেই একটা কিছু বিপদ হয়। আমি অপয়া।'

আমরা বললাম, 'সে কি বাণীদি! অপয়া আবার কি! আপনার কুসংস্কার আছে জানতাম না তো!'

বাণীদি ম্লান গলায় বললেন, 'আমি এই কথাটা কত দুঃখে বলেছি তা তো জানো না। কেউ কখনো নিজের মুখে নিজেকে অপয়া বলে? জন্ম থেকেই বিপদ আমার পাশে পাশে।'

সেইদিন আমরা বাণীদির জীবনের ঘটনা শুনলাম। ডায়মণ্ডহারবার লাইনে ট্রেন সেদিন ছ'ঘণ্টা বন্ধ ছিল। আমরা সেই মাঠের মধ্যেই পিকনিক করেছি। শীতকাল ছিলো,

তাই বিশেষ কোনো অসুবিধে হয় নি। ট্রেনের কামরা ছিলো আমাদের বিশ্রামের জায়গা।

বাণীদির জীবন কাহিনী বানানো গল্পের মতন অস্বাভাবিক। অথচ বাণীদি আমাদের চোখের সামনে জলজ্যান্ত বসেছিলেন, এবং ওঁর জীবনের কয়েকটা ঘটনা যে সত্যি তা আমাদের মধ্যে আরও কয়েকজন স্বীকার করলো, তারা আগেই শুনেছে।

বাণীদির শৈশব শুরু হয়েছে অদ্ভুতভাবে।

বাণীদি বললেন, 'তোমাদের মনে আছে, বিহারে একবার সাংঘাতিক ভূমিকম্প হয়েছিল? সেই বছরে আমার জন্ম। সেই সময় আমার বাবা মুঙ্গেরে চাকরি করতেন। আমার তখন মাত্র দেড় মাস বয়েস সেই সময় এক শেষ রাত্রে শুরু হলো ভূমিকম্প। তার একটু আগেই আমি খুব কান্নাকাটি করেছিলাম বলে আমার মা জেগে উঠে আমায় কোলে নিয়ে বসেছিলেন। একটু বাদেই ঘরবাড়ি সব কেঁপে উঠলো। অনেকেই ছুটে চলে গিয়েছিল বাড়ির বাইরে। কয়েকজন আমার মাকে চেঁচিয়ে বলেছিল, শিগগির বাইরে চলে এসো। মা বলেছিলেন খুকীকে একটু শান্ত করেই আসছি। এখন বাইরে নিয়ে গেলে আরও চ্যাঁচাবে।

কিন্তু মা আর সময় পেলেন না। তার কয়েক মুহূর্ত পরেই বাড়িটা ভেঙে পড়লো। সেবার হাজার হাজার বাড়ি ধ্বংস হয়েছিল। আমাদের বাড়ির ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে দেখা গিয়েছিল, বসে থাকা অবস্থাতেই মা মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর কোলের মধ্যে আমি তখনও বেঁচে। শেষ মুহূর্তে মা মাথাটা ঝুঁকিয়ে আমার শরীরটা আড়াল করে রেখেছিলেন। আমাকে সারা জীবন কষ্ট দেবার জন্য মা আমাকে বাঁচিয়ে রেখে গেলেন।'

বাণীদি কথাগুলো এমন নিরাসক্তভাবে বললেন যে চট করে কোনো মন্তব্য করা যায় না। কিন্তু এই একটা ঘটনার জন্যই অপয়া বলা যায় না কারুকে।

বাণীদি বোধহয় আমার মনের কথাটা বুঝলেন তাই বললেন, 'শুধু এই একটা ঘটনাই নয়। আমি যতবার ট্রেনে চেপেছি, একটা না একটা দুর্ঘটনা হয়েছেই। এর মধ্যে বড় রকমের অ্যাকসিডেন্ট অন্তত চারবার। প্রত্যেকবারই আমার চোখের সামনে কেউ না কেউ মারা গেছে, কিন্তু আমার গায়ে আঁচড়টা পর্যন্ত লাগে নি। ইডেন গার্ডেনে একবার খুব বড় একটা মেলা হয়েছিল না? আমি তখন বেশ ছোট, স্কুলে পড়ি। স্কুলের কয়েকজন বন্ধু মিলে সেই মেলায় গিয়ে নাগরদোলায় চেপেছিলাম। খুব জোরে যখন ঘুরছে, সেই সময় নাগরদোলার একটা পাল্লা ভেঙে গেল। আমরা চারটি মেয়ে তখন সব চেয়ে উঁচুতে, হঠাৎ মনে হলো যেন আমরা আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছি। প্রাণ-ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম। সবাই, অন্যরাও গেল গেল বলেছিল, কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল, আমি মরে যাচ্ছি। তারপর ধপ করে পড়লাম একটা নরম জায়গায়—পাশের একটা তাঁবুর ওপর, আমার কিছুই হল না। কিন্তু আর দুটি মেয়ের মাথায় খুব চোট লেগেছিল, আর একটি মেয়ের পা ভেঙে পঙ্গু হয়ে রইল সারা জীবনের মতন। সেই থেকে আমি আর কক্ষনো নাগরদোলায় চাপি না।'

বাণীদি সেদিন এই রকম অনেকগুলো অবিশ্বাস্য অথচ সত্যি ঘটনা বলেছিলেন।

তার মধ্যে আর একটির উল্লেখ করছি এখানে। সেটি সত্যই চমকপ্রদ। বাণীদি বললেন—

'তখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। একদিন দুপুরবেলা আমি দোতলা বাসে চেপে যাচ্ছি কলেজ স্ট্রীটে। হাজরা মোড়ের কাছে বাসটা থেমেছে, দেখি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে আমার মাসতুতো ভাই মন্টু। আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললাম, "কি রে মন্টু, কোথায় যাবি?" মন্টু চেঁচিয়ে বলল, 'কোথাও না। এমনি আড্ডা মারছি, তুমি নাম না এখানে।" আমি বললাম, "তোরা উঠে আয় না বাসে, কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসে বসব!" মন্টু আর ওর এক বন্ধু অমল, লাফিয়ে উঠে পড়ল সেই চলন্ত বাসে। আমার কাছে এসে মন্টু বলল, "তুমি কিন্তু আমাদের বাসভাড়া দেবে, আর কফি হাউসে খাওয়ার খরচও তোমার।" আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম, "আচ্ছা, আচ্ছা, দেব দেব, তোদের ডেকেই দেখছি ভুল করেছি—"

বাণীদি হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, 'সত্যি, সেদিন কি ভুলই করেছিলাম

ওদের ডেকে। আজও সেজন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না, বিশেষ করে মণ্টুর বন্ধু অমলের কথা ভাবলে।'

আমরা বাণীদিকে বললাম, 'তারপর কি হল?'

বাণীদি বললেন, 'আমি বসেছিলাম লেডিস সীটে। পাশে একটা জায়গা খালি ছিল। সেখানে মণ্টু বসবে না অমল বসবে এ নিয়ে খুব ঝুলোঝুলি হল। অমল খুব লাজুক ধরনের ছেলে, সে কিছুতেই বসতে রাজী হল না, মণ্টু বসলো আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে রইল অমল। বাস খানিকটা আসতেই কি রকম যেন গোলমাল টের পেলাম। বাসটা চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে ধর্মতলায় ঢুকতেই দেখলাম রাস্তা একেবারে লোকে লোকারণ্য, অনেকের হাতে বড় বড় লাঠি আর ছোরা, আমরা টের পাই নি কলকাতায় কখন দাঙ্গা বেধে গেছে। কিন্তু তখন আর বাস ঘোরাবার উপায় নেই। সোজা চালিয়ে কোনো থানায় আশ্রয় নিতে হবে। ওয়েলিংটনের কাছে একদল লোক বাস আটকে দিল। দুমদাম করে বোমা আর দুটো গুলির আওয়াজ শুনলাম। চোখের নিমেষে দেখলাম আমাদের পাশে দাঁড়ানো অমল গুলি বিদ্ধ হয়ে ধুপ করে পড়ে গেল। একটা আওয়াজও করতে পারল না। ব্যাপারটা ঘটে গেল চোখের নিমেষে। তার পরেই বাসসুদ্ধ লোকের আর্ত চিৎকার।

এদিকে গুণ্ডারা বাসে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সকলকে পুড়িয়ে মারতে চাইছে, কাউকে নামতেও দেবে না। আমরা তাকিয়ে দেখলাম, বাসের ড্রাইভার হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। সম্ভবত তারও গুলি লেগেছে। আমাদের আর বাঁচবার আশা নেই। তখন মণ্টু এক অসমসাহসিক কাণ্ড করলো। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সে ছুটে গেল বাসের সামনের দিকে। ড্রাইভারের সীটের পেছনে যে তারের জাল থাকে সেটার ওপর দমাদম লাথি মেরে ছিঁড়ে ফেললো সেটাকে, তারপর লাফিয়ে ভেতরে ঢুকে আহত ড্রাইভারকে সরিয়ে নিজেই চালিয়ে দিল বাসটা, মণ্টু খুব ভালো গাড়ি চালায়, কিন্তু কোনোদিন বাস চালায় নি। তবু ঝড়ের বেগে সেই বাস চালিয়ে গুণ্ডাদের দু'একজনকে ধাক্কা মেরে ফেলে সোজা সেই বাস এনে ওঠালো মেডিকেল কলেজে। সেখানে পৌঁছেই অজ্ঞান হয়ে গেল মণ্টু। তার কাঁধে একটা ছুরি বিঁধেছিল—

তাড়াতাড়ি হাসপাতালের লোকজন এসে নামালো আহতদের। আমি ঘোর লাগা চোখে অমলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসেছিলাম। আমার নড়াচড়া করারও ক্ষমতা ছিল না যেন, আমার দিকে তাকিয়ে কয়েকজন একটু যেন থমকে গেল। তারপর বললো, 'আপনি চুপ করে বসে থাকুন, একটুও নড়বেন না। আমরা স্ট্রেচার আনছি।'

আমি অতিকষ্টে বললাম, 'আমার, আমার কি হয়েছে?'

'আপনার বুকে বোধহয় গুলি লেগেছে। একদম নড়াচড়া করবেন না।'

আমি তাকিয়ে দেখলাম, আমার বুকের কাছে শাড়িতে লেগে আছে টাটকা রক্ত। বিন্দু বিন্দু গড়িয়ে পড়ছে। সত্যি কথা বলতে কি রক্ত দেখে আমার বেশ আনন্দই হয়েছিল। হয়তো আমার গুলি লেগেছে কখন, আমি টেরই পাই নি। কিন্তু আমি যে অন্যদের সংগে দুর্ভাগ্য ভাগ করে নিতে পেরেছি এটাই আমার আনন্দ।

কিন্তু পরে দেখা গেল, আমার কিছুই হয় নি। অমলের রক্ত ছিটকে এসে লেগেছিল আমার গায়ে। অন্যান্য বারের মতন সেবার আমার গায়ে আঁচড়ও লাগে নি। সেই দুঃখে সেবারে আমি এত কেঁদেছিলাম যে সাতদিন বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারি নি। আমি অন্যদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনি, তবু আমার কিছু হয় না কেন।

বাণীদির গলা ধরে এসেছিল, বোধহয় কেঁদেই ফেলতেন। অতিকষ্টে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বললেন 'সত্যিই দুর্ভাগ্য আমার সঙ্গে ঘোরে। টাইফয়েড মেরীর কথা শুনেছো তো। সেই যে মেরী নামে একটি মেয়ে যে বাড়িতেই যেত সেই বাড়িতেই কেউ না কেউ টাইফয়েড মারা যেত, অথচ তার নিজের কিছুই হতো না,—আমার অবস্থাও সেই রকম। আগেকার দিন হলে আমাকে ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারা হোত।'

আমরা বাণীদিকে সান্ত্বনা ঠিক দিতে পারি নি, কিন্তু এর পর অন্যদিকে কথা ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। এর কোনো ঘটনার জন্যই তো কেউ বাণীদিকে দোষ দিতে পারবে না। আমরা আধুনিক কালের মানুষ হয়ে অলৌকিক কিছু মানতে পারি না। এই সব ঘটনাকেই

কাকতালীয় বলতে হয়।

যাই হোক, সেবারের পিকনিকের পর থেকেই আমি বাণীদির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, আর যাই হোক বাণীদি মোটেই সাধারণ মেয়ে নন। প্রায়ই যেতাম ওঁদের বাড়িতে, ওঁদের বাড়ির অবস্থা বেশ সচ্ছল, ল্যান্সডাউনে বিরাট বাড়ি। বাণীদি কিছুদিন একটা কলেজে পড়াচ্ছিলেন, তারপর কি কারণে যেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসেই নিজের পড়াশোনাতে মেতে আছেন। ওঁর এক দাদা থাকেন আমেরিকা, আর একজন দিল্লীতে। বাড়িতে লোকজন প্রায় নেই-ই বললে হয়। আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বাণীদি, আপনি বিয়ে করেন নি কেন?'

বাণীদি বলেছিলেন, 'কেন, পৃথিবীর সব মেয়েকেই কি বিয়ে করতে হবে নাকি? কত পুরুষ তো সারাজীবন ব্যাচিলার থাকে।'

—তা থাকতে পারে, আপনার কখনো একলা লাগে না?'

—না। আমি একা থাকতেই ভালবাসি।'

বাণীদির মত মেয়েকে বিয়ে করতে অনেক পুরুষই আগ্রহী হবে। তাঁর রূপ ও বিদ্যাবুদ্ধি ছাড়াও এক একসময় বাণীদি বেশ গান বাজনা ও গল্পে জমিয়ে রাখতে পারেন। বিয়ে করে অন্য কোথাও চলে গেলে বোধহয় বাণীদির দুর্ভাগ্যের ইতিহাস মুছে যেতে পারতো।

দু'তিনবার বাণীদিকে ওই বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করার পর বাণীদি হঠাৎ একবার বলে ফেলেছিলেন, আমি বিয়ে করতে চেয়ে দুটি ছেলেকে মেরে ফেলেছি। তারপরও আমাকে বিয়ে করতে বলো তোমরা?'

কথাটা চমকে ওঠার মত, কিন্তু বাণীদি সহজে সে ঘটনা বলতে চান নি। অনেক চেষ্টা করে জানতে হয়েছে। এক বৃষ্টি ভেজা মন খারাপ করা বিকেলে বাণীদি আমাকে বলেছিলেন 'তোমাকে আমি আজ রঞ্জন আর অনুপমের কথা বলছি, তুমি আর আমাকে বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করো না।'

একটু থেমে বাণীদি বলেছিলেন, 'রঞ্জনকে আমি চিনতাম কলেজ জীবন থেকেই। রঞ্জন আমার বাবার বন্ধুর ছেলে। আমাদের মেলামেশা অনেক সহজ ছিল। আমি রঞ্জনকে মনে মনে ভালবাসতাম, কিন্তু রঞ্জনের ছিল খুব খেলাধুলোর ঝোঁক। ক্রিকেট আর ব্যাডমিণ্টন খেলায় ওর খুব সুনাম ছিল। খেলার নেশাতেই ও মেতে থাকতো, হঠাৎ একদিন তার চোখ পড়লো আমার দিকে। তারপরই বিয়ের প্রস্তাব জানালো।

ওর আর আমার বিয়ে হওয়াটা ছিল খুব স্বাভাবিক। কারুর বাড়ি থেকেই কোনো আপত্তি হতো না, বরং সবাই খুশি হোত, আমি শুধু একটা ব্যাপারে মনে মনে একটু অস্বস্তিতে ছিলাম। রঞ্জনের নিজস্ব একটা গাড়ি ছিল। আর ও গাড়ি চালাতো দুর্দান্ত স্পীডে, সেটাতেই আমার ভয়। আমি তো নিজেকে জানি। রঞ্জনের গাড়িতে আমি থাকলে নিশ্চয়ই একদিন একটা অ্যাকসিডেণ্ট হবে, অথচ একথাটা রঞ্জনকে জানানোও যায় না।

প্রায়ই ও গাড়ি নিয়ে আসতো আমাদের বাড়িতে। হর্ন বাজিয়ে ডাকতো আমাকে, আমি নিচে নেমে এলেই বলতো, "চলো, আজ কোনো জায়গা থেকে ঘুরে আসি। ব্যারাকপুর কিংবা ব্যাণ্ডেল।"

আমি বলতাম, "কেন, অত দূরে কেন? চলো না, ময়দানে যাই।" রঞ্জন তা পছন্দ করতো না। লং ড্রাইভ ছাড়া ওর ভালো লাগে না। আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতাম, দু' একদিন অ্যাকসিডেণ্টের উপক্রমও হয়েছে। শেষ পর্যন্ত একদিন ওকে বলেই ফেললাম, আমার গাড়ি করে বেড়াতে ভালো লাগে না। রঞ্জন প্রথমটা তো বুঝতেই পারে না আমার কথা, কি করেই বা বুঝবে? কোনো মেয়ে কি একথা বলে? তবু আমি ওকে বললাম, আমার চেনাশুনা সব মেয়েরা পায়ে হেঁটে কি রকম বেড়ায়, কিংবা ট্রামে বাসে ঘোরে। বড় জোর কখনো ট্যাক্সিতে চাপে। কিন্তু এরকম বড়লোকের মতন সব সময় গাড়ি নিয়ে ঘুরতে আমার লজ্জা করে। রঞ্জন কয়েকবার কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এরপর থেকে ও গাড়ি নিয়ে এলে আর ওর সঙ্গে বেরুতাম না। রঞ্জন খুব দুঃখ পেয়েছিল। কিন্তু আমার জেদ দেখে শেষ পর্যন্ত রাগের মাথায় একটা কাণ্ড করে ফেললো।

একদিন এক কথায় বিক্রি করে দিল গাড়িটাকে প্রায় জলের দামে। গাড়িটা ছিল ওর খুবই প্রিয়. গাড়ি ছাড়া ওকে এক মিনিট দেখা যেত না পথে ঘাটে—সেই গাড়ি বিক্রি করে দিতে যে ওর মনে কতটা লেগেছিল তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না। গাড়িটা বিক্রি করে সোজা রঞ্জন আমাদের বাড়িতে এসে বললো, "এবার তুমি খুশি তো?" তার দুদিন পরেই রঞ্জন মারা গেল!'

আমি দারুণ চমকে গিয়ে বললাম—'অ্যাঁ, কি হলো?'

বাণীদি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'রঞ্জন মারা গেল। কি করে জানো? গাড়ি চাপা পড়ে। খেলার মাঠ থেকে ফিরছিল, দৌড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে। —রঞ্জন নিজে কখনো কারুকে চাপা দেয় নি, অথচ ওকেই মরতে হলো গাড়ির তলায়। আর কেউ জানে না, কিন্তু আমি তো জানি, রঞ্জন যদি নিজের গাড়িটা বিক্রি করে না দিত তা হলে কিছুতেই এভাবে—'

আমি বাণীদিকে বাধা দিয়ে বললাম, 'না বাণীদি, এটা আপনি শুধু শুধু নিজের ওপর দোষ টানছেন। অনেকেই তো গাড়ি বিক্রি করে দেয় অনেক কারণে, তা বলে তারা যদি চাপা পড়ে মরে? এটা মানে, এটা একটা আকস্মিক ব্যাপার।'

বাণীদি বললেন, 'আমার সব ঘটনা সম্পর্কেই সবাই একথা বলে। কিন্তু আমার জীবনে এতগুলো আকস্মিক ঘটনা কেন ঘটে বলতে পারো?' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম, 'যাই হোক, দ্বিতীয় ঘটনাটা কি?'

বাণীদি বললেন, 'সেটা বলার আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। তুমি আমার সম্পর্কে কি ভাবছো সত্যি করে বলতো?' আমি একটু থতমত খেয়ে বললাম—'কি আর ভাববো?'

—'আমাকে তুমি ভয় পাচ্ছো না?'

—'ভয় পাবো কেন? আপনাকে ভালো লাগে বলেই তো আপনার কাছে যখন তখন চলে আসি। দ্বিতীয় ঘটনাটা বলুন।'

বাণীদি বললেন, 'দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় বছর পাঁচেক পরে। রঞ্জন মারা যাবার পর আমি আর কোনো ছেলের সঙ্গে তেমন করে মিশতুম না। আর কোনো পুরুষের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয় নি। আমি মন ঠিক করেই ফেলেছিলাম যে প্রেম ভালবাসা এসব আমার জন্য নয়। কিন্তু এ সব কিছু ওলটপালট করে দিল অনুপম, অনুপম অনেক দিন বিদেশে ছিল, আগে ওর সঙ্গে অল্প পরিচয় ছিল। বিদেশ থেকে ফিরে কেন জানি না ও আমাকে খুঁজে বার করলো, নিয়মিত আমাদের বাড়িতে আসতে লাগলো। তারপর একদিন বিয়ের প্রস্তাব জানালো। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলাম। কিন্তু অনুপম একেবারে নাছোড়বান্দা। আমি কেন ওকে বিয়ে করতে রাজী নই সে কথা ওকে জানাতে হবে, না হলে ও কিছুতেই ছাড়বে না। অর্থাৎ ওর আত্মসম্মানে ঘা লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত ওকে একদিন সব কথা খুলে বললাম। আমি ওকে জানিয়ে দিলাম যে অন্য কারুর জীবনের সঙ্গে আমি আমার জীবনটা জড়াতে চাই না। আমি অপয়া।

অনুপম তো সেই কথা শুনে আরো ক্ষেপে উঠলো। ও বললো, "এইসব ননসেন্স তুমি বিশ্বাস করো। এ রকম কয়েন্সিডেন্স তো মানুষের জীবনে হয়ই। আমারও তো কতরকম অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।"

আমি বললাম, "অনুপম, তোমার ব্যাপার আর আমার ব্যাপার একদম আলাদা, আমার কাছাকাছি যারাই আসে তাদেরই একটা না একটা বিপদ হয়।"

অনুপম বললো, "আমি কোনো বিপদকে গ্রাহ্য করি না। মনের জোর থাকলে মানুষ সব কিছু কাটিয়ে উঠতে পারে। আমি দেখিয়ে দিতে চাই তোমার ধারণাগুলো কত মিথ্যে।"

তারপর থেকে অনুপম আমাকে নিয়ে কতকগুলো এক্সপেরিমেণ্ট শুরু করলো। আমাকে নিয়ে প্রত্যেক দিনই ট্যাক্সিতে কিংবা গাড়িতে নিয়ে ঘুরতে লাগলো। জোর করে দেখবার জন্য যে কোনো অ্যাকসিডেণ্ট হয় কি না। সত্যিই কিছুই হলো না কোনোদিন। একদিন গঙ্গায় নৌকা ভাড়া করে ঘুরে এল আমাকে নিয়ে। ঝড় উঠলো না, নৌকো ডুবলো না। কলকাতায় তখন খুব কলেরা হচ্ছে। ইচ্ছে করে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে একগাদা আলুকাবলি আর কাটা ফল খেল একদিন। ওর কোনো অসুখ হলো না, ও আমাকে গর্ব করে বলতে

লাগলো, "দেখেছো তো আমি অমর, কিছু হয় না।"

সেই ক'মাস আমার সত্যি খুব আনন্দে কেটেছিল। আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম সত্যিই হয়তো দুর্ঘটনার অভিশাপ কেটে গেছে আমার ওপর থেকে। অনুপম আমার জীবনটা বদলে দিচ্ছে। তারপর অনুপম একদিন এসে বললো, "তোমার ওপর আর একটা এক্সপেরিমেণ্ট বাকী আছে। তোমার তো ট্রেন সম্পর্কে ভয় আছে। তুমি আমার সঙ্গে ট্রেনে চেপে দার্জিলিং যাবে।" আমি অবাক হয়ে বললাম—"দার্জিলিং যাবো? বাঃ, তা কি করে হয়?"

অনুপম বলল, "কেন? অসুবিধে কি আছে? বাড়িতে একটা কিছু বলে ম্যানেজ করতে পারবে না?"

"এ কি তোমার বিদেশ পেয়েছ নাকি? অসম্ভব!"

'কেন অসম্ভব কেন? দার্জিলিংএ তোমার এক মামা থাকেন না? তুমি তার বাড়িতে থাকবে আমি হোটেলে উঠব। একসঙ্গে ট্রেন জার্নি, বেড়ানো তো হবে।'

শেষ পর্যন্ত অনুপমের প্রস্তাবে আমাকে রাজী হতে হলো। আমাদের বাড়িতে খুব একটা কড়াকড়ি নেই। ট্রেনে দার্জিলিং গেলাম অস্বাভাবিক কিছু ঘটলো না। এমন কি একদিন জীপ নিয়ে ঘুরে এলাম কালিম্পং—ওদিকটার রাস্তা তখন বেশ খারাপ ছিল কিন্তু জীপের ড্রাইভার বলল এমন নিশ্চিন্তে সে বহুদিন চালায় নি। অনুপম গর্বের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "দেখলে? আমি বলেছিলাম না মনের জোরটাই আসল!"

কিন্তু বিপদটা এল অন্যদিক থেকে। আমি নিজের জন্য কখনো চিন্তা করি না। অনেক ঘটনা ঘটেছে আমার জীবনে কিন্তু আমার তো কখনো কিছু হয় নি, বিপদ হয়েছে অন্যদের। তাই আমি সব সময় অন্যদের সম্পর্কে চিন্তা করি। গাড়িতে যাবার সময় অনুপম জানলা দিয়ে সামান্য একটু ঝুঁকলেও ওর হাত চেপে ধরতাম। রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় কোনো গাড়ি এলে আমি সামনে এসে দাঁড়াতাম ওকে আড়াল করে।

একদিন ঘুম মনাস্টারির দিকে বেড়াতে গেছি বিকেলের দিকে। দুজনে পাশাপাশি আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম, চমৎকার শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এই জীবনটা কি সুন্দর। অনুপম আমার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, "তোমার সব ভয় গেছে তো?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

"ভাল লাগছে?"

"খুব। এত ভাল লাগবে, কখনো ভাবিনি।"

অনুপম একটা সিগারেট ধরাবার জন্য দাঁড়াল। আমি একটা গান গুনগুন করতে করতে এগিয়ে গেলাম অন্যমনস্কভাবে। বেশ কুয়াশা ছিল, রাস্তাটা লক্ষ্য করি নি। একটা আলগা পাথরে পা পড়তেই আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম পাশের দিকে। পাশেই বিরাট খাদ। আমি শুধু মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ করেছিলাম। তাই শুনেই অনুপম ভাবল আমার খুব বিপদ হয়েছে। লাফ দিয়ে চলে এল আমার দিকে। আমি তখন রাস্তায় পাশে পড়ে গিয়েও একটা পাথর ধরে ফেলেছি। কিন্তু অনুপম এমন হুড়মুড় করে সেখানে এসে পড়ল যে তাল সামলাতে পারল না। ও গড়িয়ে পড়ল নিচের দিকে। আমি ভেবেছিলাম অনুপম নিশ্চয়ই কিছু একটা ধরে ফেলবে। কিন্তু তা হলো না, অনুপম চেঁচিয়ে উঠল, 'বাণী, আমার হাতটা একটু ধরো। হাতটা একটু ধরো—"

আমি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে এসে আর সেখানে কিছুই দেখতে পেলাম না, অনুপম আর নেই।'

বাণীদি গুম্ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'এখনো আমার কানে সেই ডাক ভেসে আসে, বাণী, আমার হাতটা একটু ধরো, আমার হাতটা একটু ধরো। কিন্তু আমি ধরতে পারি নি।'

বাণীদির সমস্ত শরীরটা কাঁপছিল। মুখটা নিচু করা। আমি গলা পরিষ্কার করে বললাম, 'বাণীদি, আমি শুধু একটা কথা বলছি আপনাকে। এসব যাই ঘটুক থাক, তবু আপনাকে এখনো অনেকে ভালবাসে।'

বাণীদি আমার কথা শুনে কি বুঝলেন কে জানে। তীব্রভাবে তাকালেন আমার

চোখের দিকে। তারপর বললেন, 'সুনীল, তুমি আমার কাছে আর কখনো এসো না। কোনোদিন এসো না। আমি অপয়া। আমি সাংঘাতিক অপয়া। আমি তোমার ভাল চাই বলেই বলেছি। তুমি আর কোনোদিন এসো না আমার কাছে। আমি তোমার মুখও আর দেখতে চাই না কোনোদিন।'

বলতে বলতে বাণীদি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। আমি চুপ করে বসে রইলাম। এই সময় বাণীদিকে আরও বেশী সুন্দর দেখতে লাগছে।

আর কোনো সান্ত্বনার কথা মনে এলো না। আমার হাতের ওপর ঝরে পড়েছে বাণীদির চোখের জলের কয়েকটি ফোঁটা। কিছু না ভেবেই আমি সেই অশ্রুবিন্দু আমার জিভে ঠেকালাম। মনে হলো, বাণীদির চোখের জল নোনতা নয়, মিষ্টি। কেন এরকম মনে হলো কে জানে।

ঘুম জাগরণ

এক সময়ে যে এখানে একটা বেশ বড় নদী ছিল, তা এখনো বোঝা যায়, যদিও নদীর চিহ্ন বিশেষ নেই। অনেকখানি ঢালু খাত, সেখানে এখন সর্ষের চাষ হচ্ছে, হাওয়ায় দুলছে অজস্র সর্ষে ফুল।

তাপস হাত বাড়িয়ে বললো, এইখান থেকে ওই পর্যন্ত নদীটা চওড়া ছিল, বুঝতে পারছিস? ওই যে ওপাশের অশ্বত্থ গাছটা, তার ধার পর্যন্ত।

ঢালু জমি দেখে অনুমান করা যায়। তবে, জল নেই কোথাও। এরকম মরা নদী আমি আগে কখনো দেখি নি। কি রকম যেন একটু দুঃখ হতে লাগলো। তাপসকে জিজ্ঞেস করলাম, নদীটা এরকমভাবে মরে গেল কি করে?

তাপস বললো, কত নদীই তো মরে যায়। অনেক নদী দিক পাল্টায়। এটাও সে রকমই।

—বর্ষাকালেও জল হয় না?

—হয় একটু একটু। সে তো পুকুর বা খানা ডোবাও বৃষ্টির জলে ভরে যায়। কিন্তু এটার আর স্রোত নেই। দুদিন বাদে মাটি ভরাট হয়ে গেলে আর সেটুকু জলও জমবে না।

দূরের মাঠে কয়েকজন চাষীকে দেখা যায়। এ ছাড়া আশেপাশে আর লোকালয় নেই। আছে শুধু একটা বিরাট বাড়ি। প্রাসাদই বলা যায়।

বাড়িটার বয়েসও বেশী না। সত্তর আশি হবে বড় জোর। মানুষের পক্ষে এই বয়েসটা যথেষ্ট হলেও একটা বাড়ির পক্ষে কিছু না। এখনো বেশ শক্ত সমর্থ আছে। প্রত্যেক ঘরের জানলায় নীল কাচ বসানো হয়েছিল তৈরির সময়, তার মধ্যে অনেক কাচ আজও অক্ষত।

বাড়িটা তৈরি করেছিলেন তাপসের ঠাকুর্দার বাবা। শৌখিন লোক ছিলেন তিনি। তখন এখানে নদী ছিল জ্যান্ত, প্রকৃতি ছিল সুন্দর। নদীর পাড়ে বসিয়েছিলেন বিশ্রাম ভবন। শুধু বিশ্রামের জন্য এত বড় বাড়ি না বানালেও চলতো। কিন্তু তখনকার দিনের লোকেরা ছোট কিছু বানাতেই পারতেন না। তাছাড়া ওঁদের টাকা পয়সাও ছিল যথেষ্ট।

এই সুন্দর অট্টালিকাটিরও মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। নদী শুকিয়ে গেছে। লোকালয় সরে গেছে। এখন এই মাঠের মধ্যে বাড়িটাকে বেখাপ্পা দেখায়। সেই আসল জমিদার নেই, তাপসদের অবস্থাও আগেকার মতন নয়। এতবড় বিশ্রাম ভবন ওদের কাজে লাগে না।

এত বড় একটা বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করাও যথেষ্ট খরচের ব্যাপার। সারা বছর ওদের পরিবারের প্রায় কেউ আসে না এখানে—শুধু শুধু বাড়িটাকে টিকিয়ে রাখার আর যুক্তি নেই।

বাড়িটাকে আর কোনো কাজেও লাগানো যাচ্ছে না। এখানে কেউ এত বড় বাড়ি ভাড়া নেবে না। রেল স্টেশন বেশ দূরে বলে মিল-ফ্যাক্টারি করার পক্ষেও অনুপযোগী।

তাপসরা চেয়েছিল বাড়িটা সরকারকে দিয়ে দিতে। সরকারও উৎসাহী হয় নি।

এই জনমানবহীন জায়গায় বাড়িটাকে ইস্কুল কলেজ বা হাসপাতাল করারও কোনো

মনে হয় না। কাছাকাছি কোনো বড় রাস্তা বা বাসরুট পর্যন্ত নেই। বাড়িটা বিক্রির জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি, তাপসরা তাই বিরক্ত হয়ে বাড়িটাকে ভেঙে ফেলবে ঠিক করেছে। অন্তত জানলা দরজা আর কিছু ইঁট বিক্রি হবে। অর্থাৎ একেবারে নষ্টই হবে সব কিছু।

আগামী মাসেই তিন তারিখে নিলাম হবে জানলা দরজা। শেষবারের মতন তাপস তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকতে এসেছে কয়েকদিনের জন্য। সেই টানে টানে আমিও উপস্থিত।

এত বড় একটা বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে শুনলে কার না মন খারাপ হয়। বাড়িটা যে দেখতে সুন্দর শুধু সেই কারণেই যেন এর আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। এখন সব কিছুই বিচার হয় প্রয়োজনের মাপকাঠিতে। আমার বারবার মনে হতে লাগলো, আমার যদি টাকা থাকতো, আমি ঠিক কিনে নিতাম এ বাড়িটা। তারপর কি করতাম? কিছুই না। এমনিই থাকতো। তাপস আর মিলি ঘুরে ঘুরে দেখালো আমাকে সারা বাড়িটা। শুধু দোতলা আর তিন তলাতেই চোদ্দখানা ঘর। এ ছাড়া বিরাট বারান্দা, মোটা মোটা থাম আর খিলান। একতলায় ঘরগুলি রাখা হয়েছিল শুধু চাকর-বাকরদের জন্য। এখন অবশ্য একটি মাত্র চাকর ও একজন দরওয়ান থাকে। বাড়ির সব কটা ঘর খোলাই হয় নি বহুদিন।

আমরা আশ্রয় নিয়েছি দোতলার দক্ষিণ কোণের দিকে পাশাপাশি দুটি ঘরে। আরও অনেক বন্ধুবান্ধব এলে বেশ জমজমাট হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত। দু'একজন আসবে বলেও আসতে পারে নি।

দিনের বেলাটা অবশ্য আমাদের ভালোই কাটে। অল্প অল্প শীত পড়েছে। দোতলার বিশাল বারান্দায় রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসে গল্প করতে করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। দুপুরবেলা একটা লম্বা ঘুম দিই। ঘুম থেকে উঠে চা খেতে খেতেই সন্ধে হয়ে যায়।

সন্ধের পর আর ঠিক মতন আড্ডা জমতে চায় না। শহরের কোনো বাড়িতে তিনজন নারী পুরুষের আড্ডা দিতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু এখানে এই প্রকাণ্ড নির্জনতার মধ্যে আমরা তিনটি মাত্র প্রাণী, খুবই অকিঞ্চিৎকর লাগে নিজেদের। একতলায় চাকর দারোয়ানদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। কোনো কিছুর দরকার হলে চিৎকার করে ডাকতে হয়।

ইলেকট্রিক নেই, সন্ধের পরই ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুটো হ্যাজাক জেলেও সেই অন্ধকারে বেশী ফাটল ধরানো যায় না। তাপস সঙ্গে টানজিস্টার রেডিও আর টেপ রেকর্ডার এনেছে—তাতে গান শোনা হয় সন্ধের পর। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনতেও একঘেয়ে লাগে। একঘেয়েমি কাটাবার জন্য তাপস হুইস্কির বোতল বার করে।

তাতে আবার মিলির আপত্তি। মদ্যপান বিষয়েই যে মিলির কোনো আপত্তি আছে তা নয়। কিন্তু ও বলে, তোমরা তো বসে বসে এখন মদ খাবে। আর আমি একা একা কি করবো? দুজন মদ্যপায়ীর সঙ্গে তৃতীয় কারুর গল্প যে বেশীক্ষণ জমে না সে কথাও ঠিক।

মিলিকেও একটু হুইস্কি খাওয়াবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু গন্ধটা ওর কিছুতেই সহ্য হয় না। বমি আসে। একবার কোন পার্টিতে সে একটু শেরি খেয়েছিল, সেটা তার খুব ভালো লেগেছিল। সে শেরি খেতে চায়। কিন্তু শেরি কোথায় পাওয়া যাবে।

চার বছর আগে বিয়ে হয়েছে মিলির এখনো ছেলেমেয়ে হয় নি। সে সব সময় সেজে-গুজে থাকতে ভালবাসে। এখানে দেখবার কেউ নেই, তবু সে বিকেলবেলা স্নান করে খুব সাজগোজ করে এসে বসে আমাদের সঙ্গে। টেপ রেকর্ডারে গান বাজায়। সেই আসরে তাপস গেলাসে হুইস্কি ঢালতেই মিলি অমনি বলে, এই আবার শুরু হলো তো তোমাদের। তারপর রাত্তিরবেলা একেবারে অজ্ঞান হয়ে ঘুমোয়, হাজার ডাকলেও উঠবে না।

তাপসের শরীরে এখনো জমিদারি রক্ত। সে বউকে ভয় পায় না। মিলির আপত্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই সে হুইস্কির বোতল খোলে। আমারই বরং একটু সঙ্কোচ লাগে।

তৃতীয় রাত্রে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, এ বাড়িতে ভূত-টূত নেই।

তাপস হেসে উঠে বললো, ভূত? তুই আবার ভূতে বিশ্বাস করতে শুরু করলি কবে থেকে?

আমি বললাম, তা নয়। মানে, খুব পুরনো বাড়ি তো। এইসব বাড়ি সম্পর্কে সাধারণত অনেক রকম গল্প থাকে।

তাপস বললো, খুবই দুঃখের বিষয়, সে রকম কোনো গল্প তোকে শোনাতে পারছি না। এ বাড়িতে কেউ কোনোদিন কিছু দেখে নি। আগে যখন আমাদের একান্নবর্তী পরিবার ছিল, তখন অনেক সময় তিরিশ চল্লিশজন লোক একসঙ্গে বেড়াতে এসেছে, সব কটা ঘর খোলা হতো, কেউ কিছু দেখে নি।

—চাকর-বাকররাও কিছু দেখে নি?

—শুনি নি কখনো। কেন, তুই বুঝি গল্পের খোরাক খুঁজছিস?

মিলি চুপ করে শুনছিল। মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, হঠাৎ ভূতের কথা মনে হলো কেন আপনার?

আমি বললাম, ভূতটুত থাকলে আমাদের আরও কয়েকজন সঙ্গী বাড়তো। আমরা যে রকম সঙ্গীর অভাব বোধ করছি—

—আপনি ভূতের ভয় পান না?

রাত্তিরবেলা একটু একটু পাই, দিনেরবেলা পাই না। তবে, আজকালকার ভূতেরা তো খুব ভদ্র হয়। ভয়-টয় বিশেষ দেখায় না।

মিলি একটু চুপ করে থেকে বললো, ভূত আছে কিনা জানি না। তবে, আমার মনে হয়, এ বাড়িটাতে একটা কোনো অদ্ভুত ব্যাপার আছে।

আমি উৎসাহিত হয়ে উঠে বললাম, তার মানে? আপনার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে।

—হ্যাঁ হয়েছে।

—কি, কি শুনছি? আগে বলেন নি তো? এবারই হয়েছে না অন্যবার।

—যতবার এ বাড়িতে এসেছি ততবারই হয়েছে। ব্যাপারটা আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না। আমার মনে হয়, আমায় যেন কেউ ডাকে।

তাপস বললো, ননসেন্স।

মিলি দুঃখিতভাবে বললেন, তুমি তো আমার সব ব্যাপারেই ননসেন্স বলো!

আমি তাপসকে বাধা দিয়ে বললাম, দাঁড়া না, ব্যাপারটা, শুনতে দে না!

তাপস বললো, ব্যাপারটা আর কিছুই না। মিলির একটা অসুখ আছে। সোমনাম-বুলিজম্ কাকে বলে জানিস তো? ঘুমের মধ্যে ঘোরের মাথায় ঘুরে বেড়ানো। সোজা বাংলায় স্লিপ ওয়াকিং যাকে বলে। মিলি এই রকম হঠাৎ হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে হেঁটে বেড়ায়।

মিলি বললো, মোটেই আমার সে রকম কোনো অসুখ নেই।

তাপস বললো, বাঃ, তোমার দাদা সেবার বলেন নি যে ছেলেবেলায় তুমি এরকম কয়েকবার বাড়ির বাইরে চলে গিয়েছিল পর্যন্ত।

—সে তো খুব ছেলেবেলায়।

—আবার সেটা দেখা দিয়েছে।

—কিন্তু এ বাড়িতে এলেই সে রকম হয় কেন?

—মনের জোর আনো সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি মিলিকে জিজ্ঞেস করলাম আপনাকে কেউ ডাকে তার মানে কি? কারুকে চোখে দেখতে পান?

মিলিকে কোনো কথাই বলতে দিল না তাপস। বিরক্তভাবে বললো, থাক, ও কথা থাক্, ওসব আজেবাজে কথা আমার ভালো লাগে না।

বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে তাপস ঘোরতর নাস্তিক। ভগবান কিংবা ভূত কোনোটাই সে গ্রাহ্য করে না। মিলি হঠাৎ চলে গেল ঘরের মধ্যে। বুঝলাম সে রাগ করেছে।

ঘটনাটা ঘটলো সেই রাত্রেই। মিলি চলে যাবার পর তাপস আর আমি আরও অনেক-ক্ষণ বসে রইলাম। তাপস বোতলটা পুরোই শেষ করতে চায়। চাকর এসে দু'একবার জিজ্ঞেস করেছে খাবার দেবে কিনা, তাপস তাকে ধমকে ফিরিয়ে দিল। বোতলটা শেষ হবার পর তাপস বেশ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। আমি কম খেয়েছিলাম। তাপস সোজা হয়ে

দাঁড়াতে পারছে না। কোনোক্রমে তাকে ধরাধরি করে এনে বসালাম খাবার টেবিলে। কিন্তু খাদ্যে তার আর রুচি নেই। সবই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলতে লাগলো।

খাবারের টেবিলে মিলি আগাগোড়া খুব গম্ভীর। আমি একটু অপরাধী বোধ করতে লাগলাম। মিলি বোধহয় ভাবলে, আমিই ওর স্বামীকে মাতাল করে দিয়েছি। সকলেই এরকম ভাবে।

খাওয়া শেষ করে আমি উঠে পড়লাম। তাপসকে জিজ্ঞেস করলাম, তোকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসবো?

মিলি বললো, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। আপনার যাবার দরকার নেই।

আমি নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে আমার বই পড়া অভ্যাস। কিন্তু হ্যাজাকের আলোয় বই পড়তে বেশীক্ষণ ভাল লাগে না। আলো নিভিয়ে দিতেই চতুর্দিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভরে গেল।

অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম। কেন ঘুম ভাঙালো জানি না। ঘুম ভাঙাও দু'রকম হয়। কখনো কখনো ঘুমটা একটু চিরে যায়, অস্পষ্ট জাগরণের অনুভূতি, কিন্তু চোখ মেলতে ইচ্ছে করে না। আবার কখনো হঠাৎ সম্পূর্ণ ঘুম ভেঙে যায়, চোখ দুটো খুলে যায় সম্পূর্ণভাবে। আমার দ্বিতীয় রকম হলো, চোখ মেলার পর কোনো চিন্তা না করেই আমি খাট থেকে নেমে এলাম। তারপর দেখলাম আমার ঘরের দরজা খোলা।

এজন্য কোনো খটকা লাগলো না। ঘরের দরজা আমি নিজেই বন্ধ করি নি হয়তো। কিংবা ভেজানো ছিল, হাওয়ায় খুলে গেছে। এখানে চুরি-টুরির ভয় নেই, দরজা বন্ধ করার সতর্কতারও দরকার হয় না।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। পাশেই তাপসদের ঘরের দরজা বন্ধ। আমার ডান পাশে বিরাট লম্বা বারান্দায় পাতলা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে।

আমি এগিয়ে যেতে লাগলাম বারান্দা দিয়ে। কেন এগোচ্ছি তা আমি নিজেই জানি না। এবং বেশ জোরে জোরেই হাঁটছি আমি। সারা বাড়িটা একেবারে নিঃশব্দ, সুচ পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। আমি শুনতে পাচ্ছি শুধু আমার পায়ের আওয়াজ।

বারান্দার একপাশে সিঁড়ি। কোনো কিছু না ভেবেই আমি তিনতলার সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেলাম। তিনতলাতেও সমান লম্বা বারান্দা। ঘরগুলিতে সব তালা বন্ধ। পুরো বারান্দাটা পার হয়ে আমি চলে এলাম আর এক কোণে। এখানে রয়েছে একটা ঝুল বারান্দা।

সেই ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মেয়ে। আমার দিকে পেছন ফেরা। পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে একরাশ চুল। মেয়েটির হাতে একটা মোমবাতি, হাওয়ায় তার শিখাটা অল্প অল্প কাঁপছে। মেয়েটি তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

এই প্রথম আমার একটু ভয় ভয় করতে লাগলো। আমি এখানে এলাম কেন? এই মেয়েটি কে?

আমার পায়ের শব্দ শুনেই বোধহয় মেয়েটি ফিরে তাকালো। মিলি! আমাকে দেখে সে কিন্তু একটুও চমকে উঠলো না। একটু হেসে বললো, আসুন। এত দেরি করলেন যে।

আমার গলাটা শুকনো লাগলো। আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না, স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে রইলাম সেইখানে। মিলি এগিয়ে এসে, আমার হাত ধরে বললো, আসুন। দেখবেন না?

এবার আমি শুকনোভাবে বললাম, কি দেখবো?

—এদিকে আসুন।

মিলি আমার হাত ধরে এনে পাঁচিলের কোণে দাঁড় করালো। তারপর বললো, সামনে তাকিয়ে দেখুন। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। আমি ভাবছিলাম, আপনি আরও আগে আসবেন।

সামনের মাঠ অল্প জ্যোৎস্নার আবছাভাবে দেখা যায়। আমি সেদিকে তাকালাম।

মিলি বললো, দেখেছেন, নদীতে কত জল? নদীটা আবার বেঁচে উঠেছে। আবার এখানে মানুষজন আসবে। এ বাড়ি ভাঙা হবে না।

সামনে তাকিয়ে মনে হলো, সত্যিই নদীটা যেন জলে ভর্তি। জলের ওপর ঢেউ খেলা করছে জ্যোৎস্নায়।

আমি বললাম, বাঃ, কি সুন্দর।

আপনাকে আমি বলেছিলাম না? এখন দেখলেন তো? বিশ্বাস হলো তো?

একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই বুঝতে পারলাম, সব কিছুই চোখের ভ্রম। নদীর শুকনো গর্ভে সর্ষের খেত এই জ্যোৎস্নায় অন্যরকম দেখাচ্ছে।

মিলি বললো, এখানে সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না?

আমি বললাম, মিলি, ঘরে চলুন।

মিলি চাপা গলায় বললো, না। আমি যাবো না! আপনি আমার সঙ্গে এখানে থাকবেন না, সুনীলদা?

—এখানে কতক্ষণ থাকবেন?

—যতক্ষণ ইচ্ছে?

—না ঘরে চলুন।

আমি মিলির বাহুতে হাত ছোঁয়াতেই সে আমার গায়ের ওপর ঢলে পড়লো। কি রকম যেন আনন্দ ভাব। চোখ দুটো বোজা। আমি ওর হাত ধরে টেনে আনলাম। মিলি আর কোনো আপত্তি করলো না।

দোতলায় নেমে আসতেই মিলি আমার হাত ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর বললো, আপনি আর আমি ছাড়া নদীটাকে কেউ দেখে নি।

আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই মিলি দ্রুত হেঁটে চলে গেল নিজের ঘরে। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর ফিরে এলাম নিজের ঘরে।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হলো। চোখ মেলার পরেই ভাবলাম, গতকাল রাত্রের ব্যাপারটা কি সত্য? নাকি আমি স্বপ্ন দেখেছি? একবার মনে হচ্ছে স্বপ্ন, আবার মনে হচ্ছে সত্যি।

আমি উঠে চলে এলাম তিনতলায়। সেই খুলে বারান্দায় এসে মনে হলো, হ্যাঁ, কাল রাত্রে আমি এখানে এসেছিলাম ঠিকই। একটা মোমবাতির টুকরো পড়ে আছে। মিলিও কাল রাত্রে এসেছিল এখানে।

সকালবেলা মিলির চেহারা একেবারে অন্যরকম। স্নান করে নিয়েছে। তাপসের সঙ্গে কি একটা কথায় হাসছে খুব। বুঝলাম ওদের ঝগড়া মিটে গেছে।

গত রাত্রের ব্যাপারটা মিলি একবারও উল্লেখ করলো না। আমার সঙ্গে ব্যবহারেরও কোনো আড়ষ্টতা নেই। সারাদিন ধরে আমি লক্ষ্য করলাম মিলিকে। ও কি কাল রাত্তিরের ঘটনাটা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে? ও কিছু বলছে না বলেই আমি তাপসকে কিছু জানাতে পারছি না।

শেষ পর্যন্ত মনে হলো, মিলি সব ঘটনাটা ভুলে গেছে নিশ্চয়—যদি না ও খুবই সাংঘাতিক অভিনেত্রী হয়। শুনেছি স্লিপ ওয়াকাররা আগের রাত্রের কোনো ঘটনাই মনে রাখতে পারে না। এটাও হয়তো সেই ব্যাপার।

কিন্তু একটা রহস্যের সমাধান হলো না কখনো। মিলি কেন আমাকে দেখে চমকে যায় নি। কেন আমাকে দেখে বলেছিল, আপনি এত দেরি করলেন কেন? আমার তো কোনো কথা ছিল না মিলির সঙ্গে মধ্যরাত্রে নিরালায় দেখা করার? এমনকি চোখের কোণে ইশারাও হয় নি!

মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে সোজা তিনতলায় গেলাম কেন? মিলি যে ওখানে থাকবে আমি তো তার বিন্দু বিসর্গও জানতাম না।

তাহলে আমিও কি ঘুমের মধ্যে হেঁটে গেছি? কিন্তু আমার যে সব মনে আছে।

কোনোদিন এই ঘটনাটা মিলির কাছে আর উল্লেখ করতে পারি নি। কি জানি, যদি মিলিও আমাকে অবিশ্বাস করে!

'তোমাকে তো আমি বললাম, আমার খুব দরকারি একটা কাজ ছিল! আর থাকতে পারব না। সেইজন্যই হঠাৎ তাড়াহুড়ো করে চলে এলাম। আসলে কিন্তু আমার কোনো কাজই ছিল না। দেখ না, তোমার কাছ থেকে ফিরে এসেই বাড়িতে এখন তোমাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি।'

'কেন যে চলে এলাম! আসল কারণটা বলব? রাগ করবে না! আসলে আমার ভয় করছিল।'

এই পর্যন্ত পড়েই শান্তনু এমন রেগে গেল যে চিঠিটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে।

সব সময় খালি ভয় আর ভয়! এই ভয়ের জ্বালায় আর পারা যাবে না। ওরা কি চুরি ডাকাতি কিংবা মানুষ খুন করেছে যে সব সময় ভয় পেতে হবে?

যেদিনকার কথা লিখেছে স্নিগ্ধা, সেদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। সকাল এগারোটার সময়। সেই সময় চেনাশুনো অন্য কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। অফিস পালিয়ে আসতে হয়েছিল শান্তনুকে। অফিসেরই কাজ নিয়ে ডালহৌসিতে যাবার বদলে চলে এসেছিল আলিপুরে।

কলকাতা শহরের যে-কোনো জায়গায় দেখা করতেই ভয় পায় স্নিগ্ধা। সারা কলকাতা-তেই নাকি ওর আত্মীয়স্বজন ছড়ানো। সেই সব আত্মীয়রা ধারালো চোখ নিয়ে সব সময় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্নিগ্ধাকে দেখে ফেলার জন্য।

স্নিগ্ধার বাড়িতে ফোন করার উপায় নেই. চিঠি লেখার উপায় নেই। বাইরে দেখা করতে গেলে তো প্রায় একটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করতে হয়।

স্নিগ্ধা চিঠি লেখে। প্রত্যেক চিঠিতেই সে আকুতি জানায়, কখন শান্তনুকে দেখবে। শান্তনুকে সে প্রত্যেকদিন দেখতে চায়, অথচ দেখা করতেও ভয়। এতো মহা মুশকিল!

একসঙ্গে সিনেমায় যাওয়ার উপায় নেই। কোনো প্রকাশ্য জায়গায় পাশাপাশি বেড়াবার তো প্রশ্নই ওঠে না। একটা মাত্র জায়গা আছে, মিউজিয়াম, যেখানে কলকাতার বাঙালীরা সাধারণত যায় না। কিন্তু সেখানেও যাওয়া চলে না বার বার, স্নিগ্ধার ধারণা, দারোয়ান, চাপরাশিরা তাকে চিনে ফেলছে। চিনে ফেললেই বা যে কি বিপদ, তা বোঝে না শান্তনু। চিনুক না! তারা তো মিউজিয়ামে কিছু চুরি করতে যাচ্ছে না!

আর একটা জায়গা হচ্ছে, ন্যাশনাল লাইব্রেরী। এখানে স্নিগ্ধাকে মাঝে মাঝে বই নিতে আসতে হয়। বাড়ির অনুমতি আছে। তাও স্নিগ্ধা আসবে সকালের দিকে। বিকেলে বা সন্ধেবেলা এখানে অনেক ভিড় হয়ে যায়, তাদের মধ্যে চেনাশুনো কেউ কেউ তো থাকতেই পারে। অফিসের দিনে সকাল সকাল আসতে গেলে শান্তনুকে যে কী অসুবিধেয় পড়তে হয়, তা সে শুধু নিজেই জানে, স্নিগ্ধাকে বলে নি কখনো।

শান্তনু এটাই শুধু বুঝতে পারে না, কেউ দেখে ফেললেই বা ভয়ের কী আছে? সে স্নিগ্ধাকে ভালবাসে, তাকে বিয়ে করার জন্য বদ্ধপরিকর। স্নিগ্ধাও অন্য কারুকে বিয়ে করবে না, বাড়ির যদি খুব অমত থাকে, স্নিগ্ধা বাড়ি থেকে চলে আসতেও রাজি।

অবশ্য স্নিগ্ধার বাড়ি থেকে আপত্তি করার বিশেষ কোনো কারণও নেই। শান্তনু পড়াশুনোয় ভালো ছিল, এখন মোটামুটি ভালোই চাকরি করে। পরিচ্ছন্ন সচ্ছল পরিবারের ছেলে। স্নিগ্ধাদের বাড়িতে জাত-বিচারের বাড়াবাড়ি নেই, স্নিগ্ধার জ্যাঠতুতো দাদা অসবর্ণ বিয়ে করলেও বাড়ির লোক তাদের ভালোভাবেই মেনে নিয়েছে।

মুশকিল বাধিয়েছেন স্নিগ্ধার বাবা। ভদ্রলোক বেশ ভালোমানুষ, অর্থনীতির অধ্যাপক, বেশ সুরসিক। কিন্তু তিনি হঠাৎ ইরানে ভিজিটিং প্রফেসারের চাকরি নিয়ে চলে গেলেন এক বছরের জন্য। ওঃ, সেই এক বছরটা কি অসম্ভব লম্বা! স্নিগ্ধার বাবাকে এখনো কথাটা জানানোই হয় নি।

স্নিগ্ধা চিঠি লিখে বাবাকে জানাতে চায় না। বাবা ভাববেন, তিনি নেই বলে মেয়ে প্রেম করে বেড়াচ্ছে। শান্তনুকে চোখে না দেখে বাবা বুঝবেন কি করে যে কোন্ রকম

ছেলে সে। বাবা ফিরে এলে সে বাবাকে নিজের মুখে বলবে। এই জন্য মাকেও কিছু জানতে দিচ্ছে না। কারণ মা তাহলেই বাবাকে চিঠি লিখবেন। অতদূর ইরান থেকে তো শুধু শুধু হঠাৎ চলে আসা যায় না। বাবা যদি চিঠি পেয়ে চলে আসেন, সেটা খুবই লজ্জার ব্যাপার হবে।

শান্তনু অবশ্য এক বছর অপেক্ষা করতে রাজি আছে। কি আসে যায় এক বছর। কিন্তু তা বলে কি এই এক বছর মুখ দেখাদেখিও বন্ধ থাকবে? স্নিগ্ধার যুক্তি হচ্ছে, যদি কোনো রকমে কোনো আত্মীয়-স্বজন একবারও স্নিগ্ধাকে শান্তনুর সঙ্গে ঘুরতে দেখে, তাহলেই তারা কথাটা মায়ের কানে তুলবে। মা অমনি বাবাকে চিঠি লিখবেন। বাবা অতদূরে বসে দুঃখ পাবেন। বাবাকে যে দারুণ ভালবাসে স্নিগ্ধা!

শান্তনু ঠাট্টা করে, তোমার আত্মীয়-স্বজনদের কি আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই যে তোমার পাশে কোনো ছেলেকে হাঁটতে দেখলেই অমনি তোমার মায়ের কাছে নালিশ করতে ধাবেন?

স্নিগ্ধা বলে, নালিশ নয়, এমনি যদি কথায় কথায় বলে দেয় কেউ—

—বলুক না। তোমার মাকে তুমি বুঝিয়ে বলবে!

—আমার লজ্জা করে।

লজ্জা আর ভয়। এই দুটো জিনিসই যেন ভালবাসার প্রধান শত্রু। সব সময় দুজনে তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকে একটু দেখা করার জন্য, কাছাকাছি বসে একটু কথা বলার জন্য—আর কেউ এতে বাধা দিচ্ছেও না। যত বাধা এই লজ্জা আর ভয়।

সেদিন অত কষ্ট করে শান্তনু গেল ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। ভেতরে কথা বলার সুযোগ নেই, তাই ওরা এসে দাঁড়িয়েছিল বাইরে একটা গাছের নিচে পাতলা রোদ সবুজ ঘাসে মোলায়েম হয়ে ছড়িয়ে আছে।

স্নিগ্ধার হাতে দুটি বই। একটা শান্তনুকে দিয়ে বলল, এটা তোমার হাতে রাখো।

—কেন?

—তাহলে সবাই ভাববে, তুমিও বই নিতে এসেছ লাইব্রেরীতে।

শান্তনু হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, এখানে সবাইটা কোথায়? কেউ তো নেই! আমাদের শুধু দেখছে ওই বড় বড় গাছগুলো!

স্নিগ্ধা বলল, আস্তে আস্তে তো লোকজন আসবে।

শান্তনু বলল, চলো, ঘাসের ওপর গিয়ে বসি।

স্নিগ্ধা একটুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, না।

—কেন, এতে আবার কি অসুবিধে?

—এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেই তো ভাল লাগছে।

স্নিগ্ধা কারণটা না বললেও শান্তনু বুঝল। ঘাসের ওপর বসলে দৃশ্যটা অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনে কথা বললে, কেউ দেখে ফেললেও মনে করবে, দুজন ছাত্রছাত্রী বুঝি পড়াশুনোর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে।

একটা উজ্জ্বল লাল রঙের সোয়েটার পরে ছিল স্নিগ্ধা। মাথার চুল এক বেণী করে বাঁধা। নামের সঙ্গে তার মুখটার খুব মিল আছে। চোখ দুটোর দিকে তাকালেই কি রকম যেন ঠাণ্ডা লাগে। মুখে সব সময় একটা লজ্জা ভাব।

একটু বাদেই স্নিগ্ধা বলল, তুমি এবার যাবে না?

শান্তনু অবাক হয়ে বলল, চলে যাব? এক্ষুনি? কেন?

—বাঃ, তোমার অফিস নেই?

—সে আমি ঠিক ম্যানেজ করব!

—না, না, অফিসে যদি তোমার নামে কেউ কিছু বলে, তাহলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

—কে কি বলবে? আমি তো একটা কাজেই বেরিয়েছি, কাজটা ঠিকই সেরে ফিরব। কাজটার জন্য এক ঘণ্টার বেশী দেরিও তো হতে পারে।

স্নিগ্ধা ঠিক যেন মানলো না। তার চোখ দুটি চঞ্চল হয়ে রইল। ঘাসে বসা হল

না বলে শান্তনু প্রস্তাব করল একটু হেঁটে বেড়াতে। স্নিগ্ধা তাতেও রাজি হতে চায় না। অনেক পেড়াপীড়িতে সে এক পাক মাত্র ঘুরতে রাজি হল।

একবার স্নিগ্ধার কাঁধে হাত রাখার জন্য শান্তনুর বুকের মধ্যে আকুলি বিকুলি করে। কিন্তু তার উপায় নেই। পাশাপাশি হাঁটিতে হাঁটিতে স্নিগ্ধার শরীরের সুন্দর গন্ধটা উপভোগ করে শান্তনু। সবচেয়ে কি স্বাভাবিক ছিল না, স্নিগ্ধাকে এখন একবার জড়িয়ে ধরা। এখানে, প্রকাশ্যে, আকাশের নিচে তাকে একবার চুমু খাওয়া? কিন্তু সে তো কল্পনাই করা যায় না।

শান্তনু খপ করে স্নিগ্ধার একটা হাত চেপে ধরল।

স্নিগ্ধা সংগে সংগে ছাড়িয়ে নিল হাতটা। চোরা চোখে তাকে একবার বকুনি দিল।

তারপর যেখান থেকে হাঁটতে শুরু করে ছিল, সেইখানে এসেই স্নিগ্ধা বলল, এবার তুমি যাও।

—এ কি, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?

—বাঃ, তোমার অফিসের কত দেরি হচ্ছে।

—হোক!

—না। না, আমার ভয় করে।

—আবার ভয়! স্নিগ্ধাও হেসে ফেলল এবার। তারপর বলল, আমার মতন একটা বাজে বিচ্ছিরি মেয়েকে নিয়ে তুমি খুব বিপদে পড়েছো, তাই না?

শান্তনু বলল, খুব। দারুণ বিপদ! ওই দ্যাখো। ওই একজন আত্মীয় আসছে তোমার।

কোথাও একজনও মানুষ দেখা যায় না। শুধু বড়বড় গাছপালা ওদের দর্শক।

শান্তনু জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, শোনো, আমরা যদি ওইখানে সরে গিয়ে ওই রাধাচূড়া গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াই, তাতে তোমার আপত্তি আছে?

—কেন, ওখানে কি আছে?

—কিছুই না। ওখানে দাঁড়ালে আমাদের সহজে দেখা যাবে না।

—ওখান দিয়ে লোকজন হাঁটে না বুঝি?

—ঠিক আছে। আমি কথা দিচ্ছি, যদি একটি লোককেও ওখানে আসতে দেখি, এক্ষুনি আমরা চলে আসবো? লোক না-আসা পর্যন্ত আমরা ওখানে দাঁড়াবো। রাজি?

স্নিগ্ধাকে রাজি হতেই হল। জায়গাটা সত্যি নির্জন। তবু এই নির্জনতার মধ্যেও শান্তনু স্নিগ্ধার কাঁধে হাত রাখলো না। চুমু খাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। শুধু একটু বেশি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, এক একবার কাঁধে কাঁধ ছুঁয়ে যায়, শান্তনু সিগারেট মুখে দিলে স্নিগ্ধা দেশলাই জেবলে দেয়? এইটুকুতেই অনেকখানি পাওয়া।

স্নিগ্ধা এক সময় বলল, বাঃ, লোক না এলেও বুঝি আমরা এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবো?

—আমি এখানে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। তুমি পারো না?

—শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে?

—আমার তো শুধু তোমাকে দেখতেই ভাল লাগে।

—আমার ভয় করে।

—আবার ভয়? এখানেও ভয়?

স্নিগ্ধার চোখ দুটি আরও বেশি চঞ্চল। সে সুস্থির হতে পারছে না কিছুতেই। এবার অনুনয় করে বলল। শোনো লক্ষ্মীটি, আমার একটা দারুণ কাজ আছে, আমাকে বারোটার মধ্যে ফিরতেই হবে।

—বারোটার মধ্যে? তাহলে তো এক্ষুনি যেতে হয়।

—হ্যাঁ বই দুটো বদলেই...

—মোটে এইটুকু সময়ের জন্য আমি এলাম?

—লক্ষ্মীটি রাগ করো না, আর একদিন।...

—কি কাজ তোমার?

—বিশ্বাস করছো না? মাকে বলে এসেছি, মাকে এক জায়গায় যেতে হবে...

স্নিগ্ধাকে আর আটকানো যায় নি কিছুতেই। শান্তনু খানিকটা ক্ষুন্ন মনেই ফিরে এসেছিল। অন্য কেউ হলে হয়তো সন্দেহ করত, স্নিগ্ধা বুঝি শান্তনুকে তেমন ভালবাসে না। সে বুঝি শান্তনুর কাছে মিথ্যে কথা বলে অন্য কারুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। কিন্তু স্নিগ্ধা সম্পর্কে সেরকম সন্দেহ কিছুতেই করা যায় না। কারুকে ঠকাবার কোনো ক্ষমতাই নেই স্নিগ্ধার।

মেঝে থেকে শান্তনু স্নিগ্ধার দলা পাকানো চিঠিটা তুলে নিল। পড়তে লাগল পরের অংশটুকু।

...রাগ করবে না? আসলে আমার ভয় করছিল। কিসের ভয় জানো? কারুর দেখে ফেলার ভয় নয়। ভয় করছিল নিজেকেই। আমার মনে হচ্ছিল, বেশিক্ষণ থাকলে, আমাকে যদি তোমার আর দেখতে ভাল না লাগে? আমি তো সুন্দরী নই। তুমি কত সুন্দর। তোমার সামনে আমাকে কেমন যেন...আমি বেশি সাজতেও পারি না, আমার ভয় হয়, যদি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তুমি হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নাও। আমার চিবুকটা বিচ্ছিরি, তাই না?

শান্তনু আবার অবাক হল। এ আবার কী রকম ভয়? স্নিগ্ধাকে তার দেখতে খারাপ লাগবে? যাকে দেখার জন্য সে সব সময় ছটফট করে, হঠাৎ কোথাও আচমকা দেখা হয়ে গেলে সে নোবেল পুরস্কার পেয়ে যায়, সেই স্নিগ্ধাকে দেখতে তার খারাপ লাগবে? স্নিগ্ধার মতন সুন্দরী আর কে আছে? ওর চিবুকে একটা ছোট্ট কাটা দাগ, সেই জন্যই মুখটা আরও মিষ্টি দেখায়. ইচ্ছে করে ওই কাটা জায়গাটায় চুপুস করে একটা চুমু খেতে। এই জন্য স্নিগ্ধা এত তাড়াতাড়ি চলে গেল। কোনো মানে হয়!

পরে কোথায় আবার দেখা হবে, সে সম্পর্কে স্নিগ্ধা কিছু লেখে নি। তার মানে এখন দু'তিন দিন আর স্নিগ্ধা বাড়ি থেকে বেরুবে না। স্নিগ্ধার অন্য ভাই-বোনেরা ছোট ছোট। বাবা এখানে নেই স্নিগ্ধাই যেন এখন বাড়ির অভিভাবক। ওর মতন নরম মেয়েকে কি ভাইবোনরা মানে একটুও? বাবা এখন এখানে নেই বলেই, সেই সুযোগে স্নিগ্ধা এখন প্রেম করে বেড়াচ্ছে—এই অপবাদটাকেই স্নিগ্ধার বেশি ভয়।

এদিকে অফিসের কাজে তিন দিন পর আবার শান্তনুকে পাটনা যেতে হবে। তার মানে এর মধ্যে আর স্নিগ্ধার সঙ্গে দেখা হবে না? পাটনা থেকে ফিরতে ফিরতেও তো তিন চারদিন লাগবে। পাটনা যাওয়ার কথাটা স্নিগ্ধাকে জানাবেই বা কি করে?

স্নিগ্ধা চিঠি লেখে কিন্তু শান্তনুর চিঠি লেখার উপায় নেই। টেলিফোন করাও চলবে না। স্নিগ্ধাই কখনো সখনো, বাড়ি একেবারে ফাঁকা থাকলে শান্তনুকে টেলিফোন করে, বাড়িতে কিংবা অফিসে। যদি স্নিগ্ধা সেরকম ফোন করে।...

পাটনা থেকে ফিরতে ফিরতে শান্তনুর পাঁচ দিন লেগে গেল। ফেরার পথে আর এক ঝামেলা। ট্রেন কলকাতায় এসে পৌঁছোবার কথা ভোরে, কিন্তু এঞ্জিনে গণ্ডগোল হওয়ায় গাড়ি মাঝ-রাস্তায় থেমে রইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আগের জংশনে খবর দিয়ে নতুন এঞ্জিন আনতে আনতে পাঁচ ঘণ্টা কেটে গেল। অতক্ষণ থেমে থাকা ট্রেনে অপেক্ষা করা এক বিরক্তির ব্যাপার। তাও মাঠের মধ্যে। কিছুই করার নেই। নেমে পায়চারি করতে গেলেও চড়া রোদ গায়ে বেঁধে। হঠাৎ শীত চলে গিয়ে গরম পড়ে গেছে। প্রথম গ্রীষ্ম দারুণ চিটচিটে হয়। ট্রেনের মধ্যে বসে থাকলেও গরম, বাইরে রোদ্দুরে ঘোরাও অসম্ভব। ঘামে জামা-টামা চিটচিটে হয়ে গেল। মুখে বিরক্তির ভাঁজ।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেও আর এক ঝামেলা। ট্যাক্সি নেই। অনেক দৌড়োদৌড়ি করেও কোনো ফল হল না। শেষ পর্যন্ত, এক ভদ্রলোকের প্রাইভেট গাড়ি ওকে হাজরা মোড় পর্যন্ত নামিয়ে দিতে রাজি হল।

হাজরায় পৌঁছে, হাতের ছোট ব্যাগটা নিয়ে শান্তনু গাড়ির ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে যেই মুখ তুলল, অমনি দেখল এক অপরূপ দৃশ্য।

রাস্তার ওপারে, বাস গুমটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্নিগ্ধা। সঙ্গে আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। সেই মেয়েটিও বোধহয় এক্ষুনি চলে

যাবে, কেননা, একবার একটুখানি চলে গিয়ে আবার ফিরে এসে কি যেন বলল। স্নিগ্ধার সঙ্গে দেখা করার এমন আকস্মিক সুযোগ পাওয়া যায় না। বুকের মধ্যে থেকে একটা খুশি লাফিয়ে উঠল।

কিন্তু শান্তনু তার চিবুকে হাত বুলোল। দাঁড়ি কামানো হয় নি, বেশ খোঁচাখোঁচা দাড়ি টের পাওয়া যাচ্ছে। মুখে চটচটে ঘাম। জামাটাও ঘামে রবরবে। সবচেয়ে বড় কথা, ট্রেনে পাজামা পরে ছিল, তার ওপরেই শার্ট পরে নিয়েছে। এই চেহারায় সে স্নিগ্ধার সামনে দাঁড়াবে?

শান্তনু আর দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে সামনের চলন্ত মিনিবাসে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

বাড়িতে এসেই কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল আবার। এরকম দুর্লভ সুযোগ পেয়েও সে স্নিগ্ধার কাছে যেতে পারল না? আজ যা দেরি হয়ে গেছে, অফিসে যাবার কোনো প্রশ্ন নেই—স্নিগ্ধার সঙ্গে দুটো চারটে কথাও বলত অন্তত, তবু কেন গেল না? তার লজ্জা করছিল? কিংবা ভয়?

পরদিনই স্নিগ্ধার চিঠি এল।

'জানো, কাল তোমাকে দেখলাম? নিজের চোখকে আমি বিশ্বাসই করতে পারি না। হঠাৎ মনে হল যেন স্বর্গ থেকে দেবতারা আমার জন্য একটা পুরস্কার পাঠালেন। তুমি একটা কালো রঙের গাড়ি থেকে হাজরা মোড়ে নামলে। আমি হাত তুলে তোমাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তোমার বোধহয় খুব তাড়া ছিল, তুমি একটা মিনিবাসে উঠে পড়লে। তুমি আমায় দেখতে পাও নি, আমি কিন্তু তোমায় দেখে নিয়েছি। আমার ভাগ্যটা কত ভাল বল তো!

দাড়ি কামাও নি, মুখে নীল নীল দাড়ি, পাজামার ওপরে একটা লাল চেক চেক শার্ট পরেছিলে। তোমাকে কি ইয়াং আর কি সুন্দর দেখাচ্ছিল!'

একজন মানুষ

দরজার কাছে আর্দালিকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই তপন বেশ শব্দ করে ভেতরে ঢুকে গেল।

বিরাট টেবিলের ওপাশে বসে আছেন বড় সাহেব। তাঁর চেহারাটি এত বিরাট যে এতবড় টেবিল না হলে একটুও মানাতো না। টেবিলের ওপর প্রচুর কাগজপত্র ও ফাইল। ঘরে আর কেউ নেই।

বড় সাহেব মুখ তুলে ভুরু কুঁচকে বললেন, কি ব্যাপার?

তপনের হাতে একটা চিঠি, সেটা সে বড় সাহেবের নাকের কাছে ঠেলে দিয়ে বললো, এটা কে লিখেছে?

—তার মানে? চিঠির নিচেই তো সই আছে।

—তাতো দেখতে পাচ্ছি? কিন্তু এরকম চিঠি লেখার মানে?

—আপনাকে কেন ছাঁটাই করা হবে না। তার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে। আপনি কাজকর্মে ফাঁকি দেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ছুটি—

আর আপনিই বা কি কাজ করেন? সারাদিনে শুধু কয়েকটা সই মারা।

—তপনবাবু!

—চোখ রাঙাচ্ছেন কি?

—এটা বেয়াদপি করার জায়গা নয়!

—চোপ শালা!

তপন তার হাতের চিঠিটা গোল্লা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল বড় সাহেবের দিকে।

বড় সাহেব কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতভাবে বসে রইলেন। তারপর বললেন, আপনার চাকরি করার ইচ্ছে নেই দেখছি।

—তোমার এই চাকরিতে আমি ইয়ে করি।

—ভদ্রভাবে কথা বলুন।
—তুমি কি ভদ্দরলোক যে তোমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলবো? একটা চোর। ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার।
—ইনসেন। কমপ্লিটলি ইনসেন।
—মোটেই না। আমাকে পাগল সাজালে তোমার সুবিধে হয়, তাই না?
বড় সাহেব তার টেবিলের নিচের কলিং বেল বাজালেন। শব্দ হলো, চ্যাঁ, চ্যাঁ—
তপন টেবিল থেকে পেপার ওয়েটটা তুলে মারমূর্তিতে বললো, খুন করে ফেলবো! একেবারে খুন করে ফেলবো!

না, দৃশ্যটা এ রকম নয়। তপন এরকম পারবে না।
দরজার বাইরে টুলে বসে ঝিমোচ্ছিল রামখিলাওন। তপন ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছে দেখে সে বাধা দিয়ে বললো, এখন যাবেন না। সাহেব ব্যস্ত আছেন।
তপন গম্ভীরভাবে বললো, আমিও খুব ব্যস্ত। আমাকে এক্ষুনি দেখা করতে হবে।
—সাহেব খুব রাগ করবেন!
—কেন বাজে বকবক করছো! আমার সঙ্গে সাহেবের দেখা করার কথা আছে এই সময়।
রামখিলাওনের বাধা উপেক্ষা করে ভেতরে ঢুকে পড়লো তপন।
বড় সাহেব তখন একটা গল্পের বই পড়ছিলেন। সাধারণত তাঁর কাজকর্ম শুরু হয় সন্ধের পর।
তপনকে দেখে তিনি বিরক্তি গোপন করে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার?
তপন গম্ভীরভাবে বললো, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে এসেছি।
—এখন আমার সঙ্গে ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের একজন অফিসারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ঠিক আড়াইটার সময়। এক্ষুনি এসে পড়বেন।
তপন তবু শান্তভাবে এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে বসলো। নির্বিকারভাবে বললো, তিনি আসুন আগে, তারপর আমি উঠে যাবো।
তপন পকেট থেকে টাইপ করা কাগজটা বার করতেই বড় সাহেব বললেন, ওসব আমার কাছে কেন? পার্সোনেল ডিপার্টমেণ্টে এর উত্তর দিয়ে দিলেই হবে।
আমি উত্তর দিতে আসি নি।
—তবে?
—আমি আপনাকে রেজিগনেশনের চিঠি দিতে এসেছি।
বড় সাহেব কয়েক মুহূর্ত থমকে গেলেন। তারপর বললেন, কি? চাকরি ছেড়ে দেবেন?
—হ্যাঁ। আপনারা তো তাই চান!
—আপনি কাজকর্ম করেন না মন দিয়ে, জরুরী ফাইল হারিয়ে ফেলেন, আপনাকে রাখি কি করে?
—আমি আর কাজ করতেই চাই না।
—অন্য কোথাও কিছু পেয়েছেন?
—না।
—তা হলে! এই বাজারে...
—তা হোক। আমি যদি খেতে নাও পাই। আমার বিবেকটা অন্তত পরিষ্কার থাকবে। একটা চোর কোম্পানি, যারা দু'নম্বরি খাতা করে লক্ষ লক্ষ টাকা গাপ করছে, ব্ল্যাক মার্কেট হচ্ছে যাদের প্ররোচনায়।
—তপনবাবু, আপনার সঙ্গে আমার কথা শেষ হয়ে গেছে। আপনি মিঃ খেমকাকে আপনার ডিউটি বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন। আর অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেণ্টকে আমি বলে দিচ্ছি। আপনার যা পাওনা আছে নিয়ে যাবেন।
বড় সাহেব চ্যাঁ চ্যাঁ শব্দে বেল টিপলেন।

তপন হাসিমুখে বললো, দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমার যা যা বলার আছে, আমি আজ সব বলে যাবো। আমি দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছি, মালিকপক্ষ লীক করে গোপনে টাকা সরায়। আপনিও তো মালিক নন, আপনিও তো কোম্পানির চাকর। একটু বড় চাকর এই যা। আপনার বিবেক নেই, আমার এখনো আছে। দিনের পর দিন আমি বিবেকের যন্ত্রণায় ভুগছি। নিজেকে প্রশ্ন করেছি, এসব কি করছি আমি? মালিকের স্বার্থে আমি দেশে ব্ল্যাক মার্কেটের প্রশ্রয় দিচ্ছি। একটা বিরাট দুর্নীতির চক্রে আমিও জড়িয়ে পড়ছি। এইসব ভেবেই আমার কাজ করতে ইচ্ছে করতো না। অফিসে আসতে ইচ্ছে করতো না।

—তপনবাবু, আমি আপনার বক্তৃতা শুনতে চাই না।

—সত্যি কথা শুনলে বুঝি গায়ে জ্বালা ধরে?

—আপনি এখন যাবেন কিনা! চ্যাঁ চ্যাঁ

—আমার সব কথা এখনো শেষ হয় নি! চাকরি যখন ছেড়েই দিচ্ছি—

না। দৃশ্যটা এরকমও নয়। আসল দৃশ্যটা এই। তপন অনেকক্ষণ থেকেই ঘোরাঘুরি করছিল বড় সাহেবের ঘরের কাছে। এক একবার দরজার কাছে গিয়েও ফিরে আসছে আবার।

একবার রামখিলাওনের চোখে চোখ পড়তেই সে কুণ্ঠিতভাবে বললো, কি দারোয়ানজি, সাহেব খুব ব্যস্ত?

—হ্যাঁ, বাবু!

—ইয়ে, দারোয়ানজি, আপনাদের তো জামা কাপড়ের জন্য অ্যালাউয়েন্স দিচ্ছে।

রামখিলাওন উৎসাহিত হয়ে বললো, তাই নাকি? অর্ডার পাস হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, আমি নিজে দেখেছি। বছরে তিনবার জামা কাপড়।

তারপর বিনীতভাবে আবার বললো, দারোয়ানজি, বড় সাহেবের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ দরকার মাত্র পাঁচ মিনিট।

—যদি রাগ করেন।

—আমি বেশী সময় নেবো না। ঠিক পাঁচ মিনিট।

—ঠিক আছে যান্।

বড় সাহেব খুব তন্ময় হয়ে একটা ফাইল দেখছিলেন। ঘরে কোনো মানুষ ঢুকেছে, তা লক্ষ্যই করলেন না।

তপন চুপ করে দাঁড়িয়ে। কিছু বলার সাহস নেই? একদিকে ঘরে যদি আবার কেউ এসে পড়ে।

একটু বাদে সে গলা খাঁকারি দিয়ে বললো, স্যার—

বড় সাহেব মুখ তুলে বললেন, কি?

—স্যার...

—কি ব্যাপার বলুন?

—স্যার, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

—তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু শুধু স্যার স্যার করছেন কেন? কি বলবেন বলুন!

তপনের মনে পড়লো জয়ার মুখ। মাত্র এক বছর হলো বিয়ে হয়েছে। শিগগিরই ছেলেমেয়ে হবে। জয়া বার বার বলে দিয়েছে, একদম মাথা গরম করবে না। কি ঢলঢল নরম মুখ, জয়ার কথা ভাবলেই বুকের মধ্যে টনটন করে।

—কী তপনবাবু, আমার জরুরী কাজ আছে।

—স্যার, এই চিঠিটা

—ওই চিঠির উত্তর তো আপনাকে লিখে জানাতে হবে। মুখে বলে তো কিছু লাভ নেই।

তপন একেবারে টেবিলের সামনে এসে একটা চেয়ার ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল গলায়

বললো, স্যার, আমার চাকরি গেলে আমি একদম মরে যাবো। শুধু আমি নয়, আমার ফ্যামিলি।

—এখন এসব কথা বললে কি হবে? আপনাকে আগেও দুতিনবার ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছে।

—স্যার, আর কোনোদিন আমার কাজে কোনো ভুল পাবেন না। আপনি একটু দয়া করুন।

—শুনুন তপনবাবু, এটা একটা অফিস। কোম্পানি আমাকে তো দয়া দাক্ষিণ্য দেখাবার জন্য রাখে নি! কাজের বদলে মাইনে দেবে। শুধু শুধু মুখ দেখে তো আর—

—স্যার, আপনার কাছে প্রমিস করছি, আর কোনদিন কাজে যদি ভুল পান—

—আপনার কথা বিশ্বাস করা যায় না। আপনি জরুরী কাজ ফেলে রেখে হঠাৎ হঠাৎ ডুব মারেন! গত চারদিনও তো আসেন নি।

—স্যার, আমার স্ত্রীর অসুখ।

—তপনবাবু, ইউ আর অ্যান হোপলেস লায়ার! গতকাল সন্ধেবেলা আপনাকে আর আপনার স্ত্রীকে আমি একটা সিনেমা হলে দেখেছি। আমিও আমার স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আপনারা আমাদের দেখতে পান নি। কিন্তু আমি দেখেছি। গত ফরবিড. আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য বেশ ভালোই হয়েছে তো!

—স্যার, শী ইজ প্রেগনেন্ট। এই সময় যদি আমার চাকরি যায়, কি অবস্থা হবে ভেবে দেখুন। মাত্র এক বছর আগে বিয়ে হয়েছে।

—তা বলে কি এক বছর ধরেই হনিমুন করবেন? অফিসের কাজ করতে হবে না? কোম্পানি কি এসব কথা শুনবে।

—কোম্পানি না বুঝলেও আপনি বুঝবেন। আপনি একটু চেষ্টা করলেই...। মানে, অফিসের সবাই বলে, আপনি আমাদের জন্য অনেক কিছু করেন। আপনি না থাকলে আমরা—

—দিন। চিঠিটা দিন।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বড় সাহেব একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, এটাই কিন্তু আপনাকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিলাম। আপনি কথা দিচ্ছেন, এবার থেকে কাজকর্মে সম্পূর্ণ মন দেবেন?

—হ্যাঁ স্যার!

—যখন তখন কামাই করবেন না?

—না স্যার।

বড় সাহেব চিঠিটার ওপর লাল কালিতে খসখস করে কয়েক লাইন লিখে তারপর সেটা আবার ফেরত দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, যান।

—স্যার, আপনি আমার জন্য যা করলেন।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখন যান। আমার হাতে জরুরী কাজ আছে।

বড় সাহেবের অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে তপন চিঠিখানা সন্তর্পণে ভাঁজ করে পকেটে ভরলো। খুশীতে ঝলমল করে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু মুখখানি বিষণ্ন।

ধীর পায়ে সে বেরিয়ে এলো অফিসের পেছন দিককার উঠোনে। বাথরুমের সামনে ভিড়। তপন সেখানে অপেক্ষা করতে করতে বারবার থুঃ থুঃ করতে লাগলো। তার মুখের মধ্যে একটা তিক্ত স্বাদ।

খালি হবার পরে বাথরুমে ঢুকেও সে থুঃ থুঃ করলো। বেসিনের সামনে এসে মুখ ধুতে লাগলো ভাল করে।

বেসিনের সামনের আয়নাটা অনেকদিন থেকেই ফাটা। তার মধ্যে নিজের মুখখানাও অদ্ভুত দেখায়, চেনা যায় না।

সেদিকে তাকিয়ে তপন বললো, কুত্তার বাচ্চা!

মনে হয় একসময় বিরাট বাগান ছিল, চারপাশে বাগানে ঘেরা। এখন পাঁচিল ভেঙে পড়েছে, বাগানের প্রায় অস্তিত্বই নেই, আগাছার রাজত্ব। বিশাল লোহার গেটের একটা পাল্লা নেই। সুরকি বিছানো পথ ধরে ভিতরে চলে এলাম। অদূরের বাড়িটি রাজপ্রাসাদেরই মতন, স্থানীয় লোকেরা বলে, বাসুলিডাঙার রাজবাড়ি। যদিও বাসুলিডাঙার কোনো রাজা ছিলেন না কখনো, ওঁরা ছিলেন জমিদার।

দেখলেই বোঝা যায় বাড়িটিতে কেউ নেই। মানুষহীন বাড়ির একরকমের নির্ভুল স্বচ্ছতা থাকে। দরজা জানলাগুলিকে ব্যগ্র মনে হয়।

ঠান্ডা, মেঘলা, শান্ত দুপুর। শুধু আমার চটির মচমচ শব্দ। এগিয়ে গিয়ে কয়েকটি সিঁড়ি দিয়ে উঠলে প্রশস্ত বারান্দা। একদা শ্বেতপাথরের ছিল, এখন তার সামান্য চিহ্নই চোখে পড়ে। প্রধান দরজায় হাত ছোঁয়াতেই খুলে গেল। কোনো অর্গল নেই। ঘরের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমি বদলে গেলাম।

আমার মনে হলো, এ বাড়িতে আমি আগে এসেছি। এই জায়গাটা আমার খুব চেনা। অথচ তা হতেই পারে না। শিমুলতলায় এই প্রথমবার আমার বেড়াতে আসা। এ বাড়িটার অস্তিত্বও আমি জানতাম না। এখানে এসেই যাওয়া আসার পথে দূর থেকে কয়েকবার বাড়িটা চোখে পড়েছে। শুনেছি অনেকদিন থেকেই বাড়িটা পরিত্যক্ত, সম্প্রতি কোন ব্যবসায়ী নাকি এটাকে জলের দামে কিনতে চাইছে। এখানে চিনিকল বানাবে। সেইজন্যই এইবার দেখে যাবার সাধ।

তবে কেন চেনা মনে হলো? আমি জাতিস্মর নই। আগে যদি আমার আর একটা মনুষ্য জন্ম থেকেও থাকতো; তবু তার কোনো কথাই আমার মনে পড়ে না। অথচ এবাড়ির অন্দর মহল যেন আমার নখদর্পণে। আমি যেন স্পষ্টই জানি এই ঘর থেকে বেরিয়ে ডানদিকে আর একটা বারান্দা পেরিয়ে গেলে আবার ডানদিকে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। তাই না? পরীক্ষা করে দেখা যাক।

ঠিক অবিকল সেইরকমভাবে বারান্দা পেরিয়ে ডানদিকের সিঁড়িটা দেখতে পাই। আমার একটু গা ছম্‌ছম্‌ করে। যখন নিজের কোনো কাজ বা চিন্তারই ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না? তখনই একটা ভয়ের ভাব আসে।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার আগে।

একটুক্ষণ চোখ বুজে দাঁড়াই। দোতলার ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চৌকো চত্বরের চারপাশেই ঘর। সামনের দিকের উত্তর ও দক্ষিণ কোণে দুটি সিঁড়ি উঠে গেছে দুটি গম্বুজে। গোল, ঘোরানো লোহার সিঁড়ি। পূর্ব দিকে ঠাকুরঘর, সেখানে রয়েছে কালী-মূর্তি, যার জিভটা সোনার। সিঁড়ির ঠিক সামনেই বিশাল হলঘর; নাচ গানের আসর বসাবার পক্ষে উৎকৃষ্ট জায়গা, সেখানে তিনটি ঝাড়লণ্ঠন। নাচঘরের ঠিক পাশের ঘরেই একটা প্রকান্ড শ্বেতপাথরের ডিম্বাকৃতি টেবিল, সেখানে অন্তত তিরিশজন লোক এক সঙ্গে খেতে বসতে পারে। ওই ঘরের দেওয়ালের ফ্রেস্কোতে শুধু রাশি রাশি ময়ূর।

ওপরে উঠে এসে প্রত্যেকটা জিনিস মিলিয়ে নিলাম। ঠাকুরঘর, নাচঘর ঠিক যেখানে যেরকমটি ভেবেছিলাম, সেই জায়গাতে আছে। ঠাকুরঘরে কালীমূর্তিটি অবশ্য নেই। শ্বেতপাথরের টেবিলটার মাঝখান দিয়ে ফাটা এবং একটা অংশ ভেঙে পড়ে গেছে। কিন্তু চারদিকের দেওয়ালে ময়ূরের ছবি অনেকটা অস্পষ্ট হলেও ঠিক চেনা যায়। এরকম মিল কি করে সম্ভব?

এটা আমার গত জন্মের স্মৃতি হতেই পারে না। কারণ আমি নিজেকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। এর মধ্যে কোনো একটা ঘরে আমি থাকতাম, সে কথা তো মনে হচ্ছে না একবারও। শুধু মনে হচ্ছে, বাড়িটা খুব চেনা। যদিও এখানে আগে কখনো আসি নি।

পুরনো জমিদার বাড়ির ভেতরটা কীরকম দেখতে হবে, তা কল্পনা করা খুব শক্ত নয়। অনেক বইতে বর্ণনাও পড়েছি। কিন্তু চোখে দেখার আগেই কোন্ দিকে কোন্ ঘর, তা পর্যন্ত মনে আসে কী করে? বিশেষত দেওয়ালের ফ্রেস্কোতে ময়ূর?

সেই নিস্তব্ধ রহস্যময় পরিত্যক্ত বাড়িটার দোতলায় আমি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। ফুরফুরে হাওয়া ঘুরে ঘুরে যায় সারা বাড়িতে। আমার আরও মনে পড়ে। সোজা এক দুই তিন চারখানা ঘর পার হবার পর যে ছোট ঘরটি, সেটার দেওয়ালে গাঁথা একটা আলমারি আছে না? মোটরগাড়ির স্টিয়ারিং-এর মতন একটা গোল জিনিস ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটাকে খুলতে হয়। সে আলমারিটা এখনো আছে?

গুনে গুনে ঘরগুলো পার হয়ে সেই ছোট ঘরটার সামনে এলাম। এই ঘরের দরজা বন্ধ, অন্য সব ঘরের দরজা খোলা, কোনো কোনো ঘরের দরজার পাল্লাই নেই, শুধু এই এই ঘরটা বন্ধ কেন? জোরে চাপ দিলাম। খুললো না। দুমদাম করে লাথি কষালাম কয়েকবার। যে বাড়ির সদর দরজা খোলা, ভেতরে কেউ নেই, সে বাড়িতে যা খুশী করা যায়। ভেতরে সেই আলমারিটা আছে কিনা দেখার জন্য আমি ছটফট করছি। অথচ অতবড় দরজা ভেঙে ফেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একটু নিরাশ হতে হলো।

বাড়িটার প্রায় সব অংশই আমার দেখা হয়ে গেছে। সব জায়গাই চেনা। বাকি আছে গম্বুজ দুটো। মনে হয় যেন কতবার আমি উঠেছি ওই গম্বুজের ওপরে। প্রথম গম্বুজটায় একটা বিরাট পেতলের ঘণ্টা আছে। আছে না? দেখা যাক।

—কে?

চমকে পেছন ফিরে তাকালাম। হঠাৎ মানুষের পায়ের শব্দ। বারান্দা দিয়ে একটি দুরন্ত শিশুর হাত ধরে এগিয়ে আসছেন একজন মহিলা। শিশুটির গায়ে একটি গাঢ় হলদে রঙের জামা, সে একেবারে ছটফট ছটফট করছে।

মহিলাটি আমার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে। সাধারণের চেয়ে একটু যেন বেশী কৌতূহল। এমনভাবে চমকে ওঠার জন্য আমি লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

বাচ্চা ছেলেটি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, এটা তোমাদের বাড়ি?

আমি বললাম, না।

—এ বাড়িতে লোক থাকে না কেন?

—সবাই চলে গেছে।

—তুমি এখানে কী করছিলে?

—আমি দেখতে এসেছি।

এবার মহিলাটিও ভদ্রতা করে বললেন, আমরাও দেখতে এসেছি।

নিচে আরও দুপদাপ পায়ের শব্দ, অনেক মানুষের কণ্ঠস্বর। ভ্রমণার্থীরা অনেকেই এ বাড়ি দেখতে আসে। নিস্তব্ধ নির্জন বাড়িটাতে আমার যে ঘোর এসেছিল, তা একেবারে কেটে গেল। আমার মনে হলো না এ জায়গাটা আমার চেনা।

ফিরে আসছি। সিঁড়ির মুখে এক ভদ্রলোক আমাকে দেখে খুবই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, আরে, অমিয় না?

ভদ্রলোকের ভুল হয়েছে। আমার নাম অমিয় নয়। আমি সেই কথাটাই স্মিতহাস্যে জানালাম। ভদ্রলোক তবু বললেন, অবিকল অমিয় মজুমদারের মতন, আমি তো চমকে উঠেছিলাম।

পেছন থেকে শিশুর হাত ধরা সেই মহিলাও বললেন, আমিও ঠিক তাই ভেবেছিলাম। উনি কোনো কথা বললেন না দেখে...

ওঁদের কাছে দ্রুত সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়ে আমি বিদায় নিলাম। আমি অমিয় মজুমদার নামে কারুকে চিনিও না।

নিচে এসে সুরকি বিছানো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার অস্বস্তি কাটলো না: কেন এই বাড়িটা দেখে আমার এত চেনা মনে হয়েছিল? কী করে সব মিলে গেল? আবার ওই ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাই বা আমাকে দেখে অমিয় মজুমদার বলে ভুল করলেন কেন? এই দুটি ঘটনার মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই তো? হয়তো, যার নাম অমিয় মজুমদার, সে এই বাড়িতে আগে এসেছে। সে বাড়িটাকে চেনে। তাহলে আমি কে? তক্ষুনি নিজের বাড়ি ফিরে নিজের আয়নায় নিজের মুখটা দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

রাত্তিরে শুতে যাবার আগে প্রত্যেকদিনই স্নান করা অভ্যেস রীণার। শীত গ্রীষ্ম মানে না। রীণাই দোতলার বাথরুমে নীল বাল্ব লাগিয়েছে। সারা বাড়িটা যখন নির্জন হয়ে আসে, তখন শাওয়ার খুলে দিয়ে নীল আলো জেবলে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে।

একটা অস্পষ্ট চিৎকার রীণাও শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু গ্রাহ্য করে নি, সারা গায়ে সাবান মেখে সে তখন স্পঞ্জ দিয়ে পিঠ ঘষার চেষ্টা করছিল, ঠোঁটে আলতো গুনগুন গান। আর একবার চিৎকার উঠতেই কোণের ঘরের দরজা খুলে মা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কে চেঁচাচ্ছে কে? বৌমা? আমাদের বাড়িতে নাকি?

বন্ধ বাথরুমের ভেতর থেকে রীণা জবাব দিল, মনে তো হলো কাঞ্চার গলা। আবার বোধহয় আজ ওর মাথায় ভূত চেপেছে!

বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে মা জিজ্ঞেস করলেন, এই কাঞ্চা, কাঞ্চা? কি হয়েছে কি? চেঁচাচ্ছিস কেন?

একতলার কোণের ঘর থেকে কাঞ্চা হাউমাউ করে কি যেন বলে উঠলো। একটি বর্ণও বোঝা গেল না, কিন্তু মনে হলো খুব ভয় পেয়েছে। বাথরুমের জানলা দিয়ে রীণা ধমকের সুরে বললো, এই কাঞ্চা। চুপ কর। এত রাত্তিরে মানুষজন ঘুমোবে না?

চিৎকার থামলো না, বরং সত্যিকারের আতঙ্ক ফুটে উঠলো, মা ডাকলেন, দীপু, দীপু ঘুমিয়েছিস নাকি? আয় না একবার নিচে—বৌমা, তাড়াতাড়ি বেরোও।

রাত্তিরের স্নানটা তাড়াতাড়ি সারতে হলেই রীণা বিরক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বেরুতেই হবে, সব জায়গায় স্পঞ্জ বুলোনো হলো না, তাড়াতাড়ি জল ঢেলে সাবান ধুতে লাগলো। মা ততক্ষণে শিপ্রাকেও ডেকে তুলেছেন। দীপুর গম্ভীর গলা শোনা গেল। কি হয়েছে কি? আজ আবার জ্বালাচ্ছে তো কাঞ্চাটা! বলছি ওকে দেশে পাঠিয়ে দাও!

গত বছর কার্সিয়াং বেড়াতে গিয়ে এই নেপালী ছেলেটাকে নিয়ে আসা হয়েছিল। ওর বাবাই বলেছিল, এখানে খেতে পাচ্ছে না, কলকাতায় বাবুদের কাজ করে খেয়ে পরে তবু বাঁচবে। চোদ্দ-পনেরো বছরের হাসি-খুশী ছেলেটা, যেমন বিশ্বাসী, তেমন খাটতে পারে, কোন কথায় না নেই, বাড়িতে সবারই ছেলেটাকে খুব পছন্দ। কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে ছেলেটাকে নিয়ে—সন্ধের পরই ও কেমন যেন বদলে যায়, মুখ-চোখে ভয়ের ছাপ পড়ে, অন্ধকারের মধ্যে একা পড়ে গেলেই চেঁচিয়ে ওঠে। দারুণ ভূতের ভয় ছেলেটার। প্রথম প্রথম বাড়ির সবাই হাসি ঠাট্টা করে ওর ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বহু জন্মের পাহাড়ী কুসংস্কার সহজে যাবার নয়।

নিচ তলায় ভাঁড়ারঘরে শুতে দেওয়া হয়েছে কাঞ্চাকে, কিন্তু প্রায় রাত্তিরেই ও ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করে। আসলে একা ঘরে শোবার অভ্যেস ওর নেই। কিন্তু বাড়ির চাকরকে আর কোথায় শুতে দেওয়া হবে—কিছুদিন দোতলার বারান্দায় শুতে দেওয়া হয়েছিল, তাতেও ওর ভয় কমে নি, তা ছাড়া নিচতলাটা একেবারে ফাঁকা পড়ে থাকে! এখন ওর সঙ্গী হিসেবে একটা কুকুর কিনে দেওয়া হয়েছে, কুকুরটা রাত্রে ওর ঘরে শোয়। এমনিতে ছেলেটা দিনের বেলা সাহসী, দুপুরবেলা বৈঠকখানায় যেবার চোর ধরা পড়লো তখন কাঞ্চাই তো ছুটে গিয়ে লোকটাকে জাপটে ধরেছিল, আর একটু হলে ভোজালি চালিয়ে দিত। অথচ রাত্তির হলেই ওর যত রাজ্যের ভয়—রোজ খাবার সময় ও রীণা আর শিপ্রাকে শোনায়—ভূতেরা নাকি ওর ঘরে ফিসফিস করে, ওকে ভয় দেখাবার জন্য হাসে! আসলে পুরোনো বাড়ি, মোটামোটা দেয়ালে নোনা ধরার গন্ধ, দিনের বেলাতেও নিচতলাটা অন্ধকার হয়ে থাকে, সিঁড়ির তলার অন্ধকার জায়গাটার দিকে তাকালে এমনিতেই গা ছম্ ছম্ করে। তবে কাঞ্চার আজকের চিৎকারটা যেন একটু বেশী চরম।

ওরা তিনজন নিচে নেমে গেছে, গোলমাল থামে নি, সবাই মিলে উত্তেজিত ভাবে কি যেন বলছে। রীণা তাড়াতাড়ি ব্লাউজ সায়া পরে নিল, শাড়িটা জড়িয়ে নিয়ে ঝটাস করে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। মাথাটা ভালো করে মোছা হয় নি, টপ্‌টপ্ করে জল ঝরছে। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো নিচে।

কাণ্ডার ঘরে উঁকি দিয়ে রীণা জিজ্ঞেস করলো, কি, কি হয়েছে কি? কাণ্ডার থেকেও এখন বেশী চেঁচাচ্ছে শিপ্রা, কিন্তু তার কথা শোনার আগে রীণা নিজেই দেখতে পেল। কাণ্ডার হাতে একটা শাবল, ঘরের মেঝেটা অনেকখানি খুঁড়ে ফেলেছে। এ ঘরের মেঝেটা অনেকদিন ধরেই এবড়ো-খেবড়ো, বহুকালের ড্যাম্পে মাটি এরকম ফুলে ফুলে ওঠে। কাণ্ডা প্রায় বলে, রাত্তিরে নাকি ওর বিছানার তলায় গুমগুম্ শব্দ হয়। তাই শুনে শিপ্রা বলেছিল, তোর ঘরের ঠিক নিচেই পাতাল পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ আছে। তাই না রে? আজ কাণ্ডা কারুকে কিছু না বলে শাবল দিয়ে সিমেন্টের মেঝেটা খুঁড়ে ফেলেছে। রীণা দেখতে পেল সেখানে একটা মড়ার মাথার খুলি।

কাণ্ডা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, মুখখানা তার রক্তহীন ফ্যাকাসে, গলা দিয়ে আর আওয়াজ বেরুল না এখন। শিপ্রা তার মাকে জড়িয়ে ধরেছে, বাচ্চা কুকুরটা শুঁকছে সেই মড়ার মাথার খুলি—কুঁই কুঁই করে শব্দ করছে। রীণার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো পায়ের জোর চলে গেল, মনে হলো, এক্ষুনি মাটিতে ঝুপ করে পড়ে যাবে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তীব্র গলায় বললো, একি! সঙ্গে সঙ্গে মা আর শিপ্রার কান্না মেশানো চিৎকার।

একমাত্র দীপুরই ঠাণ্ডা মাথা। সে জিজ্ঞেস করলো, এই ছোঁড়া, তুই হঠাৎ মাঝ রাত্তিরে ঘর খুঁড়তে গেলি কেন?

মা বললেন, কি সর্বনাশ! এটা কি করে এখানে এলো! এই দীপু—

—আমি তা কি করে জানবো! পুরোনো বাড়ি, কবেকার কি সব ব্যাপার!

—তোর দাদাকে খবর দে! আমার মাথা ঘুরছে—এই শিপ্রা, ওরকম করছিস কেন!

—দাদাকে খবর দেবার কি হয়েছে!

মা আর শিপ্রার ভয় দেখে রীণার প্রথম আতঙ্কটা কেটে গেছে। মা শিপ্রা দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে রয়েছেন, দু'জনেরই চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। রীণা তাড়াতাড়ি উঠোনের আলোটাও জেবলে দিল। মাকে একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বললো, দেখেই তো মনে হচ্ছে বহুদিনের পুরোনো—

দীপু এগিয়ে পা দিয়ে খুলিটাকে ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। মা আর্তস্বরে বললেন, ছুঁস্ না ছুঁস্ না—এই দীপু সরে আয়—। মা দীপুর হাত ধরতে যেতেই দীপু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, দাঁড়াও না—আমার ডাক্তার বন্ধু আলোকের ঘরে দু'দুটো কঙ্কাল আছে, কতবার তাতে হাত দিয়েছি।

খুলিটা সত্যিই খুব পুরোনো, ভেতরে মাটি ভর্তি। চোয়ালের খানিকটা ফেটে গেছে, চোখের জায়গায় দুটো শূন্য গর্ত। শিপ্রা ভয়ে মার পিঠে মুখ গুঁজে দিয়েছে। দীপু বললো, মনে হচ্ছে, এর নিচে আরও হাড়গোড় আছে, একটা গোটা মানুষই ছিল—শ খানেক বছর আগে কেউ বোধহয় একটা লোককে খুন করে এখানে পুঁতে ফেলেছিল—কিংবা এমনও হতে পারে, এ জায়গাটা ছিল কবরখানা।

রীণা বললো কিন্তু বাড়ির ভিত খোঁড়ার সময় তা দেখে নি কেউ?

—হয়তো বাড়ির মালিকই কাউকে পুঁতে রেখেছিল। যাক্‌গে, এই কাণ্ডা বেরিয়ে আয়, কুকুরটা নিয়ে আয়।

ভয়, উত্তেজনা ও চেঁচামেচি চললো আরও কিছুক্ষণ। দীপু শেষ পর্যন্ত বললো, এখন এ ঘরে তালা দেওয়া থাক্, কাণ্ডা আমার ঘরেই শুয়ে থাকুক্ আজ। কাল সকালে আমি বাকি মেঝেটা খুঁড়ে দেখবো এখন।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কেন, তুই খুঁড়বি কেন?

রীণা বললো, বলা যায় না হয়তো গুপ্তধন টুপ্তধনও থাকতে পারে।

দীপু হেসে বললো, যা বলেছো! হয়তো গুপ্তধন পুঁতে যখ দিয়েছিল! আয় কাণ্ডা, তোর বিছানা নিয়ে আয়। বৌদি, তুমিও না হয় মা'দের ঘরে গিয়ে শোও—ভয়-টয় পাবে রাত্তিরে।

—আমি অত ভয় পাই না!

—না, বৌমা তুমি আমার ঘরেই এসো।

কাণ্ডার ঘর বন্ধ করে উঠোনের আলো নেভাবার পর নিচতলাটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সিঁড়িতে ওঠার আগে শিপ্রা আবার মাকে জড়িয়ে ধরলো, রীণা রইলো সবার পেছনে। শিপ্রা কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, মনে হচ্ছে, উঠোনে এখনও একটা কিসের শব্দ হচ্ছে, না?

রীণা বললো, ধ্যাৎ। কোথায় শব্দ।

দীপু বললো, শিপ্রাটার সব সময়ই ভয়—এত বড় মেয়ে, চলু, ওকে এখন একবার একা রেখে আসি নিচে।

—ওরে বাবা! শিপ্রা দু'তিনটে সিঁড়ি লাফিয়ে ওপরে উঠে এলো।

রীণা মা'দের ঘরে গেল না। নিজের ঘরেই এলো শুতে। ভালো করে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে, খাটের নিচেও একবার উঁকি মেরে দেখলো।

একা শোওয়া অভ্যেস আছে রীণার। এক সপ্তাহ অন্তর এক সপ্তাহ করে নাইট ডিউটি থাকে দেবনাথের। খবরের কাগজের চাকরি, রাত দুটো-আড়াইটের সময় ডিউটি শেষ হয়। বিয়ের পর প্রথম কয়েক মাস রাত আড়াইটের পরই হেঁটে বাড়ি ফিরে আসতো, জেগে থাকতো রীণা। এখন রীণাই তাকে বারণ করে দিয়েছে অত রাত্রে ঝুঁকি নিয়ে ফিরতে, গুন্ডা বদমাইসদের হাতে পড়তেই পারে, একদিন পুলিসের গাড়িও থানায় নিয়ে গিয়েছিল, নেহাত খবরের কাগজে চাকরি করে বলেই অফিসে টেলিফোন করে ছাড়া পায়।

কলেজে পড়ার সময়ও রীণা বরাবর হোস্টেলে কাটিয়েছে। তার ঘরে অবশ্য আরও দুটি মেয়ে শুতো, কিন্তু কখনো কখনো তারা হয়তো বাড়িতে গেছে আর ফেরে নি—রীণা একা ঘরে শুয়ে থেকেছে, তার কোনোদিন ভয় করে নি।

খাটের তলা-টলা দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রীণা শাড়ি-ব্লাউজ, সায়া খুলে নাইটি পরে নিল। সারা বাড়ি এখন আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, এ পাড়াটাও বেশ নির্জন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে রীণা ভাবলো, শিপ্রার বড় বেশী বেশী ভয়। কচি খুকি। তেইশ বছরের মেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ কান্না জুড়ে দিয়েছে! কাণ্ডার চেয়েও ওর ভয় যেন বেশী!

রীণার ভূতের টুতের ভয় নেই! কিন্তু চোর ডাকাতকে তার বড্ড ভয়। রাত দুপুরে তার ঘরে যদি একটা চোর ঢোকে—ঘুম ভেঙে তাকিয়ে দেখতে পেলেই রীণা হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবে! অবশ্য তার আগে ভালো করে দেখে নেবে সত্যিকারের চোর কি না! দেবনাথের মতন করবে না। দেবনাথ একদিন মাঝরাতে বাথরুমে যাবার জন্য বেরিয়েছিল—সিঁড়িতে দীপুকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছিল, চোর! চোর! দীপুও তখন বাথরুমে যাবার জন্যই নিচে এসেছিল, সে যত বলে দাদা আমি। দেবনাথ শুনতেই পায় নি—তারস্বরে চেঁচিয়েছিল চোর, চোর!

চুল আঁচড়ানো শেষ করে রীণা মুখে ক্রিম মাখতে লাগলো। তারপর গ্লিসারিনের শিশি থেকে খানিকটা গ্লিসারিন মাখালো ঠোঁটে আর কনুইয়ের কাছে। অনেক মেয়ের দুই কনুয়ের কাছে কি রকম খরখরে হয়ে থাকে। রীণা একদম পছন্দ করে না। রীণা আবার ভাবলো দীপুর কিন্তু সাহস আছে। দীপুর স্বাস্থ্য ভালো, কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো হলেও সবাই সাহসী হয় না। তবে এটা ঠিক, দীপু যখন পা দিয়ে মড়ার মাথার খুলিটায় ঠোক্কর মারছিল, তখন রীণারও বুকের মধ্যে শিরশির করছিল একটু একটু। ঠিক ভয় নয়, অন্য রকম কি যেন। সুইচ টিপলেই ইলেকট্রিক আলো, এর মধ্যে ভয় পাবার কি আছে। কিন্তু শুধু একটা মড়ার মাথা দেখলেই কি রকম কি রকম যেন লাগে। ওটা ওখানে এলোই বা কি করে। ঘরের মেঝেতে মড়ার মাথা। কেউ কখনো এরকম শোনে নি।

দেবনাথের বাবাই এই বাড়িটা কেনার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিলেন, হঠাৎ তিনি এলাহাবাদে অফিসের কাজে গিয়ে সেখানেই হার্ট-ফেল করেন। দেবনাথরা পরে বাড়িটা কিনে ফেলে, সাঁইত্রিশ হাজার টাকায় বাড়িটা একটু সস্তাই বলতে হবে—যদিও বাড়ি খুব পুরোনো, কিন্তু জায়গা আছে অনেকটা। কিন্তু এ পর্যন্ত বাড়িটা সম্পর্কে কোনো দুর্নাম তো কখনো শোনা যায় নি। এই এগারো বছরে ওরাও দেখে নি কিছু। রীণারই তো বিয়ে হয়েছে, আট বছর।

আলো নিবিয়ে খাটে উঠতে গিয়ে রীণার হঠাং একটু ভয় করলো। যতক্ষণ আলো জ্বালা ছিল, তার কিছুই মনে হয় নি। খালি তার মনে হচ্ছে, ঘরের মধ্যে যেন কেউ আছে। প্রথমে ভয়টা কাটিয়ে ফেলার জন্য রীণা চোখ বুজে শুয়ে রইলো কিছুক্ষণ, অন্য কথা ভাবার চেষ্টা করলো, পুজোর সময় পুরী যাবার কথা বলেছিল দেবনাথকে, কিন্তু দেবনাথ কিছুতেই নাকি ছুটি পাবে না—প্রায় তিনবছর কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাওয়া হয় নি...। রীণা কিছুতেই ভয়টা তাড়াতে পারছে না। খালি মনে হচ্ছে মাথার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে, তার নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে—তার মুখখানা রীণার মুখের খুব কাছে ঝোঁকানো।

একটুক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থেকে ভয়টা যখন ক্রমশ বাড়ছে, তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, কখন ঝট করে রীণা চোখ মেলে তাকালো, ধড়মড় করে উঠে আলো জ্বাললো। কেউ কোথাও নেই। নিছক মনের বিকার। অন্য কোনো রাতে এরকম মনে হয় না। শুধু আজই—নিচতলার ওটা দেখার পর...মনটা দুর্বল হয়ে গেছে। খাটের তলা, আলমারি—আলনার পাশগুলো আবার ভালো করে দেখলো, কোনোরকম সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণই নেই। দরজা জানলা সব বন্ধ, ঘরের ভেতরটা একটু গুমোট হয়ে গেছে। সেইজন্যই বোধহয়...!

রীণা দারুণ জেদী মেয়ে। অকারণে সে আজ ভয় পাচ্ছে বলে, নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠলো। একটা জানলা খুলে দিল রাস্তার দিকের—সেখান থেকে তাকিয়ে রইলো বাইরে। ঠুনঠুন করে একটা রিক্‌শা যাচ্ছে, রিক্‌শার ওপর কাৎ হয়ে শুয়ে আছে একটা লোক—তাছাড়া রাস্তার আর জন-মনুষ্য নেই। এক ঝলক হাওয়া এসে তার মুখে লাগতেই ভয়টা অনেক কেটে গেল।

অন্য মেয়ে হলে, ওইটুকুতেই খুশী হয়ে আবার এসে শুয়ে পড়তো। কিন্তু রীণা অকারণে ওরকম ভয় পাবার জন্য নিজের মনটাকে একটু শিক্ষা দিয়ে দিতে চাইলো। দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। সাধারণত সে পাতলা স্বচ্ছ নাইটি প'রে ঘরের বাইরে বেরোয় না রাত্তিরে—কিন্তু ড্রেসিং গাউনটা আজই কেচে দিয়েছে। এখনও শুকোয় নি। এখন সবার দরজা বন্ধ, কেউ তাকে দেখবে না অবশ্য।

ভয়টাকে একেবারে শায়েস্তা করার জন্যই রীণা বারান্দার আলোও জ্বাললো না। অন্ধকারে রেলিং-এর কাছে এসে তাকালো উঠোনের দিকে। ওপরে তিনতলায় দীপুর ঘরে আলো নিভে গেছে। মা-শিপ্রার ঘরও অন্ধকার। রীণার ছিটকিনি খোলার শব্দ কেউ শোনে নি। অন্ধকারে চোখটা সইয়ে নেবার চেষ্টা করে রীণা উঠোনের দিকে চেয়ে রইল। তার ঘরের দরজা একটুখানি খোলা, একটা আলোর রেখা এসে পড়েছে বারান্দায়। নিচতলাটা সেইজন্য আরও বেশী অন্ধকার লাগছে। একটু বাদে চোখ খানিকটা সয়ে এলো। কাণ্ডার ঘরটা তালাবন্ধ দেখা যাচ্ছে—ওর ভেতরে আছে মাথার খুলিটা—কিন্তু কোথাও কোনো শব্দ নেই। কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রীণা পেছন ফিরতে যাচ্ছে—এমন সময় একটা শব্দ শুনতে পেল নিচে। কে যেন উঠোনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে দৌড়ে গেল হাল্কা পায়ে।

চোররা ভেতরে একটা বাচ্চা ছেলেকে আগে ঢুকিয়ে দেয়। হঠাৎ যেন তার সব ভয় চলে গেছে, অদম্য সাহস এসেছে বুকে। দৃষ্টি প্রাণপণে তীক্ষ্ণ করে আবার তাকালো উঠোনে, খুঁজতে লাগলো। আবার সেই শব্দ।

রীণা চেঁচিয়ে ডাকলো, দীপু! দীপু! আলো জ্বালার জন্য ছুটে গেল সুইচের দিকে। যে-দৌড়াচ্ছে, সে মানুষ নয়। মানুষ হতে পারে না। রীণা এবার স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে একটা কালো কুচকুচে বালিশের মতন কিছু একটা উঠোনের এ পাশ থেকে ওপাশে গড়িয়ে গেছে। লম্বা লম্বা চুলওয়ালা একটা মানুষের মাথাও হতে পারে—সেই সঙ্গে চাপা কান্নার মতন আওয়াজ।

রীণার ডাক নিশ্চয়ই দীপু শুনতে পায় নি, মা-শিপ্রাও জাগে নি। কিন্তু আলো জ্বলতেই রীণা এবার দেখতে পেল তাদের কুকুরটা নিচতলার উঠোনে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। আর ডাকছে কুঁই কুঁই করে। কুকুরটাকেও দীপু তিনতলায় নিয়ে গিয়েছিল, কোন ফাঁকে আবার নিচে নেমে গেছে। কুকুরটা অকারণেই উঠোনের এপাশ-ওপাশ ছুটছে। এবার

সত্যিই দারুণ ভয় পেয়েছিল রীণা। ইস্, মানুষ এইভাবেই তো ভয় পায়। মনটা আজ দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই কুকুরটাকেও চিনতে পারে নি! কালো রঙের বালিশ কিংবা শুধু কোনো মানুষের মাথা আবার উঠোন দিয়ে গড়াতে পারে নাকি! ভাগ্যিস দীপুরা ওঠে নি, নইলে দীপু নিশ্চয়ই তাকে ঠাট্টা করে করে একেবারে কাঁদিয়ে ছাড়তো। কুকুরটা ওখানে গিয়ে ওরকমভাবে ছোটাছুটি করছে কেন। জন্তু জানোয়ারদের ব্যবহারের কি কোনো ঠিক আছে। রীণা ফিসফিস করে ডাকলো, লিজি, লিজি, ওপরে উঠে যায়।

কুকুরটা তবুও শুনলো না, অনবরত উঠোনে ছোটাছুটি করছে, যেন কিছু একটা জিনিসকে সে তাড়া করে যাচ্ছে বারবার, অথচ কিছুই নেই। রীণা আবার ডাকলো, লিজি! লিজি! কাম হিয়ার!

তিনতলায় দীপুর ঘরে খুট করে আলো জ্বলে উঠলো। একটু আগে রীণার চিৎকার সে শুনতে পায়নি, এখন এই ফিসফিসানি ডাকেই তার ঘুম ভেঙে গেছে।

নেমে আসছে।

রীণার তখন খেয়াল হলো, সে সামান্য একটা পাতলা নাইটি পরে আছে! শরীরের সব কিছুই এতে স্পষ্ট দেখা যায়, এই পরে দেওরের সামনে দাঁড়ানো যায় না। রীণা ঝট্ করে নিজের ঘরে ঢুকে, আলো নিবিয়ে, দরজা বন্ধ করে দিল নিঃশব্দে। সে যে ঘর থেকে বেরিয়েছিল, সেটাই দীপুর জানবার দরকার নেই। কিন্তু বারান্দার আলোটা নেবানো হয় নি।

দীপু দোতলায় নেমে এসে একবার অনুচ্চ গলায় জিজ্ঞেস করলো, কে? কে কথা বলছিল?

রীণা কোনো সাড়া দিল না। মা আর শিপ্রা দু'জনেরই ঘুম বেশ গাঢ়, আজ আবার ভয় পাবার পর বোধহয় বেশী করে ঘুমোচ্ছে, দীপুর গলার আওয়াজে কেউ জাগল না। দীপু বারান্দার এদিকে এলো, রীণার ঘরের দরজার সামনে একবার দাঁড়ালো, ভেতর থেকে রীণা সব বুঝতে পারছে। দীপু চাপা গলায় বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করলো, বৌদি, ঘুমোচ্ছ। রীণা একবারও উত্তর দিল না। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। দীপু উত্তর না পেয়ে নিঃশব্দে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বারান্দার আলো নিবিয়ে ডাকতে লাগলো, লিজি লিজি। আঃ আঃ, লিজি। রীণা শুনতে পেল দীপুর গলার আওয়াজ ক্রমশ একতলার দিকে নেমে যাচ্ছে।

রীণা সামান্য একটু হেসে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। দু' হাতের পাঞ্জায় চোখ দুটো ঢেকে রইলো। এখন আর তার ভয় করছে না।

দেবনাথ বললো, পুলিশে খবর দেওয়া দরকার। খুন-টুনের ব্যাপার মনে হচ্ছে।

দীপু বললো, কিন্তু দাদা, এ অন্তত পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরোনো ব্যাপার নিশ্চয়ই। পুলিশ এখন এর কি করবে?

—কি করে বুঝলি অত পুরোনো?

—দেখছো না খুলিটা ছাড়া আর সবই ঝুরঝুরে হয়ে গেছে।

শিপ্রা দিনের আলোতেও ভয় পাচ্ছে, শুকনো গলায় বললো ছোড়দা আরও একটু খুঁড়ে দেখো না, যদি আরও থাকে-টাকে?

—তা বলে সারা বাড়ির ভিতরই খুঁড়ে ফেলবো নাকি?

দেবনাথ জিজ্ঞেস করলো, কি করে জানলি আর নেই?

এমা কবরখানা ছিল না, বোঝাই যাচ্ছে। ডেড বডিটাকে লম্বালম্বি শুইয়ে কবর দেওয়া হয় নি, একটা পুঁটলি মতন করে এখানে পুঁতে ফেলা হয়েছিল। বস্তা আর পুরোনো খবরের কাগজের টুকরোও রয়েছে।

অনেক সময় ছোট ছেলের মড়া ওই রকমভাবেই কবর দেয়।

ছোট ছেলে নয়, রীতিমতন বয়স্ক—স্কাল দেখলেই বোঝা যায়। খুব সম্ভবত কোনো মহিলার স্কেলিটন।

—মেয়েছেলে?

—হ্যাঁ, জামা-কাপড়ের কোনো চিহ্ন নেই যদিও, কিন্তু দ্যাখো না, ভেতরে দু'তিনটে

ভাঙা কাঁচের চুড়ি রয়েছে।

—যাঃ, তোকে আর ডিটেকটিভগিরি করতে হবে না। পুলিশে খবর দিয়ে আয়। পুলিশ কিছু করুক না করুক, খবর দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

মা বললেন, তখুনি আমি বলেছিলুম এই পুরোনো বাড়ি কিনতে হবে না! অপয়া বাড়ি! এর চেয়ে মধ্যমগ্রাম কিংবা বারাসতে একটু ছোট দেখে নতুন বাড়ি হলে...

দীপুই সকালবেলা শাবল দিয়ে মেঝে অনেকখানি খুঁড়ে ফেলে হাড়গোড় সব বার করেছে। দীপুর উৎসাহ বেশী ছিল গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার। কতকগুলো হাড়গোড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি। বেশ গভীর গর্ত করে মড়াটাকে পোঁতা হয়েছিল বোঝা যায়, যে কোনো কারণেই হোক—সেটা ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে। ঘরের মেঝের খানিকটা জায়গা ঢিপি মতন হয়ে ফুলেছিল। পুরোনো বাড়ির মেঝে ড্যাম্প লেগে অনেক সময়ই এ রকম হয়—আগে ওদের কিছু মনে হয় নি এ সম্পর্কে।

ব্যাপারটা যে অনেকদিনের পুরোনো তার আর একটা প্রমাণও পাওয়া গেল। গর্তটার মধ্যে ছেঁড়া চটের বস্তা আর খবরের কাগজের টুকরো ছিল কয়েকটা।

ড্যাম্পে কাগজগুলো লালচে হয়ে পচে গেছে। তবুও দীপু তার পাঠোদ্ধার করার অশেষ চেষ্টা করে একটুখানি পড়তে পারলো। কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরে প্রস্তাবের একটা প্রতিবাদ সভার রিপোর্ট। কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ১৯১১ সাল পর্যন্ত? এ কাগজটা নিশ্চয়ই তারও আগের।

বাড়িতে এ রকম একটা সাংঘাতিক কান্ড, রীণা কিন্তু তা নিয়ে খুব বেশী ব্যস্ত নয়। সে মাঝে মাঝে ওখানে এসে ঘুরে যাচ্ছে, আর অফিস যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। কি করে খবর ছড়িয়ে যায় কে জানে, তাদের বাড়ির সামনে বিরাট ভিড় জমে গেছে, পাড়া-প্রতিবেশীরা এসে নানা উদ্ভট গল্প জুড়ে দিয়েছে। রান্নার ঠাকুরটা রাত্রে এখানে শোয় না—সে থাকে কাছেই একটা বস্তিতে। সকালবেলা সে এসে এই কান্ড দেখে হৈচৈ করেছিল, রীণা তাকে ধমক দিয়ে নিয়ে এসেছে রান্নাঘরে—একটা মড়ার মাথা খুঁজে বার করা হয়েছে বলে কি বাড়িতে সবার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হবে? কেউ অফিস-টফিস যাবে না? একটা ব্রিটিশ কোম্পানীতে স্টেনোগ্রাফারের কাজ করে রীণা, সে অফিসে হুট-হাট করে ছুটি নেওয়া যায় না।

সবাই মিলে জেরা শুরু করেছে কাণ্ডাকে। দিনের বেলা কাণ্ডার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। চোর-ডাকাত ধরার মতই ভূতের রহস্য বার করে ফেলার কৃতিত্বে ও এখন গর্বিত। সে জোর দিয়ে বলছে, জিন মাটির তলায় আর থাকতে চাইছিল না, তাই রোজ রাত্তিরে সে শুয়ে পড়ার পর তার কানে কানে কথা বলতো। জিন চেয়েছিল গর্ত খুঁজে তাকে বার করে দিতে।

এই রহস্যটা নিয়ে সবাই খুব মশগুল হয়ে রইলো। এখন মড়ার মাথাটা দেখার পর—অনেকেই হয়তো ভয় পেতে পারে, কিন্তু কাণ্ডা আগে থেকেই টের পেয়েছিল কি করে? সে তো অনেকদিন থেকেই বলছিল, ও ঘরে ভূত আছে, ও ঘরের মাটির তলায় খুটখুট করে শব্দ হয়! সেটা কি করে সম্ভব? এর ব্যাখ্যা কি?

নাইট ডিউটি থেকে ফিরে সকাল দশটা-এগারোটা পর্যন্ত ঘুমোয় দেবনাথ। তখন ঘুমোতে পারে নি, এই জন্য মুখখানা তার বিরক্ত, তার ওপর এই ঝঞ্ঝাট! সে একটু শান্তিপ্রিয় লোক, বেশী লোকজন তার পছন্দ হয় না। দেবনাথ ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, এই, এই দীপু, ওকি করছিস। না, না—বারণ করছি—

দীপু ততক্ষণে হাতে শাবল নিয়ে গর্তটার মধ্যে নেমে পড়েছে। গেঞ্জী পরা তার সবল শরীরে ফুলে উঠেছে হাতের মাসল। হাসতে হাসতে বললো, দাঁড়াও দেখি না—দি আরও কিছু আছে কিনা!

না, দেখতে হবে না। উঠে আয়! একটা ডেডবডি বছরের পর বছর পচছে ওখানে, অস্বাস্থ্যকর জায়গা।

দীপু তার দাদার সব কথা শোনে না। উঠে না এসে শাবল দিয়ে এদিক ওদিক খুঁচিয়ে দেখতে লাগলো। ঘরের দরজার কাছে ভিড় একেবারে ভেঙে পড়লো, একটি অতি উৎসাহী

ছেলে তো হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল। নতুন করে চেঁচামেচি শুনে বীণা আবার এসে জিজ্ঞেস করলো, আর কিছু পাওয়া গেল? রান্নার ঠাকুরকেও সেদিকে ছুটে আসতে দেখে তাকে ধমক দিয়ে বললো, আবার তুমি আসছো কেন? যাও ডালটা নামিয়ে ফেলো। ন'টা বাজে প্রায়।

মা এসে পাগলের মতন চেঁচাতে লাগলেন, দীপু, শিগগির উঠে আয়, শিগগির আয় নইলে আমি...

দু'হাতের তালুতে ভর দিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠে এলো দীপু। হাসতে হাসতে বললো, নাঃ আর কিছু নেই, ডেফিনিট। গুপ্তধন-টুপ্তধন নয়, ক্লিন মার্ডার কেস।

দেবনাথ বললো, তুই যদি পুলিশের কাছে না যাস, আমিই যাই তা হলে। অন্তত ভিড় সামলাবার জন্যও পুলিশ ডাকা দরকার।

দীপু কোনো উত্তর না দিয়ে দাদার প্রস্তাবেই সম্মতি জানালো। অর্থাৎ মাটি মাথা গায়ে তার পক্ষে থানায় যাওয়ার চেয়ে, যেতে হলে দাদারই যাওয়া উচিত। বিরক্ত মুখে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল দেবনাথ।

মা বললেন, দীপু কারুকে ছুঁবি না, যা আগে চান করে আয়!

—যাচ্ছি যাচ্ছি, দাঁড়াও না!

—না, যাচ্ছ না,—কোন্ অজাত কুজাতের মড়া তার ঠিক নেই!

—মড়ার আবার জাত কি মা! মরার আগেই তো জাতফাতের ঝামেলা।

ভিড়ের মধ্যে পাড়ার কয়েকজন প্রবীণ লোকও ছিল। দীপু তাদের জিজ্ঞেস করলো জ্যাঠামশাই, আমাদের আগে যারা এ বাড়িতে ছিল—তাদের ফ্যামিলিতে কোনো খুন-টুন কিংবা নিরুদ্দেশের ঘটনা শুনেছেন।

দু'তিনজন বৃদ্ধ একসঙ্গে কথা শুরু করলেন। তাদের কথা থেকে এইটুকু জানা গেল যে, আগে থাকতো শুধু বুড়ো বুড়ি আর তাদের একটি ছোট ছেলে। বুড়ো বুড়ির বড় ছেলে চাকরি করতো এলাহাবাদে, তার সঙ্গে বাপ মা'র বেশী বনিবনা ছিল না। বুড়ো মারা যাবার পর, বড় ছেলে এসে মা আর ছোট ভাইকে নিয়ে গেছে এলাহাবাদে আর উকিলের মারফত বিক্রি করিয়েছে এ বাড়ি। বুড়ো মরার পর পাড়ার লোকেরাই তাকে পুড়িয়ে এসেছে, সুতরাং সে সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

তবে এ বাড়ি অবশ্য বুড়ো-বুড়ির পৈতৃক ছিল না। তাঁরাও এ বাড়ি কিনেছিলেন বছর তিরিশেক আগে। কিন্তু বছর তিরিশেক আগে এ বাড়ি কার ছিল সে সম্পর্কে পাড়ার প্রবীণদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা গেল। কেউ বললেন, আগে এ বাড়ির মালিক ছিলেন এক মুসলমান জমিদার, তিনি এ বাড়ি ভাড়া খাটাতেন। আবার কেউ বললেন, এখানে আগে ছিল একটা ইস্কুল। অর্থাৎ তিরিশ বছর আগেকার স্মৃতি কারুরই নিশ্চিত নয়।

ভিড় ঠেলে বাড়ির একেবারে ভেতরে চলে এলো এক যুবক! ধুতি আর হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি পরা, পাঞ্জাবির হাতা কনুই পর্যন্ত গোটানো। হন্তদন্ত হয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার? বাড়ির সামনে এত ভিড় দেখে, শুনলাম নাকি খুন হয়েছে এ বাড়িতে?

দীপু তাকে বিশেষ পাত্তা দিল না, এক পলক তার দিকে তাকিয়ে আবার বৃদ্ধদের গালগল্প শুনতে লাগলো। ছেলেটি দীপুর হাত ছুঁয়ে আবার বললো, কি হয়েছে দীপুদা? কি ব্যাপার?

দীপু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শুধু বললো, মড়ার মাথা! এমনভাবে সে উচ্চারণ করলো, যেন বলতে চায়, আমার মাথা!

ছেলেটি দমলো না, বললে, ভিড় দেখে আমি আর থাকতে পারলুম না। একটা কাজে যাচ্ছিলুম, তারপর বাড়ির সামনে এত ভিড় দেখে মনে হলো নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে। ছেলেটির ভাব এমন যেন, এ বাড়ির কোনো বিপদ হলে তার প্রতিকার করা ওরই দায়িত্ব। সমস্ত কাজ তুচ্ছ করে তাকে ছুটে আসতেই হবে। দীপু তাকে বললো, ঐ শাবলটা সরিয়ে রাখো তো রমেন, গর্তে পড়ে যাবে!

রমেন নিচু হয়ে শাবলটা তুলতে তুলতে আড়চোখে একবার শিপ্রার দিকে তাকালো। কঙ্কালের খুলিটার দিকেও তার চোখ পড়েছিল, কিন্তু সেটা সে গ্রাহ্যই করলো না, বারবার

তাকাতে লাগলো শিপ্রার দিকে। শিপ্রা ভিড় থেকে একটু সরে চলে এলো সিঁড়ির কাছে, রমেনও এক ফাঁকে এসে গেল তার পাশে।

পুলিশ যখন এলো, রীণা তখন অফিসে বেরুচ্ছে। ভিড় ঠেলে রীণা বেরুতে পারছিল না, পুলিশের জন্যই ভিড় ফাঁক হয়ে গেল। বাড়ির সামনের রাস্তাটা তখন লোকে লোকারণ্য। কত রকম গল্প লোকের মুখে মুখে তখন ফিরছে তার ঠিক নেই। এ বাড়ির প্রত্যেকটা লোকই এখন দর্শনীয়। সিনেমার অভিনেত্রীকে দেখার মতন লোকে ভিড় করে এসেছিল রীণাকে দেখার জন্য। অফিসে যাবার সময় রীণা সানগ্লাস পরে, হালকা লাল রঙের শাড়ি আর ব্লাউজে রীণাকে দেখাচ্ছে খুব সুন্দর।

দেবনাথকে দেখে রীণা বললো, আমি অফিসে বললুম বুঝলে। তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো, এসব ঝামেলা চুকিয়ে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো।

দেবনাথ বলল, আজ না গেলে পারতে না?

—উপায় নেই। কালকে কয়েকটা ইনকমপ্লিট চিঠি আমার ড্রয়ারে রেখে এসেছি! সেগুলো আমি না গেলে কেউ খুঁজে পাবে না, আর চিঠিগুলো যদি আজ না যায়, ডেভিস সাহেব রেগে আগুন হয়ে যাবেন।

দেবনাথ পুলিশ ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে বললো, ইনি আমার স্ত্রী। এঁর অফিস আছে, গেলে আপত্তি নেই তো!

ইন্সপেক্টরটি অতিরিক্ত ভদ্র হয়ে বললেন, না, না, আপত্তি কিসের! অফিস যাবেন না কেন! যা কেস শুনছি—

রীণা হাত ব্যাগ খুলে বললো, এই নাও আলমারির চাবি, তোমার পা-জামা-টামা বার করে রাখতে একদম ভুলে গেছি। চলি তাহলে!

উঠোনে চেয়ার পেতে দেওয়া হয়েছে ইন্সপেক্টরকে। মুখ চোখ দেখলে মনে হয় এ ব্যাপারে যেন বিশেষ কোনো উৎসাহই নেই। নেহাত বেড়াতে এসেছেন।

দেবনাথ হঠাৎ অকারণে শিপ্রাকে একটা ধমক দিয়ে বললেন, এই খুকু, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? চা কর না! সকাল থেকে চা খাই নি ভালো করে!

শিপ্রার পাশ থেকে রমেন ছিটকে সরে গেল। শিপ্রা অপ্রসন্ন মুখে চলে গেল রান্না-ঘরের দিকে।

দীপু ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞাসা করলো, প্রথমে কার এজাহার নেবেন?

ইন্সপেক্টর হেসে বললেন, আপনি বুঝি খুব ডিটেকটিভ বই পড়েন?

—হ্যাঁ, না মানে কেন বলুন তো?

—আপনার ভাব দেখলেই বোঝা যায়। শুনুন, সে রকম কিছু রোমাঞ্চকর ব্যাপার ঘটার আশা নেই। ইংরেজি গোয়েন্দা গল্প হলে হয়তো দেখা যেত, এই পঞ্চাশ বছরের পুরোনো কেস থেকেই একটা বিরাট রহস্য উদ্ঘাটন হয়ে যেত। কিন্তু আমাদের এই বছরই এত কেস পেন্ডিং আছে—যে পঞ্চাশ বছরের বাসি মড়া ঘাঁটাঘাঁটি করার সময় আমাদের নেই।

—তা হলে এগুলো কি হবে? এই হাড়টাড়? রাস্তায় ফেলে দেবো?

—একটু বাদে থানা থেকে ডোম পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে এসে বস্তায় ভরে সব নিয়ে যাবে। একটা রুটিন মাফিক ফরেনসিক টেস্ট হবে—তবে বোঝাই যাচ্ছে, এ নিয়ে কোনো কেস ওপন্ করা হবে না। এমনিতেই সব মার্ডার কেস্ সল্ভ করা যায় না, আর এতো মশাই হাফ্ সেঞ্চুরি আগের ব্যাপার।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ইন্সপেক্টর দেবনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তো মশাই খবরের কাগজের লোক! ভিয়েৎনাম যুদ্ধের ব্যাপার কি বুঝছেন? মিটবে শিগগিরই।

দীপু জিজ্ঞেস করলো, ফরেনসিক টেস্টে জানা যাবে, কঙ্কালটা কোনো পুরুষের না মেয়ের?

—তা জানা শক্ত নয়। কিন্তু জেনে কি হবে।

—আমার ধারণাটা ঠিক কিনা বুঝতে পারতুম। আমার ধারণা এটা একটা মেয়েরই, দুটো ভাঙা চুড়ির টুকরো—

—এমনও তো হতে পারে—কোনো মেয়েই এই লাশটা পুঁতেছিল। গর্ত-খোঁড়ার সময় তার হাতের চুড়ি ভেঙে—

—একটা মেয়ের পক্ষে সেটা টু-ম্যাচ্। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে একটা মেয়ে আর কাউকে খুন করে আবার নিজেই গর্ত খুঁড়ে ডেড বডি পুঁতে রাখবে এতটা ভাবা—

ইন্সপেক্টর হা-হা করে হাসতে হাসতে বললেন, আপনার বুঝি ধারণা পঞ্চাশ ষাট বছর আগে মেয়েরা খুব শান্ত-শিষ্ট ছিল? তখন তারা খুনটুন করতো না?

দীপু বললো, তখন কেন, এখনও কোন মেয়ের পক্ষে অতটা করা সম্ভব নয়!

ইন্সপেক্টর বললেন, মেয়েদের চেনেন না আপনি! আমাদের লাইনে থাকলে...দেখলুম তো অনেক, মেয়েরা যেমন দেবীর মতনও হতে পারে, তেমনি যদি আবার—ইন্সপেক্টর হঠাৎ মাঝপথে থেমে গিয়ে প্রসঙ্গ বদলে বললেন, নেপালী চাকরটাকে একবার থানায় পাঠিয়ে দেবেন। ওর একটা স্টেটমেণ্ট নিয়ে রাখতে হবে—নিছক ফর্মালিটি আর কি!

ভিড় কাটতে কাটতে দুপুর গড়িয়ে গেল। খিদেয় পেট জ্বলছে দেবনাথের কিন্তু খাবার উপায় নেই। শান্তি স্বস্ত্যয়নের জন্য মা পুরুতমশাইকে ডাকতে পাঠিয়েছেন, তার আগে খাওয়া হবে না। দীপু আর অফিসে যায় নি, শিপ্রা কলেজে যায় নি। রীণা গেছে বলে মা তখন থেকে গজগজ করছেন। রীণাকে একটু ভয় পান তিনি—রীণা যখন যায় তখন শাশুড়ীকে বলেই গেছে, কিন্তু তখন তিনি আপত্তি করতে পারেন নি। এখন বলতে শুরু করেছেন প্রেতাত্মার বিহিত মন্ত্র পড়ে না তাড়ালে কখন কি বিপদ হয় মানুষের! আজকের দিনে বাড়ি থেকে কারুরই বেরুনো উচিত নয়।

দীপু ঠাণ্ডা করে বললো, ভূতে কি বৌদিকে অফিস পর্যন্ত তাড়া করবে নাকি?

মা বললেন, যা বুঝিস না, তা নিয়ে কথা বলিস না! ভূতের কথা বলছি নাকি? আত্মা বলে একটা জিনিস আছে, সেটা অন্তত মানছি তো? এতকাল মাটির তলায় চাপা পড়ে ছিল।

—আত্মা আবার কোথাও চাপা পড়ে থাকে নাকি? সে তো শুনেছি হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়!

—তুই থাম তো! দেবু তুই বৌমার অফিসে একবার ফোন করে খবর নে না?

দেবনাথ বললো, খবর আবার কি নেবো?

ঠিক মতন অফিসে পৌঁছেছে কিনা—তা ছাড়া বলে দে, আজ যেন সন্ধের আগেই বাড়িতে ফেরে!

—এখন আর ফোন-টোন করতে যেতে পারবো না। ঘুমে আমার চোখ টেনে আসছে, পেটে খিদে জ্বলছে—কোথ্ থেকে একটা মড়ার মাথা এসে বাধিয়েছে যত ঝামেলা!

রমেন নামের ছেলেটিই পুরুতমশাইকে খবর দেবার ভার নিয়েছিল। সে ফিরে এসে বললো, পুরুতমশাইকে পাওয়া গেল না, তিনি নবদ্বীপ গেছেন কি যেন কাজে। যেন দোষটা তারই, রমেনের মুখখানা সেই রকম কাঁচুমাচু। দেবনাথ বললো, ভালই হয়েছে। দাও ঠাকুর, খেতে দাও। আর দেরি করতে পারছি না।

দীপু বললো, রমেন তুমিই তো বামুনের ছেলে, তুমিই ক'টা মন্ত্রটন্ত্র আওড়ে দাও না।

—আমি তো মন্ত্র জানি না। অন্য পুরুতের খোঁজ করবো?

মা জিজ্ঞেস করলেন, অন্য পুরুত কোথায় পাবে? আর কারুর ঠিকানা জানো?

—না, তা জানি না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখবো?

দীপু হাসতে হাসতে বললো, একি দুর্গাপুজো কিংবা সরস্বতী-পুজো পেয়েছো নাকি, যে রাস্তা দিয়ে অনবরত পুরুত যাবে?

দেবনাথ বিরক্তভাবে বললো, আঃ কি হচ্ছে কি? মা, আজকেই কি তোমার ওসব না করালে নয়? রবিবার দিন না হয় পুরুত ডেকে তোমার যা খুশী করিও। এখন খাবার-দাবারের ব্যবস্থা কর, আমাকে আবার সারারাত জেগে আজ ডিউটি দিতে হবে।

অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে রীণা ঘড়ি দেখলো। ঠিক পাঁচটা পাঁচ: পাঁচটা

বাজার সঙ্গে সঙ্গেই টাইপরাইটারে ঢাকনা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রীণা কি যেন ভাবলো। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলো ময়দানের দিকে—রাস্তা পেরিয়ে ও পাশের ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলো।

পার্ক স্ট্রীট ক্রসিং-এ অন্তত শ'খানেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে লাল আলোর সামনে। বেশ ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে আজ বিকেলে। রীণার একটু খিদে পেয়েছে, খুব ইচ্ছে করছে বাদাম ভাজা কিনতে কিন্তু একা রাস্তা দিয়ে বাদাম খেতে খেতে যেতে কি রকম যেন লাগে। রীণা একবার পেছনে তাকালো. তাকিয়ে সেই লোকটাকে আবার দেখতে পেল। অফিস থেকে বেরিয়েই গেটের উল্টোদিকে এই লোকটাকে দেখেছিল তখন কিন্তু খেয়াল করে নি, কিন্তু ট্রাম স্টপেও লোকটাকে ঠিক তার পাশে এসে দাঁড়াতে দেখে সে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। লোকটার চেহারা দেখলে তো অভদ্র মনে হয় না! রীণার চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। তবু বোঝা যায়, লোকটা রীণার দিকেই চেয়ে আছে। এখন লোকটা আসছে তাঁর পেছনে পেছনে। এসব রীণার গা-সহা হয়ে গেছে। অফিস থেকে বেরিয়েই রীণা ট্রামে ওঠে না। এসব পাড়ায় একা কোনো মেয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটলেই কেউ না কেউ তার পিছু নেবে। এই লোকটাকে দেখলে তো মনে হয় শিক্ষিত ভদ্রলোক, কিন্তু চোরের মতন মুখ করে তার পেছনে পেছনে আসছে। সামনাসামনি এসে কথা বলার সাহস নিশ্চয়ই হবে না। বেশ খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে, অতি সূক্ষ্ম একটু আনন্দ এবং গর্বও বোধ করলো রীণা। তার এখন একত্রিশ বছর বয়েস—তবুও তাকে দেখে পুরুষমানুষেরা আকৃষ্ট হয়।

আর একটা কথা মনে পড়তেও রীণার একটু হাসি পেল। দেবনাথও বিয়ের আগে তাকে এই রকম অনুসরণ করতো। কলেজ থেকে ফেরার পথে রীণা রোজ দেখতো করুণ ব্যর্থপ্রেমিকের মতন মুখ করে দেবনাথ তার পেছনে পেছনে আসছে। একদিন রীণা ওকে অনেক কড়া কথাও শুনিয়ে দিয়েছে।

বড় গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল সুবিমল, রীণাকে দেখে তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, আজ একেবারে ঠিক সময় এসেছো!

রীণা বললো, আজ থাকতে পারবো না. আজ এক্ষুনি চলে যেতে হবে!

—ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো সেই অনুসরণকারী লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ইতস্তত করছে। এদিকে আসতেও সাহস করছে না, আবার ঠিক উল্টোদিকে ঘুরে হাঁটতেও পারছে না। লোকটা শেষ পর্যন্ত ময়দানের দিকে চলে গেল।

সুবিমল জিজ্ঞেস করলো, আজ তোমার ওভার টাইম নেই?

—ওভার টাইম থাকলেও আজ আমাকে বাড়ি যেতে হতো। আমাদের বাড়িতে আজ একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। আমাদের বাড়িতে একতলার মেঝে খুঁড়ে একটা মড়ার মাথা পাওয়া গেছে।

—অ্যাঁ? কি পাওয়া গেছে?

রীণা মৃদু হেসে বললো, এসো ঘাসের ওপর একটু বসি বেশিক্ষণ না কিন্তু। বাদাম কেনো না!

সব শুনে সুবিমল বললো, এটা তোমার কাছে মজার ব্যাপার?

রীণা বললো, তা ছাড়া কি!

—আমি তো এমন ঘটনা কখনো শুনি নি, বাড়ির মধ্যে একটা কঙ্কাল পাওয়া গেছে আর সে বাড়ির বউ বলছে, এটা একটা মজার ব্যাপার, তোমার ভয় করে নি একটুও?

—সত্যি বলতে কি, কাল রাত্তিরে আমার একটু গা ছমছম করছিল। খালি মনে হচ্ছিল, ঘরের মধ্যে কে যেন আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলছে।

—তার আগেই মাথার খুলিটা তুমি দেখেছ?

—হুঁ!

—তারপরও তুমি একা ঘরে শুতে পারলে?

—বাঃ, রোজই তো শুই। কালই বা শোবো না কেন? তা ছাড়া কে শোবে আমার সঙ্গে?

রীণা মুচকি হেসে তাকালো সুবিমলের দিকে। সুবিমল দুঃখিতভাবে বললো, কেন শিপ্রা তো তোমার সঙ্গে শুতে পারতো!

না, শিপ্রার সঙ্গে শুতে আমার একটুও ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া মা একলা থাকবেন কি করে! মাও খুব ভয় পেয়েছেন।

—রীণা, তোমার সত্যিই খুব মনের জোর!

—মনের জোর না থাকলে কি আর এক বাড়ির বউ হয়েও তোমার সঙ্গে এখানে বসে গল্প করতে পারি?

—দেবনাথ যদি কোনোদিন দেখতে পায়, কি বলবে তুমি তখন?

—কি বলবো, তখন ভেবে দেখা যাবে। তবে খুব বেশী চেঁচামেচি বা রাগারাগি করার মানুষ ও নয়। চাপা লোক, দুঃখ পেলেও মনের মধ্যে চেপে রাখবে।

—রীণা সত্যি বলছি, দেবনাথের কথা ভাবলে আমার মাঝে মাঝে নিজেকে দারুণ অপরাধী বোধ হয়। ওর উদারতার সুযোগ নিয়ে ওকে ঠকাচ্ছি আমরা।

—বেশ তো কাল থেকে আর ঠকিও না।

—তুমি জানো, সে উপায়ও আমার নেই। তোমারও কি আছে? তুমি পারবে আমাকে ছেড়ে থাকতে?

আবছা অন্ধকার হয়ে এসেছে, ময়দানের সব দৃশ্য এখন অস্বচ্ছ। কাছাকাছি আরও কয়েক জোড়া নারী-পুরুষ খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে। সুবিমল আলতোভাবে রীণার কোমর জড়িয়ে ধরলো, তার নিরাবরণ বাহুতে হাত বুলোতে বুলোতে বললো, রীণা, কয়েক শো বছর আগে, যখন তুমি কোনো রাজার পুরীতে পাটরাণী ছিলে, তখন কি তুমি কোনো হাট থেকে আমাকে ক্রীতদাস হিসেবে কিনেছিলে?

রীণা সুবিমলের বুকে মাথা হেলিয়ে হাসতে হাসতে বললো, কিনেছিলাম তো। এক কানাকড়ি দিয়ে কিনেছিলাম।

তাহলে, বলো রাজেন্দ্রাণী, আমার ওপর আর কি হুকুম তোমার? পদসেবা করে দেবো?

—না, আপাতত তোমার বুক পকেট থেকে ফাউন্টেন পেনটা সরিয়ে নাও। আমার ঘাড়ে ওটাতে লাগছে!

সুবিমল পেনটা সরাতে গিয়ে রীণার ঠোঁটে তার আঙুল ছোঁয়ালো। তারপর মুখটা নিচু করে রীণার চুলের গন্ধ শুঁকতে লাগলো। রীণা ঠোঁটের ওপর থেকে সুবিমলের আঙুলগুলো সরিয়ে দিয়ে আরও এলিয়ে দিল শরীরটা। সুবিমল রীণার বুকের ওপর রাখলো তার হাত, মুখটা সরিয়ে রীণার ঠোঁটের কাছে আনতেই রীণা ধড়মড় করে উঠে পড়ে বললো, ইস্, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবো বলেছিলুম, দিলে তো দেরি করিয়ে!

—বাঃ, আমি দেরি করিয়ে দিলুম?

—নিশ্চয়ই! তুমিই তো দেরি করালে। চলো, শিগ্গির আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও।

—আমি তোমাকে খানিকটা পেঁৗছে দিয়ে আসবো?

—না।

শিপ্রা চেঁচিয়ে ডাকলো, মা, মা! তুমি কি করছো ভেতরে?

কোনো সাড়া পেল না। বাথরুমের দরজা বন্ধ।

শাড়ি সায়া গুছিয়ে শিপ্রা বাথরুমে যাবার জন্য ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছিল, দেখলো মা বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন বাথরুমের দিকে। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার সময় শিপ্রা দেখলো মায়ের মুখখানা কিন্তু একটা চিন্তায় থমথমে! মা কাপড়-টাপড় নিযে যায় নি বলে শিপ্রা ভাবলো, মা বোধ হয় হাত-টাত ধুতে গেছেন। এক্ষুনি বেরিয়ে আসবেন।

সেই থেকে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিপ্রা। সন্ধে হয়ে এসেছে, শিপ্রাকে এক্ষুনি যেতে হবে গানের ইস্কুলে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেও মা বেরুলেন না। ব্যস্ত হয়ে

শিপ্রা আবার ডাকলো, মা, মা তোমার দেরি হবে?

কোনো উত্তর নেই।

শিপ্রা গুনগুন করে গান ধরলো, 'ওগো, কিশোর আজি তোমার দ্বারে—' এই গানটা শেখানো হচ্ছে এই সপ্তাহে। একটু বাদে শিপ্রা রীতিমত ঝাঁঝালো গলায় বললো, মা তুমি বেরুবে নাকি? আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

এবারও কোনো উত্তর নেই।

শিপ্রার কি রকম খট্‌কা লাগলো। অনেকদিন আগে মায়ের ফিটের অসুখ ছিল। বাবা মারা যাবার পরই দেখা দিয়েছিল এই উপসর্গ. বছর চার পাঁচের মধ্যে আর হয় নি, আবার সেটা দেখা দিল নাকি? বন্ধ দরজার একেবারে কাছে এসে শিপ্রা বললো. মা, সাড়া দিচ্ছ না কেন?

তবু কোনো সাড়া নেই।

বাথরুমের দরজার গায়ে জোরে ধাক্কা দিতে যেতেই হাট করে খুলে গেল। ভেতরে নীল আলোটা জ্বলছে। কিন্তু ভেতরে কেউ নেই। পায়খানার দরজাটাও খোলা, সেখানেও কেউ নেই। শিপ্রার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলো। সারা শরীরে একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। মা কোথায় গেল? নিজের চোখে সে মা-কে ঢুকতে দেখেছে, মা তো আর ছেলেমানুষ নয় যে দরজার আড়ালে লুকিয়ে থেকে তার সঙ্গে খেলা করবে!

তবু শিপ্রা ভয়ে ভয়ে একবার তাকালো দরজার দু'পাশে। দীপু বাড়িতে নেই, বৌদি এখনো ফেরে নি. দাদা শুয়ে আছে ঘরে—মা কোথায় গেল? শিপ্রা একেবারে বাড়ি ফাটানো চিৎকার করলো কান্না মেশানো গলায়, মা! মা!—

—কি রে, চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?

—শিপ্রা আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো। চোখ দুটো বিস্ফারিত। সমস্ত শরীরে শিহরণ। মা তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। মা কখন বেরিয়ে গেলেন বাথরুম থেকে? শিপ্রা তো বরাবর দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। গান গাবার সময় সে কি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল? এতখানি অন্যমনস্ক?

মা দোতলায় নেমে এসে আবার বললেন. কি রে এত চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?

—মা, তুমি বাথরুম থেকে কখন বেরুলে?

—আমি আবার বাথরুমে গেলাম কখন?

—তুমি বাথরুমে যাও নি? আমি দেখলাম!

—যাঃ!

—মা, আমি নিজের চোখে দেখলাম, বিশ্বাস করো।

—আমি তো দীপুর ঘরে আলনা গোছাচ্ছিলাম—

বলতে বলতে মা থেমে গেলেন। বাথরুমের দরজার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি একবার গিয়েছিলাম।

কিন্তু শিপ্রা তখন আর কিছু শুনছে না। ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরলো। তার শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। অস্বাভাবিক গলায় চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, মা, আমি নিজের চোখে দেখেছি—এমন কি মুখ পর্যন্ত।

দেবনাথ বোধহয় ঘুমিয়েই ছিল; চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এসে বললো, কি হয়েছে কি? এত জোরে জোরে কথা বলছিস কেন শুধু শুধু?

—দাদা আমি দেখলাম।

মা তাকে বাধা দিয়ে বললেন, হয়েছে, হয়েছে! শিপ্রা চোখে কি ভুল দেখেছে।

—না, চোখের ভুল নয়! ভুল হতেই পারে না।

—যা, তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে নে, গানের স্কুলে যাবি না?

—মা, দেখ আমার গা কাঁপছে। আমার বুকের ভেতরটা কি রকম করছে। আমাকে একটু ধরো তো—

মা ধরার সুযোগ পেলেন না, দেবনাথও ছুটে এসে ধরতে পারলো না, তার আগেই শিপ্রা নেতিয়ে পড়ে গেল মাটিতে. মাথাটা বেশ জোরে ঠুকে গেল মাটিতে।

মা ছুটে ওর মাথাটা তুলে নিলেন। দেবনাথ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাড়াতাড়ি ওর একটা হাত তুলে মণিবন্ধ টিপে নাড়ি দেখতে লাগলো। বিশেষ কিছুই হয় নি, এমনি অজ্ঞান হয়ে গেছে! মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে।

দেবনাথ বললো, মা দ্যাখো, ওকে বোধহয় তোমার রোগটা ধরলো।

—না, মৃগী নয়! হঠাৎ ভয় পেয়েছে। শ্রী রাম রাম রাম। কি যে অনাসৃষ্টি হল বাড়িটায়।

—ভয় পেয়েছে? এখনো সাড়ে ছ'টাও বাজে নি। অন্ধকার হয় নি ভালো। কিসে ভয় পেল?

—কি জানি! আমি তিনতলা থেকে নেমে এসে দেখি বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে মা মা বলে চ্যাঁচাচ্ছে। ও নাকি আমাকে বাথরুমে ঢুকতে দেখেছে। অথচ আমি দু'ঘণ্টার মধ্যে বাথরুমে যাই নি। এক মগ জল নিয়ে আয় তো?

—হুঁঃ, বুঝলাম। পেট গরম হয়েছে! তা হবে নাই বা কেন? যা রোদ্দুরে ঘুরে বেড়ায়। কদিন আগে বাসে আসার সময় দেখলাম কলেজ পালিয়ে আর দু'তিনটে মেয়ের সঙ্গে হৈহৈ করে ঘুরছে, যা গনগনে রোদ্দুর তখন, আমাদেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত আর ওরা শখ করে—

রীণা যখন ফিরলো, তখনও শিপ্রা ভালো করে সুস্থ হয় নি। ঘরে এনে খাটে শোয়ানো হয়েছে, মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে ব্যাকুলভাবে বলছে, কিন্তু আমি যে দেখলাম, বাথরুমের আলো জ্বলছে। আলো জ্বাললো কে?

দেবনাথ ব্যাপারটাকে হালকা করার জন্য বললো, যা, যা, ভূতে কখনো আলো জ্বালে না। আমিই হয়তো কখন আলো জেলে রেখে এসেছি!

—তুমি তো ঘুমোচ্ছিলে?

—ঘুমের ঘোরেই কখন হয়তো একবার উঠে চলে গিয়েছিলাম। তুই আমাকেই দেখিস নি তো?

—না না, আমি মুখ পর্যন্ত দেখেছি।

বলেই আবার উঠে বিছানায় ঢলে পড়লো শিপ্রা। রীণা ব্যাপারটাকে মোটেই গুরুত্ব দিলো না। চুপচাপ করে ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে একটু দেখলো। মা প্রাণপণে ঠাকুরের সামনে ধুপ-ধুনো দিচ্ছেন। রীণা ঘর থেকে বেরিয়ে নির্লিপ্তভাবে চলে এলো নিজের ঘরে। তারপরই বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো।

শিপ্রা আর একবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললো, আমি গানের স্কুলে যাবো।

মা ঠাকুরের ছবির সামনে বিড়বিড় করে কি যেন বলেছিলেন, মুখ ফিরিয়ে বেশ দৃঢ়স্বরে বললেন, না, আজ আর বাইরে বেরুতে হবে না।

দেবনাথও বললো, একদিন গান শিখতে না গেলে কি হয়?

শিপ্রা আবার শুয়ে চোখ বুজলো। এবার আর সে অজ্ঞান হয় নি এমনিই চোখ বুজে রইলো।

আর ওদিকে, শিপ্রার গানের ইস্কুলের উল্টোদিকে বকুল গাছটার তলায় অনবরত পায়চারি করতে লাগলো রমেন। অনবরত ঘড়ি দেখছে আর তাকাচ্ছে বাস-স্টপের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখ আর ঘাড় ব্যথা হয়ে এলো।

পাড়ার লাইব্রেরীতে 'গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র' এই বিষয়ে বিতর্ক ছিল, দীপু সেখানে জোরালো গলায় সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের সমর্থনে একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললো। বাড়ি ফিরলো সাড়ে ন'টায় সময়। সমস্ত বাড়িটা তখন থমথমে—যদিও সব ক'টা আলো জেলে দেওয়া হয়েছে।

শিপ্রা ঘুমিয়ে পড়েছে তখন। খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে, এ ছাড়া আর কিছু খেতে চায় নি। সব শুনে দীপু গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, ভূতটুত সব বাজে কথা। বাড়িতে মানুষের হাড় পাওয়া গেছে তো তাই এখন অনেকে অনেক কিছু ভাবে। কিন্তু বাড়িটার একটা কিছু রহস্য আছে, আজ বাড়িতে ঢোকার সময়ও কি রকম

গা ছম্‌ছম্‌ করলো।

বারান্দায় খাবার দেওয়া হয়েছে। দু'ভাই আর রীণা খেতে বসেছে মা একটা চেয়ার টেনে এমনিই বসে আছেন দূরে। শোবার ঘরের দরজা খোলা, বিছানার ওপর শুয়ে থাকা শিপ্রাকে স্পষ্ট দেখা যায়, মা চোখ রেখেছেন সেদিকে। মা বললেন, তোরা তো বিশ্বাস করিস না এসব। আমার বিয়ের পর, তোদের এক সম্পর্কের কাকা—তোর বাবার পিসতুতো ভাই, ঘুমের মধ্যে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিল বাবা বাবা, আমি যাচ্ছি! আমি যাচ্ছি! তারপর সারাক্ষণ চেঁচাতে লাগলো ঐ কথা বলে, এমনভাবে সামনে চেয়েছিল যেন ঠিক কারুকে দেখতে পাচ্ছে—কত ডাক্তার ডাকা হলো। তখনকার দিনের বিখ্যাত কবিরাজ গণনাথ সেনকেও ডাকা হয়েছিল—কিন্তু তিন দিনের দিন তোদের সেই কাকা মারা গেল।

দেবনাথ বললো, তুমি চুপ করো তো! যতসব বাজে বাজে গল্প বলে আরও ভয় ধরিয়ে দেওয়া।

রীণা মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলো, কার ভয় ধরবে? তোমার?

দেবনাথ বললো, তুমিই তো ভয় পাবে! রাত্তিরে বাথরুমে যাবার সময় আমাকেই ডাকবে।

—কোনোদিন ডেকেছি?

—দেখবো আজ কি হয়!

—রীণা মুখের হাসিটি অম্লান রেখেই বললো, আমার ভূতের গল্প শুনতে ভালো লাগে! কিন্তু ভূতের ভয় করে না।

—দেখা যাবে!

দীপু বললো, অনেকে অনেক রকম ভুল দেখে—কিন্তু শিপ্রা মাকে ভুল দেখলো কি করে? ভূতের গল্পেও তো কখনও ভূতেরা জ্যান্ত মানুষের চেহারা ধরে আসে না?

দেবনাথ বললো, এও এক ধরনের অটো সাজেসশান। শিপ্রা হয়তো কোনো কারণে মা-কে ভয় পাচ্ছে—

দেবনাথ আর যেটুকু বলতে চাইলো, তা হচ্ছে এই যে শিপ্রা হয়তো মা'র কাছে এমন কিছু গোপন করে আছে—যা ধরা পড়ে গেলে মা ভয়ংকর রাগ করবেন।—কিন্তু ছোট ভাইয়ের সামনে এ কথা আর বলবো না।

খাওয়া শেষ হবার পর সবেমাত্র হাত ধুয়েছে ওরা, এমন সময় মাথার ওপর গুম্‌গুম্‌ শব্দ হলো।

দীপু গম্ভীর গলায় বললো, মেঘ ডাকছে। রাত্তিরে নিশ্চয়ই দারুণ বৃষ্টি হবে।

মা আর্তগলায় বললো, মেঘ কোথায়? এতো ছাদে শব্দ হচ্ছে! ও দেবু ও দীপু—

আর একবার শব্দ হলো, যেন ছাদের ওপর দিয়ে কেউ একটা লোহার বল গড়িয়ে দিচ্ছে।

মা আবার চিৎকার করতে যেতেই দেবনাথ বললো, দাঁড়াও, আগে থেকেই অত ব্যস্ত হয়ো না। ভালো করে শুনতে দাও।

রীণা বারান্দায় গিয়ে ওপরের দিকে উঁকি মেরে বললো, আকাশে একটুও মেঘ নেই।

দীপু বললো, গরমের দিনে ছাদে একরকম শব্দ হয়। দিনের বেলা প্রচণ্ড উত্তাপে সবকিছুই একটু বেড়ে যায় রাত্তিরে ঠাণ্ডা পেয়ে যখন আবার কমতে শুরু করে তখন ঐ রকম শব্দ হয়।

—আগে আর তো কখনো শুনি নি?

—শুনেছো নিশ্চয়ই। তখন গ্রাহ্য করো নি। ঠিক আছে আমি দেখে আসছি।

দীপু সিঁড়িতে উঠতে যেতেই মা বললেন, না, তুই একা যাবি না। খবর্দার দীপু বারণ করছি—

রীণা দেবনাথকে বললো, তুমিও যাও না? চলো আমিও যাচ্ছি।

দেবনাথ বললো, তুমি নিচে থাকো মায়ের কাছে। আমি যাচ্ছি।

দীপুই আগে উঠে এলো। তিনতলায় তার একখানা ঘর, বাকিটা ছাদ। আবছা জ্যোৎস্নায় পুরো ছাদটা ফাঁকা পড়ে আছে। নিজের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলো তার

ঘর খোলা দরজার কাছে শাড়ি পরা একটি আবছা নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে।

এক মুহূর্তের জন্য দীপুর সমস্ত শরীর ঠান্ডা হয়ে এলো।—চিৎকার করতে গিয়েও মুখ চাপা দিল। অস্ফুটভাবে জিজ্ঞেস করলো, কে?

নারীমূর্তি একবার যেন নড়ে উঠলো, কোনো সাড়া দিল না। দীপু স্থির দৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে দু'পা এগিয়ে যেতেই তার সমস্ত শরীরটা আবার হাল্কা হয়ে গিয়ে, কুলকুল করে ঘাম বইলো।

দূর ছাই, কেউ না, দরজার পর্দাটা হাওয়ায় উড়ে ঐ রকম দেখতে হয়েছিল। ঠিক যেন টাইটভাবে শাড়ি পরে একটি মেয়ে, নবনীতার মতন। ইস, এই রকমভাবেই মানুষ ভয় পায়। তার নিজের পর্যন্ত এই রকম ভুল হয়েছিল। অবিকল মনে হয়েছিল নবনীতার মতন—এমন কি অসম্ভব হলেও তার একবার মনে হয়েছিল, নবনীতা তাই বুঝি কোনো রকমে এসে তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

পেছন থেকে দেবনাথ বললো, কিরে?

দীপু আলগাভাবে হেসে বললো, কই কিছু না।

দু'ভাই সারা ছাদটা ঘুরে দেখলো। এমন কি জলের ট্যাঙ্কের পাশে উঁকি দিতেও ছাড়লো না—যদি ভূত ওদের ভয়ে লুকিয়ে থাকে। কোথাও কিছু নেই। ট্যাঙ্কের পাশে কয়েকটা ফুলের টব, একটা খালি টব কাৎ হয়ে পড়ে আছে। সেটা গড়াবার জন্যই কি শব্দ? কিন্তু তাহলে সারা ছাদ জুড়ে শব্দ হবে কেন। ওসব কিছু নয়।

রীণা আর মা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, কিন্তু দু'জনেই নিঃশব্দ।

বছরখানেক ধরে দু'জনে পরস্পর কথা বলে না। অন্যদের সামনে অবশ্য সেটা বুঝতে দেয় না, রীণা প্রয়োজনীয় দু'একটা কথা বলে মা'র সঙ্গে। কিন্তু একা থাকলে কোনো কথা নেই।

দু'ভাই নেমে এলো এক সঙ্গে। রীণা দীপুর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, কিছু দেখতে পেলে?

দীপুও হেসে উত্তর দিল, না বৌদি, ভূতেরা দারুণ কাওয়ার্ড! কিছুতেই সামনাসামনি আসে না। অন্তত আমার সামনে কখনো আসে নি।

মা আজ তিনতলায় দীপুকে কিছুতেই একা শুতে দেবেন না। দীপু শোবেই। দোতলায় আর একটা মাত্র ঘর আছে, সেটা মাল-পত্রে ঠাসা তা ছাড়া সে ঘরটার মাত্র একদিকে জানলা বলে ভালো হাওয়া খেলে না। দীপুর একা ঘরে শোওয়া অভ্যেস, মা আর শিপ্রার সঙ্গে এক ঘরে সে কিছুতেই শোবে না।

দেবনাথ বললো শুক না ওপরে। এতদিন ধরে শুচ্ছে কিছু হয় নি—ওরকম বেশী বেশী করলে ভয় আরও পেয়ে বসবে তোমাদের।

মা শেষ পর্যন্ত কান্নাকাটি শুরু করলেন, দীপু তবুও শুনলো না। এ বংশের ছেলেরা বড় গোঁয়ার।

দীপু বললো কাল্টা তো সঙ্গেই আছে—তা হলে আর একা শোওয়া হলো কোথায়?

কাল্টা আর কুকুরটাকে নিয়ে দীপু ওপরে উঠে গেল।

দেবনাথ নিজের ঘরে ঢোকার আগে মাকে বললো, ভালো করে দরজা জানলা বন্ধ করে শুয়ো। ভয়ের কিছু নেই। যদি কোনো কিছু হয়—আমাকে ডেকো কিন্তু।

রীণা তখনও বাথরুমে। তার চাপা গলায় গান পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। ওই বাথরুমেই শিপ্রা আজ ভয় পেয়েছিল—রীণার সে সব ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নেই। শোয়ার আগে গা না ধুলে তার চলে না।

পাতলা নাইটি পরে বাথরুম থেকে বেরুলো রীণা, একবার নিচের উঠোনের অন্ধকারের দিকে, একবার ছাদের দিকে চেয়ে—কিছুই দেখতে পেল না, ঘরে এসে ঢুকলো।

দেবনাথ একটা বই বুকে নিয়ে সিগারেট টানছে শুয়ে শুয়ে। দুপুরে অনেক ঘুমিয়েছে, এখন সহজে ঘুম আসবে না। এক সপ্তাহ অন্তর নাইট ডিউটি থাকে বলে যে-কটা রাত্রে সে বাড়িতে ঘুমোয় সেই কটা রাতই তার ইচ্ছে করে রীণার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করতে। অন্যদিন রীণা দুপুরে অফিস যায়, সন্ধের পর যখন ফেরে তার একটু বাদেই দেবনাথকে

অফিস চলে যেতে হয়। বউয়ের সঙ্গে কথাই হয় না প্রায়।

দেবনাথ আড়চোখে দেখছে রীণার পাউডার ও ক্রিম মাখা। প্রত্যেকদিন সে প্রায় একই রকমভাবে প্রসাধন করে, দেবনাথ বাড়িতে থাক বা না থাক। তার শেষ হয়ে গেলে সে দেবনাথকে জিজ্ঞেস করলো, আলো নেভাবো, না তুমি পড়বে?

দেবনাথ বললো, আর পড়বো না, কিন্তু আলোটা থাক।

মস্তবড় খাট, অঢেল জায়গা, রীণা এসে একটু দূরে শুতেই দেবনাথ হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁলো। ঘাড়ের তলায় হাত ঢুকিয়ে টেনে আনলো তাকে কাছে। বুকের ওপর আলতোভাবে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে আজ একটু গম্ভীর দেখছি কেন।

—কই গম্ভীর না তো! তোমার ঘুম পায় নি?

—না।

দেবনাথের ইচ্ছে হলো, রীণার ঠোঁটে একটা চুমু খায়। কিন্তু অনেকখানি ক্রিমে ঠোঁট দুটো চটচটে হয়ে আছে। রীণার বুকে সামান্য চাপ দিয়ে বললো, বাথরুমে এতক্ষণ ছিলে, তোমার ভয় করে নি?

—ভয় আবার কি?

——সব মেয়েরাই তো একটু একটু ভূতের ভয় পায়।

—আমি পাই না। আমি সারা জীবন মানুষকেই এত ভয় পেয়েছি! আজও একটা লোক—

—আজ আবার কি হলো?

—আজ অফিসের গেটের কাছে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল—আমি যেখানেই যাই—আমার পেছনে পেছনে আসতে লাগলো।

—অফিস থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলে।

—কোথায় আবার যাবো। বাস-স্টপে এলাম—সেখানেও লোকটা, পর পর ক'টা বাস ছেড়ে দিলাম, তবু দাঁড়িয়ে রইলো।

—লোকটাকে আগে কখনও দেখেছো?

—না। আমার এমন ভয় করছিল—

—ওরকম বাজে লোক অনেক ঘোরে এসপ্ল্যানেড পাড়ায়।

—বিয়ের আগে তুমিও আমার পেছন পেছন আসতে।

দেবনাথ হেসে বললো, আমিও তাহলে বাজে লোক। তুমি আমাকেও ভয় করো।

রীণা বললো, আমার দুর্ভাগ্য কিনা বলতে পারি না—অনেক ছেলেবেলা থেকেই আমার পেছনে পেছনে এ রকম একটা না একটা লোক ঘুরছে। তার মধ্যে তোমাকেই আমি শুধু বিয়ে করেছি।

—আমাকে বিয়ে করাটাও বুঝি দুর্ভাগ্য?

—তাই বললাম নাকি? বললাম তাদের মধ্যে শুধু তোমাকেই ভালো লেগেছিল বলে তোমাকে বিয়ে করেছি।

—লেগেছিল? এখন আর লাগে না?

—তুমি সাংবাদিক হলে কেন? উকিল হলেই পারতে?

দেবনাথ আবার হেসে রীণাকে আর একটু কাছে টেনে আনলো। রীণা বাধা দিল না, নিজে থেকে জড়িয়ে ধরলো না।

দেবনাথ বললো, বাড়িতে যা শুরু হয়েছে, বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়াই ভালো মনে হচ্ছে।

—বাঃ ভূতের ভয়ে বাড়ি বিক্রি করে দেবে কেন। তা'হলে তো আমার অফিসের গেটে লোক দাঁড়িয়ে থাকে বলে আমাকেও অফিস ছেড়ে দিতে হয়।

—কিন্তু খুকু ওরকম ভয় পেল কেন?

—এবার খুকুর বিয়ে দিয়ে দাও। ওর যে আর লেখাপড়া হবে না, তা তো বুঝতেই পারছো।

—কার সঙ্গে। ঐ রমেনের সঙ্গে? জুতিয়ে ওর মুখ ভেঙে দেবো একদিন, রাস্কেল

একটা। কাজ নেই, কর্ম নেই, শুধু মেয়েদের পেছন পেছন ঘোরা।

—মেয়েদের নয়, আমি যদ্দুর জানি, শুধু শিপ্রার পেছন পেছনই ঘোরে।

—তাই বা ঘুরবে কেন? এখনও কোনো চাকরি-বাকরি জোটাতে পারে নি। বরং চাকরির জন্য ঘুরলে কাজ দিত।

—তুমি যখন আমাকে ফলো করতে, তখন তোমারও কোনো চাকরি ছিল না।

দেবনাথ এবার রীতিমতন চটে উঠলো। স্ত্রীর শরীর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললো, রীণা, তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছো! তুমি আমার সঙ্গে তুলনা করছো ঐ লোফারটার?

রীণা এবার নিজে থেকে হাত রাখলো দেবনাথের গায়ে। ঠোঁট থেকে ক্রিম মুছে একটা চুমু দিল দেবনাথের কপালে। কোমল গলায় বললো, তুমি রাগ করছো? আমি কিন্তু তোমাকে আঘাত দেবার জন্য কিছু বলি নি! আমি বলছিলাম, আমরা নিজেরা যখন কারুকে ভালোবাসি—তখন নিজেদের পক্ষে অনেক রকম যুক্তি তৈরি করি—কিন্তু অন্যদের বেলায় তা সইতে পারি না। শিপ্রা যখন রমেনকে ভালোবাসে—

—মোটেই না। ও এমনি চোখের ভালোবাসা! আমি কিছুতেই ঐ রাস্কেলটার সঙ্গে খুকুর বিয়ে দেবো না।

—ঠিক আছে, মাথা গরম করো না, এখন ঘুমোও!

—আমার ঘুম পায় নি। তুমি ঘুমোও!

—তুমি এখনো রাগ করে আছো ; তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না?

—ভালোবাসা? হুঃ! তুমি কত ভালোবাসো, তা তো জানা আছে!

রীণা একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস ফেললো। দেবনাথের একেবারে বুকের কাছে ঘেঁষে এলো, মিশে গেল দু'জনের বুক। জোর করে দেবনাথের মাথাটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে ফিসফিস করে বললো, বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে দারুণ ভালোবাসি। প্রাণের মতন ভালোবাসি। এর মধ্যে একটুও মিথ্যে নেই। আমার যখন মন খারাপ হয়, আমার যখন একঘেয়ে লাগে—তখন আমি একথা খুব ভালো করে ভেবে দেখেছি! তোমাকে ভালো না বাসলে আমি অনেক কিছুর কারণ খুঁজে পেতাম। তুমি যে এত ভালো, তোমাকে ভালো না বেসে উপায় কি?

রীণার কথায় অত্যন্ত আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল। দেবনাথ খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়লো। আবিষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলো, সত্যি বলছো?

—এর থেকে সত্যি কথা আর কখনো বলি নি।

চুমুতে চুমুতে দেবনাথের মুখ আচ্ছন্ন করে দিল রীণা। দেবনাথ ফের রীণার বুকের ওপর এক হাত রেখে অন্য হাতে নাইটিটা গা থেকে সরাতে গেল। রীণা সেটা চেপে ধরে বললো, আজ নয়, লক্ষ্মীটি, আজ আমার শরীর খারাপ।

দেবনাথ বললো, ঠিক আছে, তা হলে আলো নিভিয়ে দাও!

গরমের জন্য দরজা খুলে শুয়ে আছে দীপু। কাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে ফিসফিস করে নাক ডাকছে আস্তে আস্তে। কুকুরটা শুয়ে আছে সিঁড়ির ওপর। সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ কুকুরটা দু'বার ডেকে উঠতেই দীপু ধড়মড় করে উঠে বসলো। কুকুরটা ছাদের ওপর কাকে যেন তাড়া করে গেল। দীপু তৈরি হয়েই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে খাটের পাশ থেকে টর্চটা নিয়েই বাইরে বেরিয়ে এলো। ছাদে কেউ নেই, কুকুরটা তবু কাকে যেন তাড়া করে ছুটছে।

তবে কি সত্যিই অশরীরী কিছু? কুকুররা কি অশরীরীদেরও দেখতে পায়।

আবছা জ্যোৎস্না উঠেছে, চতুর্দিকে নির্জন, মনে হয় গোটা শহরটাই এখন ঘুমন্ত। দীপুর হঠাৎ মনে হলো, এখানে সে বড্ড একা! অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার গা ছমছম করছে। একবার ভাবলো কাণ্ডাকে ডাকবে কি না। কুকুরটা তখনও কি একটা অদৃশ্য জিনিসকে তাড়া করছে সারা ছাদময়, মুখ দিয়ে আওয়াজ করছে কুঁই কুঁই। দীপু দু'বার ডাকলো, লিজি! লিজি! শোন এদিকে। কুকুরটা তার ডাকে পাত্তাই দিল না।

টর্চের আলোটা আবার ভালো করে ফেলতেই দীপু দেখতে পেল, একটা ধেড়ে ইঁদুর। কুকুরটা ইঁদুরটাকেই তাড়া করছে। এতক্ষণ দীপু আলোছায়ার মধ্যে ওটাকে দেখতে পায় নি। দীপু হাসবে না কাঁদবে, বুঝতে পারলো না। ছি ছি ছি, সম্পূর্ণ অবিশ্বাস সত্ত্বেও সেও তো একটু একটু ভয় পেয়েছিল। নির্জন রাত্তিরে সামান্য কোনো কারণেই বিশ্বাস চলে যায়।

দীপু আবার নিজের খাটে ফিরে এলো। কিন্তু ঘুম আর এলো না। ভয় ভাঙাবার জন্য দীপু তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে তার চোখ ব্যথা হয়ে গেল, কিছুই দেখতে পেল না, শুধুই জ্যোৎস্না পড়ে আছে ম্লান ভাবে।

দরজার নীল পর্দাটা উড়ছে হাওয়ায়। সেটার দিকেও তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। এই পর্দাটাকেই কিছুক্ষণ আগে তার নবনীতা বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু নবনীতাকে দেখলে তার ভয় পাবার কি আছে? নবনীতা তো জলজ্যান্তভাবেই বেঁচে আছে।

খাট থেকে উঠে দীপু একটা সিগারেট ধরালো। আপন মনেই সামান্য হাসলো। নবনীতাকে আর একবার দেখা গেলে মন্দ হতো না। এমনিতে তো আর নবনীতার সঙ্গে দেখা হয় না, তবু যদি দৃষ্টি বিভ্রমে দেখা যেত!

সপ্তাহ দু'এক আগে নবনীতার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল, তখন দীপু মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিল। নবনীতাকে দেখে তার গা জ্বলে গিয়েছিল। মেয়েদের কখনো বিশ্বাস করতে নেই। এই নবনীতাই একদিন তাকে বলেছিল, অরুণাংশুকে দেখলে তার গা জ্বলে যায়। গায়ে-পড়া ন্যাকা ছেলে, নেহাত বাবার টাকা আছে আর একটা পুরোনো আমলের অস্টিন গাড়ি আছে তাই নিয়ে খুব চাল মেরে বেড়ায়। পাক্কা ক্যাপিটালিস্টের বাচ্চা।

অথচ সেই নবনীতাকেই দীপু দেখেছে অরুণাংশুর গাড়িতে চেপে রেড রোড দিয়ে যাচ্ছে। দীপু তখন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের মিটিং-এ যাচ্ছিল। গাড়িতে ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না, নবনীতা বসেছিল সামনের সিটে, কি একটা হাসির কথায় সে আর অরুণাংশু হেসে কুটি কুটি হচ্ছিল। কে জানে অরুণাংশুর একটা হাত নবনীতার উরুতে রাখা ছিল কিনা। কিছু বিশ্বাস নেই। নবনীতা যখন অমনভাবে হাসতে পারে—

সেদিন ভূত দেখার মতনই চমকে গিয়েছিল দীপু। যতদূর দেখা যায় সেই গাড়িটার দিকে তাকিয়েছিল! তারপর অসম্ভব ক্রোধে তার শরীর একেবারে জ্বলে গিয়েছিল। সেদিন মিটিং-এ একটা কথাও তার কানে ঢোকে নি। প্রথমে সে ভেবেছিল, দু'তিনজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে অরুণাংশুকে বেদম ধোলাই দেবে। অবশ্য অরুণাংশুকে মারতে হলে বন্ধুদের সাহায্যের দরকার নেই, সে একাই যথেষ্ট। কিন্তু খানিকটা বাদে, তার আবার মনে হয়েছিল, এক্ষেত্রে অরুণাংশুর কি আর দোষ! যে বড়লোকের বখাটে ছেলে সে তো নবনীতার মতন সুন্দরী মেয়ের পেছনে ছোঁক ছোঁক করবেই! নবনীতা তার কাছে মিথ্যে কথা বললো কেন? নবনীতা কেন তাকে এরকম কথা বলে আবার অরুণাংশুর গাড়িতে চাপলো? অত হাসিই বা কিসের?

দীপু সেদিন ঠিক করেছিল, শুধু নবনীতা নয়, পৃথিবীর আর কোনো মেয়ের সঙ্গেই সে সম্পর্ক রাখবে না। মেয়েরা সবাই এ রকম। মেয়েদের সঙ্গে প্রেম-ফ্রেম করাই এক ঝামেলা। এক গাদা সময় নষ্ট, কত রকম ন্যাকামি যে সইতে হয়- তার ওপর যদি এরকম অবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়—

আজ ছাদে উঠে প্রথমবার নীল পর্দাটা দেখে তার বুকটা ধক্ করে উঠেছিল। ঠিক মনে হয়েছিল নবনীতা দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যেই একটা নম্র সলজ্জ ভাব। যেন নবনীতা তার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে। দূর! তাও কি হয় নাকি? নবনীতা এ বাড়িতে আসেই নি কোনদিন। তিনতলায় সোজা উঠে আসা তো অসম্ভব কথা। একদিন শুধু গলির মোড় থেকে নবনীতাকে তাদের বাড়িটা দেখিয়েছিল দীপু।

কিন্তু পর্দাটাকে নবনীতা বলে মনে হলো কেন তার। সে তো ক'দিন ধরেই নবনীতার কথা মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছিল।

সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দীপু চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। হঠাৎ তার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। এ ক'দিন ধরে তার মন জুড়ে ছিল শুধু রাগ। এখন আর

রাগ হচ্ছে না পৃথিবীর কারুর ওপর, শুধু অভিমান। পৃথিবীর কেউ তার কথা ভাবে না! নীল পর্দাটার দিকে আর একবার তাকিয়ে দীপু একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললো।

—ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো শিপ্রা। মুখে হাত দিয়ে সামলাবার চেষ্টা করলো, পারলো না। সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে একবার ছুটে গেল দরজার দিকে, দরজার ছিটকিনিতে হাত দিয়েও তার ভয় করলো। ফিরে এলো জানলার নিচে নর্দমার কাছে। হুড়হুড় করে বমি করতে লাগল।

একটু আধটু বমি নয়, একেবারে পেট খালি করা। রাত্তিরে কিছুই খাই নি, দিনের বেলা ভাত তরকারি পর্যন্ত উঠে এলো বমির সঙ্গে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে বমি করলো শিপ্রা। মাথাটা ঝিমঝিম করছে, চোখে অন্ধকার দেখছে, মা-কে ডাকতেও সাহস হলো না। কোনো রকমে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। খুট করে আলো জেবলে দেখলো, বেড সাইড টেবিলে এক জগ জল ঢাকা দেওয়া রয়েছে। জলটা আনতে গিয়ে তার পা টলে গেল, তাড়াতাড়ি সামলে নিল খাটের পায়া ধরে। শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছে এইটুকু সময়ের মধ্যেই।

শিপ্রা আস্তে আস্তে আবার উঠে দাঁড়িয়ে কোনো রকমে জলের জগটা নিয়ে ফিরে এলো নর্দমার কাছে। ভালো করে চোখ মুখ ধুলো। মা যাতে বুঝতে না পারে সেই জন্যই জল ঢেলে বমি ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করলো মেঝে থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলো না, বারবার তার চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে, মাথা ঘুরে যাচ্ছে। এখন শুয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই।

খাটের কাছে ফিরে এসে শরীরটাকে হিঁচড়ে বিছানায় তুললো। মা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, মায়ের মুখে একটা বিষণ্ণতার ছায়া। অবিকল এই রকম বিষণ্ণ মুখই সে দেখেছিল সন্ধেবেলা বাথরুমের দরজার কাছে।

ইস্, আলো নেভানো হয় নি। আবার নামতে হবে? কিন্তু শরীর আর বইছে না। এর মধ্যেই গলা শুকিয়ে আবার তেষ্টা পেয়েছে পেটের মধ্যে গুলোচ্ছে কোমরের কাছটায় আর পিঠে অসহ্য ব্যথা। আলো জ্বালা থাকা সত্ত্বেও চোখের সামনে সব কিছু এক একবার অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

শিপ্রার দারুণ ভয় হলো, সে ভাবলো, মানুষ মরে যাবার আগে কি এরকম হয়? আমি কি মরে যাচ্ছি! আমার মরণই ভালো। আমি আগেই আত্মহত্যা করলুম না কেন!

কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার বেঁচে থাকার দারুণ ইচ্ছে হলো। একবার হাত বাড়িয়ে মাকে ডাকতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল। সারাদিনে মায়ের অনেক খাটুনি যায়—এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন, এখন ডাকা উচিত হবে না! শিপ্রা বিছানায় উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

এক সময় কান্না থেমে গেল তার। একটা কথা মনে পড়ল, এক তলার ঘরের মেঝে খুঁড়ে যে মেয়েটার কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল, সে কি আত্মহত্যা করেছিল? তার অবস্থাও কি শিপ্রার মতন হয়েছিল? সে কি এখন শিপ্রাকে টানছে? কাল থেকেই তার আত্মহত্যার কথা মনে হচ্ছে?

কি একটা আওয়াজে শিপ্রা উৎকর্ণ হয়ে উঠলো, চোখ মুছে ভালো করে শোনার চেষ্টা করলো। এবার স্পষ্ট শুনতে পেল, সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে কে যেন নামছে। দরজা বন্ধ, বাইরের সামান্য পায়ের আওয়াজ শিপ্রার শুনতে পাবার কথা নয়, কিন্তু চারদিক এত উৎকট নিস্তব্ধ যে পিঁপড়ের চলার আওয়াজও যেন শুনতে পাওয়া যাবে।

শব্দটা ক্রমশ জোর হচ্ছে। এবার আর কোনো ভুল নেই। ঘড়িতে আড়াইটে বাজে, এখন কে নামবে সিঁড়ি দিয়ে! শিপ্রা সোজা হয়ে বসলো। পায়ের শব্দটা এ ঘরের দিকেই আসছে, খুব কাছে।

শিপ্রা আর থাকতে পারলো না, দু'হাতে মা-কে ধাক্কা দিয়ে ডাকলো মা, মা শিগগির—

মা ধড়কড় করে উঠে বসলেন।

ঐ যে শোনো পায়ের শব্দ। শিপ্রার চুলগুলো এলোমেলো, চোখ দুটো ড্যাবডেবে, আঁচল খসে পড়েছে।

মায়ের ঘুমের ঘোর ভালো করে ভাঙে নি। তিনি বললেন, কোথায় শব্দ? কিছু না তো! তুই ঘুমো।

—ঐ যে, ঐ যে, শোনো।

—কই শুনতে পাচ্ছি না তো! আলো কে জ্বাললো।

—মা, এসে পড়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় দুম্ দুম্ করে ধাক্কা পড়লো। মা আর শিপ্রা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন। শিপ্রার গলা দিয়ে চিৎকারও বেরুচ্ছে না, একটা অদ্ভুত চাপা ভয়ের বিকৃত আওয়াজ বেরুচ্ছে।

মা-ই একটু সামলে নিলেন। কাঁপা গলায় বললেন, কে? কে?

—দরজা খোলা, আমি দীপু!

শিপ্রা আর্তনাদ করে উঠলো, না, মা, দরজা খুলো না, খুলো না! ছোড়দা নয়! এবার ছোড়দার রূপ ধরে এসেছে।

—দরজা খোলো না!

—মা খুলো না! খুলো না!

মা খাট থেকে নেমে দরজার কাছে এসেছেন, দরজা খুললেন না। হাত জোড় করে বললেন, তুমি কে বাবা, সত্যি করে বলো! আমরা তো কোনো দোষ করি নি!

—বলছি তো আমি দীপু!

—এত রাত্তিরে কি চাস্?

—শিপ্রার ঘাড় মটকাবো।

মা দরজা খুলে দিলেন। দীপুর চেহারা দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, চুলগুলো কপালের ওপর ছড়ানো, চোখ দুটো জ্বলছে। ভয়ংকর বিকৃত গলায় সে বললো, শিপ্রাকে চাই, শিপ্রার ঘাড় মটকাবো।

মা আর শিপ্রা দু'জনেই অজ্ঞান হয়ে যাবার ঠিক আগেই দীপু হা-হা করে হেসে উঠলো। হাত দিয়ে চুলগুলো সরিয়ে দিল কপাল থেকে। বললো, কি, ভয়ে একেবারে মরছিলে তো?

মা ভয়ংকর রাগ করে বললে, দ্যাখ দীপু, সব ব্যাপারেই ছেলেমানুষী, না? জানিস্, অনেকে এতে হার্টফেল করে।

দীপুর হাসি তবু থামে না!

মা সেই রকম ক্রুদ্ধভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, এত রাত্তিরে কি চাই তোর?

—জল তেষ্টা পেয়েছে। আমার ঘরে জল রাখো নি কেন?

—এত রাত হয়েছে যখন, সকালবেলা জল খেয়ে চলতো না?

দেখলাম তোমাদের ঘরে আলো জ্বলছে। জল না খেলে আমার ঘুম আসবে না!

জলের জগটা আনতে গিয়ে মায়ের চোখে পড়লো মেঝের ওপর ছড়ানো বমি। অস্ফুট-ভাবে বললেন একি! আর কিছু বললেন না। দীপুকে এক গেলাস জল গড়িয়ে এনে দিলেন।

দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে শিপ্রা। দীপু চলে যাবার পরও সে সেই রকম ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো। তখনও তার ঘোর কাটে নি। মা দরজা বন্ধ করে শিপ্রার দিকে ফিরলেন।

শিপ্রা শুধু বললো, মা—আর কিছু বলতে পারলো না। আবার মা'র মুখে গাঢ় অন্ধকার ছায়া। শিপ্রার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, কি হয়েছে? এত বমি করেছিস কেন? কি হয়েছে আমাকে বলতো?

উঠে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছলো শিপ্রা। এবার অনেকখানি সুস্থ লাগলো তার! মুখ নিচু করে বললো, মা, আমি আর এবাড়িতে থাকতে পারবো না!

—কেন? তুই একাই এত বেশী ভয় পাচ্ছিস কেন?

—আমার সব সময় ভয় করছে। আর পারছি না!

—তুই তাহলে কাল থেকে তোর ছোট মাসীর বাড়িতে গিয়ে ক'দিন থেকে আয়!

—ছোট মাসীর বাড়িতে গেলেও আমার সারবে না। মা, আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

—কেন রে? কেন? এই খুকু—

শিপ্রা প্রায় ছুটে এসে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলো।

ফুলে ফুলে উঠছে তার সুন্দর সুঠাম শরীরখানি। মা বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কি হয়েছে কি? আমাকে বল্—

—মা, আমাকে রমেনকে বিয়ে করতে দাও?

—রমেন! আবার সেই রমেন! কেন, সে ছাড়া অন্য ছেলে নেই?

—ছোটদা রমেনকে অপমান করেছে। কিন্তু রমেনকে ছাড়া আমার চলবে না!

—কেন, রমেন কেন? রমেন কি এমন ছেলে? তোর ছোটমাসী যে ছেলেটির খবর এনেছে, সে তো চমৎকার পাত্র। চেহারাও সুন্দর, ইঞ্জিনিয়ার; ভালো চাকরি করছে।

—মা, অন্য কারুর সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়।

—কেন সম্ভব নয়?

—মা, আমি দারুণ ভুল করে ফেলেছি। তোমরা এখন যদি বেশী বাধা দাও, আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

—কি করেছিস্? কি করেছিস্?

শিপ্রা কাঁদতে কাঁদতেই একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কি যেন বললো। মায়ের মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে গেল। খুব ক্লান্তভাবে থেমে থেমে জিজ্ঞেস করলেন শুধু, ঠিক জানিস?

– হ্যাঁ। তোমরা যদি চাও আমি আত্মহত্যা করলেই সব মিটে যায়, তাহলে সত্যিই আমি—

মা এবার ধমক দিয়ে বললেন, এখন আলো নিভিয়ে শুয়ে পড় তো? আর শরীরটাকে খারাপ করতে হবে না!

আলো নেভাবার পরও অবশ্য দু'জনের কারুরই ঘুম হলো না। মা আর শিপ্রা কথা বলতে লাগলো রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত।

পরদিন আসল পুরুত ডাকিয়ে খুব ধুমধাম করে শান্তি স্বস্ত্যয়ন হলো। মা সেই পুরুতকেই বললেন খুব কাছাকাছি একটা বিয়ের তারিখ দেখতে। দেবনাথকেও সব খুলে বললেন মা। মনে মনে ভয় ছিল, দেবনাথ হয়তো দপ্ করে জ্বলে উঠবে।

দেবনাথ কিন্তু শান্তভাবেই সবটা শুনলো। মুখের একটা রেখাও বদলালো না। যেন ছোটগোছের কোনো ব্যাপারে সে আর রাগ করবে না প্রতিজ্ঞা করেছে।

ধীর গলায় বললো, ঠিক আছে, প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে যা পাই ধার নেবো তুমি বিয়ের তারিখ-টারিখ দ্যাখো।

—কিন্তু রমেন যে কোনো চাকরি-টাকরি করে না।

—আমিই খুঁজবো এখন চাকরি ওর জন্য—

—ওর বাবা মা'র সঙ্গেও তো কথা বলতে হবে। তাঁদের মত আছে কি না।

—সে দায়িত্ব রমেনের!

রীণা আজও যথাসময়ে খেয়ে-দেয়ে অফিসে বেরিয়ে গেল। দীপুও বেরুবার জন্য উসখুস করছে। কিন্তু বাড়ির কাজ না চুকলে বেরুতে পারছে না। খাওয়া-দাওয়ার পরই বেরিয়ে পড়লো। দেবনাথ বেরুলো একটু বাদে, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে একটু পড়তে যাবে। আর মা বিছানায় শুয়ে একটু চোখ বোজা মাত্র চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লো শিপ্রা।

ভবানীপুরে শিপ্রার কলেজের বন্ধু সুজাতা থাকে, মাস আটেক আগে তার বিয়ে হয়েছে। দুপুরবেলা তার স্বামী বাড়িতে থাকে না, সেই সময় প্রায়ই শিপ্রা যায় তার সঙ্গে গল্প করতে। সুজাতাদের টেলিফোন আছে। সেখানে পৌঁছে শিপ্রা বললো, জানিস্

সুজাতা, আমার একটা দারুণ ভালো খবর আছে। সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, কি রে? শিপ্রা বললো, দাঁড়া আগে ওকে ডাকি!

রমেনদের বাড়িতে ফোন নেই, কিন্তু পাশের বাড়িতে ফোন করলে ওদের ডেকে দেয়। সেই জন্যই প্রায় কোনো দুপুরেই রমেন বাড়ি থেকে বেরোয় না। শিপ্রার গলা শোনা মাত্র সে বললো, দাঁড়াও, এক্ষুনি আসছি। রমেন বেকার, অথচ ট্যাক্সি ভাড়া করে ছুটে এলো সুজাতার ফ্ল্যাটে। প্রায় সুজাতার সামনেই শিপ্রাকে জড়িয়ে ধরে আর কি!

শিপ্রা বললো, জানো। কাল মরতে বসেছিলাম প্রায়। একতলার ঘরে ঐ কংকালটা পাওয়ার পর থেকে আমাদের সারা বাড়িটা এমন হয়ে আছে! কাল সন্ধেবেলা আমি যা দেখলাম সবাই বলছে আমার চোখের ভুল!

কি দেখলি রে? কি দেখলি? সুজাতা জিজ্ঞেস করলো। সবিস্তারে গল্পটা শোনালো শিপ্রা—এখন দিনের বেলা অবশ্য ব্যাপারটা সত্যিই অবিশ্বাস্য মনে হয়।

তারপর বললো, ঐ রকম ব্যাপার হলো বলেই তো মাকে বলতে পারলুম! না হলে কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারছিলুম না। মা-ও এত সহজে মেনে নিলেন!

রমেন বললো, মেনে না নিলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, আমরা আগামী সপ্তাহে রেজিস্ট্রি করতুমই।

শিপ্রা বললো, বাজে ব'কো না! মায়ের মত না পেলে আমার মনে কিছুতেই শান্তি আসতো না!

সুজাতা বললো, তা হলে তোদের ভূতটাকে তোর ধন্যবাদ দেওয়া উচিত বল্। ওর জন্যই তো হলো অনেকটা!

শিপ্রা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললো, কালকে অজ্ঞান অবস্থায় আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম, ঐ কংকালটা একটা মেয়েরই কংকাল ছিল, আমারই বয়েসী। ওরও আমার মতন অবস্থা হয়েছিল, তারপর আত্মহত্যা করে।

—সবটা স্বপ্নে দেখলে?

—কি জানি স্বপ্নে দেখলাম না কল্পনা করেছি! মোটমাট আমার বিশ্বাস, ও ছিল ঠিক আমার মতন। তখনকার দিনে তো আত্মহত্যা ছাড়া উপায় ছিল না, এখন কত উপায় আছে! আমি কিন্তু মরতে পারতুম না। মরতে আমার দারুণ ভয় করে।

সুজাতার অলক্ষ্যে রমেন শিপ্রার একটা হাত ধরে একটু চাপ দিল। সুজাতা বললো, তা হলে রমেন, সবই যখন ঠিকঠাক হয়ে গেল, তোমার উচিত আমাকে অন্তত একদিন খাওয়ানো। রমেন বললো, নিশ্চয়ই খাওয়াবো!

শিপ্রা বললো, আমার এত আনন্দ হচ্ছে না, যে কান্না পেয়ে যাচ্ছে!

দীপু গিয়ে বসে রইলো ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে। দুটো আড়াইটের সময় সেখানে নবনীতা আসবেই।

নবনীতা আর তিনটি মেয়ের সঙ্গে এসে ঢুকেই দীপুকে দেখতে পেল। দেখেই চোখ সরিয়ে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে চলে গেল অন্য টেবিলে। সেখানে গিয়ে আবার তাকাতেই দেখলো, দীপু তার দিকেই চেয়ে আছে। নবনীতা আবার চোখ সরিয়ে নিল। একটু বাদে আবার যেই তাকালো, আবার চোখাচোখি হলো। দীপু এক দৃষ্টিতে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

খানিকটা বাদে নবনীতা যখন খাওয়া শেষ করে বন্ধুদের নিয়ে উঠে পড়লো, দীপুও উঠে দাঁড়ালো। একেবারে নবনীতার পাশাপাশি বেরিয়ে এলো দরজা দিয়ে, একটাও কথা বললো না।

নবনীতার বন্ধুরা ঢুকে পড়লো ক্লাসে, নবনীতা বললো, আমি আজ চলি রে, আমি এই ক্লাসটা কাটবো। বাড়িতে আজ দিদি জামাইবাবু আসবে!

লম্বা করিডোর দিয়ে হেঁটে আসছে নবনীতা, দীপু তার কাছাকাছি, কেউ কোনো কথা বলছে না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেটের বাইরে এসে ট্রাম স্টপে দাঁড়ালো নবনীতা, দীপু

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। নবনীতাকে কিছু বললো না, দীপু এমনিই স্বগতোক্তি করলো, এখন ট্রামে খুব ভিড়।

নবনীতাও দীপুর দিকে তাকালো না। সেও স্বগতোক্তি করলো, যতই ভিড় হোক, আমাকে যেতে হবেই।

—না।

—হ্যাঁ।

—না।

নবনীতা আর কথা বাড়ালো না। হাঁটতে লাগলো হ্যারিসন রোডের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দীপু। প্রেসিডেন্সি কলেজের গেট পেরুবার পর দীপু আবার স্বগতোক্তি করলো, এতদিনে বুঝি একবারও খবর দেওয়া যেত না। নবনীতাও স্বগতোক্তি করলো সবাই আমাকে ভুল বুঝবে কেন?

—ভুল বোঝার সুযোগ দিলেই ভুল বুঝতে হয়।

নবনীতা থমকে দাঁড়ালো। এবার সরাসরি তাকালো দীপুর দিকে, দীপু অপরাধীর মতন মুখ করে বললো, যাক্, আর কিছু বলতে হবে না।

—তুমি—

—বলছি তো, আর কখনো ভুল বুঝবো না।

এবার দু'জনেই হেসে ফেললো উজ্জ্বল মুখে।

একটু বাদে কফি হাউসের টেবিলে মুখোমুখি বসে নবনীতা জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের বাড়িতে নাকি মানুষের হাড় বেরিয়েছে?

—সে খবর রাখো দেখছি।

—আমি সব খবর রাখি। তুমি না রাখলে কি হয়।

—কে বলেছে তোমায়?

—তা নিয়ে তোমার দরকার কি? বাবাঃ, বাড়ির মেঝেতে কঙ্কাল? তারপরেও সে বাড়িতে মানুষ থাকে? আর কিছু হয় নি?

—হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতে খুব ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে।

—কি রকম? কি হয়েছে বলো না।

—একটা খুব মিষ্টি মেয়ে ভূত, সে কারুর কোনো ক্ষতি করে না। এক এক সময় এক এক জনের চেহারা ধরে আসে। সে-ই আমাকে তোমার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানের ভেতরের রেস্টুর‍্যান্টে পাশাপাশি বসে আছে রীণা আর সুবিমল। দু'জনেই একটু চিন্তিত।

সুবিমল জিজ্ঞেস করলো, কাল বলেছিলে?

—না!

—আর কবে বলবে?

—হয়তো কোনদিনই বলা হবে না! কাল ঐ কথা বলতে গিয়ে তার বদলে বলে ফেললাম, আমি ওকে ভালোবাসি।

সুবিমল একটু মুচকি হেসে বললো, ও। তাই বুঝি?

রীণা ঝাঁঝালো গলায় উত্তর দিল, হ্যাঁ, তাই বলেছি। মিথ্যে কথা বলি নি, সত্যিই আমি ওকে ভালোবাসি।

—তাহলে সুবিমল বোসের তো বিদায় নেওয়াই উচিত।

—তাই নাও না! বাঁচি তাহলে।

—বিদায় নিতে পারছি কই। এমনভাবে বেঁধে রেখেছো কেন?

—তুমি একটা জিনিস বুঝতে পারবে না। ও সত্যি খুব ভালোমানুষ।

—দেবনাথ যে ভালোমানুষ, তাতো আমিও জানি।

—তা হলে এটা জানো না যে, কোনো সত্যিকারের ভালোমানুষকে কিছুতেই ঠকানো

যায় না।
—ঠকাবার দরকারটা কি? আমি চলে যাচ্ছি!
—আজ চলে গিয়ে আবার কাল ফিরে আসবে?
—যদি বারণ করো, তাও আসবো না। চিরদিনের মতন চলে যাবো।
—পারবে?
—পারতেই হবে। এরকমভাবে তো আর চলে না।
—কিন্তু আমি যে পারবো না! সুবিমল, তোমাকেও যে আমি সত্যিকারের ভালোবাসি
—ছিঃ, বিবাহিতা মহিলার পক্ষে দু'জন পুরুষকে ভালোবাসা মোটেই উচিত নয়।
—সুবিমল, তুমি আমাকে ঠাট্টা করছো?
—একটুও করছি না।
—তাহলে আমি কি করব বলে দাও!
ঝগড়াঝাঁটি না করে একদিন ঠাণ্ডা মাথায় দেবনাথকে সব খুলে বলো। বলো যে, তুমি ঝোঁকের মাথায়, আমার ওপর রাগ করে ওকে বিয়ে করেছিলে। কিন্তু তুমি যে ধরনের মেয়ে, যে ধরনের আবহাওয়ায় তুমি মানুষ, তাতে কিছুতেই তুমি ও বাড়িতে খাপ খাওয়াতে পারছো না। সুতরাং মিউচুয়াল কনসেণ্টে ডিভোর্স হওয়াই ভালো।
—আমি পারবো না, পারবো না! কিছুতেই পারবো না! ওর তো কোনো দোষ নেই! ওকে তো আমি বললেই ও আলাদা বাড়িতে উঠে যেতে পারে।
—তাহলে বাড়িটা নিয়েই যত গণ্ডগোল?
—সুবিমল, কেন তুমি বোম্বে থেকে আবার ফিরে এলে? বেশ তো চাকরিতে বদলি হয়ে বোম্বে চলে গিয়েছিলে—
—বেশ তো, আবার চলে যাচ্ছি না হয়?
—তুমি বুঝতে পারছো না, দেবনাথকে আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ওর তো কোনো দোষ নেই, আমি নিজেই তো ওকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলাম, আমাকে তো কেউ জোর করে বিয়ে দেয় নি! আমি ওর জীবনটা এখন তছনছ করে দেব?
—বেশ তো, দিও না। আমি বোম্বে ফিরে যাচ্ছি।
—তুমি এখানে ফ্ল্যাট পেয়েছো?
—হ্যাঁ। কেন?
—আমার মাথার ঠিক নেই। আমার একবার মনে হচ্ছে, আমি দেবনাথের ওপর অন্যায় করতে পারবো না, আবার মনে হচ্ছে—তোমার সঙ্গে তোমার ফ্ল্যাটেই চলে যাই। চলো, তাই যাই। তোমার চিন্তা ভাবনা করে দরকার নেই?
—বসো, বসো, অত হুড়োহুড়ি করে এ সব হয় না। তুমি খুব ভালো করে ভেবে ন্যাখো, দেবনাথ সম্পর্কে তোমার কোনো দুর্বলতা আছে কি না!
—হ্যাঁ, আছে। আমি জানি। ও আমার সঙ্গে কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করে নি। এমন মানুষ সম্পর্কে কোনো মেয়ের দুর্বলতা না থেকে পারে?
—তুমি আমার কাছে যদি চলে আসো ঝোঁকের মাথায়—তা হলে দেবনাথের জন্য তোমার মনে একটা অপরাধ বোধ থাকবে। তুমি শান্তি পাবে না। তুমি আমাকেও শান্তি দেবে না, দেবনাথেরও শান্তি নষ্ট করবে।
—তাছাড়া, আমি আর একটা কথা ভাবছি। দেবনাথের কাছে যদি আমি অবিশ্বাসী হই, তা হলে হয়তো একদিন তোমার কাছেও অবিশ্বাসী হবো। ঐ যে লোকটা অফিসের গেট থেকে আমার পেছন পেছন আসে, ওর চেহারা যদি একটু সুন্দর হতো, যদি ভদ্রভাবে আমার সঙ্গে আলাপ করতো—
—যাঃ, তা হয় না!
—কেন হবে না? মেয়েরা একবার অবিশ্বাসী হলে বারবার অবিশ্বাসীও হতে পারে। দেবনাথকে যদি ঠকাই, তাহলে আবার কখনো যে তোমাকেও ঠকাবো না—
—তাহলে দেবনাথকে না ঠকানোই তো উচিত মনে হচ্ছে।
—কোনো মেয়ে কি সত্যিই দু'জন পুরুষকে একসঙ্গে ভালবাসতে পারে না!

—পারে নিশ্চয়ই। কিন্তু দু'জন পুরুষের কেউই তা সহ্য করে না। শোনো রীণা, আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি। আমরা তো আর ছেলেমানুষ নই। ঝোঁকের মাথায় কিছু করা আমাদের মানায় না। তুমি আর কখনও আমাকে দেখা করতে বলো না। বরং দেবনাথকে সুখী করার চেষ্টা করো।

—আর তুমি?

—আমি বোম্বে ফিরে যাবো।

—তোমাকে দেখলে আমি মাথার ঠিক রাখতে পারবো না!

—আমি তোমার মাথা ঠিক রাখতে চাই। আর দেখা হবে না।

—সত্যি, আর দেখা হবে না?

—না।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে ফেরার পথে, বাস বন্ধ ছিল বলে হেঁটেই ফিরছিল দেবনাথ। সর্টকাট করার জন্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মধ্যে ঢুকেছিল। রেস্তোরাঁটার পাশ দিয়ে যাবার সময় তার চোখে পড়ল টেবিলের ওপর রাখা সুবিমলের হাতের ওপর রীণার হাত। দু'জনে দু'জনের দিকে প্রগাঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

বাগানটার অন্যান্য পাথরের মূর্তির মতন এক মুহূর্ত শুধু অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল দেবনাথ। তারপর মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে চলে গেল।

সেদিন রাত্তিরে আর খাবার টেবিলে এক সঙ্গে খাওয়া হলো না। শিপ্রা বাড়ি ফিরে শরীর খারাপ, কিছু খাবে না বলে শুয়ে পড়েছে। আসলে সে হোটেলে খেয়ে এসেছে রমেনের সঙ্গে। দেবনাথ অনেক আগেই খেয়ে চলে গেছে নাইট ডিউটিতে। রীণাও একা খেয়ে নিয়ে ঢুকে গেছে নিজের ঘরে। মা দীপুকে একা খেতে দিয়েছেন।

কাণ্ডা চাকরটা কিছুতেই আর এ বাড়িতে থাকতে চায় না। কিছুক্ষণ আগে সে জামা কাপড়ের পুঁটুলি নিয়ে চলে গেছে কাছাকাছি কোনো বাড়িতে তার গাঁও কা আদমির সঙ্গে শুতে। দীপুর ধারণা ওকে নিশ্চয়ই কেউ কয়েক টাকা বেশী মাইনের চাকরির লোভ দেখিয়েছে, তাই ভূতের অজুহাত দেখিয়ে চলে গেল।

দীপুকে আগে বলা হয় নি। খাবার টেবিলেই মা দীপুকে শিপ্রার কথাটা বললেন। দীপু তখন নবনীতার সঙ্গে আবার ভাব হয়ে যাওয়ায় এমন ডগোমগো যে, ব্যাপারটাতে সে তেমন গুরুত্বই দিল না। একদিন যদিও রমেনকে সে যথেষ্ট অপমান করেছিল কিন্তু আজ বললো, ঠিক আছে, দাদার যদি আপত্তি না থাকে তা'হলে আর আমার বলার কি আছে!

আজ দীপু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তবু মাঝ রাত্রে তার ঘুম ভেঙে গেল। একটা মেয়েলি গলায় কান্নার আওয়াজ যেন শুনতে পাচ্ছে। চোখ মেলে তাকাতেই দেখলো ছাদের আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি নারী মূর্তি। নীল কিংবা কালো রঙের শাড়ি, এক রাশ চুল ছড়িয়ে আছে পিঠে।

দীপু ভালো করে চোখ দুটো রগড়ালো। কালকের মতন ভুল দেখছে না তো? না, কোনো ভুল নেই। দীপুর দিকে পেছন ফেরা হলেও নারী মূর্তি যে তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

আজ আর দীপুর কিন্তু ভয় হলো না। অশরীরী কিছু যদি সত্যিই থাকে, আজ দীপু তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিতে চায়।

একটুও শব্দ না করে দীপু খাট থেকে নামল। আস্তে আস্তে টর্চটা তুলে নিল। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। মেয়েটি হাতের ওপর মাথা রেখে হেঁচকি তুলে কাঁদছে।

মেয়েটির খুব কাছাকাছি গিয়ে দীপুর আবার একটু ভয় করতে লাগলো। এ ঠিক ভয়ংকর ভয় নয়, খানিকটা যেন মাদকতা মাখানো ভয়।

আর কাছে গেল না, দীপু থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, কে?

মেয়েটি চমকে সোজা হয়েই দীপুর দিকে ঘুরে দাঁড়ালে, দীপু দেখলো বৌদি। তবু সতর্কভাবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখতে লাগলো। যদি সত্যিই বৌদি না হয়। যদি বৌদির মতন চেহারা নিয়ে...ধ্যাৎ! বাজে চিন্তা।

দীপু জিজ্ঞেস করলো, বৌদি? তুমি?

রীণা ততক্ষণে দ্রুত আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেলেছে। বললো, হ্যাঁ, ভাই আমি। তুমি ঘুম থেকে উঠে পড়লে কেন?

—তুমি এত রাত্রে এখানে কি করছো?

—এমনিই দাঁড়িয়ে আছি। দোতলায় অসহ্য গরম, ঘুম আসছিল না!

দীপু এবার এগিয়ে গিয়ে বৌদির পিঠে একটা হাত রেখে অনুভব করে নিল। তারপর বললো, বৌদি, তুমি কাঁদছিলে?

—কই, নাতো?

—হ্যাঁ, আমি শুনেছি। দাদার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

—না, ঝগড়া হবে কেন? দাদা-বৌদির ঝগড়ার ব্যাপারে ছোট ভাইয়ের কৌতূহল দেখাতে নেই।

—বৌদি, তোমার কি হয়েছে সত্যি করে বলো তো?

—কি আবার হবে। এমনই গরমের জন্য দাঁড়িয়েছি।

—এত রাত্তিরে, ছাদে? আমাকে ডাকলেও পারতে। যদি হঠাৎ ভয়-টয় পেতে! কাল শিপ্রা যে কান্ড করলো—

—আমার ভয় করে না!

—তোমার ভয় করে না? যদি সামনে কেউ এসে দাঁড়াতো, হঠাৎ মনে করো সেই মেয়েটিই যদি—

—কোন মেয়েটি?

—যার হাড় পাওয়া গেছে।

—সে যে মেয়েই ছিল সত্যিকারের, তা কি ঠিক হয়েছে?

—ও আমি ঠিক জানি।

রীণা একটুখানি সরে দাঁড়িয়ে বললো, তা, তাকে দেখলেই বা আমি ভয় পাবো কেন? তার সঙ্গে না হয় গল্প করতাম। জিজ্ঞেস করতাম সে মরলো কি করে? ওখানে পুঁতে রেখেছিল কেন এই সব। কিংবা জিজ্ঞেস করতাম, তারও আমার মতন একটা দুঃখ ছিল কিনা!

—বৌদি তোমার কি দুঃখ আমায় বলো—

—দীপু চলো, এবার শুতে যাওয়া যাক্!

—তুমি এড়িয়ে যাচ্ছো, আমি জানি, তুমি কাঁদছিলে। তোমার কি দুঃখ আমায় বলো, আমি যদি পারি—

ভারী অদ্ভুত এক রহস্যময়ভাবে হাসলো রীণা। সেই হাসির মধ্যে অনেক কিছু মিশে আছে, খানিকটা উদাসীনভাবে বললো, মেয়েদের দুঃখ ছেলেরা কখনও বুঝতে পারে না। ওকথা ছেলেদের কাছে বলতে নেই।

—প্রথম খণ্ড সমাপ্ত—